উদ্বোধন

মাঘ ১৩৮৮
৮৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৮৪তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৮ হইতে পৌষ, ১৩৮৯ ; ইংরেজী : ১৯৮২)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী ধ্যানানন্দ (ভাদ্র, ১৩৮৯ পর্যন্ত)

স্বামী অজজানন্দ (আশ্বিন, ১৩৮৯ হইতে)



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

বার্ষিক মূল্য ১৪·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৮৪তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৮ হইতে পৌষ, ১৩৮৯)

ব্রহ্মচারিণী অজিতা ...	রথযাত্রা (কবিতা) ...	৩৭০
ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী ...	এখনি নয় (কবিতা) ...	২৭৪
	এক ও বহু : বিরোধ ও মিলন (কবিতা) ...	৪১২
স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত ...	স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকণা ...	৩৪০, ৪৭৪, ৪৮৯
শ্রীমতী অভয়া দাশগুপ্ত ...	'কথামৃতে'র দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ ...	৩৬৫
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ...	স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের হিন্দু ছিলেন ? ...	৩১৩
স্বামী আত্মস্থানন্দ ...	দেবী দুর্গা : শক্তির উৎস ...	৫৬৩
শ্রীমতী ঊষারাণী বসু ...	স্মৃতিকণা ...	১০৪
শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ...	বাংলার বাস্তু-শিল্পে পোড়ামাটির কাজ ...	৫৭২
শ্রীকার্তিকচন্দ্র ঘোষ ...	জীব মাঝে শিব (কবিতা) ...	৫৫৫
স্বামী কেদারানন্দ ...	ভারতে শক্তি-উপাসনার ধারা এবং তাৎপর্য	৫৩০, ৫৬৫
শ্রীগণপতি পাঠক ...	আত্মসমর্পণ (গান) ...	৫৪১
স্বামী গীতানন্দ ...	জগন্নাথের স্বরূপ-সন্ধানে	২৯৪, ৩৪২
শ্রীগুরুদাস মুখোপাধ্যায় ...	আর্তি (গান) ...	১৬৮
স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ...	স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি ...	৬১৩
শ্রীমতী চিত্রা মিত্র ...	প্রভু মোর হৃদয়ে বিরাজে (কবিতা) ..	১৫৯
	দুঃখ দিয়ে জাগাও মোরে (কবিতা) ...	২৯৯
স্বামী চেতনানন্দ ...	'কথামৃতে'র জন্মশতাব্দী ...	১১৩
	কথামৃত-প্রবেশ	৪১৮, ৪৯৮
ব্রহ্মচারী জগদীশচৈতন্য ...	মনসৈবেদমাপ্তব্যম্ ...	৫১২
ডক্টর জলধিকুমার সরকার ...	'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ (সঙ্কলন) ...	৬৩
	ব্যক্তিত্বের প্রভায় সারদামণি ...	৫০৯
	'জাপানীজ এনকেফালাইটিস' : পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের সমস্যা ...	৫৬৯
শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায় ...	'আনন্দমঠ'-এর মাতৃমূর্তি ...	৪৬৫
স্বামী জীবানন্দ ...	শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্ ...	৪৭৩
শ্রীজৈল সিং ...	যুবকদের প্রতি ...	৫২৯
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ...	পূজাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণ ...	৪৫৯

শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত … শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম ৫৭৫, ৬১৯
শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী … শিব-গৌরী (কবিতা) … ৩৯৭
স্বামী দেবানন্দ … সাধকের চিন্তাধারা … ১৯৭
স্বামী ধ্যানেশানন্দ … 'কিমিদম্' … ২৬৪
ডক্টর ধ্রুব মার্জিত … আলোকের সাহায্যে জল হ'তে জ্বালানী … ১২৭
শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় … চির জ্যোতির্ময় (কবিতা) … ১১২
শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় … শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র … ৪২৬
ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য … খোকা মহারাজের স্মৃতিকথা (সঙ্কলন) … ১০৯
স্বামী সারদানন্দ : মূর্ত বিবেকবাণী … ৬২৯
শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় … সূর্য-প্রণাম (কবিতা) … ৮
শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় … আলোর পথে আমায় টানো (কবিতা) … ৫৬২
শ্রীনীলদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী … নব ভগীরথ (কবিতা) … ২১২
স্বামী পরাশরানন্দ … বৌদ্ধসঙ্ঘ … ১৬৪
স্বামী পূর্ণানন্দ … নন্দাদেবী (কবিতা) … ৫১৯
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ … শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত … ৩৯৮
ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ … বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার … ৩৬১
শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে হাস্যরস : বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ … ৪১৩
শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন … প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ … ২৮
স্বামী প্রভাকরানন্দ … দিশারী (কবিতা) … ৩১৮
শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন … স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম … ৪৪৫
'বল্লভ' … অপার মহিমা (কবিতা) … ৭২
শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য … রামকৃষ্ণবন্দনাপঞ্চকম্ (স্তোত্র) … ৫৬
অদ্বৈতবেদান্তমতে সৎপদার্থের স্বরূপ … ৪৪১
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ … সর্বধর্মস্বরূপিণে (কবিতা) … ২৬৯
ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা … ওড়িয়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব … ৪৫১
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ … শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা … ৪
শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য … ১০০
ভারতীয় যুবকদের প্রতি আহ্বান … ১৪৮
সন্ন্যাসাশ্রম ও বর্তমান যুগে সমাজের প্রতি সন্ন্যাসীর কর্তব্য … ৩৮৯
স্বামী বুধানন্দ … শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা ৯, ৫৭, ১০৫, ১৬০, ২১৯, ৩১৯, ৩৫৭, ৬৩৭

'বৈভব'	...	যায় (কবিতা)	... ১৯৬
		ডাক (কবিতা)	... ৩৮৮
শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়	...	বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি (কবিতা)	... ১৫২
শ্রীমতী মানসী বরাট	...	ভক্তের ভগবান্ (কবিতা)	... ২৫৬
শ্রীমতী মুক্তি কর	...	ইঙ্কাদের দেশ পেরুতে সাতদিন ✓	... ৬৫
		ভক্ত বরদাসুন্দর	... ৫১৪
শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	'যমেবৈষ বৃণুতে' (কবিতা)	... ৭২
স্বামী মুখ্যানন্দ পুরী	...	লঘুবিবেকানন্দম্ (স্তোত্র)	... ১৫০
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন সেনগুপ্ত	...	রাতের পৃথিবী (কবিতা)	... ২২৪
ডক্টর রমা চৌধুরী	...	দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়	... ১৫, ৬০, ২০৮, ৩৫৩
		'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'	... ৫০৫
ডক্টর রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার	...	স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য	... ১৯
রেজাউল করীম	...	সমন্বয় সাধনে কবীর	... ৫২২
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	...	পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন ✓	৫২, ১২১, ১৫৩, ২০১, ২৪৯, ৩০৯, ৩৪৮, ৪৯৩, ৫৫৬
শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু	...	'বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসে' নিবেদিতা : একটি স্মৃতিকথা ✓	.. ৪০৩
শ্রীশচন্দ্র সান্যাল	...	শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি	... ৬২৩
শ্রীশচীন্দ্রনাথ দরিপা	...	বিবেকানন্দ (কবিতা)	... ৩৪৭
ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	বিবর্তনবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ	... ১৬৯
শ্রীশশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত	...	শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা	... ৭৫
শ্রীশান্তশীল দাশ	...	মায়ের কাছে (কবিতা)	... ৪১২
শ্রীশান্তিকুমার মিত্র	...	শ্রীম-স্মরণে (কবিতা)	... ২৪৮
শ্রীশিবশম্ভু সরকার	...	দৈবজ্ঞ (কবিতা)	... ৪৪০
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	শ্রীম-স্মৃতি	... ৭৩
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	...	সতী ও উমা	... ৩৯৩
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর	...	সারদা-সরস্বতী (কবিতা)	... ১১২
শেখ সদরুদ্দিন	...	মাতৃ-বিভূতি (কবিতা)	... ৬২২
শ্রীসলিলকুমার চক্রবর্তী	...	চিনি না যে সব চিনি	... ৬৪২
অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত	...	শ্রীশ্রীমায়ের বাণী : সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে	২১৩, ২৫৭
শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ	...	মহাভূত মহাতীর্থ	২৭০, ৩০০

শ্রীসুবল কর	...	প্রার্থনা (কবিতা)	... ৩২৩
শ্রীসুশীলকুমার সিংহ	...	হে ভারত ভুলিও না (কবিতা)	... ২০৭
শ্রীমতী হিমানী রায়	...	আশা জাগে (কবিতা)	... ১৬৮
		প্রতীক্ষা (কবিতা)	... ২৪৮
		'শ্রীম' (কবিতা)	... ৫১৮
		শ্রীশ্রীমা (কবিতা)	... ৬০৭
দিব্য বাণী :	...		... ১, ৪৯, ৯৭, ১৪৫, ১৯৩, ২৪১, ২৮৯, ৩৩৭, ৩৮৫, ৪৮১, ৫৪৫, ৬০১
কথাপ্রসঙ্গে : (স্বামী নিরাময়ানন্দ)	...	উদ্বোধনের নববর্ষে	... ২
		শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ-সন্ধানে	... ৫০
		কথামৃত-শতবার্ষিকী	... ৯৮
		ইতিহাসের অঙ্গনে বুদ্ধ ও শঙ্কর	... ১৪৬
		ধর্ম, দর্শন ও জীবন	... ১৯৪
		গুরু : ব্যক্তি ও শক্তি	... ২৪২
		জনগণের সমগ্র রূপ	... ২৯০
		কৃষ্ণচরিত্র	... ৩৩৮
		মায়ের আহ্বান	... ৩৮৬
(স্বামী অজজানন্দ)	...	শুভ ৺বিজয়া	... ৪৮২
		'লোকে বলে কালী'	... ৪৮২
		ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব	... ৫৪৬
		মায়ের মন্দির-দ্বারে	... ৬০২
		দেব-মানব ঈশা স্মরণে	... ৬০৫
নানাপ্রসঙ্গে : চিরন্তন কাহিনী	...	শ্রদ্ধা ও সত্যই ব্রাহ্মণত্ব	... ৫৮০
		'শ্রদ্ধা আবিবেশ'	... ৬৪৬
স্মৃতি-সঞ্চয়ন :	...	'সব কাজই সাধন'	... ৫৮২
		'ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে কিনা এটাই লক্ষণীয়'	... ৬৪৯
জ্ঞান-বিজ্ঞান :	...	এসেন্স-অগুরু	... ৫৮২
		আবহাওয়ার উপর নজর	... ৬৫০
দেশ-বিদেশ :	...	দুই মহাদেশ জুড়ে একটি দেশ	... ৫৮৩
		কিরাতদের দেশ	... ৬৫১

সমালোচনা

শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ৬৫৪
ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য ... ২২৭, ৫৪১
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩১, ৫৮৬
ডক্টর জলধিকুমার সরকার ... ১৭৭, ৩০১
শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় ... ৮০, ৬৫৩
স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ২৭৫
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ৩৭১
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ১২৯
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২২৬
ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য ... ২৭৭, ৪৭৮
ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ ... ৭৯, ৩২৪
শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী ২৭৬
শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন ১২৯
স্বামী প্রভাকরানন্দ ৩২৬
স্বামী বিমলাত্মানন্দ ২২৬
শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২২৫, ৪৭৭
ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ ৩৬

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ... ৩৭, ৮২, ১৩২, ১৮০, ২২৯, ২৭৮, ৩২৭, ৩৭৩, ৪৭৯, ৫৪২, ৫৮৮, ৬৫৫

বিবিধ সংবাদ ... ৩৯, ৮৬, ১৩৫, ১৮৪, ২৩১, ২৭৯, ৩২৮, ৩৭৬, ৪৮০, ৫৪৪, ৫৮৯, ৬৫৬

অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ... ১০২
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪৮৮, ৫৫০
শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত আশীর্বাদ-পত্র ... ৬০৮
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন ২৪৪, ২৯২, ৫৫৩, ৬০৯
স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ... ১৯৯
পত্রসংগ্রহ : স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখিত ... ২৪৬

অন্যান্য

আঁটপুরে ধুনিমণ্ডপের উদ্বোধন ... ৩৯
আবির্ভাব-তিথি ও পূজা-তিথির সূচী ... ১৮২
জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরস্থিত সাধুভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ... ২৭৮
পল্লীমঙ্গল : রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রামীণ প্রকল্প .. ১৮০

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের রজতজয়ন্তী উৎসব ... ৮৪
বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের (হাওড়া) হীরকজয়ন্তী উৎসব ... ২৮০
বিবেকানন্দ সোসাইটির (কলিকাতা) অশীতি বর্ষপূর্তি উৎসব ... ৫৪৪
ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মেরুবিজয় ... ৮৬
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-শতবার্ষিকী উৎসব ... ১৩৬
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন ১৮৩, ৫৩৭
রামকৃষ্ণ মিশনের ৮৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস ... ২৩০
রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ... ৮২
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ... ৩৭৩
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (চেরাপুঞ্জী) সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ... ৫৪৩
শিরীষ কাগজ ... ২৩১

আবেদন :

উড়িষ্যায় সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়, খরা ও বন্যায় সাহায্যার্থে ... ৫৩৬

পুনর্মুদ্রণ

উদ্বোধন, ২য় বর্ষ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) ... ৪১
(৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা) ... ৮৯
(৭ম সংখ্যা) ... ১৩৭
(৭ম ও ৮ম সংখ্যা) ... ১৮৫
(৮ম সংখ্যা) ... ২৩৩
(৮ম সংখ্যা) ... ২৮১
(৯ম সংখ্যা) ... ৩২৯
(৯ম সংখ্যা) ... ৩৭৭
(৯ম-১০ম সংখ্যা) ... ৫৯১

চিত্রসূচী

১। শ্রীশ্রীদুর্গার চিত্র ... ... ৩৮৫ (ক)
২। শিব-সতীর চিত্র : নন্দলাল বসু ... ... ৩৯৩ (ক)
৩। উদ্বোধনী ভাষণরত স্বামী গহনানন্দজী (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলন : ১৯৮২) ... ... ৫৩৮ (ক)
৪। প্রারম্ভিক ভাষণরত ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন : ১৯৮২) ... ... ৫৩৮ (ক)
৫। স্বাগত ভাষণরত স্বামী নিরাময়ানন্দজী (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন : ১৯৮২) ... ... ৫৩৯ (ক)
৬। বক্তা, আলোচক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন : ১৯৮২) ... ... ৫৩৯ (ক)

বাঘের ভিতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘের সুমুখে যাওয়া উচিত নয়। কুলোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

* * * —শ্রীরামকৃষ্ণ

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

যে ব্যক্তি নিজেকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবনতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। জাতি সম্বন্ধেও একথা সত্য। আমাদের প্রথম কর্তব্য—নিজেকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথমে নিজের উপর, তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশ্যক। —স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—২৩ু টাকা : সম্পূর্ণ সেট ২৩০ু টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—২০ু টাকা : সম্পূর্ণ সেট ২০০ু টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জলযোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫·০০
ভক্তিযোগ— পৃঃ ৯৬, মূল্য ৩·০০
ভক্তি-রহস্য— পৃঃ ৯৫, মূল্য ৫·০০
জ্ঞানযোগ— পৃঃ ২৯৮, মূল্য ১৪·০০
রাজযোগ— পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬·৫০
সন্ন্যাসীর গীতি— পৃঃ ২৩, মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃঃ ২৯, মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ— পৃঃ ৩৬, মূল্য ১·৫০
পত্রাবলী : প্রথমার্ধ— পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০·০০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)— মূল্য ২৭·০০
পওহারী বাবা— পৃঃ ১৮, মূল্য ১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান— পৃঃ ৮০, মূল্য ১·২৫
ধর্ম-সমীক্ষা— পৃঃ ১৩০, মূল্য ৫·০০
ধর্মবিজ্ঞান— পৃঃ ১০২, মূল্য ৫·৫০

ভারতে বিবেকানন্দ—(১৭শ সংস্করণ) পৃঃ ৪২৫, মূল্য ২০·০০
বেদান্তের আলোকে— পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫·০০
দেববাণী— পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ—(৭ম সং) পৃঃ ১৮০, মূল্য ৫·০০
মদীয় আচার্যদেব— পৃঃ ৬২, মূল্য ২·২৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে— পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা— পৃঃ ৫২, মূল্য ২·০০
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬·০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃঃ ১৩৬, মূল্য ৩·৫০
ভাববার কথা— পৃঃ ৬৪, মূল্য ২·৩০
বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০
বর্তমান ভারত— পৃঃ ৪০, মূল্য ২·৫০
ভারতীয় নারী—(১৮শ সং) পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। ৩য় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২.৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪.০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২.৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২.৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩.০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫.০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩.২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫.০০

গোপালের মা— স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১.৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ (৪র্থ সং) পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৮.০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭.৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫.৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫.০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪.০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬.৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, ৭ম সং, মূল্য ১.০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩.০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭.৫০

অতীতের স্মৃতি— (৪র্থ সং), পৃঃ ৪৫৫, মূল্য ২০.০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪.৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৯, মূল্য ২.০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পুনর্মুদ্রণ (১৩৮৮), পৃঃ ৭০, মূল্য ২.৫০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩.৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। ৮ম সং, পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৬.০০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫.০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪.০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬.২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০.০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১.২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী— স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০.৭৫

বিবিধ-প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩.৫০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে — স্বামী অখণ্ডানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫.০০

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮৮

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী		... ১
২।	কথাপ্রসঙ্গে। উদ্বোধনের নববর্ষে		... ২
৩।	শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের ।।	স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	... ৪
৪।	সূর্য প্রণাম (কবিতা)	শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়	... ৮
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা	স্বামী বুধানন্দ	... ৯
৬।	দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়	ডক্টর রমা চৌধুরী	... ১৫
৭।	স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য	ডক্টর রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার	... ১৯
৮।	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ	অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন	... ২৮

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

৯। সমালোচনা ... ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ ... ৩৬
১০। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ... ৩৭
১১। বিবিধ সংবাদ ... ৩৯
১২। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (পুনর্মুদ্রণ) ... ৪১
১৩। প্রচ্ছদপট ... শ্রীঅনিল উকিল

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
জনৈক ভক্ত



৮৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে;…মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই…। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন।…এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল…। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন…। অদ্ভুত দেব-শিশু…তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।'… তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল।…তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি!

—শ্রীরামকৃষ্ণ

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১০৫-০৭]

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষে

উদ্বোধনের ৮৪তম বর্ষের প্রথম প্রভাতে আমরা স্মরণ করি যুগপ্রবর্তক এ-যুগের চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দকে, যিনি তাঁহার গুরু ইষ্ট অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাকল্যাণকারী ভাব-ধারার প্রচারযন্ত্ররূপে এই 'উদ্বোধনে'র পরিকল্পনা করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও বহু সাধুসজ্জনের সহযোগিতায় ১৮৯৯, ১৪ই জানুআরি, ১লা মাঘ ১৩০৫ 'উদ্বোধন' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—দিনটি স্বামীজীর জন্মদিনের অতিনিকটবর্তী। ইংরেজী হিসাবে ঐদিন ১২ই জানুআরি, বাংলা হিসাবে উহা পৌষসংক্রান্তি। যেদিনটি সর্বভারতীয় এক পুণ্যদিবস—গঙ্গাসাগর-স্নানের জন্য নির্ধারিত। ভারতীচেতনার গঙ্গাধারা যেন ঐদিন বিশ্বমানবের চিন্তাসমুদ্রে মিলিত হইতেছে। নদীর সীমারেখা সমুদ্রে অসীমে হারাইয়া গেল, সমুদ্রগামী নদী তাহার সমুদ্রসত্তা ফিরিয়া পাইল। একটি দেশ একটি জাতি তাহার বহুদিনের সযত্নে সঞ্চিত চিন্তাধারা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়া সার্থক হইল ইহাই সংক্ষেপে উদ্বোধনের উদ্দেশ্য।

এই শুভ প্রারম্ভে উদ্বোধনের লেখকলেখিকা, গ্রাহকগ্রাহিকা, পাঠকপাঠিকা, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞাপনদাতা সকলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নিবেদন করিতে চাই—এই বারটি মাস বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে এই কালের উপকূলে পৌছিতে পারিয়াছি। প্রথমতঃ বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, তাহারই জন্য প্রেসেরও কাজকর্ম ব্যাহত, তদুপরি আজকাল ডাকবিভাগের গোলমাল লাগিয়াই আছে, রাস্তাঘাট বন্ধ এবং সর্বোপরি বাংলাবন্ধ্, ভারতবন্ধ্। কোন্ দিকে তাকাইব একটু সহায়তার জন্য, তাহা বুঝিয়া ওঠা যায় না! এরই মধ্যে পাঠকদের আগ্রহ আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে; একখানি উদ্বোধন না পাইলে তাঁহারা তিনবার চিঠি লেখেন, আমরা আবার পাঠাইয়া দিই। তাহা যদি তাঁহাদের কাছে পৌছায়, তবে বুঝিতে হইবে উভয়েরই ভাগ্য।

*   *

নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াই একটি জীবন্ত নদী তাহার পথ করিয়া লয়। তাহাকে যে বহুদূর যাইতে হইবে, সে যে সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দ যে এ-যুগের ঘুমভাঙানিয়া প্রভাতে 'উদ্বোধনে'র উপর গুরু-দায়িত্ব দিয়া গিয়াছেন। বৎসরান্তে বা বর্ষারম্ভে সেগুলি স্মরণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, আমরা ঠিক পথে চলিয়াছি কিনা।

স্বামীজী উদ্বোধনকে কত ভালবাসিতেন, তাহার প্রথম প্রমাণ উদ্বোধনের 'প্রস্তাবনা' তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, তারপর যেখানেই থাকুন, সম্পাদককে প্রায়ই চিঠি লিখিতেন—উদ্বোধনের ভাষা কিরূপ হইবে, ভাব কিরূপ হইবে। নিজেও প্রায়ই হয় পত্র, না হয় প্রবন্ধ দিয়া উদ্বোধনকে সমৃদ্ধ করিতেন—আজ তাহারই দু-চারিটি আমরা আলোচনা করিব, উদ্বোধনের প্রাণপুরুষকে স্মরণ করিয়া।

উদ্বোধনের 'প্রস্তাবনা'—একটি নির্দেশ বিশেষ, কিভাবে একটি জাতির অবনতি রুদ্ধ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথ ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহারই একটি চিত্র; কি করিয়া একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগাইতে হয়—তাহারই মন্ত্র।

পূজামণ্ডপে আমরা বোধনের মন্ত্র শুনি, উদ্বোধনের মন্ত্র তাহারই প্রতিধ্বনি! 'উদ্বোধন' শব্দটি মনে হয় স্বামীজী তাঁহার অতিপ্রিয় কঠোপনিষদের মন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন: 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!' ওঠ জাগ, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া

আত্মজ্ঞানে জাগ্রত হও। এই বাণীটি উদ্বোধনের মটো (motto)ও বটে। সাক্ষাৎভাবে না হইলেও এখানেই সন্ধান মেলে উদ্বোধনে কি বীজ বপন করা হইয়াছে।

স্বামীজীর নির্দেশ : ভারতের জাগরণ আজ জগতের প্রয়োজনে। ভারতের মানুষ শত-শতাব্দী যাবৎ সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া তমোগুণে ডুবিতেছে—তবু তাহারই মধ্যে এই ভারতেই সত্ত্বগুণের ক্ষীণ হোমানল জ্বলিতেছে—যাহার সাহায্যে বর্তমান পৃথিবীব্যাপী রজোগুণের দাবানল নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, সে দায়িত্ব ভারতের।

"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"

এই ভাবেই স্বামীজীর ঋষিদৃষ্টি পৃথিবীব্যাপী মানুষের আগামী যুগের জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, এবং ভারতকে তাহার দায়িত্বগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজীর এ-দৃষ্টি ভূলোকের আলোকজাত নয়—এ দ্যুলোকের দ্যুতি! 'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ'! যদিও স্বামীজী মাটির মানুষকে কখনও অস্বীকার করেন নাই, তবু এ কথাও স্বীকার করেন নাই, মাটির মানুষ মাটিতেই ফিরিয়া যাইবে; বরং খ্রীষ্টের মতোই দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, মানুষ শুধু ভাতরুটি খাইয়াই জীবনধারণ করিবে না, শারীর জীবনের ঊর্ধ্বে আছে তাহার এক আধ্যাত্মিক সত্তা। সে-সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। কি অপূর্ব স্বামীজীর সমন্বয়ী দৃষ্টি!

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই কৃষ্টিধারাকে তিনি দুই মহানদীরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং ব্যাপক ও গভীর ইতিহাসজ্ঞান তাঁহার তৃতীয় নয়ন—তাহাতেই ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে।

"সুদূরবিস্তৃত বিভিন্নপর্বত-সমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়, এবং যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূর-সম্প্রসারিত এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হয়।"

স্বামীজীর পরিদৃষ্ট এই মিলন সংঘাত নয়—সংঘর্ষ নয়; একে অপরের কাছে ততটুকুই গ্রহণ করিবে—যেটুকু তাহার অভাব ছিল, যথা :

"ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য-সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।"

অতি অল্প কথায় সংহত ভাষায় স্বামীজী দুইটি* কৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এইখানেই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার মনের, উহা কত গভীর ও কত ব্যাপক! এ আলোচনা কোন কৃষ্টির বিরুদ্ধ সমালোচনা নয়। একে অপরের পরিপূরক, একের অভাব দূরীভূত হইবে অপরের অর্জিত ভাবের দ্বারা। বিনিময়—আজ শুধু পণ্যের বাজারেই নয়; ভাবের বাজারেও—তাহারই ইঙ্গিত স্বামীজীর বজ্রগম্ভীর ঘোষণায় :

"আধুনিক সময়ে পুনরায় ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত। তাহার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অর্থাৎ ভারত ও গ্রীক বা যবন চিন্তাধারা।

শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

প্রিয় ছাত্রবন্ধুগণ, সন্ন্যাসিবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী,

আজকে আমাদের এক-রকম বলতে গেলে 'thrice blessed day'। কেননা আজকের দিনে এই প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী উৎসব আরম্ভ, ঠাকুরের মর্মর-মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হ'ল, আর এমন একদিনে হ'ল যেদিন স্বামী তুরীয়ানন্দের জন্মতিথি।

এই প্রতিষ্ঠানের কার্য-প্রণালী আপনারা শুনেছেন, তাতে বলা হয়েছে—এখানে স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী ছাত্রদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা আজকাল দেখছি, চারদিকে দেখছি—সব অন্ধকার। সমাজের সর্বস্তরে দেখি সততার অভাব, চোরাকারবারী, কালোটাকা—এই সবে সমাজ যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কেন? এর উত্তরে ব'লবো, স্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসলেন, তখন দক্ষিণদেশে একটা জায়গায় কতকগুলি লোক তাঁকে বললেন: স্বামীজী আপনি রাজনীতিতে আসুন, দেশকে স্বাধীন করুন, তারপর ধর্ম-টর্ম। স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন: স্বাধীনতা তোমাদের কালই দিতে পারি। তোমরা কি তা রাখতে পারবে? তোমাদের মধ্যে মানুষ কোথায়? স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে, এই রকম মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরী কর, তারপর স্বাধীনতার কথা ভাবো। ঠিক কথা—উনি যে বলেছেন, আজ আমরা তা বুঝতে পারছি। আমাদের দেশের এই দুরবস্থা কেন? মানুষ নেই। মানুষ কেন নেই? ভারতবর্ষে আগে যে এত মনীষী ছিলেন, আগে বড় বড় ত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, কত বড় বড় সম্রাট্ ছিলেন, আর আজ এ-অবস্থা কেন? তার উত্তরে ব'লবো, আমাদের মূলে গণ্ডগোল। যে শিক্ষা আমরা পাই, তাতে কোন রকম মানুষ তৈরী হ'তে পারে না। চরিত্রবান্ মানুষ তৈরী হ'তে পারে না। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে: Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?'—কাঁটার ঝোপ থেকে কি আঙুর পাওয়া যায়, না ছোট ফুলের চারা থেকে ডুমুর পাওয়া যায়?

আমরা ছেলে-মেয়েদের যে-ভাবে শিক্ষা দেব, তারা ঠিক সেইভাবেই গড়ে উঠবে, বড় হ'লে সেইভাবে তাদের বুদ্ধি বিকশিত হবে। তাই আজকের শিক্ষাপদ্ধতি আমরা যদি ঢেলে সাজতে না পারি, যে-ভাবে ব্রিটিশরা ক'রে গেছে সেইটার উপরই ছেড়ে দেই, তাহলে অবস্থা সেই রকমই থাকবে।

স্বামীজী একবার বলেছিলেন: শিক্ষা কি-রকম হওয়া উচিত? না, চরিত্রগঠনই হচ্ছে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ছাত্রদের চরিত্রগঠনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তারপর বলছেন: আমাদের আগে যে সব জ্ঞানের শাখা ছিল, সে-সব এখন আমাদের শেখাতে হবে। তার সঙ্গে ইংরেজীও শেখা দরকার। কারণ ইংরেজী ভাষায় আমরা জগতের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞানও দরকার, আর প্রযুক্তিবিদ্যাও (Technology)। কেন? প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়ে আমাদের শিল্প গড়ে তুলতে হবে। শিল্পের উন্নতি দ্বারা যাতে গরীবরা খেতে পায়—তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু মূল জিনিস হচ্ছে চরিত্রগঠন। চরিত্র-গঠন কি এমনি হয়ে যায়? বক্তৃতা দিলে, না পার্লামেণ্টে একটা নিয়ম পাশ করলেই হয়ে যায়? চরিত্রগঠন করতে ধর্মের দরকার। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাতে দুটি ভাগ ছিল: একটি

অপরাবিদ্যা, আর একটি পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া হ'ত, যা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তা হ'ল যা হাজার হাজার বর্ষ ধ'রে চলে আসছে—মোক্ষ আর ধর্ম। মোক্ষ হচ্ছে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য, আর তার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রেও ওটার দিকে যেন দৃষ্টি থাকে। আগেকার ছেলে-মেয়েদের নানারকম শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তার ভিতর ছিল ধর্ম বা নীতিশিক্ষা, আমরা যাকে বলি, নৈতিক গুণ অনুশীলন। এই সবগুলি তাদের পালন করতে হ'ত। তাতেই তাদের চরিত্রগঠন হ'ত। আর এখন ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের শিক্ষার ভিতরে নেই। অতএব যে-রকম শিক্ষা দিচ্ছি, সেই রকম ফল পাচ্ছি। যে-শিক্ষায় জাতির যা উদ্দেশ্য, জাতির যা আদর্শ তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, সেই শিক্ষা শিক্ষাই নয়। শিক্ষা মানে কি একটু লেখাপড়া শেখা? না, আরও কিছু? শিক্ষা মানে, ছেলে-মেয়েরা—যারা শিক্ষা করতে স্কুলে যায়, তাদের দেশের আদর্শ-মতো গড়ে তুলে তাদের যথার্থ ভারতীয় নাগরিক ক'রে তোলা। তা না হ'লে শিক্ষায় কি লাভ? আদর্শ শিক্ষার অভাবেই আজকে আমাদের এই দুরবস্থা।

আমাদের সব স্কুল-কলেজের পাঠক্রমের মধ্যে এ-সব কিছুই নেই। আমাদের স্কুল-কলেজগুলি এখন নানারকম অসুবিধার মধ্যে আছে। এখন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজীর ভাবাদর্শ পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারছে না। কিন্তু তাতে যে-টুকু সুযোগ আছে, সেটাই যাতে প্রয়োগ করতে পারে, তার জন্য আমরা করেছি ছাত্র-নিবাস ও এই-সব আবাসিক বিদ্যালয়। তাতে ছেলেরা সব এক সঙ্গে থাকে। শিক্ষকও ছাত্রদের কাছে থাকেন, আর তাতে বিদ্যালয়ের যে পাঠক্রম আছে, তা ছাড়াও তাদের আরও একটু অধিক শিক্ষা দিতে পারি। সেইজন্য আমাদের অনেক জায়গায় আবাসিক বিদ্যালয় করা হয়েছে। এখানে আবাসিক বিদ্যালয় হওয়াতে আজ ঠাকুরের মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখানে মন্দির হ'ল। এ-বিদ্যালয়ের সঙ্গে, লেখাপড়ার সঙ্গে মন্দিরের কি সম্পর্ক? এ-কথা উঠতে পারে। মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক এই: এই মন্দির থাকাতে সমস্ত ছাত্রদের জীবনে একটা প্রভাব পড়বে—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী যে-ভাবে জীবন-যাপন ক'রে গিয়েছেন আর উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, তা প্রতিদিন দেখে। তাঁদের ভাবগুলি যাতে ওদের মনে একটা ছাপ রেখে দেয়, তার জন্য মন্দিরের প্রয়োজন। অন্য কোন স্কুলে তা হ'তে পারে না। এখানে ধর্মের ভাব—পাঠক্রমে প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও ছেলেরা পেয়ে যাচ্ছে।

বাইরের স্কুলে শিক্ষকের সঙ্গে ছেলেদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। ছেলেরা সময়মতো এল, দু-ঘণ্টা প'ড়ল, চলে গেল। শিক্ষক এক ঘণ্টা পড়ালেন, চলে গেলেন। তারপর আর কিছু নেই। কিন্তু আগেকার দিনে তা ছিল না। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের পিতাপুত্রের মতো সম্পর্ক ছিল। আর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। সে-শ্রদ্ধা আজকাল আর কিছুই নেই। ঘেরাও চলছে, আরও কতরকম সব চলছে। সে-শ্রদ্ধা থাকবে কি ক'রে? সেই শ্রদ্ধা হওয়ার জন্য যে-গুণ দরকার, সেই গুণই নেই। সেইজন্য আমাদের এখানে আবাসিক বিদ্যালয় হওয়াতে শিক্ষক, ছাত্র, সাধু—সব এক সঙ্গে থাকছে, তার ফলে তাদের ভিতরে পরস্পরের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব, ভালবাসার ভাব জেগে ওঠে। তাতে একটু ভাল ফল পাওয়া যায়।

সেইজন্য আমাদের যেখানে এই রকম আবাসিক বিদ্যালয় করা হয়, সেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলেছেন, তার কিছুটা আমরা প্রয়োগ করতে পারছি, দিতে পারছি ছেলেদের। এখানে

সেইজন্য ছেলেদের ব'লবো: তোমরা যে এই প্রতিষ্ঠানে এসেছ—তোমাদের এই স্কুলের, এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব কি, সেটা জানা দরকার। চরিত্রবান্ না হ'লে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না। চরিত্রবান্ হলেই বড় বড় কাজ করতে পারবে। এই যেমন, মহাত্মা গান্ধী এত বড় কাজ করলেন। কেন? চরিত্রবান্ ছিলেন বলে। তোমাদের আর একটা কথা বলি, আজকাল বার্ষিক সমাবর্তন-সভায় বক্তৃতা (Convocation address) হয় এবং ছাত্রেরা ডিগ্রি নিয়ে যায়। আগেকার সমাবর্তন-সভার সার অংশ তোমাদের একটু বলি, যা উপনিষদে আছে, আচার্য শিষ্যকে বাড়ি যাওয়ার আগে বলছেন: 'সত্যং বদ', 'ধর্মং চর'—সত্য কথা বল, ধর্ম অনুষ্ঠান কর। সত্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ো না, ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'য়ো না। নিন্দনীয় কাজ কিছু ক'রো না। যা ভাল আচরণ সেটা করবে। 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব'—এই সব উপদেশ দিতেন। স্বামীজী আরো দুটি কথা যোগ ক'রে দিয়েছেন, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' তখনকার দিনের সমাবর্তন-বক্তৃতা আর আজকালকার সমাবর্তন-বক্তৃতার মধ্যে তফাতটা দেখ। দৃষ্টিভঙ্গি কতটা আলাদা। আগেকার দিনের শিক্ষায় বলছে: তুমি মানুষ হও। বিদ্যালয় ছেড়ে যাচ্ছ বলে তুমি শিক্ষা ছেড় না। অধ্যয়ন তুমি ছেড় না। অধ্যয়ন তোমাকে করতে হবে। —এই সব কথা আচার্য শিষ্যকে বলছেন বাড়ি যাওয়ার সময়। এখনকার সমাবর্তন-সভার বক্তৃতায় আমরা অন্যরকম কথা পাই—অবশ্য এগুলিরও দরকার আছে। কিন্তু মানুষ হওয়ার যে-শিক্ষা তার দিকে এখন কোন দৃষ্টি নেই।

কলকাতা বা অন্যান্য সহরের কোলাহলে যাতে তোমাদের শিক্ষার, তোমাদের পড়াশুনার কোন ব্যাঘাত না হয়, তার জন্য এমন একটি নির্জন জায়গায় স্কুল করা হয়েছে। তোমরা শুধু পড়াশুনা নিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু তোমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, তোমরা ভারতবাসী। তোমরা শুধু এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, বাইরের লোকের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা নয়। এই প্রতিষ্ঠানের চারপাশে যে-সমস্ত গ্রাম আছে, সেই সব গ্রামের লোকজন কিভাবে থাকে, তারা কি করে না করে, এটাও দেখবার একটা সুযোগ পাবে। তখন দেখবে তাদের কি দুরবস্থা! তখন তোমাদের স্বামীজীর কথা মনে পড়বে যে, ঐ-সব লোককে মানুষ না ক'রে, মুষ্টিমেয় লোক যদি লেখাপড়া শেখে, তাতে দেশের বিশেষ কিছু লাভ হবে না। সবাইকে শিক্ষা দিতে হবে—এই জিনিসটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। এ দেশকে আবার জাগিয়ে তুলতে হ'লে এই সব লোককে ভাল ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের কাজকর্ম শেখাতে হবে, যাতে তারা উপার্জন করতে পারে, ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে পারে। এখন তোমাদের পড়াশুনার দিকে বেশী মন দিতে হবে, কিন্তু তাদের দেখে, এই দুঃখের কথাটা মনে রাখলে সময়মতো তাদের সাহায্য করতে পারবে।

তোমাদের শিক্ষা যখন শেষ হয়ে যাবে, তোমরা যখন সংসারের মধ্যে ঢুকবে, তখন আমি তোমাদের সকলকে ব'লবো যে, সংসারে ঢোকবার আগে, দু-বৎসর তোমরা দেশের কাজের জন্য দাও। যারা গরীব দুঃখী, যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের মানুষ করার জন্য দু-বৎসর তাদের সঙ্গ কর। তখন তোমাদের জীবন আরম্ভ করার আগে এই সমস্ত লোকের আশীর্বাদ পাবে। এদের আশীর্বাদ নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে তোমাদের জীবনে সাফল্য লাভ হবে।

আর একটা কথা মনে আসছে যে, আজকাল

লেখাপড়ায় যারা খুব ভাল, তারা সবাই বিদেশে যেতে চায়। বিদেশে যাওয়া ভাল, বিদেশে পড়াশুনা করা ভাল, কিন্তু বিদেশে থেকে যাওয়া —এটা কি-রকম আমার মনে হচ্ছে। কেন বিদেশে থেকে যাবে? যে ভারতবর্ষ তোমাকে মানুষ ক'রল, তাকে ভুলে যাবে, শুধু বেশী টাকাপয়সা পাবে বলে? টাকাপয়সা পাওয়ার জন্য কি ভারতবর্ষকে ছেড়ে দেবে? এটা তোমাদের ভেবে দেখা উচিত। অবশ্য ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে তোমাদের দিক থেকেও কিছু বলার আছে ঠিক। তোমরা বলতে পারো, আপনি যা বলেছেন তা ঠিকই, কিন্তু আমরা এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কেউ আমাদের দাম দেয় না। এখানে দু-শ টাকার চাকরী পেতে হ'লে কত গণ্ডগোলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কিন্তু আমেরিকায় গেলে পাঁচ-শ ডলার, একহাজার ডলার, দেড়হাজার ডলারের চাকরী পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, আমাদের দেশে বাস্তবিক প্রতিভা ও কর্মদক্ষতাকে যা দেওয়া উচিত, সেটা আমরা দিই না। তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের কাছে আবেদন ক'রব: না, তোমরা ভারতবর্ষকে ছেড় না, ভুলো না।

সেদিন আমি একটা পুরানো কাগজে পড়লাম, বিজ্ঞানে কি একটা পুরস্কার পেলেন ভারত-বর্ষের বার-তেরজন লোক, যাঁদের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা হ'ল আমেরিকাতে। তাঁরা সবাই ভারতীয়, কিন্তু এখন তাঁরা আমেরিকান নাগরিক। এই দেখ, ভারতবর্ষ তোমাকে মানুষ ক'রল, তার কাছ থেকে নিলে, আর যখন দেওয়ার সময়, তখন আর একটা দেশকে দিলে, এটা কি-রকম? এটাও ভাববার জিনিস। শুধু টাকার দিকে দেখলে চলবে না। এখানে নানারকম অসুবিধা আছে তাও ঠিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে ভুললে চলবে না।

আজ এই দিনটি হরি মহারাজের জন্মতিথি। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান ছিল তাঁর। আর তিনিও আমেরিকায় গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে থেকে যাননি। আবার ভারতবর্ষে ফিরে এসে সাধনা তপস্যা করেন। হৃষীকেশ, নাগল প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে খুব তপস্যা করেছেন। এ-সব ত্যাগের ভাবগুলি তাঁরা যা রেখে গেছেন, সেগুলি ভুললে চলবে না। ছাত্রেরা, তোমরা বোধ হয় হরি মহারাজের জীবনী পড়নি। তোমরা, ওঁর 'পত্রাবলী' আর জীবনী যদি পড়, তাহলে তোমাদের খুব উপকার হবে। দেখবে কি-রকম তেজস্বী পুরুষ ছিলেন তিনি।

আমি আর বেশী সময় নেব না। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কাছে এই প্রার্থনা করছি, যাতে তাঁদের আশীর্বাদ সর্বদা এই প্রতিষ্ঠানের উপর থাকে, আর যে-সব ছেলেরা এখান থেকে বেরোবে তারাও যেন স্বামীজী যে-রকম ছেলে চেয়েছিলেন, ঠিক ঠিক সেইভাবের ছেলে হয়ে বেরোয়।*

* ৮ই জানুআরি ১৯৮২, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের ভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ-রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।—স:

সূর্য-প্রণাম

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে একশ বছর আগে—
এক দুর্দমনীয় তরুণ
মনে হাজার বছরের প্রশ্ন নিয়ে
বইয়ের পাতার মধ্যে উত্তর খুঁজছিল ;
এই পৃথিবীটা কি ?
গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, ঈশ্বর—
এই শব্দগুলোর মানে কি ?
ভারতবর্ষ কেন পরাধীন ?
স্বাধীনতা চাই—
কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়,
চাই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ;
মানুষের এই দেহপিঞ্জরের মধ্যে
বন্দী আত্মার মুক্তি !
মুক্তি কি যুক্তি দিয়ে পাওয়া যায় ?
পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিগুলো যতদিন মনকে
আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল,
ততদিন আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল ;
কিন্তু তা ক্ষণিক—
দুর্বার প্রশ্ন নিয়ে হাজির হ'ল
উনবিংশ শতাব্দীর সামনে।
আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন ?—
মনীষীর দ্বারে দ্বারে গিয়ে একই প্রশ্ন !
সবাই নিরুত্তর।
আসলে এই প্রশ্নের উত্তর একটি জীবন—
তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।
প্রশ্ন শোনামাত্র তিনি উত্তর দিলেন : দেখেছি,
তোমাকেও দেখাতে পারি।
উত্তাল সমুদ্র শান্ত ;
মাঝে মাঝে তীরে এসে আছড়ে পড়ে।
নানা প্রশ্নের ডালি উপহার দিলেই
আসে একটি উত্তরের মালা—
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার ফুলে গাঁথা।
সব জ্বালার অবসান !
প্রশান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় ক্ষণিক বিশ্রাম।
তাও ক্ষণস্থায়ী—
যে সূর্য পৃথিবীকে শুধু আলো দিতে নয়,
প্রাণও দিতে এসেছে,
মরে যাওয়া মানুষের মনে
প্রাণের সঞ্চার করেছে,
তার রাত্রি নেই, তার মৃত্যু নেই !
সে সর্বদাই জ্বলছে—জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে !
অনির্বাণ এই সূর্যের আর এক নাম 'বিবেকানন্দ'।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৩

পরমান্ন-বিধায়িনী অন্নপূর্ণা

ব্রহ্মজ্ঞানের বনিয়াদ যে অন্ন, এটি হাড়ে-হাড়ে জেনে নিয়েই উপনিষদের ঋষি মানুষকে অনুজ্ঞা করেছেন : অন্নং বহু কুর্বীত। অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। এখানে "অন্নের" যে উচ্চতর ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, ঘরোয়া শব্দার্থটিকে অস্বীকার করার উপায় বা হেতু নেই, এ-কথা ঠাকুরের এই দুটি উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়েছে : "কলিতে অন্নগত প্রাণ", "খালি পেটে ধর্ম হয় না।"

অবতার যদি জীবের অনুকরণ কিছুটা না করেন, জীব আদৌ তাঁর অনুসরণ করতে পারে না। কলিতে অন্নগত প্রাণ শুধু জীবের নয়, অবতারেরও। তাই ঠাকুর নহবতে অন্নপূর্ণাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁর ধর্মসংস্থাপন ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছিলেন। ঠাকুরের এই সরবরাহ আধানটি যে অদৃশ্য ও অভাবনীয় ভাবে তাঁর ধর্মসংস্থাপন ও জীবোদ্ধারের কার্যের সহায়িকা ও পুষ্টিবিধায়িকা হয়েছিলেন, তা মানুষের ধর্ম-ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। শ্রীমায়ের এই মহিমাটি এখন যত প্রোজ্জ্বল হয়ে আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তাঁর দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলিতে ঠিক ততটা হয়েছিল বলে মনে হয় না। জাহাজ অনেক দূর চলে গেলে তবে পাড়ে এসে ঢেউ লাগে!

ঠাকুরের ছোটবড় বয়সের ভক্তদের মধ্যে যাঁরাই উত্তরকালে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে মহীয়ান্ বলে নমস্য হয়েছিলেন, তাঁরা সকলে যে শুধু ঠাকুরেরই জ্ঞান-প্রেম-ঘন তত্ত্বাবধানে ও কথামৃতে লালিত হয়েই মহত্ত্ব লাভ করেছিলেন তা নয়, তাঁরা সকলেই মায়ের অপরিসীম অপার্থিব স্নেহে ও পবিত্রতাস্বরূপিণীর পূতহস্তে রাঁধা অন্নেও পুষ্ট হয়েছিলেন। আহারশুদ্ধি থেকে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধি থেকে ধ্রুবা স্মৃতি ; এটি উপনিষদের শিক্ষা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অন্তরঙ্গের মধ্যে যাঁরাই আন্তরিক সাধন করতেন, তাঁদের সকলের রক্ত-স্রোতেই মায়ের রাঁধা শুদ্ধান্নের, অমৃতান্নের পীযষধারা প্রবাহিত ছিল।

শ্রীমায়ের প্রতি স্বামীজীর পাগলাটে ভক্তির এই যে উক্তি, সে ভাব-ভাষার উন্মাদনার তুলনা স্বামীজীর অন্য কোন ভাষণে ও রচনায় মিলবে না :

> "দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম।...দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময়ে সময়ে বলি, 'কো রামঃ ?' দাদা, ঐ যে বলছি, ওই খানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।"[৪৭]

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দকে এ কথাগুলি লেখেন, তদবধি শ্রীমা যে নরেনকে বিশেষ কিছু ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন, বা পরেও যে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, এমন কোন নজির রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য।

তবে মায়ের প্রতি স্বামীজীর এই যে পাতাল-ফোঁড়া, পাহাড়ের বুক-চেরা দুর্বার প্রস্রবণের মতো প্রচণ্ড বেগবতী সদা-উৎসারিতা ভক্তি, এটি কি ক'রে সম্ভূত হ'ল? মনে হয় নরেনের আধিকারিক

৪৭ স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৪, পৃঃ ২৫৭

অধ্যাত্ম-মানসের ভাবগ্রাহিতার কাছে ঠাকুরের অমূল্য কথামৃতের চেয়ে অনলস মায়ের সেবা-শুদ্ধ হাতের রান্না-করা মোটা রুটি ও বুটের ডালের আধ্যাত্মিক চৈতন্য ঊর্ধ্বচারী করার শক্তি অণুমাত্র ন্যূন ছিল না।

আর এমন নয় যে "জ্ঞানদায়িনী", "মহাবুদ্ধিমতী" মা এ-কথা জানতেন না। মায়ের এই রন্ধন-তপস্যাটির সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েছিলেন ঠাকুর নিজে ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। শ্রীমায়ের নহবতপীঠের সাধন সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গিনী যোগীন-মা বলেছেন :

"শ্রীমা ভোর চারটার আগে শৌচ ও স্নানাদি সেরে ধ্যানে বসতেন—ঠাকুর ধ্যান করতে বলতেন কিনা! এর পরে বাকি কাজ-কর্ম সেরে পূজায় বসতেন। পূজা, জপ, ধ্যান—এতে প্রায় দেড়ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর সিঁড়ির নীচে রান্না করতে বসতেন। রান্না হ'লে যেদিন সুযোগ ঘটত, সেদিন মা নিজ হাতে ঠাকুরকে স্নানের জন্য তেল মাখিয়ে দিতেন। সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে ঠাকুর আহার করতেন। তিনি স্নানে যেতেন, মা এসে তাড়াতাড়ি ঠাকুরের পান সেজে নজর রাখতেন ঠাকুর স্নান ক'রে ফিরে এলেন কিনা। তিনি তাঁর ঘরে এলেই মা এসে জল ও আসন দিয়ে তার পরে খাবারের থালা নিয়ে এসে তাঁকে আহারে বসিয়ে নানা কথার মধ্য দিয়ে চেষ্টা করতেন, যাতে খাবার সময় ভাবসমাধি উপস্থিত হয়ে আহারে বিঘ্ন না ঘটায়। একমাত্র মা-ই খাবারের সময় তাঁর ভাবসমাধি আসা অনেকটা ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন, আর কারও সে সাধ্য ছিল না। ঠাকুরের খাওয়া হ'লে মা একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিতেন। পরে পান সাজতে বসতেন। পান সাজা হয়ে গেলে গুনগুন করে গান গাইতেন; তা খুব সাবধানে, যেন কেউ না শুনতে পায়। এর পরে কলের সেই একটার বাঁশী বেজে উঠত, যাকে ঠাকুরের মা বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশী বলতেন, তাই শুনে তিনি খেতে বসতেন। সুতরাং দেড়টা দুটোর আগে কোন দিনই মায়ের খাওয়া হ'ত না। আহারের পরে নামমাত্র একটু বিশ্রাম ক'রে সিঁড়িতে চুল শুকোতে বসতেন তিনটে নাগাদ। তারপর আলো-টালো ঠিক ক'রে তোলা জলে নমো নমো করে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় কেচে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হতেন। সন্ধ্যা এলে আলো দিয়ে ঠাকুর-দেবতার সামনে ধুনো দেখিয়ে মা ধ্যানে বসতেন। এর পরে রাত্রের রান্না, সকলকে খাওয়ানো সেরে মা আহার করতেন। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে শুয়ে পড়তেন।"[৪৮]

শ্রীমায়ের এক অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীর কাছ থেকে তাঁর যে দিনপঞ্জী শোনা গেল, এতে আমরা একটা অভিনব যোগ-কৌশলের আভাস পেলাম। ঠাকুরকে যে-ইষ্টপথে সাহায্য করতে শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, তাতে তাঁর অতিকুশলী একান্ত নিঃস্বার্থ ও সদাতৎপর আত্মনিয়োগ এখানে লক্ষণীয়। ঠাকুরের সমাধি-প্রবণতা নিরুদ্ধ ক'রে, তাঁকে সুপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে আহার করিয়ে, ঐ অতিকোমলাঙ্গ ভাগবতী-তনুটি সুস্থ রাখাতেই ছিল তাঁকে—যুগাবতারের ধর্মসংস্থাপন ও জীবোদ্ধার রূপ কর্মের—ইষ্টপথে সাহায্য করা। ঠাকুরের এখন সমাধিস্থ না হওয়াতেই জীবের কল্যাণ। ঠাকুরের দেব-তনুটির এমন সদাজাগ্রত, অনলস ও প্রাণঢালা সেবার তপস্যা মা করেছিলেন বলেই দক্ষিণেশ্বরের যে আনন্দের হাটের কথা মা নিজে বলেছিলেন, তা জমতে পেরেছিল।

৪৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৮৬

খালি পেটে যে ধর্ম হয় না—এ শিক্ষা পরে ঠাকুর শিষ্যদের দিয়েছিলেন। এ সত্যটি ছিল অন্নপূর্ণা শ্রীমার একান্ত মজ্জাগত। এটি তাঁকে ঠাকুরের কাছ থেকে নূতন ক'রে শিখতে হয়নি। ঠাকুরের ধর্মসংস্থাপনের ও জীবোদ্ধারের ইষ্টপথে তিনি যেমন তাঁর বন্ধন-যোগ দ্বারা সাহায্য করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন "জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থম্" ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের।

শ্রীমায়ের নহবতপীঠে সাধনকালে ঠাকুরের তরুণ ভক্তদের অনেকে সাধন-ভজনার্থ দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপন করতেন। ভূরি-ভোজনে ধ্যানের ব্যাঘাত হয় বলে ঠাকুর তাঁদের আহারাদি-ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। এ বিষয়ে তিনি শ্রীমাকে এই অনুজ্ঞা করলেন যে রাখালকে ছয়খানা, লাটুকে পাঁচখানা, আর বুড়ো গোপাল ও বাবুরামকে চারখানার বেশী রুটি যেন দেওয়া না হয়। কাকে কতটা খাবার কখন দিতে হবে—এ বিচার-ব্যবস্থা শ্রীমা বরাবর তাঁর নিজস্ব এলাকা বলে নিশ্চয়াত্মকভাবে জানতেন। আর এ-বিষয়ে ঠাকুরের আত্যন্তিক কড়াকড়ি তাঁর মোটেই ভাল লাগত না। তাই তিনি তরুণদের ক্ষুধার অনুপাতে ঠাকুরের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশীই দিতেন। একদিন ঠাকুর বাবুরামকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলেন যে তিনি রাত্রিতে পাঁচখানা রুটি খেয়ে থাকেন, আর সেজন্য শ্রীমা-ই দায়ী। ঈষদুষ্ণ ঠাকুর যেই নহবতে গিয়ে মায়ের নিকট অনুযোগ করলেন যে তিনি বিবেকহীন স্নেহদ্বারা ছেলেদের আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ আহত করছেন, তৎক্ষণাৎ এ উক্তির প্রতিবাদ ক'রে জ্ঞান-বৈরাগ্য-সিদ্ধি-দাত্রী অন্নপূর্ণা স্বস্বরূপে অবস্থিতা হয়ে অবতারপুরুষকে স্পষ্টাক্ষরে বললেন: "দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি ক'রো না।"[৪৯]

সারদার দিব্য জীবনে ভগবানের যে মাতৃভাবের প্রকাশের কথা পরে আসবে, এখানে তার সূচনা আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারছি। সাধককে যদি সদাই ভগবানের পিতৃভাবের কর্কশ তত্ত্বাবধানে মেপে গুনে আহার ক'রে কট্টরভাবে তপস্যা করতে হ'ত, আর কখনো দু-এক টুকরো রুটি বেশী না' খাওয়া যেত, তা হ'লে হয়েছিল আর কি! তাই বলি: জয় মা! তুমি এসে দু-একটি বেশী রুটির ব্যবস্থাটি ক'রে দিলে! কথা আছে: পেটে খেলে পিঠে সয়। এখানে দুটি রুটির কথা শুধু হচ্ছে না, কথাটি গভীরতর। ভগবানের এ মাতৃভাবটি—যা সাধনা করাবার পূর্বে ছেলের পেটের ক্ষুধার কথা ভাবে, সেটি ঠাকুরের নিজস্ব ভাব হলেও মায়েতেই সে ভাবটির হ'ল স্পষ্টতর প্রকাশ। আর ঐ দিব্য ভগবদ্‌ভাবের প্রকাশটি যদি সাধকের আওতার বাইরে থেকে যেত, তবে সাধক জীবন কি 'খড়-খড়ে খড়' সদৃশই না হয়ে থাকত—হে ভগবান্!

ঠাকুরের সার্থক অনুযোগের তাড়নাতেই মায়ের এই সার্বজনীন ঈশ-মাতৃভাবটি অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তিনি আজ নিজের আপাত-অজ্ঞাতে অন্তরঙ্গ শিষ্যদের ভবিষ্যৎ দেখবার যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্বীকার করলেন, ভবিষ্যতে তাকে কার্যে পরিণত করতে তাঁকে শ্রীমাতা-গুরু-সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংহত করতে রাখতে হ'ত তাঁর মজ্জাগত অন্নপূর্ণার ভাবকেও।

নহবতপীঠে সাধন-দিনগুলি থেকে লীলাবসান পর্যন্ত শ্রীমায়ের যুগাবতারের ইষ্টপথে সাহায্য করার ধারাটি অন্নপূর্ণার ভাবাশ্রয়েই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছিল। ঠাকুরের অবতারজীবনের আন্তর সংবেদটিও শ্রীমা নিজের প্রজ্ঞাবলে অবধারণা ক'রে নিয়ে, ঠাকুরের দেহাবসানের পর

৪৯ তদেব, পৃঃ ১৪১-৪২

তার গতি নির্ণয় করতেও তিনি তাঁর অন্নপূর্ণা ভাবেরই প্রয়োগ করেছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে শ্রীমা বুদ্ধগয়ায় যখন তীর্থে গিয়েছিলেন, সে সময়ে একদিন সেখানকার মঠের বিপুল ঐশ্বর্য ও স্বীয় ত্যাগী সন্তানগণের চরম আশ্রয়হীনতা ও অন্নবস্ত্রের অবর্ণনীয় কষ্ট ও মঠ-পরিচালনায় অসীম দৈহিক ক্লেশ-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা—এই দুই বিপরীত চিত্র তাঁকে বড়ই বিচলিত করায় তাঁকে ঠাকুরের নিকট করুণভাবে প্রার্থনা করতে হয়েছিল। তিনি নিজেই সে সম্বন্ধে পরে বলেছিলেন :

"আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় আজ মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সব সংসার ত্যাগ ক'রে কয়েক দিন একটা আশ্রয় ক'রে একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হ'ল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা ক'রে, আনন্দ ক'রে চলে গেলে ; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট ক'রে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষে ক'রে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে-রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম ক'রে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসারতাপ-দগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্যই তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে।"[৫০]

অনেকের আধ্যাত্মিক অন্ন যোগাবেন মা অন্নপূর্ণা, তাই সংঘের জন্য তাঁর এই কাতর সৃজনী ক্রন্দন ও প্রার্থনা। এই সংঘশক্তির মাধ্যমে ঠাকুরের শিষ্য ও অনুগামিগণ অগণিত নরনারীকে অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স লাভে সাহায্য ক'রে আসছেন। এই সেবার বনিয়াদটি সযত্নে সেদিন শ্রীমা-ই রক্ষা করেছিলেন। যেদিন বিবেক-বৈরাগ্যবান্ ঐ মহাপুরুষগোষ্ঠীর আহারের সংস্থান ছিল না, সেদিন শ্রীমা কান্নাকাটি ক'রে এ ব্যবস্থাটি ঠাকুরের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। মায়ের কাছে কি আমাদের ঋণের শেষ আছে? যদি আটাশে ছেলে তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে বলে : মায়ের কাছে আবার ঋণ কি? ইনি কি তবে পাতানো মা নাকি? ঠিক! ঠিক! এর চেয়ে আর বড় কথা কি?

শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে বলুন বা ঠাকুরের ইচ্ছাতেই বলুন, শ্রীমা নহবতের সাধনপীঠে আবদ্ধাবস্থায় থাকাকালেই একদিকে যেমন অবতারের ইষ্টপথে সাহায্য করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নিজে সব সীমিত অবস্থা থেকে ভূমায় নির্মুক্তি লাভ ক'রে ধন্য হয়েছিলেন। সে সময় থেকেই শ্রীমায়ে আমরা যে স্বার্থলেশশূন্যতা দেখতে পাই, তা মানুষের ইতিহাসে অতি বিরল। ঠাকুর যদিও তাঁর সহধর্মী স্বামী ছিলেন এবং নহবত থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে তিনি থাকতেন, তবু কখন কখন দুমাসে হয়তো একদিনও দেখা হয়নি।

৫০. তদেব, পৃঃ ৩৫৯

কারণ কোন অন্তরঙ্গ ভক্তকেই তিনি ঠাকুরের সেবাধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন না। শ্রীমা নিজে বলেছেন: "কখনও কখনও দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ তাঁর দর্শন পাবি!'"৫১

এদিকে ঠাকুরের ঘরে নৃত্য, গীত, ভজন-কীর্তন, ভাবসমাধি দিনরাতই চলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঐ সব লীলা-বিলাস সতৃষ্ণ নয়নে দেখে দেখে শ্রীমায়ের প্রাণের আশ মিটত না। ভাবতেন: "আমি যদি ঐ ভক্তদের মতো একজন হতুম তো বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম।"৫২ কি করুণ, বিদগ্ধ এ অভিলাষ। আজকের দিনের নারী-মুক্তির ঝাঁঝালো-শাসালো তীক্ষ্ণোক্তিগুলির তুলনায়, শ্রীমায়ের এই প্রশান্তোক্তিটি কী এক মহতী কবিতা!

নহবতে বাসের আত্যন্তিক শারীরিক রুক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ঐ সব কষ্ট মায়ের গায়ে লাগত না। পরবর্তী কালে ঐ সব দিনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ ক'রে ভক্তদের শ্রীমা বলেছেন: "তবু আর কোনও কষ্ট জানি নি।...তাঁর সেবার জন্য কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত।"৫৩ "কি আনন্দেই ছিলুম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।"৫৪

সকলের দৃষ্টির অন্তরালে নহবতবাসিনী তপস্বিনী শ্রীমা অন্নপূর্ণার স্বধর্মনিষ্ঠভাবে থাকা কালেই শুধু যে ভূমা-সংস্থিতি লাভ করলেন তা নয়, তিনি উত্তীর্ণও হলেন সম্পূর্ণ স্বার্থলেশহীন সেবার পরম আদর্শে। এমন সেবা কে কবে দেখেছে?

তবে তাঁর এই একান্ত বিনম্র সেবায় একটি অতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ছিল। শ্রীমাকে যোগীন-মা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাকুরের একান্ত অনুগতা হয়েও তাঁর সব কথা শ্রীমা কেন মানেন না? একটু হেসে বললেন শ্রীমা, "তা যোগেন, মানুষ কি সব কথাই মেনে চলতে পারে?" পরে একটু ভেবে বললেন, "তা বাপু, যাই বল, কেউ মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।"৫৫

এটি শ্রীমায়ের স্বগতোক্তি নয়, স্বকীয় ঘোষণা। এ ঘোষণাটি যিনি করলেন, তিনি একদিকে ঠাকুরের একান্ত অনুগতা স্ত্রী হয়েও অন্যদিকে "সত্যি সত্যি আনন্দময়ী মা"—সর্বজননী, স্বতন্ত্রা।

এই তত্ত্ব ও তথ্যটি শ্রীমা একদিন ঠাকুরকে এমন একটি একান্ত স্বাধীন বলিষ্ঠ সর্বব্যাপী উদারতার সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে তাঁর আন্তর মহত্ত্বের এক নববিস্তার দর্শনে ঠাকুর আশ্চর্যান্বিত ও সুপ্রসন্ন হয়েছিলেন। ঠাকুরের "সত্যি সত্যি আনন্দময়ী মা" রূপে শ্রীমা ঠাকুরকে যদি কোন ব্যক্তিগত শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সেটি এ ঘটনার মাধ্যমেই উক্ত হয়েছিল:

তখন বহুভক্ত-সমাগমে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর প্রায়ই ভরা থাকত। এত লোকের ভিড়ে লজ্জাশীলা শ্রীমায়ের যাওয়া সম্ভব হ'ত না বলে, রাত্রিতে আহারের সময় হ'লে ভক্তগণ ঘর থেকে বাইরে যেতেন। শ্রীমা হাতে আহার্যের থালাটি নিয়ে ঠাকুরের ঘরে আসতেন। ঠাকুরের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পাশে বসে থাকতেন। একদিন শ্রীমা ভোজ্যের থালা হাতে ঠাকুরের ঘরের সিঁড়িতে সবে পা দিয়েছেন, এমন সময়

৫১ তদেব, পৃঃ ৮৭ ৫২ তদেব, পৃঃ ৮৭ ৫৩ তদেব, পৃঃ ৮৬
৫৪ তদেব, পৃঃ ৮৭-৮৮ ৫৫ তদেব, পৃঃ ৯৪

সহসা এক মহিলা এসে, "দিন, মা, আমায় দিন" বলে, মায়ের হাত থেকে থালাখানি নিয়ে ঠাকুরের সুমুখে রেখে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করলে মাও পাশে বসলেন। কিন্তু ঠাকুর সে-অন্ন স্পর্শ করতে পারলেন না। শ্রীমায়ের দিকে চেয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, "তুমি এ কি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? ওকে কি জান না? ও অমুকের ভাজ, দেওরকে নিয়ে থাকে। এখন ওর ছোঁয়া অন্ন আমি খাই কি ক'রে?" মা বললেন, "তা জানি; আজ খাও।" ঠাকুর কিন্তু তখনও খাবার ছুঁতে পারছিলেন না। শ্রীমায়ের মিনতির উত্তরে অবশেষে বললেন, "আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বলো।" মা করজোড়ে বললেন, "তা তো আমি পারব না, ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার 'ঠাকুর' নও—তুমি সকলের।"[৫৬]

শ্রীমায়ের এই উদার বাণীর কান্ত পূতাগ্নি স্পর্শে নিমেষে ঐ স্পর্শদুষ্ট অন্নই শুদ্ধান্ন হয়ে গেল। ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে ঐ অন্নই আহার করলেন।

কিশোরী সারদাকে ঠাকুর এককালে শিক্ষা দিয়েছিলেন: "চাঁদা-মামা যেমন সব শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাকো তো তুমিও দেখা পাবে।"[৫৭]

আজ শ্রীমা ঠাকুরের ঐ শিক্ষাটি শিক্ষাদাতাকে অন্য ভাবে-ভাষায় প্রত্যর্পণ করলেন: "...তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।" তাঁর এই বিশ্ব-উদার সর্বজনীনতায় শ্রীমা অতুলনীয়া।

[ক্রমশঃ]

৫৬ তদেব, পৃঃ ৯৫ ৫৭ তদেব, পৃঃ ৫১

আমাদের মা কি সাধারণ মা? জগতের কল্যাণের জন্য, জীবকে মুক্তি দিবার জন্য স্বয়ং জগজ্জননী লীলাদেহ ধারণ ক'রে এসেছিলেন।

—স্বামী শিবানন্দ

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

(পূর্বানুবৃত্তি)

বৈষ্ণব-দর্শনানুসারে শ্রীভগবানের 'মানসানন্দে'র মধ্যে রয়েছে সাধকহৃদয়ের দুটি প্রধান ভাব অর্থাৎ ভক্তি ও প্রীতি আস্বাদন-জনিত আনন্দ যা পূর্বেই বলা হ'ল। এই দুটি প্রধান ভাবেই সমগ্র বৈষ্ণব-মতবাদ পরিপূর্ণ। সেজন্য প্রসঙ্গান্তরে যাবার পূর্বে, আমরা এই দুটি প্রধান ভাব: ভক্তি ও প্রীতি সম্বন্ধে সামান্য মাত্র চিন্তা ক'রে দেখতে পারি।

ভক্তি ও প্রীতি

সাধারণতঃ 'ভক্তি' ও 'প্রীতি'কে দুটি বিভিন্ন ভাব বলেই গ্রহণ করা হয়। এই মতানুসারে 'ভক্তি'তে আছে ঐশ্বর্যের ভাব; এবং 'প্রীতি'তে মাধুর্যের। সেজন্য 'ভক্তি'-কালে থাকে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যেন একটি উচ্চ-নীচ-ভেদ, তজ্জনিত দুরন্ত ব্যবধান, এবং পুনরায় তজ্জনিত শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-ভীতি। কিন্তু 'প্রীতি'-কালে থাকে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে অতি নিকট প্রাণের সম্বন্ধ; এবং সেজন্য তজ্জনিত ভালবাসা, ভয় একেবারেই নয়।

কিন্তু বৈষ্ণব-মতবাদে 'ভক্তি' ও 'প্রীতি'কে প্রায় সমার্থক বলেই গ্রহণ করা হয়, এবং বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্যগণ নির্বিচারে যথা তথা এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রাণের আবেগে, তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ না ক'রে। তার কারণ হয়তো এই যে, বৈষ্ণব-মতানুসারে, ভক্তিতেও প্রীতি, এবং প্রীতিতেও ভক্তি নিহিত হয়ে থাকে অনিবার্য ভাবেই—হয়তো বিভিন্ন পরিমাণে; কিন্তু থাকেই। অবশ্য যাঁরা এরূপ পরিমাণগত প্রভেদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, তাঁরা ঠিক মেপে মেপে, প্রয়োজনানুসারে এখন 'ভক্তি', আর তখন 'প্রীতি' শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু যাঁরা তা রাখেন না, তাঁরা—এঁরাই হলেন সংখ্যাগুরু—নির্বিচারে নির্বিবাদে নির্দ্বিধায় যখন তখন 'ভক্তি' বা 'প্রীতি' শব্দটি তাঁদের কথনে এবং লেখনে বসিয়ে দিয়ে প্রচুর আনন্দলাভ করেন (ভাদ্র ১৩৮৮, পৃঃ ৩৫০)।

ভক্ত্যানন্দ

আমরা দেখলাম যে, ঐশ্বর্যানন্দ থেকে মানসানন্দ শ্রেয়ঃ, এবং সকল প্রকারের মানসানন্দের মধ্যে পুনরায় 'ভক্ত্যানন্দ'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মুমুক্ষু সাধক-ভক্তের প্রাণে ঈশ্বরকৃপায় এবং স্বীয় সাধনবলে যখন 'ভক্তি'-রূপ মানস-ভাবের উদয় হয়, তখন একদিকে ভক্ত-সাধক যেরূপ নিজে আনন্দসাগরে অবগাহন করেন, ঠিক তেমনি অন্য দিকে আনন্দাস্বাদনকামী রসিকশিরোমণি শ্রীভগবান্‌ও ভক্তহৃদয়ের সেই অমলা ভক্তি আস্বাদন ক'রে মুগ্ধ, তৃপ্ত ও আনন্দিত হন। এই তো হ'ল জগতের শ্রেষ্ঠ আনন্দ—বৈষ্ণব-মতে।

এরূপ 'ভক্ত্যানন্দে'র বিশেষ রমণীয় লক্ষণ হ'ল এই যে, এই আনন্দসাগরে ভগবান্-ভক্ত একত্রই নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এইখানেও সব নয়—আরো বেশী কিছু আছে, অনেক বেশী—তা হ'ল এই যে, ভক্তহৃদয়ে এই নির্মলা ভক্তির প্রাবল্যে স্বয়ং সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌ও ভক্তের নিকট চিরকাল বাঁধা হয়ে থাকেন; এমন কি, সেই ভক্তির দ্বারা বিজিত পরমেশ্বর সানন্দে ভক্তের দাসত্বও স্বীকার ক'রে নেন। এরূপ ভক্ত যেরূপ ভগবানের দাস বলে নিজেকে মনে ক'রে প্রভূত আনন্দিত হন, ভগবান্‌ও ঠিক সেরূপই ভক্তের দাস বলে নিজেকে মনে ক'রে

প্রভূত আনন্দিত হন। ভগবান্-ভক্তের এরূপ অঙ্গাঙ্গী উভয়পক্ষীয় সম্বন্ধই বিশেষ ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের প্রাণের কথা। এস্থলে 'উভয়-পক্ষীয়' শব্দটির অর্থ হ'ল এই যে, ভগবান্ ও ভক্তের পারস্পরিক সম্বন্ধ একেবারেই সমতুল্য। অর্থাৎ ভক্তের দিক থেকে ভগবানের সম্পর্কে যা যা ঘটছে, ভগবানের দিক থেকে ভক্তের সম্পর্কে ঠিক তা-ই তা-ই ঘটছে—বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই। যথা, ভক্তের দিক থেকে ভগবান্ যেরূপ পরম ও একমাত্র কাম্য, ভগবানের দিক থেকে ভক্তও ঠিক সেরূপই পরম ও একমাত্র কাম্য। পুনরায়, ভক্তের দিক থেকে ভগবান্ যেরূপ পরম ও একমাত্র পূজ্য; ভগবানের দিক থেকে ভক্তও ঠিক সেরূপই পরম ও একমাত্র পূজ্য। পুনরায়, ভক্তের দিক থেকে ভগবান্ যেরূপ পরম ও একমাত্র আনন্দনির্ঝর, ভগবানের দিক থেকে ভক্তও পরম ও একমাত্র আনন্দকারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিক উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই—কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে—এস্থলে ভগবান্ ও ভক্ত এরূপ অচ্ছেদ্য উভয়মুখী পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ যে —এই অনুক্রমে দুজনই দুজনের সঙ্গে সেই একই ভক্তি-প্রীতি-মৈত্রীর সম্বন্ধে চিরতরে আবদ্ধ—একের বিহনে অন্যের জীবন বৃথা; একের বিরহে অন্য আকুল-ব্যাকুল; একের লাভে অন্য চিরধন্য। নইলে বৈষ্ণবভক্ত কি সাহসভরে, গর্ব সহকারে, আনন্দসঙ্কারে বিশ্বকবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে সগৌরবে সানন্দে সদর্পে গাইতে পারতেন—

'আমার মিলন লাগি
তুমি আসচ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে॥'

(রবীন্দ্রনাথ, গীতলিপি ১।১৪; গীতলেখ্য ২।৫৫)

'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা॥'

(রবীন্দ্রনাথ, গীতলেখ্য ৩।২৪)

'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।'

(রবীন্দ্রনাথ, গীতলিপি ৪।৩৯)

'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

* * *

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।'

(রবীন্দ্রনাথ, গীতলিপি ৪।২৯)

এই কারণে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে—শ্রীভগবান্ যে সর্বশক্তিমান্ হয়েও ভক্তের নিকট পরাজিত তাঁর ভক্তির প্রতাপে; তিনি যে ভক্তের দাস; তিনি যে সর্বব্যাপী হয়েও, ভূমা মহান্ হয়েও ভক্তের অনু-পরিমাণ মনের মন্দিরে চিরকাল আবদ্ধ; এই ধরনের কথা বারংবার বলা হয়েছে—দম্ভের সঙ্গে নয়, গর্বের সঙ্গে; আত্মম্ভরিতার সঙ্গে নয়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে; শূন্যগর্ভ আবেগোচ্ছ্বাসের সঙ্গে নয়, স্থির ধীর অনুভূতির সঙ্গে।

উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি বৈষ্ণবগ্রন্থে উদ্ধৃত সুবিখ্যাত বাণীর উল্লেখ করা যেতে পারে—

'...ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥'
(প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত মাঠর-শ্রুতিবাক্য অনুচ্ছেদ ৬৫)

'শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। সেজন্য ভক্তিই ভূয়সী।'

'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥'

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৩)

'হে দ্বিজ! আমি ভক্তের পরাধীন হয়ে, এখন পরাধীনের ন্যায়ই হয়ে পড়েছি। কারণ, ভক্তজন আমার সাতিশয় প্রিয়; এবং তাঁরাই তাঁদের ভক্তির দ্বারা আমার হৃদয়কে গ্রাস ক'রে ফেলেছেন।'

'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥'

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯।৪।৬৮)

শ্রীভগবান্ দুর্বাসাকে বলছেন—

'সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। সাধুগণ আমাকে ছাড়া আর অন্য কিছুই জানেন না। আমিও সাধুগণকে ছাড়া আর অন্য কিছুই জানি না।'

'সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ॥'

(হরিভক্তিসুধোদয়ঃ, ১৪।২৯-৩০)

'আমি সদামুক্ত অথবা নিত্যমুক্ত হয়েও ভক্তের মধ্যে স্নেহরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকি। আমি অজিত, অথবা অন্যকর্তৃক কোনদিন পরাজিত না হয়েও ভক্তের দ্বারা পরাজিত হই। আমি অবশ্য, অথবা অন্যকর্তৃক কোনদিন বশীভূত না হয়েও ভক্তের দ্বারা বশীভূত হই। যিনি বন্ধুজনদের স্নেহ ত্যাগ ক'রে কেবল আমাকেই প্রীতি করেন, আমি তাঁরই; তিনিও আমারই। আমাদের উভয়ের পরস্পর ভিন্ন আর অন্য কোনই বান্ধব নেই।'

একই ভাবের কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আছে—

'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥'

(গীতা, ৯।২৯)

'আমি সর্বভূতেই সমানভাবে বিরাজিত। আমার দ্বেষ্য বা দ্বেষের পাত্র কেউই নেই; আমার প্রিয় বা প্রীতির পাত্রও কেউই নেই। তথাপি যাঁরা ভক্তিভাবে আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি; তাঁরাও আমারই মধ্যে অবস্থান করেন।'

পূর্বে বলা হয়েছে যে, ঐশ্বর্যানন্দ অপেক্ষা মানসানন্দ অথবা ভক্ত্যানন্দ ভক্তিবশ পরমেশ্বরের অধিকতর প্রিয়, যেহেতু ঐশ্বর্য-ভাবনা তাঁকে ভক্তের নিকট থেকে দূরে রাখে; কিন্তু মাধুর্য-ভাবনা তাঁকে ভক্তের সঙ্গে এক ক'রে দেয়। এই সম্বন্ধে দু-একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

'ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥'

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪।১৬)

'আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি, না হই অধীন॥'

(ঐ, ১।৪।১৭)

'আপনারে বড় মানে—আমারে সম হীন।
সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥'

(ঐ, ১।৪।২৫)

অর্থাৎ ঐশ্বর্যভাবে ভাবান্বিত ভক্ত পরমেশ্বরকে অনেক দূরে, অনেক উচ্চে সরিয়ে রাখেন, তাঁর নিজের অপেক্ষা অনেক অনেক মহত্তর বৃহত্তর উচ্চতর পূর্ণতর বলবত্তর রূপে—নিজেকে অতি দীনহীন, ক্ষুদ্রক্ষীণ, পাপতাপলীন বলে গ্রহণ ক'রে।

কিন্তু অপর পক্ষে, মাধুর্যভাবে ভাবান্বিত ভক্ত নিজেকে ঈশ্বরের অতি নিকটজন, নিজজন, প্রিয়জন রূপে গণ্য ক'রে আপনাকে তাঁরই ন্যায় মহৎ বৃহৎ উচ্চ পূর্ণ বলবান্ আনন্দরসঘনাদি রূপে প্রণিধান করেন। শ্রীভগবান্ এরূপ জনকেই—এরূপ সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, ঈশ্বরপ্রেমিক, ঈশ্বর-সুহৃৎ জনকেই বিশেষ পছন্দ করেন।

বর্তমান প্রবন্ধটি আরম্ভ করা হয়েছিল পরব্রহ্মের অনুভূতি অথবা ভক্তি-প্রীতির (Feeling অথবা

Emotion) মাধুর্যের কথা নিয়ে। আমরা দেখলাম যে, তাঁর ভক্তি-প্রীতির মাধুর্যের প্রধান কথাই হ'ল এই—ভক্তের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রেম। হয়তো হঠাৎ ভাবলে আমাদের অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হ'তে হয় যে, সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।১) 'সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম', 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' (ঈশোপনিষদ্, ৮) 'নির্মল, নিষ্কলুষ, পাপশূন্য ব্রহ্ম', 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।২।৭) 'আনন্দ ও অমৃতরূপে সর্বদা উদ্ভাসিত ব্রহ্ম', 'রসো বৈ সঃ' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৭) পরমরসস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে এই ধরণীর ধূলার, এই মর্ত্যের মাটির, এই অজ্ঞান-অবিদ্যাবৃত, এই ক্লেশক্লিষ্ট, এই বাসনা-কামনাদষ্ট, এই পাপতাপপিষ্ট জীবকে এত নিজজন, নিকটজন, প্রিয়জন রূপে গ্রহণ করতে পারেন? কিন্তু এইটিই তো হ'ল বৈষ্ণব-দর্শনের মধুরতম, মোহনতম, মঙ্গলতম, মহনীয়তম, মঞ্জুলতম মর্মোথ বাণী—ভক্ত এমন কি, স্বয়ং ভগবানের চেয়েও বড়; এবং স্বয়ং ভগবান্‌ও ভক্তের নিকট অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ—

'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখ বচনে॥'

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪।১৫১-৫২)

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩২।২২)

এস্থলে প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যাঁরা প্রকৃত—প্রকৃষ্টভাবে তাঁর ভজনা করবেন, তাঁদের এই অনুপম দানের প্রতিদান তিনি নিশ্চয়ই দেবেন—সেই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করতে পারেননি সর্বশক্তিমান্ হয়েও—কারণ গোপীগণ তাঁকে এরূপ অধিকভাবে, ব্যাপকভাবে, পবিত্রভাবে, সপ্রেমভাবে, নিষ্কামভাবে ভজনা করেছিলেন যে সেই মহাঋণের শোধ তিনি বিন্দুমাত্রও দিয়ে উঠতে পারেননি।

উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি অনুপম শ্লোক—যাতে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টতমভাবে শ্রীমুখে নিজেই বলেছেন যে, গোপীগণের ঋণ সত্যই অপরিশোধ্য—

'হে গোপীগণ! দুশ্ছেদ্য সংসার-গৃহের শৃঙ্খল ছেদন ক'রে তোমরা নির্ভয়ে নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছ। সেজন্য তোমাদের এই মিলন নিরবদ্য। এইভাবে মিলিত হয়ে তোমরা কেবল আমারই ভজন করেছ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে; আমারই প্রীতিবিধান করেছ তা দিয়ে। তোমাদের এই সাধুকর্মের জন্য, তোমরা ব্রহ্মার সমান আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হলেও তার প্রতিদান দেওয়ার সামর্থ্য আমার হবে না। তোমাদের সাধুকর্মই তোমাদের সাধুকর্মের প্রতিদান বা পুরস্কার হোক। আমি কিন্তু তোমাদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হয়েই রইলাম শাশ্বতকাল।'

কি মহান্ এই ভাব; এবং একমাত্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ঈশ্বরই এরূপ নম্র, বিনীত, উদার, প্রেমপূর্ণ।

[ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য

ডক্টর রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

১

আজকের অপরাহ্ণকালীন অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য'। বিষয়টি যদি শুধু স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' হ'ত, তাহলে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার সহজ একমুখী একটি পথ বেছে নেওয়া যেত। কিন্তু উপরি-উক্ত শীর্ষনামে আলোচকের স্কন্ধে দুটি দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করা হয়েছে। (১) স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য অবধারণা; (২) তাঁর পত্রাবলীর পর্যালোচনা, তথা পত্রাবলীর ভাবধারার অনুভাবনা।

প্রথমে আমরা পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। এ-কাজটি বস্তুতঃ খুবই দুষ্কর। কারণ প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বামী বিবেকানন্দের অন্যান্য রচনার মতো পত্রাবলীও সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রবর্তনায় লেখা হয়নি। সাহিত্য-রচনার দুর্লভ প্রতিভা যে তাঁর ছিল, এ-বিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। কিন্তু তাঁর কর্ম ও সাধনায় যেমন, রচনায়ও তেমনি একটি গভীরসঞ্চারী জীবনবোধ বা মহৎ আদর্শচেতনার রূপায়ণ-প্রয়াস প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীর মঙ্গলচিন্তায় তাঁর ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের দুর্মর আকাঙ্ক্ষাকে পর্যন্ত সংবৃত রাখতে হয়েছে। যা কিছু বলেছেন, করেছেন এবং লিখেছেন, সে-সব কিছুরই অন্তরালে এই একটিমাত্র প্রেরণা জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল। ক্ষণস্থায়ী কর্মজীবনে দীর্ঘস্থায়ী জীবন-মহীরুহের বীজ বপন করতে হয়েছে। দুদণ্ড নীরবে নিভৃতে বসে সচেতন শিল্পশ্রীমণ্ডিত সাহিত্য-নির্মিতির অবকাশ তিনি পাননি। অবকাশ পেলেও যে, এই কাজে অনেকখানি সময় নিয়োজিত করতেন কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এ এক অসামান্য আত্মসংহরণের দৃষ্টান্তস্থল। এ ব্যাপারে তাঁর তুলনা মেলে একমাত্র অগ্রজ মনস্বী অদ্ভুতকর্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলি পড়লে সহজেই বোঝা যায়, কী অপূর্বনির্মাণক্ষমা সাহিত্যপ্রতিভা তাঁর ছিল! কিন্তু এই প্রতিভাকে সংহরণ ক'রে তিনি লেখনী চালিয়েছেন দেশবাসীর কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই এই হৃদয়বত্তার স্পর্শে তাঁর সমস্ত রকম রচনা সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। আজ সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি রীতিসিদ্ধ এবং শিল্পগুণভূষিত বাংলা গদ্যসাহিত্যের নির্মাতা বলে স্থানলাভ করেছেন।

স্বামীজীর বেলাতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। সাহিত্যরচনার সচেতন তাগিদে কিছু না লিখেও আজ তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের আসনটি দৃঢ় ক'রে নিয়েছেন। এবং তা সম্ভব হয়েছে সুতীব্র উপলব্ধি এবং হৃদয়বত্তার গুণে।

স্বামীজীর পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য নির্ধারণের চাবিকাঠিও কিন্তু এইখানেই। যে পত্র ছিল ব্যক্তিগত, তাতে ব্যক্তিত্বের বিদ্যুদালোক তো উদ্ভাসিত হয়েছেই; কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ ক'রেও তা ব্যক্তিসীমা লঙ্ঘন করেছে ঐ সর্বব্যাপী হৃদয়ের গ্লানিহর স্পর্শে, ঐ বিশ্বতোমুখী কল্যাণ-স্পৃহার আদিগন্ত বিস্তারে।

এত কথা বলার পরও আমাদের ইতিহাস-সন্ধানী মন কিন্তু ঐতিহ্য-অন্বেষণ ছাড়তে চায় না। তাই দেখি বাংলা পত্রের প্রাচীনতম নিদর্শনটির সঙ্গে বাংলা ভাষার নাড়ীর যোগ আছে। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ আহোমরাজ

চুকামৃফা স্বর্গদেবকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। বাংলা ভাষায় সম্ভবত এটিই পত্ররচনার প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু বিস্ময় জাগে ঐ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত বাংলা গদ্যভাষার এ-রকম শক্ত বাঁধুনি দেখে। 'তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিতে হইবেক।' এ-রকম অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষার সৃষ্টি তো একদিনে হয় না। তাই আমাদের অনুমান, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পর্তুগীজ, ইংরেজ মিশনারীদের এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যচর্চার বহু আগে থেকেই চিঠিপত্রের অন্তঃস্রোতে বাংলা একটি গদ্যধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। আমাদের এই ভেবে গৌরববোধ হচ্ছে যে, বাংলাগদ্যভাষার অন্তঃস্পন্দন না হলেও বাহ্যরূপের একটা কাঠামো বিদেশী প্রভাব ব্যতিরেকেই চিঠিপত্রকে অবলম্বন ক'রে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এই কাঠামোতেই প্রাণসঞ্চার করেছেন উনিশ শতকের বিচিত্র গদ্য লেখকগণ। পত্রসাহিত্যের বিবর্তনও এই ধারাপথেই এগিয়েছে। স্বামীজীর পত্ররচনায় অনেক সময় যে সহজ দেশজ রীতি লক্ষ্য করা যায়, তাতে দীর্ঘকালাগত দেশীয় সংস্কার যে প্রবলভাবে কাজ করেছে, অন্ততঃ সাহিত্যের ইতিহাস পরিক্রমাকালে এ-কথাটি আমাদের ভুলে যাওয়া সমীচীন নয়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক জুড়ে যাঁদের পত্র বক্তব্য ও ভাষায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন, কবি মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামীজী স্বয়ং এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজা রামমোহন, মধুসূদন প্রমুখ মনস্বী ও কবিগণের চিঠি প্রায় সবই ইংরেজীতে লেখা হলেও বাঙালীর ইংরেজী চর্চার দ্বারা বাংলাভাষার চর্চা যে গতিলাভ করেছিল, তার প্রমাণ বহন করে। উপরি-উক্ত পত্রলেখকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীই পত্রাবলীতে প্রকাশিত মনোভঙ্গির দিক থেকে স্বামীজীর সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ পত্রই এখনো অপ্রকাশিত আছে। নরেন্দ্রপুর কলেজের অধ্যাপক ডক্টর প্রফুল্লকুমার দাস ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিবনাথ শাস্ত্রীর বহু অপ্রকাশিত চিঠি সংগ্রহ করেছেন। ব্যক্তিগত সংগ্রহের সেই খাতাটি আমাদের দেখার সুযোগ দিয়েছেন। সেই পত্রসংগ্রহ পড়েই আমাদের এই কথাটি মনে হয়েছে।

পত্ররচনার ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তেমনি পত্ররচনার ধারাও সেই গুরুত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই দিক থেকে স্বামীজীর পত্রাবলী শুধু কতকগুলি চিঠির সংকলন নয়, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত সাহিত্য-বিবেকের তীব্র গতিবিভঙ্গের সঙ্গে দৃঢ় সম্বন্ধে বিন্যস্ত। এই পত্রসমূহের যেমন স্বতন্ত্র সাহিত্যমূল্য আছে, তেমনি রয়েছে সমাজ ও সাহিত্যভাবনার ক্রম-অভিব্যক্তির সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-ভাবনার মূলে যে উপলব্ধিটি পরিণতিলাভ করতে চেয়েছে, তা হ'ল ব্যক্তিগত সাধনা সামূহিক কল্যাণযজ্ঞের সঙ্গে সম্পৃক্ত; নরের মধ্যে নয়চন্দ্রমার অধিষ্ঠান—এ-বোধ যেমন ব্যক্তির চেতনায় বিশ্বাসের স্বর্ণসৌধ নির্মাণ করে, তেমনি সামাজিক কর্মে ধর্মকে জীব এবং জীবশ্রেষ্ঠ মানবসেবার বলিষ্ঠ উদ্বোধক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে। এই উপলব্ধির কর্মময়, বাঙ্ময় এবং চিন্ময় শিল্পাবয়ব গড়ে উঠেছে শতাব্দীর শেষ পর্বে বেদান্তবোধে

নিস্নাত, সাহিত্যযশে অনীহ সন্ন্যাসী-সাহিত্য-স্রষ্টার বৈরাগ্যদীপ্ত রচনাবলীতে, প্রেম-প্রোজ্জ্বল পত্র-সম্ভারে।

একটু আগেই স্বামীজীর পত্রে প্রকাশিত মনোভঙ্গির সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্রাবলীর ভাব-সাযুজ্যের উল্লেখ করেছি। শিবনাথ স্বামীজীর বিদেশযাত্রার প্রায় পাঁচ বছর আগে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ইংলণ্ড যাত্রা করেন। দেশে ফিরে আসেন ঐ বৎসরই ডিসেম্বরে। বিদেশে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন—এই সব ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সহযাত্রী এক চীনা দম্পতির অযাচিত সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে তিনি কন্যা হেমলতা দেবীকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে, 'মৃজাপুর' স্টীমার থেকে লেখেন—"দেখেছ, জগদীশ্বরের করুণা! দেখিয়া শুনিয়া আমি একটি গান বাঁধিয়াছি, সেটা সর্বদা গুন্ গুন্ করিয়া গান করি ও কাঁদি।"

এই ভগবদ্-উপলব্ধির চাবিকাঠি হাতে নিয়েই স্বামীজীও বিদেশ-বিভুঁইয়ে চরম প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সিংহবিক্রমে বিচরণ করেছেন। আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণে অবিচল নির্ভরতা তাঁকে দিয়েছে সক্রিয়তা, চিত্তে দিয়েছে বীর্য, আর দিয়েছে নিজ জীবনের গভীরতর উদ্দেশ্য বা মিশন (mission) সম্বন্ধে অনির্বাণ একাগ্রতা। এই আত্মিক উপলব্ধিতে পরিশুদ্ধ চেতনায় যখনই চিঠি লিখেছেন তখন চিঠি শুধু চিঠি থাকেনি, হয়ে উঠেছে সাহিত্য; মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বাণীর মতো তাতে যেমন তেজ, তেমনি আন্তরিকতার স্পর্শ। এজন্য ভাষা নিয়ে তাঁকে আলাদা ভাবতে হয়নি, তাঁর পত্রের ভাষা অন্তরের ভাষা। বাংলা গদ্যভাষা যে তাঁর পত্রাবলীর দ্বারা বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেছে—এ-সত্য আজ আর বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। সহজ চলতি ভাষায়, কখনো সাধুভাষার মিশাল দিয়ে, কখনো ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে যে বলবান্ গদ্য তিনি রচনা করেছেন, তাতে কৃত্রিমতার কোন পালিশ নেই, সচেতন ভাষাবিন্যাসের কষ্টকল্পনা নেই। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে একটি কথা আছে—ভাবের সঙ্গে ভাষার যে সম্পর্ক, তা হচ্ছে অপৃথগ্-যত্ন-নির্বর্ত্য, কিংবা হরগৌরীর মতোই বাগর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। ভাব যেখানে ঐকান্তিক, অভীপ্সা যেখানে আত্মার গভীরতা থেকে উদ্ভূত, সেখানে প্রকাশের ভাষা আপনি এসে যায়। কসরতের অপেক্ষা রাখে না। স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে গুরুভ্রাতাদের কাছে লেখা চিঠিগুলিই সবচেয়ে অকৃত্রিম, সর্বাপেক্ষা সাহিত্যগুণসম্পন্ন। কারণ এ-সব চিঠিতে আপনতম নিকটজনের কাছে হৃদয়ের উন্মোচন ঘটেছে। স্বামীজীর ব্যক্তিমানসের সর্বাধিক অনাবৃত প্রকাশ গুরুভ্রাতাদের কাছে লেখা পত্রাবলীতে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ইউরোপীয় সাহিত্যে ব্যক্তিগত রচনার জনক ফরাসী লেখক মঁতেইর কথা। ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'Essais'-এর ভূমিকায় মঁতেই নিজে লিখেছিলেন—'ওহে পাঠকবর্গ, তাকিয়ে দেখ, আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু।' নিজেই নিজের গ্রন্থের বিষয়বস্তু হন ব্যক্তিগত রচনার বা Personal Essay-এর লেখকগণ। যেমন 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মূল বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। পত্রসাহিত্য একদিক থেকে আরো নিবিড় অভিধায় ব্যক্তিগত রচনা। সেই ব্যক্তিগত রচনার অনায়াস অথচ গতিশীল ভাষাসৌকর্যে স্বামীজীর পত্রাবলী চিরায়ত সাহিত্য হিসেবে বাংলার সুধীজনের মনে দিনে দিনে আসন ক'রে নিচ্ছে। শুধু উপদেশের বা নির্দেশের আকর হিসেবে নয়, উন্নত সাহিত্যকর্মের নিদর্শন হিসেবে পত্রাবলীর মর্যাদাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে।

এখন 'পত্রাবলী'র ভাষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এর সাহিত্যিক উৎকর্ষের অবধারণা করতে

চেষ্টা ক'রব।

(ক) ৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জানুআরি এলাহাবাদ থেকে গুরুভ্রাতা বলরাম বসুকে লিখছেন—

"ইতিপূর্বে আপনাকে এক পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না bearing দেখিয়া the devil take it করিয়াছেন? আমি বলি change (বায়ুপরিবর্তন) করিতে হয় তো শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে, ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy (ঈশ্বর করুণা করুন) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান্ তাহারই সহায় হন)। আপনি খালি টাকা বাঁচাতে চান, Lord (ভগবান্) কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (বায়ুপরিবর্তন) করাইবেন?"

(খ) এই বৎসরই (১৮৯০, ৩রা মার্চ) গাজীপুর থেকে কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখেছেন—

"বাবাজীর (পওহারী বাবা) তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড় হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ! খালি গ্রহণ!… এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ-জগতে আর নাই।…

"তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, 'ভগবান্ রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন—নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।"

(গ) শিষ্য হরিপদ মিত্রের স্ত্রী শিষ্যা ইন্দুমতী মিত্রকে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মে, বোম্বাই থেকে আমেরিকা যাত্রার সপ্তাহখানেক আগে লিখছেন—

"মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না।…আমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকামাত্র। সর্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনোবাক্যেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে।"

(ঘ) ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে মে চিকাগো থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ইংরেজীতে যে চিঠি লেখেন, তার বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ—

"বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যকতা নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়—তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহান্ বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কার্য কর।…জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই

উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না।"

(ঙ) ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অগস্ট প্যারিস থেকে নিবেদিতাকে ইংরেজীতে যে চিঠি লেখেন তার কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ 'পত্রাবলী' থেকে উদ্ধৃত করছি—

"আমাদের যা কিছু উদ্যম, সবই হচ্ছে সাময়িকভাবে সেই চরম পরিণতি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা! অহো, মহান্ সর্বদুঃখহর মৃত্যু! তুমি না থাকলে জগতের কী অবস্থাই না হ'ত!

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বর্তমানে প্রতীয়মান এই জগৎ সত্য নয়, নিত্যও নয়।...

"স্বপ্ন অহো! কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল! স্বপ্ন—স্বপ্নের ইন্দ্রজালই এ জীবনের হেতু, আবার ওর মধ্যেই এ জীবনের প্রতিবিধানও নিহিত রয়েছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্ন ভাঙো।"

আর উক্তি বাড়াবো না। ভাষার তিনটি গুণ রচনাকে সাহিত্যশ্রী দান করে। প্রসাদগুণ বা সরলতা, ওজোগুণ বা তেজস্বিতা এবং মাধুর্যগুণ বা মনোহারিত্ব। এই তিনটি গুণই উদ্ধৃত পত্রাংশগুলিতে বর্তমান। তার সঙ্গে মিশেছে সহজ সুন্দর কৌতুকপ্রবণতা (বলরাম বসুকে লেখা পত্রে যেমন দেখা যায়), স্নেহসিক্ত মমতা (শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত পত্রে যেমন দেখি), শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণতা (প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা পত্রে যার প্রমাণ পাই), মঙ্গলকর্মে বৈরাগ্যচেতনা (আলাসিঙ্গার কাছে লেখা চিঠিতে যার নিদর্শন আছে), আর জীবনের পথপরিক্রমা-শেষে স্বপ্নময় মৃত্যুর উপত্যকায় চিরবিশ্রান্তি লাভ করার জন্য নিরাসক্ত-মনে অপেক্ষা করার মতো পরিণত জীবন-বোধ (নিবেদিতাকে লেখা পত্রে যার কাব্যময় প্রকাশ দেখি)।

* * *

২

স্বামীজীর পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য অবধারণা করার খণ্ডিত প্রয়াস এতক্ষণ পর্যন্ত করা গেল। এখানে আর একটি কথা স্মরণ ক'রে প্রসঙ্গান্তরে প্রয়াণ ক'রব। স্বামীজীর পত্রাবলী হচ্ছে তাঁর সমগ্র রচনাবলী'র প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তাঁর 'বাণী ও রচনা' সংগ্রহে ৫৫২টি পত্র সংকলিত হয়েছে। 'পত্রাবলী'র দুইখণ্ডে ৫১৮টি পত্র সংকলিত আছে। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, এমনকি ফরাসী ভাষাতেও তাঁর পত্র আছে। (দ্রঃ পত্রসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ, উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২)।

স্বামীজীর মৌলিক রচনাবলীতেও তাই পত্রাবলীই সিংহভাগ দখল ক'রে আছে। সুধীজনেরা পত্রাবলীর ভাবসম্পদ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। এর ভাষা ও সাহিত্যমূল্য নিয়ে ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য'গ্রন্থে নাতিদীর্ঘ আলোকপাত করেছেন। বিবেকানন্দের পত্রাবলীতেই যে তাঁর ভ্রমণসাহিত্য রচনার সূত্রপাত এ-সম্বন্ধেও একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন (দ্রঃ উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)। আমেরিকা যাত্রাপথে ও আমেরিকা পৌঁছে আলাসিঙ্গা ও তাঁর বন্ধুগণকে উদ্দেশ ক'রে ১০ই জুলাই, ১৮৯৩ এবং ২০শে অগস্ট, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে যে দুটি ইংরেজী চিঠি লেখেন, তাতেই তাঁর ভ্রমণকথার সূত্রপাত।

এমনিভাবে দ্বিতীয়বার বিদেশভ্রমণকালে পত্রাকারে 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্যে 'বিলাত-যাত্রীর পত্র' লিখেছিলেন। এটিই পরবর্তী কালে 'পরিব্রাজক' নামে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের এক অতুলনীয় নিদর্শনরূপে সমাদৃত হয়েছে।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে আমাদের মনে হয়, পত্রাবলীর সাহিত্যগুণ সম্বন্ধে আরো ব্যাপক বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। শুধু তাই

নয়, বিবেকানন্দ-জীবন ও মানস-বিকাশের অন্তরঙ্গ আলেখ্য হিসেবেও পত্রাবলী অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। শুধু পত্রাবলীকে অবলম্বন ক'রে ১৮৮৮ থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রয়াণের পূর্বাবধি কালসীমায় বিধৃত স্বামীজীর একটি জীবনচরিত রচিত হ'তে পারে। নাম হ'তে পারে 'পরিব্রাজক বিবেকানন্দ', কিংবা 'ভারতপথিক বিবেকানন্দ', অথবা 'শ্রীরামকৃষ্ণোত্তর বিশ্वবিবেক বিবেকানন্দ'। যে নামই দেওয়া যাক না কেন, এ-কথাটি আমাদের অবশ্য স্বীকার্য যে, 'পত্রাবলী' এক অর্থে বিবেকানন্দ-জীবনীরই প্রামাণিকতম আকরগ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' অথবা অন্যান্য পত্রসমূহকে যে গুরুত্বসহকারে সাহিত্যবোদ্ধাগণ বিচার করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী অনুরূপ মনোযোগ এবং গুরুত্বসহকারে এখনো পর্যন্ত বিশ্লেষিত হয়নি।

এবার পত্রাবলীকে ভাবের দিক থেকে দেখার চেষ্টা ক'রব। সুগভীর অধ্যাত্মচেতনা, ভারতপ্রেম, মানবপ্রেম, বিশ্বাত্মবোধ, নিষ্কাম কর্মৈষণা, শিক্ষাদর্শ প্রভৃতি আপাত বৈচিত্র্যময় ভাব পত্রাবলীর পাতা খুঁজলেই পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত হবে। এ সমস্ত ভাবের অল্প-বিস্তর আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধকার এ-ধরনের বিষয় অনুসারে পত্রাবলীকে দেখতে যাচ্ছে না। আমাদের মনে হয়েছে—বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে বিভিন্ন ভাব নয়, একটি ভাবই তাঁর সমস্ত সত্তার অঙ্গীভূত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে পরম পরিণতি লাভ করেছে। সেটি আর কিছুই নয়, তাঁর সুগভীর আত্মোপলব্ধিসঞ্জাত বৈদান্তিক অধ্যাত্মভাবনা। উপনিষদের এই মন্ত্রবাক্য যেন তাঁর জীবনে এবং আচারে শরীরী সত্য হয়ে উঠেছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥
(ঈশোপনিষদ্, ১)

সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎসংসার যেখানে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ঐশ্বর্যমোহ ভ্রান্তিমাত্র। এ-কথা তো কতবার আমরা শুনেছি। কিন্তু পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে স্বামীজী এ-সত্য মর্মে মর্মে বুঝেছেন। এই সত্যেরই বাস্তবায়ন অভীপ্সায় তাঁর সমস্ত কর্মযোগ-পরিকল্পনা, মৃতকল্প ভারতের পুনরুত্থান-প্রয়াস এবং ঐশ্বর্যমগ্ন ঈশ্বরবিস্মৃত পাশ্চাত্যের আন্তর উদ্‌বোধনের সংগ্রাম। সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে সংস্থিত রয়েছে উপরি-উক্ত বৈদান্তিক বিশ্বাত্মচেতনা। এই চেতনার প্রসার ও বাস্তবায়নই বিবেকানন্দের জীবনোদ্দেশ্য, তাঁর সংকল্প বা মিশন (mission), তাঁর জীবনব্রত। এই ব্রতপালনের পথে বাধা বিস্তর। ব্যক্তিগত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর নির্দয়তায় সাময়িক চিত্তক্ষোভ, উদ্দেশ্যসম্পর্কে মুহূর্তজীবী সংশয়—এই-সব প্রতিবন্ধক পার হয়ে তাঁকে জীবনের পরিণতি-লগ্নে উপস্থিত হ'তে হয়েছে। এই দ্বন্দ্বমথিত অথচ ঈশ্বরমন্দ্রিত জীবনভাবনারই ক্রমবিকাশ আমরা পত্রাবলী অনুসরণে বিমুগ্ধ চিত্তে অনুধাবন করি। সন্ন্যাসী, ত্যাগী সাধক বৈরাগ্যের অনুলেপনে প্রেমের পতাকা হাতে নিয়ে ভারত ও বিশ্বপরিক্রমায় বার হয়েছেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর এ প্রব্রজ্যা যুগান্তসঙ্কিত ধর্মভাবনার পরিমণ্ডলে অভিনব, বৈপ্লবিক। তিনি সংসার-বিরাগী, কিন্তু সংসারবাসী মানবসাধারণের অনুরাগী। তাই তিনি অনুরক্ত বৈরাগী। এই অনুভবের ক্রমবিকাশের ধারাটি পত্রাবলীতে চারটি স্তর বা পর্বে বিন্যস্ত করা যায় :

(১) শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের বছর দুই পর থেকে চিকাগো মহাসম্মেলনে জয়টীকালাভের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই অগস্ট থেকে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ধর্মমহাসম্মেলনের সূচনা পর্যন্ত।

(২) চিকাগো মহাসভায় যোগদানের পর থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত; অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুআরি পর্যন্ত।

(৩) দেশে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রা পর্যন্ত; অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুআরি থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুন পর্যন্ত।

(৪) দ্বিতীয়বার স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন থেকে মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের জুন পর্যন্ত।

স্বামীজীর 'পত্রাবলী'র প্রথম চিঠিটির তারিখ ১২ই অগস্ট, ১৮৮৮; অন্তিম চিঠিটির তারিখ ১৪ই জুন, ১৯০২। অর্থাৎ মহাপ্রয়াণের ২০ দিন আগে পর্যন্ত তাঁর লিপিলিখন ছিল অব্যাহত। এই কালসীমায় যাঁদের কাছে চিঠি লিখেছেন, তাঁদের মোট তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়: (১) শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান তথা গুরুভ্রাতৃবৃন্দ; (২) স্বামীজীর নিজ শিষ্য-শিষ্যাবৃন্দ; (৩) স্বদেশ-বিদেশে তাঁর অনুরাগিবৃন্দ। (দ্রঃ উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)। পত্রাবলীর সাহিত্যগুণ আলোচনাপ্রসঙ্গেই বলেছি—চিঠির প্রাপক অনুসারে চিঠির ভাষা এবং মনোভঙ্গির একটু হেরফের হয়েছে। গুরুভ্রাতাদের কাছে যেমন ঘটেছে অবাধ আত্মউন্মোচন, তেমনি শিষ্যদের কাছে মঙ্গলবোধ বা কর্মপ্রণালী রূপায়ণের বজ্রগর্ভ উদ্দীপনা, শিষ্যমণ্ডলীবহির্ভূত অন্যান্য প্রাপকদের চিঠিতে হয়তো নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা আছে, কিন্তু একটু যেন দূরত্বের ব্যবধান আছে। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে বেশির ভাগ চিঠির প্রাপক হচ্ছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামী সারদানন্দকে মাত্র একটি চিঠি লিখেছিলেন, তাও ইংরেজীতে। স্বামী অখণ্ডানন্দকে কয়েকটি চিঠি লিখেছেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দকে লিখেছেন, বলরাম বসুকে লিখেছেন ছটি। বিদেশ থেকে যদিও বিশেষ নামে গুরুভ্রাতাদের চিঠি পাঠাতেন, ফলতঃ সেগুলি সব গুরুভাইকে উদ্দেশ করেই লেখা। শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল ও মার্গারেট নোব্‌ল্ অর্থাৎ নিবেদিতাকে লেখা বেশ কয়েকটি পত্র আছে। এ-ছাড়া মাদ্রাজী শিষ্য 'কিডি' অর্থাৎ সিঙ্গারভেলু মুদালিয়ারকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি আছে। হরিপদ মিত্র, ইন্দুমতী মিত্র, মৃণালিনী বসু, খেতড়িরাজ অজিত সিংহ প্রভৃতি গৃহী শিষ্যগণও তাঁর পত্রের প্রাপক।

দেশ-বিদেশের অনুরাগিবৃন্দের মধ্যে তাঁর চিঠির প্রাপক অনেকেই। এদেশীয়গণের মধ্যে হরিদাস বিহারীদাস দেশাই, প্রমদাদাস মিত্র, লালা গোবিন্দ সহায়, ডক্টর নাঞ্জুণ্ড রাও, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাও বাহাদুর নরসিংহাচারিয়ার, স্যার এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, ভারতী-সম্পাদিকা সরলাদেবী প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

বিদেশীয়গণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মিসেস ওলি বুল, হেল-ভগিনীবৃন্দ, ই. টি. স্টার্ডি, জন হেনরি রাইট, জোসেফাইন ম্যাকলাউড, মিসেস লেগেট, ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলি প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রাপক-প্রাপিকাদের কাছে স্বামীজী ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু বা অনুরাগী শুভানুধ্যায়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই আত্মপ্রকাশের যে স্তর-পরম্পরা ক্ষণপূর্বে নির্দেশ করেছি, তাকে একটু অনুসরণ না করলে পত্রধারার গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা যাবে না।

প্রথম স্তরের পত্রগুলি ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা। এই সময়ে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের

মহানির্বাণ ঘটে গিয়েছে। তাঁর ত্যাগী এবং গৃহী শিষ্যদের মধ্যমণি নরেন্দ্রনাথ এখন যেন কিছুটা অনিশ্চিত, লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছুটা শিথিলপ্রযত্ন। এখন তিনি অখ্যাত এক সন্ন্যাসী মাত্র। কিছু কিছু পরিচিত এবং অন্তরঙ্গ জনের আনুগত্য বা অনুরাগ লাভ করেছেন মাত্র। কী তাঁর কর্তব্য, কী তাঁর উদ্দেশ্য—এ-সম্বন্ধে এখনো তিনি কৃতনিশ্চয় হননি। এই সময়ই তাঁর পরিব্রাজক জীবনের শুরু। আর ভারতের উত্তর-দক্ষিণ সর্বপ্রান্ত পরিভ্রমণ ক'রে দরিদ্রের পর্ণকুটীর থেকে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত স্পর্শ করেছেন। রাজা-মহারাজা, উচ্চ বা মধ্যম শ্রেণীর রাজকর্মচারী, পণ্ডিত, অধ্যাপক, সাধু-সন্ন্যাসী—সব রকম মানুষের সাহচর্য পেয়েছেন। আর পেয়েছেন ভারতীয় জনজীবনের অপরিসীম গ্লানি ও দুঃখময় অবস্থার প্রত্যক্ষ পরিচয়। ভারত যেন ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগাতে হবে। কিন্তু সে কি তাঁর দায়িত্ব? এরই উত্তর পেয়ে গেলেন কন্যাকুমারিকায় ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডটির ওপর বসে ধ্যানস্থ অবস্থায়। স্থির হয়ে গেল বিদেশ যাবার সংকল্প। এ যে জীবনদেবতার নির্দেশ। গোড়ার দিকে প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে এই প্রাথমিক দোলাচল চিত্তের পরিচয় পাই। একটি চিঠি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ গাজীপুর থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেন—"কি করি, আমি বড়ই দুর্বল, বড়ই মায়াসমাচ্ছন্ন—আশীর্বাদ করুন, যেন কঠিন হইতে পারি। আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল; কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিদেশযাত্রার মাসাধিক পূর্বে ডি. আর. বালাজী রাওকে লিখছেন—"...হে প্রেমময় পিতঃ! তুমি যে একান্ত আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিতেছ, হৃদয়ের জ্বালা তো তাহা করিতে দিতেছে না।"

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে বোম্বাই থেকে 'পেনিনসুলার' জাহাজে স্বামীজী আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে জাপানের ইয়োকোহামা থেকে ১০ই জুলাই (১৮৯৩) আলাসিঙ্গা ও অন্যান্য মাদ্রাজী যুবকগণের উদ্দেশে লেখেন—"...এসো, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।" [বঙ্গানুবাদের অংশ]

আমেরিকা পৌঁছে দেখলেন ধর্মমহাসম্মেলনের তখনও অনেক বিলম্ব। আশ্রয়হীন নিরালম্ব সন্ন্যাসী। মাদ্রাজী যুবকেরা যে অর্থসংগ্রহ ক'রে দিয়েছিল, তা দ্রুত খরচ হয়ে যাচ্ছে। ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অগস্ট ম্যাসাচুসেট্স্ থেকে আবার আলাসিঙ্গাকে ইংরেজীতে যে চিঠি লিখেছিলেন তার কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ:

"এখানে আসিবার পূর্বে যে-সব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছিল, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ

পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না; কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।" এই অগ্নিময় বিশ্বাস এবং সহানুভূতির দীপবর্তিকা সম্বল ক'রে চিকাগো মহাসম্মেলনে যে-দিন তিনি বিশ্ববিজয় করলেন, তার পর থেকে তাঁর জীবনের গতিপথ এবং ভাবনার সীমারেখা স্থির হয়ে গেল। এবার তিনি অধিকতর আত্মবলে বলীয়ান্, সংশয়ের দোলাচলবৃত্তি অপসৃত। এবার থেকে শুধু অগ্রগমনের পালা।

কিন্তু এই আত্মবল এবং বিশ্বজয় কুসুমাস্তীর্ণ পথে অর্জিত হয়নি। তাঁর অনেক চিঠিতেই এর বিবরণ রয়েছে। শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক তাঁর গ্রন্থে এই কণ্টকাকীর্ণ সংগ্রামের মর্মস্পর্শী আলেখ্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম ক'রে বিবেকানন্দের রাজমহিমা এবার থেকে সূর্যাংশুর মতো ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

এর পরের দুটি পর্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। দেশে ফিরে সম্বর্ধনা ও দ্রুতসঞ্চরণশীল দিনযাত্রার মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের বহুবিধ কল্যাণকর্মে নিজেকে, শিষ্যবর্গ ও দেশবাসীকে নিয়োজিত করার দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু শরীর তো কথা শোনে না, আত্মবিস্মৃত সন্ন্যাসী তাঁর গুরুর মতোই নিজ শরীরের কথা না ভেবে ঝঞ্ঝার গতিতে ব্রত উদ্‌যাপনে নিরত হয়েছেন। যখন অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে একটা কর্মচক্র এবং ভাবস্রোত সক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছেন, এবার এর ধাক্কায় বহুকাল জাতীয় জীবনে একটি গতি বজায় থাকবে, তখনই কর্মমুখর সন্ন্যাসী চিরবিশ্রান্তির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়েছেন। এবার শুধু ভেতরে দৃষ্টি, ঘরে ফেরার জন্য প্রতীক্ষা।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীর মন্দিরে অপূর্ব দৈববাণী শোনার পর তাঁর কর্মময় জীবনের যেন এক অচিন্ত্যপূর্ব অথচ অতিপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটে গেল। এখন থেকে 'আর তিনি কর্মী, উপদেষ্ট' বা জননায়ক নহেন। এখন তিনি শুধু সন্ন্যাসী—মার নিকট ছোট ছেলেটি।'

স্বাস্থ্যের কারণে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভূখণ্ডে যাত্রা করলেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন। কিন্তু মনে তখন বিদায়বেলার বিষাদ-রাগিণী বেজে চলেছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শ্রীমতী জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর বিখ্যাত পত্রটিতে বিভাসিত অস্তগামী সূর্যের গৈরিক প্রসন্নতা পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। এ-চিঠির ভাষা অন্তরের ভাষা, ইংরেজীতে লেখা চিঠির মনোরম বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ 'পত্রাবলী' থেকে উদ্ধৃত করি—

"যতই যা হোক, জো আমি এখন সেই পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত।... আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ কচ্ছে না।

"আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী;

এত যে দুঃখে ভুগেছি, তাতেও খুশী; জীবনে কখনো কখনো বড় বড় ভুল যে করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্যে সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না, অথবা এমন বন্ধন আমি কারও কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছি না।···শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!···যাই! মা যাই!—তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই!"

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর হঠাৎ স্বামীজী বিদেশ-পর্যটন সমাপ্ত ক'রে বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। এ-পর্বের প্রায় সব চিঠিগুলির মধ্যেই কেমন একটা বিদায়ের সুর, আর পরিণত চেতনার গভীরতম দার্শনিক নির্লিপ্তি। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন বেলুড় মঠ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন—"আজন্ম আমার ভালবাসার পরিচয় পেয়ে কি আজ তোমাদের অবিশ্বাস হ'ল? অবশ্য আমার মেজাজ চিরকালই খারাপ, তায় আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে বড্ডই ভয়ঙ্কর হয়—কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে, সে-ভালবাসা যাবার নয়।"

এই ভালবাসার বন্ধনকেও পেছনে ফেলে যেতে হয়। চিরবিদায়ের কুড়ি দিন পূর্বে (১৪ই জুন ১৯০২) বেলুড় মঠ থেকে শ্রীমতী ওলি বুলকে লিখেছেন—"ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—ইহাই আমার চিরপ্রার্থনা।"

৪ঠা জুলাই ১৯০২ সমস্ত জাগতিক বন্ধন ছিন্ন ক'রে পরমা মুক্তির নিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে তাঁর যাত্রা মহাপরিণামের পথে অগ্রসর হ'ল। 'পত্রাবলী' এই মহাপরিণামপথের পর্বে পর্বে পথিকের অভিযাত্রার অন্তরঙ্গ ইতিকথা।*

* ১৮ই মে ১৯৮১, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।—সঃ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে স্বামীজী বলেছেন: "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।"[১] স্বামীজীর জীবন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—তাঁর মূল 'ভাব' বা 'জীবন-বেদ' বা বৈশিষ্ট্য ছিল 'সমন্বয়'। তিনি ছিলেন এই সমন্বয়ের মিলন-মন্ত্রের সদাজাগ্রত ঋষি।

'সমন্বয়' কথাটির ভেতর অন্তর্নিহিত বক্তব্য হ'ল দুই বা ততোধিক বিপরীত ভাবের সুসংহত মিলন। স্বামীজীর জীবনে এই মিলন-মন্ত্র কেন এমন ব্যাপক হয়েছিল—সেটি জানার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। অর্থাৎ তাঁর সমন্বয়-ধর্মিতার উৎস-সন্ধানের প্রয়োজন আছে।

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৫০

ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে দীর্ঘধারা বেয়ে স্বামীজী এসেছিলেন, সে অমৃতধারার মূল স্বরূপ হ'ল 'সমন্বয়'। ভারতবর্ষ মিলন-মন্ত্রে দীক্ষিত। যুগপরম্পরা ধরে মিলনের এই সাধনা ভারত-ইতিহাসের এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবধর্ম। ইউরোপের ইতিহাস কিন্তু এর বিপরীত। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস (যা কিনা ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি) অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্রের বা 'Polis'এর সমষ্টি। মধ্যযুগীয় খ্রীস্টীয় জগৎ (Christiandom) ভেঙে হয়েছে আজকের 'ইউরোপ'—বাস্তবে খণ্ড খণ্ড জাতির বিরূপতার কাহিনী নিয়ে ইউরোপের ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের এই সমন্বয়ের সাধনা তার সংস্কৃতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত। ভারতের সংস্কৃতি বহুমানবের বহুসাধনার ধারায় গড়ে উঠেছে। প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের মিলন-সূত্রের ধারাবহনের মনীষা এই ভারতেই সম্ভব ও স্বাভাবিক। স্বামীজী জন্মসূত্রেই ভারতাত্মার উত্তরসাধকরূপে এই মহান্ মন্ত্রকে পেয়েছিলেন এবং বাস্তবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ভারত-ইতিহাসের সমন্বয়-ধর্মিতা থেকেই যে স্বামীজীর 'সমন্বয়-ভাবে'র উদ্ভব, শুধু এইটুকু উল্লেখই যথেষ্ট নয়। স্বামীজী যাঁকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন—যাঁর পদপ্রান্তে বসে তিনি দিব্য ও সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, সেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন ও বাণী সব বিভিন্ন ও বিপরীত তত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর প্রকাশ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে একান্তভাবে পাওয়া এই সমন্বয়ের মন্ত্র তাঁকে সারাজীবন উদ্বুদ্ধ করেছিল—এই বহুর মধ্যে এক এবং বিপরীতের মধ্যে ঐক্য তাঁর ১৮৯৩ সালের বিখ্যাত চিকাগো-ভাষণে অনুরণিত হয়ে বিশ্ব-বাসীকে চমৎকৃত এবং জীবন্ত এক মিলন-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই অমৃতময় বিশ্ব-বাণীকে উদ্ধৃত না করলে এই রচনা প্রাসঙ্গিকতা হারাবে এবং সার্থক হবে না। তিনি বলেছিলেন: "…holiness, purity and charity are not the exclusive possessions of any Church in the world and that every system has produced men and women of the most exalted character.…upon the banner of every religion will soon be written in spite of resistance: 'Help and not Fight', 'Assimilation and not Destruction', 'Harmony and Peace and not Dissension.'"[২] উপরি-উক্ত স্বামীজীর এই Harmony ও 'মিলন-মন্ত্র' থেকে তাঁর জীবনের সমন্বয়-ধর্মিতার তৃতীয় সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, আর সেই উৎসটি হ'ল তাঁর অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ফল্গুধারা, যা কিনা তাঁর একান্ত আপনার প্রাণের বস্তু। তাঁর জীবনবোধে ও জীবন-দৃষ্টিতে সমন্বয়-ধর্মিতা যে কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, তা জানা যায় তাঁর উত্তরকালে এক কর্মময় জীবনের ভেতর থেকে তাপস-জীবনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর আশ্রয়ে বসে-থাকা শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত অমৃতময় সমন্বয়-বাণীর স্মৃতিচারণে। তাঁর একটি বিখ্যাত পত্রে (১৮. ৪. ১৯০০) মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন: "যতই যা হোক জো', আমি এখন সেই পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালকটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতির উপরে কিছুকালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী

২ The Complete works of Swami Vivekananda, Vol. I, 13th ed , p. 24

শুনতে পাচ্ছি—সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর! যা আমার প্রাণের ভেতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলছে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে।"

স্বামীজীর কথাতেই আবার ফিরে আসি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে 'ভাবে'র কথা তিনি বলেছিলেন, সেই অনুসারে তাঁর পবিত্র জীবন-বিশ্লেষণে 'সমন্বয়-ভাব'কে তাঁর জীবনের মূল ভাবরূপে গ্রহণ করা হয়তো তর্কের বিষয়বস্তু হবে না। তাঁর সমগ্র জীবন ও চিন্তা এই 'সমন্বয়-ভাবে'রই বহিঃপ্রকাশ।

'সংস্কৃতি'র আভিধানিক অর্থ হ'ল 'অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পজ্ঞান ইত্যাদির উৎকর্ষ' বা 'সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ'। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, জীবন-বাদ ও জীবন-দৃষ্টি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল। পাশ্চাত্যের এই জীবন-বাদের অপর নাম 'জড়বাদ' (materialism)। আচার্য যদুনাথ বলেছেন: পলাশীর যুদ্ধপ্রাঙ্গণে (১৭৫৭) জয়ের মাধ্যমে পশ্চিমের চিন্তাভাবনা প্রবেশের পথ পেয়ে গেল, এক নতুন যুগের প্রারম্ভিক স্তরের সূত্রপাত হ'ল।[৩]

স্বামীজীর যৌবন-কালে এই পাশ্চাত্য ভাবধারা বাংলাদেশের পরিমণ্ডলকে চরমভাবে প্রভাবিত ক'রল। একদিকে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী (Christian), ব্রাহ্ম-সমাজ ও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র পাশ্চাত্য প্রভাব-জনিত সংস্কার আন্দোলন এবং অপরদিকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু-সমাজ সংরক্ষণশীলদের নেতি-বাচক আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা বাংলাদেশে এক বিপরীতের সংঘর্ষক্ষেত্র রচনা করেছিল। স্বামীজীর জীবনের যৌবন-কাল (প্রথম কুড়ি বছর) এই বিপরীতের সংঘাত ও সংঘর্ষের ঘূর্ণাবর্তে লালিত হয়েছিল। স্বামীজী তাঁর 'বর্তমান ভারত' পুস্তকে এই অবস্থার একটি যথাযথ চিত্র, ঐতিহাসিকের দৃঢ় ও সাবলীলতায় তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন: "একদিকে নব্য ভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য-সম্পন্ন হইব; অপর দিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?"[৪] স্বামীজী সমগ্র জীবন এই 'গর্দভ'কে 'সিংহে' রূপান্তরিত করার কৃত্রিম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তেজোদীপ্ত প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস-পাঠে, যার পরিমাপ ও পরিশীলন বিস্ময়কর, তিনি জার্মান দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) মতো 'বাদ', 'বিরুদ্ধ-বাদ' ও 'সমন্বয়'-আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি 'বর্তমান ভারতে' প্রশ্ন তুলেছেন: "তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে। যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'।"[৫] এই 'শেখা'র মাধ্যমেই স্বামীজী সমন্বয়ের আদর্শকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' তিনি বলছেন: "আর এক কথা, বোঝ দাদা, অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার

৩ History of Bengal 1200-1757—Sir Jadunath Sarkar, Janaki Prakashan, (1977), pp. 497-499 দ্রষ্টব্য

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৪৭ ৫ তদেব, পৃঃ ২৪৭

নেই, সে মরতে বসেছে ; যে জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে এই মাত্র। আর আসলটা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।"[৬] সারাজীবন তিনি এই 'আসল'টাকে 'বাঁচিয়ে' নিজেদের 'ঢঙে' অপরের কাছ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই 'আসল' বলতে তিনি প্রত্যেক জাতির 'জাতিধর্ম'কে বা 'স্বধর্ম'কে নির্দেশ করেছেন এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকে এই 'জাতীয়' উদ্দেশ্যকে রক্ষা ক'রে অতিরিক্ত সকল রীতি-নীতিগুলিকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সামঞ্জস্য সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৭]

স্বামীজীর 'সমন্বয়ে'র উৎস, সে-সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান ও ধারণা, স্বামীজীর যৌবন-কালের পটভূমির ব্যাখ্যার পর তাঁর নির্দেশিত সমন্বয়ের ক্ষেত্রগুলির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন জাতির এক একটি 'ভাব' বা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার ক'রে স্বামীজী দেখলেন, যা তিনি তাঁর 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন : "ভারতে রজোগুণের একান্ত অভাব ; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের।"[৮] রজোগুণের যে প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মোদ্যম, তার অভাব সম্বন্ধে খেদ ক'রে স্বামীজী বলছেন : "যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই, চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা...।"[৯] স্বামীজী ভারতবাসীকে ইউরোপীয় এই রজোগুণ গ্রহণ করতে বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি সেই রজোগুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণের মিলনসাধনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন : "ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"[১০] এই রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের 'সম্মিলনের ও মিশ্রণের' মধ্যে তাঁর সমন্বয়ের আদর্শ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকে তিনি ইউরোপীয় 'ধর্ম' ও ভারতীয় 'মোক্ষে'র আদর্শের ভেতর সমন্বয়-সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন : "আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেচ্ছার' প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মের'।"[১১] 'ধর্ম'কে তিনি বলেছেন 'ক্রিয়ামূলক' বা 'কার্যমূলক', যা মানুষকে 'দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে'। আর মোক্ষ : 'যা শেখায় যে ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।' কেবল মোক্ষের চর্চা বাস্তবে সম্ভব হয় না। জীবনকে বাস্তবমুখী করতে চেয়েছিলেন তিনি। বলছেন : "যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই ; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না ; আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে।"[১২] তিনি মোক্ষের আদর্শকে পরিত্যাগ করতে বলেননি। বলছেন : "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক।"[১৩]

৬ তদেব, পৃঃ ১৬২　　৭ তদেব, পৃঃ ১৫৭-৫৮ দ্রষ্টব্য　　৮ তদেব, পৃঃ ৩৩
৯ তদেব, পৃঃ ৩২　　১০ তদেব, পৃঃ ৩৩　　১১ তদেব, পৃঃ ১৫২
১২ তদেব, পৃঃ ১৫৩　　১৩ তদেব, পৃঃ ১৫৩-৫৪

যা 'ক্রিয়ামূলক' বা 'কার্যমূলক' তা থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি আসবেই। কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতিতে শঙ্কিত হ'তে তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি বলছেন: "কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল-মন্দ-মিশ্র কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না; তবু তারা গরুই থাকে আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।"[১৪] ধর্ম ও মোক্ষের এই সামঞ্জস্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি চমৎকার নিদর্শন।

ধর্ম ও মোক্ষের সামঞ্জস্য-বিধানের সঙ্গে জড়িত আছে পাশ্চাত্য 'জড়বাদ' ও ভারতীয় 'অধ্যাত্ম-বাদে'র প্রশ্ন। Encyclopaedia of the social sciences নামক গ্রন্থের নবম খণ্ডে 'জড়বাদে'র সংখ্যায় বলা হয়েছে: "...materialism as a philosophy arose out of an attempt to substitute for religious cosmogonies an account of the world drawn from principles and materials familiar to man in everyday activity." ডেমোক্রিটাস (Democritus) এই জড়বাদের দার্শনিক রূপ দিতে গিয়ে বললেন: "অনুপরমাণুর অবস্থান ব্যতিরেকে বিশ্বে আর কিছুরই অবস্থান নেই।" অ্যারিস্টটলের মতে 'ব্যক্তিত্ব' বা 'মানব' জড়ের (matter) প্রকাশ মাত্র। দার্শনিক দিদেরো (Didero) আরো একটু এগিয়ে বললেন: মানুষের 'মন' (mind) জড়ের (matter) প্রক্রিয়া (function)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ স্বামীজীর জীবনকালে এই 'জড়বাদ' তত্ত্ব ইউরোপীয় চিন্তাভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত ক'রে কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদের (Dialectic Materialism) সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজী ইউরোপীয় বস্তু-নির্ভর এই জড়বাদের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মভিত্তিক অধ্যাত্মবাদের এক সুন্দর সমন্বয়-সাধন করেছিলেন। জড়বাদ থেকে উদ্ভূত মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের গুরুত্বকে একান্তভাবে স্বীকার ক'রে তিনি বলেছেন: "যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।"[১৫] স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন: "আধ্যাত্মিকতাই ছিল স্বামীজীর প্রথম ও শেষ কথা।"[১৬] এই আধ্যাত্মিকতাকে তিনি বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেননি। এই বাস্তবভিত্তিক অধ্যাত্ম-বাদকে 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে—তাই দেখি তাঁর জীবনের অন্যতম এই শ্রেষ্ঠ অবদানটি সমন্বয়-সাধনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইউরোপীয় এই 'জড়বাদ' ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের কাছেও যে ক্রমশঃ প্রত্যাখ্যাত হ'তে চলেছে, সিডনি হুক (Sidney Hook)-এর এই মন্তব্য থেকে, তা অনুধাবন করা যেতে পারে: "In recognizing that it can do justice to only one aspect of experience, that the human mind enters constitutively into the formulation of fundamental concepts, that its method is approximative and applicable only to series of phenomena and not to individuals, science, so it is said, has

১৪ তদেব, পৃঃ ১৫৫
১৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২১
১৬ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ৪৮

lost its materialistic sting."[১৭] স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতে এই জড়বাদ পূর্বেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণে 'কর্মে পরিণত বেদান্তে' রূপ নিয়েছিল।

জড় ও চেতন (matter and spirit)-এর ক্ষেত্রেও সেই একই সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী স্বামীজীর সমন্বয়-ধর্মিতার এক বৈশিষ্ট্য। জড় ও প্রকৃতির শক্তির উৎসরূপে তিনি বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের অস্তিত্ববোধ করেছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালীন এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন: "The materialist is right! There is but one. Only he calls that one Matter and I call it God!"[১৮] জড়ের মধ্যেও ব্রহ্মের প্রকাশ—উপনিষদের এই বাণী তাঁর সমন্বয়ের ভূমিকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রোমাঁ রোলাঁ স্বামীজীর বাণীকে 'সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম' (Universal Science-Religion) নামে অভিহিত করেছেন। স্বামীজী যে-সকল দুঃখী মানুষের বেদনা ও দৈন্য দূর করার উদ্দেশ্যে জড় ও চৈতন্য, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ, ধর্ম ও মোক্ষ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের মেল-বন্ধনের কথা বা বাস্তবমুখী অধ্যাত্মবাদের কথা বলেছিলেন, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ মনীষী রোমাঁ রোলাঁ সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম (Universal Science-Religion)-এর উল্লেখ করেছেন।

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়-প্রচেষ্টার আর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শিক্ষাকে তিনি মানুষের অন্তরের 'পূর্ণতার প্রকাশ' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৯] তিনি বলেছেন: এই পূর্ণতার প্রকাশ সেইখানেই সম্ভব যেখানে বিদ্যার মাধ্যমে 'ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ' করা হবে এবং যেখানে মানুষকে 'চরিত্রবান্, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা'য় প্রতিষ্ঠা করবে।[২০] অর্থাৎ ইউরোপীয় বিজ্ঞানভিত্তিক 'জীবনসংগ্রামে সমর্থ'কর শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় 'ধর্মভিত্তিক' চরিত্রগঠনের সমন্বয়-সাধনা ছিল স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার মূলকথা।

স্বামীজীর সমন্বয়ের আদর্শ সে-যুগের পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছিল। এ-বিষয়ে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করবে সন্দেহ নেই। ডক্টর মজুমদার বলছেন: "...রাজনীতি-ক্ষেত্রেও যখন একদিকে ধর্ম ও অন্যদিকে রাজনীতিক ঐক্যের উপর জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস চলিতেছিল, তখন স্বামী বিবেকানন্দ এই দুয়ের মধ্যেও সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।...ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলগত অধ্যাত্মবাদের উপরই তিনি জাতিগঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন।"[২১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রকাশিত 'History of Bengal' গ্রন্থে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন: "Vivekananda's ...preaching...gave a new turn to Indian nationalism and placed it on the solid basis of spirituality and

১৭ Encyclopaedia of social sciences, Vol. IX, p. 220

১৮ The master as I saw him—Sister Nivedita, 7th ed., p. 18

১৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪০০ দ্রষ্টব্য

২০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য

২১ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ৫৩

religion."[২২] স্বামীজী কোন একটি ধর্মের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় ঐক্যের চিন্তা করেননি—সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত ও মূলগত অধ্যাত্মবাদের উপর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর উক্তিটি আজকের ভারতের পক্ষেও অপরিহার্য। তিনি বলছেন: "A Nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune."[২৩] ইউরোপের ক্ষেত্রেও এই 'same spiritual tune'-এর প্রয়োজন অত্যধিক। এই ঐক্যবদ্ধ আধ্যাত্মিক মিলন-সূত্রটি না থাকায় ইউরোপ আজও খণ্ড খণ্ড জাতির উপনিবেশ মাত্র।

শুধু জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রেও স্বামীজী এক অপূর্ব সমন্বয়ের আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কার্ল মার্কসের শ্রেণীসংঘাত-মাধ্যমে বিবর্তনের তত্ত্ব তখন ইউরোপের মুষ্টিমেয় সমাজবাদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই সময় স্বামীজী শ্রেণীসংঘাতের স্থলে 'শ্রেণী-সমন্বয়ের' আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শ্রেণীকে শূদ্রে' রূপান্তরিত না ক'রে নিম্নশ্রেণীকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। নতুন ভারত যে ক্ষেত-খামার, কারখানার মানুষ নিয়ে গড়ে উঠবে সে-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। 'পরিব্রাজকে' তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন: "...নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা-ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।...এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা।...এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন।"[২৪] শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংঘাত অনিবার্য। আর সেই সংঘাতে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর দ্বারা বিনষ্ট হবে, এও স্বাভাবিক। স্বামীজী সেখানে গুণভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন—যেখানে ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন ও জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের চরিত্র ও সংস্কৃতি, বৈশ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযথ বণ্টনের কৌশল ও প্রবৃত্তি এবং শূদ্রের সাম্য ও একত্বের আদর্শের সমন্বয় সাধিত হবে।[২৫] পাশ্চাত্য শ্রেণীসংঘাতের তত্ত্ব থেকে গুণগত শ্রেণী-সমন্বয়ের আদর্শের কথা তিনি বলেছিলেন।

সাম্যের ক্ষেত্রেও তিনি ইউরোপীয় সংঘাত-আদর্শকে সমন্বয়ে উন্নীত করেছিলেন। মার্কসীয় চিন্তায় সাম্যবোধ শ্রেণীগত, জাতিগত নয়। অর্থাৎ এক দেশের শ্রমজীবীরা অপর দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ করে, নিজ দেশে অপর শ্রেণীর সঙ্গে নয়। স্বামীজী সাম্য বলতে "সমান অবস্থার কথা নয়, সমান অধিকারের কথাই বলিয়াছেন।"[২৬]

স্বামীজীর জীবনের শেষপ্রান্ত ইউরোপীয় উগ্র-জাতীয়তাবাদের উন্মেষের দ্বারা চিহ্নিত। তিনি বিভিন্ন জাতির অনিবার্য সংঘাতের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই বিধ্বংসী সংঘাতের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করতে তিনি বিশ্ব-মৈত্রীর সমন্বয়-বাণী উচ্চারণ করে-ছিলেন। জাতীয়তার ক্ষেত্রেও ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করতে

২২ Dr. R. C. Majumdar's essay on 'The National Movement', History of Bengal, (Calcutta University), p. 214

২৩ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ৫৩

২৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৮২

২৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩৪৯-৫০

২৬ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ৫৫

পেরেছিলেন এবং সেখানেও তিনি জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয়-সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৭]

স্বামীজীর সাংস্কৃতিক সমন্বয়-ধর্মিতা তাঁর জীবনে কত বড় স্থান গ্রহণ করেছিল মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "তাঁহার এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধশক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সে-সংগ্রামে তাঁহার সাহস, এমন কি তাঁহার জীবনও নিঃশেষিত হইয়াছিল।"[২৮]

স্বামীজীর সমকালীন ভারতীয় মনীষীরা তাঁর সমন্বয়-ধর্মিতার মূল্য যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। স্বামীজীর তিরোধানের স্বল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজ' নামক প্রবন্ধে লিখছেন: 'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[২৯]

স্বামীজীর সমন্বয়-ধর্মিতার মূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁর—দুই মনীষীর একই মূল্যায়ন আমাদের অভিভূত করে সন্দেহ নেই। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র এই সাংস্কৃতিক-সমন্বয়ের প্রচেষ্টা আধুনিক কালের ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যে কত মূল্যবান্, ভারততত্ত্ববিদ্ সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যাসাম (A. L. Basham)-এর একটি প্রবন্ধের স্বল্প উদ্ধৃতি থেকে তা সহজেই প্রমাণিত হ'তে পারে। তিনি বলছেন: "In the world history I believe that the great Swami Vivekananda will always have an important place in that he, more than any other teacher in India of his time, taught his fellow Indians how to assimilate the old and the new.··· It was Vivekananda, more than any other teacher of his generation, who taught India self-respect, inspired his fellows to accept their own traditional values, their own traditional way of life, but to mould them and alter them as seemed necessary, pruning away the dead wood, and developing the new, here and there grafting on ideas borrowed from west and from other sources, but still keeping the parent tree alive and flourishing."[৩০]

পরিশেষে, একটি প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক। স্বামীজীর এই সমন্বয়-ধর্মিতার প্রচেষ্টা কোন স্থায়ী সুফলপ্রদায়ী হ'তে পেরেছিল কিনা। জড়বাদী সমাজেও শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে আদর্শ স্বামীজী প্রচার করেছিলেন, দৈহিক ও মানসিক

২৭ তদেব, পৃঃ ৫৬

২৮ বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক: ঋষি দাস, পৃঃ ৪

২৯ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৫

৩০ 'Swami Vivekananda—A Moulder of the Modern World'—A. L. Basham, Swami Vivekananda in East and West, pp. 212-213

দৈন্য দূরীকরণের যে-ব্রতের কথা তিনি বলেছিলেন, তাঁরই সৃষ্ট রামকৃষ্ণ মিশন আজ দেশে দেশে দিকে দিকে সে আদর্শ ও ব্রতের বাস্তবরূপদানে এক অসাধারণ সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজীর 'কর্মে পরিণত বেদান্তে'র বাস্তবমূর্তি। সেই সঙ্গে এ-কথাও স্মর্তব্য যে, ভারতে আজ নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জীবসেবার যে মহৎ উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে—তাও অনেক ক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলস্বরূপ। সম্ভাব্য বিশ্ব-যুদ্ধের আতঙ্কের মধ্যেও বিশ্ব-প্রতিবন্ধী বৎসর উদ্‌যাপনের মহৎ প্রচেষ্টা পাশ্চাত্যের রজোগুণ ও প্রাচ্যের সত্ত্বগুণের মিলন-সাধনের ফলশ্রুতি নয় কি? আধুনিক কালের রাজনীতিবিদ্, যেমন ওয়েনডেল্ উইল্‌কি ('One World') বা ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী ('One World and India') ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ 'এক-বিশ্বের' যে-স্বপ্ন দেখছেন, তা স্বামীজীর স্বপ্নের প্রতিফলন নয় কি? সংশয়াতীত-ভাবে একটি কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে—উত্তর-কালের ঐতিহাসিকেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-লব্ধ এক-বিশ্ব-সংস্কৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজীকে এই বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।*

* ১৬ই মে ১৯৮১, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে প্রবন্ধ।—সঃ

সমালোচনা

সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : পুঁথিপত্র, ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। (১৯৭৮), পৃষ্ঠা ২০৮+৩, মূল্য ; চৌদ্দ টাকা।

'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদা নৈসর্গিক জগতের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের প্রতিতুলনা করেছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর যে-কোন ভাষার যে-কোন সাহিত্যে দেখা যায় যে, শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিশ্বের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টাগণের হৃদয়মনের দিকে ধাবিত হয়, যেমন প্রাকৃতিক কোন একটি শক্তিতরঙ্গ অন্য শক্তির দিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও অমোঘভাবে প্রবাহিত হয়ে থাকে। দুই শক্তির সম্মিলনে অনেক সময় তৃতীয় একটি যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইরকম কোন-এক সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষ ভিন্ন কোন সাহিত্য-রচনাকে সমৃদ্ধ ও বেগবান্ করে। শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে তার নিদর্শন বিরল নয়।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের পশ্চাৎপট হ'ল বস্তুত সমগ্র বিশ্বসাহিত্য। বাংলা-ভাষায় লেখা এই সমালোচনাগ্রন্থ একটি সত্যিকারের অভাব দূর করেছে, কেননা যে-কোন সতর্ক পাঠক দেখতে পাবেন যে, লেখকের সাহিত্য-বিশ্লেষণ কত দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এবং দেশ-কাল-পাত্রের কি বিস্তৃত আকাশমণ্ডল ও বলয় তা ধারণ করেছে। এই গ্রন্থের লেখক সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইতালীয়, ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিরিখে বাংলা সাহিত্যের এমন বৈজ্ঞানিক ও তুলনামূলক বিচার করেছেন যে, সর্বকালের বিশ্বজনীন একটি সাহিত্য-আদর্শ ও উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। এখানে পাঠক যেমন শিল্পকর্ম হিসাবে শকুন্তলা ও ডেস্‌ডেমোনার ঐক্য ও বিরোধাভাস উপলব্ধি করতে পারবেন, সেইরকম গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আদর্শের অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্য আবিষ্কার ক'রে আনন্দিত হবেন। লেখকের সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতার পরিধি, বলতে গেলে, বিপুল ; ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ঈর্ষণীয় ; সর্বোপরি

সৌন্দর্যানুভূতি ও নান্দনিক মূল্যবোধে সাধারণতঃ তিনি অভ্রান্ত।

আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হবো তাঁর প্রথম পরিচ্ছেদ 'সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' পাঠ ক'রে যেখানে দুই বিপরীত ধারার কাব্যাদর্শ তিনি সুস্পষ্ট করেছেন। তারপর যখন গ্রন্থের আরও ভিতরে প্রবেশ করি, তখন বিভিন্ন দেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিশ্বের মহৎ কবি ও সাহিত্যিকদের, যেমন—কালিদাস, দান্তে, শেক্‌সপিয়র, মিল্‌টন, গ্যেটে, ওয়ার্ডসোয়র্থ, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের স্থান ও অবদান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'তে পারি। একই সঙ্গে, সমসময়ের প্রধান কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় শেলী, ডিকেন্স, মালার্মে, র‍্যাঁবো, ভালেরি, ডি. এচ. লরেন্স ও শরৎচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টির দিকে আমাদের পূর্ণ অভিনিবেশ দাবী করেছেন। বর্তমান আলোচক লেখকের সংবেদনশীল মন, রসবোধ ও রুচির পরিচয় বিশেষভাবে পেয়েছে ওআলটার ডে লা মেয়ারের পূর্ণাঙ্গ আলোচনায়, চার্লস ল্যামের জীবনবৃত্তান্ত-সমন্বিত সাহিত্য-প্রচেষ্টার নিপুণ আলেখ্যে, আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের অভিনব দৃষ্টান্তস্বরূপ অস্ট্রেলীয় লেখক প্যাট্রিক হোয়াইটের উপস্থাপনায়, এবং ইতালীয় কবিবৃন্দ পেত্রার্কা, মন্তালে, কোয়াসিমোদো ও উন্‌গারেত্তির ব্যক্তিত্বময় উচ্চারণের সবিস্তার উল্লেখে।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'নীড় ও আকাশ' বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে একটি মূল্যবান্ সংযোজন। সাহিত্যবিচারে ভারসাম্য রক্ষা এবং সাহিত্যাদর্শের বিপরীত মনোভঙ্গীর মধ্যে সমন্বয়-সাধন যে আদৌ সম্ভব, তা এই অধ্যায় না পড়লে বিশ্বাস করা কঠিন। সমগ্র গ্রন্থের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই শেষ রচনায় নতুন মাত্রা ও তাৎপর্য পেয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিবিধ ভাষার বিচিত্র শিল্প-সাহিত্য-কর্মের আলোচনায় অবগাহন ক'রে পাঠক অবশেষে শিল্পোৎকর্ষ ও সাহিত্যসৃষ্টির একটি চরম অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারেন। আবার 'জীবনশিল্পী বলেন্দ্রনাথ' এবং 'সাহিত্য-শিল্পী বলেন্দ্রনাথ' অধ্যায় দুটিতে বিস্তারিত গবেষণার জন্য মহার্ঘ উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

গ্রন্থের সকল অংশ একটি সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত। ফলে, এই আলোচকের মতে অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থটি একাধারে অনুরাগী সাহিত্যপাঠকের আনন্দদান, গবেষকের সূত্রসন্ধান এবং তরুণ লেখকের দিক্-নির্দেশ করতে সাহায্য করবে। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ, তাঁর রচনাশৈলী মূলত সাহিত্যধর্মী এবং সে-কারণে নিজস্ব। সবচেয়ে বড় কথা, এই গ্রন্থপাঠের ফলে সহৃদয় ও কল্পনাপ্রবণ পাঠকের মনে বিশ্বসাহিত্যের উৎকর্ষ সঞ্চারিত হয় এবং তিনি সামগ্রিকভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান,
অর্থনীতি বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে :

(১) পশ্চিমবঙ্গ—ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ (১৯৮১): গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ হইতে ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা অঞ্চলের সাগরদ্বীপ ও সুন্দরবন এলাকায় ১৯টি গ্রামে চিকিৎসা-সাহায্য চলিতেছে। পশমী কম্বল, ধুতি, শাড়ী, শিশুদের পোশাক এবং পুরানো বস্ত্রাদি ক্ষতিগ্রস্ত নরনারীদের মধ্যে এবং বিস্কুট, বার্লি প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী শিশু ও রোগীদের মধ্যে বিতরিত।

(২) রাজস্থান (১৯৮১'র বন্যা): রাজ-

স্থানের ১৯৮১'র বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জয়পুর জেলান্তর্গত চাক্‌সু এবং লালসৎ তহশীলের ২২টি গ্রামের ১,১১৭টি পরিবারের ১,৫০০ দুর্গতদের মধ্যে পশমী কম্বল বিতরিত।

(৩) উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আরামবাগ এবং মালদায় পুনর্বাসনকার্য যথারীতি অব্যাহত আছে।

(৪) মোরভি (১৯৭৯'র বন্যা): মোরভিতে গৃহনির্মাণকার্য সমাপ্ত।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

(১) গত ১২ই ডিসেম্বর ১৯৮১, হায়দ্রাবাদ, রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক 'বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।

(২) গত ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮১, সারগাছি আশ্রমের পরিচালনায় 'বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫০ জনের অধিক ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবক এই সম্মেলনে যোগদান করে।

(৩) গত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮১, 'বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস্ হোম'-পরিচালিত 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনে' ৪৫০ জন যুবক যোগদান করে, তাহাদের বয়ঃসীমা ১৫ হইতে ৩০ বৎসর।

উৎসব

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৯তম আবির্ভাবতিথি ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮১, যথারীতি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে রান্না-করা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজের পৌরোহিত্যে বক্তৃতা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী প্রভানন্দ।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের ১২৯তম আবির্ভাবতিথি ১৭ই ডিসেম্বর, যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তসেবা, ধর্মসভা ও সঙ্গীতাদি হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্ত নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ।

ফরিদপুর (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজনগানের মাধ্যমে পালিত হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় মহিলাগণের উদ্যোগে শ্রীমতী কিরণবালা বসুর পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভার শেষে ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি-উৎসব: শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৯তম আবির্ভাবতিথি গত ২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৮১), বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতির সময় হইতেই বহু ভক্ত নরনারী উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মঙ্গলারতির পর নাটমন্দিরে ভজনগান শুরু হয় এবং চলে সকাল ৯॥ পর্যন্ত। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হয়। প্রায় ৮০০০ ভক্ত নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ পান।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়ীর সারদানন্দ হলে সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। সকাল ৭টা হইতে ৭॥ শ্রীনীরেন্দু চৌধুরীর ভজন, তারপর প্রায় দুইঘণ্টা শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও সহশিল্পিবৃন্দের লীলাগীতি, অতঃপর আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন। তাঁহার আলোচনার পর কালীকীর্তন করেন 'সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন

সম্মিলনী'র শিল্পিবৃন্দ। সন্ধ্যায় লীলাগীতি পরিবেশন করেন 'সুরপীঠে'র শ্রীঅরুণ ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ।

২০শে ডিসেম্বর, স্বামী নিরাময়ানন্দ বিস্তারিত-ভাবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ২৭শে ডিসেম্বর, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ বিশ্ব-ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করেন।

খ্রীস্টোৎসব: ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৮১), সারদানন্দ হলে ভগবান্ যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের পূর্বসন্ধ্যা পালিত হয়। তাঁহার সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে বাইবেল পাঠ করেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ। বাইবেল পাঠের পর তিনি ভগবান্ যীশুখ্রীস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেন।

৬ই ডিসেম্বর স্বামী প্রেমানন্দজী ও ২১শে ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দজীর আবির্ভাবতিথি পালিত হয়।

সন্ধ্যারতির পর (৬৷৷ টায়) সারদানন্দ হলে স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই মাসে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ:

শঙ্করচরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য, পুনর্মুদ্রণ (১৩৮৮), পৃ: ৭০, মূল্য: ৩.০০ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, পুনর্মুদ্রণ (১৩৮৮), পৃ: ৬৪০, মূল্য: ৩৩.০০ টাকা

আরতি-স্তব—৭ম সং, পৃ: ৩১, মূল্য: ১.০০ টাকা।

তিব্বতের পথে হিমালয়ে—স্বামী অখণ্ডানন্দ ৩য় সং, পৃ: ১৮১, মূল্য: ৫.০০ টাকা

বিবিধ সংবাদ

আঁটপুরে ধুনিমণ্ডপের উদ্বোধন

হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের পৈত্রিকবাড়িতে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের খ্রীস্টমাসের পূর্বসন্ধ্যা ২৪শে ডিসেম্বর, নরেন্দ্রনাথ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের নয়জন ত্যাগী সন্তান প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে পবিত্র অগ্নিশিখাকে সাক্ষী রাখিয়া সংসারত্যাগের সংকল্প করেন। নরেন্দ্রনাথ, নিত্যনিরঞ্জন, বাবুরাম, তারকনাথ, শশিভূষণ, শরৎচন্দ্র, কালীপ্রসাদ, গঙ্গাধর ও সারদাপ্রসন্ন —এই নয়জনই পরবর্তী কালে যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। নরেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী বৈরাগ্যময় ভাষণে উদ্দীপিত হইয়া সকলেই সংসারত্যাগের সংকল্প করেন। পরে তাঁহাদের খেয়াল হইল ঐ দিনটি খ্রীস্টজন্মের পূর্বসন্ধ্যা (X-mas Eve)। ২৪শে ডিসেম্বর তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

যে-স্থানটিতে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই পবিত্র স্থানটি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আঁটপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ ট্রাস্ট একটি ধুনি-মণ্ডপ নির্মাণ করেন। ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮১, রবিবার সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই নব-নির্মিত মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া ধুনি প্রজ্বলিত করেন।

বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ সহ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সকাল ১০টার সময় উৎসবস্থলে আসিয়া পৌছিলে শঙ্খধ্বনি দ্বারা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হয়। তাঁহারা গাড়ি হইতে নামিয়া মন্দিরে প্রণাম করিয়া উৎসব-মণ্ডপে যান। সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকে মঙ্গলাচরণ, বেদগান। পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত

মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। উন্মোচন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের নয়জন ত্যাগী সন্তানের পূর্ণাবয়ব রিলিফ মূর্তি এবং তাহার পাদদেশে প্রদীপ জ্বালেন। ধূপ জ্বালার পর পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিয়া প্রজ্বলিত করেন ধুনি। সন্ন্যাসিবৃন্দ ও অগণিত ভক্ত নরনারী মণ্ডপের চারিপাশে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া এই পবিত্র দৃশ্য দর্শন করেন। বাহিরে তখন চলিতেছিল সমবেত কণ্ঠে বেদগান।

মণ্ডপ হইতে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আয়োজিত ধর্মসভায় যান। 'প্রভু তুমি সর্বস্ব আমার…' উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ ট্রাস্টের সভাপতি শ্রীঅজিত বসু। তাহার পর ট্রাস্টের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাল পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের লিখিত-ভাষণটি সভায় পাঠ করেন :

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের পুণ্য জন্মস্থান আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানরূপে পরিগণিত। শ্রীনরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের নয়জন সন্তান ১৮৮৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে এই আঁটপুরে প্রজ্বালিত ধুনির সামনে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের এই প্রতিজ্ঞা পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাসে এক নব যুগের সূত্রপাত করেছিল। খুব আনন্দের বিষয়, সেই পবিত্র ঘটনার স্মরণে, ধুনি-প্রজ্বলনের পুণ্য স্থানটিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ ট্রাস্ট' একটি স্মারক-মন্দির নির্মাণ করেছেন। সেই মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। যে মন্দিরের দ্বার আজ উদ্বোধন করা হ'ল, তা শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁর সন্তানদের স্মৃতিকে ধারণ ক'রে আছে। তাঁদের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে ঠাকুরের ভাবধারা ভক্ত-হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে। তাঁদের সকলের আশীর্বাদ সতত আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক, আজকের এই শুভদিনে তাঁদের কাছে আমার প্রার্থনা।

আমার শুভেচ্ছাদি সকলকে জানাচ্ছি।

ইহার পর অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু একটি লিখিত-ভাষণ পাঠ করেন এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ এই দিনটির তাৎপর্য বুঝাইতে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

আঁটপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ ট্রাস্টের চেষ্টাতেই এই নবনির্মিত ধুনিমণ্ডপ নির্মিত। মণ্ডপের দেওয়ালের চারিদিকে টেরাকোটায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ৩৮টি ফলকে রূপায়িত করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর পরামর্শে শিল্পী শ্রীনিত্যানন্দ ভকত এই ধুনিমণ্ডপনির্মাণে সাহায্য ও তাহাতে রিলিফ-মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করিয়াছেন।

জন্মজয়ন্তী

ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) শহরে 'দেবেন্দ্রমোহন হলে' ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৮১), মানিকপাড়া 'পাবলিক লাইব্রেরি' প্রাঙ্গণে ১৯শে ডিসেম্বর এবং খড়গপুর 'দুর্গামন্দির হলে' ২০শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। তাহাতে আলোচনা করেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ।

নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে।

বীরভূম শ্রীরামকৃষ্ণ তপোমঠ, ভাঙ্গর (২৪ পরগনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ, গোলাপুর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খাগড়া (বহরমপুর) 'শ্রীশ্রীমায়ের সংসার'।

পরলোকে

শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ৯ই পৌষ ১৩৮৮ (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮১), রাত্রি ২টায় পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা গ্রামের বাসভবনে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে তিনি ১৩১৯ সালে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

বালক প্রেনহেকের বিখ্যাত হারভিবংশীয়; নাম কুমার হারভি। বালকটী সুন্দর ও সরল। কুমার হারভির বড় বড় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় দেখিলেই তাহাকে সততার ও সারল্যের প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয়। কুমার আপামরসাধারণ সকলেরই প্রিয়।

দোলমেনের জমিদারগৃহিণী বালকের আত্মীয়। কুমার তাঁহাকে নববর্ষের সুখশান্তি-জ্ঞাপনার্থ দোলমেনে আসিল। অনতিদূরেই সুধাধবলিত উচ্চ বৃহৎ প্রাসাদ দোলমেন-ভূম্যধিকারী-বর্গের মহিমা ঘোষণা করিতেছিল। কুমার দ্রুতপদসঞ্চারে সেই প্রকাণ্ড সৌধ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জমিদারগৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইল। গৃহিণী বৃদ্ধা; একখানি বৃহৎ আরাম-কেদারায় স্বীয় দেহযষ্টি লুপ্ত করিয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠখণ্ড ধিকি ধিকি আপনার জীবনের অস্তিত্ব লোপ করিতেছিল।

কুমারকে দেখিবামাত্র গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরস্পরে নববর্ষের বিশেষ সম্ভাষণ হইল। গৃহিণী কহিলেন, 'কুমার, ঐ দেখ তোমার নববর্ষের উপহার সামগ্রী। মনোমত হইল কিনা পরীক্ষা কর।'

কয়েকখানি গল্পের বহি, কতকগুলি খেলানার সামগ্রী ও একটী বন্দুক সম্মুখস্থ টেবিলে শোভা পাইতেছিল। হারভি উপহারগুলি দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সারা দুইটী বৎসর ধরিয়া হারভি একটী বন্দুক পাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। বন্দুকটী দেখিয়া তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মনে করিল শত্রুপক্ষীয় কাহাকে পাইলে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখে।

হারভি যে বংশ সম্ভূত, সে বংশের পুরুষমাত্রেই যোদ্ধা এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই রণক্ষেত্রে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার পিতামহ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সিবাস্তাপুল আক্রমণে নিহত হন। কুমার হারভি শৈশব হইতেই পৈতৃক কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিত।

সেইদিবস বৈকালে বাটী ফিরিবার সময় পথে হারভি বন্দুকটী লইয়াই ব্যস্ত ছিল। অন্যান্য দ্রব্যগুলি বৃদ্ধ ভৃত্যের হস্তে দিয়া সে নিশ্চিত ছিল। দোলমেন ত্যাগের পর প্রেনহেকের পথে প্রবেশ করিয়া কিছু দূর যাইবার পর কুমার হারভি দেখিল, তাহার সমবয়স্ক একটী বালক তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। বালকের পরিচ্ছদ অত্যন্ত সামান্য রকমের। তাহার পাতলা পাতলা ছোট গাল দুটি, আর সেই বিবর্ণ কচি মুখখানি দেখিলেই দারিদ্র্যদুঃখের ভীষণ অত্যাচারের কথা মনে পড়ে। তাহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নদুটির দৃষ্টি আপনার উপর পতিত দেখিয়া, কুমার দয়ার্দ্রচিত্তে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বালক, তুমি কি চাও?"

বালকটী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না এমন কিছুই নহে। আমি ওই বন্দুকটী দেখিতেছিলাম।"

হারভি। তোমার নাম কি?

বালক। আমার নাম তনিগী, আমি আপনাদিগের বাড়ীর নিকটেই থাকি। আপনি যখন পনী আরোহণে বেড়াইতে যান, তখন আমি আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু আপনি আমাকে দেখেন নাই।

মাঘ, ১৩৮৫ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ (মাঘ, ১৩৮৮, পৃঃ ৪১)

হারভিকে এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুন্দরপ্রকৃতিবিশিষ্ট বোধ হওয়ায় বালক তনিগী সাহসে ভর করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। বন্দুকের ঘোড়াটিতে হাত দিয়া দেখিতে লাগিল।

হারভি স্বভাবসুলভ সারল্যের সহিত বলিল, 'তনিগী, এটি আমার নববর্ষের উপহার; আচ্ছা, তুমি কি কি উপহার পাইলে?' বালক উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আমায় উপহার দিবার লোক ইহজগতে কেহই নাই, আমার পিতা মাতা উভয়েই পরলোকগত।"

হারভি বৃদ্ধ ভৃত্যের হস্তস্থিত অন্যান্য দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া কহিল, "বালক, ঐ সকল উপহারের মধ্য হইতে যেটি ইচ্ছা হয় বাছিয়া লও।" তনিগী অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে ঐ সকল দ্রব্য একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি পুনরায় সেই মহামূল্য বন্দুকটির উপর পড়িল। সে মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল, 'না, ওই সকল দ্রব্যে আমার কোনও আবশ্যক নাই; আমি কি ওই বন্দুকটি আর একবার ক্ষণকালের জন্য দেখিতে পারি?'

হারভি তৎক্ষণাৎ সেই বন্দুকটি তনিগীর হস্তে প্রদান করিল। এইরূপে কিছু দূর যাইবার পর হারভি তানগীকে নিবিষ্টচিত্তে বন্দুকটির প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া কহিল, "বালক, তোমার পিতামাতা বর্ত্তমান নাই। কিন্তু নববর্ষারম্ভে তোমায় কিছু উপহার দেয়, এমন লোক কি কেহই নাই?"

বালক কাতরকণ্ঠে অতি কষ্টে একটি ক্ষুদ্র 'না' বলিয়া, আবার সেই বন্দুক লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

কুমার হারভি, কি জানি কেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; বোধ হইল, যেন তাহার মনের মধ্যে সহসা একটি তুমুল ঝড় উঠিয়াছে, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'তনিগী! এই বন্দুকটি আমি তোমায় দিলাম; আহা, তোমার পিতামাতা কেহই নাই!'

তনিগী একদৃষ্টে কুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। কুমারের উদার স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া সে আনন্দে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার বিবর্ণ কপোলযুগল অরুণরাগরঞ্জিত হইল। তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল। সে কি ভাবায় কুমার হারভিকে ধন্যবাদ দিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। কুমার হারভি এক্ষণে কলেজে অধ্যয়ন করেন। অবকাশকালে প্রেনহকে আসিয়া তনিগীকে দেখিয়া যান। প্রেনহেক জমিদারীভুক্ত একটি গোলা বাড়ীতে তনিগী কর্ম্ম করিত।

এক দিবস তনিগী হারভিকে কহিল, "কুমার! বন্দুকটী সর্ব্বক্ষণই আমার নিকটে থাকে। উহাই আমার বাল্যকালের একমাত্র প্রিয় বস্তু ও আনন্দ-নিদর্শন। যদ্যপি এমন দিন আইসে, যখন আপনার কোনও বন্দুকের প্রয়োজন হইবে, আশা করি, আপনি অধীনকে স্মরণ করিবেন।" এই কয়েকটি কথা তনিগী অর্দ্ধবিকম্পিত স্বরে এমন ভাবে কহিল, যে কুমারের তাহা অহঙ্কারসূচক বলিয়া বোধ হইল না। উহা তাহার প্রাণের আবেগময়ী ভাষা, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল।

অষ্টাদশ বর্ষে কুমার হারভি সেণ্টসীরের সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বাল্যাবধি

তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত পথের অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। দুই বৎসর অন্তে '৭০ খৃষ্টাব্দের সেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুমার হারভি সেণ্টসীর বিদ্যালয়স্থ কয়েকজন বন্ধুর সহিত ঐ যুদ্ধে এক সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বয়ং এক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তনিগী আবেদন করিয়া, কুমারের অধীনস্থ সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইল। অত্যল্প দিবসের মধ্যেই এই দরিদ্র কৃষক যুবক অদম্য বীরের আসন গ্রহণ করিল। তাহাদের সেনাদল উত্তরস্থ সৈন্য বিভাগের অধীন ও ফেডার্ব নামক সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচালিত। আমাদের পরিচিত বন্ধুদ্বয় প্রত্যেক যুদ্ধের অন্তে একবার পরস্পরে মিলিত হইত।

অধ্যক্ষ ফেডার্ব অত্যন্ত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও শত্রুর আক্রমণ নিবারণে কৃতকার্য্য হইলেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরে 'পণ্টনইলেসের' যুদ্ধে তনিগী অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইল। কুমার হারভিও অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখাইয়া কাপ্তেনের পদে উন্নীত হইলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নববর্ষারম্ভ দিবসে তাঁহারা 'আরাসের' নিকটে শিবির মধ্যে পূর্ব্ব দিবসের ক্লান্তি দূর করিতেছিলেন।

তনিগী বলিল, 'কাপ্তেন, আজ হইতে দশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি আমায় একটি বন্দুক প্রদান করিয়াছিলেন, মনে আছে কি?' কুমার আপনার বাল্যকালের বন্দুক পাইবার আগ্রহের বিষয় স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, 'হাঁ, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ রূপে জাগরূক আছে।'

তিন দিবস পরে 'বাপমের' যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম দিবসের সন্ধ্যার প্রাক্কালে, যখন যুদ্ধ প্রায় বন্ধ হয় হয়, তনিগী কাপ্তেনের অনুসন্ধানে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। তনিগী দেখিল, কাপ্তেন হারভি স্বীয় সদ্যোহত অশ্বের নিম্ন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চাতে একজন প্রাসিয়ান্ সেনা কুমারের উদ্দেশে স্বীয় বর্শা উত্তোলন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। চারিদিকে মহা-কোলাহল। কুমার সবে মাত্র দাঁড়াইয়াছেন, সম্মুখে প্রাসিয়ান্ সেনা উত্তোলিতবর্শাহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দণ্ডায়মান। সহসা কোথা হইতে কে একজন তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া সেই প্রাসিয়ানকে তরবারির আঘাতে নিপাতিত করিল। সে আর কেহই নহে—আমাদের সুপরিচিত অদম্যবীর্য কৃতজ্ঞ তনিগী। তনিগী কাপ্তেন হারভির সেই আসন্ন বিপদ অবলোকন করিবামাত্র শত শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক, শত শত হত আহতকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া, কুমারের প্রাণরক্ষার জন্য উন্মত্তের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তনিগী সেই হত প্রাসিয়ানের নিকট হইতে তাহার বন্দুক গ্রহণ করিয়া, কুমারকে উপহার দিবার মানসে কহিল, 'কুমার! একদিন আপনি আমাকে একটি বন্দুক দান করিয়াছিলেন। অনুমতি করুন, এই বন্দুক আপনাকে অর্পণ করিয়া কর্ত্তব্য-ঋণ হইতে মুক্ত হই।'

হরি! হরি! তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে, যখন সবে মাত্র বন্দুক হারভির হস্তে প্রদান করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইয়াছে, হতভাগ্য তনিগী পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়া গেল। কোথা হইতে একটি গুলি আসিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল। কুমার বাষ্পাকুলিত লোচনে সেই বন্দুকটী—তাঁহার প্রাণরক্ষক সেই চিরকৃতজ্ঞবন্ধু প্রদত্ত রক্তস্নাত বন্দুকটী—সাদরে গ্রহণ করিলেন। সহসা, কি জানি কেন, স্বপ্নের মত অতীতের ছায়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল।

(মাঘ, ১৩৮৮, পৃঃ ৪৩)

কুমার দেখিলেন—সেই দোলমেনের প্রশস্ত পথ—যথায় তিনি এক কৃষক বালককে তাঁহার উপহার-বন্দুক দান করিয়াছিলেন।

পাঠক! তনিগীকে—সেই কর্ম্মবীর সেই অদম্য অধ্যবসায়শীল কর্ম্মযোগী সেই পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কৃতজ্ঞতাপরায়ণ তনিগীকে, কি একবার অনুসন্ধান করিবে না? ঐ দেখ বহু উচ্চে, যথায় মানবের চর্ম্মচক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি পঁহুছিতে প্রায় অক্ষম, ঐ সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পার্শ্বে মাল্যচন্দনচর্চ্চিত হইয়া তনিগী, বন্ধু কুমার হারভির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। থাক দেব, থাক তনিগী! অনন্ত ধামে বসিয়া অনন্ত আনন্দ উপভোগ কর। এ মরজগতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা, তোমার মহনীয় আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তোমার প্রদর্শিত মহাপথের উদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য সারাটী জীবন ধরিয়া যত্ন করিতে থাকি,—দেখি, যদি একপদও অগ্রসর হইতে পারি।

রামকৃষ্ণ মিশন

১। মাদ্রাজ মহোৎসব।

পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্র আমরা মাদ্রাজ হইতে পাইয়াছি :—

এখানে সুচারুরূপে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-পূজা ও মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গতবার প্রায় ১৪।১৫ মণ চাউল ও সামান্য টাকা একত্রিত হইয়াছিল। এবার উৎসবের জন্য প্রায় ৪০ মণ চাউল ও নগদ দুই শত টাকার উপর সংগ্রহ হইয়াছিল। সাহায্য প্রদানকারী মহাশয়দিগের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Coconade-এর জমিদার প্রায় ৬ মণ চাউল দিয়াছেন (ইনি পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি, Telegu ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন)। মাদ্রাজ হাইকোর্টের Justice সুব্রহ্মণ্য আয়র, নগদ ৩০৲ টাকা দিয়াছেন। মহোৎসব সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যের সমস্ত ভার "মুন্মথ্ স্বামী নাইডু" নামক এক সুদক্ষ লোকের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ইনি কার্য্যবশতঃ প্রায় ৩ দিন অন্ন গ্রহণ করিতে অবসর পান নাই। একরাত্রি একেবারেই নিদ্রা যান নাই ও কেবল খাটিয়াছিলেন। এদেশে মেঠাই প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য গ্রহণের প্রথা নাই। নারিকেলের নাড়ু করা হইয়াছিল ও রাশীকৃত ফল আনয়ন করা হইয়াছিল। অপরদিকে ৪০০ শত লোকের অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। সে দিন আফিস থাকাতে মধ্যাহ্নে খুব লোক হয় নাই। অতি সামান্য লোকই প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিলেন। ৪টার পর দলে দলে লোক আসিয়াছিল। রাত্রিতে সকলেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়াও সকলকে ঠিক সমানভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিথি-পূজার দিন ৩০০ শত লোকের উপর প্রসাদ পাইয়াছিলেন, রাত্রিতে খুব হোম হইয়াছিল। উৎসবের দিনও ২০০ শত ভদ্রলোক প্রসাদ পাইয়াছিলেন ও প্রায় ৫০০০ হাজার গরিবলোক সন্তুষ্ট চিত্তে ভোজন করিয়াছিল। উপরতলায় এক বিস্তীর্ণ ঘরে ভগবানের সমাধিস্থ সৌম্যমূর্ত্তি অতি সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সে ঘরে প্রায় ৫০০ শত লোক ধরে। রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী, পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

(৮৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৪)

সভাপতি—এখানকার হাইকোর্টের উকিল—কৃষ্ণস্বামী আয়র মহাশয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার মিশন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মভাব ভারতবর্ষে আবার জাগিয়া উঠিতেছে।

২। নিউইয়র্ক সংবাদ।

গত অক্টোবর মাস হইতে, নিউইয়র্কস্থ 'বেদান্ত সভা'র একটি স্থায়ী গৃহ হইয়াছে। ইহাতে শতাধিক লোকের স্থান হইতে পারে। একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারিণী সমুদয় কার্য্য তত্ত্বাবধারণ করেন। ১৫ই অক্টোবর ইহা সাধারণের জন্য খোলা হয়। স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। ২২শে অক্টোবর হইতে ইহার নিয়মিত বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে বক্তৃতার নাম ও তারিখ দেওয়া গেল। বক্তা—স্বামী অভেদানন্দ।

১৮৯৯—২২শে অক্টোবর—	দর্শন ও ধর্ম্ম।
„ ২৯শে „	জাগতিক ক্রমবিকাশ ও উহার উদ্দেশ্য।
„ ৫ই নবেম্বর	আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ।
„ ১২ই „	ভগবানে মাতৃভাব নিত্য।
„ ১৯শে „	শুভাশুভতত্ত্ব।
„ ২৬শে „	জীবন্মুক্তির উপায়।
„ ৩রা ডিসেম্বর	মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না?
„ ১০ই „	বংশানুক্রমবর্ত্তিতা ও পুনর্জ্জন্মবাদ।
„ ১৭ই „	ব্রহ্মানুভূতি লাভ।
„ ২৪শে „	কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট উপাসনা।
১৯০০—৭ই জানুয়ারি—	বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম।
„ ১৪ই „	যোগ কি? উহার সীমা ও অভ্যাস।
„ ২১শে „	প্রাণায়াম তত্ত্ব।
„ ২৮শে „	আত্মসংযমের উপায়।
„ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি	আধ্যাত্মিক জীবনে একাগ্রতা ও ধ্যানের ফল।
„ ১১ই „	পাপী কিরূপে মুক্তি লাভ করে।
„ ১৮ই „	যীশুর ধর্ম্ম ও বেদান্তের নীতি।
„ ২৫শে „	ক্রমবিকাশবাদ ও অমরত্ব।
„ ৪ঠা মার্চ্চ	প্রাচীন ভারতে 'শব্দ'ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতনয় ও ক্রশ।
„ ১১ই „	আমাদের অদৃষ্টের সৃজনকর্ত্তা কে?
„ ১৮ই „	ঈশ্বর কি আমাদের প্রার্থনা শুনেন?
„ ২৫শে „	ভগবৎপ্রেম ও মুক্তি।
„ ১লা এপ্রেল	কোন মহাপুরুষের জীবনী।

(মাঘ, ১৩৮৮, পৃঃ ৪৫)

স্বামী বিবেকানন্দ ৮ই নবেম্বর নিউইয়র্কে আগমন করেন। তিনি সেইদিন বেদান্তসভার নিয়মিত অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া অনেক নবাগত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন। ১০ই তাঁহাকে সাধারণে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। একপক্ষ এখানে থাকিয়া ২২শে তিনি চিকাগোয় গমন করেন। তথায় এক সপ্তাহ থাকিয়া ক্যালিফর্ণিয়ায় গিয়াছেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ মণ্টক্লেয়ার নামক স্থানে থাকেন। ইহা নিউইয়র্ক হইতে একঘণ্টার পথ। তিনি হিতোপদেশ ও অন্যান্য ভারতীয় পুস্তক হইতে ছেলেদিগকে নীতি শিক্ষা দেন।

৩। মুর্শিদাবাদ জেলা অন্তঃপাতী ভাবদাগ্রামস্থ

অনাথ-আশ্রম।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রেরিত।)

আমি প্রায় এক মাস, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিষ্ঠিত অনাথআশ্রমে আছি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময়, বহরমপুরের অদূরবর্ত্তী মাহুলা গ্রামে ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্রদিগকে অন্নবিতরণে রত উক্ত স্বামীর, একটী অনাথআশ্রম স্থাপনের প্রথম ইচ্ছা হয়। তৎকালীন মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ই. ভি. লেভিঞ্জ এবং তৎপরবর্ত্তী কালেক্টর ডব্লিউ. ইজার্টন, স্বামীজির অধ্যবসায় এই মহদুদ্দেশ্যের ভবিষ্যৎসিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া স্বামীজিকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করেন। ১৮৯৭ আগষ্ট মাসে, দুইটী অনাথ বালক লইয়া আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হয়। এক্ষণে বালকদিগের সংখ্যা দ্বাদশ। ইহাদের মধ্যে ভাগলপুরের কালেক্টর জে. জি. কামিং একটী, এবং মুর্শিদাবাদের কালেক্টর জে. আর. ব্ল্যাক্উড্ দুইটীকে পাঠান। এইরূপ, স্থানীয় রাজপুরুষ ও স্বদেশীয়দিগেরও আশ্রমের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি।

আশ্রমের প্রথম আরম্ভ মাহুলা গ্রামে। ১৮৯৯এর প্রারম্ভে বহরমপুরের আট মাইল দক্ষিণে সারগাছিতে আশ্রম স্থানান্তরিত হইয়াছে। জমিদার শ্রীমতী মধুসুন্দরী বর্ম্মণী আশ্রমের জন্য তাঁহার কাছারিবাড়ির এক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথ বালকেরা এক্ষণে সেইখানে রহিয়াছে। আশ্রমের বাড়ির জন্য, বিঘা প্রতি চারি আনা নামমাত্র বার্ষিক খাজনা হিসাবে তিন বিঘা সতের কাঠা জমি দিয়া ইনি নিজের উদার অন্তঃকরণের ও স্বদেশ বাৎসল্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

ক্ষুধিতকে অন্নদান ও অনাশ্রিতকে আশ্রয়দান আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জীবনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান করা, এবং ছেলেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, এক কথায়—"মানুষ করা", যাহাতে তাহারা নিজের জীবন অত্যুচ্চ আদর্শে গঠিত করিয়া সেই আদর্শ বলে পতিত ভারতের অভ্যুত্থানের দ্বার মুক্ত করিতে পারে। এক একটি আত্মা অনন্তশক্তির আধার; উপযুক্ত আচার্য্যের হাতে সে শক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।

এই আড়াই বছরের মধ্যে বালকদিগের চরিত্র পরিবর্ত্তন দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

(৮৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৬)

একদিকে স্বামীজির অতুল স্নেহ, অক্ষুণ্ণ উদ্যম; অন্যদিকে তদেকাশ্রয় অনাথ বালকের প্রীতি, সচ্চরিত্র, কার্য্যক্ষমতা; আশ্রমটী আমার কাছে ভালবাসার স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। সে দিন দুইটী নূতন ছেলে আসিয়াছে। স্বামীজি উহাদিগকে গরম জল ও সাবান দিয়া স্নান করাইলেন, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে। অতীব সুন্দর ও আশাপ্রদ দেখিবার জিনিস।

ছেলেদিগকে এখন কাপড় বোনা, জামা সেলাই করা, ছুতোরের কাজ, রেশম-বিজ্ঞান এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলা পড়া, লেখা, আঁক প্রভৃতি শেখান হয়। ইহার জন্য একজন তাঁতি, একজন দর্জ্জি, একজন ছুতোর ও একজন বাঙ্গলা পণ্ডিত মাহিনা দিয়া রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত রবিবার ভিন্ন প্রত্যহ সকালে, তাঁতি ফি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবারে, ছুতোর বুধ ও শনিবারে এবং দর্জ্জি রবিবারের সকালে আশ্রমে আসিয়া ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দেন। প্রত্যেক সোম ও শুক্রবারে বেঙ্গল্-রেশম-সমিতি দ্বারা নিযুক্ত একজন দক্ষ শিক্ষক রেশম-বিজ্ঞান শিখাইয়া যান। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর স্বামীজি নিজে অথবা উপস্থিত তাঁহার কোন সন্ন্যাসী ভ্রাতা ইংরাজী পড়ান।

আশ্রমে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম-নির্বিশেষে, হিন্দু, মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের অনাথ বালকদিগকে স্থান দেওয়া হইবে। যে সম্প্রদায় হইতে আনীত, যাহাতে সেই সম্প্রদায়ের অনুমোদিতরূপে বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, ধর্ম্মোপদেশ কালে স্বামীজি সে বিষয়ে সাতিশয় সাবধান, ও যত্ন করেন। বর্ত্তমান বারটী ছেলের মধ্যে দুইটী মুসলমান। একঘরে হিন্দুবালকদের —"অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়", এই সুমিষ্ট, ভক্তিপূর্ণ, সমস্বর প্রার্থনা; পাশের ঘরে মুসলমান বালকদ্বয়ের উচ্চস্বরে "লা ইলাহা ইল্লালা" আহ্বান, শুনিলে আশা হয়, বুঝি ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিভিন্ন প্রতীয়মান প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস সমূহের বিদ্বেষশূন্য ভাবে একত্র অবস্থান শীঘ্রই স্বপ্নরাজ্যের অলীকত্ব হইতে কার্য্যক্ষেত্রের সত্যে পরিণত হইবে।

আজকাল, আশ্রমের খরচ কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির মাসিক চাঁদা ও মধ্যে মধ্যে এককালীন দান হইতে চলিতেছে। ইহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আশ্রমের আপাততঃ অভাব প্রথমতঃ—একটী বাড়ি, অনুমান দশহাজার টাকার; দ্বিতীয়তঃ—আশ্রমটীকে দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার জন্য, ছেলেদের ভরণপোষণ, শিক্ষা প্রভৃতি যাহাতে সুশৃঙ্খল চলিতে পারে, তদুপযোগী অর্থ। বলা বাহুল্য, আশ্রমের মহান্ অভিপ্রায়ের বিস্তারের সঙ্গে, ইহার অভাবও বাড়িতে থাকিবে।

এ আশ্রমে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকলগুলির সমরূপ, এই দরিদ্র, পরিত্যক্ত বালকদের মধ্যে স্ফুরণ, ও কালে মানুষ হইলে, তাহাদের দ্বারা গ্রামে গ্রামে দীন দুঃখী লক্ষ্যহীন সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ঐ সমস্ত ভাবের বিস্তার ও ঐ সমস্ত ভাব লইয়া কাজ করা ও করান,— ইহা স্বামীজির এ জীবনের ব্রত। মায়াবাদী, চিরকাল দ্বৈতরহিত ভূমানন্দপ্রয়াসী সন্ন্যাসীর পক্ষে সাধন ভজন ফেলিয়া এরূপে গৃহস্থের ন্যায়, ছেলেপিলে নিয়ে, আবার সংসার বানান, কতদূর স্বার্থত্যাগ, তা সন্ন্যাসী আমরা বুঝিতে পারি। বুকের রক্ত দিয়া, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামী আশ্রমটী খাড়া করিয়াছেন, সকলকেই বলি, আপনাদের কাঙ্গাল সন্তানের জন্য,

(মাঘ, ১৩৮৮, পৃঃ ৪৭)

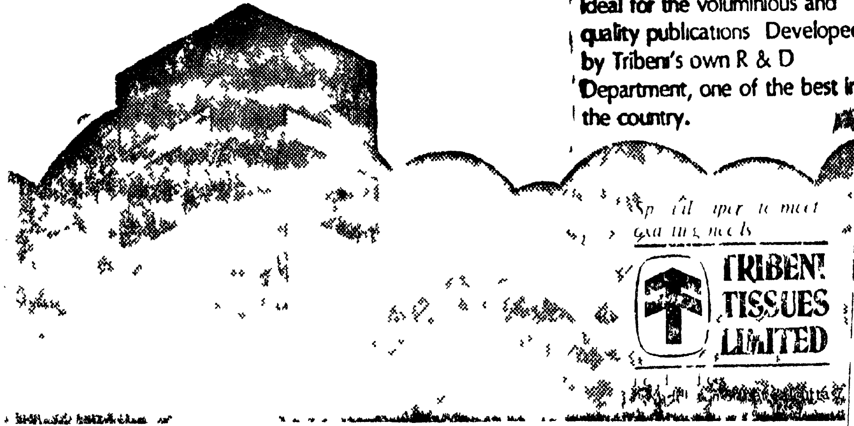
আপনাদেরই এরা রক্তমাংস, আপনাদের দেশের মঙ্গলের জন্য। সাধারণের সহানুভূতি ছাড়া আশ্রমের আর অধিক উন্নতি অসম্ভব। আশ্রমের শৈশব জীবন এইখানেই শেষ হইবে, অথবা আপনাদের সকলের শারীরিক, আর্থিক, যে রূপে যিনি পারেন, সাহায্যের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এখন তাহা আপনাদেরই উপর নির্ভর। সম্বলহীন একজন ভিক্ষুক যথাসাধ্য করিয়াছেন ও করিতে প্রস্তুত, চিন্তাশীল, সহৃদয় সকলের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণ ফাণ্ডের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন। চাঁদা বা এককালীন দান আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা স্বামী অখণ্ডানন্দ অনাথাশ্রম, ভাবদা পোঃ আঃ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

৪। ঘোগা বন্যা।

অল্পদিন হইল, ভাগলপুর জেলার ঘোগা নামক স্থানে ভয়ানক বন্যা হইয়া অনেক গ্রামের অনেক জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করে। স্বামী অখণ্ডানন্দ গত ৫ই অক্টোবর মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রম হইতে তথায় সাহায্যার্থ গমন করেন। ৩০শে ডিসেম্বর তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গেল:—ইনি প্রথমে ঘোগার দক্ষিণ নিকটস্থ জানিডি নামক গ্রামবাসীর অবস্থা পরিদর্শন করিয়া, তথা হইতে ৯।১০ মাইল দক্ষিণস্থ সোনহৌলা ও দুরিগু নামক গ্রামে গিয়া ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কমি' সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঘোগায় আসিয়া ২রা নবেম্বর হইতে বিপন্ন গ্রামসমূহের পরিদর্শন আরম্ভ করিলেন। মধ্যে কয়েকদিন ভাগলপুরে ছিলেন। সেই সময়ে ইহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া স্থানীয় জমিদারবর্গ ও সরকারী কাছারির কর্ম্মচারিগণ বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ঘোগায় অনেক সম্পত্তিপন্ন গৃহস্থ বণিক আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিপন্নগণের প্রতি তাঁহাদের কিছুমাত্র দয়া নাই, তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন।

২রা নবেম্বর ঘোগার অনতিদূরে কুশা নামক গ্রামে গিয়া দেখিলেন, গ্রামখানি ভাসিয়া গিয়াছে; কেবল ৮ ঘর বণিক রহিয়াছে, তাহারা কুটীর বাঁধিয়া কোনরূপে গ্রামখানির অস্তিত্বরক্ষা করিয়াছে। এ গ্রাম হইতে ৮টী নরনারী, ২টী গবাদি পশু এবং ৪০০।২০ শস্যাদি ভাসিয়া গিয়াছে। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত ৮টী বণিকই উপার্জ্জনক্ষম। তথা হইতে পাবসরাই নামক গ্রামে গিয়া দেখিলেন, তথায় কলেরার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। অল্পদিনের মধ্যেই ১৩।১৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত। জলপ্লাবনে এ গ্রামের কিছু অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু অধিকাংশ গৃহ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছিল, অধিবাসিগণ অতি দরিদ্র। স্বামী অখণ্ডানন্দ এই মহাবিপদের সময় সেখানে কোন ডাক্তার বৈদ্যেরও চিহ্ন দেখিলেন না। যাহা হউক, তিনি নিজে যতদূর পারেন, করিলেন এবং ক্রমশঃ কমিং মহোদয়ের যত্নে একটী ডাক্তারের ও কিছু ঔষধের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সকল কলেরারোগগ্রস্ত ব্যক্তির একাধিক বস্ত্র নাই দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি নূতন বস্ত্র দিলেন। দিবারাত্র সেবা করিতে করিতে, ইনি বিশেষভাবে যে চারিটী রোগীর সেবা করিতেছিলেন, সকলেই আরোগ্য লাভ করিল। ইহার কিছু পরেই ইহাকে আর একটী কলেরারোগীর সেবা করিতে হয়;



With best compliments from :

Rollatainers Limited

13/6, Mathura Road
Faridabad–121003
HARYANA

Phone : 52-3554, 52-5183, 52-3088, 52-1282

B. C. Paul & Son (P) Ltd.

2/2, Gopal Ch. Chatterjee Road
Calcutta-700002
Leading Manufacturers of Vegetable Oils

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৫৮, মূল্য ২'৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। (যন্ত্রস্থ)

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৭০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরত্রিক-স্তব—৭ম সংস্করণ, মূল্য ১'০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩'৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। (যন্ত্রস্থ)

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬'২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে — স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫'০০

Udbodhan—Phone : 55-2447 JANUARY 1982 Regd. No. WB/NC-17

৮০.৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

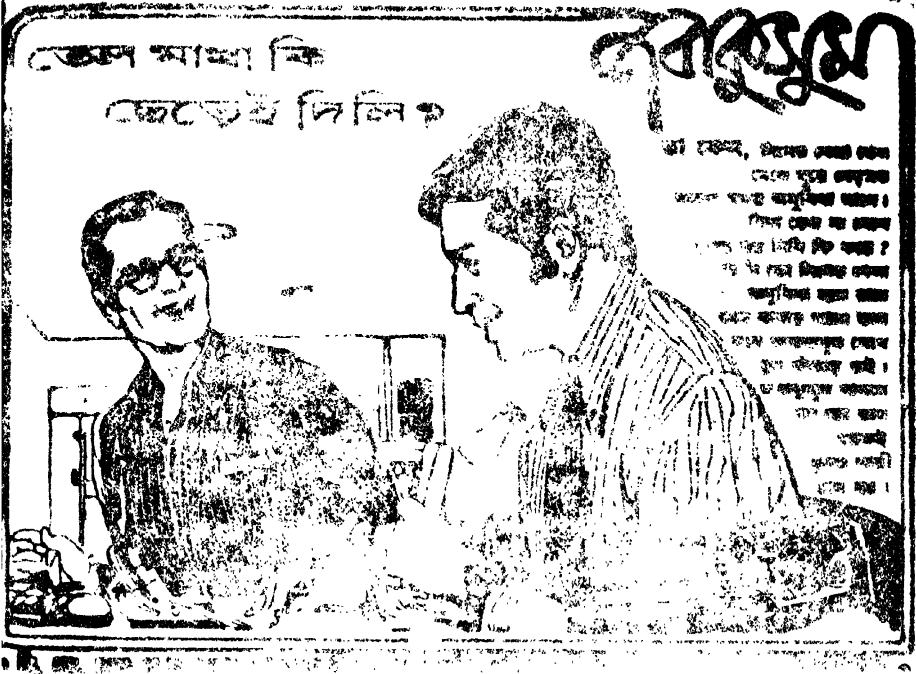
উদ্বোধন

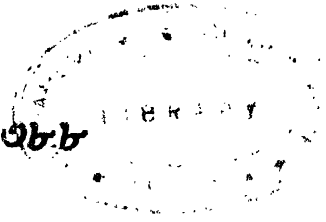
ফাল্গুন ১৩৮৮

৮৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত





উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮৮

সূচীপত্র

১। দিব্য বাণী : অবতারবাদের ক্রমবিকাশ ৪৯

২। কথাপ্রসঙ্গে : শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ-সন্ধানে ৫০

৩। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন ... স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ... ৫২

৪। রামকৃষ্ণবন্দনাপঞ্চকম্ (স্তোত্র) ... শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য ... ৫৬

৫। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা ... স্বামী বুধানন্দ ... ৫৭

৬। দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় ... ডক্টর রমা চৌধুরী ... ৬০

৭। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ... সঙ্কলক : ডক্টর জলধিকুমার সরকার ... ৬৩

৮। ইঙ্কাদের দেশ পেরুতে সাতদিন ... শ্রীমতী মুক্তি কর ... ৬৫

৯। অপার মহিমা (কবিতা) ... 'বল্লভ' ... ৭২

১০। 'যমেবৈষ বৃণুতে' (কবিতা) ... শ্রীভক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭২

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

১১। শ্রীম-স্মৃতি … শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় … ৭৩

১২। ভ্রম-সংশোধন … … ৭৪

১৩। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা … শ্রীশশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত … ৭৫

১৪। সমালোচনা … ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ … ৭৯

… শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় … ৮০

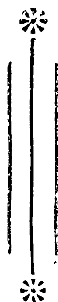
১৫। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ … … ৮২

১৬। বিবিধ সংবাদ … … ৮৬

১৭। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা … … ৮৯

(পুনর্মুদ্রণ)


THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA










৮৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

অবতারবাদের ক্রমবিকাশ

…বৈদিক যুগের ঋষিই যে কালে পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এ-কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৈদিক যুগে মানব কতকগুলি পুরুষকে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থসকল দর্শন করিতে সমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয়ের শক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে একমাত্র 'ঋষি'-পর্যায়ে নির্দেশ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিল।…

দার্শনিক যুগের অন্তে ভারতে ভক্তি-যুগের বিশেষভাবে আবির্ভাব হইয়াছিল। বেদান্তের তীব্র নির্ঘোষে ভারত-ভারতী তখন সর্বব্যক্তির সমষ্টীভূত এক বিরাট-ব্যক্তিত্ববান্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া কেবলমাত্র অনন্যভক্তিসহায়ে তাঁহার উপাসনায় জ্ঞান এবং যোগের পূর্ণতাপ্রাপ্তি-বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে।…

বিশিষ্ট ঋষিগণের ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতির অন্য প্রধান কারণ—ভারতের গুরু-উপাসনা। বেদোপনিষদের যুগ হইতেই ভারত-ভারতী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানদাতা আচার্য গুরুর উপাসনা করিতেছিল। ঐ পূজোপাসনাই তাহাদিগকে কালে দেখাইয়া দেয় যে, মানবের ভিতর অতীন্দ্রিয় ঐশী শক্তির আবির্ভাব না হইলে সে কখনও গুরুপদবীগ্রহণে সমর্থ হয় না।…শ্রীভগবানের করুণাই মূর্তিমতী গুরুশক্তিরূপে তাহাদিগের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে।

—স্বামী সারদানন্দ

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, (১৩৮০), অবতরণিকা, পৃঃ ৩-৬]

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ-সন্ধানে

শিবরাত্রির তপস্যার পর ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ার চাঁদ এক পূর্ণতার আভাস লইয়া পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। সাধক মানুষ চিন্তা করে—কি ঐ পূর্ণতার ইঙ্গিত! গোটা পূর্ণচন্দ্রের আবছা ছায়া দেখা যায় দুদিনের শশিকলার আধারে। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবিকাশের ও ভাববিস্তারের অন্তরতম রহস্য।

কামারপুকুর গ্রামের প্রান্তে পর্ণকুটিরে অতি অনাড়ম্বরে একান্তনীরবে একদিন যাহার আরম্ভ, আজ সেই ঘটনার স্মৃতি-উৎসব—নগরে শহরে গ্রামে গঞ্জে, কোটিকণ্ঠে মুখরিত জয়ধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত! কিভাবে সেই গ্রাম্য বালক শহরের উপকণ্ঠে এক উদ্যানবেষ্টিত দেবালয়ে পূজারীর কাজ করিতে করিতে সরল ব্যাকুল সাধনার মাধ্যমে জগন্মাতার দর্শন লাভ করিল, পরে তাঁহারই নির্দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম সাধনা করিয়া, সকল ধর্মের সারসত্য উপলব্ধি করিয়া পরিণত বয়সে ঘোষণা করিলেন: সরলতা ও ব্যাকুলতা সহায়ে সাধনা করিলে সকল ধর্মের পথেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, এবং ভগবান্ লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য ঈশ্বর, ধর্মগুলি পথ মাত্র। পথ লইয়া বিবাদ করা অপরিণতবুদ্ধি বালকের পক্ষেই শোভা পায়; পরিণতবুদ্ধি মানব একটি পথ ধরিয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়; পথে বিবাদ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অতি উদার যুগোপযোগী শিক্ষা, তথা নবতম সাধনার ধারা মতবাদ-কণ্টকিত পৃথিবীতে এক নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। তবে বুঝি, মানব-সভ্যতা এতদিনে যুক্তিবাদের শুষ্ক মরুভূমি অতিক্রম করিয়া নূতন শ্যামল সফল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নানাধর্মের সাধনা করিয়া, নানারূপে নানাভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া বর্তমান যুগে মানবমনের দুইটি বহুজিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন: (১) হাঁ, ঈশ্বর আছেন; (২) তাঁহাকে দেখা যায়। অতঃপর তিনি দিয়াছেন আরও দুইটি অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর: (১) তাঁহাকে নানাভাবে উপলব্ধি করা যায়, (২) না, এগুলি বিরোধী নয়; পরস্পর পরিপূরক।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় এই গূঢ় তত্ত্বের রহস্য আমরা আভাসে কিছুটা বুঝিতে পারি। যদি স্বামী বিবেকানন্দ না বুঝাইতেন, হয়তো বহু ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন অসাধারণ সাধক বা মহাপুরুষ জানিয়াই ক্ষান্ত হইতেন; কিন্তু স্বামীজীর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ জড়বাদীর যুক্তি-দুর্গ দুর্বল করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার গভীর অনুভূতি আধ্যাত্মিক চেতনাকে বিশ্বমানবের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন: এ-যুগের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণরূপ আলোক-স্তম্ভের সাহায্যেই দিঙ্‌নির্ণয় করিবে—পথ খুঁজিয়া পাইবে; সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত তরণী বন্দরে পৌঁছিবে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে পাশ্চাত্যে বেশী বক্তৃতা দেন নাই,—এ-বিষয়ে 'মদীয় আচার্যদেব' (My Master) তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতা, সেখানে অর্ধেকাংশ বলিয়াছেন জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্বের কথা। শেষদিকে সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া যৎসামান্য মন্তব্য করিয়াছেন। আরেকটি বক্তৃতা ইংলণ্ডে দিয়াছিলেন—সেটির বিস্তৃত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না—তবে তাহার সারাংশ উপরলিখিত বক্তৃতাতেই আছে। মান্দ্রাজ ও কলিকাতার দুইটি বক্তৃতার শেষদিকে কম্পিতকণ্ঠে স্বীয় গুরুদেবের কথা যখন বলিতে শুরু করিয়াছেন, তখন কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেদিন আর কিছু বলা হয় নাই। চিঠিপত্রে অল্পাধিক যাহা

ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা গুরুভক্তি ও ভগবদ্ভক্তির গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম।

শীতের শেষে এমনই এক শুভদিনে মাঘীপূর্ণিমায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত নবগোপাল ঘোষ রামকৃষ্ণপুরে স্বীয় নূতন ভবনে একটি শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি স্থাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণ সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ নগরকীর্তন করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হন এবং মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর পূজা করিয়া ভক্তিভরে যখন প্রণাম করিতেছেন, তখন তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—এ যুগের এক নূতন প্রণামমন্ত্র :

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

বহুদিন যে-ভাব তাঁহার হৃদয়-গোমুখীতে রুদ্ধ হইয়া ছিল, আজ তাহা উৎসারিত হইয়া প্রবাহিত হইল পৃথিবীকে ধন্যপুণ্য করিতে নবতম ভাগীরথীর মতো।

প্রণামমন্ত্রটি অতি সংক্ষিপ্ত, যেন সূত্রাকারে স্বতই রচিত—বেদমন্ত্রের মতো পুরুষ-নিঃশ্বসিত। স্পষ্টই বোঝা যায়—যে-ভাব স্বামীজী বহুদিন প্রকাশ করিতে গিয়াও পারেন নাই বা করেন নাই—আজ তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল দেবাদেশে : আর গোপন নয়, এবার প্রকাশ!

এত সংক্ষিপ্তভাবে এই মহামন্ত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে, ভক্তমন চায়—ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা। কিন্তু ব্যাখ্যা করিতে গেলেই সত্য সীমিত হইয়া যায়। তথাপি মানুষ চেষ্টা করিবে বুঝিবার ও বুঝাইবার; আবার ভয়—এই-পথেই শুরু হয় নূতন করিয়া মতভেদ। তাই বোধ হয়—স্বামীজী ইঙ্গিতমাত্র করিয়া গিয়াছেন, আর বলিয়া গিয়াছেন : বুদ্ধিমান্ বুঝিয়া লও।

'উদ্বোধনে'র প্রথমেই তিনি 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের একটি ব্যাখ্যা দিয়া শুরু করেন। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও সাধনার এবং তাঁহার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই শুভ-সন্ধিক্ষণে আমরা স্বামীজীর সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি :

'বারংবার এই ভারতভূমি মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা, গতপ্রায়, বর্তমান গভীর বিষাদ-রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা ইতঃপূর্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।...

এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব-যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব-যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম-প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ!—হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর!

হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গতরাত্রি পুনর্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া লও!'

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সঙ্ঘগুরু ও অন্যান্য প্রাচীন সন্ন্যাসীদের শুভেচ্ছা এবং বহু মানুষের ভালবাসা মাথায় নিয়ে আমি সম্প্রতি ইওরোপ ঘুরে এসেছি। এই আমার প্রথম ইওরোপ-যাত্রা। এর আগে দু-একবার সুযোগ এসেছে, কিন্তু যাওয়া হয়নি। এই যে এবার আমি গেলাম, এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা হচ্ছে এই যে, কিছুদিন আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি একটি আমন্ত্রণ পাই। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অক্সফোর্ডের ওরিয়েন্টাল ইন্সটি-ট্যুটের স্প্যালডিং প্রফেসর'। ভদ্রলোক একজন ভারতীয়, বাঙালী—নাম, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। তিনি আমাকে লেখেন: 'আপনি যদি এখানে এসে বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু বলেন, তাহলে আমরা খুব খুশী হবো।' বেদান্তের একটা বিশেষ দিক নিয়ে বলবার জন্য তিনি আমাকে লেখেন। সেটা হচ্ছে বেদান্তের রহস্যবাদ, অর্থাৎ বেদান্তের ভিতর দিয়ে গিয়ে যে-সব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা মানুষের হয়, সে-সম্পর্কে বলতে হবে। আমি তো একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। এ-বিষয়ে বলা বড় শক্ত। যদি নিজের কোন অভিজ্ঞতা থাকত, তাহলে এক-রকম; আবার যদি কারুর নিজের অভিজ্ঞতা থাকেও, সেটা অপরকে বলা বা বোঝানো যায় না। আমি খুব ইতস্ততঃ করছিলাম তখন। তাছাড়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা অন্য দিক থেকেও দেখছিলাম না। এতদূর যাব, খরচপত্র আছে, এখানকার কাজকর্মও আছে। অনেক রকমের অসুবিধে। কাজেই যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে আমার তখন মনে হয়নি।

এর কিছুদিন বাদে পশ্চিম বার্লিন থেকে এক জার্মান ভক্ত লিখে পাঠালেন: 'আপনি যদি এখানে এসে বেদান্ত নিয়ে কিছু বলেন আমাদের কাছে, আমরা খুব খুশী হবো।' এঁকে আমি চিনতাম। কারণ গত 'মহাসম্মেলন' উপলক্ষে ইনি এখানে এসেছিলেন। তার আগেও এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয় ছিল। কিন্তু আমার যাওয়া নিয়ে তখন কোন কথা ওঠেনি। আমি জানতাম যে, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য দেশে যান, এমনকি বার্লিনে এঁদের কাছেও যান। বার্লিন থেকে ওঁরা আমাকে লিখলেন: 'যদি আপনি অক্টোবরের গোড়াতে আসেন, তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়, তখন বেশী শীত হবে না। আমরা এক্ষুণি টিকিটের টাকা পাঠাচ্ছি।' আমি দেখলাম, অক্টোবর মাসটা ইন্সটিট্যুটে পাঠ-টাঠ হয় না, প্রায়ই ছুটি থাকে—বলা যেতে পারে। সে-সময় গেলে আমাদের কাজের কোন অসুবিধে হবে না। অক্টোবরের গোড়াতেই যাব, এ-রকমই ভাবছিলাম। কিন্তু অক্টোবরে আমাদের মঠে সাধু-সম্মেলন হবার কথা ছিল। প্রতি তিনবছর অন্তর মঠে এই সাধু-সম্মেলন হয়। পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ বললেন: 'সাধু-সম্মেলন আসছে—এটা শেষ ক'রে যাও।'

পশ্চিম জার্মানি থেকে আমাকে যিনি টাকা পাঠিয়েছিলেন, তিনি একজন মহিলা—নাম, ইলসে বুশ (Ilse Bush)। মহিলার মেয়ে—আনা বুশ (Anna Bush)—আমাকে আগে থেকে জানত, চিনত। এক-সময় সে কিছুদিন ইন্সটিট্যুটে ছিলও। এখন মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া। মেয়ে মনে ক'রল, তার মা অত্যন্ত কৃপণতা করেছে। তাই সে আবার আমাকে টাকা পাঠালো। তার মা যে টাকা পাঠিয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণ টাকাই সে

পাঠালো। তার মার উপর তার এত রাগ যে, মাকে 'মা' বলবে না, মার নাম হচ্ছে ইলসে (Ilse)। লিখছে: 'ইলসে এত কৃপণ, তোমাকে যে-টাকা পাঠিয়েছে তা যথেষ্ট নয়; আমি তোমাকে তাই আবার টাকা পাঠালাম। অতএব তুমি ভাল-ভাবেই এস।' কিন্তু শুধু যাতায়াতের টাকাই যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্য দেশে যেতে হ'লে পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিরও খুব প্রয়োজন হয়। ওদেশে খুব শীত, ভাল শীতের পোশাক দরকার হয়। আমি গেরুয়া পরেই গিয়েছিলাম, বরাবর গেরুয়া পরেই ছিলাম—কিন্তু সে যথেষ্ট নয়, ভাল পশমের কাপড়-চোপড় দরকার হয়। সেজন্যে অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল। তা এখানকার অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার যা যা দরকার সবই দিলেন; কাজেই দেখলাম যে, সব যোগাযোগ আপনিই হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোন চেষ্টাই করতে হচ্ছে না। তখন আমি অক্সফোর্ডের সেই অধ্যাপককে লিখলাম: 'আমি যাব ঠিক করেছি। এখন আপনি আমাকে জানান যে, আমি আগের বিষয়েই ব'লব অথবা অন্য কোন বিষয়ে ব'লব।' তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন: 'শঙ্করাচার্য আর রামানুজাচার্য—এঁরা দুজনে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার একটা তুলনামূলক আলোচনা আপনি করবেন।' শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী, তিনি অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টি নিয়ে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। রামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তিনি তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আলোতে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি ভাবলাম, এ-ও তো ভারি মুশকিলে পড়া গেল। কারণ জিনিসটা খুব বিতর্কমূলক হয়ে যাবে, 'কচকচানি' যাকে বলি আমরা। এখন সেই কচকচানি কার ভাল লাগবে? কারোরই ভাল লাগবে না। সাধারণভাবে গীতার ব্যাখ্যা করলে ভাল লাগতে পারে। আমি তাঁকে উত্তরে লিখলাম: 'আমার মনে হচ্ছে এটা খুব টেকনিক্যাল ব্যাপার হয়ে যাবে। সাধারণ লোকের পক্ষে এটা কি খুব উপযুক্ত বিষয় হয়েছে?' তিনি লিখে পাঠালেন: 'আপনি ভুলে যাবেন না, অক্সফোর্ডের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের শ্রোতাদের কাছে এমন জিনিসই বলতে হবে, যা খুব বিতর্কমূলক হবে। আর আপনি প্রস্তুত হয়ে আসবেন। এখানে কিন্তু আপনাকে বক্তৃতার পর নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে। সংস্কৃত এখানকার শিক্ষক এবং ছাত্ররা ভালভাবেই জানে, আর এই বিষয় নিয়েই এখানে পড়াশুনো হচ্ছে! কাজেই, আপনাকে ভালভাবে তৈরী হয়ে আসতে হবে এই বিষয়ে বলবার জন্যে।' আমাদের প্রেসিডেন্ট মহারাজও আমাকে বললেন: 'ভালভাবে তৈরী হয়ে যাও।' আরও ভয় পেয়ে যেতে লাগলাম এ-সব শুনে। তখনই বই-টই একটু-আধটু ঘাঁটতে লাগলাম। আমার একটা অভ্যাস আছে, আমি যখনই কিছু বলি, সামনে একটুকরো কাগজে কি-কি ব'লব তা সংক্ষেপে লিখে রাখি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখে পড়ার অভ্যাস আমার আদৌ নেই, আর পড়লে বোধ হয় ভালও লাগে না। কেউ যদি তাঁর বক্তৃতাটা একেবারে পুরোপুরি লিখে পড়েন, লক্ষ্য করেছি, তা শ্রোতাদের কাছে খুব ভাল লাগে না।

পশ্চিম জার্মানি

যাই হোক, আমি এখান থেকে ২৪ অক্টোবর রওনা হয়ে দিল্লী গেলাম। সেখান থেকে তার পরদিন এয়ার ইণ্ডিয়ার একটা জাম্বো বিমানে পশ্চিম জার্মানীর পথে পাড়ি দিলাম। ইন্সটিট্যুটের সব সাধু-ব্রহ্মচারী, কর্মী—সকলের সহযোগিতা, শুভেচ্ছা এবং উৎসাহ আমি কোনদিন ভুলব না। যেন তারাই যাচ্ছে। আমি যেন সাক্ষীগোপাল—ঠেলেঠুলে সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের প্রতিনিধি ক'রে আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমার জন্যে তাদের

চিন্তার অন্ত নেই। আমার মতো অক্ষম কয়জন? আমি নিজের জিনিসপত্র পর্যন্ত নিজে চিনি না। নতুন স্যুটকেশ—স্যুটকেশ খুলতেও জানি না! আজকাল নতুন নতুন সব বেরিয়েছে, নতুন ধরনের চাবি—এগুলোর সাথে আমি আদৌ পরিচিত নই। সে-সব জিনিস নিয়ে রাস্তায় অসুবিধেও হয়েছে আমার। তখন অন্য লোক এসে খুলে-টুলে দিয়েছে। দিল্লীতে প্লেনে ওঠার পর একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল—সবাই জানেন তাঁকে। খুব নামকরা অভিনেতা—তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী)। পরে আরও দু-একজন পরিচিত লোক বেরিয়ে পড়ল। প্লেনে প্রায় আটঘণ্টা একভাবে একজায়গায় বসে থাকতে হয়। মাঝখানে একবার শুধু রোমে প্লেনটা থামে। রোমে যখন প্লেনটা লাগল, তখন সবাই দেখলাম নামছে—পায়চারি ক'রে, পায়ে যে রক্ত জমে গেছে, তা একটু ছাড়াবে। আমিও ভাবলাম, নামব। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ ক'রল—নামা আর হ'ল না। বসে বসে সব দেখছি। একটা মজার ব্যাপার চোখে প'ড়ল। এই প্রথম দেখলাম, সাহেবরা এসে প্লেনের ভিতরে ঝাড়ু দিচ্ছে। যারা ঝাড়ু দিচ্ছে তাদের একটা আলাদা পোশাক আছে। হলুদ রঙের পোশাক। অনেকটা যে-রকম আমরা সাধুরা পরি (অর্থাৎ গেরুয়া) তার কাছাকাছি। তা দেখে বুঝতে হবে, তারা ঝাড়ুদার। আমি লক্ষ্য করছি, তারা কি করে। দেখলাম, ঝাড়ু দেওয়ার দিকে তাদের বিশেষ মন নেই—তাদের নজর হচ্ছে, কোথায় খাবার জিনিস আছে সেদিকে। হাতে ঝাড়ু আছে, আর থলি আছে। থলির মধ্যে পটাপট মাখন, চীজ—যা পাচ্ছে, ঢোকাচ্ছে। আর কেউ নেই সেখানে! প্লেনের লোকদের সঙ্গে ওদের হয়তো বেশ ভাল একটা সম্পর্ক আছে, প্লেনের লোকেরা হয়তো ভেবেছে—আর এইসব জিনিসে আমাদের দরকার নেই, ওরা নিয়ে যাক। যা হোক, আমি দেখছি, ওরা সব পটাপট যা সামনে পাচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে, কেউ কেউ আবার সঙ্গে সঙ্গে খেতেও আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। দেখলাম, মানুষ সব জায়গায় একই রকমের। এ-সব জিনিস পেয়ে যাচ্ছে—একেবারে বিনা পয়সায়! এ-সব ক্ষেত্রে দুর্বলতা স্বাভাবিক। যা হোক, তারা যা নেবার নিয়ে নেমে গেল। রোম থেকে প্লেন ছাড়ল। একেবারে সোজা ফ্রাঙ্কফুর্ট!

ফ্রাঙ্কফুর্ট সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক আমার আগে থেকেই ছিল। সবার মুখে শুনছিলাম: 'সে বিরাট ব্যাপার, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না—কত বড়। একটা শহর বলতে পারেন।' সেটা অবশ্যি সত্যিকথা। ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টকে পুরোপুরি একটা শহর বলেই মনে হবে। তার মধ্যে হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা। একটু ভয় ভয় ক'রে নামছিলাম। তারপরে ভাবলাম, যা হয় হবে। অসুবিধে হ'ল কি—আমার সঙ্গে একটা অ্যাটাচি কেস ছিল, রোমে আসবার আগেই কিভাবে সেটা খুলে গেছিল। চাবি-তালা সব খুলে গেছে, এমনকি ডালাটাও—ফলে তার ভিতরে কাগজপত্র টিকেট ইত্যাদি যা ছিল—সব পড়ে যাচ্ছে। আমি সেটা কি ক'রে নিয়ে যাব? তা প্লেনে আমার পাশে উড়িষ্যার একটি মেয়ে ছিল—অল্পবয়সী; তার বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। স্বামীর কাছে যাচ্ছে আফ্রিকার কোন শহরে; অল্প অল্প বাংলা জানে। তাকে বললাম: 'আমাকে একটা সরু দড়ি দিতে পারো, এটা একটু বাঁধব?' সে কোথা থেকে খুঁজে একটা সরু দড়ি দিল। তার মন ভয়ানক খারাপ, একা একা যাচ্ছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে আমি নেমে গেলাম। নামবার সময় দু-একজনকে আমি বললাম, একটু দেখবেন এঁকে আপনারা। যা হোক, সে যে দড়ি দিয়েছিল তা

দিয়ে এ্যাটাচি কেসটা তো কোনরকমে বাঁধলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে নেমে সেই অবস্থায় সেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বাঁধা ভাল হয়নি—দু-একটা কাগজ তা থেকে পড়ে যাচ্ছে। পিছন থেকে একজন বললেন: 'স্বামীজী, আপনার কাগজ পড়ে যাচ্ছে।' দেখলাম, সেই ভদ্রলোক আমার জানাশোনা। একটি মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। তিনি বললেন, 'আমি আপনার সমস্ত জিনিস নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে কিছু করতে হবে না।' আসলে আমার অসুবিধে হচ্ছিল, গায়ে একটা ওভারকোট ছিল, সেটার জন্যেই। সেই ওভারকোটের ভারই আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারি না। একটা সামলাতে গিয়ে আরেকটা বেসামাল হয়ে যায়। আমি বেশ বুঝলাম, কেন ওদেশে গিয়ে আমাদের স্বামীজীরা ওদেশের পোশাক পরেন! আমার ঐ অবস্থা দেখেই বোধ হয় সেই মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের দয়া হ'ল। তিনি আমার সব কিছু বয়ে-টয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর আবার প্লেন আরেক দিকে, তিনি চলে গেলেন। আমাদের দেশে যেমন প্লেনটা এক-জায়গায় এসে নামে, তারপরে বাসে ক'রে অথবা হেঁটে এয়ারপোর্টে যেতে হয়—ওখানে কিন্তু সে-রকম না। ওখানে প্লেনটা এসে এয়ারপোর্টের গায়ে একেবারে মিশে যায়। প্লেন থেকে নেমেই আপনি একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়বেন। সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে এখন আপনি হেঁটে যান। সুড়ঙ্গ মানে অন্ধকার না—আলোয় ঝলমল করছে। আর তার জায়গায় জায়গায় দেয়ালে লেখা আছে কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে। তবে অনেকটা হাঁটতে হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রায় তিন-মাইলের মতো হাঁটতে হয়। যেখানে এ-রকম অনেকটা হাঁটতে হয়, সেখানে 'কনভেয়ার বেল্ট' আছে। কনভেয়ার বেল্ট হচ্ছে, রবারের। আমাদের এখানে যেমন সম্পূর্ণটাই মেঝে, ওখানে মেঝে না—রবার দেওয়া আছে। তার ওপর হাঁটলে শব্দ হয় না। কনভেয়ার বেল্ট অর্থাৎ রবারটা চলছে। তার ওপরে উঠে দাঁড়াতে হবে। তখন সেটা আপনাকে নিয়ে যাবে, আপনাকে আর হাঁটতে হবে না। যতদূর ওটা যাচ্ছে, আপনি যেতে পারবেন। তাছাড়া এসক্যালেটার আছে, লিফট নেই। এসক্যালেটার অর্থাৎ চলমান সিঁড়ি। সিঁড়িগুলোই চলছে। এখন আমাকে একজন বলে দিল: 'আপনার কাপড় যেন ওর মধ্যে জড়িয়ে না যায় তাহলে বিষম বিপদ! আর কনভেয়ার বেল্ট, সেটার একটা গতি আছে—উঠলে পরে প্রথমেই একটা ঝাঁকুনি লাগে। সেটাও একটু খেয়াল রাখবেন।' আমাকে দু-চারজন বারণ করেছিলেন: 'আপনি ওসবের ভিতর দিয়ে যাবেন না, সিঁড়ি দিয়ে হেঁটেই যাবেন।' আমার মনে মনে একটু অভিমানই হ'ল—সবাই পারলে আমি পারব না কেন? কনভেয়ার বেল্টেই যাব, এসক্যালেটারেই যাব। যাই হোক, তা-ই করলাম, দেখলাম কোন অসুবিধে হয়নি। দু-চারবার যাতায়াত করলেই অভ্যাস হয়ে যায়।

[ক্রমশঃ]

রামকৃষ্ণবন্দনাপঞ্চকম্

শ্রীবিধুভূষণভট্টাচার্যবিরচিতম্

অতুলনমহিমানং ত্যক্তসর্বাভিমানম্
গুণগণগরিমাণং সর্বধর্মপ্রমাণম্।
বিবুধবিহিতমানং বেদতন্ত্রাদিগানম্
বিগলিতভবতৃষ্ণং রামকৃষ্ণং প্রবন্দে ॥ ১ ॥

পরমগুরুমসঙ্গং ত্যক্তসঙ্গৈকসঙ্গম্
ধৃতচরমসমাধি-ভ্রান্তিবীজপ্রভঙ্গম্।
কৃতপরিণয়রঙ্গং শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিতাঙ্গম্
বিগলিতভবতৃষ্ণং রামকৃষ্ণং প্রবন্দে ॥ ২ ॥

নিরবধিজগদম্বা-পাদপদ্মানুষক্তম্
বিলসিতমিব দেবী-চারুপাদেষ্বলক্তম্।
বিমলনয়নদৃষ্ট্যা দুষ্কৃতাৎ ত্রাতভক্তম্
বিগলিতভবতৃষ্ণং রামকৃষ্ণং প্রবন্দে ॥ ৩ ॥

নিখিলভয়বিরামং বিশ্বচিত্তাভিরামম্
দমিতবিভবকামং সর্বদা গীতরামম্।
বিষয়কথনবামং যোগিলব্ধপ্রকামম্
বিগলিতভবতৃষ্ণং রামকৃষ্ণং প্রবন্দে ॥ ৪ ॥

ত্রিভুবনমণিহারং সর্বদুঃখাপহারম্
সুর-নর-মুনিসারং বিশ্বমুক্তিপ্রসারম্।
কথিতভুবনসম্পদ্‌বাক্যপীযূষধারম্
বিগলিতভবতৃষ্ণং রামকৃষ্ণং প্রবন্দে ॥ ৫ ॥*

---

* মালিনী ছন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৪

দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রগতি

ভক্তগণের গমনাগমন তখন দক্ষিণেশ্বরে লেগেই ছিল। অন্নপূর্ণার রন্ধনশালায় দাক্ষিণ্যের রান্না যখন চ'লত রাতদিন, শ্রীমায়ের মনখানি তখন বিছিয়ে পড়ে থাকত সেই 'ভব-সাগর-তরণ-কারণে'র চারণ-ভূমিতে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বিহার, বিচার, প্রচার, প্রণাম, হাসি, রসিকতা ও নৃত্য করতেন এবং অকস্মাৎ সমাধিস্থ হতেন ও পুনরায় সে-অবস্থা থেকে ব্যুত্থিত হয়ে অপার্থিব সংলাপ করতেন।

ষোড়শী-পূজার মহানিশায় পূজারী ঠাকুর ও পূজিতা দেবী-সারদার সমাধি-অবস্থায় সেদিন যে আধ্যাত্মিক একাত্মিত্ব অনুভূতিতে সিদ্ধ হয়েছিল, সেদিনই তাঁদের উভয়ের পারস্পরিক মর্ম ও কর্ম একে-অন্যে অর্সেছিল। এই অনুভূতির দ্যোতনা শ্রীমায়ের অন্তরের সকল ভাব ও কর্ম-প্রেরণার মূল উৎস হয়ে পড়ায়, তিনি অতি স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরের আত্ম-স্বরূপতা-প্রাপ্তা উত্তরসাধিকায় বিবর্তিতা হয়েছিলেন। এমনটি হ'তে শ্রীমা ঠাকুরের তাগিদের অপেক্ষা রাখেননি —তাঁর নিজের অতিশুদ্ধ অন্তরের অতল স্বামী-প্রেমের প্রেরণাতেই তিনি এমনটি হয়েছিলেন। দৈহিক সম্বন্ধের কোন অবস্তু-গত অজ্ঞান-আড়াল না থাকাতেই শ্রীরামকৃষ্ণে মায়ের এমন তন্ময়তা সম্ভব হয়েছিল, যার সার্থক বর্ণনার ভাষা আমরা পেয়েছি স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত স্তোত্রে: 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা', 'তন্নামশ্রবণপ্রিয়া', 'তদ্ভাবরঞ্জিতাকারা'।

এই আধ্যাত্মিক একাত্মিত্বের অনুভূতি শ্রীঠাকুরের চিন্তাধারাকেও নিগূঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছিল। একবার শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে যেয়ে সাত আট মাস পিত্রালয়ে ছিলেন, সেই সময়ে ভাবের ঘোরে পড়ে গিয়ে ঠাকুরের বাম-হাতের হাড় স্থানচ্যুত হয় এবং তাতে তাঁর খুবই কষ্ট হয়। শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে এসে ঠাকুরের ঘরে কাপড়ের পুঁটলিটি রেখে প্রণাম করা মাত্র ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন: ''কবে রওনা হয়েছ?" জবাবে শ্রীমায়ের কাছ থেকে যখন শুনলেন যে তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়েছেন, ঠাকুর অমনি বললেন: "এই তুমি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়েছ বলে আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাও যাত্রা বদলে এসগে।" শ্রীমা সেদিন ফিরতে চাইলে ঠাকুর বললেন, "আজ থাক, কাল যেও।" পরদিন শ্রীমা যাত্রা বদল করতে দেশে গেলেন।[৫৮] এখানে লক্ষণীয় এই যে, ঠাকুর ঠিক বিশ্বাস করতেন যে, শ্রীমায়ের অশুভক্ষণে যাত্রার ফলে তাঁর নিজের হাত ভেঙেছে। শ্রীমাকে যাত্রা বদল ক'রে আসতে হ'ল। দুই দেহ, এক অস্তিত্ব।

নহবত-পীঠে সাধন-কালেই ঠাকুরের মননের সহিত শ্রীমায়ের এক-মনতা এবং ঠাকুরের প্রাণের সহিত তাঁর এক-প্রাণতা এমন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, উচ্চারিত হবার পূর্বেই শ্রীমা ঠাকুরের ইচ্ছা জানতে পারতেন ও তদনুযায়ী কর্ম নির্বাহ ক'রে রাখতেন।

সারদাপ্রসন্ন ও অন্যান্য বালক ভক্তেরা তাঁদের অতিশুভ পূর্বসংস্কারবশে, অভিভাবকদের শাসনানুশাসন লঙ্ঘন করেই ঠাকুরের দুর্বার প্রেমের টানে তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। দরিদ্রতা ও ততোধিক অভিভাবকদের অসহযোগিতা

৫৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৭৪-৭৫

নিবন্ধন ঘরে ফেরবার পয়সা তাঁদের পকেটে থাকত না। ঠাকুরকে সে পয়সা জোগাতে হ'ত। খেয়ার মাঝিকেই নিজে কড়ি যুগিয়ে যাত্রীকে করতে হ'ত পারাপার। সাতটাকা রোজগেরে ঠাকুরের এমনি ছিল সুদগ্ধ সৌভাগ্য! ঠাকুরের আদেশে শ্রীমায়ের কাছে ফেরবার পয়সা চেয়ে নিতে গিয়ে সারদাপ্রসন্ন দেখতেন যে, অযাচিত দাক্ষিণ্যশোভনা শ্রীমা আগে থেকেই দোর গোড়ায় ভাগের গাড়ীতে যাবার চারটি পয়সা রেখে দিয়েছেন। নরেন্দ্র আসতেই ঠাকুরকে যেই বলতে শোনা গেল, "তুই আজ এখানে থাকবি", শ্রীমা অমনি ছোলার ডাল চড়িয়ে দিয়ে ময়দা ঠেসতে বসতেন। নরেন্দ্র মোটারুটি ছোলার ডাল পছন্দ করেন। ঐ পছন্দের ছন্দে ঈশ্বরের মাতৃভাবটিকে রন্ধনযোগে চালিত ক'রে শ্রীমা ঠাকুরের ইষ্টপথের সহায়িকা ও নিয়ামিকা হচ্ছিলেন বুঝি বা নিজের অজ্ঞাতসারে, স্বামী-প্রেমের একনিষ্ঠতায়। ঝাউতলার পথে মাকে নরেন্দ্রের আহারের ব্যবস্থা করার কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর দেখতেন, সব আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেছে।

ঐটুকু তো ছিল নহবতের ঘরখানি। মহিলা-ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়লে তাঁদের জন্য রাত্রির বাসস্থান ঠিক করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। ঠাকুর তাঁদের বলতেন রোয়াকেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা ক'রে নিতে। কিন্তু তাঁরা নহবতে গিয়ে হর্ষান্বিত হতেন এই দেখে যে, অজিজ্ঞাসিতা শ্রীমা ইতিমধ্যে নহবতের ঐ অল্পপরিসর ঘরেই যে কোন জাদু-বলে রাত্রিযাপনের সুব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন।

এইরূপে শ্রীমা ঠাকুরের যুগধর্মস্থাপনের উপযোগী যে ইষ্টপথ সে-পথে তাঁকে উত্তীর্ণ করার জন্য পরিবেশ-সৃষ্টি, সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা এমন নিবিড়ভাবে ক'রে আসছিলেন যে, তিনি নিজে তাঁর ভাবী কর্মক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতেই এগিয়ে থাকছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের আনন্দের হাটটি যে এত জম-জমাট, অবতারের ঈশ-কর্ম ও ভগবৎ-সন্ধানীদের সাধন-কর্ম যে যুগপৎ এত সুগম হ'তে পেরেছিল, তার কেন্দ্রিক আশয় ছিল শ্রীমায়ের নির্মুক্ত সেবা শক্তি। এই সেবা-শক্তির—যা উত্তরকালে ঈশ্বরের মাতৃস্বরূপে পূর্ণাবিকশিত হয়েছিল বলে শ্রীমা একদিকে ঠাকুরকে বহাল তবিয়তে রাখতেন ও অন্যদিকে ভক্তদের তাঁদের সাধনপথে ব্রতনিষ্ঠ রাখতে ঠাকুরের অভাবনীয় সহযোগিতা করতেন।

তাঁর সহযোগিতা কিন্তু কোন শেখানো গতে চলত না; কারণ এটি ছিল যুগধর্মসংস্থাপনে তাঁর একান্ত নিজস্ব দান, যা অতি স্বাভাবিক ও সাহসিকভাবে তাঁর প্রাণকেন্দ্র থেকে উৎসারিত হ'ত। শ্রীমায়ের ব্যক্তিজীবনের এই যে এক মৌলিক প্রকাশ, এটি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেরই একটি পরিপূরক বিকাশ—কারণ উভয়ে একে-অন্য-থেকে পৃথক্‌কৃতভাবে দর্শিত ও ভাবিত হ'তে চাননি, এই জন্যে যে যুগ্ম-প্রকাশের সমবায়ে যা পূর্ণ, অন্যভাবে তা সম্যক্ বোধগম্য হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীজগদম্বার নিজের হাতের যন্ত্র ঠাকুরের দেহখানির মূল্য শ্রীমায়ের মতো অন্য কেউ জানতেন বলে মনে হয় না। লক্ষণীয় এই যে, ঠাকুরের দেহের সেবার জন্য শ্রীমা এমন এক সহজ উপায় প্রয়োগ করেছিলেন, যা ধর্মানু-শাসনের বেত্রাস্ফালনকে অণুমাত্র তোয়াক্কা ক'রত না, এবং তা অতি নম্রতার সঙ্গে। মা ঠাকুরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যতটা প্রয়োজন ততটা খাওয়াতেন। খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দিহান ঠাকুর কোন সময়ে প্রশ্ন করলে সত্য-মিথ্যা-নিরপেক্ষ অকুণ্ঠভাবে কার্যকরী জবাব দিতে পারতেন, কারণ অন্নপূর্ণার স্বধর্মানুযায়ী, ঠাকুরের

শরীর রক্ষা ও পুষ্টি সাধন ব্যাপারে "খাওয়ার জন্য মিথ্যা বললে দোষ নেই; আমি এই রকম ক'রে ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাওয়াই।"[৫৯] এখানে সেবাকে শ্রীমা যে সত্যের উপরে স্থান দিলেন, এটি তিনি স্বয়ংঅভয়া আপন অভয়ে-স্বাতন্ত্র্যে করলেন, "সত্যধর্মায় গোপ্তয়ে," কারণ তাঁরই তো দেহ রক্ষার জন্য এটি করা, যিনি 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' অবতীর্ণ ও সত্যকর্মরত।

১৫

শ্রীমায়ের 'অপনান'-সাধনা

হিন্দী ভাষায় একটি অতিসুন্দর শব্দ আছে: 'অপনান', অর্থ আপন ক'রে নেওয়া। এই আপন ক'রে নেওয়াতেই সকল মূল-সার ধর্মের ইতিবাচক প্রাণের কথা। অনন্ত বিশ্বের অধীশ্বর কোথা থেকে এসে মানুষ হয়ে ভালবেসে আমাদের আপন ক'রে নেন। আমরা ভগবান্‌কে আমাদের ক্ষুদ্র-হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে আপন ক'রে নিই—আমাদের হৃদয়ের একটুকু ভালবাসা পেলে তাঁর চোখ ছলছল করে, শ্রীমুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভগবানের সন্তানদেরও ভালবাসা দিয়ে আমরা আপন ক'রে নিই। এই তো ধর্ম।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ যোগীর লক্ষণ সম্বন্ধে বললেন: "হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখের ন্যায় অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।"[৬০] এটি অদ্বৈতবেদান্তের দিক থেকে বলা হয়েছে। ভক্তিশাস্ত্রের যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চভাবাশ্রয়ে যে সাধনার উপদেশ, তাও ভগবান্‌কে আপন ক'রে নেওয়ার জন্য। মানুষ যেমন ভগবান্‌কে আপন ক'রে নেওয়ার সাধনা করে, অবতীর্ণ ভগবান্ তেমনি করেন মানুষকে আপন ক'রে নেওয়ার। ঠাকুরের জীবনে আমরা এক অত্যাশ্চর্য 'অপনান'র যুগ্ম সাধন-সিদ্ধি দেখতে পাই। তিনি বহুভাবে সাধন ক'রে এত নিবিড় একান্তভাবে ভগবান্‌কে আপন ক'রে নিলেন যে, শেষে নিজেকেই ভগবান্ বলে আবিষ্কার করলেন। অন্যদিকে নিজের ঈশাত্বিত্বে সমাহিত থেকে জীবনের শেষাংশে মানুষকে আপন ক'রে নেওয়ার অতি-মানুষিক সাধনা করলেন। আসক্তির লেশমাত্র থাকলে এ-আপন ক'রে নেওয়ার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। অনাসক্তি-ভিত্তিক এ-সাধনা গগনচারিণী উদ্দীপন-কারিণী দিব্যরাগিণীর মতো, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, জাগিয়ে-জাগিয়ে ভেসে যায়। সবাই একে জানে নিজের ব'লে। কারণ নিজ অন্তরের নিগূঢ় সত্যটিকে ইনি উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরাই শুধু সার্থকভাবে এ-সাধনা করতে পারেন, যাঁরা আত্মদর্শন করেছেন। পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত আপনা-আপনি স্বার্থ-ক্লিষ্ট ভাবালুতা থেকে, একান্ত শুদ্ধ আধ্যাত্মিক 'অপনান'র আদর্শ ও শৈলী সম্পূর্ণ আলাদা।

শ্রীঠাকুর যেমন হয়েছিলেন মানুষভাবে ভগবান্‌কে আপন ক'রে নেওয়ার অতি-নিজস্ব সাধনাতে সিদ্ধ, তেমনি হয়েছিলেন ভগবদ্-ভাবে মানুষকে আপন ক'রে নেওয়ার সাধনায় সিদ্ধ। "চাঁদা মামা সকল শিশুর মামা" এতে যে শুধু সকল শিশুর আধ্যাত্মিক অধিকার ঘোষিত হয়েছে, তাই নয়, এখানে চাঁদামামার হৃদয়ের আকুতিও ব্যক্ত হয়েছে।

যুগধর্মসংস্থাপনে ও জীবোদ্ধারকার্যে ঠাকুরের স্বভাবজ শৈলী ছিল 'অপনান'। কাশীপুরে জীবন সায়াহ্নে অতি স্বাভাবিকভাবেই যে ঠাকুরের 'অন্তরঙ্গ' বাছাই হ'ল, সেটিও হ'ল আপন করতে / হ'তে পারার তারতম্যের উপর। ঠাকুরের অমৃতকথা আছে:

"যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক

---

৫৯ তদেব, পৃঃ ৯১ ৬০ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ৬।৩২

হয়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখবে না।' 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না ; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না ; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান'—এই বলে নাক সিঁট্‌কে ঘৃণা ক'রো না! তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে,—যত দূর পারো। আর ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দ ভোগ ক'রবে। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্ব-স্বরূপকে দেখতে পাবে।"[৬১]

জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে যাঁরা ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখতে সক্ষম হননি, তাঁরা 'অপনান'র সাধনায় সিদ্ধ হ'তে পারেন না।

[ক্রমশঃ]

৬১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮২, পৃঃ ১৬৪

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

(পূর্বানুবৃত্তি)

পূর্ব সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৮৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭, আষাঢ় ১৩৮৮) বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের সপ্ত মহাগুণের শেষ গুণ 'সৌন্দর্য' পুনরায় স্বয়ং সপ্ত মহাগুণের একটি অভিনব সমন্বয়। তাদের মধ্যে প্রথম মহাগুণ 'মাধুর্য' সম্বন্ধে পূর্বের কয়েকটি সংখ্যায় (আষাঢ়—ভাদ্র ১৩৮৮ এবং অগ্রহায়ণ—পৌষ ১৩৮৮) বলা হয়েছে। এই সংখ্যায় 'সৌন্দর্যে'র অংশীভূত সপ্ত মহাগুণের মধ্যে দ্বিতীয় মহাগুণ 'ঐশ্বর্য' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

ব্রহ্মের ঐশ্বর্য

ব্রহ্মের স্বরূপের আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুটি দিক, অর্থাৎ 'ঐশ্বর্য' ও 'মাধুর্যে'র বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে (শ্রাবণ ১৩৮৬)। বর্তমানে সে-সম্বন্ধে কিছু বিশদতর প্রপঞ্চনা করা হচ্ছে।

ব্রহ্ম বিশেষ ক'রে ঈশ্বরকে সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয় ষড়ৈশ্বর্যশালী বলে ; এবং তাঁর আরেকটি যে সর্বজনজ্ঞাত ও সর্বজনব্যবহৃত নাম 'ভগবান' তারও অর্থ হ'ল এই যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ছয়টি 'ভগ' বা ঐশ্বর্যের সমন্বিত আধার।

এই-প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে সুবিশাল বেদোপনিষদে পরমতত্ত্বকে 'ভগবান' বলা প্রায় দেখাই যায় না—বিশেষ ক'রে উপনিষদ সমূহে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে অবশ্য দু-একস্থানে বলা হয়েছে—

'সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥'

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৩।১১)

'সকল মুখ, মস্তক ও গ্রীবাযুক্ত
সকল ভূতের হৃদয়ে স্থিত।
সর্বব্যাপী তিনি ভগবান্
অতএব সর্বগত শিবরূপে কথিত ॥'

পুনরায়—

'সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো।
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥'

(ঐ, ৫।৪)

'ঊর্ধ্ব, অধঃ সর্বদিক প্রকাশ ক'রে
সূর্য যেমন হয় আলোকিত।
তেমনি সেই বরেণ্য দেব ভগবান্
কারণস্বরূপ পৃথিব্যাদি করেন নিয়মিত ॥'

কিন্তু অন্যত্র প্রায় সর্বত্রই 'ভগবান্' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে সম্মাননীয় জনের উদ্দেশ্যে। যেমন, শিষ্য গুরুকে, পুত্র পিতাকে, অথবা পত্নী পতিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করছেন এইভাবে—'সোঽহং ভগবঃ শোচামি। তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৭।১।৩)

'ভগবন্, আমি শোকমগ্ন। ভগবান্ আমাকে শোকের পরপারে নিয়ে চলুন।' (নারদ গুরু সনৎকুমারকে বলছেন)।

'ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু।'

(ঐ, ৬।৫।৪ ; আরো ৯ বার)।

'ভগবান্ আমাকে পুনরায় বলুন।'
(শ্বেতকেতু পিতা আরুণিকে বলছেন)।

'যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৪।৩)

'ভগবান্ এ বিষয়ে যা জানেন, তা আমাকে বলুন।' (মৈত্রেয়ী পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন)।

এরূপ উদাহরণ প্রচুর।

সে যাহোক, 'ভগবান্' নামটি পরবর্তী ভক্তিবাদী বেদান্তে বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব-বেদান্তে অতি প্রিয় নামরূপে গৃহীত হয়েছে। বলদেবও ছিলেন বৈষ্ণব-বেদান্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। সেজন্য সেই দিক থেকে ষড়ৈশ্বর্যবিমণ্ডিত শ্রীভগবানের বিষয় কিছু চিন্তা করা যেতে পারে, তাঁর 'ঐশ্বর্য' মহাগুণের বিবরণী-প্রসঙ্গে।

সুবিখ্যাত বিষ্ণুপুরাণে 'ভগবান্' শব্দটির প্রত্যেক অক্ষরের ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে সুনিপুণভাবে—

'সম্ভর্তেতি তথা ভর্তা ভ-কারার্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গ-কারার্থস্তথা মুনে ॥'

(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৩)

অর্থাৎ 'ভ-কারে'র দুটি অর্থ—'সম্ভর্তা' বা পোষক ; এবং 'ভর্তা' বা আধার। 'নেতা' শব্দের অর্থ—কর্মজ্ঞানফলপ্রাপক ; অর্থাৎ অপরকে কার্যে পরিচালনা করবার শক্তিবিশিষ্ট।

'গ-কারে'র তিনটি অর্থ—নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। 'গময়িতা' শব্দের অর্থ হ'ল—মহাপ্রলয়-কালে কার্যসমূহকে কারণের অভিমুখে প্রয়োজক। 'স্রষ্টা' শব্দের অর্থ হ'ল—সৃষ্টি-কালে পুনরায় তাদের কারণ থেকে অভিব্যক্ত ক'রে সৃষ্টিকারক।

সুতরাং এস্থলে সমগ্র শ্লোকটির অর্থ হ'ল এই যে, ভগবান্ পোষণকর্তা ও আধার বা আশ্রয় ; কর্মের ফলদাতা এবং সকলকে স্ব স্ব কার্যে প্রয়োজক ; মহাপ্রলয়-কালে, তিনি সৃষ্ট কার্য-সমূহকে স্ব স্ব কারণাভিমুখে চালিত ক'রে সেই সেই কারণে তাদের পুনঃপ্রবেশ ঘটিয়ে এবং বিলীন ক'রে দিয়ে অপ্রকট ক'রে দেন ; পুনরায় সৃষ্টি-কালে সেই সেই কারণ থেকে কার্যসমূহকে বাইরে অভিব্যক্ত ক'রে প্রকটিত করেন।

এইভাবে 'ভ' এবং 'গ'—এই দুটি অক্ষরের মাধ্যমে শ্রীভগবানের প্রায় সকল প্রধান গুণ-

শক্তির কথাই এস্থলে বলা হয়েছে।

তারপরে বিষ্ণুপুরাণে সমগ্র 'ভগ' শব্দটির অর্থ দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥'
(ঐ, ৬।৫।৭৪)

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টির সমষ্টির নাম 'ভগ'।

তারপরে বিষ্ণুপুরাণে 'ভগবান্' শব্দটির তৃতীয় অক্ষর 'ব-কারে'র এরূপ অর্থ দেওয়া হয়েছে—

'বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু ব-কারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥'
(ঐ, ৬।৫।৭৫)

অর্থাৎ সকল ভূতের আত্মা, সকলেরই আত্মা বা সকলেরই অধিষ্ঠান ব্রহ্মে সকল ভূত বা সৃষ্ট পদার্থ বাস করে, সেজন্য তিনি অব্যয় অথবা শাশ্বত—এই হ'ল 'ব-কারে'র অর্থ।

এস্থলে বিশেষ ক'রে ব্রহ্ম যে কেবল সৃষ্টি ও লয়ের কারণ তাই নয়—যে কথা 'ভ' এবং 'গ'র প্রসঙ্গে বলা হ'ল—তিনি সেই সঙ্গে স্থিতিরও কারণ—এই কথা স্বতন্ত্রভাবে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের বা সৃষ্ট জীবজগতের দিক থেকে শ্রীভগবানের যে গুণ-শক্তি আমাদের সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল এই যে, তিনিই একমাত্র জীব-জগৎ-সম্বলিত এই বিশাল বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ। এই কারণেই বিশ্ববিশ্রুত মহর্ষি বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভেই 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (১।১।১) 'এই কারণে এর পরে ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছার উদয় হয়'—এই প্রথম সূত্রের পরেই সেই জিজ্ঞাস্য তত্ত্ব ব্রহ্মের প্রথম লক্ষণরূপে বলা হচ্ছে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' (১।১।২) অর্থাৎ সেই জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম হলেন তিনিই, যাঁর থেকে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম প্রভৃতি, অথবা সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হচ্ছে।

এরূপে বিষ্ণুপুরাণের মতে, 'ভগবান্' শব্দটির তিনটি অক্ষর 'ভ', 'গ' ও 'ব'-এর সমাবেশে আমরা পেলাম সমগ্র শব্দটি 'ভগববান্'—অর্থাৎ যাঁর 'ভ', 'গ' ও 'ব' আছে তিনিই শ্রীভগববান্ অথবা শ্রীভগবান্—এস্থলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারেই 'ব' শব্দটি লুপ্ত হয়ে গিয়ে 'ভগববান্' থেকে 'ভগবান্' শব্দটি পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণে ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের কথা উপরে বলা হ'ল। বিষ্ণুপুরাণে (৬।৫।৭৯) অন্যত্র পুনরায় এই ছয়টি ঐশ্বর্যকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ভক্তিভরে—

'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়গুণৈর্গুণাদিভিঃ॥'

অর্থাৎ হেয়গুণ বিবর্জিত সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র শক্তি, সমগ্র বল, সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য ও সমগ্র তেজ—এই ছয়টিই 'ভগবৎ' শব্দবাচ্য।

এস্থলে 'শক্তি', 'বল', 'বীর্য' ও 'তেজ'—এই চারটি শব্দ সাধারণতঃ সমার্থক বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বৈষ্ণব-বেদান্তে এইগুলির মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদ করা হয়—যে সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

আমরা বলদেবের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা-কালে বারংবার দেখেছি যে, তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী রূপে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানের মাধ্যমে, যুক্তিবিচারের কষ্টিপাথরে ঈশ্বর ও জীব-জগতের মধ্যে সমানভাবে অবশ্যস্বীকার্য 'ভেদ' ও 'অভেদের' সহাবস্থান রক্ষা করতে অসমর্থ হলেও, 'অচিন্ত্য' বলে সেই সমস্যাকে সমাধান করবার প্রচেষ্টা না ক'রে, তা হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলেও—তিনি কেবলমাত্র অন্ধ ভক্তির আবেগে ভেসে যাবার লোকও ছিলেন না। বরং তাঁর মধ্যে ছিল বাঙালীসুলভ প্রখর যুক্তিপ্রবণতা যা শত ভক্তি-

প্রবাহেও ভেসে যায়নি। সেজন্য ভক্তিবাদী হয়েও ঈশ্বরের 'মাধুর্যে'র পাশাপাশি যে তাঁর আরেকটি দিকও আছে, অর্থাৎ তাঁর 'ঐশ্বর্যে'র দিক, তা তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন সমান শ্রদ্ধা-সহকারে। বলদেবের গৌরব এইখানেই।

বস্তুতঃ শ্রীভগবানের মধ্যে একাধারে এরূপ 'ঐশ্বর্য' ও 'মাধুর্যে'র সমন্বয় সমগ্র ভারতীয় দর্শনেরই একটি গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য। তিনি আমাদের অতি নিকটজন, অতি আপনজন, অতি প্রিয়জন নিঃসন্দেহে। অর্থাৎ তিনি আমাদের ভীতির পাত্র নন, প্রীতির পাত্র, নিশ্চয়ই। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি আমাদের ভীতি না থাকলেও নিশ্চয়ই থাকবে শ্রদ্ধা, নিশ্চয়ই থাকবে সম্ভ্রম, নিশ্চয়ই থাকবে সম্মান। কারণ তিনি তো কেবলই আমাদের লীলাখেলার জন নন; সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচালক, তিনি আমাদের উপদেষ্টা, আমাদের দোষশোধক, তিনি আমাদের উন্নতি-বিধায়কও সমভাবে। সেজন্য তিনি 'কঠোরে কোমলে', ঐশ্বর্যে মাধুর্যে, শক্তিতে প্রীতিতে আমাদের সকল প্রয়োজনই মেটাচ্ছেন সমান তৎপরতার সঙ্গে। আমরাও আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনবোধে, বিভিন্ন পরিবেশসাপেক্ষে বিভিন্ন ভাবভাবনাসঞ্চারে তাঁর 'ঐশ্বর্য' ও 'মাধুর্যে'র যে কোনটিকে সময়বিশেষে প্রাধান্য দিতে পারি—ক্ষতি নেই; বরং প্রভূত লাভ, প্রচুর সান্ত্বনা, পরিপূর্ণ আনন্দ, প্রকৃষ্ট শান্তি হবে তাতে আমাদের।

সেজন্য বিশেষভাবে জ্ঞানমূলক, ভাবাবেগহীন গুরুগম্ভীর উপনিষদেও ব্রহ্মের এই দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে স্থিরধীরভাবে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে (ভাদ্র, ১৩৮৭—ঐশ্বর্য; আষাঢ়, ১৩৮৭—মাধুর্য)।

[ক্রমশঃ]

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ

সঙ্কলক : ডক্টর জলধিকুমার সরকার

[পৌষ, ১৩৮৮ সংখ্যার পর]

৬। বৃন্দাবন যখন যাই, পথে রেলে যেতে যেতে দেখি কি ঠাকুর জানালা (রেলগাড়ির) দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছেন, 'কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দেখো যেন না হারায়।'

তাঁর ইষ্ট-কবচটি আমার হাতে ছিল। আমি পূজা করতুম। তারপর উটি মঠে দিলুম। এখন মঠে পূজা হয়। ২।৪৭

৭। জয়রামবাটীতে স্বামী অরূপানন্দ জিজ্ঞাসা করছেন, 'মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে, তুমি কি বল?'

মা—হাঁ, তিনি আমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

'আমার' বলায় অরূপানন্দ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আমি সেভাবে জিজ্ঞাসা করছি না।'

মা—হাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামি-ভাবেও, এমনি ভাবেও। ২।৩

৮। একজন বৃদ্ধা অপর একজনকে যোগ-শাস্ত্রের ষটচক্রভেদ ও বিভিন্ন বীজাদি সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন। গোলাপ-মা বললেন, 'ওসব বীজ-মন্ত্র অমন ক'রে বলতে নেই।' তবু তিনি বলতে লাগলেন। মা ঐ সব কথা শুনতে শুনতে সহাস্যে আমাকে বললেন, 'ঠাকুর নিজহাতে আমাকে কুল-কুণ্ডলিনী, ষটচক্র এঁকে দিয়েছিলেন।'

সেখানে উপস্থিত ভক্ত সরযূবালা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেখানি কই, মা?'

মা—আহা মা, এত যে হবে, তা কি তখন

জানি ? সেখানি কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর পেলুম না। ১।৭৫

৯। সরযূবালা—'থাক্, মা, ঠাকুরের কথা আর একটু বলুন।'

মা—বইয়ে যে লেখে, সব ঠিক হয় না। আমাকে যে ঠাকুর ষোড়শী পূজা করেছিলেন, সে-কথা রামের বইয়ে যা লিখেছে, তা ঠিক হয় নি।

ঘটনাটি ব'লে শেষে বললেন, 'বাড়িতে তো নয়ই—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেখানে গোল বারাণ্ডার কাছে গঙ্গাজলের জালাটি রয়েছে ঐখানে। হৃদয় আয়োজন ক'রে দিয়েছিল। ১।৯১

১০। গোলাপ-মার আমাশয় সারতে তিন মাস লাগবে, ডাক্তার এরূপ বলাতে মা বললেন, "ঠাকুরের অমনি আমের ধাত ছিল। দক্ষিণেশ্বরে এই সময় (বর্ষাকালে) প্রায় আমাশয় হোত। নবতের দিকে লম্বা বারাণ্ডার ধারে একটা কাঠের বাক্স ফুটো ক'রে নীচে সরা পেতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শৌচে যেতেন। আমি সকালেরটা ফেলে আসতুম। বিকেলেরটা ওরা ফেলতো। সেই সময়ে একটি মেয়ে আসে, বললে কাশীতে থাকে। সে প্রদীপের শীষে আঙুল তাতিয়ে প্রত্যহ ঠিক একুশবার ক'রে তাত দিতে মলদ্বারের ফুলো টনটনানি কমে গেল। আমি তখন ভাবতুম—একে আমাশয়, তাতে গরম সেক, বেড়েই বা যায়। কিন্তু বাড়ল না, সেরে গেল। সেই মেয়েটিই আমাকে সে বাড়ি (দক্ষিণেশ্বরে—গ্রামের ভিতরে এখন যেখানে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদার বাড়ি হয়েছে, তার পাশেই শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের জন্য কুঁড়েঘর হয়েছিল) থেকে নবতে নিয়ে এসেছিল; বললে, 'মা, তাঁর এমন অসুখ, আর তুমি এখানে থাকবে ?'...আমি তাঁর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে চ'লে এলুম। কয়েক দিন পরে তিনি একটু সারলে সে মেয়েটি চ'লে গেল। কোথায় গেল আর খোঁজ পেলুম না। তারপর আর দেখা হয় নি। সে আমার বহু উপকার করেছে। কাশী গিয়েও তাঁর খোঁজ করেছিলুম, পাই নি। তাঁর (ঠাকুরের) প্রয়োজনে সব কোথা হ'তে আসত, আবার কোথা চ'লে যেত।" ১।৯৮-৯৯

১১। রাধু (সন্তান হওয়ার পর) "খুব আফিম খাওয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইদানীং মারও শরীর ভাল নয়, মাঝে মাঝে জ্বর হইতেছে। তিনি রাধুর আফিম খাওয়াটা কমাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা লইয়া রাধু সব সময়ে খুব জিদ করে। সেদিন সকালে মা তরকারি কুটিতেছেন। রাধু আফিমের জন্য আসিয়া বসিয়াছে। মা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন, 'রাধি, আর কেন, উঠে দাঁড়া না। তোকে নিয়ে আর পারি নে। তোর জন্যে আমার ধর্মকর্ম সব গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে জোগাই বল্ তো ?' এই সকল মৃদু রোষবাক্য বলাতে রাধু রাগিয়া গিয়া সামনের চুবড়ী হইতে একটা বড় বেগুন লইয়া মায়ের পিঠে জোড়ে ছুঁড়িয়া মারিল। গুম্ করিয়া শব্দ হইতেই দেখি, মা পিঠটা বাঁকাইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটি ফুলিয়া উঠিল। মা ঠাকুরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে বলিতেছেন, 'ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ।' নিজের পায়ের ধূলা লইয়া রাধুর মাথায় দিতেছেন ও বলিতেছেন, 'রাধি, এই শরীরটাকে ঠাকুর কোনদিন একটি শাসনবাক্য বলেন নি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস ! তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায় ? তোদের নিয়ে পড়ে আছি ব'লে তোরা কি মনে করিস বল্ দেখি ?' রাধু তখন কাঁদিয়া ফেলিল। ২।২৪৬-৪৭

[ক্রমশঃ]

ইঙ্কাদের দেশ পেরুতে সাতদিন

শ্রীমতী মুক্তি কর

আমেরিকা বলতে আমরা সাধারণতঃ উত্তর আমেরিকা—বিশেষ ক'রে যুক্তরাষ্ট্রই বুঝি। বস্তুতঃ দক্ষিণ আমেরিকাও একটি বৃহৎ মহাদেশ এবং এর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও কম নয়। তাছাড়া এ-মহাদেশটিও নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং নানা প্রকার মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত, তবে দক্ষিণ আমেরিকায় খুব বেশী লোক যায় না ব'লে এর অনেকটাই আমাদের কাছে সুপরিচিত নয়।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমি এই দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে গিয়েছিলাম---সাতদিনের সফরে। প্রথমে লিমা। যেখান থেকে কুচ্‌কো (Cuzco) ও মাচু-পিচু ব'লে দুটো জায়গাও দেখে এসেছি। এ জায়গাগুলির কথা কিছু আলোচনা ক'রব।

আমার কাছে দেশ দেখা মানে শুধু কয়েকটি নাম-করা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ দেখে আসা নয়, আমার ভাল লাগে সে দেশের মানুষের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে, আর জানতে ইচ্ছে করে ওদের রীতিনীতি, যা ওদের জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশে আছে।

আমাদের আমেরিকা ছেড়ে যাবার আর বেশী-দিন বাকী ছিল না। জুলাই মাসেই আমার স্বামী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে ফিরে আসবেন, তাই তার আগেই এ-দেশটাকে যতটা সম্ভব দেখে যেতে হবে। দক্ষিণ আমেরিকার ইঙ্কা (Inca) সভ্যতার কথা বইয়ে অনেক পড়েছি, এখানে এসে এটা না দেখে গেলে আমার ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই এবারে আমরা একটা চার্টার্ড প্লেনে যাওয়া ঠিক করলাম। এভাবে যাওয়া অনেকটা আমাদের কুণ্ডু স্পেশালে যাবার মতোই। প্রায় ৩০০ যাত্রীকে সুষ্ঠুভাবে সব দেখাবার ভার নিয়ে ওদের যাত্রা। আমাদেরও টাকা দিয়ে নিজেদের দায়দায়িত্ব কমিয়ে নেওয়া হয় এতে। অর্থাৎ হোটেল ঠিক করা, পথ-নির্দেশনার মানচিত্র ঠিক করা, এ-সবের দায় আর আমাদের রইল না। সমষ্টিগত ভ্রমণ আমার জীবনে এই প্রথম। অভিজ্ঞতার খাতায় আমার এটাও একটা সঞ্চয়ের অধ্যায়!

আমেরিকায় দেখেছি সব কাজেই আগে থাকতে পরিকল্পনা (Plan) করাটা প্রথম ও প্রধান। সেটা ভালভাবে ক'রে নিতে তারা যথেষ্ট সময় নেবে, তারপর যন্ত্রচালিতের মতো সব কাজ পরপর সুষ্ঠু-ভাবে হয়ে যায়, পরে আর সময় লাগে না, আর ভুলও হয় না। আমাদের সমস্ত যাত্রাটা, কিভাবে হবে, তার ছক্‌ কেটে কাগজে লিখে প্লেনে ওঠার আগেই সব যাত্রীদের দিয়েছিল।

আমাদের প্লেন রাত ১২॥ টায় নিউইয়র্ক থেকে ছাড়ল। রাত্রির অন্ধকারে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমরা দক্ষিণে যাচ্ছি, তাই শেষ-রাত্রির দিকে দেখলাম, বাঁ-পাশের আকাশে আলো ফুটে উঠল, ধীরে ধীরে বেগুনী হ'ল, তারপর লাল হয়ে সূর্যদেব উঁকি দিলেন—সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

আমরা সকাল ৮॥টায় লিমা বিমানঘাঁটিতে এসে নামলাম। আগেই বলেছি, এদের কাজের ব্যবস্থা খুব সুন্দর। ওদের বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তাতে ক'রে আমরা হোটেলে এলাম। আসবার পথে বাসেই একটি মেয়ে লিমা সম্বন্ধে যাত্রীদের বোঝাল: পেরুকে (Peru) তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি ভাগের নিজস্ব জীবনধারা স্বতন্ত্র। পর্বতভাগ, বনভাগ, ও মরুভূমি। এখানে বছরে মাত্র ১ থেকে ৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। আর এখানকার অ্যাণ্ডীজ (Andes) পর্বতমালা কুমীরের পিঠের মতো। এই পর্বত থেকে নেমে আসা নদী বা ঝরনাগুলি

সমতলভূমিতে ফসল ফলায়। বহু যুগ আগে এই দেশ ইঙ্কা-নামে জাতির আবাসস্থান ছিল। তাদের বহু কীর্তি এখনও বর্তমান। মরুভূমির শুষ্কতার জন্য তারা মৃতদেহ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারত। শুনেছি এদের সোনারূপার কাজ অপূর্ব, পাথরের কাজও দেখার মতো। তাছাড়া আছে নদী ও সমুদ্রের মাছ।

পেরুর রাজধানী লিমা-সহর সমুদ্রের কাছেই। এর যুগ্ম বন্দরসহর ক্যালাও (Callao) সমুদ্রের ওপরে। বর্তমানে অবশ্য লিমা সমুদ্রের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। সহরের মধ্য দিয়ে একটি নদী চলে গেছে, তার নাম রিমাক। আমরা হোটেলে আসবার পথে রিমাক নদীটি দেখলাম।

এরপর বাসের মেয়েটি যাত্রীদের এই অচেনা সহরে চলাফেরা সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিলেন। ট্যাক্সি সম্বন্ধেও সাবধান ক'রে দিলেন—বিদেশী পেয়ে ঠকাতে পারে। আমাদের কিন্তু সে-রকম কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। যাই হোক, এই সহরটির দুটি ভাগ: একটি পুরানো, একটি নতুন। আমাদের হোটেলটি হ'ল পুরানো অঞ্চলে।

মালপত্রগুলি হোটেলে রেখে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম সহর দেখতে। সময় অল্প, তাই যতটা পারা যায় সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এখানকার ভাষা স্প্যানিশ—অল্প জানা থাকলেও তাতে আমার দখল ছিল না। একটা রেঁস্তোরায় গিয়ে কিছুতেই বোঝাতে পারি না, আমরা কি খেতে চাই। রেঁস্তোরার মালিক একজন ভদ্রমহিলা—খুব হাসিখুশি। আকারে ইঙ্গিতে বোঝালাম যে, আমরা ক্ষুধার্ত—ভাল খাবার দিতে হবে। 'Si' 'Si' করতে করতে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। ভাবলাম 'হাঁ' 'হাঁ' তো ক'রল, এখন কি অখাদ্য খেতে দেবে কে জানে! কপাল ভাল ব'লে খাবারগুলি মন্দ ছিল না। খানিক বাদে ওঁর মেয়ে এল, সে কিছু ইংরেজী জানে। মিষ্টি ও চা সে পরিবেশন ক'রল। এমনিভাবে অনেক জায়গাতেই ইংরেজী-জানা দু-একজনকে পেয়ে গিয়েছি। এখানে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত সবাইকেই ইংরেজী বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়। এদের বিশ্ববিদ্যালয় আজও সাধারণের জন্য অবৈতনিক। ওখানকার আদিম অধিবাসীদের কথিত ভাষাকেও লিখিতভাবে চালু করবার প্রচেষ্টা চলছে, যদিও সেটা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সব দেশের মতোই ৪৫০ বৎসর আগে স্পেনদেশের লোকেরা জাহাজে ক'রে এসে স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে দেশ দখল ক'রে নেয়। এইজন্য দক্ষিণ আমেরিকার আর এক নাম—স্প্যানিশ বা ল্যাটিন আমেরিকা। সেইসময় প্রশান্ত মহাসাগরের গায়ে অবস্থিত এই পেরু ইঙ্কা-নামে এক জাতির বাসভূমি ছিল। এরা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আর এক আদিম অধিবাসী আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের (নামেই ইণ্ডিয়ান, কিন্তু আসলে ভারতীয়দের সঙ্গে এদের কোন সংযোগ বা সূত্র ছিল না) সগোত্র। সহজে স্প্যানিশদের কাছে পরাভূত হলেও এদের সভ্যতা কিন্তু বেশ উচ্চস্তরের ছিল, তার কথা পরে বলছি।

আমাদের হোটেলের খুব কাছেই পুরানো সহরের কেন্দ্রস্থল 'Plaza de Armas'; তখনকার দিনে সহরের কেন্দ্রস্থলে এ-রকম একটা চত্বর তৈরি করার রীতি ছিল। এই চত্বরের মাঝখানে থাকত একটি ফোয়ারা, তার চারপাশে রাজপ্রাসাদ, গির্জা, অফিস, বাজার সবকিছু গড়ে উঠত এবং এটাই হ'ত সহরবাসীর মিলনস্থল। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্প্যানিশ যোদ্ধা ফ্রান্সিস্ পিজারো (F. Pizarro) এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁর সঙ্গে মাত্র ১৩ জন যোদ্ধা ছিল। এই কয়েকজনের সাহায্যেই তিনি গোটা দেশটা জয়

করেন। আসল কথা, এই ১৩ জন ছিল উচ্চ পর্যায়ের যোদ্ধা বা সেনানায়ক, বাকী সাধারণ সৈনিক—যদিও সবশুদ্ধ সংখ্যায় তারা মাত্র ২০০ জন ছিল। দেশজয়ের পর এই যোদ্ধারা এবং তাদের পরিবারবর্গ এখানকার শাসক এবং সম্ভ্রান্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের কোন ক্ষমতা ছিল না।

লিমার পুরানো দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সবই প্রায় কাছাকাছি। পায়ে হেঁটেই দেখার সুবিধা। অবশ্য এদের নতুন সহর, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি কিছুদূরে। সেগুলি আমরা বাসে ক'রে গিয়ে দেখেছি। হেঁটে-হেঁটে রাস্তার দু-পাশের পুরানো বাড়িগুলি দেখছিলাম—আমাদের দেশের পুরানো বাড়ির সঙ্গে অনেক মিল আছে। দোতলার কাঠের কারুকার্য-করা ঝুল-বারান্দা আমাদের দেশের মতো। বাড়ীর মাঝখানে দরজা, তার ভেতরে চৌকো উঠান। উঠানের চারপাশে ঘর। এখানকার গীর্জাগুলি খুব সুন্দর। এরা সবাই প্রায় রোমান ক্যাথলিক। একটি গীর্জার সামনে দেখলাম কিছুলোক শুয়ে-শুয়ে আর হাঁটু মুড়ে-মুড়ে গীর্জায় যাচ্ছে। বোধ হয় কোন মানত বা পুজো আছে। এরা গাছপালা শেকড়—এখনও রোগপ্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করে। বাজারে দেখলাম সেগুলি বিক্রি হচ্ছে এবং অনেকে কিনছে। এখানকার লোকেরা দেখতে ভাল, প্রাণখোলা, মিশুক। দেখতাম, আমার শাড়ী ও সিঁদুরের টিপ সকলকে আকর্ষণ করে। রাস্তায় হাঁটার সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'হিন্দী' 'হিন্দী' ব'লে আমার সঙ্গে সঙ্গে চ'লত আর ভারতীয় পয়সা চাইত। দুঃখের বিষয় আমার কাছে একটিও ভারতীয় পয়সা ছিল না। আগে জানলে কিছু নিয়ে যেতাম। একটি ছোট্ট মেয়ে আমার নাক দেখিয়ে ব'লল, আমি তাতে নাকছাবি পরিনি কেন? কোথাও ও বোধ হয় নাকছাবি-পরা ছবি বা মানুষ দেখেছে, তাই ধারণা হয়েছে—সব ভারতীয় মেয়েরাই নাকে গহনা পরে। ভারতীয়ের সংখ্যা এখানে খুব কম। বাজারে একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাঁর কাছে শুনলাম, সমস্ত পেরুতে নাকি মাত্র পঁচিশ ঘর ভারতীয়—তার মধ্যে বেশীর ভাগ ভারতীয় দূতাবাসের।

বিকেলে আমরা একটা বাসে ক'রে সমুদ্রের ধারে গড়ে-ওঠা নতুন সহর ও বাজার দেখতে দেখতে গেলাম। একেবারে ঝক্‌ঝকে সহর। গাছপালাতেও একটু ধুলো নেই। ভাবছিলাম, এখানে বৃষ্টিপাত কম হয়, তবু এরা এত জল কোথায় পায়! শুনলাম নদী থেকেই এরা প্রয়োজনীয় সমস্ত জল সংগ্রহ করে। বর্তমানে অবশ্য লোকসংখ্যা বেড়ে ৪০ লক্ষ হওয়াতে জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

প্রথমে আমরা ৯০০ বৎসরের পুরানো ইঙ্কাদের তৈরি পিরামিড দেখলাম। এটি মাটির তৈরি, অথচ কালের প্রবাহে নষ্ট হয়ে যায়নি, হয়তো বৃষ্টির স্বল্পতা ও শুকনো হাওয়াই এর প্রধান কারণ। তারপর গেলাম মিউজিয়ামে। সেখানে ইঙ্কাদের ও তাদের পূর্ববর্তী লোকেদের তৈরি যে-সব মাটির পাত্র রয়েছে, সেগুলি দেখে মনে হয়—সেইসময় শিল্পের মান অনেক উঁচু ছিল। পাত্রগুলির গায়ে অঙ্কিত চিত্রগুলি এখনও কী সুন্দর! এরপর দেখলাম গোল্ড মিউজিয়াম। এটি একজন ভদ্রলোক—তাঁর সমস্ত জীবনের নিজস্ব সংগ্রহ দিয়ে সাজিয়েছেন। এই সংগ্রহশালাটি দেখে অবাক হলাম। একজন লোকের পক্ষে এতসব সংগ্রহ করা সত্যই দুরূহ কাজ। ইঙ্কাদের সময় সোনা নিশ্চয়ই প্রচুর ছিল, কারণ পোশাক-পরিচ্ছদে, পাদুকায়, ব্যাগে—সবকিছুর ওপর খাঁটি সোনার ও পাথরের অপূর্ব কাজ। তাছাড়া তারা মাথা থেকে হাতের নখ পর্যন্ত নানারকম গহনা দিয়ে মুড়ে রাখত।

সোনা দিয়ে পাত বানিয়ে নখ মুড়ে দেওয়া আগে কখনও শুনিনি। শুধু সোনাই নয়, বহু অস্ত্রশস্ত্রও তিনি সংগ্রহ করেছেন, তাতেও সোনার কাজ রয়েছে। সেইসময়ে মৃত ব্যক্তির দেহকে মাতৃ-গর্ভে যে-ভাবে শিশু থাকে, সে-ভাবে হাঁটু মুড়িয়ে কবর দেওয়া হ'ত এবং সঙ্গে তার গহনা, কার্পেট ও যাবতীয় মূল্যবান্ জিনিসও দিয়ে দিত। এদের ধারণা বা বিশ্বাস ছিল যে, এভাবে সমাধি দিলে মৃতব্যক্তির আত্মা শীঘ্র পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং সে তার জিনিস আবার ফিরে পাবে। যাই হোক, এই সব সমাধি-আবিষ্কর্তারা সমাধিগুলি থেকে বহু পুরানো জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখলাম। ছোট্ট একটি ছেলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সূচীপত্র ঘোষণা করছিল। প্রথমে এখানকার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে আমাদের দেখাল; তারপর গান ও নাচ। ছেলেমেয়ে উভয়েই জমকালো পোশাক পরে নাচল, সঙ্গে বাজল বাঁশী, গীটার, বেহালা, হারব্ ও ড্রাম। দেখে মনে হ'ল—সমস্ত পৃথিবীতে পল্লীগীত ও নৃত্য কোথায় যেন এক সূত্রে বাঁধা। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ওদের এই নাচগান আমার মনকে একটা অপূর্ব আনন্দে ভরে দিল।

পরদিন আমরা কুচ্‌কো গেলাম। লিমা থেকে প্লেনে মাত্র ১॥ ঘণ্টার পথ—পাহাড় পেরিয়ে যেতে হয়। প্লেন থেকে জনবসতি কিছুই দেখা যায় না—শুধু পাহাড় আর পাহাড়। কোন কোন পাহাড়ে বরফও জমে ছিল। কুচ্‌কো ১১ হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়-ঘেরা একটি ছোট্ট সহর। এটি আগে ইঙ্কাদের রাজধানী ছিল। পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঢাকা ব'লে স্থানটি বহিঃ-শত্রু থেকে নিরাপদ, কিন্তু স্প্যানিশদের হাত থেকে এরা নিষ্কৃতি পায়নি। পিজারো একেও অধিকার ক'রে নিলেন এবং তারপর ৩০০ বৎসর ধরে চলেছিল স্প্যানিশদের শাসন। কথিত আছে, পিজারো মাত্র অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এই দুর্গম পর্বতসঙ্কুল পথে লিমা থেকে কুচ্‌কো আসেন। ইঙ্কারা আগে কখনও ঘোড়া দেখেনি। অশ্বারোহীদের দেখে তাই ওদের প্রথম মনে হয়েছিল, বোধ হয় কোন চার-পাওয়ালা দেবতারা এসেছেন। কাজেই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল, পিজারো সোজা ওদের রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়ে ইঙ্কারাজাকে বন্দী করেন এবং বহু ধনরত্ন ও অর্থের বিনিময়ে তার প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সে-সব পাবার পর রাজাকে হত্যা ক'রে দেশের সর্বময় কর্তা হন, এক-রকম বিনা যুদ্ধেই।

সহরটিতে যদিও স্প্যানিশ-ছাপ রয়েছে, তবু ইঙ্কাদের শিল্পের ধ্বংসাবশেষ কম নেই। এখনও ইঙ্কাদের মাটি ও পাথরের তৈরি ভিত ও দেওয়াল শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে অবাক হ'তে হয়। প্রায় প্রতি ৩০০ বৎসর পরপর বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে, কিন্তু তাতেও এগুলি ধ্বংস হয়নি। একটি গীর্জায় দেখেছিলাম কালো রঙের যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি। জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম, সেটা ভূমিকম্পের ত্রাণকর্তা হিসেবে করা হয়েছিল।

১১ হাজার ফুট উঁচুতে এসে অনেকেরই শ্বাসকষ্ট হয়, আমার কিন্তু কিছুই হ'ল না। হোটেলের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম দূরে পাহাড়ের ওপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভেড়া ও লামা চরাচ্ছে। এখানকার সবুজ রঙটি বড় সুন্দর। পশুপালন এদের বড় পেশা, যা আজও বর্তমান। গ্রামের মেয়েরা চাষবাস, সন্তানপালন, গৃহপশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ক'রত। এদের প্রধান কাজ ছিল এই পশুদের লোম ও চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরি করা।

লিমার মতো এখানেও সহরের কেন্দ্রস্থলে

একটি চত্বর (Plaza) ছিল। তার পাশে রাজপ্রাসাদ (এখন সরকারী অফিস), গীর্জা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এখানকার গীর্জাটি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের এবং একটি সুন্দরতম শিল্পের মধ্যে গণ্য। গীর্জার ভেতরের ইঙ্কাদের আঁকা তৈলচিত্রগুলি অপূর্ব। এত বড় সমৃদ্ধ গীর্জা আমি খুব কমই দেখেছি। সহর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে হ'ল Sassayhman, এটি ইঙ্কাদের দুর্গ ছিল। ভূমিকম্পে এর কতক অংশ পড়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে, তাও কম নয়। শত শত টন ওজনের পাথর কী ক'রে এত উঁচুতে পাহাড়ের ওপর আনল, সেটা ভেবে আশ্চর্য হ'তে হয়। তখন, এমন কি গাড়ির চাকাও সৃষ্টি হয়নি। পাথরগুলির কোণাগুলিকে আবার ঘষে ঘষে গোলাকৃতি করা হয়েছে। তারপর একটির ওপর আর একটি বসিয়ে এই বিরাট সৌধশ্রেণী তৈরি ক'রল কী ক'রে, তাও ভাবতে পারি না! দুটি পাথরের মধ্যে কোন কিছু দিয়ে জোড়া দেওয়া নেই, অথচ একটি পাতলা কাগজও তার মধ্য দিয়ে ঢোকানো যায় না। ছোট-বড় পাথরগুলি মনে হয়, অঙ্ক কষে বসিয়ে গিয়েছে। যার ফলে তারা একটি আর একটিকে ঠিক ধরে আছে। এখনকার ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে এই তৈরি-প্রণালী আজও রহস্যাবৃত। কারো কারো ধারণা—এটা অন্য গ্রহের লোকেরা এসে করেছে। অবশ্য এটা শুধুই কল্পনা, কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদের লিখিত কোন পুস্তকও নেই। এমন কি পাথরের গায়েও কোন নিদর্শন নেই। শুধু জানা গেছে এরা কৃষি সম্বন্ধে বোঝাতে হ'লে সবুজ বা নীল রঙ এবং সৈন্য সম্বন্ধে বোঝাতে হ'লে লাল রঙ দিয়ে ছবির আকারে এঁকে বোঝাত। তাও উচ্চ-পদস্থ লোকেদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল।

এর কিছুদূরে টম্বোমাচাই (Tombo Machai) বলে একটা জায়গা আছে। এখানে পাহাড়ের গায়ে ঝরনা, নীচে তার জল বয়ে যাচ্ছে। এদের সূর্যপূজার স্থান এইটি। আর সেই-সময়ে রাজাদের মৃত্যুর পর মৃতদেহের মমি সূর্যের দিকে মুখ ক'রে এই পাহাড়ের গুহায় রাখা হ'ত। স্থানটি অতি মনোরম।

এরপর গেলাম পুকোপুকারা (Puka Pukara) দেখতে। এখানে শুনলাম ইঙ্কাদের সৈন্যঘাঁটি ছিল। এখন অবশ্য সবটাই মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে। এর উল্টোদিকে রয়েছে মানমন্দির। এর থেকে বোঝা যায়, ইঙ্কারা আকাশের গ্রহ-তারকা নিয়ে অনেক চর্চা ক'রত।

এই সহরটি অতি প্রাচীন—এখানে লোক-বসতি বরাবরই ছিল। এখানকার রাস্তাগুলি পাথরে বাঁধানো, সরু সরু গলি, তার দু-পাশের বাড়িগুলি পাথরের খিলান দেওয়া গায়ে-গায়ে লাগানো নীচু অন্ধকার। প্রবেশপথে নীচু কাঠের দরজা ও ছোট ছোট জানালা। এ-সব দেখে আমাদের পুরানো বারাণসীকে মনে পড়ছিল। ইরাকে থাকতে 'আরবিল' ব'লে এইরকম একটি পুরানো সহর দেখেছিলাম। এটি একটি যুগের প্রতীক ব'লে মনে হয়। কুচকোর আবহাওয়া ভাল ব'লে পুরানো সহর তার ঐতিহ্য নিয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছে। আমি এখানকার স্থানীয় এক-রকম পোশাক কিনতে এদের পুরানো বাজারে গিয়েছিলাম। ছোট্ট দরজা দিয়ে মাথা নীচু ক'রে ঢুকতে হয়। তারপর একটা চৌকো উঠান, তার চারপাশে ছোট ছোট ঘর, তারই মধ্যে একটা লম্বা নীচু ঘরে দোকান। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ইরাকের মতো এখানেও দেখলাম—কার্পেট বা পঞ্চো (পোশাক) ইত্যাদি যত পুরানো হবে; তত তার কদর এবং দামও বেশী। কারণ উল পুরানো হ'লে গরম ও মসৃণ হয়, রঙটিও পাকা হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটা প্রকল্প (Restoration Project) এখানে করা হয়েছে। এদের কাজ হচ্ছে, এখানকার পুরানো বাড়ি, ছবি, মূর্তি—এ-সব রক্ষা এবং সংস্কার করা। আমার স্বামী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে আমরা এদের কাজ দেখতে গিয়েছিলাম। ৪।৫ জন অভিজ্ঞ উপদেষ্টা এই কাজে নিযুক্ত আছেন। পুরানো গীর্জা থেকে প্রায় নষ্ট হয়ে-যাওয়া তৈলচিত্রগুলিকে এনে এঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নতুনের মতো ক'রে ফেলছেন, কিছু কিছু নতুন অংশ তৈরিও করতে হচ্ছে, মূর্তির বেলায়ও তাই। এ-কাজের জন্য বহু অর্থ ও সময়ের দরকার। তখনকার দিনে মূর্তি বানাবার প্রণালী কি ছিল, সেটাও আমায় ওঁরা দেখালেন। এ-ছাড়া সোনা, রূপা ও তামার তৈরি জিনিসও এঁরা সংরক্ষণ করছেন। এটা দেখে আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল

এখানকার অধ্যক্ষ আমাদের ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের নির্মিত একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন। তখনকার দিনে মাটির চৌকো চৌকো তাল ক'রে বাড়ি বানান হ'ত এবং তার দেওয়ালে প্লাস্টার দিয়ে সাদা রঙ ক'রে কাঠকয়লা বা প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হ'ত। আমাদের দেশেও অনেক জায়গায় এমনি দেওয়ালে আঁকা দেখেছি। এই বাড়ির দেওয়ালের বিভিন্ন স্তরগুলি দেখে বোঝা যায়, চারযুগ আগে এটি তৈরি হয়েছে। কারণ এর স্তরে স্তরে চারটি যুগের অঙ্কন পাওয়া গেছে। ইউনেস্কো (UNESCO) এবং বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank)-এর সাহায্যে বাড়িটির পুনঃসংস্কার হচ্ছে। এটি শেষ হ'তে আরও তিন-চার বৎসর লাগবে। বাড়িটির কাঠের দরজায় অপূর্ব সূক্ষ্ম কাজ।

কুচ্‌কোর পুরানো সহরটি একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল—সে প্রাচীর এখনও বর্তমান। এই প্রাচীর দেখতে গিয়ে একটা সূর্যমন্দিরও দেখলাম। তার কাছাকাছি একটি বাড়ির নিদর্শন রয়েছে। অনুসন্ধানে জানলাম—ইঙ্কাদের রাজত্বকালে সহরের সুন্দরী মেয়েদের এনে এখানে রাখা হ'ত এবং তাদের সব রকম শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, তখন নারী-স্বাধীনতাও ছিল না। এই মেয়েরা যখন বড় হ'ত, সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে রাজা নিজেই বিয়ে করতেন, অন্য সুন্দরীদের তাঁর কর্মচারীদের পদ অনুযায়ী বিয়ে দিতেন, তারপর বাকীরা সূর্যদেবের মন্দিরের দেবদাসীপদে নিযুক্ত হ'ত। এদের কুটীরশিল্পের মধ্যেও দেখলাম সূর্যদেবের প্রতীক সর্বত্র।

পরদিন আমরা মাচুপিচু গেলাম। 'মাচুপিচু' মানে লুকায়িত স্থান। কুচ্‌কো থেকে ট্রেনে যেতে হয়। সেখানে থাকবার জায়গা নেই ব'লে সকালে গিয়ে বিকেলেই ফিরতে হয়। সবেধন নীলমণি একটি মাত্র হোটেল। সেখানে অবশ্য খাবার ব্যবস্থা আছে, শোবার ব্যবস্থা নেই। খুব ভোরে ট্রেন। এই ট্রেন-ভ্রমণটি বড় সুন্দর। প্রথমে আমরা ১২০০০ ফুট উঁচুতে উঠে আবার ৮৮০০ ফুট নীচে নেমে এলাম। রেল-লাইনের একপাশে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে পাথরের ওপর দিয়ে স্রোতস্বিনী নদী উরুবাম্বা ছুটে চলেছে। এই নদী মাচুপিচু হয়ে অ্যামাজন (Amazon) নদীতে মিশেছে। চারপাশের উঁচু পাহাড় থেকে অসংখ্য ঝরনার জল এসে উরুবাম্বাতে পড়ছে—তাই নদীর আনন্দ যেন আর ধরে না। ট্রেন থেকে দেখছিলাম আর কবিগুরুর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির কথা মনে পড়ছিল। আমাদের ট্রেন যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে।

আমরা বেলা ১১টায় মাচুপিচু পৌঁছলাম। ইয়েল (Yale) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক বিংহাম (Mr. Bingham) ঘুরতে

ঘুরতে হঠাৎ এই স্থানটিকে আবিষ্কার করেন। সেটা বেশীদিনের কথা নয়—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। পর্বতে ঘেরা ইঙ্কাদের এই স্থানটি বাইরের জগতের কাছে হারিয়ে গিয়েছিল।

মাচুপিচু স্টেশনে নেমে আমরা একটি বাসে ক'রে প্রায় ১০০০ ফুট উঁচুতে সেখানকার একমাত্র) হোটেলে গেলাম। প্রথমেই দুপুরের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ইঙ্কাদের সেই আশ্চর্য কীর্তি-দর্শনে।

এটি ৭ম শতাব্দীতে হয়েছিল ব'লে অনুমান। ১০০-তলার সমান কিংবা তারও বেশী উঁচুতে পাথর কেটে এবং দেওয়াল দিয়ে খাড়া পাহাড়ের গায়ে ওরা কী সুন্দরভাবে—বাসস্থান, গোরস্থান, জেলখানা, বাজার, রাজদরবার, মন্দির সবকিছু তৈরি করেছিল, তার নিদর্শন রয়েছে। ওপরে উঠে যাবার সুন্দর সিঁড়ি। ওপরে সূর্যদেবের মন্দির ও উল্টোদিকে চন্দ্রের মন্দির। তাতে বড় বড় জানালা, সামনে বিরাট চত্বর। সমস্ত কিছু ভাল ক'রে দেখতে হ'লে সেখানে কয়েকদিন থাকতে হয়, কিন্তু আমাদের ট্রেন বিকেল ৪টায় ছেড়ে যাবে, তাই দৌড়তে হ'ল। আগেই ইঙ্কাদের দুর্গ বানাবার কথা উল্লেখ করেছি। তবে এই পাহাড়ে-ঘেরা দুর্গম স্থানটি দেখে আশ্চর্য হলাম। আকাশচুম্বী খাড়া পাহাড়ের গায়ে এত বিস্তৃত একটি ছোটখাট সহর তৈরি ক'রে ফেলা কম কৃতিত্ব নয়। সব-কিছু দেখে মনে হয়, সেই-সময়ে এই স্থানটি খুব সম্ভব ইঙ্কাদের তীর্থস্থান ছিল। সামনের পাহাড়টি শিবলিঙ্গের মতো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাদদেশ উরুবাম্বা নদী ঘোড়ার খুরের আকারে বেষ্টন ক'রে আছে। ওপর থেকে দেখলে একটি ছবির মতো মনে হয়। তখন রেল বা কোন যানবাহন ছিল না। পায়ে হেঁটে যাত্রীরা দলে দলে এখানে তীর্থ করতে এসেছে কষ্ট-অর্জিত পুণ্যলাভের জন্যে। সূর্য ও চন্দ্রের মন্দির ও যাত্রীদের থাকার ঘরগুলি দেখলে সেটাই অনুমান হয়। রাজা বা উচ্চকর্মচারীরা যে-সব ঘরে থাকতেন, তার পাথরগুলি খুব মসৃণ। তখন কঠোর শাস্তি দেবার প্রথাও ছিল। একটি পাহাড়ের শেষসীমার কোণায় একটি জায়গা আছে, যেখান থেকে অপরাধীকে গভীর খাতে ফেলে দেওয়া হ'ত। তার নিদর্শনরূপে বহু হাড় ও মাথার খুলি পাওয়া গেছে।

ওপরে একটি সূর্যঘড়িও দেখলাম। তার থেকে মনে হয়, এরা তার সাহায্যে সময় নির্ণয় ক'রত। মাচুপিচুতে পাহাড়ের গায়ে শুধু যে ঘরবাড়িই রয়েছে তা নয়—বড় বড় কুয়ো, যাতে এখনও জল রয়েছে ; ধাপে ধাপে কৃষিক্ষেত্রগুলি সুন্দরভাবে সাজানো এবং জলনিষ্কাশনের চমৎকার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ওপর থেকে নালী কেটে ধাপে ধাপে চৌবাচ্চা করেছিল, তাতে জল সংরক্ষণ করা হ'ত। শৈশবে ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের কথা পড়ে উত্তরকালে ইরাকে সেটা দেখতে গিয়ে দেখলাম, শুধু বালির স্তূপ। কালের প্রবাহে শুধু মাটির নীচে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও কুয়ো ছাড়া প্রায় সবই ধূলিসাৎ হয়েছে। কিন্তু মাচুপিচু এসে যা দেখলাম, তা অভিনব।

আমাদের আজই ফিরে যেতে হবে। তাই বাসে ক'রে রেলস্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। একটি ছোট্ট ছেলে, দেখে মনে হয় কোন মেষ-পালকের ছেলে হবে, খাড়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল এবং আমাদের বাসের আগেই রেলস্টেশনে এসে হাজির। সবাইকে অবাক করেছিল ছেলেটি। ওর এই কৃতিত্বের জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে অনেক পয়সাও রোজগার ক'রে ফেলল।

আমাদের গাড়ী এবার উল্টোদিকে ইঞ্জিন লাগিয়ে ফিরে চ'লল। উরুবাম্বা সমান তালেই নেচে গেয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। তার আর বিরাম নেই। নদীর উল্টোতীরে মাঝে মাঝে দু-একটি বসতি। ট্রেনের শব্দ শুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরে এসে হাত নাড়ছিল। ওদের সুন্দর মুখের হাসি আরও সুন্দর। আমিও হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালাম। ইঙ্কা সভ্যতার নিদর্শনগুলি পেছনে ফেলে এলাম, সঙ্গে রইল তার স্মৃতি।

অপার মহিমা

'বল্লভ'

এ কোন্ জীবন এল এ মলিন ধরার ধূলিতে ?
কেমনে বলিব তাঁরে নিতান্তই নশ্বর মানব ?
ঐশ্বর্যের লেশমাত্র দেখি যাঁর নাহি বাহিরেতে,
সযত্নে লুকানো তাঁর অনির্ণেয় অনন্ত বৈভব।
নাহি চক্র, নাহি ধনু, কোথা তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থরাজি ?
পাণ্ডিত্যের নাহি খ্যাতি, নেতৃত্বের নাহিক সম্মান,
জ্ঞানী, মানী, গুণীজনে ভক্তিপুষ্পে সাজাইল সাজি,
তাঁহার চরণতলে উচ্চ, নীচ—সকলে সমান।
ধর্মভেদ, দেশভেদ, শ্রেণীগত সকল সীমারে
হেলায় লঙ্ঘিয়া তিনি সদানন্দ, সর্বলোকপ্রিয়,
মায়ের সন্তান সবে—পর কেবা এ বিশ্বসংসারে,
তাঁর কাছে সর্বজন ব্রহ্মময়, আত্মার আত্মীয়।
জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ধ্যান—সব যোগে পূর্ণ সিদ্ধি যাঁর—
কোন্ নামে ডাকি তাঁরে, কোথা শেষ তাঁর মহিমার ?

'যমেবৈষ বৃণুতে'

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নররূপে তুমি আসোনি যখন
আর্তধরণী-তলে—
নিবিড় বেদনা গলিয়া ঝরেছে
সবার নয়ন-জলে।
বাড়ালে চরণ যবে করুণার
জ্যোতির দুয়ার খুলি',
প্রেমের জোয়ারে উঠিল শীর্ণ
তটিনী-বক্ষ ছুলি'।
প্রসাদে তোমার বিবেকের বাণী
করিল বিশ্বজয় ;

সকল শাস্ত্র-তত্ত্ব হ'ল যে
শ্রীরামকৃষ্ণময়।
দিকে দিকে তব অভয় শঙ্খ
হয়েছে ধ্বনিত, তবু—
খেলাঘর ভুলি, এত কাছে পেয়ে
চিনিতে পারিনি প্রভু!
আজি বেলা শেষে রাতুলচরণ
লাগিয়া আকুলপ্রাণ ;
অচলা ভক্তি মিলেনা যে কভু,
তুমি না করিলে দান।

শ্রীম-স্মৃতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

'শ্রীম'কে মাত্র তিনবার দেখেছি। প্রথমবার দর্শন হয় বেলুড় মঠে। সম্ভবতঃ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ, ঠাকুরের তিথিপূজায়। শ্বেতশুভ্র সৌম্য মূর্তি! কিছু দূর থেকে দেখলাম, মনে হ'ল এক প্রাচীন ঋষি। একা বসে আছেন একটি কাষ্ঠাসনে; শান্ত ও স্থির। তাঁর নিকটে যাওয়ার সাহস হয়নি।

দ্বিতীয়বারও সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি-পূজায় মঠের সামনে একটি কাঠের বেঞ্চিতে বসে-ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ ছিল, মনে হয়। পিতা সঙ্গেই ছিলেন, তিনি প্রণাম ক'রে ইঙ্গিতে প্রণাম করতে বললেন। গুরুজনপদে যেমন প্রণাম করার প্রথা—তেমনিভাবে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করলাম। তাঁর আয়ত দুই চোখের দিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। ছবিতে তাঁর চোখ দুটি দীর্ঘ তা বোঝা যায়, কিন্তু সে চোখে কী উদার কোমলতা, তা যিনি দেখেননি, তাঁকে বোঝানো যাবে না। পিতার সঙ্গে সামান্য কথা হ'ল—বাণী সুমধুর। শুধু এইটুকু মনে আছে।

তৃতীয়বার যাই মর্টন ইন্সটিট্যুটে। সম্ভবতঃ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। আমার তখন ২৪ বৎসর বয়স। সন্ধ্যা হয় হয়। একটি প্রস্তরফলকে একপাশে লেখা আছে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' ইন্সটিট্যুট। ভয়ে ইতস্ততঃ করছি সিঁড়িতে উঠতে, অপরিচিত আমাকে দেখে বাড়ির লোকে কী ভাববে! এমন সময় একটি যুবক হাতে কিছু নিয়ে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শ্রীম এখানে থাকেন?' তিনি বললেন, 'সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।' গেলাম উঠে—ছাদে। দ্বিতলে শ্রীম ছিলেন। ছাদে দরজার কাছে একটি বেঞ্চি পাতা ছিল। তার একপাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর সামনে একটি আরাম-কেদারা পাতা ছিল। দেখেই বোঝা যায়—শ্রীম সেখানে এসে বসেন। ছাদের একপাশে একটি তক্তপোষ পাতা ছিল। তাতে কয়েকজন বসেছিলেন। আমি সসংকোচে সামনের বেঞ্চির একপাশে বসলাম। পাশে উপবিষ্ট ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে বসতে পারি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

একজন একটি লণ্ঠন এনে আমার বাঁ-পাশে রেখে গেলেন। পরে জেনেছি, তিনি শ্রীম-র এক পুত্র। কিছু পরে শ্রীম সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন। বৃদ্ধ স্থবির ধীরপদে নিজ নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন।

তাঁর ছেলে লাল শালু-মোড়া 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' এনে পিতার হাতে দিলেন। শ্রীম সেই পুস্তক মাথায় ছোঁয়ালেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। তারপর একখণ্ড 'কথামৃত' বার ক'রে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি তো হতভম্ব! চেনা নেই, জানা নেই, হঠাৎ আমাকে কেন? পরক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। শ্রীম-র মেঘমন্দ্র স্বর শুনলাম, "আজ আপনি ভাগবত, আমাদের 'কথামৃত' পাঠ ক'রে শোনাবেন।" হতবাক্ থাকার অবসর নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথা হ'তে পড়া হবে?' পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'যেখান থেকে খুশি।' শ্রীম-র দিকে চেয়ে দেখি, তিনি স্থির নিস্পন্দ ও চক্ষু মুদ্রিত। কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ; ঠাকুরকে স্মরণ ক'রে বই যেখানে খুলে গেল, সেখান থেকেই পড়েছিলাম। নিমেষমাত্র ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, "হে ঠাকুর! এই ঘোর বিপদে তুমি রক্ষা কর! শ্রীম-র সামনে 'কথামৃতপাঠ' আমার পক্ষে ঘোর-পরীক্ষা। প্রভু! তুমিই লজ্জার হাত থেকে রক্ষা কর।"

পাঠ করলাম প্রায় ৪০।৪৫ মিনিট। যখন মনে হ'ল এবার বন্ধ করা যায়, তখন বন্ধ করলাম।

পাঠের সময় বই পড়ায় মনটা দিয়েছিলাম। সমস্ত ঘটনা ও কথাগুলি আমার মানসপটে জীবন্ত ছবি হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে শ্রীম-কে দেখছিলাম। তাঁর দুই চোখে প্রেমাশ্রু-প্রবাহ। এমন অপূর্ব মানুষ, এমন অপূর্ব দৃশ্য আর কখনও দেখিনি এবং এখন জানি, আর দেখবও না।

পাঠ সাঙ্গ হ'ল ; শ্রীম অশ্রু সংবরণ ক'রে শান্ত হলেন। আমি তাঁর পুস্তকখানি তাঁর হাতে দিয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করতেই ইসারায় বারণ করলেন। বললেন, 'আপনি ভাগবত।' তারপর পুস্তকটি যথাস্থানে রেখে শালু জড়িয়ে রাখতে রাখতে আপন মনে ভাবস্থ হয়ে বললেন, 'এটি পঞ্চম বেদ ; এর প্রতিটি কথা মন্ত্র ; মানুষের চৈতন্য হয়, মনের শান্তি আনে, সংসার-জ্বালা জুড়োয়।'

তাঁর পুত্র এসে 'কথামৃত' নিয়ে নেমে গেলেন। একটু পরে একটি পাতার ঠোঙায় দুটি রসগোল্লা ও একটি বোম্বাই আম এনে আমার হাতে দিলেন। শ্রীম ছাদের অপর পাশে জলের 'ট্যাঙ্ক'-এর কাছে গিয়ে পাঁচিল টপকে রাস্তায় পাতা ফেলতে বললেন। আসবার সময় কলের জলে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়ে মুছে এসে বসলাম। তখন নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলেন। পিতার পরিচয় জিজ্ঞেস করেননি। 'কানপুর' শুনেই বললেন, "ও তুমি নেপালের 'ছেলে'?" আমি জানালাম, 'হ্যাঁ।' নেপাল ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীমা'র সন্তান। কানপুরে 'রামকৃষ্ণ মিশন'-শাখা স্থাপন করেছিলেন।

'কানপুর মঠে মাঝে মাঝে যাও?' শ্রীম-র প্রশ্নের উত্তরে জানালাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। নেপাল মহারাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা আছে।'

'আমি আজ যাই' বলে তাঁকে প্রণাম করলাম। মাথায় হাত রেখে তিনি আশীর্বাদ করলেন এবং আবার বললেন, 'তুমি ভাগবত। তোমায় এই কাজই করতে হবে। আবার একবার এস। নিশ্চয়ই এস।' আমি বললাম, 'আচ্ছা।' কিন্তু আর যাওয়া হ'ল না। বাড়ি ফিরে পিতার 'টেলিগ্রাম' পেলাম এবং পরদিন কানপুর রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলাম। অল্পদিন পরে শুনলাম 'শ্রীম' নরদেহে আর নেই।

শ্রীম-র কাছে দেড় ঘণ্টার উপর বসেছিলাম। সেখানে বেলুড় মঠের কোন কোন ব্রহ্মচারী ও বেদান্ত মঠের জনৈক সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীম ছিলেন উভয় মঠের মিলন-ভূমি।

শ্রীম-কে দর্শন করার পর বুঝেছি—শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম কাকে বলে। গ্রন্থ আমাদের কাছে নিষ্প্রাণ পুস্তক মাত্র। তা যে কী পরিমাণ শ্রদ্ধার বস্তু ও তার বিষয়বস্তু কিরূপ ভক্তি ও আদরের সহিত গ্রহণ করতে হয়, তার একটি ধারণা হ'ল, এই দিব্যপুরুষের অবিরল অশ্রুপাত-দর্শনে! এমন ক'রে যিনি ঠাকুরকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর কাছে জীবনে একবার যেতে পেরেছি—তাতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ, ১৩৮৮ সংখ্যায় পৃষ্ঠা ৬০৬, উত্তরার্ধের ২য় পঙ্‌ক্তিতে 'লক্ষ্ণৌ সেবাশ্রমের' স্থলে 'বৃন্দাবন সেবাশ্রমের' হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা

শ্রীশশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত

১

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভক্ত-বৎসল। ভক্তদের সামগ্রিক কল্যাণ তাঁর লক্ষ্য ও চিন্তা হলেও আপামর সাধারণেরই হিতার্থে তাঁর উপদেশ।

কিসে ভক্ত ও শ্রোতাগণ তাঁর উপদেশের মর্মার্থ সঠিক বুঝতে পারে—পারে তাঁর নির্দেশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে, এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তাঁর নানা কথা ও কাহিনী; আর প্রয়োগ করেছেন তাঁর অপরূপ উপমা।

এই বিষয়ে মানব-ত্রাতা খ্রীষ্টদেবের সঙ্গে লোকপাবন পরমহংসদেবের মিল প্রভূত। গল্পেই যে শ্রোতাদের মন সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট হয়—এই অভিজ্ঞতা এই অবতার-দ্বয়ের নিশ্চয় হয়েছিল। তাই দেখি, গল্পের মাধ্যমেই এঁরা দুজন তাঁদের উপদেশ পরিবেশন ক'রে গেছেন। যেমন যীশুখ্রীষ্টের কল্প-কথা (Parables) এবং উপমা উদাহরণ প্রভৃতি অতি চিত্তাকর্ষক, তেমনি পরমহংসদেবের গল্প-গাথা ও উপমাও পরম রমণীয়।

এই উপমাগুলি যেমন সহজ ভাষায় পরিবেশিত, তেমনি প্রাসঙ্গিক উপদেশাবলীও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত। তাই শুধু ভক্ত নয়, সমস্ত শ্রোতার মনেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা-আশ্রিত উপদেশগুলি রেখাপাত করে এত গভীরভাবে।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্মাতার কাছে রসে ও বশে রাখার প্রার্থনা তো বহুজনবিদিত। তাই দেখি, তাঁর কথা যেমন প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট, তেমনি বক্তব্যও সব সময়েই সরস ও সহজবোধ্য।

একদা রবীন্দ্রনাথ রঙ্গ ক'রে বলেছিলেন :

"সহজ কথা বলতে তুমি কহ যে,
সহজ কথা যায় না বলা সহজে।"

তবে এই বিষয়ে কবি নিজে যে উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম, তা তো সকলেরই জানা।—এমনি ব্যতিক্রম তাঁরও আগে আরেক জন ছিলেন, তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু সহজ কথা নয়—শক্ত কথাও অতি সহজবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গতঃ এখানে স্মরণীয় : বরফ ও জলের উপমা দিয়ে কত সহজ কথায় পরমহংসদেব সাকার ও নিরাকার তত্ত্বটি বুঝিয়েছেন।

সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ভাষায় যিনি আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন, নিঃসন্দেহে তিনি অসাধারণ। আর যিনি আপন উপলব্ধ-সত্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লোক কল্যাণে অতি সহজ কথায় বলেন, তিনিই তো লোকপাবন মহা-মানব। অধিকন্তু, মানুষকে তারণ করার জন্য যিনি জগতে অবতীর্ণ—তাঁকেই তো বলে 'অবতার'।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মধ্যে যে-বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম আমাদের হৃদয় ও মন হরণ করে, তা হ'ল তাঁর 'উপমা'। 'উপমা কালিদাসস্য' প্রবাদ-বাক্য হয়ে গেছে। 'উপমা রামকৃষ্ণস্য'ও ওই প্রবাদ-বাক্যের মতোই সত্য ও সুন্দর। এই উপমাগুলি যেমনই স্বতঃস্ফূর্ত ও অবিভ্রান্ত, তেমনি আবার যথাযথ ও অভ্রান্ত।—এগুলি তাঁর নিবিড় ও ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি।

রামকৃষ্ণদেবের উপমাগুলি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই, তাঁর এই পর্যবেক্ষণ-শক্তি দেখে। এও এক পরম বিস্ময়! সংসারে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায়

আমাদের যে-সব সমস্তার সম্মুখীন হ'তে হয়, সেই সব বিষয়েও তাঁর উপদেশ যেমন অসংখ্য, তেমনি মৌলিক। আমরা আলোচনা-প্রসঙ্গে সেগুলি যথাস্থানে উল্লেখ ক'রব, এখানে শুধু এটুকুই বলতে পারি : শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁর চারপাশে যখন যা ঘটেছে সেই সব কিছুই।

আমরা জানি, তাঁর বাল্যকাল কেটেছে পল্লীগ্রামে ; তাই তাঁর উপমায় দেখি পল্লী-চিত্রেরই আধিক্য। প্রসঙ্গতঃ এখানে দু-চারটির উল্লেখ শুধু করতে পারি। যেমন—

(ক) পুত্রের হাত ধরে আলের ওপর দিয়ে গমনরত চাষী।

(খ) হাটে চাষের গরু কেনা।

(গ) ঢেঁকিতে ধান-ভানারতা গ্রাম্যমেয়েরা।

(ঘ) বন-বাদাড়ে দেখা বহুরূপী-গিরগিটি।

(ঙ) চাষীর খাল কেটে জমিতে জল আনার 'রোখ', ইত্যাদি।

আর এদিকে নগর-জীবনের স্বাক্ষরও আছে কিছু উপমায় : যেমন—

(ক) বাড়ীতে গ্যাস চাইলে গ্যাস-কোম্পানির কাছে 'আর্জি' করতে হয়।

(খ) টেলিগ্রাফের তারে ফুটো থাকলে সংবাদ পৌছাবে না।

(গ) ফটো-তোলা-কাচে কালি মাখানো থাকলে, তবেই ছবি ওঠে, ইত্যাদি।

আবার কিছু আছে লোক-চরিত্র সম্বন্ধেও, যেমন—

(ক) হাতে পয়সা হ'লে মানুষের স্বভাব কি রকম পাল্টে যায়।

(খ) কুয়াসাবৃত-ব্যক্তি ভাবে অন্যরা কুয়াসাচ্ছন্ন, শুধু সে বাদ, ইত্যাদি।

আর কিছু তাঁর কবিত্ব ও শিল্পানুভূতির নিদর্শন : যেমন—

(ক) ফুলে ছেয়ে আছে এমন গাছকে এক-একটি 'তোড়া' কল্পনা।

(খ) সন্ন্যাসী-জ্ঞানীকে দাগহীন সাদা বৈ বা মল্লিকা ফুল ভাবা।

(গ) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণীর বিবরণ তো কথাশিল্পীর শিল্প-কৃতি, ইত্যাদি।

যাই হোক, এবার উপমা-প্রসঙ্গে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত 'যোগীর চক্ষু'র কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তিনি বলেছেন :

"যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল ফ্যালে, দেখলেই বোঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তুলনার উর্ধে। অথবা, তাঁর তুলনা তাঁর উল্লিখিত ঐ পাখীটির সঙ্গেই করা যায়। সব সময়ে ঈশ্বরে তাঁর চিত্ত সমর্পিত ও প্রাণমন নিবেদিত, তাই দৃষ্টিও তাঁর ঐ পাখীর মতোই ভাব-বিহ্বল !

কিন্তু এ-রকম যাঁর অবস্থা, তিনি এত দেখতেন কি করে ? এ-প্রশ্ন স্বতই মনে আসে।

আসলে সমাহিতচিত্ত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলেই তাঁর বহির্দৃষ্টি এত স্বচ্ছ, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ, সেইসঙ্গে এত গভীর।

তিনি তো সাধারণ নন, তিনি অনন্যসাধারণ। তিনি শুধু যোগী নন, তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ। তিনি শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ।

আমরা গৃহীরা সাধারণতঃ পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকি। সব সময়ে বাড়ীর দশজনার বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় বিব্রত হই। তাদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই। সহজে সমাধান না পেলে অবশ্য ভগবান্‌কে, তা যে নামেই হোক, স্মরণ করি

"বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা" —কবির এই কথাটি আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক সত্য নয়। কারণ বিপদে পড়েছি বলেই ভগবান্‌কে ডাকছি। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর'—এইটিই তো আমাদের নিত্য প্রার্থনা!

জনৈক ইংরেজ ভক্ত-কবির ভাষায় ভগবানের ইচ্ছা: "If goodness lead him not, yet weariness / May toss him to my breast."

ভগবান্ প্রতিনিয়ত আমাদের তাঁর কাছে চাইছেন; তাই নানাভাবে ডাকছেনও। তবু আমরা সাড়া দিই না! রবীন্দ্রনাথের কথায়:

"তাই তো তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
আমার হৃদয় লাগি,
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।"

আমরা তবু আকৃষ্ট হই না। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে বড় একটা তাঁকে স্মরণও করি না। এই হচ্ছি আমরা—সাধারণেরা!

আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করি আর না করি, তিনি যখন 'জগদ্ধিতায়' অবতীর্ণ হন, তখন তাঁকে আমাদের কল্যাণে যা শ্রেয়ঃ, তার কথা তো বলতেই হবে। আর আমাদেরও যেমন রোগমুক্তি চাইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নির্বাচিত ওষুধটি সেব্য, তেমনি সংসারে শান্তি চাইলে অবতারদের নির্দেশও পালনীয়।

একদা শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক ভক্ত তাঁকে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, সংসারে কি-রকম-ভাবে থাকতে হবে। তার উত্তরে ঠাকুর বলেন:

"সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী-পুত্র, বাপ-মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে, যেন কত আপনার লোক; কিন্তু মনে জানবে, যে তারা তোমার কেউ নয়।"

অতঃপর তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা-স্বরূপ প্রয়োগ করলেন নীচের উপমাটি:

"বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে, মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে, 'আমার রাম, আমার হরি', কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।"

এই উপমাটি শুনতে যেমন মধুর ও উপভোগ্য, এর অন্তর্নিহিত নির্দেশটুকু পালন করা আবার তেমনি শক্ত ও কষ্টসাধ্য।

নিজ সংসারের পরিজনেরা আমাদের কেউ নয় —এ ভাবতে পারা কি সহজ কাজ? আমাদের আপনজন ত্রিভুবনে একজন, যিনি ত্রিভুবন-স্বামী, কি জগন্মাতা, কি অন্তর্যামী, আর যারা নিত্য আমাদের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে, যারা আমাদের প্রতিপাল্য, যাদের নিয়ে আমাদের নিশীথের স্বপ্ন আর কল্পনা, দিবসের চিন্তা আর সাধনা, তারা আমাদের কেউ নয়—এ ভাবতে পারা মোটেই সহজ নয়।

নিরাসক্তভাবে সংসারে জীবনযাপন-প্রসঙ্গে গল্পচ্ছলে একদা শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরিবেশন করলেন নীচের উপমাটি:

"কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো?—আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে। (তেমনি) সংসারে সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।"

আড়ায়-রাখা ডিমে মনটা রেখে কচ্ছপ যেমনটি চলাফেরা করে, আমাদেরও তেমনি ঈশ্বরে সমর্পিত-চিত্ত হয়ে সংসারের কাজকর্ম করতে বলেছেন ঠাকুর। বারে বারে ঘুরে-ফিরে তিনি নানা উপমার মাধ্যমে আমাদের বলেছেন, সংসারে একেবারে জড়িয়ে না পড়ে, খানিকটা নির্লিপ্ত ও নিরাসক্তভাবে যাতে নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম ক'রে

যেতে পারি, তারই আন্তরিক চেষ্টা করতে।

এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করি, তাঁর আরেকটি উপমা : "তেল হাতে মেখে, তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হ'লে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

পরক্ষণেই ব্যাখ্যা করতে করতে প্রয়োগ করলেন আরেকটি উপমা :

"সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি রাখা যায়, তাহলে ভাসে।"

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হ'ল, নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তি-রূপ মাখন লাভ ক'রে মনটি সংসার-জলে ফেলে রাখলেও তা মিশে যাবে না, ভেসেই থাকবে।

অবশ্য এটাও অনস্বীকার্য, দুধকে মাখনে পরিণত করা যায় কয়েকটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেই, কিন্তু মনকে নির্লিপ্ত করা সত্যই সাধন সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রসঙ্গতঃ ঠাকুর বলেছেন : ঈশ্বর দর্শনের পন্থা হ'ল ব্যাকুলতা। সাধক-কবি রামপ্রসাদও গেয়েছেন : 'ডাক দেখি মন ডাকার মতো, কেমন শ্যামা থাকতে পারে ?'

অর্থাৎ এঁদের দুজনেরই কথা—একমাত্র ব্যাকুলভাবে ডাকলেই ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া সম্ভব। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেছেন, এই যে ব্যাকুলতা, তা কি রকম ? না, জলে ডুবন্ত লোকের বাঁচবার তাগিদে একটু বাতাসের জন্য যে আকুলি-বিকুলি-ভাব, তেমনি ব্যাকুলতাই চাই।

এই 'ব্যাকুলতা' বোঝাবার জন্য আবার একটি উপমার আশ্রয় নিলেন। বললেন :

"তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।"

এই যে তিন টানের কথা বলেছেন ঠাকুর, এ-সম্পর্কে প্রায় সবারই কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তবে অন্য দুটি টানের চাইতে সন্তানের উপর মায়ের টান যে গভীর, অর্থাৎ টান বা আকর্ষণের মধ্যে তীব্রতম, তা তো সর্বজনবিদিত।

জীব-জগতে মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও সর্বত্র এই স্নেহের প্রকাশ এবং মায়া-মমতার অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। এমন যে হিংস্র বাঘিনী, তার শাবক-স্নেহও মাতৃস্নেহের সুন্দর অভিব্যক্তি। আর নিজ বৎসতরীর জন্য গাভী-মাতার মমতা ও উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ তো নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা।

মনুষ্যজগতেও একই চিত্র! সন্তানের প্রতি জননীর আকর্ষণ তো শাশ্বত সত্য। কারো মা ধনী বা নির্ধন, বিদুষী বা নিরক্ষরা, মহিমময়ী বা মান-বিহীনা হন না কেন, তাঁর অপত্য-স্নেহে কোন খাদ নেই।

বিস্ময়ের কথা হ'ল : এই-রকম মায়ের টানেও ভগবদ্দর্শন হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, আরও দু-রকম টান এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই।

তাহলে আমরা, যারা শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায় 'পিঁপড়ের সার'—তাদের ভরসা কোথায় ? ভরসা অবশ্যই আছে, ইঙ্গিত দিয়েছেন লোকপাবন পরমহংসদেব। তাঁর কথা হ'ল : "কিছু না পারো, ভক্তিভরে দুটো প্রণাম করবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যেমন অভয়-বাণী দিয়ে গেছেন : 'হরের্নামৈব কেবলম্'। শুধু হরিনাম নিলেই হবে। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শুধু অন্তরের ভক্তি-প্রণামটি নিবেদন করলেই হবে।

মনে হয়, ঠাকুরের উপদেশের ব্যঞ্জনাটি হ'ল : প্রণাম বা প্রার্থনা করতে গেলে বিবেকবান্ ও শ্রদ্ধাবান্ মানুষের আত্ম-জিজ্ঞাসা আসবেই : বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে উপবেশনেচ্ছু সেই রাজার মতো, 'আচ্ছা, আমি কি যথোচিত নিষ্ঠায় এবং সুগভীর ভক্তিতে আমার প্রণামটি নিবেদন করছি?'

আর এই স্বগতোক্তির ভেতর দিয়ে অনুতাপের অশ্রুজলে আসবে আত্ম-শুদ্ধির প্রচেষ্টা ও প্রার্থনায় আন্তরিকতা। আর এই নিত্য প্রণাম নিবেদন যদি কোন অশুভ কামনার সঙ্গে যুক্ত না হয়, তবে নিশ্চয় ক্রমোন্নতি হবে।

প্রণাম দিয়ে শুরু হলেও প্রাণ-মন সমর্পণের পথে তার অগ্রগতি অবধারিত, মনে হয়, এই হ'ল করুণাঘন ঠাকুরের আশ্বাস-বাণীর মর্মকথা।

সমালোচনা

হরিশ্চন্দ্র—বনফুল। **প্রকাশক :** শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৮।এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। (১৩৮৬), পৃঃ ১৩০+৪, দাম : দশ টাকা।

বনফুল—সরিৎশেখর মজুমদার। **প্রকাশক :** শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৮।এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। পৃঃ ৯৪+৪+৬, দাম : নয় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থদুটির প্রথমটি এ-পর্যন্ত-জানা বনফুলের শেষ উপন্যাস। দ্বিতীয়টি বাংলা-সাহিত্যে বনফুলের প্রথম জীবনী, খুব নতুন ধরনের জীবনী—অন্য কোন সাহিত্যে এ ধরনের জীবনী আছে বলে জানি না। বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর রচনাবৈচিত্র্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত বনফুলের এই জীবনীটি তাঁদের অভিনন্দন লাভ করবে।

উপন্যাস 'হরিশ্চন্দ্র' ঐ নামের এক গ্রামের জমিদারের বিষয়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় আত্মোৎসর্গের বিচিত্র কাহিনী। হরিশ্চন্দ্রের শেষ চিঠি-অনুসারে—"তারা দরিদ্র, তারা অসহায়, তাদের নানারকম দোষ আছে।...তবু তাদেরই আমি ভালবাসি, কারণ তারা বড় অসহায়, অথচ তারাই আমাদের দেশের লোক। আমি তাদের মঙ্গলের জন্যই এতদিন চেষ্টা করেছি, পারিনি, কারণ আমি বিলাসের মধ্যে ছিলাম, তাই তাদের সম্মান পেয়েছি, ভালবাসা পাইনি। সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে তাই তাদের কাছেই চললাম।" একটু বেশী আদর্শবাদ শোনাচ্ছে হয়তো, সুখের বিষয় এমন আদর্শবাদীদের দেখা আজকের দুর্দিনেও এদেশে মেলে। হয়তো এই সর্বত্যাগের আদর্শই 'হরিশ্চন্দ্র'-নামকরণের প্রেরণা।

কিন্তু সব মিলিয়ে উপন্যাসটি প্রায় নবযুগের রূপকথায় পরিণত। নানা চরিত্রের মিছিলে সর্বত্রই কেমন এক ইচ্ছাপূরণের প্রভাব। মৃগমটর গ্রামের হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁর বন্ধু আত্মভোলা শিল্পী (সেইসঙ্গে কেম্‌ব্রিজের এম.এ) উপানন্দ—পাশাপাশি গ্রামের দুই জমিদার। উপানন্দের দেখাশুনা হরিশ্চন্দ্রই করেন। অবিবাহিত দুই বন্ধুর অভিভাবিকা 'মা'—হরিশ্চন্দ্রের সম্পর্কিত মাসীমা। গ্রামপালিত হরিশ্চন্দ্রের জীবনে প্রতিযোগিতা যন্ত্রযুগের সঙ্গে। মূলতঃ কৃত্রিম যন্ত্রযুগ ও স্বভাবসুন্দর পল্লীজীবনধারার দ্বন্দ্ব এ উপন্যাসের পটভূমিতে। এ উপন্যাসে হরিশ্চন্দ্রের প্রায় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত জীবনযাত্রার অন্তরালে সুগভীর দেশপ্রেম মাঝে মাঝে দেশ-জননীরূপে স্বপ্ন হয়ে ওঠে। গল্পকথা কখন নীতি-কথায় পরিণত হয়ে যায়। উপন্যাসের শেষপ্রান্তে রূপকথার কন্যার মতো হরিশ্চন্দ্রের ভাইঝির আবির্ভাব। বন্ধু উপানন্দের সঙ্গে এই সঙ্গীতনিপুণা ভাইঝির বিয়ে দিয়ে প্রজাবৎসল হরিশ্চন্দ্র প্রজাদের

সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাবার জন্য গৃহত্যাগী হলেন। এরই পাশাপাশি ডক্টর সোম ও লিসার কাহিনী বিচিত্র হলেও অনেকটা বাস্তব। গল্পের জাল-বোনায় বনফুলের দক্ষতা যে শেষ অবধি অটুট ছিল, 'হরিশ্চন্দ্র'-উপন্যাসে তার প্রমাণ আছে। আবার কাহিনী যখন আদর্শবাদের আতিশয্যে ঢাকা পড়ে যায়, তখন উপন্যাস হিসাবে যে দুর্বলতা দেখা দেয়, তারও উদাহরণ এ উপন্যাসে মেলে। তারাশংকরের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'-র প্রথম রূপের সঙ্গে পরবর্তী রূপের পার্থক্য এ-জাতীয় আদর্শবাদের প্রভাবের আর এক উদাহরণ। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম যুগের লেখা আর শেষ যুগের লেখায় শিল্পগুণের পার্থক্যও এই কারণে। সুবোধ ঘোষের গল্প-উপন্যাসও শেষের দিকে গান্ধীবাদের অতিরিক্ত প্রভাবে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

যা জীবনে আছে, আর যা আমরা হ'তে চাই—এ দুয়ের সমন্বয় ঘটানো দুর্লভ কথা-শিল্পীর কাজ। 'বনফুল' তাঁর 'নির্মোক', 'হাটে বাজারে', 'অগ্নীশ্বর' প্রভৃতি রচনায় যে আদর্শবাদের নিহিতরূপ অসামান্য শিল্পগুণে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন, 'হরিশ্চন্দ্রে' তা প্রকট। তবু গল্পহিসাবে এ উপন্যাসের কাহিনীও পাঠককে আকৃষ্ট ক'রে রাখে। এমন কথাকোবিদ আমাদের সাহিত্যে আজ দুর্লভ।

অপরপক্ষে বনফুলেরই বিভিন্ন রচনাংশ চয়ন ক'রে বনফুলের সমগ্র জীবনকথা আভাসে সাজিয়ে দিয়েছেন সরিৎশেখরবাবু। এ যেন একসঙ্গে বনফুলের জীবনচর্চা এবং সাহিত্যসমালোচনা। অল্পপরিসরে এই শ্রদ্ধাঞ্জলির নৈপুণ্য তারিফ করার মতো।

বনফুল 'পশ্চাৎপট' নামে তাঁর আত্মকথায় যা লিখেছেন, তার চেয়ে তাঁর গল্পে-কবিতায়-নাটকে-উপন্যাসে আপন পরিচয় কম দেননি। তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই কালজয়ী মহিমা মৃত্যুর স্পর্শ-সত্ত্বেও অম্লান ভাস্বর। সরিৎশেখরের 'বনফুল' সে-কথা আমাদের বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে।

বই দুটির প্রচ্ছদ ও গ্রন্থন-পারিপাট্য সুরুচির পরিচায়ক। দাম আরো কম হ'লে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হ'ত। **ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

ব্যক্তি বনাম ব্যক্তিত্ব—গান্ধীজী ও নেতাজী—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়, ২৯১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। (১৯৭৮), পৃ: ৮+২৮০, মূল্য: ষোল টাকা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুই প্রধান পুরুষ মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বসু। এই সংগ্রামের ইতিহাসের কিঞ্চিদধিক দুই দশক কাল (১৯২১-৪৫) মুখ্যতঃ নিয়ন্ত্রণ করেছেন উক্ত দুই জননেতা। উভয়েই রেখে গিয়েছেন কর্মোদ্যম, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, সততা এবং আত্মত্যাগের প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অবশ্যই পার্থক্য ছিল, যে-কারণে আন্দোলনের নানা পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য দেখা গিয়েছে। কখন কখন তা আন্দোলনের শরিকদের সংহতিও ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উক্ত দুই মহান্ নেতা যে ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেছেন, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

দুঃখের বিষয়, দেশবাসীদের অনেকে ওঁদের মতভেদের দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে ওঁদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিকৃত দৃষ্টিতে বিচার ক'রে থাকেন। ওঁদের কার্যধারার মূল্যায়নেও প্রায়শ: বস্তুনিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান গ্রন্থের লেখক প্রস্তাবনায় বলেছেন: 'পূর্ণাঙ্গ কোন বইতে তাঁদের (মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের) সম্পর্ককে ইতিহাসের আলোকে তুলে ধরবার চেষ্টা আজও আমার চোখে পড়েনি। এই রকম এক অভাব আর

বেদনাবোধই আমার এই গ্রন্থরচনার উৎস।' অর্থাৎ গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ককে ঘিরে জনমানসে যে-বিভ্রান্তি এখনও কতকটা রয়েছে, তার অবসান ঘটানোই লেখকের লক্ষ্য। বর্তমান গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলনের উত্তালকালের ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে বিবৃত করা হয়েছে। সেই ইতিহাসের আলোকে লেখক উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন ঐ দুই মহান্ পুরুষের সম্পর্কের সত্য রূপটি। তাঁর সেই প্রয়াস বহুলাংশে সফল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ যে-কথা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা যায়, 'বইটি সেই সময়কার প্রকৃত তথ্যসমূহ প্রকাশ' করেছে, 'যার ফলে (অনেকের মন থেকে) অনেক ভুলের নিরাকরণ হবে'। শ্রীনারায়ণ বলেছেন: মহাত্মাজী ও সুভাষচন্দ্র 'আমাদের দুটি জিনিস শিখিয়েছেন—দেশের নিঃস্বার্থ সেবা করা এবং নিজের মতের জন্য আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত থাকা।' বইটি পড়ে এই সত্যটি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

'ব্যক্তি বনাম ব্যক্তিত্ব' আমাদের নতুন ক'রে চিনিয়ে দেয় গান্ধীজীকে, যিনি দেশের নির্জীব চিত্তে অকস্মাৎ প্রাণশক্তি এনে দিয়েছিলেন, যাঁর চরিত্রের মধ্যে 'প্রবল নৈতিক শক্তি' অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কোন কোন ক্ষেত্রে মতের অনৈক্য সত্ত্বেও কবি যাঁর প্রতি শ্রদ্ধানত হ'তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। আমরা চিনে নিতে পারি দুঃখজয়ী সুভাষচন্দ্রকেও, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'দেশনায়ক' রূপে বরণ ক'রে নিয়ে একদা (১৯৩৯) বলেছিলেন: 'আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তার মধ্যে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।...পেয়েছি তোমার প্রাণশক্তির প্রমাণ।...দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান।'

গ্রন্থটির একটি বিশেষ ত্রুটি: মুদ্রণ-প্রমাদ। বস্তুতঃ ছাপার ভুলে বইটি কণ্টকিত। ফলে পদে পদে পাঠককে অস্বস্তি বোধ করতে হয়। বানান ভুলের দৃষ্টান্ত অনেক, সেগুলি আর আলাদা ক'রে উল্লেখ করা হ'ল না। এক জায়গায় তারিখেরও ভুল দেখা গেল। বইয়ের শেষদিকে (পৃঃ ২৬২) সুভাষচন্দ্রের 'হারিয়ে যাওয়ার দিন' হিসাবে ১৭ আগস্ট ১৯৪৪ বলা হয়েছে—সনটি অবশ্যই হবে ১৯৪৫। আশা করা যায়, পরবর্তী সংস্করণে প্রুফ পড়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে।

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ২৪শে জানুআরি ১৯৮২, রবিবার বেলা ৩-৩০ ঘটিকায় বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭২তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ সভায় পঠিত ১৯৮০-৮১ সালের কার্য-বিবরণীতে বলা হয় যে, বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মঠ ও মিশনের ত্যাগী কর্মিবৃন্দ তাঁহাদের সেবাদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া দৃঢ়তার সহিত মিশনের বহুমুখী সেবাব্রত এবং বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়-বিধ্বস্ত অঞ্চলে কষ্টসাধ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন-কার্য পরিচালনা করেন।

আলোচ্য বৎসরে মোট ৬৯,৫৫,২৬৭ টাকা নিম্নলিখিত ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্যে ব্যয় করা হয়:

(ক) বন্যাত্রাণ—অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে, (খ) ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ—পশ্চিমবঙ্গে, (গ) খরাত্রাণ—বিহার, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গে, (ঘ) দাঙ্গাত্রাণ—ত্রিপুরা ও আসামে, (ঙ) চিকিৎসাকার্য—পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলায়, (চ) ভূকম্প-ত্রাণ—নেপালে, (ছ) বাংলাদেশের কয়েকটি শাখার মাধ্যমে খাদ্য, বস্ত্রাদি, দুগ্ধ বিতরণ ও চিকিৎসাকার্য করা হয়, (জ) অধিকন্তু পুনর্বাসনকার্য—পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাটে।

এছাড়া বিতরিত বিভিন্ন দানসামগ্রীর আনুমানিক মূল্য মোট ৪৯,২৬,২৭৬ টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে পল্লীমঙ্গলের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কৃষি-উন্নয়ন, মৎস্যচাষ, হস্তশিল্প, বিদ্যালয়, কতিপয় ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন সেবাকার্য ছাড়াও আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও বহুমুখী সেবাকার্য পরিচালনা করা হয়:

বেলুড় মঠে একটি নূতন আরোগ্যভবন ব্লক, দুইটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয়—একটি রায়পুরে ও অন্যটি বেলুড় মঠের পরিচালনাধীনে কামারপুকুরে, বৃন্দাবনে ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য একটি পরিবহণ, মালদহে একটি বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার এবং নরেন্দ্রপুরে একটি ব্রেইল-গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করা হয়।

হায়দ্রাবাদে সর্বজনীন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান এবং বিবেকানন্দ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাঙ্গালোরে স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী-সভাগৃহ, মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ, তিরুভল্লাতে গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মঠের দুইটি শাখা—একটি লক্ষ্ণৌতে ও অন্যটি কনখলে এবং বাংলাদেশের দিনাজপুরে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়।

উপরি-উক্ত উন্নয়নকার্য ছাড়াও মিশন পরিচালিত ৯টি হাসপাতাল ও ৬২টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাক্রমে ৩৫,৩৩৬ ও ৩৯,৪৪,৯৭৩ জন রোগীর সেবা করা হয় এবং ৭৬৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯২,৭৭২।

আবার বহু কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ মঠ-পরিচালিত ২৩টি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫,৯৭,৪৭১ জন রোগীর সেবা করা হয় এবং উহার ২৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭,৫৪৯।

তদ্ভিন্ন অনুন্নত ও গ্রামাঞ্চলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ৩৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪৮টি ভ্রাম্যমাণসহ দাতব্য চিকিৎসালয় ও কতিপয় গ্রন্থাগার এবং নানা প্রকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করেন।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে সাতদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে নানা দিগ্‌দেশ হইতে ১৪,০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন।

বেলুড়ে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত মিশন ও মঠের বিশ্বব্যাপী শাখার সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৭৫ ও ৬৬।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে:

(১) পশ্চিমবঙ্গ—ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ (১৯৮১): গত ১০ই জানুআরি, ১৯৮২ হইতে ২৪ পরগনা জেলান্তর্গত পাথরপ্রতিমা এলাকায় ৩০টি গ্রামের ১১,৫১০ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে ৬৫৫টি পশমী কম্বল, ৫৫১টি ধুতি, ৫৫৭টি শাড়ী, ৪,২০৬টি শিশুপোশাক, ৯,১৫০টি পুরাতন বস্ত্রাদি, ৪২ কিলো বিস্কুট, ৩ কিলো সাগু, ৫২ কিলো বার্লি, এবং ১০ পাউণ্ড গ্লুকোজ বিতরণান্তে ত্রাণকার্য বন্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯টি গ্রামের ৬,৫১৭ জন রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ হইতে ২৪ পরগনা জেলান্তর্গত সাগরদ্বীপ ও সুন্দরবন এলাকার ১৫টি গ্রামে যে চিকিৎসা-সাহায্য শুরু হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। ৪,০০১ জন চিকিৎসিত, ১,২৩২ জন টীকাপ্রাপ্ত এবং ১,৬৩২ জন শিশু ও রোগীর মধ্যে শিশুখাদ্য বিতরিত হয়।

(২) রাজস্থান—বন্যাত্রাণ (১৯৮১): খেতড়ি হইতে পরিচালিত এই ত্রাণকার্য সমাপ্ত।

(৩) পুনর্বাসনকার্য: উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগ ও মালদায় পুনর্বাসন-কার্য অব্যাহত আছে।

(৪) অরুণাচল প্রদেশ—অগ্নিত্রাণ: নরোত্তম-নগর কেন্দ্র-পরিচালিত অগ্নিত্রাণ-সাহায্য ঢুইটি ওয়াংচু গ্রামের ১৩৯টি ভস্মীভূত গৃহের পরিবার-বর্গকে প্রদান করা হয়। দুর্গত নরনারীর মধ্যে পশমী কম্বল ও বাসনপত্রাদি বিতরিত হয়।

জন্মজয়ন্তী

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১২০তম আবির্ভাবতিথি গত ১৬ই জানুআরি ১৯৮২, যথারীতি ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ২০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে রান্না-করা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী আত্মস্থানন্দের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন

কিষেনপুর (মিশন) আশ্রমে গত ১৬ই জানুআরি ১৯৮২, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথিতে একটি অ্যালোপ্যাথি ডিসপেন্সারী কেন্দ্র চালু করা হয়।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র ১৯৮১-র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. পার্ট টু পরীক্ষায় যথাক্রমে পরিসংখ্যানে (অনার্স) প্রথমস্থান এবং রসায়নে (অনার্স) প্রথম ও দ্বিতীয়স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া **নরেন্দ্রপুর** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র ২৪ পরগনা জেলান্তর্গত আলিপুর সদর মহকুমার ১৯৮০-র প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থস্থান লাভ করিয়াছে।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা, ২রা ও ৩রা জানুআরি ১৯৮২, মহাসমারোহে কল্পতরু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১লা কল্পতরু দিবসে প্রত্যূষ হইতে উদ্যান-বাটীতে ভক্তবৃন্দের সমাগম শুরু হয় এবং চলে রাত্রি পর্যন্ত। হাজার হাজার ভক্ত নরনারী

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেন। মধ্যাহ্নে হাতে হাতে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী আত্মস্থানন্দজী এবং স্বামী গহনানন্দজী। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। উৎসবের আনন্দে উদ্যানবাটীর আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া ওঠে।

তৃতীয় দিন ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত এবং 'ভক্ত কবি জয়দেব' যাত্রাভিনয় হয়। তিনদিনের এই অনুষ্ঠান-পরিচালনায় মঠ-কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সংস্থা যথোচিত সহায়তা করেন।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের রজতজয়ন্তী উৎসব

বিদ্যাপীঠে চারিদিনব্যাপী রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

৬ই জানুআরি ১৯৮২, বুধবার পূর্বাহ্নে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ বিদ্যাপীঠে শুভাগমন করেন।

৭ই জানুআরি সকাল ৮টায় বিদ্যাপীঠের স্বদেশ-বেদীতে ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বিদ্যাপীঠের পতাকা উত্তোলন করেন; তাঁহার সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী উমানন্দ।

৮ই জানুআরি সকাল ৮-১০ মিঃ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন বহু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, বিদ্যাপীঠের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ এবং অগণিত ভক্ত নরনারী। এই দিন বিশেষ পূজক ছিলেন স্বামী সুলভানন্দ, তন্ত্রধারক স্বামী হিতানন্দজী। মূর্তি-প্রতিষ্ঠার পর পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী রজতজয়ন্তী স্মৃতিভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। সকালে নাটমন্দিরে ভজনগান ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করা হয়; যথা—বেদ, গীতা, চণ্ডী, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরান, গ্রন্থসাহেব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রভৃতি। সকাল প্রায় ১০॥টায় পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যাপীঠের অ্যালবাম প্রকাশ করেন। ইহার পর বিদ্যাপীঠের সারদামন্দিরে আয়োজিত চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ ডি. এম. সেন। বিকালে প্রাক্তন ছাত্রসম্মেলনের পর বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক 'মানভূম লোকগীতি' পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী। বিষয় ছিল: 'মানব-জাতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ভূমিকা।' স্বাগত ও প্রারম্ভিক ভাষণ দেন যথাক্রমে শ্রীঅশোকমোহন চক্রবর্তী এবং স্বামী উমানন্দ। ইহার পর পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ভাষণ দেন। (মাঘ, ১৩৮৮, পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য)। সভায় অন্যান্য বক্তা ছিলেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দ। তাঁহাদের বক্তৃতার পর পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী রজতজয়ন্তী-স্মারকগ্রন্থ উদ্বোধন করেন এবং বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীসুনীল পাল, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধুতি, শাল ও চেক্ দিয়া সম্মানিত করেন। সভাশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীসুনীলচন্দ্র দে। রাত্রে ছৌ-নৃত্যের এক আনন্দানুষ্ঠানে সকলে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন।

৯ই জানুআরি সকালে মিশন লাইব্রেরি-

প্রাঙ্গণে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবক্ষ-মূর্তির উন্মোচন করেন ডঃ ডি. এম. সেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ এবং ডঃ সেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণ করেন। ইহার পর আয়োজিত আলোচনা-চক্রের সভাপতিত্ব করেন পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী। বিষয় ছিল: 'শিক্ষার মূল্যবোধ ও স্বামী বিবেকানন্দ।' আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার, শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅমল দত্ত। মধ্যাহ্নে মানভূমের লোকগীতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে আলোচনা-চক্রের বিষয় ছিল: 'ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজের শিক্ষাপদ্ধতি ও স্বামী বিবেকানন্দ।' স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন ডঃ দেবকুমার চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। সন্ধ্যায় 'সঙ্গীতাঞ্জলি' অনুষ্ঠানের পর বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 'PINOCCHIO' ইংরেজী নাটকটি অভিনীত হয়।

১০ই জানুআরি সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্বামী আদিনাথানন্দ। তাঁহার লিখিত-ভাষণ পাঠ করেন স্বামী অমরানন্দ। স্বামী বেদান্তানন্দের ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীঅজয় প্রসাদ। ইহার পর মূলমণ্ডপে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের বিষয় ছিল: 'স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে পল্লীপুনর্গঠনে ছাত্র ও যুবসমাজের ভূমিকা।' স্বামী গহনানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন শ্রীশক্তিপ্রসাদ মিত্র, শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী, ডঃ ধ্রুব মার্জিত, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী ও শ্রীঅশোক-মোহন চক্রবর্তী। ইহার পর প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। মধ্যাহ্নে মিশনের আম্রকুঞ্জ-সভাবেদীর সম্মুখে অনুষ্ঠিত লাঠিখেলায় উপস্থিত সকলে আনন্দ লাভ করেন। অপরাহ্ণে পুরস্কার বিতরণী-সভায় স্বামী গহনানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন ডঃ এন. আর. ব্যানার্জী, ডঃ ধ্রুব মার্জিত, ডঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীআশিস বন্দ্যো-পাধ্যায়। সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন স্বামী উমানন্দ। স্বামী গহনানন্দ কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভান্তে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী পূতানন্দ। সন্ধ্যায় শ্রীশচীন সেনগুপ্ত রচিত 'গৈরিক পতাকা' নাটকটি অভিনয় করেন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও কর্মিবৃন্দ। নাট্যানুষ্ঠানের পর শ্রীঅঘোর বাউড়ী স্বরচিত 'ঝুমুর গান' পরিবেশন করেন। রাত্রে শ্রীসনাতন বাউল বাউলগীতি পরিবেশন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। এইভাবে নানাবিধ আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে চারিদিনব্যাপী রজতজয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

উদ্বোধন-সংবাদ

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্ম-জয়ন্তী: পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের বহুস্মৃতিধন্য উদ্বোধন কার্যালয় তথা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ১৭ই পৌষ, ১লা জানুআরি (১৯৮২), শুক্রবার সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহার জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ ও ভজনকীর্তনাদি হয় এবং সারাদিন সাধু ও সমাগত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর নূতন বাড়ীর সারদানন্দ হলে স্বামী সারদানন্দজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী সোমেশ্বরানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবতিথি উৎসব: স্বামী বিবেকানন্দের ১২০তম আবির্ভাব-তিথি গত ১৬ই জানুআরি (১৯৮২), শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে

উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজন-কীর্তনাদি হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। সভান্তে শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও সহশিল্পিবৃন্দ লীলাগীতি পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে ১৭ই ও ২৪শে জানুআরি, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

৮ই জানুআরি স্বামী তুরীয়ানন্দজী, ২৭শে জানুআরি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, ২৯শে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও ৮ই ফেব্রুআরি স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর আবির্ভাবতিথি পালিত হয়

সন্ধ্যারতির পর (৬॥টায়) সারদানন্দ হলে স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী শান্তিময়ানন্দ (আত্ম মহারাজ) গত ৮ই জানুআরি ১৯৮২, বৈকাল ৪-২৭ মিনিটে ৮১ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া ও অন্যান্য উপসর্গহেতু তাঁহার দেহান্ত হয়। গত দশ বৎসর যাবৎ অসুস্থতাহেতু তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল। মিশনের অফিসে নিযুক্ত-থাকাকালীন ১৯৭২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হওয়ার পর হইতেই অধিকাংশ সময় তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২১ খ্রীঃ শ্রীহট্ট (বর্তমান বাংলাদেশ) আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ খ্রীঃ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টের পর তিনি সারগাছি, নারায়ণগঞ্জ ও বেলুড় মঠে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সরল শান্ত ও কঠোর সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মেরুবিজয়

৯ই জানুআরি ১৯৮২, ভারতীয় মহাসাগর গবেষণার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হইল। ২১ জনের ভারতীয় অভিযাত্রীর একটি দল ঐ দিন ভারত মহাসাগর পার হইয়া কুমেরুর বুকে পদার্পণ করেন। উদ্দেশ্য, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত গবেষণা এবং সামুদ্রিক জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। অভিযাত্রী দল নরওয়ে হইতে ভাড়া-করা জাহাজ 'এম. ভি. পোলার সার্কেল'-এ করিয়া গোয়ার সমুদ্রতট হইতে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮১, এই দুর্গম অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানটির উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে ঐখানে একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র স্থাপন করা। মাত্র তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ ভারতীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমগ্র পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে ইহা এক অভিনব সাফল্য।

ভারতের আগে মাত্র ছয়টি দেশ, ১৪,২০০,০০০ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী জনমানবহীন এই বিশাল প্রান্তরে—যাহা কিনা পৃথিবীর আবহাওয়াকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব করেন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ-সংক্রান্ত সচিব ডঃ এস. জেড. কাসিম এবং অভিযানটি প্রধানতঃ পরিচালিত হয় 'ভারতীয় সমুদ্র-উন্নয়ন-বিভাগে'র উদ্যোগে। এই দলে দুইজন বাঙালী আছেন

তাঁহাদের নাম আর. সেনগুপ্ত এবং এ. সেনগুপ্ত।

ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া ১১ই ফেব্রুআরি অভিযাত্রী দলটি রওনা হইয়াছেন ঘরে ফিরিবার জন্য, কুমেরুর বুকে রাখিয়া আসিয়াছেন —একটি ফলক যাহাতে লেখা আছে তাঁহাদের পদার্পণের শুভ দিনটির কথা, একটি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র এবং কিছু অতি আবশ্যকীয় জিনিস।

শ্রীসারদা-সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলন

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে নারীভক্তদের লইয়া ১৯৫৪-৫৫ খ্রীঃ সর্বভারতীয় **শ্রীসারদা-সঙ্ঘ** প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, নিউ দিল্লী, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে এই সঙ্ঘের ২৯টি শাখা আছে। এই সঙ্ঘ দক্ষিণেশ্বরস্থ শ্রীসারদা-মঠের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। গত ডিসেম্বর (১৯৮১) এবং জানুআরি (১৯৮২)-তে কটক ও অন্ধ্র প্রদেশস্থ রাজমুন্দ্রিতে ইহার স্থানীয় ও সর্বভারতীয় বার্ষিক সম্মেলন বহু জ্ঞানিগুণিজনের উপস্থিতিতে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় স্থানেই সঙ্ঘের সহ-সভানেত্রী ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক 'যুগজীবনম্' মঞ্চস্থ হইয়া সকলকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে।

সর্বভারতীয় যুব-শিক্ষণ শিবির

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের পঞ্চদশ বার্ষিক সর্বভারতীয় যুব-শিক্ষণ শিবির গত ২৫শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮১, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির হস্টেলে অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে মোট ৬২৪ জন যোগদান করেন। ২৫শে ডিসেম্বর বিকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মহামণ্ডলের পতাকা উত্তোলন করেন এবং ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর উদ্বোধন করেন।

যুবসম্মেলন

ধুবড়ী (আসাম) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আঞ্চলিক যুবসম্মেলন গত ১৫ই হইতে ১৭ই জানুআরি ১৯৮২, প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী এবং আসামের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ মেহরোত্রা বাণী পাঠাইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করে। তাহাদের বয়স ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহাদের মধ্যে রচনা, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, বক্তৃতা, ব্যায়াম প্রভৃতির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একটি প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়। ইহা ছাড়া নাট্যানুষ্ঠান ও লীলাগীতি হয়।

কল্পতরু-উৎসব

১লা জানুআরি ১৯৮২, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু-উৎসব স্বর্গত হরেন্দ্রকুমার নাগের ৩৮ নং বিডন স্ট্রীটের বাসভবনে ভক্তি, নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়।

মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণের ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দের পৌরোহিত্যে বক্তৃতা করেন শ্রীমুরারিমোহন কাব্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীনির্মাল্য বসু প্রভৃতি। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত। সন্ধ্যায় 'রামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য' পরিবেশিত হয়।

রাণাঘাট মহামিলন মন্দিরে পাঁচদিনব্যাপী কল্পতরু-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, পাঠ, ভজনগান ও ধর্মসভার মাধ্যমে উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) স্বামী বিবেকানন্দ পাঠচক্রে কল্পতরু-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

জন্মজয়ন্তী

শ্যামপুকুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণসারদা সংসদে ৯ই হইতে ১২ই জানুআরি ১৯৮২,

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা. পাঠ, ভজনগান প্রভৃতি হয়। এই উৎসবের ধর্মীয় সভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা ও আরো অনেকে।

খিদিরপুর সুরবিতান এবং 'রবি বসু গীতায়নে'র সংযুক্ত উদ্যোগে ১৬ই জানুআরি ১৯৮২, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। 'বিবেক-বন্দনা' শীর্ষক ভক্তিগীতির মাধ্যমে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

শিকড়া কুলীন গ্রাম (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে ২৭শে জানুআরি ১৯৮২, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ১২০তম জন্মতিথি উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' শীর্ষক দুইটি গীতি-আলেখ্য এবং স্বামী নিরাময়ানন্দের প্রাঞ্জল ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বিশেষ উপভোগ্য হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে রান্না-করা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং রাত্রে কালীপূজা হয়। এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, পূর্বদিন সন্ধ্যায় স্বামী কৃষ্ণানন্দের ব্যবস্থাপনায় ১ম হইতে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্ম ও মানসপুত্র রাখাল' বিষয়ে একটি বক্তৃতার প্রতিযোগিতা।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক গত ৬ই ফেব্রুআরি ১৯৮২, উহার নিজস্ব ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

উদ্বোধনী সংগীতের পর সোসাইটির সম্পাদক ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানান। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন : 'স্বামীজীর বাণী আমাদের কাছে পুরানো হয়নি, বর্তমান সমস্যা সমাধান করতে তাঁর বাণীই আজ বিশেষ প্রয়োজন—শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য। তাঁর বাণী কখনও পুরানো হ'তে পারে না, কারণ তা তাৎক্ষণিক নয়, চিরায়ত।' অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার দেশবিদেশের মনীষিগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বর্তমানে স্বামীজীর বাণীর প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দ বলেন : 'সন্তানরা যখন তাদের পিতামাতার কাছে জানতে চায় তাদের ধর্ম কি? তখন নিবেদিতা-লিখিত স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর ভূমিকা অনুযায়ী তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁদের সন্তানদের হাতে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী তুলে ধরে বলতে পারেন এই নাও এ-যুগের ধর্মগ্রন্থ।' শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য পরিবেশিত সমাপ্তি-সংগীতের পর শ্রীপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দেহত্যাগ

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসের (যোগীন-মা) কন্যা শরৎকুমারী মিত্রের (কথামৃতে উল্লিখিত 'গনু') পুত্র **মায়াময় মিত্র** (মণ্টুবাবু) গত ২২শে জানুআরি (১৯৮২), তাঁহার কলিকাতাস্থ ৩৬/৭ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটের বাড়িতে ৮৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ চোরবাগান মিত্র বংশে তাঁহার জন্ম। পিতা যোগেন্দ্রলাল মিত্র স্বর্গত হইলে তিন ভাই—ভুলু, মণ্টু ও কার্তিক উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতেই আশ্রয়লাভ করেন। স্বামী সারদানন্দের স্নেহ-যত্নে পালিত হন এবং শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহাশীর্বাদে ধন্য হইয়াছিলেন। মণ্টুবাবু শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে বি. ই. (B. E.) পাশ করিয়া টাটা কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং সহকারী পরিচালক পর্যন্ত হইয়াছিলেন। ১৯৫২ খ্রীঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন।

দুঃখের বিষয় বেচারা, স্বামীজির প্রাণপণ সেবা সত্ত্বেও কালকবলে পতিত হইল। স্বামীজি এই ব্যক্তির অনাথ পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন।

১৪ই নবেম্বর ইনি এই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেরুয়া নদীর তীরে এক একখানি করিয়া বন্যাপ্রপীড়িত গ্রামের অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ২রা নবেম্বর হইতে ১২ই পর্য্যন্ত পক্কিসরাইয়ে কেবল কলেরা রোগাক্রান্ত বিপন্ন ব্যক্তির সেবা করিতে হইয়াছিল। তথা হইতে বাহির হইয়া ৩০।৩২টী বন্যাপ্রপীড়িত গ্রামের দুরবস্থা দর্শন করিয়া ঐ সকল গ্রামের অত্যন্ত দুরবস্থ ব্যক্তিকে অল্প অল্প চাউল ও অর্থসাহায্য করিলেন। কলেরা রোগাক্রান্ত গ্রামমাত্রকেই নির্দ্দোষ করিবার জন্য গন্ধক ও ধুনার ধূম দিতেন এবং গ্রামবাসী মাত্রকেই কর্পূরাদি দিয়া, তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া জল নির্দ্দোষ করিয়া খাইতে শিখাইতেন। এই উপায়ে ইনি একখানি চামারের গ্রামকে রোগমুক্ত করিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ দেখিলেন, এই সকল গ্রামের অন্নাভাব ততদূর নহে, যতদূর পরিধেয়ের অভাব। সুতরাং ইনি বিশেষ যত্নের সহিত বস্ত্র বিতরণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। কমিং সাহেব এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক নানাপ্রকারে স্বামীজির বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি ৫৪০ খানি নূতন বস্ত্র ও ১২॥০ মণ চিড়ে ও ৪॥০ মণ গুড়দ্বারা ৮০০ ব্যক্তির জলযোগ করাইয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মা স্বামী অখণ্ডানন্দের এই সাধু কার্য্যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামপ্রকাশ করিবার উদ্বোধন পত্রে স্থানাভাব; 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'তে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে এবং সদাশয় কমিং বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।

৫। রাজপুতানা-অনাথালয়।
(কিসেনগড়)

রামকৃষ্ণ মিশনসংক্রান্ত উক্ত অনাথালয়ের অধ্যক্ষ—স্বামী কল্যাণানন্দ—আমাদিগকে এই পত্র লিখিয়াছেন :—

কিছু দিবস হইল রাজপুতানার 'Famine Commissioner' ফেমিন্ কমিশনর এই অনাথালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, অত্রস্থ ছোট ছোট অনাথ বালক বালিকাদের জন্য অনেকগুলি নানা রকমের খেলনা পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "আপনারা রাজপুতানার মধ্যে যেখানে যেখানে আরও অনাথালয় খুলিতে চাহিবেন, সেইখানেই খুলিতে পারিবেন, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব"।

অত্রস্থ দেওয়ান শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর লাল অনাথালয়ের অনেক সাহায্য করিতেছেন ও করিবেন বলিয়াছেন। এত লোকের রান্না করিবার সমস্ত জিনিষপত্র তিনি সরকার হইতে দিতেছেন ও বিনামূল্যে সমস্ত কাষ্ঠ দিতেছেন এবং অত্রস্থ বালকদিগকে কার্য্যশিক্ষা দিবার জন্য স্থানীয় Cotton mills এবং Carpet factoryতে পাঠাইতেছেন। ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত অনাথগণ মাসিক বেতন পাইবে।

(ফাল্গুন, ১৩৮৮, পৃঃ ৮৯)

নিম্নলিখিত চাঁদাস্বরূপ ৮৬৲ টাকা 'ভারতী'র সম্পাদক মহাশয় কয়েক দিবস হইল আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

(১)	বাবু নিত্যানন্দ রায়, বাসেয়া	১০৲
(২)	,, নিত্যরঞ্জন মিত্র, ষ্টুডেণ্ট সংস্কৃত কলেজ	৫৲
(৩)	,, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা	২০৲
(৪)	,, লোকেন্দ্র নাথ পালিত, যশোহর	২৫৲
(৫)	জনৈক ডাক্তার, কলিকাতা	৫৲
(৬)	জনৈক মহিলা ঐ	১০৲
(৭)	জনৈক বন্ধু ঐ	১৲
(৮)	B. N. Chatterjee, Secy. P. W. D. Club, Sylet.	১০৲

নিম্নলিখিত মহাশয়গণ অনাথদিগের জন্য আমার নিকটে অর্থসাহায্য পাঠাইয়াছেন :—

(১)	শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ, দিনাজপুর	২৫৲
(২)	,, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ভবানিপুর, কলিকাতা	৫৲
(৩)	,, রাম নাথ বসু, চাঁদপুরা, রাজপুতানা	২৲

সম্প্রতি এখানে ৮৫ জন অনাথ বালকবালিকা আছে এবং প্রতিদিনই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। উপরোক্ত অনাথদিগের মধ্যে ২০ জন মাত্র কারখানাতে প্রতিদিন কার্য্য করিতে যাইতেছে এবং ৫ জন স্থানীয় হাসপাতালে আছে।

(স্বাক্ষর) কল্যাণানন্দ।

স্বামী কল্যাণানন্দকে সাহায্য করিতে বেলুড় মঠ হইতে, স্বামী নির্ম্মলানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ উক্ত অনাথাশ্রমে সম্প্রতি যাত্রা করিয়াছেন।

৬। প্লেগ-নিবারণ কার্য্য।

সাধারণে রামকৃষ্ণ মিশনের গত বৎসরের প্লেগকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন। বিদুষী সিষ্টার নিবেদিতার (মিস্ নোবল্) তত্ত্বাবধানে এই কার্য্য যেরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তিনি গত জুন মাসে লণ্ডন চলিয়া গেলে এই কার্য্য কিছুদিন বন্ধ থাকে। কিন্তু এ বৎসর কলিকাতায় প্লেগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া স্বামী সদানন্দকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। স্বামী সদানন্দ এ বৎসরে কার্য্য আরম্ভ করিয়া, এপ্রেল মাসের প্রথমার্দ্ধে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রথমতঃ, এই প্লেগকার্য্যের প্রণালী কিরূপ, তাহা সাধারণের জানা আবশ্যক। কলিকাতার বস্তিগুলি অতিশয় অপরিষ্কার। বস্তি অর্থে কতকগুলি কুটীরসমষ্টি। এই কুটীরগুলি এরূপ ঘন-সন্নিবদ্ধ যে এখানে আলোক বা বায়ু আসিবার সম্ভাবনা খুব কম। ড্রেনগুলি সাধারণতঃ অতি

অপরিষ্কার; আর এখানে যত গরিব লোকের বাস। মিস্ নোবল্ এই সমস্ত বস্তি পরিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কতকগুলি ইউরোপীয় ও দেশীয় বন্ধু এবিষয়ে খুব সাহায্য করিলেন। হেল্থ অফিসার ও চেয়ারমান উভয়ে এই পরিষ্কার-কার্য্য পর্যাবেক্ষণ করিয়া গেলেন এবং অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে চাহিলেন।

এ বৎসর স্বামী সদানন্দের তত্ত্বাবধানে এবং আদেশানুসারে দুইজন ছোক্‌রা ধাঙ্গড়, একজন ভিস্তি, ৩ জন কুলি এবং ৬ জন মেথর কার্য্য করিতেছে। তাহাদের উপরে একজন মেট (সর্দ্দার) আছে।

কার্য্যপ্রণালী :—অস্বাস্থ্যকর বস্তির কুটীর সকলের পরিষ্কার ও শোধনকার্য্য বিনামূল্যে করা হয়। পাকাবাড়ীও পরিষ্কার ও শোধন করিয়া দেওয়া হয়—কিন্তু গৃহস্বামীর বিশেষ অনুরোধে। যখন কোন বস্তিতে কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন দুইজন ছোক্‌রা ধাঙ্গড় ড্রেনের ভিতর নামিয়া তাহা পরিষ্কার করে। রাস্তার উপরের ড্রেনও পরিষ্কার করে ধুইয়া ফেলা এবং শোধনদ্রব্য দিয়া শোধন করা হয়। ফাঁকা জায়গাগুলি ঝাঁট দিয়া সমুদয় ময়লা রাস্তার এক ধারে জড় করা হয়—তারপর ময়লার গাড়ীওয়ালা তাহা তুলিয়া লইয়া যায়। বাড়ীর ভিতর ঝাঁট ও পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। পায়খানা ও ড্রেন পরিষ্কার করিয়া শোধন ও ধৌত করা হয়। এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের গাড়ী দিয়া ময়লা উঠান কঠিন হয় নাই, কিন্তু যদি কার্য্যের ক্ষেত্র বৰ্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, দু-একখানি নিজেদের গাড়ী রাখিতে হইবে।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ওয়ার্ড নং একের প্লেগপ্রপীড়িত বস্তিতে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত ওয়ার্ড নং একের ৪, ৭, ১৯ ও ৩৬ ব্লক এবং ৩নং ওয়ার্ডের ১৩ ও ১৪ ব্লক এবং ২নং ওয়ার্ডের ১৪ ব্লক পরিষ্কার ও শোধন করা হইয়াছে। প্রতিদিন গড়ে ৪ গাড়ি ড্রেনের ময়লা ও অন্যান্য স্থানের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে ১নং ওয়ার্ডের ১৯ ও ৩৬ ব্লকের সত্বাধিকারীগণের অনুরোধে কুঁড়িটীর উপর পাকাবাড়ীর শোধন ও পরিষ্কার-কার্য্য করা হইয়াছে। এই বাড়ীগুলির ভিতর ও বাহির উভয়ই ভয়ানক অপরিষ্কার ছিল। রাশীকৃত জঞ্জাল ছিল—যাহা কয়েক মাস ধরিয়া সাফ করা হয় নাই। ঐ ওয়ার্ডগুলির স্যানিটরি ইন্‌স্পেক্টরগণ এবং ডিভিসানাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনেকবার এই পরিষ্কার-কার্য্য দেখিয়া গিয়াছেন।

টাকার অভাবে মেথর প্রভৃতির সংখ্যা বাড়াইতে পারা অথবা আরও অধিক পরিমাণে সংশোধক দ্রব্য কিনিতে পারা যাইতেছে না। বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী অনুগ্রহ করিয়া পারক্লোরাইড অব-মার্কারি এবং ফেনাইল দিয়া মিশনকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

ওয়াল্ডি কোম্পানীর নিকট প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা সংক্রামকতানিবারক দ্রব্য তাঁহাদের পড়তা মূল্যে দিতে স্বীকার পাইয়াছেন। কিন্তু মিশনের প্লেগকমিটীর আর্থিক অবস্থা এত মন্দ যে, তাঁহারা ঐ সামান্য অর্থও যোগাইতে পারিতেছেন না। সহৃদয় জনগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিয়া প্লেগকমিটীকে আরও সুচারুরূপে কার্য্য করিতে সহায়তা করেন। অর্থাদি স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, বেলুড়মঠ, ডিষ্ট্রীক্ট হাওড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

— ** —

(ফাল্গুন, ১৩৮৮, পৃঃ ২১)

মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রম।

(সংবাদ)

ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কমিং সাহেব স্বামী অখণ্ডানন্দের মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ ফণ্ডে ৫০ পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভাগলপুরের জলপ্লাবিত গ্রামসমূহে স্বামী অখণ্ডানন্দের পরোপকার-ব্রত এবং নিঃস্বার্থ উদ্যম দেখিয়া কমিং সাহেব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট করিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

বেলডাঙ্গা প্রভৃতি নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে অনাথাশ্রমের জন্য ৬০ মণ ধান্য সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের মুসলমান সমাজে অখণ্ডানন্দ স্বামী "স্বাস্থ্য ও গ্রাম সংস্কার" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত ছিলেন এবং স্থানীয় মুসলমান জমিদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি সুন্দর সারগর্ভ হওয়ায় পুনরায় বক্তৃতা দিতে স্বামিজী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনাথালয়ে দুইটি ১০ বৎসর বয়স্ক মুসলমান বালক প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ দুইটি বালক পূর্ব্বে রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর নিবাসী ছিল। স্বামিজী তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমে স্থান দিয়াছেন।

বাঙ্গালা রেসম সমিতির (Bengal silk committee) সেক্রেটরি ষ্ট্যাক সাহেব বিগত ১৫ই জানুয়ারি অনাথালয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন এবং তথাকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদান্ত-সূত্রের

রামানুজভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

[সানুবাদ মূলভাষ্যের কিয়দংশ—বর্ত্তমান সম্পাদক]

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।]	১লা বৈশাখ।	(১৩০৭ সাল)	[৭ম সংখ্যা।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।*

[শ্রীম—কথিত]

(৮৩ পৃষ্ঠার পর।)

[শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীগিরিশ ঘোষ ইত্যাদির সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে কথা ও তাঁহার নানাবিধ ভাবাবেশ।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[রাজপথে]

গিরিশের নিমন্ত্রণ ; রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা হবে। বলরামও, ঠাকুর খাবেন বলে, রাত্রের খাবার প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরিশের বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন—বলরাম, তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।

দুতলা হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর। যেন মাতাল। সঙ্গে—নারাণ, মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলো।

নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে বলিলেন, হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে, আমি অমনি চলে যাব।

বোস পাড়ার তেমাতা পার হলেন—কিছুদূরেই শ্রীযুক্তগিরিশ ঘোষের বাড়ী। এত শীঘ্র চলচেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকৃচে। না জানি হৃদয় মধ্যে কি অদ্ভুত দেব-ভাব হইয়াছে। বেদে যাঁহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্যমনের অতীত নহেন ; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধআত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করছেন। এই কি দেখছেন—"যো কুচ্‌, হায় সো তুঁহি হায়?"

এই যে, নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল ; কৈ নরেন্দ্র ত সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিলেন না। লোকে বলে, এর নাম ভাব, এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হইত। কে এ ভাব বুঝিবে?

---

* মতামতের জন্য লেখক মহাশয় সম্পূর্ণ দায়ী। ইহা 'উদ্বোধন-নিয়মাবলী'র ১২শ নিয়মের অন্তর্গত নহে।
(ফাল্গুন, ১৩০৮, পৃঃ ৯০)

গিরিশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার—নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিলেন।

নরেন্দ্রকে বললেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।"—কথার প্রতি অক্ষর করুণা মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই; হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা—এই একটী (দেহী?) ও একটা জগৎ!

'জীব জগৎ' এসব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন। অবাক্ হয়ে দেখছিলেন। দু-একটী কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছি, আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটী দুটী ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত মন্দিরে]

দ্বারদেশে গিরিশ; ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরিশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলাগ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দুতলায় বৈঠকখানার ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

(সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

(নিত্যগোপাল)

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি)। ওখানে—?

নিত্য। আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন আছিস্?

নিত্য। ভাল নয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই-এক গাম নীচে থাকিস্।

নিত্য। লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়।—এক এক বার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহবে বৈ কি? তোর সঙ্গে কে থাকে?

(৮০তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৯৫)

নিত্য। তারক।* ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাঙ্‌টা বল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল।—সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো—গণেশগর্জ্জী—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হয়ে গিস্‌লো।

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক্ হয়ে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, 'তুই এসেছিস্? আমিও এসেছি!' এ কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[পার্ষদ সঙ্গে।]

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), গিরিশ, রাম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টার্ ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

(অবতার সম্বন্ধে বিচার)

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষে ঈশ্বর অবতার হন্। এদিকে গিরিশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানব দেহ ধারণ করে মর্ত্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনে বিচার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)। একটু ইংরাজিতে দুজনে বিচার করো—আমি দেখবো।

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজিতে হইল না—বাঙ্গালাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজি কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।

[Doctrine of Equality]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। ওরও যা মত, আমারও তাই মত। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তি বিশেষ। কোন খানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোন খানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রামদত্ত। এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত ভাবে)। না, না; ওর একটা মানে আছে।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র। তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধআত্মা, একই। ঋষিরা এই শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা সেই শুদ্ধআত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। মানুষে অবতার না হলে, কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞানভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দিবে?

* তারক—শিবানন্দ।

নরেন্দ্র। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। হাঁ, হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তারপর ঘোরতর তর্ক হ'তে লাগলো। Infinity তার কি অংশ হয়? Hamilton কি বলেন? Herbert Spencer কি বলেন? Tyndall, Huxley বা কি বলে গেছেন, এই সব কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, ইগুলো* আমার ভাল লাগছে না। আমি তাই সব দেখ্‌ছি! বিচার আর কি করবো? দেখ্‌ছি—তিনিই সব হয়েছেন।

(রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও বটে; আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে—মনবুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়—তার কি কল্লে বল দেখি?—

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে)। ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু' থাক্ না নাম্‌লে কথা কইতে পারি না। "বেদান্ত, শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কি না, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটী।

"যেমন একটী বেল। একজন, খোলা আলাদা, বীজ আলাদা আর শাঁস আলাদা করেছিল। বেলটী কত ওজনে জান্‌বার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে, কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাঁস সব এক সঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে, যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি, আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়,—জীব নেতি জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর, অনুভব হয়, যারই শাঁস তারই খোলা, বীচি,—যা থেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাই থেকেই জীব জগৎ। যারই নিত্য (Absolute) তারই লীলা (Relative)। তাই রামানুজ বল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

[ঈশ্বর দর্শন—God vision]

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার করবো? আমি দেখ্‌ছি, তিনিই এই সব হয়েছেন—তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন।

"তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না, 'এই আমি দেখ্‌ছি তিনি সব হয়েছেন।' তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ কর্‌লে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না, বিষয়-কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ কর্‌লে তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।

* তাঁহার ব্যবহৃত সুমিষ্ট কথা—"ইগুণ" অর্থাৎ—এইগুলি।

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। —শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
জনৈক ভক্ত

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Re. 0.85

MY MASTER
Price : Re. 0.60

THOUGHTS ON VEDANTA
(Seventeenth Edition)
Price : Rs. 2.25

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3.80

CHRIST THE MESSENGER
(Eighth Edition)
Price : Rs. 1.25

RELIGION OF LOVE
Price : Rs. 3.50

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4.25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3.00

VEDANTA PHILOSOPHY
Price : Rs. 2.50

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 1.80

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
(Cloth) Price : Rs. 2.30

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 6.25

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Rs. 1.00

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৫৮, মূল্য ২'৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪'০০

স্বামী বিবেকানন্দ— স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৫৩, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৭৫

আরত্তি-স্তব—৭ম সংস্করণ, মূল্য ১'০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী আনাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩'৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। ৮ম সং, পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৬'০০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব— স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬'২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে — স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪.০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১.৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী — পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪.৫০

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়—পৃঃ ৪৪, মূল্য ০.২৫

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা — স্বামী দেবানন্দ। ২য় সং, পৃঃ ৭৬, মূল্য ১.২৫

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩.৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬.০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২.৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪.০০

ধ্যান — স্বামী ধ্যানানন্দ। পৃঃ ১০২, মূল্য ৩.৫০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪.০০

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি— স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২.৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮.০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত :

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫.০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১.০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ২.২৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮.৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ১২.৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ৪র্থ খণ্ড ৩.০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩.০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯.০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২.০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ— স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২.০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০.০০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ৩.০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮.০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩.০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য (সাধারণ বাঁধাই) ৩.৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ৪.০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

[illegible] বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের [illegible] উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত

উদ্বোধন

চৈত্র ১৩৮৮

৮৪তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৪০৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১১০৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

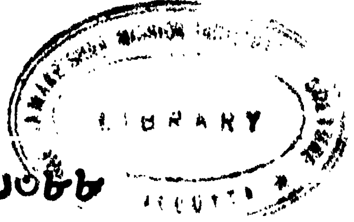
সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩


তেল মাখা কি
ছেড়েই দিলি?



উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৮৮

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী		৯৭
২।	কথাপ্রসঙ্গে :		
	কথামৃত-শতবার্ষিকী		৯৮
৩।	শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য	স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	১০০
৪।	স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র		১০২
৫।	স্মৃতিকণা	শ্রীমতী উষারাণী বসু	১০৪
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা	স্বামী বুধানন্দ	১০৫
৭।	খোকা মহারাজের স্মৃতিকথা	সঙ্কলক : ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য	১০৯
৮।	সারদা-সরস্বতী (কবিতা)	ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর	১১২
৯।	চির জ্যোতির্ময় (কবিতা)	শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়	১১২
১০।	'কথামৃতে'র জন্মশতাব্দী	স্বামী চেতনানন্দ	১১৩

১১। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন ... স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ... ১২১
১২। আলোকের সাহায্যে জল হ'তে জ্বালানী ... ডক্টর ধ্রুব মার্জিত ... ১২৭
১৩। সমালোচনা
... অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন ... ১২৯
... শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ... ১২৯
... শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩১
১৪। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১৩২
১৫। বিবিধ সংবাদ ১৩৫
১৬। বিজ্ঞপ্তি ১৩৬
১৭। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (পুনর্মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩০৭ : পৃঃ ১২১-২৮)
১৩৭

Statement about ownership and other particulars of

UDBODHAN

FORM IV

According to Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

(1) Place of Publication — 1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003.

(2) Periodicity of its Publication — Monthly.

(3) Printer's Name .. Swami Niramayananda
Nationality .. Indian
Address .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.

(4) Publisher's Name .. Swami Niramayananda
Nationality .. Indian
Address .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.

(5) Editor's Name .. Swami Niramayananda
Nationality .. Indian
Address .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.

(6) Name & Address of individuals who own the Newspaper .. Trustees of the Ramkrishna Math, Belur Math, Howrah, West

1.	Swami Vireswarananda	*President*	-do-
2.	Swami Nirvanananda	*Vice-President*	-do-
3.	Swami Bhuteshananda		-do-
4.	Swami Gambhirananda		-do-
5.	Swami Vandanananda	*General Secretary*	-do-
6.	Swami Gahanananda	*Asst. Secretary*	-do-
7.	Swami Atmasthananda	"	-do-
8.	Swami Gitananda	*Treasurer*	-do-
9.	Swami Abhayananda		-do-
10.	Swami Ranganathananda		-do-
11.	Swami Tapasyananda		-do-
12.	Swami Adidevananda		-do-
13.	Swami Hiranmayananda		-do-

I, Swami Niramayananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI NIRAMAYANANDA
Signature of Publisher.

Date : 15. 3. 1982



৮৪তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	চৈত্র, ১৩৮৮

দিব্য বাণী

আমি এখন এই উত্তরভারতের মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু উল্লেখ··· করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখনকার এক অতি বিচারশীল পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়, তিনিও ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া তর্কে পণ্ডিতদের পরাস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ী হন। বাল্যকাল হইতে তিনি শিখিয়াছিলেন, ইহাই জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। কোন মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহার সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল; তখন তিনি বাদানুবাদ, তর্ক-ন্যায়ের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবীতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন, প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। পুণ্যবান্ পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত —সকলেই তাঁহার ভালবাসার ভাগ পাইত, সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন;··· তাঁহার সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল, জাতিচ্যুত পতিত, সমাজে পরিত্যক্ত—সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫।১৬০-৬১]



কথাপ্রসঙ্গে

কথামৃত-শতবার্ষিকী

১৮৮২, ২৬শে ফেব্রুআরি, রবিবার··· "গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি।···ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার 'কথামৃত' পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্য-বদনে হরিকথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন।"

স্থান কাল পাত্র পরিবেশের কী নিখুঁত বর্ণনা। এখনও পাঠক রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছেন বিষয়-প্রবেশের জন্য! লেখক সিদ্ধ-নাট্যকারের মতো ধীরে ধীরে পট উত্তোলন করিতেছেন। লেখক নিজেই দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত নীরব অভিনেতা, নির্বাক্ দ্রষ্টা :

"মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করিতেছেন।" ঘরে কি বিষয় আলোচনা হইতেছিল, তাহা এখনো উদ্ঘাটিত হয় নাই। "ঠাকুর বলিতেছেন, 'যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম—আর করতে হবে না।···তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হ'ল।'"

১৯৮২, ২৬শে ফেব্রুআরি—উপরি-উক্ত ঘটনার শতবার্ষিকী—এ এক নূতন ভাবের শতবার্ষিকী! আজকাল তো সংবাদপত্র খুলিলেই একটা না একটা 'শতবার্ষিকী'-সংবাদ চোখে পড়ে, অধিকাংশই কোন ব্যক্তির জন্মশতাব্দী; নয়তো কোন কিছুর শতবার্ষিক স্মরণোৎসব। তাহারই মাঝে অতি নীরবে একটি ডায়েরীর লিপি-আরম্ভের শতবার্ষিকী হইয়া গেল, যাহার লিপিকার নিজের নামটিও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু যে 'বাণী' তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা আজ স্বমহিমায় প্রকাশিত বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাষায়। আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' কথাই বলিতেছি।

প্রকাশিত পাঁচটি খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে মাস্টার মহাশয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ 'গুপ্ত' চার-পাঁচটি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন—তবে 'কথামৃত'-ডায়েরীর লেখক হিসাবে প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত 'শ্রীম' নামটিই সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এই বিনয়ের ছদ্মবেশই তাঁহার প্রকৃতবেশ। লেখকের নামের মীমাংসা তো হইল, এখন দেখা যাক—গ্রন্থের নামটি তিনি কোথা হইতে চয়ন করিলেন এবং কী বা তাহার গভীর অর্থ।

'অমৃত' কথাটি ভারতের আধ্যাত্মিক সাহিত্যে একটি সুপরিচিত শব্দ। আমাদের ঘরের কাছেই আমরা পাই 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। বলিতে গেলে এই মহাগ্রন্থই বাংলাভাষার প্রথম জীবনচরিতগ্রন্থ। অবশ্য জ্ঞানেশ্বরের অপূর্বগ্রন্থ 'অমৃতানুভব' বা 'অনুভবামৃতে'র নাম এদেশে তত শোনা যায় না—কিন্তু সেখানেও শুনি এই অমৃতের বাণী। 'গীতামৃত' শব্দটি তো বহুল-ব্যবহৃত। সে যাই হোক, আমরা ধরিয়া লইতে পারি—প্রবল অন্তর্নিহিত বৈষ্ণব সংস্কারবশতঃ ঐ-জগৎ হইতেই মাস্টার মহাশয় 'কথামৃত'-কথাটি চয়ন করিয়াছেন, ঐ-জগতের আর একটি মহাগ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্'। 'কথামৃতে'র প্রথম পৃষ্ঠাতেই মাস্টার মহাশয় লিখিতেছেন যেন 'শুকদেব' ভগবৎ-কথা কহিতেছেন;

অথবা নীলাচলে 'চৈতন্যদেব' ভক্ত-পরিবৃত হইয়া কথা বলিতেছেন। এই বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনের মণিকোঠায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার কথা তো শুধু কথা নয়, তাহা 'কথামৃত'! শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের 'গোপীগীতা'র গোপনকথা তিনি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন—প্রতিটি খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায়—

তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।

কৃষ্ণপ্রেম-পীড়িত গোপীগণ অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের দয়িত প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি কথা অমৃতপূরিত—সংসারের নানাবিধ তাপদগ্ধ জীবনে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে সমর্থ। সংসার-তাপে তপ্তজীবন—মাস্টার মহাশয় যে সেদিন গিয়াছিলেন গঙ্গার শীতল জলে সব জ্বালা জুড়াইতে; মৃত্যু-পথের যাত্রী সহসা সন্ধান পাইলেন অমৃতকুম্ভের। মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, মৃত্যুভয় জয় করিয়া শুরু করিলেন এক নবজীবনের জয়যাত্রা। এই নব-জীবনে তাঁহার নূতন কর্তব্য, নূতন দায়িত্ব—এই অমৃতবারি সিঞ্চন করা তাপদগ্ধ মানবের মরণোন্মুখ হৃদয়-মরুতে—তৃষ্ণাক্লিষ্ট সংসারের লবণাক্ত বালুকাবেলায়। তাহারই মাধ্যমে এই মৃত্যুময় স্বার্থদ্বন্দ্বপূর্ণ পৃথিবীতে রচনা করা এক অমর কানন—যাহার নাম শান্ত সভ্য উন্নত উদার এক মানবসমাজ

গ্রন্থের নাম ও বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু উপলব্ধি হইল; এখন দেখা যাক গ্রন্থকারের কি এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি ইহা লিখিলেন? 'লিখিলেন' বলিলে হয়তো ঠিক বলা হইবে না; লেখার জন্য নির্বাচিত হইলেন। 'কথামৃত' রচিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্বে ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের একাধিক শিষ্য ও ভক্ত তাঁহার অমৃতবাণী জন-সাধারণে বিতরণ করিবার কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়—'শ্রীম'কে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাচিত নিযুক্ত করিয়াছেন। রাত্রে মণিকে শয়নের পূর্বে একদিন একান্তে বলিতেছেন—'আজ কি সব বললাম'—মণি সেবা করিতে করিতে বলিতেছেন—যাহা শুনিয়াছেন—যেরূপ যেমন মনে আছে; শ্রীরামকৃষ্ণ দু-একটি সংযোজন করিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন—এইটা এইরকম—অনেকটা যেন ছাত্রের দৈনন্দিন লিপিকার্যের সংশোধন! আর একজন শিষ্যকে তাঁহার ঘরে বসিয়া ঐরূপ লিপিকার্য করিতে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'কি করছিস রে?' শিষ্য-বলেন, 'আপনার সুন্দর মধুর কথাগুলি লিখে রাখছি—অনেকের কাজে লাগবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'ওর জন্যে লোক আছে।'—তোমাদের কাজ আরও গভীর ও ব্যাপক।

মাস্টার মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর, প্রকাশশক্তিও হৃদয়গ্রাহী এবং যুগোপযোগী, যে জন্য দেখা যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশিত ও প্রবাহিত হইতেছে, নানা স্তরের নানাভাবের মানুষ ইহা পড়িতেছে—ইহার শিক্ষা সাধ্যমত জীবনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিতেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আজিকার পৃথিবীতে অধ্যাত্মজীবনের সাধকের পক্ষে 'কথামৃত' নিত্যসহচর 'বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক'—সংশয়াকুল জীবনের অন্ধকার পথে 'কথামৃত' এক আলোকসম্পাত! শোকতপ্ত মৃত্যুভয়ে ভীত সংসার-জীবনে 'কথামৃতে'র কথা সত্যই অমৃত সমান।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

শিক্ষা শিশুদের কেবল মাত্র লিখতে পড়তে ও অঙ্ক কষতে শেখানো নয়, এমন কি কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান-বিতরণও নয়, যথার্থ শিক্ষা হ'ল —অজ্ঞতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে শিশুদের উত্তরণ ঘটানো এবং যে-সমাজে শিশু জন্মেছে, সেই সমাজের আদর্শ অনুযায়ী শিশুকে পূর্ণবিকশিত হ'তে বা পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করা। শিশুর পূর্ণতাপ্রাপ্তি বলতে আমরা বুঝি যে, শিশুর মধ্যে তার অন্তর্নিহিত কতকগুলি গুণের বিকাশ হয়েছে কিংবা অন্তরগুহায় নিহিত সম্পূর্ণতার কিয়দংশ সে আয়ত্ত করতে পেরেছে। আমাদের ব্যক্তিত্বের দুটি মাত্রা—সৎ ও প্রাতিভাসিক (the real and the apparent)। এই প্রাতিভাসিক মাত্রাটি যাবতীয় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের বিষয় এবং সে-সকল বিজ্ঞান দিয়ে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করা যায়। অপরপক্ষে 'সৎ'-মাত্রাটি ইন্দ্রিয়াতীত, সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহির্ভূত। প্রত্যেকের মধ্যে অন্তর্লীন 'সৎ' বা প্রকৃত সত্তাটি পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত। তাকে বলা হয় পরমাত্মা, আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি। মানুষ যত বেশী তার এই আন্তরসত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাববিনিময় করতে পারে, সে ততই অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং পূর্ণতা আয়ত্ত ক'রে থাকে। এই কারণেই স্বামীজী শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ-সাধনই শিক্ষা'। সুতরাং আমরা যখন আমাদের জীবনে আমাদের আন্তরসত্তাটির পূর্ণবিকাশসাধন করতে সমর্থ হই, তখনই আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছে থাকি। পরমাত্মা বা আত্মা নামে পরিচিত এই আন্তরসত্তাটির স্বরূপই পূর্ণতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখব যে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে, সাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আমরা অশিক্ষিত। আমাদের বিভিন্ন অসম্পূর্ণতাই এই সংসারে আমাদের যাবতীয় বিবাদবিসংবাদ ও দুঃখভোগের কারণ। এই সকল বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা নিয়ে আমরা দাবি করতে পারি না যে, আমরা শিক্ষিত। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রুটি দেখিয়ে দেবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাগ্রহণ করতে আপত্তি করেছিলেন।

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি হচ্ছে এই শিক্ষা নির্দিষ্ট কোন আদর্শ বা লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত নয়। একজন চিত্রকরের তাঁর চিত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, তেমনি একজন ভাস্করের শ্বেতপাথর খণ্ড থেকে যে-মূর্তি খোদাই করতে হবে, সে-বিষয়ে পরিষ্কার পরিকল্পনা থাকে, কিন্তু বর্তমানে একজন শিক্ষকের শিক্ষার আদর্শ বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই ; বরং বলা যেতে পারে, যে শিক্ষক শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছেন বা পড়াশোনা করাচ্ছেন, তাঁর নিজেরই কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শ নেই। আমরা পত্র-পত্রিকায় আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা-প্রসঙ্গে সমালোচনা দেখি। প্রায়শঃ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রয়োজনে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। এই সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য বহিরঙ্গ পাঠক্রমের সংস্কার মাত্র, কিন্তু কেউই শিক্ষাব্যবস্থার মূল গলদ আদর্শহীনতা বা লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেন না। এঁরা সকলেই প্রথম থেকেই শুধুমাত্র বৈষয়িক ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান বা অপরাবিদ্যার উপর জোর দিয়ে এসেছেন। তাঁরা কেউই পরাবিদ্যার উল্লেখ পর্যন্ত করেন না, এবং তার কোন প্রয়োজনও আছে ব'লে মনে করেন না। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সীমিত হয়ে যায় জীবিকা-অর্জনের উপযোগী শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার মধ্যেই। অথচ পরাবিদ্যাবিহীন শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিকেই প্রকৃত শিক্ষার অধিকারী বলা যায় না।

আবার অপরাবিদ্যার মধ্যেও আমরা কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের দিকে সমস্ত জোর দিচ্ছি। নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়—কোন্ পদ্ধতিতে এবং কিভাবে সে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জন করবে। এই নির্বাচনের পর ঐ বিশেষ বিষয়টি শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে এবং বিশেষজ্ঞতার দোহাই দিয়ে অন্যান্য সবকিছুই বর্জন করা হয়। আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ক'রে তোলে ঠিকই, কিন্তু তাকে কোন উদার সার্বভৌম জীবন-রচনার শিক্ষা দেওয়া হয় না, যা আয়ত্ত ক'রে সে সত্যিকারের একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে কিংবা অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। ভেবে দেখ, একজন ভারতীয় ছাত্র প্রযুক্তি-বিদ্যার কোন একটি বিশেষ বিভাগে শিক্ষা লাভ করেছে; অথচ সে তার দীর্ঘ পাঠ্যকালের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের বা অতীত ও বর্তমানের কোন প্রজ্ঞাবান্ মনস্বী ব্যক্তির রচনাদি পড়ার সময় বা সুযোগ পায়নি এত সব প্রযুক্তি-বিদ্যা আয়ত্ত করার পরও তাকে কিন্তু 'মানুষ' বলা চলে না, সত্যিকারের ভারতবাসী ব'লে তো তাকে অভিহিত করাই যায় না।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অপর একটি ত্রুটি হচ্ছে, যে যন্ত্রটি দ্বারা আমরা সমস্ত বিদ্যা অর্জন করি, সেই 'মন' সম্পর্কে সামান্যতম প্রয়োজনীয় যত্নও নেওয়া হয় না। মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন বা উর্ধ্বায়নের জন্য কোন উপযুক্ত শিক্ষাই দেওয়া হয় না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষব্যবস্থায় ধ্যান, একাগ্রতা ও নৈতিক পবিত্রতা পালনের দ্বারা মনের সংস্কার ও নিয়মনের মাধ্যমে মনকে বিদ্যার্জনের যোগ্য যন্ত্ররূপে তৈরী ক'রে নেওয়া হ'ত। তখনকার বিদ্যার কেন্দ্রগুলি থাকত শহর বা নগরের জনবসতি থেকে অনেক দূরে এবং উপরি-উক্ত মনের চর্চার পক্ষে সেই পরিবেশ ছিল একান্ত অনুকূল—বলা বাহুল্য, দৃঢ়ভিত্তিক বোধ-শক্তিসম্পন্ন জীবনের জন্যও একান্ত প্রয়োজন নির্জনে বাস ও গভীর মনোনিবেশ

একটি শিশু তার পরিবেশ থেকেই অভ্যাস ও চরিত্র অর্জন ক'রে থাকে। সুতরাং শিশুকে নির্দিষ্ট উপায়ে গড়ে তুলতে হ'লে তদনুরূপ গৃহের ও বিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে। একটি চারাগাছ সুন্দর সমুন্নত একটি বনস্পতিতে পরিণত হয়, মনোহর ফুল ও সুমিষ্ট ফল দেয়, কিন্তু এই সুস্থ সচ্ছল দৃঢ় সম্পূর্ণ একটি বৃক্ষ রূপে বিকশিত হয়ে উঠতে তাকে সাহায্য করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সার জল এবং অনুকূল বাতাবরণ। অনুরূপভাবে একটি শিশুর বিকাশও নানাভাবে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সেই কারণে শিশুকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হ'লে তদনুকূল জীবন যাপনের গুরুদায়িত্ব বাবা মা এবং শিক্ষকগণের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আচার্যগণ ছিলেন মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের ছাত্রগণ তাঁদেরই জীবন ও ব্যবহার দেখে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রত।

আমাদের বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও শিক্ষকগণ তাঁদের চারিত্রশক্তি দ্বারা অনেক অভাব অনেকাংশে পূরণ করতে পারেন, পূরণ করতে পারেন পাঠক্রমের অতিরিক্ত সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচী প্রবর্তন ক'রে। এর দ্বারা শিক্ষার্থিগণ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জাতীয় আদর্শ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আয়ত্ত করতে পারবে। প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর বাড়ীটিকে একটি আশ্রমে রূপান্তরিত করতে হবে, শিক্ষককে প্রাচীন ঋষিদের মতো জীবন যাপন করতে হবে। এরূপ ব্যক্তির নিকটে গ্রাম ও শহরের মানুষ উপদেশ নির্দেশ ও সান্ত্বনা লাভের জন্য যাবে। এবং সকল শিক্ষার্থিগণ তাদের বিপদে-আপদে ঐ শিক্ষককে তাদের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক রূপে দেখতে শিখবে।*

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে পূজ্যপাদ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের শিক্ষণ-মন্দিরের প্রদর্শনীতে (১৩ই জানুআরি ১৯৬৬) ইংরেজীতে একটি ভাষণ দেন। সেটি ঐ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকা 'সন্দীপনে' (১৯৬৬) প্রকাশিত হয়। এই লেখাটি তাহারই বঙ্গানুবাদ—স্বামী প্রভানন্দ-কৃত।—সঃ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীমতী যামিনীবালাকে রামচন্দ্রপুরে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়—

* মঠ
৬।৪।৪০

পরমকল্যাণীয়াসু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। সাবধানে থাকিয়া শরীর সুস্থ রাখিতে ভুলিও না। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে মনও ভাল থাকে না, মন ভাল না থাকিলে অভীষ্ট সাধনও হয় না। মহাপুরুষ মহারাজ সমভাবেই আছেন। আমার শরীর মাঝে ২ খুব খারাপ হয়। গত দুই দিন একটু ভাল ছিলাম। আজ তেমন ভাল নয়।

আশ্রম হইতে কয়েকজনের জ্বর হওয়ার সংবাদ পাইয়া আমি দুঃখিত ও চিন্তিত আছি। যত শীঘ্র পারি আশ্রমে যাইতে চেষ্টা করিব।

তোমরা আমার স্নেহাশীষ জানিবে। ইতি—

আঃ শ্রীঅখণ্ডানন্দ

* পোস্টকার্ডটিতে HOWRAH 22 JLY 33—এই ছাপ আছে।—সঃ

(২)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

* মঠ
বৃহস্পতিবার

পরমকল্যাণীয়াসু

তোমাদের কুশল সমাচার পাইয়া সুখী হইলাম। সর্ব্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ মনন করিয়া সংসারের সকল কায করিবে।

আমি আজ এখনি দুই দিনের জন্য কাশীপুরে যাইব। তোমরা আমার ও এখানকার সকলের শুভাশীষ জানিবে। মহাপুরুষ মহারাজ সেই একই রকম আছেন। আমি প্রায়ই অসুস্থ বোধ করি। ইতি—

আঃ শ্রীঅখণ্ডানন্দ

* পোস্টকার্ডটিতে BELUR MATH 10 AUG 33 HOWRAH—এই ছাপ আছে।—সঃ

(৩)

সহায়—

*শনিবার

পরমকল্যাণীয়াসু—

আমার স্নেহাশীষ তোমরা জানিবে। পূঃ মহাপুরুষ মঃ সমভাবেই আছেন। আমি প্রায় ১৬ দিন কাশীপুরে এক ভক্তের বাটীতে একটু ভাল আছি।

আশ্রমের এক মহারাজ অসুস্থ আছেন। সেইজন্য আমি চিন্তিত আছি।

তোমাদের
সতত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

* পোস্টকার্ডটিতে COSSIPORE 23 AUG 33 CALCUTTA—এই ছাপ আছে।—সঃ

(৪)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়—

*২রা ফাল্গুন

পরমশুভাশীর্ব্বাদমস্তু:—

পরে তোমার পত্র পাইলাম। মাষ্টার মহাশয়ের পত্রেই তোমার সংবাদ পাই। আমার পত্র পাইবার পর তাঁহাকে এই সংবাদ দিও।

তুমি ৺দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠ দর্শন করিয়া ওখানে আসিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

আমার শরীর সর্ব্বদা ভাল থাকে না। এখানে কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ তিথি পূজা। বড ব্যস্ত। ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

* পোস্টকার্ডটিতে MOHULA 11 FEB 31 MURSHIDABAD—এই ছাপ আছে।—সঃ

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে ঘাটালে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়—

*৮।২।৩৪

পরমকল্যাণবরেষু—

অনেকদিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। অতিশয় ব্যস্ত থাকায় পত্র দিতে এই বিলম্ব হইল। সর্ব্বদা আমার শরীর ভাল থাকে না। নিদারুণ শীতে এ বৎসর আমি একটু কাবু—আমার বাতের যন্ত্রণা পায়ে ও কোমরে বোধ হয়। ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সব হইয়া যাইবে। তাঁহার নাম দুই সন্ধ্যা যেন অবশ্য / ২ করে। আমার শুভাশীর্ব্বাদ তোমরা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

পুঃ ভূমিকম্পের সেবাভাণ্ডারে শ্রীমতীর নামে
কিছু পাঠাইবে। ইতি—
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

* পোস্টকার্ডটিতে MOHULA 8 FEB 34 MURSHIDABAD—এই ছাপ আছে।—সঃ

(২)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়—

*২৬।১২।৪১

কল্যাণবরেষু—

এমন হাঙ্গামায় থাকি ও এত পত্র পাই, যে, যথাসময়ে তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় না। একজন লেখক ছিল, সেও এখন নাই।

তোমরা আমার শুভাশীষ জানিবে। আমি এখন কোন ঔষধাদি ব্যবহার করি না। আমার হৃদ্‌রোগও আছে। এই রকমেই যে কয়টা দিন যায়। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

* পোস্টকার্ডটিতে MOHULA 10 APR 35 MURSHIDABAD— এই ছাপ আছে।—সঃ

স্মৃতিকণা

শ্রীমতী উষারাণী বসু

নিজের একটু পরিচয় দিচ্ছি। নিজের পরিচয় দেওয়া সাধারণতঃ 'কাঁচা আমি'র বিলাস। কিন্তু আমার পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক, যা 'পাকা আমি'র পর্যায়ে পড়ে। তাই নিঃসংকোচে লিখছি।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ গৃহী-ভক্ত বলরাম বসুর দৌহিত্রী। বলরাম বসু সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞান দিয়েছেন জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদা দেবী। তিনি বলেছেন, ঠাকুরের সমস্ত গৃহী-ভক্তদের মধ্যে বলরাম বসু 'সবচেয়ে বড়।' এই উক্তিটি আমরা পাই 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে। আর বলরামবাবুর স্ত্রীর অসুখের সময় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে, 'আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি দেখতে যাবে না?' মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যাব কিসে?' উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'হেঁটে যাও।' পরে অবশ্য পালকি পাওয়া যায়। তবু লক্ষণীয় যে, ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমার বলরাম' এবং মাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে হেঁটে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে যেতে বলেছিলেন। ঠাকুর তো 'আমি', 'আমার' শব্দ ব্যবহারই করতেন না। কিন্তু বলরাম বসুর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখি।

ইংরেজী ১৯০১ সালের ঘটনা। আমার বয়স তখন প্রায় চার বছর। শ্রীশ্রীমা তখন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। বলরাম-মন্দিরের ভিতরের বাড়িতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বাঁ দিকের ঘরে তিনি থাকতেন। তিনি থাকবেন ব'লে আমার মামা রামকৃষ্ণ বসু তাঁর জন্য বারাণ্ডায় স্নানের ঘর তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন।

একদিন আমি নীচে স্নান ক'রে কাঁদতে কাঁদতে উপরে আসি। শ্রীশ্রীমা ঘর থেকে বেরিয়ে আমায় কোলে তুলে নেন। আমার পা শ্রীশ্রীমায়ের গায়ে লাগছিল, এতে অপরাধ হয় মনে ক'রে আমার দিদিমা—বলরাম বসুর স্ত্রী এবং পরম পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের দিদি কৃষ্ণভাবিনী বসু—আমার উপর রাগ করেন, তাড়াতাড়ি এসে শ্রীশ্রীমায়ের কোল থেকে আমাকে নেমে আসতে বলেন। শ্রীশ্রীমা দিদিমাকে বললেন, 'অত ছোট মেয়ে, মা ভগবতী, ওতে দোষ নেই।' এই দিনটির স্মৃতি আমার মানস পটে আজও উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত রয়েছে। এটি আমার অন্তরের সম্পদ। লোককে বলবার মতো নয়। তবে আমি লিখছি পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজীর আদেশে।

করুণাময়ী মা আমার! জীবন-প্রভাতে একদিন তুমি আমায় কোলে তুলে নিয়েছিলে। আজ আয়ু-সূর্য অস্তাচলে যায়। আমায় ভুলে আছ কেন মা! তোমার অভয়-অঙ্কে আবার স্থান দাও—এই মিনতি তোমার রাঙা পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মন-মুখ-এক—ঠাকুরের যেমন কথা তেমনি আচরণ। দুশ্চরিত্র মদ্যপ দুরাচারী গিরিশ ঘোষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ঠাকুরের 'অপমান'র সাধন-বিস্তারের সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন :

"...আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না ; কিন্তু এই ধারণা ছিল যে আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মতো ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই, কিন্তু তিনি আমার পরম-বন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় বেশী ভালবাসিতেন। আর এক বিষয় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যে আপনাকে দোষী জ্ঞান করিয়াছে তাহাকে তিনি ভাল করিয়াছেন। পরশপাথর স্পর্শে মহাপাপীর হৃদয় স্বর্ণ হইয়া যাইত। আপনাকে দীনভাবে ভাবিলে তিনি মহাপাপীকে আশ্রয় দিতেন, কারণ দেখিয়াছি থিয়েটারের বেশ্যাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ তিনি যে কত কথা বলিতেন, তাহা বুঝা কঠিন, যেমন বেশ্যা দেখিয়া বলেন 'আনন্দময়ী'; কালী দেখে সোনার কালী; তবে তাঁর দৃষ্টিমাত্রেই সব সোনা হয়। যেহেতু তাঁহার ভক্তগণকে যদি কেহ একত্র করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টিতে যে সোণা হয় তাহা বুঝিতে পারিবেন।..."[৬২]

"...যদি অন্তরূপ ঈশ্বর থাকেন, তা হ'লে আমি মুক্ত হবো। আমি ঘৃণিত বারাঙ্গনা গৃহ হইতে তাঁহার নিকট গিয়াছি, আমাকে বসিতে আসন দিয়াছেন। আমার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে পাপ-থিয়েটার গৃহে মিঠাই লইয়া আসিয়াছেন। আমি এ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। আমার নিকট তিনিই ভগবান্, তিনিই অবতার। তাঁহার এক কথায় আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে। ...তাঁহাকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁহাকে ভুলাই কঠিন।"[৬৩]

যুগধর্ম-সংস্থাপন ব্যাপারে ঠাকুরের মুখ্য ও ফলপ্রসূ শৈলী ছিল 'অপমান'। এই যে গিরিশ বললেন : "তাঁহাকে মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়—তাঁহাকে ভুলাই কঠিন।" এতে প্রতিভাত হ'ল না কি, ঠাকুর হয়ে বসেছেন তাঁর অন্তর্যামী? ঠাকুরকে ভুলাই যাঁর পক্ষে হয়ে পড়েছে সব চেয়ে কঠিন, তাঁর আধ্যাত্মিক উর্ধ্ব-গামিতা রোধ করতে পারবে বিশ্বের কোন্ শক্তি?

ঠাকুর এটি বিশেষ ক'রে চেয়েছিলেন যে, তাঁর উত্তরসাধিকারূপে শ্রীমায়ের প্রস্তুতি-শিক্ষণে তাঁর আন্তরজীবনে ব্যাপক ও গভীরভাবে অতিশুদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত 'অপমান' অনুশীলিত হয়। সেজন্য বেছে-বেছে শুদ্ধ আধার পবিত্র বালক ও মহিলা ভক্তদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অপ্রত্যাশিতভাবে অচিরে ঠাকুর এটি দেখে অতি প্রসন্ন ও আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে 'অপমান'র যোগ-সাধনায় শ্রীমা জন্মসিদ্ধা হলেও তিনি সর্বদা সজ্ঞানে ও অনৈচ্ছিকভাবে তার চর্চাও ক'রে চলেছিলেন।

যোগীন-মা একদিন দেখলেন, শ্রীমা কতকগুলি

---

৬২ রামকৃষ্ণ মিশনের অধিবেশনের দিনপঞ্জি, ১৪ অধিবেশন, ২৫শে জুলাই, ১৮৯৭, পৃঃ ১৯

৬৩ তদেব, ১৭ অধিবেশন, ১৫ আগস্ট, ১৮৯৭, পৃঃ ২৮

পান শুধু চুন-সুপারি দিয়ে সাজলেন এবং কতকগুলি ভাল ক'রে সাজলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : "এগুলিতে মশলা-এলাচ দিলে না? ওগুলি কার, এগুলিই বা কার?" মা উত্তর দিলেন : "যোগেন, এগুলি (ভালগুলি) ভক্তদের —ওদের আমাকে আদরযত্ন ক'রে আপনার ক'রে নিতে হবে। আর ওগুলি (অন্যগুলি) ওঁর (ঠাকুরের) জন্যে, উনি তো আপনার আছেনই।"[৬৪]

শ্রীমায়ের স্বরূপানুভূতির সঙ্গে যখন তাঁর এই জীবন-ব্রত-সচেতনতার সংযোগ আমরা দেখতে পাই, তখন এটি বুঝতে পারি যে শ্রীমায়ের দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রগতি 'অপনান'র যোগ-বর্ত্মে লক্ষ্যাভিমুখী বিবর্তিত হয়ে চলেছিল, নিজের মাতৃহৃদয়ের তাগিদেই।

এটি অতিশয়োক্তি নয়, অল্পোক্তি যে শ্রীমায়ের জীবনে আচরিত একান্ত শুদ্ধ-নির্যাস ধর্মের 'অপনান'-যোগের যে অত্যাশ্চর্য প্রকাশ ও বিকাশ হয়েছিল তার তুলনা মানুষের ধর্মের ইতিহাসে নেই। তাঁর দেহাবসানের পরেও এই প্রকাশের কান্ত জ্যোতি-বিস্তারের গতি রুদ্ধ হয়নি। যাঁরাই শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী মনোনিবেশ ক'রে অনুধাবন করেছেন, তাঁরাই এ-সত্যটি অনুভব করেছেন।

শ্রীমায়ের 'অপনান'র সাধনা শুধু যে তাঁর হৃদয়ের আবেগের অভিব্যক্তি, তা নয়—হৃদয়ের আবেগের চেয়েও আরও অনেক গভীরতর আধ্যাত্মিক সংবেদ-সমষ্টি এতে নিবিষ্ট আছে। এ সংবেদ-নিয়ে সর্বাংশে নির্ণয় না হলেও এদের উৎসগুলির সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা অসম্ভব বলে মনে হয় না। একদিকে শ্রীমায়ের ছিল অদ্বৈতানুভূতি-জনিত সমদর্শন-প্রতিভা, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অতি উদার স্বতঃস্ফূর্ত ভূমা-সংহিত মাতৃভাব।

তাই শ্রীমায়ের এই অনুভূতি-প্রসূত অবিশ্বাস্য উক্তি : "আমার শরৎ (সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও (জেলখাটা ডাকাত) তেমন ছেলে।"[৬৫] আমজাদের প্রতি মায়ের যে ব্যবহার তাতে রয়েছে সেই জ্ঞানাঞ্জন যা দর্শনে-মননে আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ে আন্তরিক সাধকের চোখ উন্মীলিত হয়।

মানুষ কেউই সম্পূর্ণ নির্দোষ নয় জেনে, এ সকলের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে সশ্রদ্ধভাবে ও সোৎসাহে মেনে নিয়ে শ্রীমা সকলকে সমভাবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু এই অনবদ্য ভাবটি আবার কোন কোন আত্মাভিমানী ভক্তের সহ্য হ'ত না। ঠাকুরের কোন বিশিষ্ট ভক্ত অন্য এক ভক্তের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে শ্রীমাকে যখন উপরোধ করলেন যে, তিনি যেন তাঁকে তাঁর সমীপে আসতে না দেন, তাতে মা অতি সামান্য শব্দে একটি অতি অসামান্য ঘোষণা করেছিলেন : "আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে তাকে কোলে নিতে হবে।"[৬৬]

ঠাকুর ভক্তিবিহ্বল চিত্তে এই গানটি গাইতেন :

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা-মাকে,
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাক'
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে)॥"[৬৭]

ভবতারিণীর প্রত্যক্ষ দর্শনাভিলাষী শ্রীরামকৃষ্ণ

৬৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৪৩ ৬৫ তদেব, পৃঃ ৪০৪ ৬৬ তদেব, পৃঃ ৩১৯
৬৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮২, পৃঃ ১০৮

যখন কঠোর সাধনায় রত ছিলেন, এইটি ছিল তাঁর অন্তরের ভাব। তারপর ইচ্ছাময়ীর কৃপায় যখন তাঁর শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রত্যক্ষ দর্শন হ'ল, এবং তাঁকে যত্র-তত্র যখন-তখন দেখতে পেতেন, দেখতে পেতেন সর্বভূতে, দেখতে পেতেন এমন কি পতিতাতেও, তখন আর আদরিণী শ্যামা মাকে—যিনি সব কিছু হয়েই আছেন—আড়াল ক'রে রাখার প্রশ্ন উঠত না।

কিন্তু পল্লীতরুণী সারদা যখন নগরের উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে এলেন তাঁর জীবন সাধনায় ব্রতী হ'তে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অতি সাবধানে রাখলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার বাতাবরণ যাতে অণুমাত্র ব্যাহত না হয়, তাঁর সহজ লজ্জাশীলতা, স্বকীয় ভাব এবং স্বাস্থ্য অবস্থাধীনে যাতে সুরক্ষিত হয়, সে-দিকে তিনি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখলেন।

শ্রীমাকে প্রকট করার জন্য ঠাকুরের আত্যন্তিক ব্যগ্রতা ছিল না। কিন্তু তাঁর এই এক বিশেষ আগ্রহ ছিল যে, যাঁকে নিজের ত্যাগ-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি, ভক্তি-শক্তি, সেবা-শক্তি, প্রেম-শক্তি, উদার-শক্তি ও আনন্দ-শক্তির প্রতিভূ রূপে রেখে গেলেন তাঁর ভাবায়তনের কেন্দ্রভূমিতে, জগৎ-কল্যাণের সেই পূর্ণ ঘটটি যেন ত্যাগে, জ্ঞানে, ভক্তিতে, সেবায়, প্রেমে ও আনন্দে পূর্ণ হয়। সেজন্য তাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার প্রয়োজন ছিল। আর অন্তরালবর্তিনীর প্রহরী রেখেছিলেন নিজের জ্ঞান-নয়নকে। ঠাকুর যে শিষ্টাদর্শে ও অধ্যাত্ম-আদর্শে শ্রীমাকে পূর্ণ বিকশিত হবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন, তাতে ছিল রক্ষণশীলতার বনেদী গাম্ভীর্য ও উদার গ্রহণশীলতার দুঃসাহসী প্রেম। ঠাকুরের অতি মৌলিক ও সর্বার্থসাধক শিক্ষার গুণেই হোক, বা শ্রীমায়ের আত্ম-বিকাশ-প্রতিভার গুণেই হোক, তিনি যখন স্বয়ংসম্পূর্ণা হ'য়ে আবির্ভূতা হলেন, তখন দেখা গেল জগতের ইতিহাসে শ্রীমাতে এমন একটি মানবী-দেবী প্রকাশ সংঘটিত হয়েছে যা সত্যি অনুপম।

মানুষকে ঠাকুর যত কিছু অমূল্য অধ্যাত্ম দান-দাক্ষিণ্যে ঋণী ক'রে রেখে গেছেন—সে দাক্ষিণ্যে তাঁর সব চেয়ে মৌলিক ও বস্তুতঃ অশেষ অধ্যাত্ম-সংস্থান আমাদের এই চিরকালের শ্রীমা। তাঁর ভাব-অঙ্গনে সকল সন্তানের আত্ম-পূর্তির অব্যয় অধিকার। সেখানে ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী-অজ্ঞান, শক্তিমান্-দুর্বল, উৎক্রান্ত-পতিত—সকলের অছি হয়েছেন স্বয়ং মা। 'মা আছেন আর আমি আছি, ভাবনা কি আর আছে আমার'—প্রাণ খুলে এ গান আমরা সকলেই গাইতে পারি।

এই যে আমাদের শ্রীমা, তিনি যদিও নিজের প্রাণের প্রেরণাতেই আপন মাতৃত্বে মহিমান্বিতা, তবু শ্রীঠাকুর এ-বিষয়ে কোন সম্ভাব্যতাকেই আপতনে রেখে যান নি। শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এমন কি আকুতির মাধ্যমেই ঠাকুর বহুলাংশে এ বিষয়ে আত্মপ্রস্তুতি বিষয়ে শ্রীমাকে সাহায্য ক'রে আসছিলেন। তাঁর জীবনে একটিবার—শুধু একটিবার ঠাকুর শ্রীমায়ের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন। এই প্রয়োগ-প্রসঙ্গটি অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এ সত্যটি যে, ঠাকুর তাঁর ঈশ-দায়িত্ব তাঁর একক স্কন্ধে ন্যস্ত মনে করতেন না। একটি মাত্র প্রসঙ্গে শ্রীমাকে আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবহিত না দেখে ঠাকুর তাঁকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেও অনুতাপ ব্যক্ত করেননি। এ ঘটনা ভক্তদের এত গৌরবের ঘটনা যে, তাঁরাও ভর্ৎসিতা মায়ের পক্ষ হয়ে তাঁর জন্য কোন সহানুভূতি অনুভব করেন মনে হয় না—আর এ-বিষয়ে মায়ের পক্ষ হয়ে শ্রীঠাকুরের সমীপে তাঁদের কোন অনুযোগ ও অভিযোগ বিশেষ নেই।

ভক্তদের প্রতি শ্রীমায়ের যে আত্মীয়তা-বোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাঁর দক্ষিণেশ্বরের তপস্যার কাল থেকে, অধীর আগ্রহে ঠাকুর তার সামগ্রিকতা ও পূর্ণতা দেখে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে যেদিন তাঁতে অণুমাত্র অপূর্ণতা দেখতে পেয়েছিলেন, সেদিন তিনি সৈনিক শিক্ষকের মতো মা-কে ভর্ৎসনা করেছিলেন। ঘটনাটি হয়েছিল এইরূপ :

ভক্ত বলরাম বসুর স্ত্রী কঠিন রোগে অসুস্থা। ঠাকুর শ্রীমাকে বললেন : "যাও, দেখে এস গে।" পাড়াগাঁয়ে মা পায়ে হেঁটে পথ চলতে অভ্যস্তা ছিলেন, কিন্তু সহরে দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজার অবধি হেঁটে যাওয়াটা ভব্যতার দিক্ থেকে কতটা বাঞ্ছনীয় হবে, সেটা ভেবেই হয়তো বললেন : "যাব কিসে ? গাড়ি-টাড়ি নেই।" এ যুক্তি ঠাকুরের কাছে মোটেই দাঁড়াতে পারল না। তিনি দৃঢ় স্বরে বললেন : "আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না ? হেঁটে যাবে—হেঁটে যাও।"[৬৮] অবশ্য শেষ পর্যন্ত মা-কে হেঁটে যেতে হয়নি, একটি পালকি জুটে গিছল।

লক্ষণীয় এই যে 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' ঠাকুর ভক্তের সংসার ভেসে যায় এটি চাইতেন না ; চাইতেন যেন সংসারে ভক্ত ডুবে না যায়, ভেসে থাকে। যখন সমস্যার, দুঃখের, আপদ-বিপদের প্লাবন আসে তখন নিমজ্জমান ভক্ত যে খুঁটি ধরে ভেসে থাকবে সে হচ্ছে—"মা আছেন আর আমি আছি।" যে ঠাকুর 'আমি' 'আমার' বলতেই পারতেন না, তাঁর এই যে তারস্বরে "আমার বলরামের" বলে মাকে তিরস্কার করা, এটি কৃষ্ণ-অবতারে ঘোষিত "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি", এই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি। এই ভর্ৎসনার অভিঘাতে শ্রীমায়ের রামকৃষ্ণভাবগ্রাহী অন্তরে ঠাকুরের এই ভক্তাত্ম ভাবটি চিরকালের মতো এমন নিবিড় ভাবে গেঁথে গেল যে, উত্তরকালে এটি তাঁর আত্ম-স্বরূপেরই একটি বিশেষ প্রকাশ বলেই সব সময়ে প্রতীয়মান হ'ত।

যদিও বর্ণিত হয়েছে যে ঠাকুর মাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, এটি লৌকিক দিক থেকে বলা, শ্রীমায়ের মনে কিন্তু এর কোন স্থায়ী দাগ পড়েনি। তার প্রমাণ, পরবর্তী কালে তিনি নিজে বলেছিলেন : "আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম যে, তিনি কখনও আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেন নি।" "ঠাকুর আমাকে কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি ; কখনও 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেন নি।"[৬৯] "আহা ! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন। একদিনও মনে ব্যথা পাবার মতো কিছু বলেন নি।"[৭০]

[ক্রমশঃ]

৬৮ শ্রীমা সারদা, পৃঃ ১৩৬
৬৯ তদেব, পৃঃ ৯০
৭০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১৩৮৩, পৃঃ ১২২

শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে যে নামে ইচ্ছা ডাকিতে পারো। কারণ, তাঁহারাই সচল দেবদেবীর ঘনীভূত মূর্তি, সকল অবতারের সমষ্টীভূত বিগ্রহ।

—স্বামী সারদানন্দ

খোকা মহারাজের স্মৃতিকথা

সঙ্কলক : ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে 'খোকা মহারাজ' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন বড়ই লাজুক, কাউকে কোন কথা সহজে বলতে চাইতেন না। তাঁর সাধকজীবনও ছিল অতি গোপনীয়। তাঁর সঙ্গে যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, শুধু তাঁরাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারতেন। তাঁর সম্বন্ধে যখন কিছু শুনি, আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই—কী সুন্দর অনাড়ম্বর সহজ সরল এই মহাপুরুষের জীবন, কী অমূল্য তাঁর উপদেশ! উপদেশগুলি হয়তো কঠিন, অথচ পরিবেশানুযায়ী কত সহজ সরল হ'ত, যখন তিনি সাধু-ব্রহ্মচারীদের কাছে সেগুলি বলতেন। তাঁদের মনে তাঁর কথাগুলি গভীরভাবে রেখাপাত ক'রত, যা তাঁরা কোন দিন ভুলতে পারতেন না। এই রকম একজন সাধু—তখন তিনি ছিলেন তরুণ ব্রহ্মচারী, এখন প্রবীণ সন্ন্যাসী—তাঁর কাছ থেকে খোকা মহারাজের সম্বন্ধে কিছু শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই প্রবীণ সন্ন্যাসী—স্বামী বিদেহানন্দ—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে গঙ্গাচরণ মহারাজ নামেই পরিচিত তাঁর কাছে খোকা মহারাজের সম্বন্ধে যা শুনেছি, তা লিপিবদ্ধ ক'রে উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি :—

'খোকা' মহারাজ সত্যি খোকার মত ছিলেন—কী সরল বালকস্বভাব! কখন কখন শিশুদের সঙ্গে খেলা করতেও ভালবাসতেন। একবারের একটি ঘটনা খুবই সাধারণ, তা সত্ত্বেও তারই মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি ঘটে রাঁচি আশ্রমে। তখন ভাদ্র-আশ্বিন মাস, ক্ষুদে জামের সময়। আশ্রমের একটি গাছে ক্ষুদে জাম ভরতি হয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলেরা ঐ গাছের তলায় পড়া জাম কুড়িয়ে খাচ্ছে। খোকা মহারাজ ঐ না দেখে সেখানে গেলেন, আর তাদের সঙ্গে জাম কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে একজন ব্রহ্মচারী তাঁর কাছে ছুটে গেলেন এবং নিষেধের ভঙ্গিতে বললেন : 'মহারাজ, একি করছেন? আপনি কেন জাম কুড়িয়ে খাচ্ছেন?' খোকা মহারাজ উত্তরে বললেন : 'ক্ষুদে জাম খেলে ডায়াবেটিস্ সেরে যায়।'—এই বলছেন আর শিশুসুলভ হাসি হেসে এক-একটা ক'রে জাম কুড়িয়ে মুখে টপ্ ক'রে পুরে দিচ্ছেন। এই দেখে ব্রহ্মচারী আর হাসি চাপতে পারলেন না, তিনিও খোকা মহারাজের সঙ্গে হাসতে লাগলেন।

আর একটি মজার ঘটনা। খোকা মহারাজ তখন বেলুড় মঠে আছেন, একদিন মনে মনে ঠিক করলেন—মঠের সব সাধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে কফি খাওয়াবেন। তিনি প্রথমে রান্না-ঘরে গিয়ে পাচক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আজকে কিছু পায়েস কি বেশী হয়েছে?' পাচক ঠাকুর ব'লল : 'হ্যাঁ মহারাজ, এক বালতি বেশী হয়েছে।' খোকা মহারাজ সেই এক বালতি পায়েস তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে সব সাধুকে নিমন্ত্রণ করতে চলে গেলেন। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসে পায়েস থেকে দুধ আর চিনির রস ছেঁকে বের ক'রে নিয়ে একটি পাত্রে রাখলেন। তাতে পরিমাণ মতো কফি-পাউডার মিশিয়ে দিলেন। এদিকে নিমন্ত্রিত সাধুরা তো বেজায় খুশী—আজ খোকা মহারাজ তাঁদের কফি খাওয়াবেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি খোকা মহারাজের ঘরে এলেন। সবাই এলে তিনি প্রত্যেকের কাপে কাপে ঐ পাত্র থেকে কফি ঢেলে দিলেন। সবাই এক চুমুক খেয়ে বলতে লাগলেন : 'আঃ,

ওয়াণ্ডারফুল, ভেরি নাইস্! কী সুন্দর সুইট ফ্লেভার বেরুচ্ছে!'—এই বলতে বলতে সবাই খুব আনন্দের সঙ্গে কফি খাওয়া শেষ করলেন। তখন খোকা মহারাজ হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন: 'তোমাদের ঠকিয়েছি—পায়েসের কফি খাইয়েছি।' সবাই তো অবাক্! সবাই তাঁর দিকে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি দুষ্টু হেসে বলছেন: 'রান্না-ঘর থেকে পায়েস এনে, তা ভাল ক'রে চটকিয়ে, কাপড় দিয়ে ভাল ক'রে ছেঁকে, তাতে কফি-পাউডার মিশিয়ে তোমাদের খাইয়েছি।' সবাই তখন ঠকে যাওয়ার হাসি হাসতে লাগলেন। দেখে খোকা মহারাজের খুব আনন্দ হ'ল।

খোকা মহারাজ মঠে আছেন। একদিন তিনি রিভল্‌ভিং চেয়ারে বসে আছেন, আর মাটিতে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে একটু একটু ক'রে ঘুরছেন। তিনি যেখানে চেয়ারে বসে ঘুরছিলেন, তার ঠিক সামনের ঘরে (যেখানে এখন পূঃ ভরত মহারাজ বসেন) মহাপুরুষ মহারাজ চেয়ারে বসে তাঁর ঘোরা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি একটি মাদ্রাজি লাল-পেড়ে গেরুয়া কাপড় প'রে ছিলেন। তিনি কাপড়টিকে ভাঁজ ক'রে হাঁটুর ওপর তুলে খোকা মহারাজের কাছে উঠে এলেন। তিনি হাত-তালি দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন: 'বা খোকা ঘোরে, বা খোকা ঘোরে।'—এই না শুনে খোকা মহারাজ খুব জোরে জোরে ঘুরতে লাগলেন। খোকা মহারাজের বয়স তখন ৬০।৬১ বৎসর হবে। মহাপুরুষ মহারাজের বয়স তাঁর থেকে আরো বেশী ছিল। যাঁরা এই দৃশ্য দূর থেকে দেখছিলেন, তাঁরা এই দুই মহাপুরুষের শিশুসুলভ খেলা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

খোকা মহারাজের চরিত্রের আর একটি দিক। একবার গরমের সময় তিনি বেলুড় মঠে আছেন। দোতলায় স্বামীজীর ঘরের পাশে পূর্ব-বারান্দায়, সন্ধ্যার কিছু পরে তিনি ইজিচেয়ারের ওপর গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে শুয়ে আছেন। একজন ব্রহ্মচারী হাত-পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করছেন। খোকা মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'এখন কি জোয়ার এল রে?'

ব্রহ্মচারী: 'হ্যাঁ, মহারাজ।'

খোকা মহারাজ: 'এই যে নৌকাগুলি জোয়ারে এগিয়ে যাচ্ছে—এই রকম সাধনভজন ক'রে এগিয়ে যেতে হয়। সাধকজীবনেও এক এক সময় মনে জোয়ার আসে—সাধনভজন করার ইচ্ছা হয়। তখন লেগে-পড়ে সাধনভজন করতে হয়। আর দেখ্, কিছুদিন তপস্যা ও পরিব্রাজক জীবন-যাপন না করলে সন্ন্যাসজীবন পরিস্ফুট হয় না।'

খোকা মহারাজ রাঁচিতে এক ভক্তের বাড়িতে গিয়েছেন। সেখান থেকে রাঁচি আশ্রমে যান। তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী (জিতেন মহারাজ)। রাঁচি আশ্রমটি বেশী দিন স্থাপিত হয়নি, তাই আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কফি-টফি ওখানে কেউ খেতেন না, আর অতিথিদের জন্য কোন ব্যবস্থাও ছিল না। খোকা মহারাজ এসেছেন। তিনি কফি খেতে খুব ভালবাসেন। তিনি বিকালে বরাবরই এক কাপ কফি খান। এখন কি করা যায়—ভেবে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহা চিন্তায় পড়লেন। আশ্রমে একটি হিন্দুস্থানী জমাদারের ছেলে কাজ ক'রত। আশ্রমের পাশে পাহাড়ের ওপর একজন অ্যাডভোকেটের বাড়ি ছিল। সেখানে ঐ ছেলেটি বাড়ির সব কাজকর্ম ক'রত। কোন উপায় না দেখে একজন ব্রহ্মচারী ঐ অ্যাডভোকেটের বাড়ি থেকে কফি-পাউডার চেয়ে নিয়ে আসেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী জানতে পেরে বললেন: 'তুমি শেষ পর্যন্ত ওদের বাড়ি থেকে কফি-পাউডার চেয়ে নিয়ে এলে! ওখানে

ঐ জমাদারের ছেলেটি বাড়ির সব কাজকর্ম করে !' খোকা মহারাজ পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন। তিনি শুনতে পেয়ে বললেন : 'ও জিতেন, তোমাদের বেদান্ত কি শুধু বইয়ে লেখা থাকবে, ব্যবহারে আসবে না ?' স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী আর কিছু না বলে চুপ ক'রে রইলেন। তিনি খোকা মহারাজের ইঙ্গিতটি বুঝতে পারলেন।

রাঁচিতে আর একটি ঘটনা। আশ্রমে তখন বেশী ঘর ছিল না জিনিসপত্র রাখবার। আশ্রমবাসীরা প্রত্যেকের কাছে শীতের লেপ-কম্বল যা ছিল, সব তাঁদের বিছানার ওপর পেতে তার ওপর একটা চাদর পেতে দিতেন। তার ওপর তাঁরা শুতেন। খোকা মহারাজ রাঁচি গিয়েছেন। তিনি আশ্রমে ঢুকেই একজন ব্রহ্মচারীর নাম ধরে জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন। ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে বললেন : 'আজ্ঞে মহারাজ, আসুন।' খোকা মহারাজ তাঁর ঘরে ঢুকেই চুপ্ ক'রে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন। ব্রহ্মচারী তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা করতে অন্য ঘরে গেলেন। ঘর ঠিক ক'রে এসে দেখেন তিনি তখনও তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি লজ্জা পেয়ে বললেন : 'মহারাজ, আপনার বিছানা ঠিক হয়ে গেছে। আপনি চলুন—সেখানে শোবেন।' খোকা মহারাজ বললেন : 'কেন ? এই তো আমি বেশ শুয়ে আছি।'

ব্রহ্মচারী : 'মহারাজ, এটা আমার বিছানা....।'

খোকা মহারাজ : 'তুই এটায় শুসতো ? তবে আমি শুলে দোষ কি ?' কোন রকম তাঁর ওঠার লক্ষণ না দেখে ব্রহ্মচারী বললেন : 'মহারাজ, অন্ততঃ একটা চাদর পেতে দি, বিছানার ওপর।' খোকা মহারাজ : 'কোন দরকার নেই।' তারপর কিছু সময় চুপ ক'রে থেকে বললেন : 'হ্যারে গঙ্গা, তুই আজকাল বড় রাজপুত্র হয়ে গেছিস্, না !

ব্রহ্মচারী। 'কেন, মহারাজ, ও-কথা বলছেন ?'

খোকা মহারাজ : 'না, তোর বিছানাটা নরম নরম লাগছে তাই।'

ব্রহ্মচারী : 'শীতের লেপ-কম্বল রাখবার জায়গা নেই, তাই বিছানায় সব পেতে রেখেছি।'

খোকা মহারাজ : 'তাই বল্। ব্রহ্মচারীদের নরম বিছানায় শুতে নেই।'

খোকা মহারাজ মঠে আছেন। তিনি হুঁকোতে তামাক খেতেন। টিকে ধরাবার জন্য মোমবাতির দরকার হ'ত। তিনি ঠাকুর-ঘরের পোড়া মোমবাতির মোম জোগাড় করতেন। তারপর পেঁপে গাছের পাতা কেটে তার ডাঁটা নিয়ে তার মধ্যে সুতো সমেত গরম মোম ঢেলে দিয়ে মোমবাতি তৈরী করতেন। কেউ যদি বলতেন : 'মহারাজ, আপনি অত পরিশ্রম ক'রে, মোমবাতি নিজে তৈরী না ক'রে কোন ভক্তকে বললেই তো তাঁরা আনন্দের সঙ্গে দোকান থেকে আপনার জন্য অনেক ভাল মোমবাতি কিনে এনে দেবেন।' তিনি তার উত্তরে বলতেন : 'Waste not, want not.' (অপব্যয় কোরো না ; অভাবে পড়বে না)। ভক্তদের 'বুকের রক্ত জল করা' টাকা নেওয়া উচিত নয়। আর যত কম নেওয়া যায় ভক্তদের কাছ থেকে, তত সাধুর পক্ষে ভাল।'

তরুণ ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য ক'রে, তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের সাবধান ক'রে দিয়ে বলতেন : 'দেখ্, ভক্তদের কাছ থেকে কোন জিনিস নিবি না। আর নিজেদের ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র যত কম নিতে পারিস, তত ভাল। ভক্তরা যা কিছু জিনিসপত্র দেয়, সাধুদের জপ-ধ্যান থেকে তা কাটা যাবে। তারা যতই ভগবানের নাম ক'রে দিক না কেন, সাধুর জপ-ধ্যান থেকে কিছু অংশ কাটা যাবে।

সারদা-সরস্বতী

ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর

অ-সার সংসার জানি ; জানি কিবা সার।
অসারেই রুচি মম—তাই বার বার
সার ভুলি' ছুটি নিতি অসারের পানে ;
—শ্রেয়ঃ ছাড়ি' চলি সদা প্রেয়ের সন্ধানে!
শ্রেয়-প্রেয়-দ্বন্দ্ব-ক্লান্ত বিবেক-বিহীন,
আত্মার মহিমা ভুলি' ভাবি ক্ষুদ্র দীন!
শুনিলাম নব বেদ, নব এক শ্রুতি—
সারদা জ্ঞানদারূপে এল সরস্বতী!

প্রাক্তনের পাশে বদ্ধ অজ্ঞানের ঘোরে—
কীট সম জন্মে যারা, বাঁচে আর মরে,
তাদের দেখাতে পথ, দিতে শুদ্ধা মতি
সার-দা হইয়া এলে তুমি সরস্বতি!
হে সারদে! সরস্বতি! দেহ দিব্য জ্ঞান।
প্রেয়ঃ ছাড়ি' শ্রেয়ঃ যেন যাচে মোর প্রাণ॥

চির জ্যোতির্ময়

শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার সন্ধানে ফিরে
কালের দিগন্তে চেয়ে থাকি,
ক্লান্ত দৃষ্টি খুঁজে মরে অবিরাম ;
অনন্ত এ কাল-সিন্ধু
অসংখ্য বুদ্‌বুদ্
ওঠে আর নিমেষে মিলায়॥
শত লক্ষ সূর্য সোম
সৃষ্টি ও প্রলয়
সব শুধু নিমেষের খেলা
এ অকূলে কোথা তুমি
দিশা নাহি পাই।
ক্লান্তিহীন কালব্যাপী
অসীম সীমায়
কোথায় শাশ্বত তুমি
বুঝিতে পারি না।

কোন কল্পে 'কৃষ্ণ' তুমি,
অন্য কল্পে দেখি তুমি 'রাম'—
এই নাম-রূপ সংজ্ঞা
কল্পান্তরে
লীন হয় এ সাগরে।
আবার ফিরিয়া দেখি
জ্যোতির সমুদ্র মাঝে
'ঈশ' 'মুশা' 'কৃষ্ণ' 'রাম'
একত্র বিরাজে—তোমা-মাঝে।
সব কাল ব্যাপ্ত করি
হেরি তুমি অনন্ত স্বরূপ
'রামকৃষ্ণ' চিরজ্যোতির্ময়।

'কথামৃতে'র জন্মশতাব্দী

স্বামী চেতনানন্দ

ডায়েরীগুলি সত্যি অমর হয়ে রয়েছে ও থাকবে। একশ' বছর আগে (২৬শে ফেব্রুআরি ১৮৮২) শ্রীম'র ডায়েরীগুলির মধ্যে জন্ম নিল ভাবীকালের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বিশ্বের অধ্যাত্মপিপাসুরা 'কথামৃত'কার শ্রীমকে জানাচ্ছে মৌন প্রণতি ও ব্যক্ত অভিনন্দন। ব্যক্তিগত ডায়েরী যে পৃথিবীর ধর্মসাহিত্যে সর্বোচ্চ অধিকার পাবে 'শ্রীম' কখনই তা ভাবেননি। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত থাকতে চেয়েছিলেন গুপ্ত, কিন্তু পারেননি। লুকিয়ে কলেজের চিলের ছাদে বসে ডায়েরী পড়তেন, যাতে কেউ জানতে না পারে, কিন্তু ব্যর্থ হলেন সে প্রচেষ্টায়। ভক্তেরা ঐ ডায়েরীর অমৃত আস্বাদ করতে চাইলে বলতেন, "ও কিছু না, নিজের জন্য লিখেছি।" কথায় বলে—"যত হয় গুপ্ত, তত হয় পোক্ত। যত হয় ব্যক্ত, তত হয় ত্যক্ত।"

পৃথিবী সুন্দর; কারণ এর স্রষ্টা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনি কখনও লোকসমক্ষে জাহির ক'রে বলেন না, "আমি বিশ্বের স্রষ্টা।" 'শ্রীম' নানা নামে কথামৃতে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছেন, যেমন—মাস্টার, মণি, মোহিনীমোহন, একটি ভক্ত, সেবক, ইংলিশম্যান। কৌতূহলী মানুষ ছুটে গেছে শ্রীম'র কাছে কথামৃতের চরিত্রগুলিকে আরও ভাল ক'রে জানবার জন্য। জনৈক ভক্ত জটিল-চরিত্র হাজরার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় শ্রীম বলেন, "হাজরা একদিন দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসে মালা নিয়ে জপ করছে। ঠাকুর মা-কালীর মন্দির থেকে এসে ভাবে হাজরার হাত থেকে মালা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—বললেন, 'এখানে (অর্থাৎ তাঁর কাছে থেকে) আবার মালা জপ করা! কলকাতায় তো অনেকে মালা জপ করে—কেউ কুড়ি বছর—কেউ পঁচিশ বছর ধরে, তাদের কি হচ্ছে? ব্যাকুলতা না হ'লে কিছুই হয় না। এখানে (অর্থাৎ তাঁকে) দেখলেই চৈতন্য হয়ে যায়।'"

হাজরার শেষটা কি হ'ল জানতে চাওয়ায় শ্রীম বললেন, "ঠাকুরের নাম করতে করতে তাঁর শরীর যায়।"

জনৈক ভক্ত—"কথামৃতে 'মণি' বলে যে ভদ্রলোকের কথা আছে, তাঁর শেষ অবস্থা কি হ'ল?"

শ্রীম—"বলতে পারিনে কি হবে।"

উত্তর শুনে সকলে হাসল।

কথামৃতের মণি, যিনি পরবর্তী কালে অগণিত মানুষের মাথার মণি হয়েছেন, তিনি বসতেন অধিকাংশ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের পাপোশের ওপর। কী বিনয়! কী শ্রদ্ধা! কী ভালবাসা! ঠাকুর একদিন শ্রীমকে বলেন, "তুমি এখানে কিছু চাও না, কিন্তু (আমাকে) দেখতে আর (আমার) কথা শুনতে ভালবাসো; তোমার দিকেও আমার মন পড়ে থাকে: কেমন আছে—কেন আসে না—এই সব ভাবি।" ভাবতেও ভাল লাগে—দেহধারী ভগবান্ ভক্তের জন্য কী ভাবেই না ভাবেন! ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে নিজের কাছে টেনে বসিয়ে দুহাত দিয়ে উদ্ধবের ডান হাতখানা চেপে ধরে করুণকণ্ঠে বললেন, "গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য।" কী অপূর্ব দৃশ্য! সৌম্য সম্বোধনে বুঝাচ্ছে—তোমার মুখখানি শান্তিতে, মধুরতায়, স্নিগ্ধতায় ভরা। ব্রজে আমার প্রিয়জনদের দুঃখবেদনা দূর কর। কথামৃতের পাতায় পাতায় আমরা দেখি ভগবানের ভক্তের জন্য ভাবনা। এতে মনে আশা ও আশ্বাস জাগে।

শ্রীম ছিলেন অন্তঃসার, গম্ভীরাত্মা, ফল্গুনদী; তিনি ছিলেন মুখচোরা, বর্ণচোরা, গুপ্তযোগী। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে তিনি বিচিত্র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—লিপিকার, দূত, অন্তরঙ্গ সঙ্গী, সেবক, 'ছেলেধরা মাস্টার'।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—ছবি ও কথামৃত। অন্যান্য অবতারদের কল্পনার দ্বারা চিন্তা করতে হয়, কারণ তখন তো ক্যামেরা ছিল না। ঠাকুরের তিনখানি ছবিই সমাধি-কালে তোলা; ভক্তদের ধ্যানের পক্ষে খুব সুবিধা। আর কথামৃতের কথা, বর্ণনা, চরিত্র—সব বাস্তব ও টাটকা। শ্রীম জীবদ্দশায় প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকাতে লিখেছেন, "শ্রীম বা মাস্টার বা M (a son of the Lord, and a servant) একই ব্যক্তি। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য ভক্তদিগের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনী (Diary)-তে লিপিবদ্ধ ছিল। যে দিনেই দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, সেই দিনেই সমস্ত স্মরণ করিয়া Diary তে লেখা হইয়াছিল। ইতি গ্রন্থকার।"

ডায়েরীর উৎস সম্বন্ধে শ্রীম আরও বলেছেন, "ঈশ্বরের কাজ আমরা কতটা বুঝতে পারি? আমার ডায়েরী লেখার অভ্যেস আগে থেকেই ঠাকুর করিয়ে নিলেন। হেয়ার স্কুলে থার্ড ক্লাশে যখন পড়ি (১৮৬৭) তখন থেকেই ডায়েরী লিখছি ক্রমাগত, দৈনন্দিন কি করলাম, কোথায় গেলাম—এই সব। আর ১৮৮২ ফেব্রুয়ারীর শেষে ঠাকুরের দর্শন হ'ল। তখন এই অভ্যেসটা কাজে এল। অনেকেই তো ছিলেন, কিন্তু আমার দ্বারা ডায়েরী লিখালেন। তবে তো এই বই (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত) বের হ'ল। পনের বছর apprentice খাটতে হয়েছিল। ওতে কতো উপকার হ'ত—memory sharp (স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ) হ'ত, লিখবার কৌশল বাড়ত। ছয় সাত ঘণ্টা, এমন কি সারাদিনের ঘটনা পর পর রাত্রিতে মনে প'ড়ত। এমনতর করেছিলেন ঠাকুর। গান-গুলিরও একে একে প্রথম পদ মনে রাখতে চেষ্টা করতাম।"

'কথামৃত' শ্রীরামকৃষ্ণের কথার প্রতিচ্ছবি! শ্রীম কাগজের ওপর কলম দিয়ে যে অনবদ্য কথার ছবি এঁকেছেন, তা অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী। 'কথামৃত' কীভাবে রূপ নিল? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীম বলেছিলেন, "আমি তাঁর কথামৃত স্মৃতিতে বহন ক'রে আনতাম এবং বাড়ীতে এসে ডায়েরীতে তার সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখতাম। অনেক সময় এক একদিনের কথার নোট সাতদিন ধরে স্মৃতি থেকে বের ক'রে লিখতাম। তাঁর এক একটি কথার জন্য আমি চাতকের মতো চেয়ে থাকতাম। ডায়েরীর নোট থেকে পুস্তকাকারে বহু পরে 'কথামৃত' লিখিত হয়। এক-একটি scene আমি হাজার বারেরও বেশী ধ্যান করেছি। কাজেই বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত সেই লীলাকথা আমার চোখের সামনে ঠাকুরের কৃপায় জীবন্ত হয়ে ভাসত, যেন এইমাত্র দেখে এলাম—সত্তর বৎসর পূর্বে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হলেও। কাজেই এইভাবে বলা যেতে পারে যে ঠাকুরের জীবন্ত সম্মুখেই লেখা হয়েছে। অনেক সময় ঘটনার বিবৃতিতে মন প্রসন্ন হ'ত না। তখনই ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন হতাম। তখন সঠিক চিত্রটি মনশ্চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল ও জীবন্তভাবে প্রকাশিত হ'ত। কাজেই লৌকিক জগতে সময়ের এত বড় ব্যবধান থাকলেও আমার চিন্তার জগতে ইহা সদ্য-অনুষ্ঠিত বলে প্রতিভাত হ'ত।"

কথামৃতের বাণী—"আগে ঈশ্বর পরে জগৎ।"

এ-বাণী বুঝতে গেলে চাই সাধুসঙ্গ। সৎসঙ্গ দুর্লভ, কিন্তু 'কথামৃত' সুলভ। কথামৃতপাঠ শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ। চরিতামৃতকার বলছেন, চৈতন্যোক্ত পঞ্চসাধন—"সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম, ব্রজে বাস—এই পঞ্চসাধন প্রধান।" কথামৃত-কার বলছেন, "সাধুসঙ্গ ছাড়া উপায় নেই আমাদের। ঠাকুরের কথার আদি মধ্য অন্ত ঐ এক কথা—সাধুসঙ্গ।" সৎসঙ্গে সংসারীদের ভবরোগ দূর হয়, সন্ন্যাসীদের মায়াজাল ছিন্ন হয়। কথামৃতের চরিত্ররাজি ঐ সৎসঙ্গের প্রতিভূ।

পথিকৃতের অলংকার লোকনিন্দা। ধম্মপদে বুদ্ধের একটি সুন্দর কথা আছে, "পৃথিবীতে অনিন্দিত ব্যক্তি কেহই নাই। একান্ত নিন্দিত-পুরুষ কিংবা একান্ত-প্রশংসিত পুরুষ কখনও হয় নাই, হইবে না, এখনও নাই।" শ্রীম 'কথামৃত' লিখে কেবল প্রশংসাই পাননি; তাঁকে অনেকে অভিশাপ দিয়ে চিঠি দিয়েছে। একদিন কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "'স্বামীজী লিখছেন, কেউ curse (অভিশাপ) দিবে, কেউ reward (পুরস্কার) দিবে—কথামৃত পড়ে।' যাদের, মনে কর, interest-এ (স্বার্থে) হাত পড়বে, তারাই curse দিবে। ত্যাগের কথা আছে কিনা এতে। যাদের ভোগে মন আছে, তারাই রেগে যাবে। মা হয়তো বলবে, হায় আমার ছেলেটা সাধু হয়ে বের হয়ে গেল! ঐ লোকটাই তো তার মাথা খারাপ ক'রে দিল বইটা (কথামৃত) লিখে। কোন স্ত্রী হয়তো বলবে, আমার সাজানো বাগান নষ্ট ক'রে দিল ঐ লোকটা। পতিও বলতে পারে, ঐ বইটা পড়েই আমার স্ত্রী বিগড়ে গেল। যাদের ভোগ শেষ হয়ে গেছে, কিংবা অল্প বাকী আছে, তারা ঠিক এর উল্টো কথা বলবে। তারা বলবে, কথামৃত অমৃতই বটে—জীবনামৃত। ঐ-টি আমাদের শান্তি দিল, জ্বলে যাচ্ছিলাম।"

একবার জনৈক ডাক্তার শ্রীমকে কথামৃত ধারাবাহিকভাবে পুনরুক্তিগুলি বাদ দিয়ে পুনরায় সুন্দরভাবে লিখতে পরামর্শ দেন। শ্রীম তাঁকে বলেন, "Repetition (পুনরুক্তি) ছাড়বার যো আছে? একটা কথাই হয়তো পাঁচ জায়গায় বলেছেন। ছেড়ে দিলে কথাটার link (সম্বন্ধ) ভেঙে যায়। আর, একই কথা পাঁচ জনকে বলেছেন পাঁচ জায়গায়। তাতে কার উপর কিরূপ act (কাজ) করেছে তা বোঝা যায়।... ফিল্ডে brilliance (উজ্জ্বলতা) বাড়ায় কিনা ডায়মণ্ডের। সেটিং-এর জন্য ডায়মণ্ডের সৌন্দর্যের কমতিবৃদ্ধি হয়। কাঠের উপর রাখ, এক রকম দেখাবে। ভেলভেটের উপর রাখ, তখন সৌন্দর্যের পূর্ণতা লাভ করবে।" ঠাকুরের প্রতিটি কথা শ্রীম'র কাছে ছিল ডায়মণ্ডের চেয়েও মূল্যবান্।

কথামৃতের ওপর বহুগ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক ভাষ্য, টীকা রচিত হবে। গত এগার বছর ধরে দেখছি, 'কথামৃত' এই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কীভাবে ছড়াচ্ছে! অনেক সময় বিস্ময় লাগে। বাবুরাম মহারাজের কথা স্মরণ হয়, "ওরে, প্রচার কে করবে? ঠাকুরকে প্রচার কাকেও করতে হবে না। তিনি স্বয়ং প্রচারিত হচ্ছেন। আমি গিয়ে কেবল দেখলুম ঠাকুরের মহিমা। তিনি নিজে কীভাবে তাঁর ভাব ছড়াচ্ছেন, তাই দেখবার জন্য তিনি কৃপা ক'রে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন।"

গত বছর এপ্রিলে (১৯৮১) ক্যানসাস সিটির বেদান্ত কেন্দ্রে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। একটি মেয়ে ঠাকুরের বই পড়ে সেণ্ট লুইসে চিঠি দেয়। তাকে ক্যানসাসে দেখা করতে বলি। সে চাষীর মেয়ে এবং বিদুষী। সুদূর ক্যানসাসের একটা খামারে কাজ করে। Mid West-কে বলে আমেরিকার Bread basket। মেয়েটি ৩,৪ শ' মাইল গাড়ী চালিয়ে এল। তার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল

পড়তে লাগল। সে বলল—খামারের একটা ছোট কুটীরে সে শুয়ে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে দর্শন দিয়ে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। সে মন্ত্রটি আমাকে ব'লল। আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবলুম ঠাকুরের অশেষ কৃপা! আমেরিকার Mid West-এর হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত প্রান্তরে প্রান্তরে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরে ঘুরে দেখছেন কার ব্যাকুলতা জেগেছে!

ক্যানসাসের আর একটি মেয়ে কথামৃত কিনে পড়ছে। আমি বললুম, "শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—Woman and gold is maya (কামিনী-কাঞ্চনই মায়া)। তোমার মনে এতে আঘাত লাগে না?" সে ব'লল, "না। যেখানে woman আসে, আমি man-এ পরিবর্তন ক'রে নি।" খুশী হয়ে বললুম—"তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।" আমেরিকায় এখন Women Liberation, Equal Rights প্রভৃতি আন্দোলন চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে তো তাদের তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার কথা। আমি কতিপয় মহিলাকে জানি, যারা কথামৃতের (Gospel-এর) Woman and gold is maya পড়ে ঠাকুরের ওপর বিরূপ ভাব পোষণ করে।

যাহোক স্বামী নিখিলানন্দজী Gospel of Sri Ramakrishna-তে কামিনী-কাঞ্চনের অনুবাদ করেছেন 'Woman and gold'। অবশ্য তিনি পাদটীকায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন ওটা মূলতঃ 'lust and greed'। স্বামী বিবেকানন্দও কামিনী-কাঞ্চন অর্থে কাম-কাঞ্চন (lust and greed)-এর উল্লেখ করেছেন।

ভক্তদের বুঝিয়ে বলতে হ'ল: শ্রীরামকৃষ্ণের ইষ্ট ছিলেন মা কালী; গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী; প্রথম শিষ্যা সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবী, যাঁকে তিনি জগজ্জননীরূপে পূজা করেছিলেন; গর্ভধারিণী মা মনে কষ্ট পাবেন বলে, তিনি সন্ন্যাসী হয়েও গেরুয়া পরলেন না এবং তীর্থবাস ত্যাগ করলেন; তারপর তিনি জগতে মাতৃভাব প্রচার করলেন। তিনি শিষ্যদের কখনও মেয়েদের ঘৃণা করতে শেখাননি। নারীজাতিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের উপবাসক্লিষ্ট মুখ তাঁকে কষ্ট দিত। এহেন ব্যক্তি কি কখনও নারীবিদ্বেষী হ'তে পারেন? চতুরাশ্রমীদের মধ্যে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে নারীজাতির অটুট মাতৃসম্বন্ধ।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কামিনী-কাঞ্চনকে ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন বলেছেন, তখন শ্রোতা সবাই পুরুষ। স্ত্রীভক্তদেরও তিনি পুরুষদের থেকে পৃথক্ থাকবার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপদেশ দিতেন। তাছাড়া ইংরেজী কথামৃতের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনের মেয়ে মিস মার্গারেট উড্রো উইলসন।

সেদিন এক কাগজে দেখলাম, একটা কাউন্টিতে (জেলায়) এক বছরে ৯০০০ বিবাহ, ৮০০০ বিবাহবিচ্ছেদ। বিচ্ছেদে জ্বালাযন্ত্রণা। ঐ-সময় শ্রীরামকৃষ্ণের "কামিনী-কাঞ্চনই মায়া" মন্ত্র খুবই ফলপ্রদ। যখন স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে যায়, তখন সে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়; এমন কি অনেকে আত্মহত্যা করে বা স্ত্রীকে হত্যা করে। এ তো কাগজে হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু ঐ সময় কেউ যদি ঠাকুরের বৈরাগ্যোদ্দীপক "কামিনী-কাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়" কথা পড়ে, সে হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাবে এবং জীবনের নতুন পথের সন্ধান পাবে।

আমাদের একজন সাধু আমেরিকার একজন নাম-করা অধ্যাপককে ইংরেজী 'কথামৃত' পড়তে দেন। তিনি ওতে Woman and gold is maya দেখে আর বেশী দূর এগোননি। তিনি বইখানি ফেরত দিয়ে ভাল না লাগার কারণ বললেন। সাধুটি তাঁকে বললেন, "দেখুন, এই

বইয়ের সব নেবেন না। আপনার যেটুকু প্রাণে লাগে, সেটুকুই নেবেন।" তারপর অধ্যাপকটি সমস্ত বইখানি পড়ে বললেন, "I think Ramakrishna is the answer to our society. I love this book very much. Our society is guided by two things: Dollar-king and Sex-queen. The teachings of Ramakrishna is a nice solution to those crucial problems."

শ্রীরামকৃষ্ণকে হক্ কথা বলতেই হবে। মুখরোচক চাটুবাক্য বা মিষ্টি মিথ্যে কথা বলবার জন্য তাঁর জন্ম নয়। স্বামীজী বলেছেন, "যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলে, তার পথ কুসুমাবৃত; আর যে তা করে না, তার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।"

কয়েক বছর আগে ফিলাডেলফিয়াতে ক্যাথলিকদের ইউক্যারিস্টিক কংগ্রেসে কলকাতার মাদার টেরিসা একটা স্লোগান তোলেন—Hunger for God। আমেরিকায় অনেকে তাতে বেশ নতুনভাবে উৎসাহ পান। একটা বক্তৃতায় বলতে হ'ল—"দেখ, ঐ স্লোগানটা তোমাদের কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ওটা একটা পুরানো উক্তি। অবতার আসেন মানবমনে ভগবৎক্ষুধা জাগাবার জন্য। খুলে দেখ ১১৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের 'গসপেল'খানা। ওর পাতায় পাতায় রয়েছে ব্যাকুলতার কথা। লীলাপ্রসঙ্গে দেখবে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদগ্রহণের পরে রয়েছে, "ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন"। তাঁর প্রথম ঈশ্বরদর্শন সাধনার দ্বারা হয়নি—হয়েছে ব্যাকুলতার দ্বারা। ব্যাকুলতাবিহীন সাধনা যান্ত্রিক, প্রাণহীন।

পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবানের প্রতি মানুষের ভালবাসার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের প্রতি ভগবানের ভালবাসার বিবরণ বড় একটা পাওয়া যায় না। কারণ মানুষ ভগবানের অনন্ত প্রেম প্রকাশে সমর্থ নয়। শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "কেউ ব্যাকুল হয়েছে—শুনলেই ঠাকুর নিজে তার কাছে দৌড়ে যেতেন। একদিন অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ী ক'রে একজন ভক্তের বাড়ী গিয়ে পড়লেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম। ঠাকুর এসেছেন, শুনে ভক্তটি তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি এই অন্ধকার রাত্রে কষ্ট ক'রে এসেছেন কেন? আমাকে বললেই আমি যেতাম।' ঠাকুর তখন বললেন, 'দেখ, কখনও ভক্ত ছুঁচ হয়, ভগবান্ চুম্বক হন; আবার কখনও ভগবান্ ছুঁচ হন, ভক্ত চুম্বক হয়। ব্যাকুল হ'লে সে ভগবান্‌কে পায়।'"

গত গ্রীষ্মে (১৯৮১) মেক্সিকোতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা বেদান্ত-কেন্দ্র আছে। প্রতি সোমবার সেখানকার ভক্তেরা ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে ধ্যান করে এবং পরে তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করে। আমি বেদান্তের ওপর একটা বক্তৃতা দিলাম। কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট তা স্প্যানিশে অনুবাদ ক'রে ভক্তদের শোনালেন।

গত অগস্ট মাসে লণ্ডনের ভব্যানন্দজীর সঙ্গে কথা হ'ল। তিনি বলছিলেন, তাঁর রোম-ভ্রমণের কথা। আগে ক্যাথলিকরা নিজেদের স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছিল এবং অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। উদার পোপ জন্ ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলে (২) ঘোষণা করেন: "Let them reflect attentively on how Christian religious life may be able to assimilate the ascetic and contemplative traditions whose seeds were

sometimes already planted by God in ancient cultures prior to the preaching of the Gospel."—Vatican Council II (Ad Gentes). এর পর থেকে ক্যাথলিকরা রুদ্ধদ্বার খুলে বেরিয়ে অপর ধর্ম সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়।

যাহোক ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কতিপয় বেনিডিক্টিন (Benedictine) সন্ন্যাসীর আমন্ত্রণে ভব্যানন্দজী যান ইতালিতে। তাদের মঠে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মের পূজা, প্রার্থনা ও ধ্যান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা ও অনুষ্ঠান হয়। তিনি দুদিন বেদীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে রেখে ফুল, ধূপ, দীপ দিয়ে সাজিয়ে পূজা করেন, এবং "হরি ওঁ রামকৃষ্ণ" সুরতান যোগে গান করেন। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরাও তাতে যোগ দেন। ইতালির টেলিভিশন তা তুলে দেখায়।

রোমে তখন পোপ ছিলেন বৃদ্ধ পল। বহু-ভাষাবিদ্ গুণীব্যক্তি, ভব্যানন্দজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পোপ পল পৃথক্‌ভাবে দেখা করেন এবং যখন সমবেত ছবি তোলা হয়, পোপ ভব্যানন্দজীর হাত ধরে নিজের কাছে বসান। ঐ সময় ভব্যানন্দজী পোপ পলকে The Gospel of Sri Ramakrishna উপহার দেন এবং তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি ঠাকুরের বিষয় পূর্ব থেকেই অবগত আছেন।

এ-দেশে এখন যত যোগী, গুরু, বাবা আছেন, তাঁদের অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' পরিবেশন করেন। কেউ তাঁর নাম উল্লেখ করেন, কেউ করেন না। আমেরিকায় যত ধর্ম, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ বেরুচ্ছে, অধিকাংশ বইয়ের নির্ঘণ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। লস এঞ্জেলিস সিটি কলেজের একটি ছাত্রী আমাকে একখানা The Portable World Bible (Edited by Robert O. Ballou, Penguin Books) পাঠিয়েছে। ওটা ঐ কলেজের পাঠ্য। দেখলাম ঐ গ্রন্থে ১২ পৃষ্ঠা 'কথামৃত' থেকে নেওয়া হয়েছে।

কয়েক বছর আগে খ্রীস্টোফার ইশারউড আমাকে A Treasury of Traditional Wisdom উপহার দেন। ঐ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেছে নিউইয়র্কের Simon and Schuster; ওতে দেখলাম, ইংরেজী 'কথামৃত' থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ১৬৭ বার।

'কথামৃতে' মধু আছে, মজাও আছে—তাই ছড়াচ্ছে। আমাদের এক বন্ধু আমেরিকার এয়ার-ফোর্সে মেজর ছিল। দিলখুশ ভদ্রলোক। সে বলে, 'খুব সম্ভব শ্রীরামকৃষ্ণের সময় I was that trouble-maker Hazra!' আমরা তাকে হাজরা বলেই ডাকি। সে এখন আমেরিকার একটা জুডো পত্রিকার সম্পাদক ও জুডো শিক্ষা দেয়। সে একদিন বলছিল, "কাজ থেকে বাড়ী ফিরে আমি আমার সঙ্গীদের খুঁজি। তারা হচ্ছে কথামৃতের বিভিন্ন চরিত্র। ঐ সব বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে আমি বেশ আনন্দ পাই।"

বছর দশেক আগেকার কথা। তখন সবে হলিউডে এসেছি। একদিন বক্তৃতার পর হ্যাণ্ডশেক করবার সময় একটি ভক্ত নিজের পরিচয় দিয়ে ব'লল, "I am Girish." মুখ দিয়ে ভুর ভুর করছে মদের গন্ধ। মনে প'ড়ল ঠাকুরের কথা—আমার সব ভক্ত দেশ-বিদেশে আছে। যে যে-ভাবে থাকুক ঠাকুরের সঙ্গে যোগ থাকলেই হ'ল। গীতাকার বলেছেন—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

আমাদের আর এক বন্ধু ঠাকুরের উগ্র ভক্ত। একটি লোক তাকে এক যোগীর বই পড়তে দেয়। বন্ধুটি খুব বুদ্ধিমান্ ও উচিত-বক্তা। সে বইখানি ২ পৃষ্ঠা পড়ে গুণে দেখল ১৮টা "I" রয়েছে। সে তখন ঘর থেকে ঠাকুরের বিরাট 'গসপেল'খানা বের ক'রে তাকে ব'লল, "তোমার যোগীর 'I'র

ছড়াছড়ি দেখলাম, এবার এই কথামৃত উল্টে দেখ শ্রীরামকৃষ্ণ কতবার 'I' উল্লেখ করেছেন।"

ইংরেজী কথামৃতে অনেক জায়গায় "All Laugh", "Laughter" আছে। অনেক সময় আমেরিকান ভক্তেরা বলে, "স্বামী, আপনি হাসেন, কিন্তু আমরা তো ওখানে হাসির কিছু দেখি না। বললুম—হাসি-হিউমার লুকিয়ে থাকে ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিমায়, সামাজিক প্রথায়, দেশাচারে, লোকাচারে এবং প্রকাশ পায় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি-ঠাট্টা বুঝতে গেলে তাঁর ভাব-ভাষা-সামাজিক প্রথার সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন। আমার একখানা বই আছে "10,000 Jokes, Toasts and Stories"। আমি মাঝে মাঝে ঐ বই পড়ি। কোনটা ধরতে পারি, কোনটা পারি না। অপরকে জিজ্ঞাসা ক'রে তবে জানি। একটা প্রবাদ আছে—বোকা তিনবার হাসে : প্রথম—না বুঝে, দ্বিতীয়—বুঝে এবং তৃতীয়—বুঝতে এত দেরী হ'ল কেন, এই ভেবে।

সেদিন একজন কমেডিয়ানের কাহিনী শুনছিলাম। সে বলছিল কোন এক গ্রাম্য শহরের চার্চে যাজক ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলে চললেন, "খ্রাইস্টই একমাত্র সম্পূর্ণ (perfect), আর সব পাপী ও অসম্পূর্ণ। তোমরা কি কেউ সম্পূর্ণ মানব দেখেছ বা তার কথা শুনেছ? যদি কেউ দেখে বা শুনে থাকো তবে হাত তোল।" গীর্জা গমগম করতে লাগল। যাজকের চ্যালেঞ্জে কেউ হাত তুলল না। অবশেষে একটি মধ্যবয়স্ক লোক উঠে দাঁড়াল। যাজক হুংকার দিয়ে বললেন, "তুমি সম্পূর্ণ?" "না।" "তুমি দেখেছ এমন কাউকে যে সম্পূর্ণ?" "না।" "শুনেছ কোন ব্যক্তির নাম যে সম্পূর্ণ?" "হ্যাঁ।" "কে সে?" "আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামী।"

শুনে সবাই হাসল। আমি হাসলুম না। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "ঐ দ্বিতীয় স্বামী যা কিছু করে, তার স্ত্রী বলে—আমার প্রথম স্বামী এ-ব্যাপারে perfect ছিল। বেচারা বর কিছুতেই স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে না পেরে গীর্জায় শান্তির জন্য হাজির হ'ল, এবং সেখানেও সেই একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'ল।" আমরা পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি ভালভাবে জানি না, তাই তাদের হিউমার ধরতে পারি না; এরাও তেমনি 'কথামৃতে'র সব হিউমার ধরতে পারে না। তবে বুঝিয়ে দিলে খুব খুশী হয়। Love for freedom (স্বাধীনতাপ্রিয়তা) এবং Sense of humour (কৌতুকরসবোধ) আমেরিকানদের রক্তে মেশানো।

একবার জনৈক যুবক একজন প্রাচীন সাধুর কাছে উপদেশ চাওয়ায় তিনি বলেন, "রোজ 'কথামৃত' পড়বে। মানবমনে যত রকম আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উঠতে পারে, তার উত্তর 'কথামৃতে' আছে। যদি ঠাকুরের কথা তোমার মনের সন্দেহ ভঞ্জন না করতে পারে, তবে তুমি কি মনে কর—আমার কথা তোমার সমস্যা সমাধান করবে?"

আর একবার একটি যুবক 'কথামৃত' পড়ে সাধু হ'তে আসে। জনৈক সন্ন্যাসী রহস্য ক'রে তাকে বলেন, "ওহে কথামৃত পড়ে কেউ সাধু হ'তে পারে না। স্বামীজীর বই পড়। তাহলে ভিতরে অনুপ্রেরণা জাগবে—তখন সাধু হ'তে পারবে। 'কথামৃত' পড়লে তো ভগবান্ দর্শন হয়, তখন তোমার সাধু হবার প্রয়োজন কি?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত যে কতভাবে ছড়াচ্ছে আমরা জানি না। কিছুকাল আগে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে আমেরিকার এক বিখ্যাত লেখক ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের বক্তৃতা শুনতে গেলাম। তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন, ঠাকুরের "আসন্নপ্রসবা ব্যাঘ্রী ও মেষপালের" গল্প বলে। ইলিনয়ের একটা ব্যাপটিস্ট চার্চে ধর্মসম্মেলন হচ্ছিল।

সেখানকার যাজক একজন নিগ্রো। তিনি সভাপতির ভাষণে উল্লেখ করলেন ঠাকুরের গল্প—"চার অন্ধের হস্তী দর্শন।" অবশ্য এঁরা কেউ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করেননি। তাতে কিছু আসে যায় না। যিনি "নামযশে থাক থু" করতেন, এবং "লোকমান্যিতে ঝাঁটা" মারতেন, তিনি কি আর নামের কাঙাল হবেন?

'কথামৃত' যে কীভাবে কার মনে কাজ করছে বলা মুশকিল! কয়েক বছর আগে এক বক্তৃতায় (Yearning for Illumination—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা) ঠাকুরের কথামৃতের একটি ছোট্ট কথা বলেছিলাম, "কলিতে বলে, একদিন একরাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয়।" শুনে একটি actress (অভিনেত্রী) বাসায় গিয়ে কাঁদতে শুরু ক'রল। মেয়েটি দুপুর রাত পর্যন্ত কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ল। পরে সে আমায় বলেছিল, "কত তো কাঁদলুম, ঠাকুর তো এলেন না।" সরলতার প্রতিমূর্তি মেয়েটি! এ-সব ভক্তদের ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা দেখলে বা শুনলে আনন্দ হয়।

'কথামৃতে'র কথা আঁকড়ে ধরে এ-সব ভক্ত জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজের একটা আশ্বাসবাক্য মনে পড়ে, "দেখ, বাবা, ঠাকুর যদি সত্য হন তো আমরাও সত্য। যা বলছি, ঠিক ঠিক বলছি; আমরা লোক ঠকাতে আসিনি। যদি আমরা ডুবি তো তোমরাও ডুববে; কিন্তু তাঁর কৃপায় জেনেছি যে আমরা ডুবব না, আর তোমরাও ডুববে না।"

আফিংখেকো ময়ূরের যেমন মৌতাত লেগে থাকে 'শ্রীম' তেমনি ঠাকুরের কথামৃত পান ক'রে গোলাপী নেশায় মশগুল হয়ে থাকতেন। তিনি নিজে কথামৃত আস্বাদ ক'রে অমর হয়ে রয়েছেন এবং ভাবীকালের পথিকদের ঐ অমৃতের অধিকারী ক'রে গেছেন।

'কথামৃতে'র জন্মশতাব্দীর শুভলগ্নে কথামৃতকার শ্রীম'র প্রতি অশ্বিনী দত্তের পত্রাংশ প্রণিধানযোগ্য: "ধন্য তুমি। এত অমৃত দেশময় ছড়ালে। আমি তো আর শ্রীম'র মতো কপাল ক'রে আসিনি, যে শ্রীচরণদর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত, আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখবো।...ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা। ঐ কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় ক'রে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।"

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। "আমি কে" ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি, এর কোন্‌টা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে, তাই আত্মা—চৈতন্য। "আমার" "আমিত্ব" দূর হলে ভগবান্ দেখা দেন।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ফ্রাঙ্কফুর্টে আমাকে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেন ছেড়ে প্যান আমেরিকার প্লেনে চড়তে হবে। সেজন্যে প্যান আমেরিকার কাউণ্টারে গিয়ে সেখানে টিকেট দেখাতে হবে। ওখানে ওরা সব দেখে-শুনে বলবে: 'ঠিক আছে, তুমি অমুক জায়গায় যাও', ইত্যাদি। অমুক 'বে' (Bay)-তে প্লেনটা এসে লাগবে। 'বে', 'হল্' ইত্যাদি শব্দ ওরা ব্যবহার করে। ঐগুলি জানতে হয়। এখন ঐ মারোয়াড়ী ভদ্রলোক তো চলে গেছেন। আমি নিজেই যাচ্ছি আমার মালপত্র নিয়ে। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনি কি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি, আমার বাবাকে আপনি চিনতেন, তিনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন—সুবোধ দাশগুপ্ত। আমি তাঁর ছেলে সুপ্রিয় দাশগুপ্ত।' তিনি বললেন: 'আপনার বোধ হয় অসুবিধে হচ্ছে, আপনার জিনিসগুলি আমি বয়ে নিয়ে যাই।' আমি 'না, না' করলাম, তিনি শুনলেন না, সব জিনিসগুলি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। তা আমরা দুজনে যাচ্ছি, এমন সময় শুনি পিছন থেকে একটি নারীকণ্ঠ: 'Can I give you a lift?'—'তোমাকে কি আমি গাড়ীতে তুলে নিতে পারি?' ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্ট এত বড় যে, সেখানে যারা কাজ করে, তাদের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয় না। গাড়ী নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। হালকা ধরনের মোটরগাড়ীতে তারা চলাফেরা করে। ঐ মহিলাটি গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার অবস্থা দেখেই হোক, বা যে-কারণেই হোক, তাঁর দয়া হয়েছে, তিনি বলছেন: 'Can I give you a lift?' আমি তাঁকে চেয়ে দেখলাম, তারপর বললাম: 'Are you not an angel?'—'তুমি স্বর্গ থেকে নেমে এলে নাকি? আমার মনে হচ্ছে, আমার দুর্দশা দেখে তুমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ!' তিনি হেসে বললেন: 'Yes, I am an angel.' তারপর জিজ্ঞেস করলেন: 'কোথায় যাবেন?' আমি বললাম: 'Pan Am'—অর্থাৎ প্যান আমেরিকান কাউণ্টারে যাব। তিনি বললেন: 'আসুন গাড়ীতে।' সেই ভদ্রলোক আর আমি তাঁর গাড়ীতে চড়লাম; তিনি আমাদের যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। সেখানে গিয়ে শুনি, ঘোষণা হচ্ছে: 'Swami Lokeswarananda, You are wanted at the information counter.' কোথায় সেই 'ইনফরমেশন কাউণ্টার', কে আমাকে চাচ্ছেন, কেন চাচ্ছেন—কিছুই বুঝছি না। সঙ্গে ছিলেন সুপ্রিয় দাশগুপ্ত—তিনি বললেন: 'স্বামীজী, আপনি ভাববেন না, আমি গিয়ে খোঁজ ক'রে আসছি।' তিনি ফিরে এসে জানালেন যে, বার্লিন থেকে খোঁজ করছে, আমি এসে পৌঁছেছি কিনা। বার্লিনে উনি জানিয়ে দিলেন যে, আমি পৌঁছেছি, আর এই ফ্লাইটে যাচ্ছি। তারপরে উনি আমাকে 'সিকিউরিটি চেকিং'-এর জন্যে কোথায় যেতে হবে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ও-সব জায়গায় *সিকিউরিটির* বা *কাস্টমস*-এর বিশেষ কড়াকড়ি নেই, দেখলাম। ওদের এক-রকম যন্ত্র আছে—তাই দিয়ে সব পরীক্ষা করে। কারও গায়ে হাত দিয়ে ওরা পরীক্ষা করে না—যেমন আমাদের দেশে করা হয়। সঙ্গে যদি কোন ধাতুদ্রব্য (metal) থাকে ওদের যন্ত্রে টুং ক'রে একটা শব্দ হয়। আমার কোমরে বেল্ট

ছিল। যন্ত্রে ধাতুর শব্দ ধরা পড়েছে। জিজ্ঞেস ক'রল: 'কি আছে?' আমি বললাম, 'বেল্ট'। ওরা বললে: 'ঠিক আছে, যাও।' কোন বাক্স খোলা নয়, কোন রকম প্রশ্নও নয়। তারপর ও-সব পার হয়ে তো আমি বসে আছি—এবার আমাকে লক্ষ্য করতে হবে, আমার প্লেনটা কখন আসবে। আজ-কাল তো সব টিভিতে দেখায়। দিল্লীতেও হয়েছে এখন, ঘোষণা করে: 'এই ফ্লাইট এখুনি যাবে, তৈরী হয়ে নাও। এই গেট দিয়ে যাও।' তা আমি সেটার জন্য অপেক্ষা করছি। একটা কাঁচের দেওয়াল-দেওয়া ঘর, তার মধ্যে বসে অপেক্ষা করছি। কাঁচের অপরপারে দেখি, একটি পরিচিত মুখ: কলকাতার শ্রীনীলাদ্রি-কুমার বসু। তিনিও আমাকে দেখে ইশারা করছেন। কাঁচের মধ্যে দিয়ে তো কথা শোনা যায় না—ইশারা ক'রে আমাকে ডাকছেন। এখন আমি তো 'সিকিউরিটি' পার হয়ে এসেছি। কি করি! আমি সিকিউরিটির লোকদের বললাম: 'দেখ, ওখানে আমার একজন বন্ধু আমাকে ডাকছে, আমি কি একটু যেতে পারি?' এত ভদ্র ওরা যে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেতে দিল। ব'লল: 'Oh yes.' আমি গেলাম, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। তিনি বললেন: 'এই প্লেনে আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক যাচ্ছেন, আমি তাঁকে বলে দিচ্ছি, তিনি আপনাকে দরকার হ'লে সাহায্য করতে পারবেন।' তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ এভাবে কথাবার্তা বলে আবার সেই কাঁচের ঘরে ফিরে এসে আমার প্লেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। সেই বাঙালী ভদ্রলোক—তিনিও এলেন। তারপরে যথাসময়ে প্লেনে চড়লাম, বার্লিনে পৌঁছলাম। জার্মানির সাথে ভারতের সময়ের তফাত হচ্ছে সাড়ে চারঘণ্টার। আমি সকাল নটায় দিল্লী ছেড়েছি আর যখন বার্লিনে পৌঁছলাম, তখন প্রায় রাত এগারোটা—বার্লিনের এগারোটা। তার সঙ্গে যদি সাড়ে চারঘণ্টা যোগ করি, তাহলে আমাদের হিসেবে প্রায় ভোরবেলা। ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে আমাকে প্লেনের জন্য প্রায় দু ঘণ্টা বসতে হয়েছিল। অর্থাৎ প্রায় আঠারো ঘণ্টা লাগল বার্লিনে পৌঁছতে। ওখানকার এয়ার-পোর্টেও ঐ কাঁচের দেওয়াল আছে, তার ওপারে দেখলাম দু-একটি পরিচিত মুখ—আমাকে দেখে হাত নাড়ছে। খুব স্বস্তি বোধ করলাম। আমাদের এখানে যেমন প্লেন থেকে মালপত্র ছাড়াতে অনেক সময় লাগে, ওখানে কিন্তু তা নয়। কলকাতায় দেখেছি, দিল্লী থেকে কলকাতা আসতে যতটা সময় লাগে, তার পর মাল পেতে প্রায় আরও ততটা সময়ই লাগে। ওখানে কিন্তু সব জায়গায়ই দেখলাম, মাল আমার আগেই এসে গেছে, আর ঘুরপাক খাচ্ছে কনভেয়ার বেল্টে। এখন আমি আমার মাল তুলে নিলেই হ'ল। মাল বইবার জন্য কুলী কিন্তু পাওয়া যাবে না। আমার সঙ্গে একটা বড় স্যুটকেশ ছিল, আরও ছোটখাটো জিনিসপত্র ছিল কিছু কিছু। সেগুলি কি ক'রে নেব? সব জায়গায়ই ট্রলি থাকে। ট্রলির ওপর মাল চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে—সব জায়গাতেই লক্ষ্য করলাম—ট্রলি পাওয়া যায় না। কারণ অনেক যাত্রী। যদি তাড়াতাড়ি নেমে একটা ট্রলি হাতিয়ে নিতে না পারা যায়, তাহলে মুশকিল। অত তাড়াহুড়ো করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। কাজেই, অনেককেই অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় একটা ট্রলি পাওয়ার জন্য। যা হোক, একটা ট্রলি আমি পেয়ে গেলাম। তাতে সব জিনিস চাপিয়ে 'কাস্টমস্'-এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। ভাবছি, এবার তো আমাকে সব খুলতে হবে। এখান থেকে (ভারত থেকে) সব গুছিয়ে-টুছিয়ে দিয়েছি

—সে-সব যদি আবার খুলতে হয় তাহলে তো মুশকিল। আবার কি আমি সাজাতে পারব ও-রকমভাবে? দেখি যে, কাস্টমস্-এর লোকেরা সব আমার দিকে চেয়ে আছে, কিছু বলছে না। আমি বললাম: 'তোমরা এ-সব খুলবে না? দেখবে না?' বলছে: 'কেন? আপত্তিজনক কিছু আছে নাকি?' আমি বললাম: 'না না, আপত্তিজনক কিছু নেই!'—'তাহলে যাও, আমরা ও-সব কিছু দেখব না!' তখন আমি বেরিয়ে গেলাম। বাইরে আসতেই দেখলাম, কিছু জার্মান, আর কিছু ভারতীয়—প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন এসেছেন ফুলের মালা-টালা নিয়ে। খুব সম্মান ক'রে আমাকে তাঁরা একজায়গায় বসালেন, অনেক ছবি-টবি তুললেন। এরপর থেকে আমি আর আমার জিনিসপত্রের দিকে ফিরেও তাকাইনি। তাঁরাই সব দেখাশুনো করেছেন। তাঁরাই নিয়ে চললেন সব। তাঁদের গাড়ী ছিল—বড় বড় সব গাড়ী। তাতে ক'রে চললাম আমরা। আমাকে নিয়ে তাঁরা এক-জনের বাড়ীতে তুললেন। বিরাট বাড়ী—তার পাঁচতলায় উঠতে হবে। পুরানো বাড়ী—কোন লিফ্‌ট্ নেই। আমার জন্য পাঁচতলায় দুটো বড় বড় ঘর ঠিক ক'রে রেখেছে—একটা শোবার ঘর, আর একটা বসবার। যারা আমার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসবে, তাদের সঙ্গে আমি ঐ বসবার ঘরে দেখা ক'রব। সুন্দর ব্যবস্থা। মিস্টার ও মিসেস ফ্রাঙ্কে—এঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন আগে; ইংরেজী বিশেষ বলতে পারেন না। সমস্যা হ'ল, আমার ঐ-সব মালপত্র পাঁচ-তলায় তুলতে হবে! আমি তো কিছুতেই পারব না। আর যাঁদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছি, তাঁদেরও তো বেশ বয়স হয়েছে আমি চিন্তা করছিলাম: কি ক'রে অত ওপরে তোলা হবে? ঐ যে মেয়েটি—আনা বুশ—সে দুহাতে আমার সব জিনিসপত্র নিয়ে পাঁচতলায় পৌঁছে দিল, একটুও দাঁড়াল না। আমি অবাক হয়ে গেলাম—কী শক্তি! এই যে মেয়েটি—এর মা হচ্ছেন ইলসে বুশ, আগেই বলেছি এদের কথা। মা আর মেয়েতে ঝগড়া—শেষ দিন পর্যন্ত দেখে এসেছি সেই ঝগড়া বেশ উপভোগও করতাম, আবার অসুবিধেতেও পড়তাম মাঝে মাঝে। কি-রকম ঝগড়া হ'ত, একটু নমুনা দিই। খেতে বসেছি একসাথে টেবিলে—মা, মেয়ে আর আমি। কোন কারণে মা চটে গেছে। কিন্তু আমাকে বুঝতে দেবে না। সে হয়তো জার্মান ভাষায় বলছে: 'একটা অপদার্থ মেয়ে! এ-রকম একটা মেয়ে আমি পেটে ধরেছি! আমার দুর্ভাগ্য!' যেমন মায়েরা বলে থাকেন মেয়েকে। বলছে একেবারে স্বাভাবিক গলায় যাতে আমি বুঝতে না পারি, মা চটে গেছে। হঠাৎ দেখি, মেয়ে চুপ ক'রে বসে আছে। হাসিখুশী ছিল এতক্ষণ—এখন চুপ ক'রে বসে আছে; খাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে উঠে কোটটা গায়ে দিয়ে সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে গেল। আমার খুব খারাপ লাগল। খেতে বসে একজন যদি না খেয়ে চলে যায়, কার না খারাপ লাগে? মা ব'লল: 'তুমি ওর জন্যে ভেবো না। ও ঐ-রকমই। ওর মাথায় একটু ছিট আছে।' সেটা অবশ্য ঠিকই। মাথায় ছিট সত্যি আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা সেই মেয়েটি—আমার সব জিনিসপত্র একা পাঁচতলায় তুলে দিল। আমাদের দেশের অনেক পুরুষ মানুষও ও-রকম পারবে না। এত দৈহিক ক্ষমতা! শুধু সে-ই নয়, সব জার্মান মেয়েদেরই দেখেছি বিরাট বিরাট চেহারা। হঠাৎ দেখলে মেয়ে বলে মনেই হয় না।

মিসেস ফ্রাঙ্কে স্বামী ঋতজানন্দজীর শিষ্যা ফ্রান্সে 'গ্রেট্‌স্' (Gretz)-এ আমাদের একটা

বেদান্তকেন্দ্র আছে—ঋতজানন্দজী সেখানকার প্রধান। স্বামী কিন্তু নাস্তিক—ধর্ম-টর্ম বিশ্বাস করেন না; অথচ তিনি যোগশিক্ষা দেন। তাঁর একটা যোগ-স্কুল আছে। এ-রকম নটা যোগ-স্কুল বার্লিনে আছে। ইনি যে স্কুলটা চালান সেটা খুব নাম-করা স্কুল। অনেক টাকা দিয়ে সেখানে ভর্তি হ'তে হয়। সুন্দর হল আছে, খুব সাজানো-গোছানো, আমি সেখানে বক্তৃতাও করলাম। ঐটা তাঁর জীবিকা, বেশ মোটা টাকা তিনি রোজগার করেন বলে মনে হ'ল। আর এই যে মহিলা—ইনি পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করেন। এক সময় সেটাই তাঁর পেশা ছিল। এখন বিয়ে থা হয়েছে, ধর্ম-টর্মর দিকে মন দিয়েছেন। এখন আর পেশা হিসেবে করেন না—শখ হিসেবে অবসর সময়ে মাঝে মাঝে পোশাক তৈরী করেন। আর বছরে একবার সেইসব পোশাক নিয়ে তাঁর গুরু ঋতজানন্দজীর কাছে যান। নানারকম সব পোশাক। এতটা জানলাম কি ক'রে? আমি যখন ঐ বাড়ী থেকে চলে আসছি, তখন দেখি আমার আলমারিতে অনেকগুলি সোয়েটার। ভাবছি, এতগুলি সোয়েটার কি আমি ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলাম? কেন এতগুলি সোয়েটার আবার সঙ্গে এনেছিলাম? দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কয়েকটা খুব ভাল সোয়েটার। তা, একজনকে দিয়ে জিজ্ঞেস করালাম: 'আচ্ছা, এই সোয়েটারগুলি কি আমিই এনেছিলাম? আমার, না কার?' তা সেই মহিলা বললেন: 'না, ওঁর নয়। ওঁর যদি পছন্দ হয়, উনি নিতে পারেন।' আমি বললাম: 'না, আমার কোন দরকার নেই।' জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, ওঁর গুরু ঋতজানন্দজীর জন্যে উনি সেগুলি তৈরী করেছেন। শুনে খুব আনন্দ হ'ল। ভাল লাগল খুব।

মিস্টার এবং মিসেস ফ্রাঙ্ক নিরামিষ পছন্দ করেন। বাড়ীতে কোন সময়ে আমিষ রান্না হয় না। আমিষ খেতে হ'লে কোন হোটেল বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে আসেন। ওখানে ওঁরা আমাকে নানারকম নিরামিষ খাওয়াতেন। ওঁরা ধরেই নিয়েছেন যে, আমি নিরামিষ খাই। ওঁদের গুরুদেব স্বামী ঋতজানন্দজীর দক্ষিণ-ভারতীয় শরীর—তিনি নিরামিষ খান। যা হোক, যে-সব নিরামিষ রান্না করতেন সব দিন যে ভাল লাগত, তা নয়। তবু খেয়ে নিতাম। এঁদের বাড়ীতে আমি দুদিনমাত্র ছিলাম, তারপরে মিসেস বুশের বাড়ীতে গেলাম। মানে তাঁরাই এসে নিয়ে গেলেন। এ-রকম ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। সেখানেই আমি এর পর থেকে ছিলাম।

আবার ফিরে আসি। ২৫শে অক্টোবর রাতে তো আমি বার্লিন পৌঁছলাম। আমি প্লেনেই খেয়ে এসেছিলাম। তবুও ওঁদের খুশী করবার জন্য একটু ফলের রস পেলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম। ভাল ঘর, ভাল ব্যবস্থা। বেশ ভাল ঘুম হ'ল। কোন অসুবিধে হ'ল না।

পরের দিন থেকেই লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ শুরু হ'ল। যতদিন ছিলাম, সকালবেলায় অনবরত লোক আসত। আর ২৬ তারিখে বিকেলেই মিস্টার ফ্রাঙ্কের যোগের স্কুলে গিয়ে বক্তৃতা করতে হ'ল। গিয়ে দেখি, ওরা আগে থেকেই ছাপিয়ে রেখেছে, কি কি বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়। যেমন: 'আত্মা কি?' অথবা 'গুরু কাকে বলে? গুরুর কি প্রয়োজন?' অথবা 'মুক্তি বলতে কি বোঝায়?', 'ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি?', 'কি ক'রে মনকে সংযত করা যায়?' ইত্যাদি। একবার একটি বিষয় ছিল: Religious Experiences. এটি বলে আমার খুব আনন্দ

হয়েছিল। জার্মানিতে দেখেছি—শুধু জার্মানিতে কেন, ওদেশে প্রায় সর্বত্রই দেখেছি—গুরু সম্বন্ধেই বেশী কৌতূহল লোকেদের। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা ক'রত: 'গুরু যে করতেই হবে, এমন কি মানে আছে?' 'আমার গুরুকে আমি কি ক'রে চিনব?' 'গুরুর সঙ্গে সম্পর্কটি কি এ জন্মের, না জন্মজন্মান্তরের?' এ-সব প্রশ্ন তারা ক'রত। আবার ব'লত: 'কেউ যদি এসে আমাকে বলে আমি তোমার গুরু, তাহলে আমি কি ক'রব সেক্ষেত্রে?' আমি বলতাম: 'সাধারণতঃ আমরা জানি, কেউ গুরু হ'তে চায় না। কেউ যেচে এসে যদি বলে, "আমি তোমার গুরু", সে কি-রকম মানুষ, সে-বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। তবে সে-রকম যদি ঘটে, তুমি তোমার বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে যা-হোক একটা সিদ্ধান্ত করবে। সে বিষয়ে আমার পক্ষে নির্দিষ্ট ক'রে কিছু বলা বড় শক্ত' ইত্যাদি।

ওখানে দেখলাম, বক্তৃতার পরে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর হয়। আমার সবচেয়ে আনন্দ হয়েছে এই প্রশ্নোত্তরে। বক্তৃতা মানে তো একতরফা বলে গেলাম—তার কতটা শ্রোতারা নিতে পারছে বোঝা যায় না। কিন্তু প্রশ্নোত্তর হ'লে সেটা বোঝা যায়। এ-প্রসঙ্গে বলি, ওখানে যে-সব বক্তৃতা করতাম, জার্মান ভাষায় একজন তার অনুবাদ ক'রে দিত। ঐ যে মেয়েটির কথা বললাম, মাথায় ছিট আছে, সে-ই বেশীর ভাগ অনুবাদ ক'রত। সে ভাল ইংরেজীও জানে, আর জার্মান তো তার মাতৃভাষা। দেখলাম, ভারতীয় এ-সব চিন্তার সাথে তার বেশ ভাল পরিচয়ও আছে। কাজেই, সে বেশ ভাল অনুবাদ করতে পারত। একবার হ'ল কি, মেয়েটির কি কারণে মার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। একটা সভাতে তারই অনুবাদ করার কথা—হঠাৎ বেঁকে ব'সল। সবাই প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত—হঠাৎ সে ব'লল: 'না, আমি পারব না।' কি করা যায়? তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জার্মান ছাত্র, সে ভাল ইংরেজী জানে, সে ব'লল, 'আমি অনুবাদ ক'রব।' আমি ইংরেজীতে দুটো-তিনটে বাক্য বলে যাচ্ছি। তারপর সে সেটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু তার অনুবাদ যে ঠিক হচ্ছে না, শ্রোতাদের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে একটু একটু ইংরেজী জানে—তারা প্রতিবাদ করছে: 'কৈ, তুমি তো ওটার অনুবাদ করলে না?' 'না, ঐ শব্দটার প্রতিশব্দ এটা নয়।' কিন্তু ঐ মেয়েটি অনুবাদ বেশ ভাল ক'রত। শ্রোতাদের দেখে তা বেশ বোঝা যেত। আর একজন ভদ্রলোক, অধ্যাপক ত্রিপাঠী—সম্ভবতঃ উত্তরপ্রদেশের লোক—তিনিও বেশ ভাল অনুবাদ করতেন। বহু বছর তিনি জার্মানিতে আছেন—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। খুব ভাল জার্মান জানেন তিনি। সংস্কৃত জানেন, পালি জানেন, ইংরেজী তো জানেনই কিছু কিছু তিনি উপনিষদ্ এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রও চর্চা-টর্চা করেন। ভাষা জানলেও, বেদান্ত-চিন্তার সাথে যদি বেশ পরিচয় না থাকে, তাহলে অনেক শব্দের ঠিকমতো প্রতিশব্দ বের করা বড় শক্ত। ঐ মেয়েটি ঠাকুর-স্বামীজীর বই খুব ভাল পড়াশুনা করেছে—সে তাই বেশ ভাল অনুবাদ করতে পারত, আর অধ্যাপক ত্রিপাঠীও পারতেন। আমার বড় বড় বক্তৃতাগুলি অধ্যাপক ত্রিপাঠীই অনুবাদ করতেন।

ওখানে সভাতে একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম যে, প্রথমেই থাকত কিছুক্ষণ ধ্যান। তখন একটা ভারতীয় সঙ্গীত বাজবে, সেই সঙ্গীতের বিন্দু-বিসর্গও হয়তো শ্রোতারা বোঝে না—কিন্তু ভাবটা হচ্ছে, একটা ভারতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সেইজন্য টেপ-রেকর্ডে কিছু কিছু

ভারতীয় গান বাজানো হ'ত। আজকাল ভারতীয় গান টেপ-রেকর্ড ক'রে ওখানে বিক্রি হয়। ফ্রান্স আর ইংলণ্ডে আমাদের আশ্রমেও দেখলাম, 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' বা অন্যান্য স্তোত্র টেপ-রেকর্ডে পাওয়া যায়। সে-সব চালানো হ'ত। আমি এখান থেকেও কিছু গান টেপ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেও বাজিয়ে শোনানো হ'ত। টেপ-রেকর্ড বাজবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান চলবে। ধ্যানের পর বক্তৃতা। আমি একটা-দুটো লাইন বলে চুপ ক'রে থাকতাম। তারপর অনুবাদক সেটার অনুবাদ ক'রত। তারপর আবার আমি বলতাম। এতে চিন্তার একটু ব্যাঘাত হ'ত। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধাও বোধ করতাম। চিন্তার ধারা রক্ষা করতে পারতাম না। তাই আমি একটা প্রস্তাব করলাম: 'আমি অন্তত মিনিট পাঁচেক বলার পর অনুবাদ ক'রে শোনালে কেমন হয়?' তা ওরা ব'লল: 'পাঁচমিনিটে তুমি তো অনেক কথাই বলতে পারো। অনুবাদক সবটা মনে রেখে অনুবাদ করতে পারবে না—অনেকটাই হয়তো সে বাদ দিয়ে যাবে। আর এই যে পাঁচমিনিট তুমি বলে যাচ্ছ—তখন তো শ্রোতারা চুপ ক'রে বসে থাকবে—এটাও ঠিক ভাল লাগবে না।' অবশ্য আমি জার্মানিতে দেখলাম, অনেকেই ইংরেজী একটু-আধটু জানে। বলতে পারে বা বুঝতে পারে। ওদের স্কুলে ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ বা রাশিয়ান বা অন্য যে-কোন একটা বিদেশী ভাষা নিতেই হয়—বাধ্যতামূলক সেটা। তাহলেও বক্তৃতার অনুবাদ করতেই হ'ত। অনুবাদক থাকলে তাদের বুঝতে সুবিধা হয়! হাজার হোক নিজের ভাষায় শোনা তো! আমার বক্তৃতাগুলি সাধারণতঃ বিকেলের দিকে থাকত আর সকালবেলা দ্রষ্টব্য স্থান সব ঘুরে দেখতাম। যখন ফ্রাঙ্কেদের বাড়ীতে ছিলাম—ওরা আমাকে নিয়ে শহর ঘুরিয়ে দেখাত। জার্মানির প্রত্যেক শহর সম্বন্ধে একটা কথা বলা চলে যে, বনের মধ্যে শহর বা শহরের মধ্যে বন। অর্থাৎ একটা বন থাকবেই থাকবে। ছুটি হলেই ওরা সব গাড়ী নিয়ে বেরুল—ঐ বনের মধ্যে চলে গেল। বাইরে রাস্তার ওপরে দেখা যাবে অসংখ্য গাড়ী। গাড়ীতে লোক নেই—সবাই চলে গেছে বনের মধ্যে। বনের মধ্যে ওরা বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, পিকনিক করছে। আমাকে ওরা বার্লিনের একটা বনে নিয়ে গেল। খুব ভাল লাগল। আর একটা বড় লেক দেখলাম—সেখানে ওরা 'বোটিং' (boating) করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: জঙ্গলে কোন জন্তু-জানোয়ার আছে কিনা। ওরা ব'লল যে, খরগোশ আছে, আর কিছু নেই। আমি ওখানকার বেশ কয়েকটি শহর দেখলাম। খুব সুন্দর শহর। না দেখলে বোঝা যায় না। আর বাড়ীগুলি ছবির মতো। পুরানো বাড়ী আছে, নতুন বাড়ীও আছে। নতুন নতুন যে-সব বাড়ী তৈরী হচ্ছে, সেগুলি বিরাট বাড়ী। কিন্তু দেখলাম, ওরা পছন্দ করে পুরানো বাড়ী। পুরানো বাড়ীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 'আর্কিটেকচারাল স্টাইল' যাকে বলে, সেটা পুরানো বাড়ীতে আছে। নতুন বাড়ীতে তা প্রায় নেই বললেই চলে। সেইজন্য দেখলাম ওদের বেশী পছন্দ পুরানো বাড়ী। আমার চোখেও পুরানো বাড়ীগুলিই বেশী ভাল লাগল। বাড়ীর ছাদগুলি সব দু-পাশে ঢালু। কারণ বরফের দেশ তো—ছাদটা ঢালু হ'লে বরফ গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবে। তা না হ'লে বরফ জমবে ছাদের ওপরে, বরফের চাপে ছাদটা ভেঙেও যেতে পারে। অধিকাংশ পুরানো বাড়ীরই ছাদ ঢালু।

[ক্রমশঃ]

আলোকের সাহায্যে জল হ'তে জ্বালানী

ডক্টর ধ্রুব মাজিত

পৃথিবীর জ্বালানীর ভাণ্ডার ক্রমশঃ শেষ হ'তে চলেছে—তাই সমগ্র বিশ্বজুড়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে সঞ্চিত জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে মানব সভ্যতা কী ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হবে! জ্বালানী-সমস্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ—এ কারণে যে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে প্রকৃতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একের পর এক জয় ক'রে মানুষ নিজেকে সভ্যতার এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে, যেখানে জ্বালানী-ব্যাপারটা তার অগ্রগতির পথে প্রধান সহায়, তার দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই জমানো সম্পদ একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগেই আগামী দিনের জন্য নতুন কিছু সন্ধান করার চিন্তা করতেই হচ্ছে - পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, কয়লা, কোল গ্যাসের অনুপস্থিতিতে যন্ত্রসভ্যতার রথ চালু রাখা হবে কিভাবে? আমরা জানি, প্রয়োজনীয়তাই হ'ল নিত্যনতুন আবিষ্কারের জননী। প্রয়োজনই উৎসাহিত করে মানুষের উদ্ভাবনী সাধনা ও কল্পনাকে! এক্ষেত্রেও তাই মানুষের অভাব-বোধই বিজ্ঞানীদের তাঁদের গবেষণাগারগুলির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে—প্রেরণা দিচ্ছে নতুন কিছু সন্ধান করার। বিজ্ঞানীদের সৃজনকুশলী হস্তের নিপুণতায় আমাদের হয়তো নিকট ভবিষ্যতেই আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'তে হবে জ্বালানী-সমস্যার সফল সমাধানের ব্যাপারে। বৈজ্ঞানিকদের কিছু কিছু কর্মকাণ্ডের কথা আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পারছি—যেমন সৌরশক্তির প্রয়োগ অর্থাৎ সূর্য-নিঃসৃত আলোক এবং তাপের বিপুল তেজভাণ্ডার যা কিনা সদাসর্বদা আমাদের কাছে জীবনের প্রেরণা হিসাবে এসে পৌঁছচ্ছে বা সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন উর্মিমালা হ'তে প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরের উষ্ণতাকে সফলভাবে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টার কথা। এই সব শক্তিগুলির নব মূল্যায়ন করা এবং প্রচলিত জ্বালানীর বিকল্প হিসাবে এগুলিকে প্রয়োগ করাই এখন ফলিত বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

সম্প্রতি জানা গেল—এ পর্যায়ে নতুন এক ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কিছু বিজ্ঞানী, তা হ'ল —জলকে আলোর সাহায্যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন-এ ভেঙে ফেলে তা হ'তে শক্তি আহরণ করা। নোবেল-পুরস্কারবিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক জর্জ পোর্টার (George Porter), অধ্যাপক গ্রাৎসেল (M. Gratzel), ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক কল্যাণসুন্দরম্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এভাবে শক্তি পাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁরা অনেকাংশে সফলও হয়েছেন। তাঁদের গবেষণা-সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করছি।

প্রকৃতিতে বিভিন্ন পদার্থে সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) হয়ে থাকে এবং অনেক-ক্ষেত্রেই তা হয়ে থাকে নিজে নিজেই অর্থাৎ তার স্বাভাবিক নিয়ম-অনুযায়ী। সালোকসংশ্লেষের ফলে পদার্থটি তার মূল উপাদানগুলিতে ভেঙে যায় এবং এর জন্য যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে, তাতে কিছু পরিমাণ শক্তির লেনদেন হয়।

রুথেনিয়াম ট্রাই ২, ২´ বাইপিরিডিন[২] এমনই

১ কাঁটা ছাড়া যেমন গোলাপ হয় না, বিজ্ঞানের সরস্বতীও তেমনি গণিত এবং সাংকেতিক চিহ্ন ছাড়া কথা কইতে পারেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই কিছু কিছু চিহ্ন প্রয়োগ করতেই হচ্ছে, না হ'লে ব্যাপারটা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত না হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

Ruthenium tris 2, 2´ bipyridine = $Ru^{3+}(bpy)_3^{3+}$

রুথেনিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ (element)।

একধরনের পদার্থ যা স্বাভাবিক দৃশ্যমান আলোকে (Visible light) ভেঙে যায় এবং রুথেনিয়ামেরই কাছাকাছি একপ্রকার পদার্থে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিত এই পদার্থটির তড়িৎ-চার্জ রূপান্তরের আগের পদার্থের চেয়ে কিছু কম হয়ে যায়। তড়িৎ-চার্জের পরিমাণ কমে যাওয়াটাই বিজ্ঞানীদের কাছে খুব উৎসাহব্যঞ্জক। পদার্থটির তড়িৎ-চার্জ কমে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই নয় —রূপান্তরের আগের পদার্থের গায়ে যখন দৃশ্যমান আলোক (4500 Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক) গিয়ে পড়ে, তখন পদার্থ হ'তে একটি ইলেকট্রন কণিকা অণুটির উত্তেজিত স্তরে উঠে যায় এবং দৃশ্যমান আলোকের 6150Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটি আলোক-রশ্মি পদার্থটি হ'তে বেরিয়ে আসে। সমস্ত ব্যাপারটি স্বাভাবিক তাপমাত্রা অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম তাপমাত্রায় ঘটা সম্ভব। এটাও বিজ্ঞানীদের কাছে একটি আশাব্যঞ্জক ব্যাপার। তড়িৎরাসায়নিক (Electrochemical) বিক্রিয়াটি মোটেই জটিল নয় বরং বলা চলে, এ-ধরনের সহজ সরল ব্যাপার প্রকৃতিতে হামেশাই ঘটে থাকে।

এখন রূপান্তরিত ঐ রুথেনিয়াম যৌগটির (Compound) সঙ্গে মিথাইল ভাইলোজেন[২] নামক অপর এক ধরনের যৌগিক পদার্থের বিক্রিয়া ঘটানো হয়। রুথেনিয়াম যৌগ এবং মিথাইল ভাইলোজেনের বিক্রিয়াটি একটি অনুঘটকের (Catalyst) উপস্থিতিতে হয় এবং তাদের উভয়েরই এক ধরনের রাসায়নিক রূপান্তর হয়, আর রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে তড়িৎ-চার্জের যে তারতম্য হয় তার ফলেই জলের (অর্থাৎ H_2O র) অণুটি ভেঙে হাইড্রোজেন পরমাণু গঠিত হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর এক অতি বিশিষ্ট ধর্মই হ'ল, ওটি অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। সামান্যতম আগুনের সংস্পর্শে এলেই তা জ্বলে ওঠে। সুতরাং উৎকৃষ্ট জ্বালানী হিসাবে হাইড্রোজেনের কদর খুবই

স্বাভাবিক তাপমাত্রার এক লিটার জল হ'তে এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রায় বারো লিটার বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাস (অবশ্যই স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং চাপে বারো লিটার গ্যাসের কথা বলা হচ্ছে পাওয়া সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। এবং সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটিকে তাঁরা গবেষণাগারে ঘটিয়ে যাচাই ক'রে নিতেও পেরেছেন। বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে রুথেনিয়ামের যে যৌগটি থেকে যায়, সেটিকে আবার ঘুরিয়ে বিক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে এনে হাজির করা হয়, ফলে ঐ একই পদার্থ দিয়ে বার বার কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব। কারিগরী দিক থেকে যৌগটিকে ঘুরিয়ে ফের ব্যবহার করার ব্যাপারটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর ফলে খরচ খুব কমে যাবে।

জলের অপর নাম জীবন—আর জলের প্রাচুর্যও পৃথিবীতে যথেষ্ট। আলোকের সাহায্যে ব্যাপকভাবে যদি জলকে ভেঙে হাইড্রোজেন গ্যাসের জ্বালানীতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তবে বিরাট একটি মৌলিক সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত হ'তে পারি। বিজ্ঞানের মতানুযায়ী জলকে বলা চলে 'হাইড্রোজেনের ছাই', কারণ হাইড্রোজেন গ্যাসকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পোড়ালেই জল পাওয়া যায়। এখনকার বিজ্ঞানীদের নতুনতম সাধনা হ'ল—হাইড্রোজেনের ছাই হ'তে হাইড্রোজেনের পুনর্মুক্তি ঘটানো; যেন কয়লার ছাই থেকে ফের কয়লা ফিরে পাওয়া।

বর্তমান যুগের জ্বালানী-সমস্যার তীব্র সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের সবদিক চিন্তা ক'রে দেখতেই হবে পেট্রোল, কেরোসিন, কয়লা ইত্যাদি প্রচলিত জ্বালানীগুলি ছাড়া আর কি কি হ'তে আমরা শক্তি আহরণ করতে পারি। এ-সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীগণ তাঁদের ভাবনা চিন্তা কতদূর এবং কি বিস্ময়করভাবে সম্প্রসারিত ক'রে চলেছেন সেগুলি সম্পর্কে আমরা একে একে ভবিষ্যতের সংখ্যাগুলিতে আলোচনা ক'রব।

২ Methyl Viologen—এটি এক ধরনের বর্ণহীন পদার্থ যাকে 4, 4'-dimethyl bipyridine বা Paraquat নামেও অনেক সময় উল্লেখ করা হয়।

সমালোচনা

In the lap of the Himalayas—Original in Bengali by Swami Akhandananda. Translation by Dr. Narendranath B. Patil. Published by Sri Ramakrishna Math, 16, Ramakrishna Math Road, Madras-600004. (1980), pp. 106+4+6. Price : 5·00।

সব সাহিত্যে কিছু পুস্তক আছে, যা বিষয়-বস্তুর মাহাত্ম্যে, প্রকাশনার প্রাঞ্জলতায়, লেখকের চারিত্রিক মহিমায় কালজয়ী হয়। এমনই একটি কালজয়ী পুস্তক হ'ল পরম পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দের 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে'। ১৩৪৫ সালে পুস্তক-আকারে প্রকাশের পর কত বছরই না অতিক্রান্ত হয়েছে—সেদিনের দুর্গম হিমালয়ের পথ আজ কত সুগম! কালের ভেদে প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্যরাশির প্রকাশ হয়তো সেই মহিমায় আজ বিকশিত নয়, তবু এই ভ্রমণকাহিনী আজও অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে একই-ভাবে বিমুগ্ধ করছে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সাধারণ দৃষ্টি নিয়ে হিমালয়কে দেখেননি—তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে শুধু দর্শনেন্দ্রিয় দিয়েই মূল্যায়ন করেননি—ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত একটি প্রাণ চৈতন্যময় নগাধিরাজকে দেখেছেন দেবতার লীলাভূমিরূপে—তাই তাঁর বর্ণনায় শুধু নিপুণ লেখকের সুমধুর বর্ণনাই নয়, আছে পবিত্রতায় উদ্বুদ্ধ মহামন্ত্র। তাই এই পুস্তকে পাই আত্মার অন্বেষণ, শুধুমাত্র ভ্রমণ-বিলাস নয়।

এমনই একটি মহৎ পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ (সারাংশ) উপহার দিয়ে ডঃ নরেন্দ্রনাথ বি. পাতিল বহু পাঠক-পাঠিকার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পুস্তকটির প্রকাশক মাদ্রাজস্থিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ'। প্রকাশকের মুখবন্ধে ইংরেজীতে পুস্তকটির প্রকাশনার উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেটি এতই মূল্যবান্ যে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা কঠিন। মুখবন্ধে বলা হয়েছে, "For, the Swami's writings give not only informative and thrilling accounts of men, countries and events, but also reflections of a philosopher and a lover of God, man and Nature, so that they are educative in the highest sense of the term." প্রকাশকের এই উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকা সম্ভব নয়। ইংরেজী অনুবাদটি এতই মনোগ্রাহী, যার ফলে প্রতি ছত্রেই পুস্তকটির 'বিশেষ শিক্ষণীয়' মূল্য প্রকাশিত হয়ে ওঠে। আনন্দের আর একটি কারণ, বাংলা ভাষায় লিখিত মূল পুস্তকটিকে পাশে রেখে 'In the lap of the Himalayas' পাঠ করলে, ইংরেজী অনুবাদের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে। দশটি ছোট ছোট পরিচ্ছেদে হিমালয়-ভ্রমণ পরিবেশিত হয়েছে। মূল বাংলা পুস্তকটিতে পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজীর বর্ণনা-মাহাত্ম্য, সজীব দৃষ্টিশক্তি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সমাজ সম্বন্ধে সদাজাগ্রত মনের ও হিমালয়-মাহাত্ম্য যে-ভাবে বিধৃত হয়েছে—ইংরেজী অনুবাদেও তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে—রসের ও স্বাদের কোথাও ব্যত্যয় ঘটেনি। এমন একটি সুমুদ্রিত পরিচ্ছন্ন মহৎ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্তভাবে প্রার্থনীয়।

অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন

শবরী পৃথিবী জাগে—শান্তশীল দাশ। প্রকাশক : সাহিত্য সদন, এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। (১৯৭৩), পৃঃ ১১৬, মূল্য : চার টাকা।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে শান্তশীল দাশ একটি পরিচিত নাম। বহুকাল ধরে তিনি কবিতা লিখছেন। বর্তমান গ্রন্থে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিরচিত ১০০টি

কবিতা স্থান পেয়েছে। সংকলনের অষ্টম কবিতার নামে সমগ্র গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। গ্রন্থের শীর্ষকের মধ্যেই সমগ্র কাব্যের ভাবব্যঞ্জনাটি প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। দুঃখে-দৈন্যে, আঘাতে-বেদনায়, লোভে-স্বার্থপরতায় জর্জরিত চারিদিকে হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার উন্মাদ কোলাহলে ক্লান্ত বিবর্ণ ব্যর্থ পৃথিবী আজ যেন শবরীর মতোই মুক্তি-প্রতীক্ষায় ও প্রিয়-প্রত্যাশায় দিন গুনে চলেছে। 'অহল্যা' কবিতাটির মধ্যেও অহল্যার প্রতীক ব্যবহার ক'রে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনায় আর্ত-আহত কবি ঐ একই জীবনজিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে—যেন তাদেরই একজন প্রতিনিধি হয়ে: "যুগ-যুগান্তের সেই পুঞ্জীভূত তপ্ত অশ্রুজল / কে মোছাবে? ক্ষমাসিক্ত কোথা প্রাণ করুণা-চঞ্চল?"

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণের অবক্ষয় ও অন্ধকার থেকে আলোর পথে, আশার পথে উত্তরণের অঙ্গীকারের অভীপ্সায়, একটি প্রসন্ন পবিত্র ঊর্ধ্বায়ত চেতনায় এই গ্রন্থের বহু কবিতাই প্রদীপ্ত ভাস্বর হয়ে আছে। "কবে হবে এ পৃথিবী আলোময়ী প্রসন্ন-বদনা? / শুচিশুভ্র স্নিগ্ধ হাস্যে বিচ্ছুরিবে আলোকের কণা?"—এই আন্তরিক জিজ্ঞাসাই বহু কবিতার মূল সুর। সুগভীর এবং একান্ত নিবিড় একটি নিসর্গপ্রীতিও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে আছে বহু কবিতায়। তবে প্রকৃতির স্নিগ্ধ শান্ত রূপের প্রতিই কবির যেন অধিক আকর্ষণ। ছোট ছোট আপাততুচ্ছ ঘটনাবলীর মধ্যে একটি দার্শনিক তাৎপর্য আরোপ ক'রে, মহৎ একটি মানবিক ও নান্দনিক মর্যাদায় কবি সমুত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছেন এই সব নিসর্গদৃশ্যাবলীকে। আলতো রঙে রেখায় ছোট ছোট পেনসিল স্কেচের মতো কবি অজস্র নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। আবার কতগুলি কবিতায় রয়েছে মন্থর স্মৃতিচারণা। এবং সেখানে বিরহের বেদনা-মধুর একটি প্রেমের স্মৃতি-আলেখ্য যেন বার বার ধরা দিয়ে গেছে। যদিচ সে প্রেম অনেক সময়েই স্নিগ্ধ সজল একটি গৈরিক প্রসন্ন ধূসরতায় এবং দার্শনিক বিবিক্তিতে দূরায়ত নক্ষত্রের মতোই শান্ত সমাহিত। তা সত্ত্বেও প্রাণের আবেগে উষ্ণ চঞ্চল কখন বা সেবা-সুন্দর দুটি কল্যাণময়ী হাতের আকর্ষণ কবিকে উন্মনা ক'রে তুলেছে বার বার। একটি বিষণ্ণ মধুর বিগত প্রেমের স্মৃতিচিত্র পাঠককে মাঝে মাঝেই ক্ষণিকের জন্য উন্মনা ও অশ্রুসজল ক'রে চলে যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলি, সমগ্র ভাবে শান্তশীলবাবুর কবিতার মধ্যে একটি সংযত প্রশান্তি, একটি প্রসন্ন স্নিগ্ধতা আমাদের পরিতৃপ্ত করে।

শান্তশীলবাবুর আর যে বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করে, তা হ'ল তাঁর সরল সহজ আন্তরিকতা, শুভবোধ ও মানবিকতার প্রতি অতন্দ্র একটি বিশ্বাস। তাঁর কবিতার এই গুণ সহজেই আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। কবি কখনও ভঙ্গি দিয়ে ভোলাতে চেষ্টা করেননি। ব্যক্তি-জীবনেও যেমন, কবিতার মধ্যেও তিনি নিজেকে অকপটে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভালো-মন্দ, দোষ-ত্রুটি, উৎকর্ষ-অপূর্ণতা নিয়ে তিনি যা এবং যতটুকু, ঠিক তাই এবং ততটুকুই আমরা চিনে নিতে পারি। নিজেকে কোথাও ঢেকে চেকে, সাজ-পোশাকে সজ্জিত ক'রে চমক সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করেননি। তাই ভূমিকায় তিনি নিজের সম্পর্কে অনায়াসেই লিখতে পেরেছেন, "কেউ কেউ বলেন, আপনার কবিতা বড় রবীন্দ্র প্রভাবিত; কেউ বা বলেন, আরো একটু আধুনিক হন না; কারো অভিমত, আপনার কবিতা বড় সহজে বোঝা যায়...সব অভিযোগই সবিনয়ে মেনে নেই। যা পারিনি, তার জন্য দুঃখ বোধ করি না। আমি যা নই, কবিতায় তা হ'তে চাইনি।" কবিচিত্তের এই শুদ্ধ সত্যানুসরণ ও

অকপট সারল্য—তাঁর কবিতাগুলিকে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছে।

ছন্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্য ও কুশলতা আমাদের খুশী করে। প্রচলিত পয়ার, দীর্ঘ পয়ার এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান পাঁচ মাত্রার ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করলেও সাত মাত্রার ও চার মাত্রার এবং আরো কিছু সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উজ্জ্বল উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করেছি। কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেছে বলে মনে হ'ল। সব মিলিয়ে বইটি সাধারণ্যে সমাদৃত হবে আশা করি। বিশেষ ক'রে চারিদিকের এই অবক্ষয় এবং অন্ধকারের অতলে ডুবতে ডুবতেও যারা আলোকিত মনুষ্যের স্বপ্ন দেখে, এই জগৎ ও জীবনকে যারা নতুন সুন্দর ক'রে গড়ে তুলতে আগ্রহী, আমাদের এই মানুষের নক্ষত্রকে নবজাতকের বাসযোগ্য ক'রে যেতে চায় যারা—তাদের কাছে বইটির আবেদন অনস্বীকার্য। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

জ্ঞানমন্থি: মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: স্বামী সোমানন্দ, সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ আশ্রম, ৬৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৩। (১৯৮১), পৃঃ ৪৮+৪ ; মূল্য: চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে 'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা ও তত্ত্বকথা কবিতার ছন্দে লিখিত ও বিশ্লেষিত। এখানে ভক্তিভাবই মুখ্য, ছন্দঃপতন বা মুদ্রণ-প্রমাদ গৌণ বলেই আমার ধারণা। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা জীবনকে আরও ভালোভাবে তুলে ধরার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। যা হোক, পরবর্তী সংস্করণে সেদিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে কবির ভক্তিরসাশ্রিত কাব্য 'জ্ঞানমন্থি' আরও বেশী সার্থক ও মহিমান্বিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা ও দক্ষিণেশ্বর মন্দির-সমন্বিত প্রচ্ছদ অর্থবহ, সার্থকনামা ও সঙ্গতিপূর্ণ হবে। ছাপা, বাঁধাই ভালো। প্রচ্ছদ ও আর্টপেপারে ছাপা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা চিত্রটি মনোরম। অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক গ্রন্থটি সমাদৃত হ'লে খুশী হবো। তবে আয়তনের তুলনায় গ্রন্থটির বিক্রয়মূল্য আজকের অর্থসংকটের দিনে একটু বেশী বলেই মনে হয়। এর ফলে অল্পায়তনবিশিষ্ট গ্রন্থটির বহুল প্রচার ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। সেদিকে প্রকাশক ও গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে :

(১) পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যা-ত্রাণকার্য সমাপ্ত।

(২) বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন : উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগ ও মালদায় পুনর্বাসনকার্য যথারীতি অব্যাহত আছে। গত ৭ই ফেব্রুআরি ১৯৮২, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক কালিয়াচকস্থিত (মালদা জেলা) বন্যাপীড়িতদের মধ্যে প্রথম কিস্তিতে নবনির্মিত টালির ঘর প্রত্যর্পিত হয়।

(৩) অরুণাচল প্রদেশ—অগ্নিত্রাণ : নরোত্তম-নগর কেন্দ্র পরিচালিত অগ্নিত্রাণ-সাহায্য ৩ইটি ওয়াংচু গ্রামের ১০৫টি ভস্মীভূত গৃহের পরিবারবর্গের মধ্যে ১,৫৫০ কিলো চাউল, ১৬০ কিলো লবণ, ১১০ কিলো চা-পাতা, ১১৫টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, ৩০টি থালা, ১৪৫টি মগ, কম্বল ১৪৫খানি এবং মহিলাদের জন্য ১১৫খানি মেখলা বিতরিত হয়।

ভিত্তিস্থাপন

গত ৫ই ফেব্রুআরি ১৯৮২, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কর্তৃক লক্ষ্ণৌস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম নির্মীয়মাণ ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

উৎসব

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৭তম আবির্ভাবতিথি গত ২৫শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, যথারীতি ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন স্বামী প্রভানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ২৮শে ফেব্রুআরি সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেইদিন প্রায় ৩৫,০০০ নরনারীর মধ্যে হাতে হাতে রান্না-করা প্রসাদ বিতরিত হয়। দিনের শেষে—বৈকালের দিকে প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৭তম আবির্ভাবতিথি ২৫শে ফেব্রুআরি, যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৭০০০ নরনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবময়ানন্দ। ১লা মার্চ পুরস্কার-বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীতপনকান্তি রায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী উমানন্দ।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি-উৎসব পাঁচ-দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের শেষদিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পারিতোষিক-বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে আশ্রমে একটি 'চক্ষু-অপারেশন শিবির' খোলা হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

(১) গত ৮ই হইতে ১৪ই ফেব্রুআরি ১৯৮২, কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় সপ্তাহব্যাপী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

(২) গত ২৬শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ হইতে ১৮৫ জন ছাত্র এই সম্মেলনে যোগদান করে। প্রতিদিন অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল শরীরচর্চা, অধিবেশন ও প্রশ্নোত্তর। বিভিন্ন দিনের অধিবেশনে ভাষণ দেন স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, স্বামী উমানন্দ, স্বামী বিশোকাত্মানন্দ এবং আরো অনেকে।

বাংলাদেশের সংবাদদর্পণে

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৭তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের শেষ তিন দিনের (২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুআরি, ১৯৮২) যে-বিবরণ বাংলাদেশের The Bangladesh Observer, The Bangladesh Times, বাংলার বাণী, দৈনিক সংবাদ প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

২৮শে ফেব্রুআরি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন :

শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক জগতে সমুজ্জ্বল তারকার মতো। মানবসমাজের কাছে তিনি যে-আদর্শ তুলে ধরেছেন, তা-ই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তিনি মানুষকে ভালবেসেছিলেন এবং বলেছিলেন মানুষের সেবাই প্রত্যেকটি মানুষের প্রধান কর্তব্য। তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতের বিভিন্ন দেশে তাঁর আদর্শ প্রচার করেছেন। আজ রামকৃষ্ণ মিশন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের সেবায় নিয়োজিত।

এদিনের অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার শাচরিতারণ সিনহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, বিচারপতি শ্রীরণধীর সেন, ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ ও সভাপতি বিচারপতি শ্রীদেবেশ ভট্টাচার্য তাঁহাদের ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

২৭শে ফেব্রুআরি, কবি বেগম সুফিয়া কামাল 'শ্রীসারদাদেবী ও নারীজাগরণ' শীর্ষক আলোচনায় শ্রীসারদাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, 'নারীজাতিকে অবহেলা ক'রে কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। নারী ও নারীত্বের মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বামী অক্ষরানন্দ, সুধা সেন, মালতী খান, দিলরুবা, স্বপ্না সাহা, প্রতিভা রায় ও সভানেত্রী রেবা সেন।

২৬শে ফেব্রুআরি, বাংলাদেশের রেল, সড়ক ও জাহাজ-চলাচল মন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী, 'ধর্ম ও সমাজের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা' শীর্ষক আলোচনায় বলেন :

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারত-উপমহাদেশের দুজন মহান্ ব্যক্তি। তাঁরা ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দিয়েছিলেন এবং মানবজাতিকে ভালবাসার মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, বিচারপতি শ্রীদেবেশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উপলক্ষে শোভাযাত্রা

শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাবতিথি ২৫শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিট্যুট অব কালচার এবং রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান হইতে ২১শে ফেব্রুআরি দুইটি শোভাযাত্রা সকাল ৬॥টায় বাহির হইয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতে করিতে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করিয়া একত্র মিলিত হয় যতীন বাগচী রোডে। সেখান হইতে তাহারা বিবেকানন্দ পার্কে যায়। সেখানে আয়োজিত সমাবেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা এবং ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী গহনানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ ও স্বামী অনন্তানন্দ।

শোভাযাত্রায় যোগদান করেন প্রায় আট হাজার ভক্ত নরনারী ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি-উৎসব

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৭তম আবির্ভাবতিথি গত ২৫শে ফেব্রুআরি (১৯৮২), বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। ৪টা ৩০ মিনিটে মঙ্গলারতির পর শ্রীদীপ্তিপ্রকাশ বসু ভজনসঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর সারদানন্দ হলে শ্রীদীপ্তিপ্রকাশ বসু পাঁচালি ছন্দে গীত পরিবেশন করেন। ইহার পর স্বামী নিরাময়ানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনীরেন্দু চৌধুরী।

শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে ২১শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর উদ্যোগে সকাল ৮টায় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির হয়। তাহাতে যোগদান করেন বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, বাগবাজার বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থী ও ভক্তবৃন্দ এবং বহু অনুরাগী ভক্ত নরনারী। এই শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া বাগবাজার স্ট্রীট, শ্যামবাজার মোড় হইয়া দেশবন্ধু পার্কে শেষ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট টেম্পোতে বাহিত হয়। বালকেরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি বহন করিয়া লইয়া যায়। বহু বাণী ও পতাকায় শোভিত, ব্যাণ্ডবাদ্য ও কীর্তন-মুখরিত, ধূপের গন্ধে সুরভিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত সমগ্র শোভাযাত্রাটি সারা পথে এক দিব্য আনন্দ-উৎসবময় পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। বহু ভক্ত নরনারী, বালক-বালিকা এবং সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের এই সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রাটি পথের অগণিত দর্শকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোভাযাত্রাশেষে দেশবন্ধু পার্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী ভর্গানন্দ ও স্বামী অমলানন্দ। সমবেত সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

৯ই মার্চ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ পূজা হয় এবং ১৩ই মার্চ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়।

সন্ধ্যারতির পর (৬॥টায়) সারদানন্দ হলে স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী সন্মাত্রানন্দ গত ৩রা ফেব্রুআরি ১৯৮২, ভোরবেলায় ৫-১৫ মিনিটে ৭৬ বৎসর বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মস্তিষ্কে রক্তহীনতা ও অন্যান্য উপসর্গহেতু তাঁহার দেহান্ত হয়। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮১, তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করিবার পূর্বেও একাধিকবার তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গত কয়েক মাস যাবৎ বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে থাকিয়া অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবন সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি বারাণসী, নিউ দিল্লী, কনখল, সারদাপীঠ (বেলুড়), উদ্বোধন (কলিকাতা), দেওঘর, শ্যামলাতাল এবং রাজকোট কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সরল, অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি ছিলেন সবার প্রিয়।

বিবিধ সংবাদ

মাছেরা কি বধির ?

বিগত শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল জলের মধ্যে যে-সব মাছ থাকে, তাহারা বধির। বহুদিন ধরিয়া নানা গবেষণার পর বর্তমানে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে জানা গিয়াছে, যে-সব মাছের 'বায়ু-থলি' বা 'এয়ার-স্যাক' আছে, তাহারা শুনিতে পায়। তাহাদের ঐ বায়ু-থলি'ই জলজ শব্দকে কর্ণে পৌঁছাইয়া দিতে সাহায্য করে। কিন্তু সব মাছের আবার ঐ 'বায়ু-থলি' নাই—যেমন হাঙর জাতীয় সামুদ্রিক মাছের। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, তাহারাও শুনিতে পায়, তবে কিভাবে তাহা এখনো বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ডিসেম্বর, ১৯৮১]

জন্মজয়ন্তী

খিদিরপুর সুরবিতানে ২৫শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ২৫শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, সঙ্গীত, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১লা মার্চ সন্ধ্যারতির পর স্বামী অসঙ্গানন্দের সভাপতিত্বে বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৮১) পাঠ করেন আশ্রমের সচিব শ্রীঅনিলকুমার বসু। বিবরণে প্রকাশ এই সেবাশ্রমে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৯৮১ খ্রীঃ দৈনিক গড়ে ১৫৮ জন চিকিৎসিত হন। একটি লাইব্রেরি আছে, তাহাতে পুস্তকসংখ্যা ১৪০৪ এবং ছাত্রাবাসে ছাত্রসংখ্যা ১৩।

রাধামোহনপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রে ৩রা মার্চ ১৯৮২, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠের দ্বারা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অপরাহ্ণে বিবেকানন্দ স্কুলে ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বদাত্মানন্দের পৌরোহিত্যে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ-বিতরণের দ্বারা সুচারুরূপে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

পুরুলিয়া প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের উদ্যোগে ২০শে ও ২১শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, দুইদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ২০শে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে মধ্যাহ্নে সভার আয়োজন করা হয়। স্বামী সুবিচারানন্দের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন শ্রীরথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, সংঘের সম্পাদক শ্রীপতুলচন্দ্র চৌধুরী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীপ্রণব বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে ৪০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রাজারহাট (বিষ্ণুপুর) 'নিরঞ্জনধামে' ৭ই মার্চ ১৯৮২, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের শুভ আবির্ভাবতিথি-উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, কীর্তন ও নরনারায়ণসেবা হয়। বিকালে স্বামী জিনানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

যুবসম্মেলন

তিলজলা বিবেকানন্দ যুবকেন্দ্রের বার্ষিক অধিবেশনে ৭ই মার্চ ১৯৮২, সন্ধ্যায় ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্থানীয় তরুণ-তরুণী এবং ভক্তজনের সমাবেশ ঘটে। সভায় শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ 'শ্রীমায়ের বাণী ও নারীসমাজ' সম্বন্ধে এবং

অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন 'যুবসমাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান' বিষয়ে ভাষণ দেন। সভাপতির 'কথামৃতের ভূমিকা' সম্পর্কে বক্তৃতার পর সভা সমাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-শতবার্ষিকী উৎসব

কলিকাতা ৩৮ নং বিডন স্ট্রীটস্থ নাগ-ভবনে শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের লিপি-আরম্ভের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে গত ২৬শে, ২৭শে এবং ২৮শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, তিনদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠানে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের পটভূমিকায় ছোট খাটে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ও পদতলে মেঝের উপর উপবিষ্ট শ্রীম'র মূর্তি নিপুণভাবে সজ্জিত করা হয়।

২৬শে ফেব্রুআরি বিকাল ৫টায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশম্ভুচন্দ্র ঘোষ। প্রথমেই তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণীর উল্লেখ করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। পরবর্তী দুইদিনও তিনি কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ফাদার ইমানুএল (Immanuel), শ্রীমুরারীমোহন কাব্য-বেদান্ততীর্থ, ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেশ্বর নাগ চৌধুরী নিপুণভাবে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। ২৭শে ফেব্রুআরি, ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং শ্রীমতী শুক্লা হাজরা ও সম্প্রদায় কর্তৃক কীর্তন পরিবেশিত হয়। ২৮শে মধ্যাহ্নে পাঁচ শতাধিক দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রী উৎসবের সংবাদ নিম্নলিখিত স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে :

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, স্বামী শিবানন্দ গিরির উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী গহনানন্দ।

বিবেকানন্দ উৎসব সমিতির উদ্যোগে ২৭শে ফেব্রুআরি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'রমেশ ভবনে' ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা পাঠক-পাঠিকাকে জানানো যাইতেছে যে, পুনর্মুদ্রণ অংশ পাতার উপরে উল্লিখিত সন, মাস এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা আমাদের পূর্ববর্তী সংখ্যার 'পুনর্মুদ্রণ' অংশের ধারাবাহিক সন, মাস ও পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং নীচের ছোট টাইপে লিখিত পৃষ্ঠাসংখ্যা 'বর্তমান' সংখ্যার ধারাবাহিক মাস, সন ও পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ মাত্র।—সঃ

[অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ Revelation.]

বিচারান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিলেন,—

"দেখেছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার,—তিনি যদি তাঁর মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার কর্‌তে হয় না, কারুর বুঝিয়েও দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘস্‌তে ঘস্‌তে দপ্‌ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ করে আলো যদি তিনি দেন, তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

(কালী* ও ব্রহ্ম†)

তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কৈ, কালীধ্যান তিন চার দিন কর্‌লুম, কিছুই তো হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল্‌চো, তাঁকেই কালী বল্‌ছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর তাঁর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাব্‌লেই দাহিকাশক্তি ভাব্‌তে হয়, দাহিকাশক্তি ভাব্‌লেই অগ্নি ভাব্‌তে হয়। কালী মান্‌লেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়, আবার ব্রহ্ম মান্‌লেই কালী মান্‌তে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি (কালী) অভেদ। ঐ শক্তি ঐ কালী আমি বলি।"

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরিশের থিয়েটর্ যেতে হবে। তাই হরিপদকে বলিলেন, "ভাই একখান গাড়ী যদি ডেকে দিস্—থিয়েটর্ যেতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। দেখিস্ যেন আনিস্। (সকলের হাস্য)।

হরিপদ (হাসিতে হাসিতে)। আমি আন্‌তে যাচ্চি—আর আন্‌বো না?

(ঈশ্বর লাভ ও কর্ম্ম ; 'রাম ও কাম')

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটর্ এখন যেতে হবে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রাখতে হবে ; "জনক রাজা ইদিক্ উদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়ে ছিল দুধের বাটী।" [সকলের হাস্য।]

গিরিশ। থিয়েটর্‌গুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে কর্‌চি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, না, ও বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্চে।

নরেন্দ্র। এইতো ঈশ্বর বল্‌ছে, অবতার বল্‌ছে। আবার থিয়েটরে টানে।

* কালী—God in his relations to the conditioned.
† ব্রহ্ম—The unconditioned, the Absolute.

(চৈত্র, ১৩০৮, পৃঃ ১৩৭)

[পুনর্মুদ্রণ]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরো সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরো উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রর প্রতি)—"মান কর্‌লি তো কর্‌লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)।"

(বিচার ও ঈশ্বর লাভ)

(নরেন্দ্রের প্রতি) "যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার কর্‌ছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

"নিমন্ত্রণ বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়, যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায় (সকলের হাস্য)। আরো কম্‌তে থাকে। দই পাতে পড়্‌লে কেবল সুপ্‌ সাপ্‌। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হলে, আর শব্দ—বিচার—থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি!"

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

কেন এরূপ করিতেছিলেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছিলেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর দর্শন?

কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ঐ দেখ, বহির্জগতের হুঁস চলিয়া যাইতেছে। এরি নাম বুঝি অর্দ্ধবাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইত? এখনো নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। এতো গা টেপা পা টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা কর্‌ছেন, না শক্তি সঞ্চার কর্‌ছেন?

দেখিতে দেখিতে আরো ভাবান্তর হইল। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত জোড় করে কি বলছেন।

বলছেন—"একটা গান (গা)—তাহলে ভাল হব—উঠ্‌তে পারবো কেমন করে—গোরা প্রেমে গর্‌গর মাতোয়ারা (নিতাই আমার)—

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্; চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ করে রহিলেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বলছেন।—

"দেখিস্ রাই যমুনায় যে পড়ে যাবি—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী।"

আবার ভাবে বিভোর। বলিলেন,

"সখি সে বন কত দূর।
(যে বনে আমার শ্যামসুন্দর)
(ঐ যে কৃষ্ণ গন্ধ পাওয়া যায়)
(আমি চলিতে যে নারি)"

(সপ্তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৩৮)

এখন জগৎ ভুল হয়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় বসে আছেন কিছুই হুঁস্ নাই। এখন মন প্রাণ ঈশ্বরে গত হয়েছে। 'মদগত অন্তরাত্মা'।

'গোরা প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান। আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন—

"ঐ একটী আলো আসচে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আসচে এখনো বুঝতে পারছি না।"

এইবার নরেন্দ্র গান গাইলেন—

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ ॥
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে।
কোথায় আমি অতি দীন হীন ॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবার বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতে লাগিল। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে কে নিয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী—অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই কালীবাড়ীতে যাইবেন—গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি—উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁকে উঠান হইল। এখনো 'গর্গর মাতোয়ারা'।

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা—যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত-হৃদয়ে]

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত রামকৃষ্ণছবি—স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজ্‌লিস্—সুখ স্বপ্নের ন্যায় নয়ন পথে সেই প্রেমের হাট্—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটী আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন,

সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।
মোহিলে প্রাণ ॥

কেউ ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্চেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চৌদ্দ পোয়া মানুষ কেমন করে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হল। কি বুঝলাম? বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝলাম না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বেশ বল্লেন 'যতক্ষণ বিচার—ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।' তা ও বটে! এই তো এক ছটাক্ বুদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বুঝ্‌বো। ঈশ্বরের

(চৈত্র, ১৩৮৮, পৃঃ ১০৯)

কথা? এক সের বাটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বল্লেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ করে, তাহলে এক দণ্ডেই বুঝা যায়। Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন "Light! More Light!" তিনি যদি দপ্ করে আলো জেলে দেখিয়ে দেন। তবে—

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ,

যেমন Palestineএ মূর্খ ধীবরেরা Jesusকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন, অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

"যদি দপ্ করে তিনি না দেখান্, তাহলে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্‌ছেন ও কথা, সে কালে অবতারে বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখিয়েছেন,—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।—গুরুবাক্যে বিশ্বাস!

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা॥"

"আমার তাঁর বাক্যে ঈশ্বরকৃপায় বিশ্বাস হয়েছে—আমি বিশ্বাস করবো। অন্যে যা করে করুক—আমি এই দেবদুর্ল্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়বো? বিচার থাক্। জ্ঞান চর্চ্চড়ি করে কি আর একটা Faust হব? আবার কি, গভীর রজনী মধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিবে, আর আমি একাকী ঘরের মধ্যে 'হায় কিছু জানিতে পারিলাম না, Science, Philosopoy বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এ জীবনে ধিক্' এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব? না Alastor-এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিব? না; আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্ জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ কর্‌তে যাবার প্রয়োজন নাই। আর, এক সের বাটীতে চার সের দুধ ধরলো না বলে মরিতে যাবারও দরকার নাই। বেশ কথা,—গুরুবাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবন্, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও, আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজতে যাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—অমলা, অহেতুকী—ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর।'

"আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, 'কি ভালবাসা! গিরিশ থিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়ীতে যেতে হবে। শুধু তা নয়। এমনও বল্‌ছেন না যে, সব ত্যাগ কর—আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি—এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন ঘায়ের মামড়ী—ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়্‌লে, রক্ত পড়ে কষ্ট হয়; কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই—তারা বলে এক্ষুণি সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয় এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

(৮ভতম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৪০)

"আর, গিরিশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, প্রভু তুমিই ঈশ্বর—মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য। গিরিশ ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে; কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; কে ধরায় পতিত দুর্ব্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে; কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব্ববৎ অমৃতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, যাঁরা তদ্গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই—'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ সম্ভবামি যুগে যুগে।'

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য ক্রন্দন। বলেন, 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন। এ প্রেম তো মানুষ-জ্ঞানে নয়; এ প্রেম দেখ্‌ছি—ঈশ্বর প্রেম। ছেলেরা—শুদ্ধ-আত্মা স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই, বিষয়কর্ম্ম করে করে এদের লোভ অহঙ্কার হিংসা ইত্যাদির স্ফূর্ত্তি হয় নাই—তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত, কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। তাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান্, খাওয়ান্, শোয়ান্, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান; লোকের খোসামোদ করে বেড়ান্—কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী করে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্ব্বদা বলেন—ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেম?—মাটীর প্রতিমাতে এ্যতো * ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর—শুদ্ধনরদেহে হয় না?

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন; apparent manকে (বাহিক মনুষ্যকে) ভুলে গেলেন—Real manকে (প্রকৃত মনুষ্যকে) দর্শন করতে লাগলেন: অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল—যাঁকে দর্শন করে কখন অবাক্ স্পন্দহীন হয়ে চুপ করে থাক্‌তেন—কখন বা ওঁ ওঁ বলতেন; কখন বা মা মা করে বালকের মত ডাক্‌তেন। নরেন্দ্রের ভিতর—তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখ্‌তেন, নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল!

"নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই,—তার আর, কি হয়েছে? ঠাকুরের দিব্যচক্ষু; তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে—বড় আপনার লোক, তিনি যে—আপনার মা, পাতানো মা ত নন্; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ করে আলো জেলে দেখিয়ে দেন না?—তাই বুঝি ঠাকুর বল্লেন,—

"মান কর্‌লি ত কর্‌লি, আমরাও তোর মানে আছি।"

"আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয়; তাঁর উপর অভিমান কর্‌বেন না ত কার উপর অভিমান

* যেখানে এ'র মাথায় হসন্তর মতন চিহ্ন থাকিবে (এ'), সেখানে এ'র উচ্চারণ করিবেন, যেমন এক=য়্যাক=এ্যক।

করবেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের, এ'ত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এ'ত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সেই গভীর রাত্রে, রামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বর্ত্তমান ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ।] [১বঃ—২৩৭ পৃষ্ঠার পর

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠীকুল একমতি। কুসীদকশাহস্ত বণিক সকলের হৃৎকম্প উৎপাদক। অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সেজন্য বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তির সঞ্চার হয়, বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই।

"বণিক কোন্ দেশে না যায়?" নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে এক দেশের বিদ্যাবুদ্ধি কলা কৌশল বণিক অন্য দেশে লইয়া যায়। যে বিদ্যা সভ্যতা ও কলাবিলাসরূপ রুধির, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজহৃদ্‌পিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনীযোগে তাহা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। এ বৈশ্যপ্রাদুর্ভাব না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্যভোজ্য সভ্যতা বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত?

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্ব্বাঙ্গ হইয়াও সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে "জঘন্যপ্রভবো হি সঃ" বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে "জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি" দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই "চলমান শ্মশান", ভারতেতর দেশের "ভারবাহী পশু" সে শূদ্রজাতির কি গতি? এদেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্ত্তী ইংরাজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্যতমসাবরণ এখন সকলকে সমান ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্ব্বলের যেনতেন প্রকারে সর্ব্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম্ম পরের দাসত্বে; সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে, বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকিরণে; এ

(৮০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১০২)

শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা। ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ নিদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশজনে লক্ষজনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতি মাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদিবর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে ও শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্য্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরুস্ক স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপিও এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম্মকর্ম্ম-সহিত সর্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্ব্বাভাষচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্ এনার্কিজম্ নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটী বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীন কালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জ্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দু-একটী অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লয়। তাহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ, অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাহার নিজের জাতি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্ম্মণ্য মনুষ্য সকল শূদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর, বা সারথি—কুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরেরও স্বসমাজ ত্যাগের অধিকার নাই। কাযেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্য্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া মধ্যগত লোক সকলের ধীরে ধীরে উন্নতি বিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে জাতি নির্বিশেষে দণ্ডপুরস্কারসঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

(চৈত্র, ১৩০৬, পৃঃ ১৪৩)

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে তত পরিমাণে তাহা দুর্ব্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা: যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছলবল কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজা-সহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যত কাল এই ভাব থাকিবে ততকাল এইরূপ রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি—সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুষ্যবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্যও—একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্ম্মানির, ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার—উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থ-ত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্য্যন্তও অসম্ভব। এই স্বার্থ রক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও যেনতেন প্রকারেণ উদর পূর্ত্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি। আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্ম্মে বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্ত্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারত জীবনের উচ্চতম সোপান।

—*—

উদ্যমশীল মার্কিণ যুবক।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত।)

জন্ স্মীথ্ নামক এক কৃষকনন্দন ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেন। দুইটি ভ্রাতার মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ; অল্প বয়সেই তাঁহাদের পিতার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষি-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যাহা উপায় করিতেন, তদ্দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮'০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২'৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫'২৫ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭'৮০ ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ মূল্য ৮'২৫ ; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯'৫০ ; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩'৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাঁধাই ৬'০০ ; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ১'৭৫

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৫'২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪'২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ (সাধারণ বাঁধাই) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২'২৫
„　(কাপড়ে বাঁধাই) পৃঃ „ মূল্য ২'৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি —অক্ষয়কুমার সেন ; ১০ম সং, মূল্য ৩৩'০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭'৫০, ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২'০০

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২০'০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬'০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৬'০০ (২য় সংস্করণ)

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৫, মূল্য ১৬'০০ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬'০০/; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮'০০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩০৬, মূল্য ৮'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪·০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১·৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী — পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪·৫০

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়—পৃঃ ৪৪, মূল্য ০·২৫

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা — স্বামী দেবানন্দ। ২য় সং, পৃঃ ৭৬, মূল্য ১·২৫

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩·৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬·০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২·৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৭৪, মূল্য ২৪·০০

ধ্যান — স্বামী ধ্যানানন্দ। পৃঃ ১০২, মূল্য ৩·৫০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৪শ সং, পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪·০০

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি— স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২·৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮·০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত :

১ম ভাগ পৃঃ ৪৪৪, মূল্য ১৫·০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১·০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ২·২৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮·৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। ১৫শ সং, পৃঃ ৫১৯, মূল্য ১২·৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ৪র্থ খণ্ড ৩·০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩·০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯·০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২·০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ—(স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২·০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০·০০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ৩·০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮·০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩·০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য (সাধারণ বাঁধাই) ৩·৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪·০০

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত
সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন

বৈশাখ ১৩৮৯

৮৪তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা





উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত


তেল মাখা কি
ছেড়েই দিলি?

উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৮১

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী ঃ			
	বুদ্ধ ও শঙ্কর	...	...	১৪৫
২।	কথাপ্রসঙ্গে ঃ			
	ইতিহাসের অঙ্গনে বুদ্ধ ও শঙ্কর	...	...	১৪৬
৩।	ভারতীয় যুবকদের প্রতি আহ্বান	... স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	...	১৪৮
৪।	লঘুবিবেকানন্দম্ (স্তোত্র)	... স্বামী মুখ্যানন্দ পুরী	...	১৫০
৫।	বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি (কবিতা)	... শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়	...	১৫২
৬।	পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন	... স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	...	১৫৩
৭।	প্রভু মোর হৃদয়ে বিরাজে (কবিতা)	... শ্রীমতী চিত্রা মিত্র	...	১৫৯
৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা	... স্বামী বুধানন্দ	...	১৬০
৯।	বৌদ্ধসঙ্ঘ	... স্বামী পরাশরানন্দ	...	১৬৪

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

ছাপা নাই।

নবমবার মুদ্রিত হইতেছে

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। ...মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল।

মিডিয়াম সাইজে ৪৮০ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা: বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ।

ষষ্ঠ মুদ্রণ—দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৩

মূল্য—১৪৲

দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা...প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক...সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

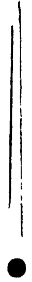
সপ্তম সংস্করণ—১৪৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

১০। আশা জাগে (কবিতা) ... শ্রীমতী হিমানী রায় ... ১৬৮
১১। আর্তি (গান) ... শ্রীগুরুদাস মুখোপাধ্যায় ... ১৬৮
১২। বিবর্তনবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ ... ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৬৯
১৩। সমালোচনা ... ডক্টর জলধিকুমার সরকার ... ১৭৭
১৪। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১৮০
১৫। বিবিধ সংবাদ ১৮৪
১৬। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ... পুনর্মুদ্রণ (বৈশাখ, ১৩০৭ ; পৃঃ ১২৯-৩৬) ... ১৮৫







৮৪তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৮৯

15 MAY 1982

দিব্য বাণী

বুদ্ধ ও শঙ্কর

…সহস্র বৎসর ধরিয়া যে মহান্ তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মূর্তি দেখিতে পাই। তিনি আর কেহ নহেন—আমাদেরই গৌতম শাক্যমুনি। তোমরা সকলেই তাঁহার উপদেশ ও প্রচারকার্যের বিষয় অবগত আছ। আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, জগৎ এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই। তিনি কর্মযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।…

ইনি দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেজন্য ইনি দেবভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ-লোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইনি দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় রামের মতো ইনি চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।…

* * *

সেই ব্রাহ্মণযুবক, যাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ষোড়শ বর্ষে তিনি তাঁহার সকল গ্রন্থ-রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা আধুনিক সভ্য জগতের এক বিস্ময়! আর তিনিও ছিলেন বিস্ময়জনক! তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র ভারতকে তাহার প্রাচীন পবিত্রভাবে লইয়া যাইতে; কিন্তু ভাবিয়া দেখ—এই কার্য কত কঠিন ও কত বিরাট!…মহান্ দার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৫৮-৫৭, ১৫৯]

কথাপ্রসঙ্গে

ইতিহাসের অঙ্গনে বুদ্ধ ও শঙ্কর

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা দেশকালপাত্রের উর্ধ্বে এক নিত্য সনাতন তত্ত্ব। আর ইতিহাস দেশকালের সীমানার মধ্যে—অর্থাৎ ইতিহাসের অঙ্গনে কয়েকজন ব্যক্তির জীবনের কিছু ঘটনা। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কি সম্ভব? অর্থাৎ যাঁহারা ধর্মজগতের মানুষ, পৃথিবীতে যাঁহারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক দিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের কি ইতিহাসের সন তারিখ দিয়া বাঁধা যায়, না ইতিহাসের মাপকাঠি দিয়া মাপা যায়? এ প্রশ্ন চিরন্তন! কেহ বলেন আমাদের ধর্ম বড, কারণ আমাদের ধর্মের ইতিহাস আছে; অপর জন বলিবেন, আমার ধর্ম বড়, কারণ আমার ধর্মের ইতিহাস নাই! এ বড় কঠিন সমস্যা! কোথায় ইহার সুমীমাংসা? কী ইহার সদুত্তর?

এ কথা অবশ্যই সত্য যে, ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা একটি নিরপেক্ষ সত্তা এবং উহা নিত্য সনাতন—উহা কোন দেশ কাল বা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না, যথা বিজ্ঞানজগতের মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ। উহা সর্বদা সর্বত্র সত্য, নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া যে, উহা পার্লামেন্টে পাশ করা আইনের মতো একমাত্র ইংলণ্ডের চতুঃসীমার মধ্যেই কার্যকর হইবে, তাহা নহে। অথবা নিউটনের নাম মানুষ ভুলিয়া গেলেই উহা অন্তর্হিত হইবে, তাহাও নহে। অবশ্য যাঁহারা বিজ্ঞানের গভীর জলে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া উঠিবেন, না ঐ নিয়ম আর এখন নাই অনেক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—তাহার অর্থ এই নয় যে, ঐ নিয়ম বাতিল হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ বৃন্তচ্যুত আপেল আর মাটিতে পড়িবে না: প্রকৃত কথা মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়া গিয়াছে।

ধর্ম বা আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। শ্রুতি বা উপনিষদে আমরা পাই অতি সহজভাবে, সরলভাষায় ধর্মের একটি রূপ: 'সত্যংবদ, ধর্মংচর' ইত্যাদি—ইহার উপর আর একটি অনুভূতি ব্যক্ত হইল—যে নিত্য সত্যের অনুসন্ধান করিতেছ, 'তুমিই সেই'—তোমার অতিরিক্ত কোন সত্য বা কোন সত্তা নাই! তাহাকে জানো। অর্থাৎ নিজেকে জানো, তাহা হইলেই সব জানা হইবে। তোমাকে নিজেকে না জানিলে তোমার কিছুই জানা হইল না; সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-নীহারিকা জীব-জগৎ-ঈশ্বর—সব জ্ঞানের ভিত্তি তোমাতে- তোমারই আত্মাতে।

শ্রুতি বা উপনিষদের এই বাণী, এই শিক্ষা চিরন্তন—সনাতন সুরের মতো, অনাহত ধ্বনির মতো ইহা বাজিয়া চলিয়াছে; দেশকালের বন্ধনে ইহাকে বাঁধা যায় না, সীমার মধ্যে এই অসীমকে আনা যায় না। তবু তাহারই প্রচেষ্টা চলিয়াছে দেশে দেশান্তরে—যুগে যুগান্তরে—তাহারই ফলশ্রুতি ইতিহাসের অঙ্গনে ধর্মগুরু ও ধর্ম-প্রবর্তকদের পদক্ষেপ! ইহার ফল কখন ভাল হইয়াছে—কখন হয় নাই; কোথাও ইহা ফলপ্রসূ হইয়াছে, কোথাও হয় নাই। মানুষের মধ্যে নানা ভাবের মতান্তর মনান্তর সৃষ্ট হইয়া ধর্মে ধর্মে বিরোধ হইয়াছে। এগুলি দূর করিতে হইলে আবার আমাদের যাইতে হইবে—এগুলিরই উৎস সন্ধানে!

এখন দেখা যাক—ইতিহাসের অঙ্গনে অথবা বলিব, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দুইটি চরিত্রের অভিনয় অথবা বলিব লীলাভিনয়। আমরা বুদ্ধ ও শঙ্করের কথা বলিতেছি। দেশকালের ব্যবধানে ইঁহারা কতদূরে—অথচ ভাবের দিক দিয়া কত কাছে! একজনের জন্ম হিমালয়ের পাদদেশে; আর একজনের সমুদ্রবিধৌত কেরলের নারিকেল-উপবনে, একজনের জন্ম খৃষ্টের প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে, আর একজনের ৬৮৬ বৎসর পরে।* উভয়েই ভারতের প্রায় সর্বত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন—ধনী-দরিদ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সমসাময়িক বহু-সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন—শুধুমাত্র ধ্যান-জ্ঞানের মাধ্যমে নয়—হৃদয়, মস্তিষ্ক ও চরিত্রের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—ব্যক্তিগত চরিত্র-প্রভাবের ফলেই অপরের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনা যায়, বা কাহারও মনে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করা সম্ভব। বুদ্ধ ও শঙ্করের জীবনে এরূপ বহুতর দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে, শুধু মাত্র উপদেশ দিয়া বা ভাষ্য লিখিয়াই তাঁহারা ইতিহাসের ওলট-পালট করিতে সক্ষম হন নাই। দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যক্তিগত চরিত্রপ্রভাব অপরিসীম।

বুদ্ধের সুদীর্ঘ জীবনে ছোট বড় কত ঘটনা ছড়াইয়া রহিয়াছে: কখনও উপদেশ দিয়া, দৃষ্টান্ত দিয়া, কোথাও বা প্রশ্নমূলক শিক্ষা দিয়া, কোথাও হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা তিনি শিক্ষা দিতেছেন। শোকার্তা জননীকে বলিতেছেন, তাঁহার মৃতপুত্র বাঁচাইয়া দিবেন একমুষ্টি সরিষার বিনিময়ে, অবশ্য সেই সরিষামুষ্টি আনিতে হইবে এমন এক গৃহ হইতে যেখানে কখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। [illegible] বোধ হইল, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী [illegible] পথে [illegible]। [illegible] প্রাণের বিনিময়ে ছাগশিশু [illegible] মধ্যে [illegible] নাটকীয় চমৎকারিত্বে পূর্ণ।

শঙ্করের জীবনেও [illegible] প্রথম সেই [illegible] কুম্ভীরগ্রস্ত [illegible] মায়ের নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা [illegible]; দ্বিতীয় দৃশ্য নর্মদাতীরে গুরু গোবিন্দপাদের পাদমূলে—তারপর বারাণসী হইয়া হিমালয়ে ভাষ্য রচনা—পরবর্তী দৃশ্য মাহিষ্মতী নগরীতে মণ্ডনমিশ্রগৃহে বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া বাদ, মধ্যস্থ মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতী, পরে দেশ [illegible] পরিব্রাজক শঙ্কর [illegible] উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম [illegible] ভ্রমণ করিতেছেন, বেদান্তদৃষ্টিতে [illegible] মন্ত্র প্রচার করিয়া এই [illegible] অপর [illegible] করিতেছেন।

বুদ্ধ ও শঙ্করের এই [illegible]-রাজত্ব, যুক্তি-[illegible] আজ পর্যন্ত ভারতের [illegible] রাখিয়াছে; যতদিন এই সকল মহাপুরুষদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, [illegible] ধরিয়া রাখিবে [illegible] তাহাই তো ধর্মের 'মর্ম'।

* আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃঃ [illegible] দ্রষ্টব্য। [illegible]—An Advanced History of India-তে ৮ম শতাব্দী বলা আছে, পৃঃ [illegible] দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় যুবকদের প্রতি আহ্বান

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

দেশে স্বাধীনতালাভের পর থেকে আমাদের যুবকদের মধ্যে জাতির পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর উৎসাহ দেখা দিয়েছে এবং এটি খুবই প্রশংসার্হ। কিন্তু এই পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবার পূর্বেই কর্মীদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন—ভবিষ্যৎ ভারতের ভাবমূর্তিটি সম্বন্ধে। যেমন, একজন চিত্রশিল্পী ঝট্ ক'রে ক্যানভাসের উপর রং লাগাতে শুরু করেন না। এ-রকম পদ্ধতিতে কোন সুন্দর চিত্র সৃষ্টি হ'তে পারে না। শিল্পীকে ভাল ক'রে ভাবতে হবে, তিনি কি চিত্র আঁকতে চান; সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ভাবনা তাঁর ধারণার মধ্যে থাকা চাই, তাহলেই তিনি তাঁর মনোজগতের রূপকল্পটি ক্যানভাসের উপর উপস্থাপিত করতে পারবেন। তেমনিভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার ঝট্ ক'রে একটা বাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ করেন না। তিনি প্রথমে বোঝার চেষ্টা করেন বাড়ীটি কি ধরনের হবে। বাড়ীটা কি একটা বিদ্যালয়ের জন্য, বা হাসপাতালের জন্য, বা সরকারী অফিসের জন্য, না বসবাসের জন্য? তারপর প্রয়োজনানুসারে তিনি বাড়ীর নক্শা তৈরী করেন, খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন এবং তারপর বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু করেন। তোমাদেরও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, তারপর তোমরা জাতি-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তোমরা কি চাও ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়? আমি নিশ্চিত যে, তোমরা সে-রকম কিছু চাও না, কারণ কোন সামরিক শক্তিই দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি। দেখ না, হিটলার বা মুসোলিনির কী পরিণতি! তাহলে তোমরা কি আমেরিকার মতো তোমাদের দেশকে শিল্পে উন্নত ও কৃষিতে খুবই অগ্রসর একটি ধনী জাতিতে পরিণত করতে চাও?

আমাদের দেশ দরিদ্র, আমাদের জনসাধারণের খাওয়াদাওয়ার জন্য আমরা ধনসম্পদ চাই। কিন্তু শুধুমাত্র খাদ্য ও পানীয় আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি? আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশ তাদের প্রচুর ধনসম্পদ সত্ত্বেও মনের শান্তি ও সত্যিকার সুখ লাভ করেছে কি? তারা তা পায়নি। দেখ, ঐ-সব দেশের তরুণেরা, প্রাচুর্যের মধ্যে গড়ে ওঠা যুবক ও যুবতীরা—তাদের কিছু করবার নেই ভেবে হতাশ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকজন খুবই ধনী, কিন্তু জীবনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় তারা ভয়ঙ্কর অর্থহীনতায় ভুগছে। আমাদের সামরিক শক্তির দরকার দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে লুটপাট করার জন্য নয়। আমাদের নিরন্ন জনসাধারণের খাওয়াপরার জন্য আমাদের প্রয়োজন ধনসম্পদ, কিন্তু এটাও আমাদের জাতির আদর্শ হ'তে পারে না। এই দুইয়ের অতিরিক্ত আমাদের আরও কিছু দরকার। সেই বস্তু কি, যা নাকি ধনসম্পদ ও সামরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাঙ্ক্ষিত শান্তি এনে দেবে।

আমি তোমাদের বলি, তোমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ ক'রে দেখ—সম্রাট অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, কণিষ্ক ও অন্যান্যদের সময়ে ভারতবর্ষ শক্তিতে সম্পদে শান্তিতে কত মহান্ ছিল। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে আমাদের নিশ্চিতই ছিল মহৎ আদর্শ, যা নাকি ভারতবর্ষকে অতীতে এত মহান্ ক'রে তুলেছিল। কিন্তু তাহলে আমাদের এই অধঃপতন এল কি ক'রে? আমাদের

অনুসন্ধান ক'রে নির্ণয় করতে হবে—আমাদের অধঃপতনের কারণগুলি। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সংগঠনে আমরা সেই-সব আদর্শ গ্রহণ ক'রব, যা আমাদের মহান্ করেছিল এবং সেগুলি ত্যাগ ক'রব, য আমাদের অধঃপতিত করেছিল। এবং যা আমাদের ছিল না, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা—সেগুলি আমরা সংগ্রহ ক'রব।

আজকাল আমরা বিজ্ঞানের নামে শপথ করি। আমরা বলি, এটা অবৈজ্ঞানিক, এটা কুসংস্কার। আমরা জানবার চেষ্টাও করি না, আমাদের মধ্যে মহৎ কি ছিল এবং যা নাকি আমাদের একটি জাতি হিসাবে গত তিন হাজার বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে এসেছে। আমাদের এই অতীতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার পিছনে ছোটা কি বৈজ্ঞানিক? এই পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারা কালের পরীক্ষায় এখনও পরীক্ষিত হয়নি। এগুলি বড় জোর দুশো বছরের পুরানো এবং তাদের কতকগুলি আরও আধুনিক। তাছাড়াও এই সকল ভাবধারার আদর্শ কি পাশ্চাত্ত্যজাতির জীবন-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে? এর দ্বারা কি পাশ্চাত্ত্যের জাতিগুলি যথার্থ সুখ ও শান্তি লাভ করতে পেরেছে? মনে তো হয় না যে, এ-বিষয়ে তারা সাফল্য লাভ করেছে। সুতরাং ঐ সকল আদর্শের পিছনে তোমরা ছুটেছ কেন?

আমার তরুণ বন্ধুরা, তোমরা জেনে রাখো, আমরা মানুষ, ভগবান্ আমাদের বুদ্ধি-যুক্তি যা দিয়েছেন, তা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। যে কেউ এসে কোন কিছু জোর দিয়ে বললেই আমরা যেন যুক্তি-বিবর্জিত হ'য়ে গরুর পালের মতো পরিচালিত না হই; সেজন্য তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ তোমরা সর্বপ্রথমে আমাদের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহ কর, সেগুলি ভাল ক'রে মনন কর এবং তার উপর ভিত্তি ক'রে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোল। কখনই শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা চালিত হ'য়ো না।

মনে রাখতে হবে সর্বপ্রথম প্রয়োজন চরিত্র। সচ্চরিত্র ছাড়া কোন মহৎ কাজেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। মহাত্মাজীর দিকে লক্ষ্য কর। দেখ, তিনি তাঁর চরিত্রবলে কিভাবে সমগ্র জাতিকে পরিচালিত করেছিলেন এবং ইংলণ্ডকে ভারত-ত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। তিনি এর জন্য বন্দুক, আণবিক বোমা—এ-সব কিছুই ব্যবহার করেননি। সুতরাং যদি তোমরা ভারতবর্ষকে বৃহৎ মহৎ করতে চাও, তাহলে সর্বপ্রথম নিজেদের চরিত্র গড়ে তোল। তারপর বিচার ক'রে স্থির কর, কি ধরনের ভারতবর্ষ তোমরা গড়তে চাও এবং তারপর সেই অনুসারে কাজে হাত দাও। এর জন্য যদি স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়, তার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এ-ধরনের অধ্যয়নের জন্য স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'ই হবে তোমাদের নির্দেশপঞ্জি। এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও আদর্শের মহত্তম দিকটি তোমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হবে *

* ইংরেজী 'Rebuild India'-র 'Foreword'-এর বঙ্গানুবাদ – স্বামী [illegible]ানন্দ-কৃত। সঃ

লঘুবিবেকানন্দম্

স্বামী মুখ্যানন্দপুরীবিরচিতম্

I

রামায়ণমহাকাব্যে রঘুবংশগতামপি।
বিবেকানন্দসাদৃশ্যাং দৃষ্ট্বা রাঘববর্ণনাম্ ॥১

তাদৃশাজন্মশুদ্ধস্য চাফলোদয়কর্মিণঃ।
আসমুদ্র পরিব্রাজশ্চাবিশ্বচরিতার্থিনঃ ॥২

সদ্গুণৈঃ সুমনা ভূত্বা চাপলায় প্রচোদিতঃ।
স্বান্তঃসুখায় তু স্তোত্রং
লঘুমেতৎ করোমি বৈ ॥৩

মন্দঃস্ফূর্তিবশোভূত্বা স্তোতুকামো মহাত্মনঃ।
মহদ্‌লভ্যাং ক্রিয়াসিদ্ধৌ
করিষ্যাম্যতি সাহসম্ ॥৪

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে স্বকাব্যে পূর্বসূরিভিঃ।
পুষ্পেষু প্রোতসূত্রস্য সাদৃশ্যেনাস্তি মে কৃতিঃ ॥৫

বাল্মীকি-কালিদাসাভ্যাং
শ্লোকান্ শব্দান্ সমাহৃতান্।
গ্রথিত্বাত্র চ মালায়ামর্পয়ামি তয়োঃ কৃতে ॥৬

II

দত্তাখ্যবংশসম্ভূতো বিশ্বনাথ ইতি শ্রুতঃ।
শ্রীভুবনেশ্বরীখ্যাতা ভার্যা তস্য পতিব্রতা ॥৭

তস্যা বিশুদ্ধচিত্তায়াঃ প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।
নরেন্দ্রনাথবালার্কো দীপ্যন্ সর্বাং মহীমিব ॥৮

কালিকানগরীজাতো রামকৃষ্ণপদাশ্রিতঃ।
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতমহেশ্বরঃ ॥৯

বাল্যেবাধিগতো বিদ্যা যৌবনে সাধনারতঃ।
প্রৌঢ়ে লোকহিতে মগ্নঃ
স্বেচ্ছয়ান্তে দিবংগতঃ ॥১০

বিবেকানন্দনাম্নাসৌ রঘুনাথ ইবাপরঃ।
উত্তীর্য সলিলং সিন্ধোঃ ধর্মসংস্থাপনে রতঃ ॥১১

III

নাতিদীর্ঘসুগাত্রশ্চ দৃঢ়গ্রীবো মহাহনুঃ।
সুশিরাঃ সুবিশালাক্ষঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ ॥১২

মহোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমংদেহং বিশ্বধর্ম ইবাশ্রিতঃ ॥১৩

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
সর্বলক্ষণসম্পন্নশ্চাষ্টাদশবিভূতিমান্ ॥১৪

সংগীত-বাদ্য-নিষ্ণাতো মনোজ্ঞস্তত্ত্বচিন্তকঃ।
আর্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥১৫

নিয়তাত্মা মহাবীর্যো
দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী।
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী
সত্যান্বেষী বৃহদ্‌ব্রতঃ ॥১৬

IV

স চ সর্বগুণোপেতো গুরোঃপ্রীতিবিবর্ধনঃ।
নরাবতার এবাসৌ নারায়ণসখাস্মৃতঃ ॥১৭

আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়াসদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভশ্চারম্ভসদৃশোদয়ঃ ॥১৮

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সর্বভূতহিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্দক্ষঃ সমাধিমান্ ॥১৯

ভক্তিমান্ ধ্যানযোগী চ কর্মযোগপরায়ণঃ।
অদ্বৈতানুভবে তিষ্ঠন্ সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥২০

বেদ-বিজ্ঞানসম্পন্ন আত্মতত্ত্ববিশারদঃ।
সর্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্ ॥২১

সারগ্রাহী কৃতজ্ঞশ্চ নাভিমানী দৃঢ়ব্রতঃ।
চারিত্রেণ চ সংযুক্তঃ সমর্থোঽনভ্যসূয়কঃ ॥২২

সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ।
সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ ॥২৩

V

হনুমৎসদৃশো ভক্ত্যাং জ্ঞানে শংকরসন্নিভঃ।
ভাবে তু স্বগুরোর্মূর্তিঃ কারুণ্যে বুদ্ধ এব চ ॥২৪

সদাশিবসমো মন্যৌ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
রন্তিদেব ইব ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ ॥২৫

সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব।
বৈশাল্যে নভসংকাশঃ সদা সত্যপরাক্রমঃ ॥২৬

রক্ষিতা সত্যধর্মস্য ভারতস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য বিশ্বধর্মস্য রক্ষিতা ॥২৭

বেদান্তকেশরী সাক্ষাদটন্ সর্বত্রমেদিনীম্।
অগর্জদুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ লোকা জাগ্রত জাগ্রত ॥২৮

VI

অমৃতস্য পুত্রাঃ শৃণ্বন্তিত্থং সম্বোধয়ন্নপি।
অশ্রাবয়দ্বেদবাণীং পরাংশ্রেয়স্করীং শুভাম্ ॥২৯

জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্তাং সর্বাভয়প্রদায়িনীম্।
তমসঃ পারমাত্মানং মহান্তং প্রাপ্যকারিণীম্ ॥৩০

তত্ত্বমসি-মহাবাক্যং জীবস্য শিবরূপতাম্।
আত্মনোঽপাপবিদ্ধত্বমিত্যাদীন্যুপদিষ্টবান্ ॥৩১

নির্গুণং সগুণং চৈব ব্রহ্মতত্ত্বমশেষতঃ।
মায়াং চ সৃষ্টিতত্ত্বং চ বৈজ্ঞানিকমতানুগম্ ॥৩২

কর্মতত্ত্বাখিলং চৈব পুনর্জন্মাদিকং চ বৈ।
বন্ধং মোক্ষং চ জীবানামীশ্বরানুগ্রহং তথা ॥৩৩

নিসর্গস্যাপি বৈচিত্র্যং অখণ্ডাদ্বৈতবস্তুনি।
অবিভক্তং চ সর্বেষু যদ্বিভক্তমিব স্থিতম্ ॥৩৪

একমেব হি সদ্বস্তু বিপ্রৈস্তু সুবিশারদৈঃ।
কিমর্থং হি সমুক্তং স্যাদ্‌বহুধানামরূপতঃ ॥৩৫

নানাত্বে স্থিতমেকত্বং ধর্মং চ সার্বভৌমিকম্।
পরমেশস্য চৈকত্বং সর্বধর্মসমন্বয়ম্ ॥৩৬

ঈশাবতারতত্ত্বং চ সর্বমুক্ত্বা সবিস্তরম্।
ঈশসন্দর্শনার্থং তু চতুর্যোগান্ প্রদিষ্টবান্ ॥৩৭

VII

যোগং বিজ্ঞানসংযুক্তং ভক্তিযোগং সুধান্বিতম্।
দিব্যাত্মভাবসম্পন্নং জ্ঞানযোগং দিবাকরম্ ॥৩৮

কর্মযোগং বিশেষেণ জীবসেবাদিসংযুতম্।
সানুষ্ঠানিকবেদান্তং সর্বশক্তিপ্রদং শিবম্ ॥৩৯

সর্বত্রসমতাভাবমাচণ্ডালজনেষ্বপি।
দরিদ্রেষু চ মূর্খেষু নারায়ণমতিস্তথা ॥৪০

সমুত্থানং চ নারীণাং জনতাভ্যুদয়ং পরম্।
ভারতাভ্যুদয়ং সম্যঙ্-নববিশ্বোদয়ং শুভম্ ॥৪১

এবং দেশবিদেশেষু জাতিলিঙ্গাদ্যভেদতঃ।
বোধয়ামাস সদ্ধর্মমুচ্চাবচ জনেষ্বপি ॥৪২

VIII

ধর্মদিগ্বিজয়ী বীরো যতিবর্যো মহামতিঃ।
পূজিতঃ সুষ্ঠু সর্বত্র পণ্ডিতৈরপি পামরৈঃ ॥৪৩

ভারতে পুনরাবর্ত্য অগ্নিমন্ত্রৈঃ প্রচোদয়ন্।
প্রসুপ্তলোকমুদ্বোধ্য দেশোত্থানে ন্যয়োজয়ৎ ॥৪৪

ভারতস্য চ মাহাত্ম্যং তস্য স্বর্ণযুগানি চ।
ঈশ্বরাদিষ্টকার্যং যদাত্মজ্যোতিপ্রকাশনম্ ॥৪৫

তস্য দিব্যভবিষ্যং চ সর্বং বৈ সমুদীরয়ন্।
কৃত্বা সর্বান্ সমুৎসাহান্‌রেমে যুগপ্রবর্তকঃ ॥৪৬

ইত্থমুপদিশ্য সর্বত্র কৃতার্থঃ স জনপ্রিয়ঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য নির্দেশং নিরবর্তয়ৎ ॥৪৭

IX

প্রাচ্য পাশ্চাত্যদেশস্থৈঃ সচ্ছিষ্যৈঃ সুসমাবৃতঃ।
স্বগুরুভ্রাতৃভির্যুক্তো গুরুভক্তৈশ্চ সংযুতঃ ॥৪৮

স্থাপয়ামাস গঙ্গায়াং বিশ্বধর্মপ্রচারকম্।
বেলুড়ে যতিসংস্থানং রামকৃষ্ণমঠাভিধম্ ॥৪৯

তস্য শাখা-প্রশাখাশ্চ ভূমণ্ডলসমাবৃতাঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মঠানাবৃত্য রাজতে ॥৫০

যতিসংঘস্য চোদ্দেশ্যং স্বামিনা বিশদীকৃতঃ।
আত্মনোঽপিচমোক্ষার্থং জগতশ্চহিতায় বৈ ॥৫১

এতন্মঠস্য চিহ্নং তু চতুর্যোগসমন্বিতম্।
তস্য মধ্যগতো হংসঃ দ্যোতকঃ পরমাত্মনঃ ॥৫২

X

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য শক্তিঃ শ্রীসারদামণিঃ।
বিবেকাদিযতিবৃন্দঃ তয়োঃ ষোড়শপার্ষদাঃ ॥৫৩

বিশ্বধর্মোপমাকাশে সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
শোভতস্তৌ সভক্তৈশ্চ শিষ্যতারাগণাবৃতৌ ॥৫৪

সারদাং মাতরং চাপি রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
আশ্রিতান্ চ তয়োঃ সর্বান্ প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥৫৫

সর্বধর্মস্বরূপায় আনন্দজ্ঞানবর্ষিণে।
সর্বাবতারযুক্তায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥৫৬

বিশ্বমাতৃস্বরূপিণ্যৈ সর্বদোষাপহারিণ্যৈ।
করুণারসপূর্ণায়ৈ সারদায়ৈ নমোনমঃ॥৫৭
বিবেকানন্দযোগীন্দ্রং সর্বলোকশুভংকরম্।
প্রণমামি সদা ভক্ত্যা মুখ্যানন্দার্থসিদ্ধয়ে॥৫৮
আষাঢ়মাসে গুরুপূর্ণিমায়াং
শতাব্দন্যূনে দ্বিসহস্রবর্ষে।
শকাব্দগণ্যে গুরুপূজনার্থং
কৃতং চ স্তোত্রং তু বিবেকানন্দম্॥৫৯
যে পঠন্তি ত্বিদং স্তোত্রং ভক্ত্যা চ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ত্যক্ত্বা হৃদয়দৌর্বল্যং লভন্তে জয়মঙ্গলম্॥৬০
॥ ওঁ শ্রীসারদারামকৃষ্ণসমেত
বিবেকানন্দার্পণমস্তু॥

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

কপিলাবাস্তু উঠিয়াছে মেতে
যেন মহা উৎসব।
রাজার পুত্র বহুদিন পরে
আসিছেন আজ ফিরে নিজ ঘরে;
রাজপুরী মাঝে পড়ে গেছে সাড়া
আনন্দ কলরব।

রাজমহিষীর নাই অবসর
উৎসাহে সীমা নাই।
বুদ্ধ তাঁহার আদরের ধন,
স-শিষ্য এসে করিবে ভোজন;
যা কিছু ভোজ্য মনের মতন
সংগ্রহ করে তাই।

মুণ্ডিত কেশ, ভিক্ষুর বেশ
ভিক্ষাপাত্র হাতে—
দাঁড়ালেন আসি তরুণ শ্রমণ
দিব্য জ্যোতিতে দীপ্ত আনন;
একা নন তিনি চির অনুগত
ভক্ত শিষ্য সাথে।

বালক রাহুল কিছু নাহি জানে
নবাগত কোন্ জন।
চেয়ে দেখে আর ভাবে মনে মনে,
কেন বা অশ্রু মাতার নয়নে?
কোথা থেকে তাঁর আগমন হেথা,
কিবা তাঁর প্রয়োজন?

অশ্রু মুছিয়া কহে যশোধরা
পুত্রকে ডাকি কাছে।
'দিব্য কান্তি দেখিতেছ যাঁরে
জনক তোমার; উপনীত দ্বারে;
চেয়ে লও আজ পিতৃধন তব
গচ্ছিত যাহা আছে।'

মাতার আদেশে রাহুল আসিয়া
চরণে হইল নত।
কহিলেন প্রভু,—'বৎস আমার,
মণি-মাণিক্য না আছে দিবার;
পৈত্রিক ধন পাবে মোর কাছে
শুধু যে সত্যব্রত।'

প্রভুর আদেশে মুণ্ডিত কেশ
ভিক্ষুর বেশ পরা।
ধন জন ভরা ছেড়ে সুখনীড়,
রাজপুরী ছেড়ে হইল বাহির;
মাটিতে লুটায়ে কাঁদিয়া আকুল
অভাগিনী যশোধরা।

এত আনন্দ, এত কলরব
সব কিছু গেছে থামি।
রাজার দুলাল ভিখারীর সাজে—
ওঠে হাহাকার রাজপুরী মাঝে;
সবার কণ্ঠে ধ্বনি, 'বুদ্ধং
শরণং গচ্ছামি।'

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ওখানকার রাস্তাগুলি দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিরাট চওড়া চওড়া রাস্তা। ওরা বলে 'অটোবান' (autobahn)। হিটলার ক'রে গেছেন। চারটে গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে; আর চারটে গাড়ী পাশাপাশি আসতে পারে। মাঝখানে লম্বা ফুলের বাগানের ফালি। আর আলাদা আলাদা 'লেন' ক'রে দেওয়া। যদি কেউ ঘণ্টায় ৮০ কি. মি. গাড়ী চালাতে চান—তার জন্য একটা আলাদা লেন আছে। ঐ লেনে যেতে গেলে ঐ বেগে গাড়ী চালাতে হবে। প্রতি লেনের গতিবেগ বেঁধে দেওয়া আছে। আর একটায় হয়তো ঘণ্টায় ১০০ কি. মি., আর একটায় হয়তো ঘণ্টায় ১২০ কি. মি.—এইরকম। যদি কেউ গাড়ীর গতিবেগ পালটাতে চায় তাহলে সিগন্যাল দিয়ে একটা লেন থেকে আর একটা লেনে যেতে হবে। কিন্তু যে ৮০ কি. মি.-র লেনে যাচ্ছে অথচ ১২০ কি. মি. বেগে গাড়ী চালাচ্ছে—পুলিশ তাকে ধরবে। একটি মহিলা আমাকে গাড়ীতে যেতে যেতে বলেছিল: 'স্বামীজী, গাড়ী চালাতে চালাতে আমি যদি কারও সাথে বেশী কথা বলি, তাহলে ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে যাই, গাড়ীতে বেশী স্পীড দিয়ে ফেলি, আর তার জন্য জরিমানা দিতে হয়।' আমি বললাম: 'কি ক'রে ওরা ধরে, বলো দেখি?' ব'লল: 'টেলিভিশনে। স্পীড বাড়ালেই পুলিশের টেলিভিশন-স্ক্রীনে ধরা পড়ে, ওরা একেবারে ছবি তুলে ফেলে। গাড়ী, নম্বর, কত স্পীডে চলছে—সব ধরে ফেলে। আর কোন প্রশ্ন করার উপায় থাকে না। আমাকে অনেকবার ওরা দেখিয়েছে। আমি সত্যি-সত্যিই অন্যমনস্ক হয়ে বেশী স্পীডে গাড়ী চালিয়ে ফেলেছি।' এই অটোবানগুলি যেমন চাওড়া, গাড়ীগুলিও তেমনি বড় বড়—আর নানারকমের গাড়ী। জার্মানিতে তো নানারকম গাড়ী তৈরী হয়। জার্মানির বিখ্যাত গাড়ী 'ভোক্স ওয়াগন' —সেই গাড়ীরই কতরকম আকৃতি। ভোক্স ওয়াগন হচ্ছে 'পীপল্স্ কার' অর্থাৎ সাধারণ মানুষের গাড়ী। একজনের গাড়ীতে যাচ্ছি— সুন্দর গাড়ী; কিন্তু তিনি বলছেন: 'আমার গাড়ীটা পুরানো হয়ে গেছে।' আমি বললাম: 'কতদিন হয়েছে?' বললেন: 'ছ-বছর; এটাকে এবার বাদ দিতে হবে।' সেই গাড়ী কিন্তু চক্‌ চক্‌ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'এটা বিক্রি করলে তুমি কত দাম পাবে?'— 'কিছুই হয়তো দাম পাব না। পুরানো গাড়ী তো!'

ওখানে রাস্তাতে মানুষ প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না—গাড়ী শুধু। অনবরত গাড়ী চলছে। আর রাত্রিতে আমি যেখানে থাকতাম, সেখান থেকে গাড়ীর শব্দ শোনা যেত—একটানা শব্দ হয়ে যাচ্ছে। পুরী বা অন্যান্য সমুদ্রতীরে যেমন ঢেউ-এর শব্দ শোনা যায়, ঠিক সে-রকম শব্দ। আর রাস্তা ও গাড়ী এত ভাল যে, একটুও কাঁপে না গাড়ী—শুধু একটা শোঁ শোঁ শব্দ হয়। গাড়ীতে চড়লে সেইজন্য আমার ঘুম পেয়ে যেত অনেক সময়। ওখানে অটোবানে খুব ঘুরলাম, নানারকম

'ফ্লাই-ওভার' আছে, সেও দেখলাম। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম : ওখানে কারও বাড়ীতে গাড়ীর গ্যারাজ নেই—রাস্তাতেই সারি সারি গাড়ী দাঁড় করানো থাকে। গাড়ী পার্ক করানো একটা মহা সমস্যা। নিজের বাড়ীর সামনেই হয়তো কেউ দেখল, সারি সারি গাড়ী দাঁড় করানো আছে। বিরাট লম্বা লাইন—হয়তো অনেকটা দূরে গিয়ে তাকে তার নিজের গাড়ী পার্ক করতে হ'ল! কাজেই এটা একটা সমস্যা ওখানে। অনেক সময় ফুটপাথের ওপরেও গাড়ী রেখে দেয়, দেখলাম। কিন্তু তাতে কেউ হাত দেয় না বা গাড়ীর কোনরকম ক্ষতি-টতি বা চুরি-টুরি করে না।

আর একটা দর্শনীয় জিনিস দেখলাম, 'সুপার মারকেট'—সে এক বিরাট ব্যাপার! হকচকিয়ে যেতে হয়। কতরকমের জিনিস রয়েছে সেখানে! মনে হয়, পৃথিবীর এমন কোন জিনিস নেই, যা ওখানে পাওয়া যায় না। আপনি নিজে পছন্দ ক'রে নিজেই নিয়ে নিচ্ছেন, নিজেই দাম রেখে দিচ্ছেন—কেউ দেখছে না। কী বিশ্বাস! অবশ্য 'শপ্ লিফটিং' যে একেবারে হয় না, তা নয়—তবে কদাচিৎ।

ওখানে আর একটা জিনিস দেখলাম, বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবনযাত্রা খুব সহজ হয়ে গেছে। লোকে রান্না-বান্না করে এত চটপট্, যেন ম্যাজিক জানে। আমি পরে যে বাড়ীতে থাকতাম, সেই মহিলাটির কথাই বলছি সে মিটিং-এ গেছে—যে মিটিং-এ আমি বক্তৃতা করলাম। সব ব্যবস্থা সেখানে সে করেছে। তারপর মিটিং থেকে ফিরে এসেছি আমরা, সেও আমাদের সঙ্গেই এসেছে। পনেরো মিনিট পরেই দেখি, সে বলছে : 'Swamiji, dinner is ready'. আমি বললাম : 'তোমার এর মধ্যেই রান্না হয়ে গেল? তুমি কি ম্যাজিক জানো নাকি?' সে বললে : 'রান্না হ'তে আর কত সময় লাগে?' বাস্তবিক, এমন ব্যবস্থা ওদের যে, রান্না করতে পরিশ্রম হয় না বিশেষ। সব জিনিস সাজানো রয়েছে 'ফ্রীজে'। বাজারেও অনেক জিনিস পাওয়া যায়। একটুখানি শুধু গরম ক'রে নেওয়া—ব্যস্।

পশ্চিম জার্মানিতে আমি দু-দফায় ছিলাম। প্রথমে এক সপ্তাহ (২৫ থেকে ৩১ অক্টোবর, ১৯৮১)। পরে তিন সপ্তাহ (১১ থেকে ৩০ নভেম্বর, ১৯৮১)। প্রথম যখন গেলাম, অক্টোবর মাসের শেষাশেষি, গাছের পাতার রঙ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পাতা বলে বুঝতেই পারিনি। জিজ্ঞেস করেছি : 'কি ফুল এগুলি?' তারা বলেছে : 'ফুল নয়, পাতা।' সুন্দর সুন্দর পাতা; নানারঙের পাতা। তারপরে আবার যখন বার্লিনে এলাম—মাসখানেক বাদে—তখন দেখলাম, সব গাছ ন্যাড়া হয়ে গেছে। শীতকালে সব গাছের পাতা পড়ে গেছে। ওরা ব'লল : 'আপনি একবার মার্চ-এপ্রিল মাসে যদি আসেন, তাহলে দেখতে পাবেন, কী সুন্দর কচি কচি পাতা! তখন ফুলও দেখতে পাবেন অনেক।' আমি বললাম : 'কোন পাখী দেখছি না তো?' ওরা ব'লল : 'শীত আসছে বলে সব পাখী পালিয়ে গেছে।' তবে আমি বার্লিনে দ্বিতীয় দফায় মিসেস ইলসে বুশের বাড়ীতে যে-ঘরে ছিলাম, তার কাঁচের জানলা দিয়ে একটা পার্ক দেখতে পেতাম। সেখানে দু-একটা পাখী আসত। ঘুঘু দেখতাম, আরও কয়েকটা পাখী দেখতাম—তাদের নাম জানি না। কাঁচের জানলার কাছে বসে সেইসব পাখী দেখতাম। খুব ভাল লাগত। আর ঐ যে পাগলা মেয়েটির কথা বলেছিলাম, সে লক্ষ্য করেছে, আমার পাখীর প্রতি দুর্বলতা—সে আমাকে দেখাত : 'ঐ দেখ, ঐ পাতার মধ্য দিয়ে দেখ, একটা পাখী দেখা যাচ্ছে, ঐ আর

একটা পাখী দেখা যাচ্ছে ওখানে!' তবে খুব বেশী পাখী আমি দেখতে পাইনি, জন্তুজানোয়ারও বেশী দেখিনি—শীতকাল বলেই সম্ভবতঃ।

একটা জিনিস এখানে বলতে চাই। ওই দেশে ধনী আর দরিদ্রের তফাতটা বিশেষ বোঝা যায় না। কিছুটা শুধু বোঝা যায়, পোশাক-পরিচ্ছদ. আর গাড়ী দিয়ে। গাড়ী ওদের প্রত্যেকেরই আছে। এক পরিবারে বাবার একটা, মায়ের একটা, আবার ছেলেমেয়ের আলাদা আলাদা গাড়ী। দূরে দূরে সব কিছু, তাই গাড়ী না হ'লে চলে না। সবারই গাড়ী আছে—ধনী-দরিদ্র সবার। তফাত হচ্ছে, কারও হয়তো খুব দামী গাড়ী, আর যার পয়সা কম তার হয়তো অল্প দামের। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সবার প্রায় একই মানের। সেইজন্য দেখলাম, স্বাস্থ্য ওদের সবারই খুব ভাল। আর শুনলাম, পূর্ব আর পশ্চিম বার্লিনের তফাত অনেক। পূর্ব বার্লিন হচ্ছে পূর্ব জার্মানিতে। সেটা অপেক্ষাকৃত গরীব। সেখানে মাংস, মাখন, চিনির জন্য লম্বা লাইন দিতে হয়। কিন্তু মজা হচ্ছে, ওখানকার টিভিতে নানারকম প্রচার করা হয়। ওটা হচ্ছে কম্যুনিস্ট দেশ। ওরা টিভিতে দেখায়—এখানে মানুষ স্বাধীন, এখানে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র ভেদ নেই। এখানে কারখানাতে শ্রমিকরাই মালিক; মালিক বলে আর আলাদা কেউ নেই। টিভিতে দেখাচ্ছে: কারখানায় কোন্ জিনিস কতটা উৎপাদন করা হবে, শ্রমিকরাই সব একসাথে বসে, সভা ক'রে ঠিক করছে; সভার পর পরস্পর হাণ্ডশেক করছে—অর্থাৎ সবাই সমান। এখানে কোন মালিক নেই, ম্যানেজার নেই, যা অন্যান্য দেশে থাকে; শ্রমিকরাই মালিক বা ম্যানেজার। এটা তারা খুব দেখানোর চেষ্টা করে।

কিন্তু তুলনামূলকভাবে পশ্চিম জার্মানিতে প্রাচুর্য অনেক বেশী। অঢেল জিনিস সেখানে। ওদের এখন সমস্যা হয়েছে, কতকগুলি জিনিস এত উৎপন্ন হয়, যদি তারা বাইরে বিক্রি করার বাজার না পায় তাহলে মুশকিল। বাজার নিয়েই সমস্যা। আজকাল যে-সব লড়াই চলছে—হয়তো অস্ত্র দিয়ে লড়াই হচ্ছে না—লড়াইটা হচ্ছে হয়তো ডলারের সঙ্গে পাউণ্ডের, পাউণ্ডের সঙ্গে রুবলের, অথবা ইয়েনের, অথবা মার্কের। আমার এতগুলি জিনিস তৈরী হয়েছে, এগুলি বিক্রি ক'রব আফ্রিকার একটা জায়গায়। সেখানে আমি বাজার ঠিক করেছি। তাড়াতাড়ি আমেরিকা গিয়ে হয়তো সেই বাজারটা দখল ক'রে ফেলল। এই প্রতিযোগিতা আজকাল চলছে শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে। জার্মানিতে এখন এই সমস্যা দেখা দিয়েছে—কোথায় বাজার পাওয়া যায়। ঐ যে বলছিলাম, ভোক্স ওয়াগন হচ্ছে পীপল্‌স্ কার—ঐ গাড়ী যদিও আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু ওরা বলছে: 'ঐ গাড়ী এখন আর বিক্রি হবে না।' তাই যদি হয়, সেটা হবে তাদের পক্ষে বিরাট একটা সমস্যা। কারণ গাড়ী তৈরীর কারখানাতে বহু লোক কাজ করে। যদি গাড়ীর বাইরে চাহিদা না থাকে, তাহলে অনেকে বেকার হয়ে যাবে; এবং ওরা ব'লল: 'বেকার হচ্ছেও অনেক।' ওদের দেশেও বেশ বেকার আছে এখন। তবে ওদের ওখানে বেকারদের সরকার থেকে একটা ভাতা দেওয়া হয়। যে বেকার সে গিয়ে ব'লল: 'আমার এই যোগ্যতা, আমি কোন কাজ যোগাড় করতে পারিনি।' তখন ওরা তাকে বেশ ভাল একটা ভাতা দেবে। কিন্তু সাতদিন বা পনেরো দিন অন্তর অন্তর তাকে খবর দেবে: 'অমুক জায়গায় তোমার উপযোগী একটা কাজ আছে, যাও, সেই কাজে তুমি যোগ দাও।' যদি সে না যায়, তাহলে ঐ ভাতাটা ওরা বন্ধ ক'রে

দেবে। সে অবশ্য বলতে পারে : 'ঐ জায়গাটা অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে, অতদূর আমি যেতে পারব না', বা 'ঐ জায়গাটা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হচ্ছে না' ইত্যাদি। এ-সব কৈফিয়ৎ দিয়ে সে হয়তো সাময়িকভাবে পাশ কাটাতে পারে, তবে ওরা সব সময় চেষ্টা করে যাতে যে বেকার সে কোন একটা কাজ নেয়। তা না হ'লে তার ভাতা বন্ধ ক'রে দেবে।

আমি আগে বলেছি, বার্লিন থেকে মিসেস ইলসে বুশ নামে একজন মহিলা আমার পশ্চিম জার্মানি যাবার জন্য প্রথমে টাকা পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি জানতে পারলাম, যে-টাকা তিনি পাঠিয়েছিলেন, সেটা শুধু তাঁর টাকা নয়—আরও অনেকের অংশ তাতে ছিল। তবে তিনিই বোধ হয় বেশী অংশটা দিয়েছিলেন। ওখানে কিছুদিন থাকার পর বেশ বুঝতে পারলাম—প্রায় সব জায়গায় যেমন হয়ে থাকে—ওদের মধ্যেও খুব রেষারেষি আছে। মিসেস বুশের ইচ্ছে, আমি তাঁর বাড়ীতে বরাবর থাকি। তাঁর বাড়ীতে থাকতে আমার দিক থেকে কোন আপত্তি ছিল না। তাঁর বাড়ীতেই আমি বেশী দিন ছিলাম। বার্লিনে তো দু-দফায় তিন সপ্তাহ ছিলাম—এই তিন সপ্তাহের মধ্যে দু-সপ্তাহেরও বেশী সময় আমি মিসেস বুশের বাড়ীতেই ছিলাম। কিন্তু অন্যান্যরা দেখলাম, তাঁর সম্পর্কে বেশ মনঃক্ষুণ্ণ। আমাকে তাঁরা পরে বলেছিলেন যে, মিসেস বুশ একটু প্রভুত্বপ্রিয়। তিনি যা ভাল বুঝবেন, তা-ই করবেন। অন্যের কোন মতামত নেবেন না, অন্যদের তিনি জানাবেনও না—তিনি কি করছেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমার বক্তৃতা, আমার সঙ্গে লোকজনের দেখাসাক্ষাৎ তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন। আমি অবশ্য প্রথমে এ-সব জানতে পারিনি। পরে ওঁদের অনেকে এসে আমাকে বলতে লাগলেন : 'আপনি কিন্তু এর পরে যখন আসবেন (তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে, আমি প্রত্যেক বছর সেখানে যাব) মিসেস বুশের বাড়ীতে উঠবেন না!' আমি বললাম : 'কেন? কি হয়েছে?' তাঁরা বললেন : 'আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। আসতে চাই, আর তিনি আপনাকে না জিজ্ঞেস করেই বলে দেন—না, স্বামীজী অত্যন্ত ব্যস্ত, বা অত্যন্ত ক্লান্ত, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। আমাদের ইচ্ছে করে আপনার সান্নিধ্য পেতে, আপনার কথা শুনতে—কিন্তু এই বেড়া ডিঙিয়ে আপনার কাছে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সভাতে অবশ্য আপনার বক্তৃতা শুনি; কিন্তু আমাদের তো অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্নও থাকে। সবার সামনে সে-সব বলা চলে না। কিন্তু এই মহিলার জন্য সে হবার উপায় নেই।' আমি অবশ্য এ-ব্যাপারে ঐ মহিলাকে কিছু বলিনি। দুদিনের জন্য গিয়ে ওঁদের এই সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ভাল লাগল না। খারাপ লাগল এই ভেবে যে, সত্যিই যদি এমনটি হয়ে থাকে, তাহলে যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা অনেকে আমার কাছে আসতে পারছেন না। অথচ আমাকে তো তাঁদের সকলের জন্যই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার তখন মনে হ'ল : ওখানে যদি আমাদের কোন আশ্রম গড়ে ওঠে, তাহলে এ-সব অসুবিধে দূর হ'তে পারে। কারণ যাঁর বাড়ীতেই সাধুরা গিয়ে উঠুন না কেন, ঐ-রকম কথা উঠবেই বা সত্যি-সত্যিই ঐ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে। অন্যান্যদের ঐ অভিযোগ সত্যি কিনা বা কতখানি সত্যি, তা আমি জানি না; তবে মিসেস বুশের যে অনেক গুণও আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। খুব উৎসাহী মহিলা; খুব কর্মিৎকর্মা। ঠাকুর-স্বামীজীর প্রতি খুব ভক্তিশ্রদ্ধা।

আমার খুবই আদর-যত্ন করেছেন। তবে মজা হচ্ছে, সেই নিয়েও দেখলাম মায়ে-মেয়েতে

ঝগড়া। মেয়ের ধারণা, মা আমার যথেষ্ট আদর-যত্ন করছে না। মোটেই তা নয়। মিসেস বুশ আমাকে খুবই যত্ন করেছেন, নিজে রান্না ক'রে অনেক খাইয়েছেন-দাইয়েছেন। তাঁর রান্নাও আমার খুব ভাল লাগত। খুব ভাল ছানা আর দই উনি আমাকে খেতে দিতেন। এখানে যেমন আইসক্রীম ছোট ছোট বাক্সে পাওয়া যায়, ওখানে দইও সে-রকম বাক্সে পাওয়া যায়। খুব জমাট দই—মিষ্টি নয়, আবার টকও নয়। আমি গোল-মরিচ মিশিয়ে সেই দই খেতাম, খুব ভাল লাগত খেতে। ছানাও বাজারে পাওয়া যায়। ওরা বলে 'কটেজ চীজ'। আমি একটু চিনি মিশিয়ে খেতাম—ভালই লাগত। আর, নানারকম ফলের রস খেতে দিত আমাকে। ওখানে দেখলাম, আস্ত ফল খুব কম লোকেই খায়। দু-একটা ফল আছে—যেমন কলা, বা 'আবুকাডো' নামে ইজরায়েলের এক-রকম ফল আছে—যেগুলি ওরা আস্ত খায়, নাহলে বেশীর ভাগ ফলের রস খায়। ইজরায়েলের ঐ ফলটির খুব সমাদর ওখানে। আমার কিন্তু বিশেষ ভাল লাগল না খেতে। জার্মানিতে আপেল আর আঙুর ছাড়া আর বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ফল আসে বাইরে থেকে। ইজরায়েল থেকে কিছু আসে, আফ্রিকা থেকেও আসে। আমি যে ঘরে থাকতাম, সেই ঘরে সব সময় ওরা আমার জন্য কিছু ফল রেখে দিত। বিশেষ ক'রে আঙুর আর আপেল। আপেল খেতাম না, আঙুর মাঝে মাঝে খেতাম। আর কিছু বাদাম, পেস্তা এ-সবও থাকত। ওগুলির খুব দাম ওদেশে—কিন্তু আমার জন্য তারা রেখে দিত কাজেই আমার খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্টই হ'ত না; তবু মেয়ের ধারণা, মা আমার ঠিকমতো যত্ন নিচ্ছে না। শুধু আমার খাওয়া নিয়েই নয়, আরও অনেক বিষয়েই মা-মেয়েতে খুব খুনসুটি হ'ত। একবার মা এসে আমার কাছে মেয়ের নামে নালিশ করছে, আবার কিছুক্ষণ পরে মেয়ে এসে মার নামে নালিশ করছে—এ-রকম খুব হ'ত।

মেয়ে মার সঙ্গে থাকে না; তার একটা আলাদা ফ্ল্যাট আছে, সেখানে সে থাকে। মাঝে মাঝে মেয়েটি আমাকে ব'লত: 'তুমি আমার ওখানে যাবে?' স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ওর বাড়ী গিয়ে বলেছিলেন: 'তুমি দেখছি এটাকে আশ্রম ক'রে ফেলেছ!' আশ্রম এই অর্থে যে, সে মেঝেতে শোয়, খাটে শোয় না। মেঝেতে কম্বল বিছানো আছে, তাতে শোয়। খুব কৃচ্ছ্রসাধন করে। রঙ্গনাথানন্দজী নাকি বলেছিলেন, মেয়েটি আমাকে ব'লল, 'এর পরে যখন আমি আসব, তোমার এখানে এসে উঠব।' আমাকে তাই সে বলেছিল: 'তুমি যাবে আমার ওখানে?' আমি বললাম: 'তোমরা যা ঠিক করবে, তাই ক'রব। তোমার মা আছেন, আরও যাঁরা আছেন, তাঁরা সকলে মিলে যা ঠিক করবেন, তাই আমি মেনে নেব। আমি কেন ব'লব, আমি এই জায়গায় থাকব বা ঐ জায়গায় থাকব?' তার বাড়ীতে আমাকে অবশ্য আর যেতে হয়নি—তার মায়ের বাড়ীতেই শেষ পর্যন্ত ছিলাম।

ওদেশে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, ওরা বড় সভা-টভা বিশেষ পছন্দ করে না। ৬০।৭০ জন, বড়জোর ১০০ জন হয়তো আসবে এক-একটা সভাতে। ওরা বেশী পছন্দ করে 'সেমিনার'। সারাদিন ধরে সেইসব সেমিনার চলে। সকালে 'ব্রেকফাস্ট' খেয়ে লোকে আসবে। বেশী লোক নয়—ঐ ৬০।৭০ জন। ঘণ্টাখানেক হয়তো বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর হ'ল। তারপর 'টি-ব্রেক' বা 'কফি-ব্রেক'। ধর্মসংক্রান্ত বেশীর ভাগ সেমিনারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা 'মেডিটেশন' থাকা চাই-ই

চাই। কিছুক্ষণ 'মেডিটেশন' হ'ল, কিছুটা বিরতি, কিছুক্ষণ আলোচনা, প্রশ্নোত্তর হ'ল, আবার কিছুক্ষণ বিরতি—এইরকম। ওরা দেখতাম বক্তৃতার থেকেও বেশী পছন্দ করে ব্যক্তিগত সান্নিধ্য। কেউ হয়তো গেছেন একটা ধর্মমত প্রচার করতে, ওরা তাঁর কাছে আসবে নানারকম প্রশ্ন নিয়ে। দু-তিনজন একসাথে যাবে কিংবা একা যাবে। ওখানে ধর্মপ্রচার করবার এটাই পদ্ধতি। বড় সভার প্রতি তাদের খুব একটা আকর্ষণ নেই। বড় সভাতে যারা ভিড় করে, তারা যে খুব উৎসাহী লোক তা নয়। যেন যেতে হয় তাই যায়। কিন্তু সেমিনারে যারা যোগ দেয়, তারা বাছা বাছা লোক। যারা প্রকৃত আগ্রহী তারাই ঐ-সব সেমিনারে আসে। বক্তৃতার পরে একদিন একজন আমাকে বললেন: 'Swamiji, when you speak, I feel as if you are speaking to me and for me.'—'তুমি যখন বল, আমার মনে হয়, যেন আমাকেই বলছ, আর আমার জন্যই বলছ।' এঁর এই কথাটা শুনে আমার খুব আনন্দ হ'ল। আসলে বক্তৃতার ব্যাপারে আমার স্বভাবই হ'ল যে, ঘরোয়া ভঙ্গিতে বলা।

ওখানে 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স' (Christian Science) বলে একটা দল আছে। ওরা কি করে—যদি দেখে কোন লোক বেশ জনপ্রিয়, তাহলে তাকে ওদের ওখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমি যখন মিসেস বুশের বাড়ীতে আছি, তখন ঐ 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স'-এর যাঁরা নেতা তাঁরা এসে আমাকে টানাটানি করতে লাগলেন। আমার অপরাধ হয়ে গেছে: আমি কাকে যেন বলেছিলাম, 'তোমাদের গির্জায় যে গান হয়, আমার একটু শুনতে ইচ্ছে করে।' এই কথাটা কি ক'রে তাঁদের কানে পৌঁছে গেছে। তাঁরা, আমি যখন ক্লার্কেদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন তাঁদের গিয়ে বলেছেন: 'ওঁর খুব ইচ্ছে আমাদের চার্চের গান শুনবেন। অমুক দিন আমাদের চার্চে খুব ভাল প্রার্থনা-সভা হবে। তাতে গান গাইবেন একজন বিখ্যাত অপেরা-গায়ক। ওঁকে সেইদিন ওখানে নিয়ে এস।' এখন আমি যে ঐ গান শুনতে যাব, মা-মেয়ের মোটেই তাতে মত নেই। ঐ ব্যাপারে দেখলাম, মা আর মেয়ে দুজনেই একমত। আমাকে হঠাৎ এসে একদিন জিজ্ঞেস করছে: 'তুমি নাকি যেতে চেয়েছ ওখানে?' আমি তো অবাক: 'কখন চাইলাম আমি! কাউকে কিছু বলিনি তো? ওখানে তো আমি কাউকেই চিনি না।' 'তবে যে ওরা বলছে, তুমি ওদের গান শুনতে চাও?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ, গান শুনতে চেয়েছি, তাই বলে গির্জায় যাব এ-কথা বলিনি। তোমাদের মধ্যে যারা গান গাইতে পার, তারা যে-কেউ একদিন ঐ গান গেয়ে আমাকে একটু শোনাবে, সেই কথাই বলেছি। তার জন্য গির্জায় যেতেই হবে, তার কোন মানে নেই, ঘরে বসেই শুনতে পারি।' যাই হোক, ওঁদের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত এঁরা খুব বিরক্ত হয়েই আমাকে ওঁদের সঙ্গে যেতে দিলেন।

গির্জায় গিয়ে আমার যে খুব খারাপ লাগল, তা বল'ব না—আবার খুব ভালও যে লাগল, তাও বলতে পারি না। খারাপ লাগল না—তার কারণ, অপেরা-গায়ক যিনি, তাঁর গলা খুব ভাল। কিন্তু একটু নিষ্প্রাণ লাগল গানগুলি। তিনি যে খুব ভক্তিসহকারে গাইছেন—তেমন মনে হ'ল না। তবে গলা নিঃসন্দেহে ভাল। আর, ভাল লাগল না এই কারণে, এত সুন্দর সাজানো গির্জা, এত আসবাবপত্র—অথচ প্রার্থনাতে ক-জন মাত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এসেছেন। সঙ্গে তাঁদের দু-একজন নাতি-নাতনীকে নিয়ে এসেছেন। অন্যদিন মনে হয়, আরও কম লোক আসে। অপেরা-গায়কটি খুব নামকরা, সেইজন্য হয়তো সেদিন লোকজন অপেক্ষাকৃত বেশী হয়েছে। তিনি যে-সব

গান গাইছিলেন, তার অনেকগুলির ভাষা বুঝলাম না। দু-একটা গান ছিল, তাতে জার্মান ভাষা আর তার ইংরেজী অনুবাদ একসাথে। কিন্তু সে-সব গানের বাণী যে খুব উঁচুদরের, তার পিছনে যে খুব গভীর কোন ভাব আছে, তা মনে হ'ল না। আমাদের দেশের যে-সব ভক্তিসঙ্গীত, তার সুরও যেমন ভাল থাকে, তার বাণীও তেমনি মনের মধ্যে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। আমাদের অধিকাংশ ভক্তিসঙ্গীতেরই কথার মধ্যে খুব গভীর ভাব থাকে। কিন্তু ঐ অপেরা-গায়ক যে-সব গান গাইলেন, তাতে লক্ষ্য করলাম—দু-চারটি কথাই কেবল ঘুরেফিরে আসছে, যেমন 'Love' (ভালবাসা), 'Peace' (শান্তি), 'Harmony' (সমন্বয়)। নতুন কথা বিশেষ কিছু নেই। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই কেমন যান্ত্রিক—প্রাণহীন। বৈচিত্র্যের অভাব।

এইসব নানাকারণে সাধারণ লোকের উপর চার্চের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আমাকে ওখানকার একটি মেয়ে কথায় কথায় বলেছিল: 'আমি গির্জায় যাই না—যেতে ভাল লাগে না।' আমি বললাম: 'কেন ভাল লাগে না?' সে বলছে: 'The very atmosphere there is depressing'.—'গির্জার আবহাওয়াটাই যেন নৈরাশ্যজনক, সেখানে গেলেই যেন মনে অবসাদ আসে।' এর কারণ, এমন কিছু সেখানে তারা শোনে না, যা তাদের প্রাণে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। সব সময় কেবল স্বর্গ আর নরক—আর পাপ, পাপ, পাপ। সব সময় সেখানে যেন তাদের বলা হচ্ছে: 'ঐ তোমার সামনে জ্বলছে নরকের আগুন, ওখানে গিয়ে তোমাকে পড়তে হবে। সেটাই তোমার ভবিষ্যৎ।' এতে তাদের মনটা দমে যায়। মানুষের দোষ-দুর্বলতা থাকেই। কিন্তু সব সময় যদি সেই দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই দুর্বলতার কোন প্রতিকার হয় না—বরং মানুষ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এইসব কারণে ওরা যেন মনে মনে গির্জা বা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ধীরে ধীরে ওরা খ্রীষ্টধর্ম থেকে সরে যাচ্ছে।

[ক্রমশঃ]

প্রভু মোর হৃদয়ে বিরাজে

শ্রীমতী চিত্রা মিত্র

কোরক হইতে ধীরে ফুটে ওঠে ফুল,
সুমধুর হাসি তার নয়নের শোভা।
রঙে রসে গন্ধে ভরা অতি মনোলোভা,
গুন-গুন-গুন রবে উড়ে অলিকুল।
সবুজ তৃণের দলে তব মধুরিমা,
হে সুন্দর, নাহি তার সীমা পরিসীমা।
তোমার প্রেমের রঙে বনানী প্রান্তর
তোমারি মহিমা গাহে যুগ-যুগান্তর।

তোমার প্রেমের বাঁশী সংসারের মাঝে
শিশুর কাকলি ডাক কানে মোর বাজে
শতেক কর্মের ক্লেশ ভুলে যাই তবু,
যখন তোমারে স্মরি ওগো মোর প্রভু!
বেদনা মধুর হয় সংসারের মাঝে।
যদি প্রিয় প্রভু মোর হৃদয়ে বিরাজে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৬

শ্রীমাকে ঠাকুরের ঈশ-দায়িত্ব সমর্পণ

১৮৮৪, ২৫শে মের কথা হচ্ছে। কথামৃতে আছে পঞ্চবটীতে কীর্তনানন্দের পর নিজের ঘরে ফিরে ঠাকুর সিঁথির গোপালকে জিজ্ঞেস করলেন: "হ্যাগা, ছাতাটি এনেছ?" অপ্রস্তুত গোপাল বললেন: "আজ্ঞা না, গান শুনতে শুনতে ভুলে গেছি।" ছাতা আনতে গোপাল যখন তাড়াতাড়ি ছুটলেন, ঠাকুর মন্তব্য করলেন: "আমি যে এত এলোমেলো, তবু অত দূর নয়।"৭১

ঠাকুরের এলোমেলোমির নতুন ছন্দটিকে সে-কালে ভব্য ব্রাহ্মসমাজের মার্জিতরুচি কোন-কোন নেতা স্বাগত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। অথচ আধুনিক কালে ঠাকুরের এলোমেলোমিটি-ই হয়েছে একটি অতি আকর্ষণীয় বস্তু। তাঁর কাপড়-চোপড় সব সময়ে ঠিক জায়গায় থাকত না বলে, তাঁর প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় প্রেমের কমতি পড়ে না। ঠাকুর পরিপাটি ইস্তিরি করা কাপড়-জামা জমকালোভাবে গুছিয়ে না প'রে, বগলদাবায় কাপড়টি নিয়ে মহাকালের চিরন্তন শিশুর মতো ভাব—হাসি-মুখে যখন এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ান আপন শান্ত-দান্ত বেপরোয়া মহিমায়, এ আদি-সৌন্দর্য-গৌরবের তুলনা কোথায়? যাক্, সবাইকে এই আধুনিক কবিতাটিকে তারিফ করতে হবে, এমন কোন দাবী নেই।

কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ঠাকুরের এলোমেলোমি কখন কখন যদিও প্রকাশ পেয়েছে 'অবস্তু-ব্যাপারে', 'বস্তু'-বিষয়ে তা একটি বারও প্রকাশ পায়নি। অন্যথায় অত্যল্প সময়ে সকল প্রকারের সাধনায় সিদ্ধি লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না, এবং আধিকারিক ভক্তদের ও অন্যান্য সাধকদের সাধন-ব্যাপারে তাঁর এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকত না।

আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান বিষয়ে প্রয়োজন-সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে, লোক বুঝে ব্যক্তিগত শিক্ষা দেবার যে নীতি ঠাকুর অনুশীলন করতেন এতে অণুমাত্র এলোমেলোমি ছিল না। "এলোমেলো" ঠাকুর তাঁর আসল গুছানোতে কত যে পরিপাটি ছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রয়েছে তাঁর সারদা-লালন সমীক্ষায়।

এতে ক'রে ঠাকুর নিজে যেমন এক অভিনব আপাত-স্ববিরুদ্ধভাবে প্রকাশ হয়েছেন, তেমনি শ্রীমাকে তিনি প্রকাশ করেছেন, তাঁর স্বমহিমায়।

লীলাবসানের দিন যতই এগিয়ে আসছিল, ততই ঠাকুর তাঁর অবতরণের "বস্তু"-বিষয়ক, ধর্ম-সংস্থাপনার্থক ও জীবোদ্ধারক সব কিছু পরিপাটি রূপে গুছিয়ে এনে শ্রীমায়ের সুরক্ষায় রাখছিলেন। এটি ছিল তাঁর স্বেচ্ছাকৃত বা শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগকৃত—সারার্থ একই হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তিনি স্বয়ং ছিলেন ভবতারিণীর হাতের যন্ত্র। সে যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঠাকুর সুকৌশলে শ্রীমাকে ক্রমে-ক্রমে তাঁর লীলামঞ্চের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসছিলেন, কারণ স্পষ্টতই তিনি স্থূলদেহে লীলা সাঙ্গ ক'রে, "ও ঘরে" প্রয়াণোন্মুখ হয়ে ছিলেন।

কাশীপুরে একদিন ঠাকুর মায়ের দিকে একাগ্র-ভাবে তাকিয়ে আছেন দেখে শ্রীমা বললেন: "কি বলবে, বলই না?" অনুযোগের সুরে ঠাকুর বললেন, "হাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না?

৭১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ১৩৭৩, পৃ: ৯৪

(নিজের দেহ দেখিয়ে) এই সব করবে ?" নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে শ্রীমা বললেন, "আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি করতে পারি ?" ঠাকুর তখনই উত্তর দিলেন, "না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।"[১২]

ঠাকুরের অমৃত-কথায় আছে : "লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হ'তে পারে।"[১৩] "লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাশ চাই।"[১৪]

শ্রীমায়ের দাওয়ায় বসে হাপুস-হুপুস ক'রে পরমান্নের ভূরি-ভোজন করতে অভ্যস্ত আমরা, তাঁকে এক অতি বরেণ্যা জগদ্‌গুরুভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নই। ঠাকুর কিন্তু কয়েকবার পুনরুক্তি দ্বারা মায়ের উপর এই দায়িত্বটি এত কায়েমী ক'রে রেখে যান যে, এতে ক'রে, বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় যে, এ-ধরায় লোকশিক্ষার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি শ্রীমায়ের উপর কতটা নির্ভরশীল ছিলেন।

কাশীপুরে একদিন ঠাকুরের খাবার নিয়ে উপরে গিয়ে দেখেন, ঠাকুর চোখ বুজে শুয়ে আছেন। "এখন খাবে যে, ওঠ।"—মা ডাকলেন। যেন কোন দূর দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে, ভাবের ঘোরে মায়ের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, "ভাখ, কলকাতার লোকগুলি যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"

এ "কলকাতার লোকগুলি" জগৎ জুড়েই আছে। অজ্ঞান-অন্ধকারে যারাই রয়েছে, তাদের উল্লেখ করেই ঠাকুর এ-কথা বললেন।

মা বললেন, "আমি মেয়ে মানুষ। তা কি ক'রে হবে ?" ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে আপন-ভাবে বলে যেতে লাগলেন, "এ আর কি করেছে ? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।"[১৫]

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের মহাসমাধির পরে, অন্য এক সময়ে মা বলেছিলেন : "যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছে হ'ল, আমিও যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না তুমি থাকো ; অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।"[১৬]

ঠাকুর যে শুধু শ্রীমাকে তাঁর অসমাপ্ত কাজ করবার দায়িত্বই অর্পণ করেছিলেন তাই নয়, এ-কাজ করবার জন্য তাঁকে তিনি অনেক সিদ্ধ মন্ত্রও দিয়েছিলেন, দিব্য সম্পদ গচ্ছিত রাখার মতো।

শ্রীমায়ের ভাবী পাবনী ব্যক্তিত্ব-সম্ভাবনা শ্রীঠাকুর তাঁর নিজের স্বপ্ন-মাধ্যমেও যে আভাসে ব্যক্ত ক'রে রেখে গিছলেন, সে-সব কথা পরে ভক্তগণ শ্রীমায়ের কাছ থেকেই শুনেছিলেন। ঠাকুরের মহাসমাধির দশ বছর পরে জয়রামবাটীতে আগত কোন বালক ভক্তকে শ্রীমা গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, "দেখ, ঠাকুরের প্রায়ই সমাধি হ'ত। একদিন অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভাঙলে বললেন : 'দেখ গো, আমি একদেশে গিছলুম —সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কি ভক্তি ! তখন কি বুঝতে পেরেছিলুম, এই গুলি-বুলরা সব ভক্ত হবে ? আমি তো অবাক্, সাদা সাদা মানুষ আবার কি ?"[১৭]

এমনি করেই হয়তো ঠাকুর শ্রীমায়ের দায়িত্বের পরিধি বাড়িয়ে দিয়ে গিছলেন, যাতে ক'রে কালে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য ব্যক্ত হয়েছিল এই আন্তর সরল ভাষায় : "তারাও (যাদের বলা হয় বিদেশী) তো আমার ছেলে।"[১৮]

---

১২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৩৩
১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮২, পৃঃ ৪৯
১৪ তদেব, পৃঃ ৫০
১৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৩৫
১৬ তদেব, পৃঃ ১৩৩
১৭ তদেব, পৃঃ ৪২২
১৮ তদেব, পৃঃ ৪২২

দেখা যাবে—ঈশ-কর্মে আসল গুছানোর ব্যাপারে এলোমেলো ঠাকুরে কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই। শ্রীমাকে যে তিনি সত্যি-সত্যি আনন্দময়ী রূপে দেখতেন, এই জগজ্জননীর উপর সকল সন্তানের ভার-দায়িত্ব। এইজন্যই মনে হয়, যদিও ঠাকুর জানতেন যে, তাঁর দেহাবসানে শ্রীমা সাংসারিক দৃষ্টিতে হবেন সন্তানহীনা বিধবা, তবু তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তিনি সুনিশ্চিতভাবে কারো উপর দিয়ে যাননি। বরং শ্রীমায়ের উপর তিনি অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রে গেছেন। যেমন: "লক্ষ্মীটিকে দেখো।"[৭৯]

গোলাপ-মা একমাত্র কন্যার শোকে মুহ্যমানা হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর শ্রীমাকে তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন: "তুমি ওকে পেট ভরে খেতে দেবে; পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে।" আর একদিন শ্রীমাকে ঠাকুর ওঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন: "তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন ক'রো; এ-ই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।"[৮০]

অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন "কলকাতার লোকগুলি" দেখার ভার, "অনেক কিছু" করার ভার, ঠাকুরের চেয়ে "অনেক বেশী" করার ভার, শ্রীঠাকুর মায়ের উপর ন্যস্ত ক'রে গিছলেন।

শ্রীমায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয় মারা যাওয়ার পূর্বে দিদির চোখে চোখ রেখে বললেন: "দিদি, সব রইল—দেখো।"[৮১] বিকৃত মস্তিষ্ক সুরবালা ও রাধুর ভার মায়ের উপর এল।

ঠাকুরের অদর্শনের পর শ্রীমায়ের যখন সংসার শূন্য মনে হ'ত, কিছুই ভাল লাগছিল না, প্রাণ উড়ি-উড়ি, মন হু-হু ক'রত, মা প্রার্থনা-প্রশ্ন করতেন: "আর আমার এ-সংসারে থেকে কি হবে?" সে-সময়ে একদিন দর্শনে আবির্ভূত হয়ে একটি দশ বছরের মেয়েকে দেখিয়ে ঠাকুর বললেন: "একে আশ্রয় ক'রে থাকো। তোমার কাছে কত ছেলেরা এখন আসবে।"[৮২] এই মেয়েটি হ'ল রাধু, যাকে আশ্রয় ক'রে আগন্তুক ছেলেদের দায়িত্ব মাকে নিতে হবে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, "এলোমেলো" ঠাকুর তাঁর দেহাবসানের পর যুগধর্মসংস্থাপনার্থ যা-যা প্রয়োজন সে-সব মূলসূত্রগুলি তুলে-তুলে শ্রীমায়ের হাতে দিয়েছিলেন অত্যন্ত পরিপাটি-রূপে।

অথচ এ-সব দায়িত্ব-ব্রত উদ্‌যাপনের সব ব্যবস্থা করতে হবে শ্রীমাকে একান্ত স্বয়ম্ভর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে। পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে শ্রীঠাকুর মাকে এ-বিষয়ে উপদেশ দিয়ে রেখেছিলেন:

"তুমি কামারপুকুরে থাকবে; শাক বুনবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।

"দেখ কারও কাছে একটি পয়সার জন্যও চিত হাত ক'র না। তোমার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্য যদি কারও কাছে হাত পাতো, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।·· বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজের বাড়িতে আদর ক'রে রাখুক না কেন, কামারপুকুরে নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট ক'রো না।"[৮৩]

আশৈশব ঠাকুর ছিলেন প্রচণ্ডভাবে স্বাধীন-চেতা। স্বাধীনচেতা না হ'লে অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠালাভ করা সম্ভব নয়। এরূপ স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তির প্রেমই সম্পূর্ণভাবে স্বার্থলেশশূন্য হ'তে পারে। এমন জনই শুধু সমদর্শনের ভিত্তিতে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে জনকল্যাণ সাধন করতে পারেন।

৭৯ তদেব, পৃঃ ১৫১ ৮০ তদেব, পৃঃ ১৪৬
৮১ তদেব, পৃঃ ২০৭ ৮২ তদেব, পৃঃ ২০৮ ৮৩ তদেব, পৃঃ ১৬৩

অবতারের আবির্ভাবের যে মুখ্য ব্রত ও দায়িত্ব শ্রীমায়ের স্কন্ধে ন্যস্ত করতে ঠাকুর উদ্যত হয়েছিলেন, তার ব্যাবহারিক দিক সম্বন্ধে অবহিত করতে মাকে এ-সব উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া। পারমার্থিক দিক থেকে আনন্দময়ী শ্রীমাকে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না।

ঠাকুরের অমৃত-কথায় আছে :

"মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।"[৮৪]

ঠাকুর তাঁর জীবিত-কালে অবতারের ধর্মসংস্থাপন-যোগ-বর্ত্মে যে সর্বার্থসাধক মহান্ প্রকাশ ভাবরাজ্যে সূচিত ক'রে রেখেছিলেন, সে-সব গুহ্য তত্ত্ব ও তথ্য ভক্তগণ অনেকাংশে ঠাকুরের কাছ থেকে শোনেননি। বরং পরবর্তী কালে শ্রীমায়ের কাছ থেকে কথাপ্রসঙ্গে এ-সব তথ্য পাওয়া গেছে। কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিব্য বিষয়ে শ্রীমাকে ঠাকুর শ্রীমায়ের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন।

"বস্তু"-বিষয়ে "আমি যে এত এলোমেলো" —ঠাকুরের অত্যাশ্চর্য যোজন-নিপুণতার অনাড়ম্বর প্রকাশ অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু জীবের পারমার্থিক কল্যাণ-ব্যবস্থা বিষয়ে একাধারে মুক্তিদায়িনী শ্রীমাতে ঠাকুর এমন কয়েকটি অপরিহার্য আধ্যাত্মিক যোগাযোগের সমবায় ক'রে রাখলেন যে, গভীরভাবে ভাবলে স্তম্ভিত হ'তে হয়।

ইতিপূর্বে উদ্ধৃত শ্রীঠাকুরের বাণীটির আলোচনা করলেই বোঝা যাবে :

১. যেহেতু মানুষের সাধ্য নেই যে, অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে, সেই হেতু ঠাকুর সাধন ক'রে শ্রীমাতে বিভাসিতা আনন্দময়ীকে, এ-কর্মের ভার নিতে রাজী করালেন।
২. যাঁর ভুবনমোহিনী মায়া, জীবকে মায়া-মুক্ত করার দায়িত্ব তাঁতেই ন্যস্ত করলেন।
৩. যে সচ্চিদানন্দ গুরু শ্রীঠাকুরে আবির্ভূত, "যেই-ঠাকুর, সেই-আমি" বলে সেই সচ্চিদানন্দ গুরু শ্রীমাতেও আবির্ভূত।
৪. আর ভগবদ্-দর্শন তো ছিল শ্রীমায়ের হস্তামলকবৎ—যখন খুশী দেখতে পেতেন।
৫. "আদেশ" তো ঠাকুর বিশেষভাবেই দিলেন—"এ আর কি করেছে? তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে।"
৬. যিনি অবতীর্ণ ভগবানের পূজা এবং তাঁর সকল সাধনার ফল গ্রহণ করেছেন, তিনি যে ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী এ-বিষয়ে আর প্রশ্ন কি?

শ্রীঠাকুরের দেহাবসানের কিছুকাল পরে শ্রীমায়ের যে অভাবিত গুরুশক্তির প্রকাশ হ'ল সেটি-ই শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর ইষ্টপথে সার্থক সাহায্য করার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীমা ঠাকুরের প্রতিফলিত জ্যোতি নন। তিনি সেই একই সবিতৃ-শক্তি। এটি বিশেষ ক'রে প্রমাণ হ'ল যখন ঠাকুর তাঁর নিজের দেহখানি সরিয়ে নিয়ে শ্রীমায়ের শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

[ক্রমশঃ]

৮৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮২, পৃঃ ৭৪

বৌদ্ধসঙ্ঘ

স্বামী পরাশরানন্দ

আড়াই হাজার বছর আগে এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত : গয়ার অনতিদূরে নৈরঞ্জনা (অধুনা ফল্গু) নদীতীরে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন এক তরুণ তাপস। তাপসের প্রতিজ্ঞা কঠোর, ধ্যানে নিষ্পন্দ শরীর, সমাহিত চিত্ত ; জীবজগৎ এক ভাবী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় দিব্যভাব ধারণ করেছে। চির-অভীপ্সিত পরমতত্ত্ব জানবার জন্য ধ্যানের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করছেন তিনি। রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্বপূর্বজন্মের সমুদয় বৃত্তান্ত ছবির মতো তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল ; বুঝলেন—এ-জগৎ চাকার মতো ঘুরে চলেছে, এখানে স্থিরত্বের কোন ব্যবস্থা নেই ; কদলী বৃক্ষের গর্ভের ন্যায়ই অসার এই জীবজগৎ। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি জীবের কর্মফল দর্শন করলেন—পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা স্বর্গের সুখ আর দুষ্কর্মকারীরা যন্ত্রণাদায়ক নরকে গমন করছে। তৃতীয় প্রহরে জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকার মূল কারণ তাঁর ধ্যানে ভেসে উঠল, বুঝলেন—অবিদ্যার নাশেই এই শৃঙ্খলের পরিসমাপ্তি। চতুর্থ প্রহর—সর্বজ্ঞ ঋষি বুদ্ধ হয়ে জগতের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন ;[১] দিব্য-আনন্দে বিভোর হয়ে কেটে যায় সাত সপ্তাহ—মনে সংশয়ের দোলা—অবিদ্যা-নাশের, সর্বদুঃখনিবৃত্তির এই পথ, যা তিনি অবর্ণনীয় ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা লাভ করেছেন, জগদ্‌বাসীকে তা বলবেন কিনা আর পথের নির্দেশ দিলেও তারা এই সাধনার অধিকারী কিনা। সংশয় কেটে যায় অবিলম্বে—প্রেমাবতার করুণাময়ের হৃদয় হয়ে ওঠে উদ্বেল, তিনি অনুভব করেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে নিদারুণ দুঃখময় জগৎপারাবারের পারে নিয়ে যাবার জন্যই তাঁর দেহধারণ, তাঁর অলৌকিক সাধনা ও তাঁর বুদ্ধত্বলাভ। তিনি বোঝেন সংসাররূপ ঘোর অমানিশায় বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানুষের কাছে তাঁকেই হ'তে হবে আলোর দিশারী।

আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তিনি রওনা হলেন ঋষি-পত্তনের (সারনাথের) দিকে ; এইখানেই সাক্ষাৎ হ'ল পূর্বপরিচিত পাঁচ সাধকের সঙ্গে, যাঁরা চরম কৃচ্ছ্রতার পথ পরিত্যাগ ক'রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার জন্য কয়েক বছর আগে তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। করুণার অবতার দয়ার্দ্রচিত্তে এই পঞ্চসাধককে সংসারের সকল দুঃখক্লেশের মূল ও তা হ'তে নির্বাণলাভের উপদেশ প্রদান করলেন—তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন হ'ল। এই পঞ্চব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের প্রথম পঞ্চশিষ্যরূপে ভবিষ্যতে বৌদ্ধ-সমাজে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন ক'রে কালে অর্হৎরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এর পরের পঁয়তাল্লিশ বছর চলতে থাকে তথাগতের অক্লান্ত প্রচারকার্য এবং তাঁর অনলস একক প্রচেষ্টাতেই শত শত গৃহস্থ ভিক্ষু-জীবনযাপনে ব্রতী হ'ল। দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়রূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গ যদিও গৃহস্থ ও ভিক্ষু উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু বুদ্ধদেব ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বনকেই সাধনের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করতেন এবং এর ফলে তাঁর জীবিত-কালেই হাজারেরও অধিক ভিক্ষুতে[২] ভারতভূমি ছেয়ে যায়। এই ভিক্ষুরাই কালে বৌদ্ধসঙ্ঘরূপ বিশাল মহীরুহ গড়ে তোলেন।

১ সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১ম খণ্ড (নবপত্র প্রকাশক), (বুদ্ধচরিতম্—অশ্বঘোষ), পৃঃ ৮৭-৮৯

২ বৌদ্ধধর্ম—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৫১

বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশের কড়াকড়ি নিয়ম কিছু ছিল না ; সকল জাতি ও সকল বর্ণের জন্যই এর দ্বার উন্মুক্ত ছিল। অবশ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং পনেরো বৎসরের কম বালকের পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সঙ্ঘে প্রবেশ নিষেধ ছিল। সঙ্ঘে স্থানলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি মাথা মুণ্ডন ক'রে, হলুদ পোশাক পরিধান ক'রে একজন গুরুকে পছন্দ করবে, যিনি অন্ততঃ দশজন প্রবীণ ভিক্ষুর নিকট পবিত্র সঙ্ঘে স্থানলাভের জন্য তার হয়ে সুপারিশ করবেন। দশজন ভিক্ষুর মধ্যে যদি একজনও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ না করেন, তাহলে তাকে প্রব্রজ্যা-দীক্ষা দেওয়া হয়। তখন সে 'শ্রমণ' হয়।

ভিক্ষুগণ অনুমোদন করলে সঙ্ঘপতি তাকে ভিক্ষুর চীবর তিনটি দিয়ে দেন। প্রার্থী ঐ চীবর পরিধান ক'রে, সন্ন্যাসীবেশ ধারণ ক'রে দুটি মন্ত্র পাঠ করে। প্রথম, 'ত্রিশরণ' মন্ত্র—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

দ্বিতীয়, দশশীল মন্ত্র—জীবহত্যা, অপহরণ, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ ও সুরাপান এই পঞ্চপাপ থেকে নিবৃত্তি এবং অকাল ভোজন, নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্তি, গন্ধমাল্য প্রভৃতি সেবন, আরামশয্যায় শয়ন, সোনা-রূপা গ্রহণ—এই পঞ্চব্যসন থেকে নিবৃত্তি।[৩]

প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত যুবকের বয়স কুড়ি বৎসর হ'লে এবং যদি দেখা যায়- দীক্ষা নেওয়ার উপযুক্ত, তখন তাকে 'উপসম্পদা' দীক্ষা দেওয়া হয়। এর পর সে সঙ্ঘে পূর্ণ প্রবেশাধিকার পায়। উপসম্পদা দীক্ষাকালে ভিক্ষুকে সঙ্ঘের প্রাচীনদের মধ্যে একজনকে উপাধ্যায়রূপে পছন্দ ক'রে নিতে হয়। উপাধ্যায় ভিক্ষুকে বহুবিধ জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হ'লে সঙ্ঘের অনুমতি নিয়ে তাকে সঙ্ঘভুক্ত করেন। দীক্ষার পরের পাঁচ বছর আচার্যের নিকট ভিক্ষুর অধ্যয়নের কাল। ভিক্ষুকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এই জীবনের প্রধান ব্রত সংযম এবং দারিদ্র্য।[৪] লিখিত অলিখিত বহুবিধ নিয়মের মধ্যে ভিক্ষুদের জীবনের মূল সুর যে সুউচ্চ আদর্শে বাঁধা ছিল এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল সময়-নিয়ন্ত্রিত এবং আয়াসসাধ্য ; রুগ্ণ ও বৃদ্ধ ব্যতীত সকলকেই সকালের দিকে ভিক্ষার জন্য গৃহস্থ-বাড়ীর উদ্দেশ্যে যেতে হ'ত। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে ভিক্ষা-দ্রব্য একস্থানে ভোজন করাই ছিল নিয়ম—দিনে এই একবারই মাত্র তাদের আহার। ভিক্ষার সময় মৌনভাব অবলম্বনই বিধেয়, অবশ্য ভিক্ষা গ্রহণের পর দাতাকে আশীর্বাণী উচ্চারণ করা যেতে পারে। কখনও আবার কোন সম্পন্ন গৃহস্থ ভিক্ষুদের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ক'রত বা মঠে আহার পাঠিয়ে দিত। দিনের বাকি সময় ভিক্ষুদের ধ্যান-ধারণাদিতে কাটাতে হ'ত ; সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা বা গৃহী ভক্তদের সমাবেশে ধর্ম ব্যাখ্যা করা হ'ত। ভিক্ষুদের পরিচ্ছদ ছিল তিনটি গৈরিক চীবর—সুতা থেকে ভিক্ষুরা নিজেরাই এগুলি তৈরী ক'রে নিত বা দান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারত।[৫]

গ্রামে বা শহরে ভিক্ষুর বাস নিষেধ ছিল ; যারা নির্জনে অরণ্যবাস ক'রত, তারা গ্রাম বা শহরের নিকটেই কুটির বেঁধে থাকত। ভিক্ষুদের একেবারে একাকী থাকা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম,

৩ ঐ, পৃঃ ১২৭
৪ ঐ, পৃঃ ১২৭-২৮
৫ ঐ, পৃঃ ১৩০

এমনকি অরণ্যবাসের সময়েও দুই বা তিনজন ভিক্ষু একসাথে থাকত। পরস্পরকে সাহায্য, প্রলোভনের সময় রক্ষা আর উপদেশ নির্দেশ দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পরস্পরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল একসাথে থাকার লক্ষ্য। সঙ্ঘে নবাগতদের প্রথম পাঁচ বছর দুজন প্রাচীন ভিক্ষুর সাথে—তাঁদের ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই থাকতে হ'ত। এর ফলে ভিক্ষুজীবনের মহান্ ব্রতগুলি তারা বুঝতে পারত এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা সঙ্ঘের আদর্শ ও মূল সুরটি ধরতে পারত।[৬]

বৌদ্ধসঙ্ঘের পূর্ববর্তী যে-সব সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ ছিল (জৈন বা আজীবকদের) সেগুলিতে শারীরিক কৃচ্ছ্রতাকে খুবই প্রাধান্য দেওয়া হ'ত; এমনকি মনে করা হ'ত, এর সাথে জ্ঞানলাভের কোন নিকট সম্পর্ক আছে। কিন্তু মধ্যপন্থাই ছিল বুদ্ধমনে উদ্ভাবিত ভিক্ষুদের ব্রত। বুদ্ধ কঠোর শারীরিক কৃচ্ছ্রাদির বিরোধী ছিলেন। দেবদত্ত এবং আরও কয়েকজন শিষ্য বুদ্ধদেবকে সঙ্ঘের নিয়মাবলী আরও কঠোর করতে বললে তিনি তা করেননি। শারীরিক কৃচ্ছ্রাদি ও আত্মনিগ্রহ অপেক্ষা হৃদয়-মনের পবিত্রতা তাঁর নিকট বেশী আদরণীয় ছিল; তাই তিনি কাশ্যপকে বলছেন, যত রকমের শারীরিক কৃচ্ছ্রাদিই করা যাক না কেন, সৎ কার্য, পবিত্র হৃদয় এবং শুভ চিন্তার দ্বারা লব্ধ যে আনন্দ, তা না পেলে কাউকে প্রকৃত ভিক্ষু বলা যায় না। যার প্রেমপূর্ণ হৃদয় থেকে ক্রোধ বা অশুভ সঙ্কল্প চলে যায় এবং কামভাব বিদূরিত হয়, সেই 'ভিক্ষু' নামের অধিকারী। [দীঘ-নিকায় ৮ম][৭] অবশ্য দারিদ্র্য-ব্রত সঙ্ঘে সব সময়ই আলোকবর্তিকার ন্যায় ছিল উচ্চস্থানে। ভিক্ষুর ভূমি, দাস-দাসী, গবাদি পশু রাখা নিষেধ ছিল। তার সম্পত্তি সর্বসাকুল্যে আটটি—তিনটি চীবর, কটিবন্ধ, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূচ ও একটি ছাঁকনি। অবশ্য মঠ বা বিহারগুলির কথা স্বতন্ত্র; তাদের জমি ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি থেকে শুরু ক'রে সবকিছু অস্থাবর সম্পত্তিই ছিল। বহু শ্রেষ্ঠী ও রাজাদের আনুকূল্যে মঠগুলির ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক মধ্যযুগের ইওরোপীয় চার্চ অপেক্ষা কম কিছু ছিল না।[৮] বৌদ্ধসঙ্ঘ পুরাপুরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হ'ত; নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতি মঠে অধ্যক্ষ ঠিক হতেন—তিনি মঠের কার্যাবলী পরিচালনা করতেন, কিন্তু কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা তিনি ভোগ করতেন না; অবশ্য মঠে তিনি সবচেয়ে বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতেন।[৯]

খ্রীষ্টীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুর কাছে আত্মপাপ স্বীকার করার যে রীতি আছে, বৌদ্ধসঙ্ঘে তার অনুরূপ একটি প্রথা প্রচলিত ছিল।[১০] ভিক্ষুদের পালনীয় নিয়মগুলির নাম ছিল প্রাতিমোক্ষ; মাসে দুইবার মঠের সকল ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এগুলিকে পড়া হ'ত—প্রতিটি নিয়ম পড়ার পর ঐ নিয়ম পালনে অক্ষম ভিক্ষুকে সকলের সামনেই তা স্বীকার ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। লঘুপাপে ভিক্ষুর অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীকারই ছিল প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু গুরুপাপের (নরহত্যা, ব্যভিচারাদি) দণ্ড ছিল সঙ্ঘ থেকে

---

৬ Buddha : His life, His Doctrine, His Order—Dr. H. Oldenberg, (1927), pp. 364-65

৭ The Religion of the Buddha and its relation to Upanisadic Thought —Bahadur Mal, (1958), pp. 159-60

৮ Ibid, p. 161

৯ Ibid, p. 158

১০ বৌদ্ধধর্ম—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৫২

বহিষ্কার।[১১] অবশ্য স্বেচ্ছায় সঙ্ঘ থেকে ভিক্ষু যে কোন সময়েই তার পূর্বজীবনে ফিরে যেতে পারত।

ভজন-পূজন-স্তুতি-প্রার্থনা ইত্যাদির পরিবর্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অভ্যাস করতে হ'ত ভাবনা, ধ্যান ও সমাধি। ভাবনা পাঁচ রকমের—মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা। এর মধ্যে মৈত্রী, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষা পতঞ্জলির যোগসূত্রে[১২] যা চিত্তের প্রসাদের কারণ এবং সে-হিসাবে সমাধির পরোক্ষ কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। সকল জীবের মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক—এরূপ শুভ চিন্তা হ'ল মৈত্রী; দুঃখ-কষ্ট-রোগ-যন্ত্রণায় যারা নিপীড়িত তাদের প্রতি সমব্যথী হওয়া ও এই জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে চিন্তা হ'ল করুণা; সুখী ব্যক্তির সুখে আমারও সুখ ও আনন্দ এই ভাবনা হ'ল মুদিত; শরীরের নশ্বরত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও এর অসারতা চিন্তা হ'ল অশুভ। উপেক্ষার মূলে আছে রাগ-দ্বেষ জয়, তাই এই ভাবনায় সাধককে সমত্বের সাধনা করতে হয়—সুন্দরের প্রতি প্রীতি বা অসুন্দরের প্রতি ঘৃণা নেই, সুখদায়ক জিনিসে আসক্তি বা দুঃখদায়ক জিনিসে বিরক্তি নেই—এক-কথায় এই সাধনা হ'ল সর্ব অবস্থায় মনের সাম্যভাব বজায় রাখার সাধনা। দিনে অন্ততঃ দুবার একান্তে বসে উপরে বর্ণিত পঞ্চভাবনা ভিক্ষুদের অভ্যাস করতে হবে। বৌদ্ধমতে ধ্যানের স্থান অতি উচ্চে; এই ধ্যানের দ্বারাই মানব-জীবনের যে চরম ঈপ্সিত বস্তু তাই লাভ করা যায়। বুদ্ধদেব বর্ণিত ধ্যানের অবস্থাভেদে চারটি সোপান আছে—ধ্যানেরই অতি উচ্চ অবস্থায় আছে সমাধি[১৩]—বৃত্তিরহিত মন সম্যক্-রূপে ধ্যেয় বিষয়ের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে; কিন্তু ধ্যানের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে সেই অবস্থায় যেখানে ভাবজ্ঞান নেই, অভাবজ্ঞানও নেই; শান্ত-রস সলিলে নিমগ্ন সাধকের সেই অবস্থা লক্ষ্য ক'রে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার'।

প্রথমাবস্থায় বৌদ্ধসঙ্ঘ কেবলমাত্র ভিক্ষুদেরই সঙ্ঘ ছিল; কিন্তু বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই ভিক্ষুণীদের সঙ্ঘে প্রবেশ স্বীকৃত হয়। প্রথমে গৌতমী মহাপ্রজাপতি ও পরে প্রিয় শিষ্য আনন্দের বহু আবেদন-নিবেদনে বুদ্ধদেব সঙ্ঘে স্ত্রীলোকের স্থান দিতে রাজী হন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ভিক্ষুণীদের প্রবেশের জন্য সঙ্ঘের স্থায়িত্বকাল অর্ধেক হয়ে যাবে। ভিক্ষুদের তুলনায় ভিক্ষুণীদের জীবনযাত্রার নিয়মে কড়াকড়ি ছিল বেশী। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের সংখ্যা নগণ্য হলেও এঁদের অনেকেই তপস্যা ও পুণ্যবলে অর্হৎ পদে আরূঢ়া হন; ক্ষেমা, বিশাখা, উৎপলবর্ণা, সোমা ইত্যাদি বহু উচ্চমার্গের সাধিকার নাম ও উপাখ্যান সূত্র-পিটকের অন্তর্গত থেরীগাথায় পাওয়া যায়।

বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধসঙ্ঘের জমাট ধর্মভাব ও প্রসার কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর কাল অব্যাহত গতিতে চলেছিল। করুণাবতার বুদ্ধ যে-বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি এই সঙ্ঘে সঞ্চার করেছিলেন, তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মানুষকে দিয়েছিল ধর্মের প্রেরণা, সদ্-জীবনযাপনের প্রেরণা, লোককল্যাণের প্রেরণা, আর এই দুর্নিবার প্রেমাকর্ষণে পৃথিবীর এক বিশাল জনসমষ্টি এই ধর্ম গ্রহণ ক'রে মানবজীবনের

১১ ঐ, পৃঃ ১৫২-৫৪
১২ সমাধি-পাদ, ৩৩ নং সূত্র
১৩ বৌদ্ধধর্ম—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৩৪-৩৭

চরম উদ্দেশ্য সাধনে হয়েছিল ব্রতী। কিন্তু ভাবতে অবাক্ লাগে যে, মানবেতিহাসের এই অত্যাশ্চর্য পুরুষ অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের ন্যায় অবতারের উপর বা ভগবানের উপর বা কোন অলৌকিক শক্তির উপর কখনও নির্ভর করতে বলেননি, তাঁর প্রথম ও শেষ বাণী হচ্ছে—'আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব।' এমন কি মহানির্বাণের পূর্বে আনন্দ যখন এই মহামানবের নিকট সঙ্ঘ সম্পর্কে তথাগতের শেষ নির্দেশ কি, জানতে চাইলেন, উদারহৃদয় প্রেমিক ব'লে উঠলেন, "তথাগত মনে করেন না যে সঙ্ঘকে পরিচালিত করার দায়িত্ব তাঁর, বা সঙ্ঘ তাঁর উপরেই নির্ভর করবে। তাহলে তথাগত কেন নির্দেশ রেখে যাবেন সঙ্ঘ পরিচালনার ব্যাপারে?···তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং—মুক্তির চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে, বুদ্ধ প্রচারক মাত্র।"[১৪]

১৪ ধম্মপদ, (হরফ প্রকাশনী), পৃঃ ৮৫ ও পৃঃ ৮৭

আশা জাগে

শ্রীমতী হিমানী রায়

শুনেছি, ডাকিলে পরে
তুমি সাড়া দাও তারে;
তবে কেন মোর প্রতি হেন অবিচার।
তোমার অমৃত নাম
জপ করি অবিরাম
বাঞ্ছা পূর্ণ এ জগতে হয় সবাকার।
মনের নিভৃত কোণে,
পূজি তোমা সঙ্গোপনে,
জাগে আশা, দেখা যদি পাই।
দিনে দিনে বর্ষ ক্ষয়,
সকলি বিফলে যায়,
নাহি জানি কোন্ পথে যাই।
অন্তরের সিংহাসনে
তোমারে প্রতিষ্ঠা করি,
সার্থক করিব মম এ জীবন মন।
তোমারই করুণা মোরে,
নিয়ে যাবে সেই পুরে,
যথায় হেরিব দুটি রাতুল চরণ।

আর্তি

(গান)

শ্রীগুরুদাস মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারে বসিয়ে রেখে
কোথায় গেলি ও-মা কালী।
আঁধারেতে লাগছে মা ভয়,
বসে আছি অনেক সময়,
একা একা বসে আমি
ডাকছি শুধু মা-মা বলি॥
আমি যে তোর অবোধ ছেলে,
তাই ব'লে কি দিবি ফেলে,
এতই কি তোর অবহেলা
বুঝি না তোর লীলা খেলা।
তুই ছাড়া আর কে বাঁচাবে,
কে নেবে মা কোলে তুলি?

বিবর্তনবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদের যুগে সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন ছিল—"কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ১।১)—'ব্রহ্ম কি জগৎকারণ? আমরা কোথা হ'তে উৎপন্ন হয়েছি, কার দ্বারা জীবিত আছি এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি?' বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও প্রশ্ন—জীবজগতের উৎস কোথায়?

উপনিষদের ঋষিরা জাগতিক নিরীক্ষায় অনেক মতভেদ লক্ষ্য ক'রে ধ্যানযোগের পদ্ধতি অবলম্বনে জানলেন—

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (ঐ, ১।৩) —প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার জগৎকারণত্বের সহায়ক, স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি।

কিন্তু বিজ্ঞান প্রথম পদ্ধতি এখনও ছাড়েনি। বৈজ্ঞানিক তার মতামত সর্বদাই নির্ভুল তথ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করে। মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তথ্যে ভুল থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্বামীজীর জন্মের কিছু পূর্বে জীবজগতের উৎস সম্বন্ধে এই-রকম একটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক মতবাদ—যা 'বিবর্তনবাদ' নামে খ্যাত, যার সঙ্গে মনীষী ডারুইনের নাম জড়িত—পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় আলোড়ন এনেছিল। এই চিন্তাতরঙ্গের আঘাত স্বামীজীর মনেও পড়বে, তা আর বিচিত্র কি? আমার মনে হয়, এর প্রথম উল্লেখ চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতায় কূপমণ্ডুকের আখ্যানে; পরে জ্ঞানযোগ-সংক্রান্ত বহু বক্তৃতায়, 'কর্মজীবনে বেদান্ত' বক্তৃতামালায়, 'রাজযোগে', 'পত্রাবলীতে', 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদে' স্বামীজী বিবর্তনবাদের অনেক সমালোচনা করেছেন। সেগুলি উপস্থাপিত করবার পূর্বে ঐ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাগুলি একটু অনুধাবন ক'রব।

বিবর্তনবাদঃ ডারুইনের চিন্তা

চার্লস্ রবার্ট ডারুইন (Charles Robert Darwin, 1809–1882) এই বিবর্তনবাদের মূল স্তম্ভ। যুবা বয়সেই তিনি আবিষ্কারের নেশায় এক তথ্যসংগ্রহকারী নৌ-অভিযানে যোগ দিয়ে ৫ বৎসরে সারা পৃথিবী ঘুরে বহু উদ্ভিদ্, জন্তু, জীবাশ্ম প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। পরবর্তী ২০ বৎসরে সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে কতকগুলি তত্ত্বে উপনীত হন। ঠিক সেই সময়েই তিনি জানলেন যে, অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস্ (Alfred Russell Wallace, 1823—1913) নামে আর এক বৈজ্ঞানিক মালয় দ্বীপপুঞ্জ (Malay Archipelago)-র কতকগুলি উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর উপর গবেষণা চালিয়ে একই ধরনের মত পোষণ করেন। সেজন্য তাঁরা যুগ্মভাবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একখানি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। ডারুইন পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "On the origin of species by means of natural selection" এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে "The descent of man" নামক বিশ্ববিশ্রুত পুস্তক-দুটি প্রণয়ন করেন।

ডারুইন তাঁর বিরাট সংগ্রহশালা থেকে যে তথ্যরাজি উদ্ঘাটন করলেন, তাতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন যুগের জীবাশ্ম ও ভূপৃষ্ঠের বহুস্থান ও বহুপ্রকার আবহাওয়া অঞ্চল থেকে পাওয়া গৃহে বা প্রাকৃতিক পরিবেশে পালিত জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যে নানাপ্রকার বৈষম্য বর্তমান—কোন দুটি জীব এক নয়। এই বৈষম্যের মধ্যেও তাঁর নজরে পড়ে কিছুটা সাদৃশ্য—এদের শারীরিক গঠনে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি, রক্তনমুনা প্রভৃতিতে। এগুলি বিশ্লেষণের পর শ্রেণীবিভাগ ক'রে সাজান হ'লে ডারুইন এদের পরস্পরের

মধ্যে সম্বন্ধ ও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এমন কি গর্ভের ভেতর ভ্রূণ থেকে শিশু যে পরিবর্তনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, তাতেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবের সহিত সাদৃশ্য পান।

এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি ক'রে ডারুইনের ধারণা হ'ল - বর্তমান জগতের উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু যা আমরা দেখি, তা একদিনে সৃষ্ট হয়নি; বহুযুগ পূর্বে সৃষ্ট কোন একপ্রকার মৌল জৈব উপাদানেই প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে তারই বংশবৃদ্ধির চেষ্টা ও বংশগত গুণসঞ্চালনের দ্বারা বৈষম্য সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমেই সর্বস্তরে ক্রমোন্নতির ফলে উদ্ভিদ্ ও জীবজগৎ বর্তমান আকারে পৌঁছেছে। কিভাবে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল—এ-বিষয় অবশ্য তিনি কোন সিদ্ধান্তে আসেননি। সেজন্য তাঁর পুস্তকের নাম, 'Origin of life' না দিয়ে 'Origin of species' দিলেন।

কিভাবে সম্ভব হ'ল, তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধির ফলে পর্যাপ্ত খাদ্যের ও স্থানের অভাবে, একই বা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এবং হিমযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত বহুপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলে। শুধু ক্ষুধার জন্য নয়, যৌনমিলনের সঙ্গীনির্বাচনেও এই সংগ্রাম। আবার বৈষম্যের দরুনই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ব্যবহার-জনিত সুবিধা পেয়ে, কতকগুলি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে বংশবৃদ্ধি করে, আর অযোগ্য প্রাণীগুলি পরাজিত হয়ে কালে ধ্বংস হয়। এই পদ্ধতিকেই তিনি আখ্যা দেন—যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) বা উন্নততর শ্রেণীতে রূপান্তর। আর উপায়ের নাম দিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) দ্বারা ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ।

সেই মৌল জৈব উপাদান (mollusc or protoplasm)-ই ক্রমান্বয়ে উন্নততর জীবে পরিণত হ'তে হ'তে মানবাকারে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান মানবের ঠিক পূর্বস্তরেই হ'ল আদিমানব (৩ লক্ষ বৎসর), তার পূর্বেই বনমানুষ জাতীয় প্রাণী।

ডারুইনের পূর্ব ও উত্তরসূরীদের চিন্তা

ডারুইনের এই মতবাদের মূল্যায়নের সুবিধার্থে তার পূর্ব ও উত্তরসূরীদের কথাও কিছু আলোচনা করছি। ডারুইন স্যার সি. লিয়েল (Sir C. Lyell, 1797—1875)-এর জীবাশ্ম ও জীবন-সংগ্রাম এবং ম্যালথাস্ (Malthus)-এর জনসংখ্যা-সম্বন্ধীয় মত যেমন গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই গ্রহণ করেছিলেন জাঁ ব্যাপটিস্ট লামার্ক (Jean Baptist Lamarck, 1744—1829)-এর মত—যাতে দেখানো হয়েছিল যে, উদ্ভিদ্ ও জীবজগতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারজনিত গুণের আয়ত্তীকরণ ও বংশানুক্রমিক সঞ্চালন সম্ভব।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, 1822—95) দেখালেন—প্রজনন-ক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ে প্রাণের সংক্রমণ সম্ভব নয়। এতে ডারুইনের কিছু চিন্তা সমর্থিত হ'ল।

তবে লামার্ক (Lamarck)-এর কাছে ধার-করা মতটি তদানীন্তন বিজ্ঞানজগৎ গ্রহণ করতে পারেনি। সেজন্য ক্রমোন্নতিবাদ সম্বন্ধে ডারুইনের নির্দেশিত মতে সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। এদিকে ডারুইন সমশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে যে অত্যধিক বৈষম্যগুলিকে লক্ষ্য করেও, প্রক্ষিপ্ত মনে ক'রে মূল চিন্তাধারা থেকে বাদ দিয়েছিলেন—সেগুলির উপর অধিকতর মনঃসংযোগ ও আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল (Gregor Johan Mendel, 1822—84) ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বললেন, বংশগতভাবে গুণসঞ্চালন করে এক জোড়া জিন (Gene), যার একটি বাপের ও অপরটি মায়ের দেওয়া। এক শ্রেণীর

প্রাণীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি জিন শৃঙ্খলের আকারে থাকে, তাকে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম (Homologous Chromosome) বলে; এইগুলিই গুণের রক্ষক ও বাহক। হঠাৎ, যথা তেজস্ক্রিয় রশ্মিপাতে এই নির্দিষ্ট সংখ্যার পরিবর্তন (mutation) হয়—সঙ্গে সঙ্গে গুণের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কেবল যখন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে হিউগো ডি ভ্রিস (Hugo De Vries) নতুনভাবে ঐ তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তখনই মেণ্ডেল (Mendel)-এর মত বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থান লাভ ক'রল। এইরূপ পরিবর্তন-জনিত নতুন প্রাণীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন শ্রেণী সৃষ্ট হয়, ফলে ডারুইনের প্রদর্শিত বৈষম্য-সংগ্রাম-ক্রমোন্নতির ধারা চলতে থাকে।

এখনও ডারুইনের মতবাদ দোষত্রুটিবর্জিত হয়ে পরিবর্তিতাকারে সমর্থিত হচ্ছে। এর পেছনে টমাস হেনরি হাক্সলি (Thomas Henry Huxley, 1825—95) ও অগস্ট ভাইসম্যান (August Wiesmann)-এর অবদান চির স্মরণীয়। বর্তমানে এটি 'Synthetic Theory of Evolution' নামে পরিচিত, যার সঙ্গে হাল্‌ডেন (Haldane), ফোর্ড (Ford), ফিশার (Fisher), মুলার (Muller) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের নাম জড়িত।

এইভাবে মনীষী ডারুইন একটি মূল চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ও এই ধারায় বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চলছে।

বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মত

জগৎ-সৃষ্টি আর সৃষ্টির বৈচিত্র্য বুঝাতে ডারুইনের বিবর্তনবাদকে স্বামীজী একেবারে অস্বীকার করেননি; বরং বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিবাদী এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর ত্রুটিগুলির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন। তার মধ্যে প্রধানতঃ ক্রমবিকাশের সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচনের কোন ব্যবস্থা না থাকা, একের ধ্বংসে অপরের উন্নতি, মূল চিন্তায় শুধু শরীরগত গুণের কথাই স্থান পেয়েছে—মনোগত গুণ বা সংস্কারের কথা নয়। মনুষ্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি স্বীকার ক'রে, অদ্বৈতবেদান্ত মতে বিবর্তনবাদকে কিভাবে ত্রুটিহীন ক'রে বুঝাতে পারা যায়, স্বামীজী তা দেখিয়েছেন।

অভিনন্দন: বিবর্তনবাদকে স্বাগত জানাতে স্বামীজী জোর দিয়ে বলেছেন, "ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবতঃ এই 'ক্রমবিকাশ'বাদীদের সহিত বিবাদ করিবেন না। কিন্তু…জানিতে হইবে…প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান।" (২।১১৪)।*

অন্য স্থানে এই সত্যটিকে নিষ্কাশন ক'রে স্বামীজী বলেছেন, "মানুষ যতই জ্ঞান লাভ করিতেছে, ততই তাহার এই ধারণা বাড়িতেছে যে, কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে, আর আধুনিক সর্ববাদিসম্মত ক্রম-বিকাশবাদের তাৎপর্যই এই যে, কার্য কারণের রূপান্তর-মাত্র। এই কারণও আবার এক পুরাতন কারণের কার্য।" (২।২৬২)।

বিবর্তনবাদের মূলতত্ত্বটি খুঁজতে গিয়ে তিনি আরও বললেন, "বিজ্ঞান বলিতে বোঝায় যে, বস্তুর ব্যাখ্যা তাহার প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে; বিশ্বের

* সর্বক্ষেত্রে এইরূপ সংখ্যা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার (১ম সং) খণ্ড ও পৃষ্ঠার সূচক।

ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য বাহিরের কোন ব্যক্তি বা অস্তিত্বকে টানিয়া আনার প্রয়োজন হয় না।" যেমন, "শূন্যে উৎক্ষিপ্ত পাথরকে একজন দৈত্য টানিয়া নামায়, এই ব্যাখ্যাটি পাথর-বস্তুটির ভিতর হইতে আসিত না, আসিত বাহির হইতে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য পাথরটি পড়িয়া যায়, এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু পাথরের স্বভাবগত গুণবিশেষ; এই ব্যাখ্যাটি বস্তুর অভ্যন্তর হইতে আসিতেছে।" (৩।১৩৬)।

"এই ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণা হইল আধুনিক বিবর্তনবাদ; দুইটি ধারণাই একই মূলতত্ত্বের অভিব্যক্তি। সমগ্র বিবর্তনবাদের সরল অর্থ—বস্তুর স্বভাব পুনঃপ্রকাশিত হয়; কারণের অবস্থান্তর ছাড়া কার্য আর কিছুই নয়, কার্যের সম্ভাবনা কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে; সমগ্র বিশ্বই তাহার মূল সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র, শূন্য হইতে সৃষ্ট নয়।...কারণ খুঁজিতে আমাদের বিশ্বের বাহিরে হাতড়াইবার প্রয়োজন নাই।" (৩।১৩৭)।

বিশেষ ধর্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হলেও বিজ্ঞানের যুক্তিবাদের স্বপক্ষেই যেন স্বামীজী মনোভাব ব্যক্ত ক'রে বলেছেন, "যে-সব ধর্ম বিশ্বাতিরিক্ত একজন ঈশ্বরকে আঁকড়াইয়া ছিল,...(তাহাদের) এই ধারণা এখন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যেন...সে ধারণাকে ভূপাতিত করা হইতেছে; ধর্মকে ভূমিসাৎ করা হইতেছে বলিয়াই আমি ইহা বলিতেছি।" "ঈশ্বর ৫ মিনিটে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ঘুমাইতে গেলেন এবং সেই সময় হইতে ঘুমাইয়াই আছেন।" "'শূন্য হইতে সৃষ্টি'—আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট ইহা উপহাসের বিষয়।" (৩।১৩৭)।

আপত্তি (১): এক শ্রেণীর জীবের ধ্বংসের উপর অপর শ্রেণীর জীবের ক্রমোন্নতির চিন্তার বিরুদ্ধে স্বামীজী বলেছিলেন, "হাজার জীবনকে ধ্বংস ক'রে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়—যা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে—তা হ'লে বলতে হয়, এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার ক'রে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, এ-কথা স্বীকার করতেই হয়।...হাজার পাপীর প্রাণ সংহার ক'রে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়।" (৯।১১৯)।

"এরূপ শোনা যায়, দোষাংশ ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটি বিশেষত্ব; সংসার হইতে ক্রমাগত দোষভাগ পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাহাদের প্রাচুর্য আছে, যাহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, যাহাদিগকে তথাকথিত ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের দাম্ভিকতা বাড়াইতে পারে। সত্যই ইহা তাহাদের পক্ষে হিতকর ও শান্তিপ্রদ। সাধারণ লোকেরা যন্ত্রণা ভোগ করুক তাহাদের ক্ষতি কি? সাধারণ লোক মারা যাক—সেজন্য তাহাদের কি? বেশ কথা, কিন্তু এ-যুক্তি আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ (সমষ্টিগতভাবে) নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা (আরও) দোষাবহ এ-কথা স্বীকার করা যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, এবং অমঙ্গলের পরিমাণ কমিতেছে। ...কিন্তু অমঙ্গলের ভাগ যে ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়?" (২।১১)।

আপত্তি (২): ডারুইনের বিবর্তনবাদ শরীরগত গুণাবলীর বংশানুক্রমিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তথ্যসংগ্রহকালে তিনি মনোগত

গুণাবলীর কথা ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। তাই স্বামীজী বলেছেন 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে': "Animal kingdom (নিম্ন প্রাণিজগৎ)-এ আমরা সত্য-সত্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom (মনুষ্য-জগৎ)-এ, যেখানে rationality (জ্ঞান-বুদ্ধি)-র বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উলটোই দেখা যায়। মনে কর্, যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) ব'লে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle (সংগ্রাম) একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom (মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ)-এ instinct (স্বাভাবিক জ্ঞান)-এর প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই তাতে rationality (বিচারবুদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্য Animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom (জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যজগৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন ক'রে progress (উন্নতি) হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণ বিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগ) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হ'তে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবেতর প্রাণিজগৎ)-এ স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ)-বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতো মনুষ্যেতর প্রাণীতে ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।" (৯।১২১-২২)।

আপত্তি (৩): বিবর্তনবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, এতে ক্রমান্বয়ে উন্নতির কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু বিপরীত গতির কথা আলোচনা করাই হয়নি। কোন কোন বৈজ্ঞানিকও এ-প্রসঙ্গ তুলেছেন। স্বামীজী বহুস্থানে যুক্তি সহকারে বিবর্তনবাদের এই অসম্পূর্ণতা দেখিয়ে প্রত্যেক ক্রমবিকাশের ঠিক পূর্বে একটি ক্রমসঙ্কোচনের অস্তিত্বের কথা অবতারণা করেছেন। স্বামীজীর উক্তির যে কয়টি উদ্ধৃত পূর্বে দেওয়া হয়েছে তাতেও এ-কথার উল্লেখ আছে। এখন এ-বিষয়ে স্বামীজীর আরও কয়েকটি আলোচনা তুলে ধ'রব।

স্বামীজী বলেছেন, "আমরা যদি পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থামাত্র। ক্রমবিকাশের প্রমাণ কেবল এই: নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সকল দেহই পরস্পর সদৃশ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণী জন্মিয়াছে এবং উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর জন্মে নাই? দুদিকেই যুক্তি সমান—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে যাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন

হইতেছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিভাবে সত্য হইতে পারে।… মানুষের ক্রমাগত অনন্ত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বেশ বুঝা গেল।" (২।২০১)।

"…আমরা ক্রমাগত সরলরেখায় উন্নতি করিয়া চলিতেছি, এ-কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।…সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি তোমার সম্মুখ দিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে, যখন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনন্তরূপে বর্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে?" (২।২০০)। "তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্তকালের জন্য অবনতি হইতে পারে না।" (২।১৪১)।

স্বামীজী অন্য আর এক জায়গায় বলেছেন, "বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটি আসিয়াছে, আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজরূপে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই ঐ বীজে বর্তমান। শূন্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না;… বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল ঐ বীজ-মাত্র; আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। সমুদয় মানুষটাই একটি জীবাণুর ভিতরে, ঐ জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া মানবাকারে পরিণত হয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—(প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায়, কারণে) সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে ছিল।" (২।১১৪)। "এখন বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আবার ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করিবে", "এইভাবে তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে।" "শূন্য হইতে কিছুরই উৎপত্তি হয় না।" (২।১১৫)।

ক্রমসঙ্কোচ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী আবার বলছেন, "কিসের ক্রমসঙ্কোচ? ইহাই প্রশ্ন।…(আমরা দেখিয়াছি) বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব, আবার বীজে উহার পরিণাম—সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম একই। পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই উহার বিলয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা—আদি অন্ত উভয়ই সমান।…অন্ত জানিলে আদি জানিতে পারিব। সমুদয় 'ক্রমবিকাশশীল' জীবপ্রবাহকে—যাহার একপ্রান্তে জীবাণু, অপর প্রান্তে পূর্ণমানব (পূর্ণ চৈতন্য)—একটি জীবন বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পারো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। Law of conservation of Energy ('শক্তির নিত্যতা' নিয়ম) যদি সত্য হয়…এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একবিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পারা যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্য যদি জীবাণুতে বর্তমান না থাকে, তবে উহা অকস্মাৎ উৎপন্ন হইতে পারে না।…অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন অন্য অন্য বিষয়ে দেখা যায়, (তেমন এ ক্ষেত্রেও) যেখানে আরম্ভ সেইখানেই (চৈতন্যেই) শেষ; তবে কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত।… সেই পূর্ণমানব এই প্রাণপ্রবাহ শৃঙ্খলের এক প্রান্ত,

আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে জীবাণুরূপে প্রকাশিত।" (২।১১৫-১৭)।

"যদি তাঁহারা (বিবর্তনবাদীরা) ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটি স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশক না হইয়া সহায়কই হইবেন।" (২।১১৫)।

সমাধান: বিজ্ঞান জড় তথ্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে প্রখর যুক্তির সাহায্যে যে-সব তত্ত্বে উপনীত হচ্ছে, তাতে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ ক্রমেই জড়বাদী ও ধর্মবিমুখ হয়ে পড়ছে—সেজন্য স্বামীজী খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আবার এই বিজ্ঞানের স্বীকৃতির ফলে যখন অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাসগুলি ধূলিসাৎ হচ্ছিল, তখন স্বামীজী স্বস্তিবোধ করেছিলেন। ধর্ম যে শুধু কতকগুলি অযৌক্তিক বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, তা যে সুদৃঢ় যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের সূত্রগুলি যে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি ও জাগতিক সকল ব্যাপারকে সহজে বোঝাতে সক্ষম—তা দেখাতে অদ্বৈতবেদান্তের অবতারণা ক'রে বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

যদিও স্বামীজীর এই চিন্তা পূর্বপৃষ্ঠাগুলিতে কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে, বিষয়টিকে পরিষ্কার করবার জন্য তাঁর বাণী আরও কিছু আলোচনা ক'রব।

স্বামীজী বলেছেন, "(বিজ্ঞানের) দুইটি মূলতত্ত্বকে তৃপ্ত করিতে পারে—এমন কোন ধর্ম থাকিতে পারে কি? আমার মনে হয়, পারে। আমরা দেখিয়াছি, প্রথমতঃ সামান্যীকরণের মূলতত্ত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে।…(দ্বিতীয়তঃ) বিবর্তনবাদের তত্ত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে এমন একটি চরম সামান্যীকরণে আসিতে হইবে, যাহা শুধু সামান্যীকরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যাপকই হইবে না, বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভবও তাহা হইতে হওয়া চাই। উহাকে নিম্নতম কার্যের সহিত সমপ্রকৃতির হইতে হইবে; যাহা কারণ, যাহা সর্বোচ্চ, যাহা চরম—যাহা আদি কারণ, তাহাকে পরম্পরাগত কতকগুলি অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দূরতম, নিম্নতম কার্যের সহিতও অভেদ হইতে হইবে। (অদ্বৈত) বেদান্তের ব্রহ্মই এই শর্ত পূরণ করেন; কারণ সামান্যীকরণ করিতে করিতে সর্বশেষে আমরা গিয়া যেখানে পৌছিতে পারি, এই ব্রহ্ম তাহাই। এই ব্রহ্ম নির্গুণ,—অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের চরম অবস্থা (সচ্চিদানন্দস্বরূপ)।" (৩।১৩৭-৩৮)। "উহা সর্বব্যাপী চৈতন্য, (অসীম), সর্বদাই পূর্ণভাবে বর্তমান" (২।১৩০), অপরিণামী, অমর, একমেবাদ্বিতীয়ম্। "সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্তের আবরণের ভিতর দিয়া নানারূপে (ব্যষ্টিরূপে—সঙ্কুচিত অবস্থায়) প্রকাশ পাইতেছেন (বা প্রতিভাত হইতেছেন)।" (২।৯৮)। "ব্যষ্টি হইয়া আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি—(আমাদের কাছে জগৎ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে)…আর এই পরিবর্তন সমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহারা আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশ মাত্র।…(সব ব্যষ্টির ভিতরেই) অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ রহিয়াছে…প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।" (২।৭০-৭১)। এই-ভাবে সামান্যীকরণ গ্রহণ করা হইল।

এই ব্যষ্টির প্রকাশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, "পণ্ডিতেরা ক্রমবিকাশ কাহাকে বলেন? উহার ভিতর দুইটি ব্যাপার আছে। (ব্যষ্টির) অন্তর্নিহিত (অনন্ত) শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বাহিরের অনেক ঘটনা উহাকে বাধা দিতেছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। সুতরাং এই অবস্থাগুলির সহিত সংগ্রামের জন্য ঐ শক্তি নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটি

শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণের পর মনুষ্যরূপে পরিণত হয়। এখন যদি এই তত্ত্বটিকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন সময় আসিবে, যখন যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে ক্রীড়া করিতেছিল এবং অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বাহিরের ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না।" (২।১০০)। ওটা আবার পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

কি উপায়ে এটি সম্ভব হয়, তা বোঝাতে স্বামীজী বলেছেন, "যখন জীবাত্মা (অর্থাৎ ব্যষ্টি) এ-কথা বুঝিতে পারে, (তার মধ্যেই অনন্ত শক্তি নিহিত) তখনই সে এই জগৎ-কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশই বেশী ক'রে নিজের অন্তরাত্মার (পূর্ণ-চৈতন্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ এতে যেমন শারীর বিবর্তন ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে। (৭।২৯৮)।

এইরূপে বিকাশের সংগ্রাম ধ্বংসের পথে নয়, নিবৃত্তির বা ত্যাগের পথে তা দেখিয়ে স্বামীজী আরও বললেন, "ধর্মতত্ত্বে এই ক্রমবিকাশকেই 'ত্যাগ' বলা হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি—এগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ।" (৭।২৯৮)

যেমন অজ্ঞানাবরণে পূর্ণচৈতন্যের জীবাণুতে ক্রমসঙ্কোচন আবার পরেই বিভিন্ন প্রাণপ্রবাহ-ক্রমে পূর্ণতার বিকাশ, তেমনই প্রাণপ্রবাহের প্রতি স্তরেও আবর্তন সূচিত হয়ে বৈষম্য বৃদ্ধি করে। এইভাবে বিবর্তনবাদ গৃহীত হ'ল। তাই স্বামীজী বলেছেন, "অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই, শুধু মেলে তাহা নয়, বরং ঐ-সকল সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর এইজন্যই ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্তর এতখানি স্পর্শ করিয়াছে।" (২।১০১)।

এইভাবে স্বামীজী অদ্বৈতবেদান্তের সাহায্যে বিবর্তনবাদ ও বিজ্ঞানের অন্যান্য মূলতত্ত্বগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের ত্রুটি সংশোধন ক'রে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সমন্বয় সাধন করলেন।*

* ১৮ই মে ১৯৮১, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।—সঃ

সমালোচনা

The Condensed Gospel of Sri Ramakrishna. (M's own English Version). Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-600004, (July 1978), pp. xviii+322, Subsidised edition—Price : Rs. 5·00.

বইটি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এর ইতিহাস বলা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের মরদেহ ত্যাগের এগার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মশায় বা শ্রীম) তাঁর সযত্ন-রক্ষিত ডায়েরি হ'তে বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে পর পর দুটি পুস্তিকা (pamphlet) প্রকাশ করেন। এ দুটি পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন, এ-কথা পাঠকবর্গের জানা আছে। স্বামীজী খুব সম্ভব 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দেখে গেছেন, কারণ 'কথামৃত' ১ম ভাগ বের হয় ১৯০২ এবং ঐ খ্রীষ্টাব্দেই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। 'কথামৃতে'র ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ভাগ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯০৫, ১৯০৭, ১৯১০ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'কথামৃতে'র গোড়ায় যে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাণী আছে, তাও ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীম তাঁকে ডায়েরি হ'তে কিছু কিছু পড়ে শোনাবার পরে লেখা। বেশ বোঝা যায় যে, মাষ্টার মশায় তাঁর গুরুদেবের অমৃতবাণী-গুলি জগৎকে দান করবার পূর্বে দীর্ঘ এগার বৎসর ডায়েরির দিনলিপিগুলি নিয়ে মনন, অনুধ্যান এবং পরিমার্জন করেছিলেন। ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকাশ করবার কারণ বোধ হয়, দেশে ও বিদেশে অবাঙালীদের নিকট সেই সব বাণী পৌঁছে দেওয়া। হয়েছিলও তাই ; স্বামীজী দ্বিতীয় পুস্তিকাটি পড়ে লিখেছিলেন, "প্রত্যেকেই পছন্দ করিতেছেন—দেশে ও বিদেশে।" দুঃখের বিষয় পুস্তিকা-দুটির কোনটিই এখন পাওয়া যায় না। বই-আকারে 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' বেরোয় মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' কার্যালয় হ'তে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই বইতে আগের দুটি পুস্তিকার সকল অংশই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রীম বইটির পুরাতন ধরনের ইংরেজী ভাষা পরিমার্জিত ক'রে দ্বিতীয় সংস্করণ মাদ্রাজের 'রামকৃষ্ণ মঠ' হ'তে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'কথামৃত' প্রকাশিত হলেও অবাঙালী পাঠকদের কাছে ইংরেজী বইটি অতি প্রিয় হওয়ায় ১৯৪২-এর আগে পর্যন্ত এর অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক পাঁচখণ্ড 'কথামৃতে'র ইংরেজী তরজমা 'Gospel of Sri Ramakrishna' প্রকাশিত হ'লে শ্রীম-লিখিত 'গসপেলটি'র ছাপানো অপ্রয়োজনীয় বোধে বন্ধ করা হয়। কিন্তু বইটি স্বয়ং শ্রীম-দ্বারা লিখিত হওয়ায় এবং এর সাহিত্যিক মূল্যবোধে বহুজন এটিকে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করায় মাদ্রাজ মঠ দীর্ঘ ৩৬ বৎসর পরে বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করেছেন। বইটি দুটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে : একটি ২৫৲, অন্যটি ৫৲। মনে হয়, স্বামী নিখিলানন্দ-লিখিত 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' হ'তে পৃথক করার জন্য এবং এতে সমগ্র 'কথামৃত' সন্নিবিষ্ট না থাকায় নতুন সংস্করণের নামকরণে সংক্ষিপ্ত (Condensed) কথাটি যোগ করা হয়েছে।

স্বামী তপস্যানন্দ-লিখিত পরিচিতি এবং ২৫ পৃষ্ঠা ভূমিকা ছাড়া সমগ্র বইটি ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত ; এবং প্রতিটি অধ্যায়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদ আছে। ('কথামৃতে'র প্রতিটি ভাগ খণ্ডে এবং প্রতিটি খণ্ড পরিচ্ছেদে বিভক্ত)। পরিচ্ছেদগুলি 'কথামৃতে'র কোন না কোন

ভাগের খণ্ডের সঙ্গে মেলে, কিন্তু কোন ধারাবাহিক মিল নেই। উদাহরণ স্বরূপ: প্রথম পরিচ্ছেদ—'কথামৃতে'র প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের সঙ্গে মেলে, কিন্তু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে যাওয়ার বর্ণনা আছে, যেটি পাওয়া যায় 'কথামৃতে'র ৩য় ভাগে। কেন তিনি পরিচ্ছেদগুলি 'কথামৃতে'র ধারায় করেননি, তা বলা কঠিন—যেমন বলা কঠিন, কি ভিত্তিতে 'কথামৃতে'র ভাগগুলি শ্রীম সাজিয়েছেন। 'গসপেলটি' আরম্ভ হয়েছে 'কথামৃতে'র মতো শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীম'র দর্শনের প্রথম দিন হ'তে; কিন্তু শেষ হয়েছে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চের বর্ণনা দিয়ে। বলা বাহুল্য, বইটিতে মাঝের অনেকদিনের দিনলিপি নেই, যেগুলি 'কথামৃতে' আছে।

'কথামৃত' ও 'গসপেল' দুটিরই ভিত্তি মাষ্টার মশায়ের ডায়েরি হওয়ায় অধিকাংশ স্থলে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও একটি অপরটির অনুবাদ নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলালে 'গসপেলে'র অনেক অধ্যায়ে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়, যা 'কথামৃতে' নেই। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথোপকথনে সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সমাধি সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা আছে।

'কথামৃতে' আছে: "একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি বস্তু, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।" ইংরেজী বইয়ে এর পরে আছে: "It is Being not conditioned by anything—Time, Space or Causation. How can one give expression to it by any word of mouth?" 'কথামৃতে' আছে: "তা ঈশ্বর কি কাউকে বেশী শক্তি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন?...তা তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন?" 'গসপেলে' এর পরেও আছে: "Inequality is a fact in God's creation and must have a deep meaning. It does not certainly prove that God is partial." 'কথামৃত' ৩য় ভাগ, ২৪শ খণ্ডে: "শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে নরেন্দ্রনাথকে)—'আচ্ছা আমার কি ভাব? নরেন্দ্র—বীরভাব, সখীভাব—সব ভাব।'" 'গসপেলে'র চতুর্দশ অধ্যায়ে এই তিন ভাবকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাত পঙ্‌ক্তিতে। এইরূপ বিভিন্নতা আরও অনেক জায়গায় আছে।

বই-দুটি মিলিয়ে পড়লে মাষ্টার মশায়ের ডায়েরির আরও দুটি জিনিস লক্ষিত হয়: (ক) শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীম'র প্রথম দুই-তিন দিনের দর্শনের তারিখ। 'গসপেলে' (১ম অধ্যায়ে ১ম পরিচ্ছেদ) প্রথম দর্শন সম্বন্ধে আছে: "It is the spring of 1882"—কোন নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া নেই। 'কথামৃতে' এ-সম্বন্ধে আছে: "ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত Joseph Cook সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঠাকুর ষ্টীমারে বেড়াইয়াছিলেন, তাহারই কয়েক দিন পরে।" পরের পৃষ্ঠায় অবশ্য আছে: 'আজ রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী" কিন্তু বাংলা তারিখ বা তিথি দেওয়া নেই। দ্বিতীয় দর্শন সম্বন্ধে বাংলা বইয়ে আছে, "দ্বিতীয় দর্শন, সকাল বেলা, আটটার সময়"—কোন তারিখ নেই। ইংরেজী বইয়ে আছে, "a couple of days after at about eight in the morning, M. called again". তৃতীয় দর্শনের তারিখ সম্বন্ধে ইংরেজীতে আছে, "the following Sunday' এবং 'কথামৃতে' আছে '৫ই মার্চ", বাংলা তারিখ বা তিথি নেই। 'কথামৃতে'র ১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড হ'তে এবং 'গসপেলে'র ২য় অধ্যায় হ'তে প্রায় সকল দিনের দিনপঞ্জি

ইংরেজী বাংলা তারিখ, বার ও তিথি দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। এর থেকে মনে হয় যে, শ্রীম'র প্রথম দুই তিন দিনের দর্শনের দিনলিপি তিনি ডায়েরিতে বিশদভাবে লেখেননি, যেভাবে পরের গুলির বিষয় লিখেছিলেন। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য হয়েছিলেন, দ্বিতীয় দর্শনে অভিভূত হয়েছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই দেবমানবের সম্বন্ধে সবকিছু ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রথম দিকের দিনলিপিগুলিতে তারিখ পরে হিসাব ক'রে যোগ করেছিলেন, যা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের 'গসপেলে' করা হয়নি। (খ) বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দর্শনের বর্ণনায় 'কথামৃত' ও 'গসপেলে' বেশ তফাত দেখা যায়। ইংরেজী বইয়ে যদিও আরও বিশদভাবে বর্ণনা আছে ('কথামৃতে' ২২ পৃষ্ঠা, 'গসপেলে' ৩৬ পৃষ্ঠা), তবে অনেক কথা যা 'কথামৃতে' আছে, তা ওতে নেই। যেমন—"ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল।··· কত খাটত। সকাল বেলা আশ্রম হ'তে চলে যেত···রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে ফলমূল খেত।" "গরু 'হাম্বা' 'হাম্বা' করে···কসাইয়ে কাটে··· শেষে নাড়ি ভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈরী···তখন 'তুঁহু' 'তুঁহু'।" "গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়··দশমাস হ'লে আদপে কর্ম করতে দেয় না।" "কাঠুরে এগিয়ে দেখে রূপার খনি··· সোনার খনি।", "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি।" আবার ইংরেজীতে আছে বাংলায় নেই, এরূপও আছে। যেমন— "পাঁজিতে আছে বিশ আড়া জল", "সন্ন্যাসীর বাহিরে ও ভিতরে ত্যাগ, গৃহীর মনে ত্যাগ", বড়লোকের মালীর "আমার বাগান" বলা, জল "ভক্তি হিমে বরফ" হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারগুলি। অবশ্য এইসব উক্তি বা উদাহরণগুলি দুটি বইয়েরই অন্যত্র হয়তো কোথাও দেওয়া আছে। যেমন অগ্নি ও দাহিকার শক্তির কথাটি ইংরেজীতে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথাবার্তায় না থাকলেও কেশবের সঙ্গে ষ্টীমারে ভ্রমণকালে দেওয়া আছে। একই দিনপঞ্জির বর্ণনায় এরূপ অমিল থাকায় অনুমান করা যেতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সব কথা বা উপমা বহুবার বহুজায়গায় বলেছেন, শ্রীম প্রয়োজন মতো জায়গায় সেগুলির ব্যবহার করেছেন।

বইয়ের ইংরেজী ভাষা নিয়ে কিছু কিছু সমালোচনা হ'তে পারে, কারণ এ যেন খানিকটা স্কুল-কলেজে শেখা ইংরেজীর মতো। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শ্রীম যে-সময় লিখেছেন, ভাষাটি সেই সময়কার। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় একশত বৎসর আগেকার ভারতীয়দের লেখা পুনর্মুদ্রিত চিঠি দেখলেই এ-কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে। বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কামিনী-কাঞ্চন'-এর অনুবাদ "Woman and Gold" নিয়ে অনেকে অনুযোগ করেন। এ-বিষয়ে বইয়ের পরিচিতিতে স্বীকার করা হয়েছে, অনুবাদটি "lust and lucre" হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, সংস্কৃত একটি বিচিত্র ভাষা এবং এই ভাষা হ'তে উদ্ভূত 'কামিনী' শব্দের অর্থ—ঠিক নারী নয়, বরং বলা যায় কামনার কেন্দ্ররূপা নারী। শ্রীরামকৃষ্ণ নারীকে জগন্মাতার অংশরূপে দেখতেন, তাঁদের সম্বন্ধে কখনও ঘৃণা প্রকাশ করতেন না।

সস্তা সংস্করণের দাম মাত্র পাঁচ টাকা করা সত্যই প্রশংসনীয়।

অবাঙালী ভক্ত যাঁরা শ্রীম'র লেখন-মাধুর্য উপভোগ করতে চান এবং যাঁদের পক্ষে স্বামী নিখিলানন্দের বড় 'গসপেল' পড়া সম্ভব নয়, তাঁদের কাছে এই বইয়ের পুনঃপ্রকাশ অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। বাঙালী পাঠক যাঁরা 'কথামৃত' পড়েছেন, তাঁদের কাছেও এই বইয়ের মূল্য আছে, কারণ কিছু কিছু তথ্য বা আলোকপাত, যা কথামৃতে নেই, তা এই বইয়ে পাওয়া যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যদি সামান্যও নতুন তথ্য পাওয়া যায়, বিশেষতঃ শ্রীম'র কাছ হ'তে, তার মূল্য কি কম? **ডক্টর জলধিকুমার সরকার**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

পল্লীমঙ্গল

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সর্বদাই গ্রামীণ সাধারণ ও দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণের জন্য নানাভাবে বিভিন্ন প্রকার সেবায় নিয়োজিত। এতদতিরিক্ত সম্প্রতি (১) রামকৃষ্ণ মঠ পল্লীমঙ্গল ও (২) রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গল নামে দুইটি নূতন কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। এই প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হইয়াছে (১) শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে, (২) রর জন্মস্থান হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে এবং (৩) হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের আরও ১৫টি গ্রামে। ঐ-সকল গ্রামের সার্বিক ও সামূহিক উন্নয়নই পল্লীমঙ্গলের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, নীতি ও ধর্ম এবং সর্বোপরি আর্থিক উন্নতির উপায়স্বরূপ—ঐ-সব অঞ্চলের ২০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়া ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু করিয়া, বর্তমানে ৩৯২টি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও প্রযুক্তিগত বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা স্বনির্ভর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে নিম্নলিখিত কাজের মাধ্যমে: (১) চাষের জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষা এবং সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ বণ্টন, (২) মৎস্য-চাষ, (৩) দুগ্ধপ্রকল্প, (৪) কৃত্রিম গোপ্রজনন, (৫) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে সাহায্য এবং (৬) কুটীরশিল্প। কুটীরশিল্পে ধূপকাঠি, চক (খড়িমাটি), মোমবাতি, আসন ও ঝোলানো ব্যাগ, গেঞ্জি, শাড়ী, ধুতি, চাদর, গামছা, পোশাক প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে এ-পর্যন্ত ৩৫,০০০ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। এ-ছাড়া বয়স্ক শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

গত ১৬ই মার্চ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণতম সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ) জয়রামবাটীতে একটি রুটি ও বিস্কুটের কারখানা উদ্বোধন করিয়া স্থানীয় কয়েকজন বেকার যুবকের হাতে তুলিয়া দেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—পল্লীমঙ্গলের জন্য দান ৩৫ সিসিএ ধারানুসারে ১০০% আয়করমুক্ত। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত উপরি-উক্ত কাজে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগ ও মালদায় পুনর্বাসনকার্য সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে।

খেতড়ি (রাজস্থান)—বস্ত্রবিতরণ: পশমী কম্বল ২০টি, পশমী সোয়েটার ৬টি, ৩ খানি শাড়ী ও ৪ খানি ধুতি শীতকালীন পোশাক হিসাবে খেতড়ি কেন্দ্র কর্তৃক ৩৩টি উপযুক্ত পরিবারবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

উৎসব

শিলং (মেঘালয়) রামকৃষ্ণ মিশনে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৭তম জন্মোৎসব গত ২৫শে ফেব্রুআরি মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, প্রায় ৫০০০ ভক্ত নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ-বিতরণ, ভজনাদি প্রভৃতির মাধ্যমে আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে ৭ই হইতে ১১ই মার্চ পদাবলী কীর্তন, রামায়ণ-গান, শিশুশিল্পিবৃন্দ কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি হয়। ১২ই হইতে ১৪ই মার্চ আয়োজিত জনসভায় আলোচিত হয় শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী। এই তিনদিনের সভায় স্বামী প্রমথানন্দ পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ মেহরোত্র। ১৩ই ও ১৪ই মার্চ শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও সহ-শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত হয় যথাক্রমে 'রামকৃষ্ণ-গীতি আলেখ্য' ও 'মহাভারত-গীতি আলেখ্য'। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ছয়-সাত হাজার শ্রোতা।

চেরাপুঞ্জী (মেঘালয়) রামকৃষ্ণ মিশনে গত ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-গান, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। মধ্যাহ্নে ৬০০ জন খাসি ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের ভক্ত নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ২৮শে ফেব্রুআরি এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তৃতা করেন মেঘালয়ের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীমাহাম্ সিং এবং সেং-খাসি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রীঅগুারসন মাউরি। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

শেলা (মেঘালয়) রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত পালিত হয়। এই উপলক্ষে ৩০০ জন ভক্ত নরনারীর এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতে করিতে গ্রাম পরিক্রমা করে। মধ্যাহ্নে ১২০ জন ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী গোকুলানন্দ, শ্রীহিপ্‌শন রায়, শ্রীঅগুারসন মাউরি, শ্রীবর্কলে পিউ, শ্রীলক্ষ্মণ স্থলাই। দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধুতি, শাড়ি, সার্ট ও ফ্রক বিতরণ করা হয় সন্ধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :

মোরাবাদি (রাঁচি) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

ফরিদপুর (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা) মিশন আশ্রম।

বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ উপলক্ষ করিয়া ১১ই মার্চ ,৯৮২, এক আনন্দোৎসবে বিশেষ পূজা ও হোম হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পদার্পণের শতবর্ষ পূর্তি-স্মরণে প্রদীপ জ্বালাইয়া এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। সেই সময় বেদপাঠ হইতে থাকে। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিয়া তিনি নাটমন্দিরে আয়োজিত সভায় যান। পূর্বাহ্ণের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন স্বামী অভয়ানন্দজী প্রমুখ মঠের ও কলিকাতার বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং অগণিত ভক্ত নরনারী। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন : "দক্ষিণেশ্বরের মতো এই বলরামবাবুর বাড়িও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাক্ষেত্র। এখানে ঠাকুর কম ক'রে একশ-বার এসেছেন। ১১ই মার্চ ১৮৮২, এই বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম আগমন নয়, তার আগেও বহুবার এসেছেন। তার কোন দিন-তারিখ জানা যায় না। 'কথামৃতে', প্রথম লিপিবদ্ধ হয় এই দিনটি।" এর পর পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বলেন : "শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যে, বলরামের বাড়ি আমার কেল্লা। তিনি এখানে এসে বহুবার রাত্রিবাস করেছেন। বলরামের অন্নকে তিনি শুদ্ধ অন্ন বলতেন। ভক্তদের কাছে দক্ষিণেশ্বর যেমন তীর্থস্থান, বলরাম মন্দিরও একটি তীর্থস্থান। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনা ক'রে আমরা আনন্দ পাচ্ছি, ঠিক একশ বছর আগে তাঁর কথা শুনে ভক্তেরা যে কী আনন্দ পেয়েছিলেন, তা আমরা কল্পনায়ও আনতে পারি না!" সমাপ্তি সঙ্গীতের পর সমাগত সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যারতির পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীর তাৎপর্য আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন : "ঠাকুরের কথা বুঝতে আরো বহু শতাব্দীর প্রয়োজন।"

আবির্ভাব-তিথি ও পূজা-তিথির সূচী

বাংলা ১৩৮৯ সাল, ইংরাজী ১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ

তিথি-কৃত্য

১। শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	১৪ বৈশাখ	বুধবার	২৮ এপ্রিল	১৯৮২
২। শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	২৩ বৈশাখ	শুক্রবার	৭ মে	,,
৩। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	৩ শ্রাবণ	সোমবার	১৯ জুলাই	,,
৪। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১৯ শ্রাবণ	বুধবার	৪ আগষ্ট	,,
৫। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২৭ শ্রাবণ	বৃহস্পতিবার	১২ আগষ্ট	
৬। স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১ ভাদ্র	বুধবার	১৮ আগষ্ট	
৭। স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২৬ ভাদ্র	রবিবার	১২ সেপ্টেম্বর	
৮। স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	৩১ ভাদ্র	শুক্রবার	১৭ সেপ্টেম্বর	
৯। স্বামী সুবোধানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী	১২ কার্ত্তিক	শুক্রবার	২৯ অক্টোবর	
১০। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দশী	১৪ কার্ত্তিক	রবিবার	৩১ অক্টোবর	
১১। স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	৯ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	২৫ নভেম্বর	
১২। শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	২১ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	৭ ডিসেম্বর	
১৩। স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২৫ অগ্রহায়ণ	শনিবার	১১ ডিসেম্বর	,,
১৪। স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা	৫ পৌষ	মঙ্গলবার	২১ ডিসেম্বর	,,
১৫। শ্রীযীশুখৃষ্ট		৮ পৌষ	শুক্রবার	২৪ ডিসেম্বর	,,
১৬। স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	১৩ পৌষ	বুধবার	২৯ ডিসেম্বর	,,
১৭। শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	২০ পৌষ	বুধবার	৫ জানুয়ারী	১৯৮৩
১৮। স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২ মাঘ	রবিবার	১৬ জানুয়ারী	,,
১৯। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	৪ মাঘ	মঙ্গলবার	১৮ জানুয়ারী	,,
২০। স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	১৪ মাঘ	শুক্রবার	২৮ জানুয়ারী	,,
২১। শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১ চৈত্র	বুধবার	১৬ মার্চ	,,
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		৫ চৈত্র	রবিবার	২০ মার্চ	,,
২২। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	১৩ চৈত্র	সোমবার	২৮ মার্চ	,,
২৩। স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১৭ চৈত্র	শুক্রবার	১ এপ্রিল	,,

পূজা-কৃত্য

১। শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৭ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	২২ মে	১৯৮২
২। স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	২২ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	৬ জুন	,,
৩। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	৭ আশ্বিন	শুক্রবার	২৪ সেপ্টেম্বর	,,
৪। শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২৯ আশ্বিন	শনিবার	১৬ অক্টোবর	,,
৫। শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	৫ মাঘ	বুধবার	১৯ জানুয়ারী	১৯৮৩
৬। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৮ মাঘ	শুক্রবার	১১ ফেব্রুয়ারী	,,

যুবসম্মেলন

জলপাইগুড়ি মিশন আশ্রমে গত ১২ই ও ১৩ই মার্চ যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুই-দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'বেদান্ত ও ভোগবাদ', 'ভারতের বর্তমান সমস্যা-সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ', 'ভারতীয় জনজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান' এবং 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ'। উপরি-উক্ত বিষয়ের উপর ভাষণ দেন বিশিষ্ট বক্তাগণ ও যুব-প্রতিনিধিবৃন্দ।

উদ্বোধন-সংবাদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই এপ্রিল (১৯৮২) শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার উদ্বোধনের 'সারদানন্দ হলে' প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং ভাষণ দেন ৯ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৯টায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়। ডঃ তপনকান্তি ঘোষ উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের প্রারম্ভিক ভাষণের পর শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ দুইখানি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই তিনদিনব্যাপী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ।

প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় সকাল ৯টায়। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত' উদাহরণ-সহযোগে আলোচনা করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। তাঁহাকে সহযোগিতা করেন 'ছন্দম্-গোষ্ঠী'।

প্রথম অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীদিলীপকুমার সেন। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী, ডঃ তারকনাথ ঘোষ, শ্রীতাপস ভট্টাচার্য ও শ্রীবিপ্রদাস ভট্টাচার্য।

দ্বিপ্রহরের বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় বিকাল ৩টায়। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন। তাঁহার বক্তব্যের উপর মন্তব্য করেন ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীহরিপদ আচার্য।

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভা'। তাঁহার আলোচনার উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুধাংশু মণ্ডল ও অধ্যাপক পার্বতী চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় দিন ১০ই এপ্রিল শনিবার বিকাল ৩টায় তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসুপ্রকাশ সাহা। 'শ্রীশ্রীমা: গুরুভাব' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপিকা চামেলী বসু। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন ডঃ জলধিকুমার সরকার, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত।

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে শ্রীসুপ্রকাশ সাহার সঙ্গীতের পর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। তাঁহার বক্তব্যের উপর মন্তব্য করেন ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন ও ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। এই অধিবেশনের শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'প্রেমের ঠাকুর' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীধ্রুব চৌধুরী, শ্রীতপন সিংহ ও সম্প্রদায়।

তৃতীয় দিন ১১ই এপ্রিল রবিবার বিকাল ৩টায় চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডঃ তপন-কান্তি ঘোষের উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর ডঃ জলধি-

কুমার সরকার প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ'। তাঁহার পাঠের পর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডঃ দেবীদাস বসু, ডঃ ধ্রুব মার্জিত ও ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁহার বক্তব্যের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন। অধিবেশনের শেষে 'গীতাতত্ত্বের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ' সঙ্গীতানুষ্ঠানটি শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

তিনদিনব্যাপী এই সাহিত্য-সম্মেলন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুরাগী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করে।

২রা এপ্রিল শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে রামনবমী পালিত হয়।

সন্ধ্যারতির পর (৭টায়) 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

জন্মজয়ন্তী

আমতলী (ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৫শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, চারদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজনগান, রামায়ণ-গান, পদাবলী কীর্তন, ধর্মসভা এবং 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের মাধ্যমে সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের শেষদিন ৫০০০ ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ধানবাদ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গত ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ ১৯৮২, প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসবে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। দুইদিনের অনুষ্ঠানে স্বামী মিত্রানন্দের পৌরোহিত্যে ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী উমানন্দ।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য **ধীরেন্দ্র গুহঠাকুরতা** গত ১৩ই মার্চ ১৯৮২, সকাল ৬-১৫ মিনিটে কলিকাতা ঢাকুরিয়ার বাসভবনে ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়সে মৈমনসিংহ হইতে শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে আসেন। তিনি বহু সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে সুপরিচিত।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য খাসিপাহাড় (মেঘালয়) জেলার শেলাগ্রাম নিবাসী **দেবেশ রায়** গত ১৩ই মার্চ, ৯২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী প্রভানন্দ (কেতকী মহারাজ) যখন এই শেলাগ্রামে গিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করেন, তখন যে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন, দেবেশ রায় ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া শেলাগ্রামের পরিচালনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন।

থাকিত। তাহাতে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্যোপার্জ্জনজন্য ব্যয়ের সম্যক্ কুলান হইবে জানিয়া, সৌভ্রাত্রনিবন্ধন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে সুদূর পূর্ব্বদেশস্থ কোনও বিখ্যাত বিদ্যালয়ের অন্তর্বাসী করিয়া দিলেন।

স্বীয় মেধাগুণে জন্ স্মীথ্ শীঘ্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ্, এ, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন। পরে বি, এ, শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া পত্রদ্বারা অবগত হইলেন যে, সে বৎসর তাঁহাদের ক্ষেত্রে শস্যের নামমাত্রও জন্মে নাই এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহ হইতে আর্থিক সাহায্যের কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া, জন্ স্মীথ্ প্রথমতঃ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ধনীদের গৃহে গিয়া কি অর্থ ভিক্ষা করিবেন? ভিক্ষা করা অতি নীচের কর্ম্ম ভাবিয়া তিনি সেই উদ্যম হইতে নিরস্ত হইলেন। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যদি কোনও উপায় নির্দ্ধারিত হয়, তিনি সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া, তৎক্ষণাৎ একটি কাগজ লইয়া তদুপরি এইরূপ লিখিলেন :—

"বিজ্ঞাপন।"

"অদ্য হইতে জন্ স্মীথ্ বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের নিম্নলিখিত অভাবগুলি পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে ;—

১। আমি ছাত্রগণের ক্ষৌরকর্ম্ম করিব। প্রত্যেক ক্ষৌরের জন্য তাঁহাদিগকে দশ সেণ্ট করিয়া দিতে হইবে। (দশ সেণ্টে পাঁচ আনা, আমেরিকায় ভারতবর্ষাপেক্ষা সকল বিষয়ই অতি মহার্ঘ্য।)

২। তাঁহাদের পাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন করিব। প্রত্যেক পাদুকা যুগলের জন্য পাঁচ সেণ্ট করিয়া দিতে হইবে।

৩। জামার বোতাম সীবন প্রভৃতি কর্ম্ম সমুচিত মূল্যে সম্পন্ন করিব।

৪। চীনের বাদাম সুন্দররূপে ভর্জ্জন করিয়া অল্পমূল্যে সকলকে যোগাইব।

৫। তর্ক, বাদ প্রভৃতির মীমাংসা, ও বক্তৃতার বিষয়গুলিকে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি কর্ম্ম সর্ব্ববাদিসম্মত মূল্যে সম্পন্ন করিব।

৬। টুপি সকলের সংস্কার ও রঞ্জন প্রভৃতি কর্ম্ম এখানে স্বল্পমূল্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

৭। পাঠ্য পুস্তক সকল ন্যায়মত মূল্যে ক্রয় বিক্রয় বা পরিবর্ত্তন করিতে পারা যাইবে।

৮। কাগজ, কলম, পেন্সিল, মসি, মসিপাত্র, প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে দেওয়া হইবে।

৯। দেশীয় দ্রব্য সকল সাদরে গৃহীত হইয়া, অত্রত্য শিল্পিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইবে।

১০। অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত আমি পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় বিষয় সাধারণকে যোগাইতে চেষ্টা করিব।

১১। জন্ স্মীথের নাম বিস্মৃত হইবেন না।

১২। স্মরণ রাখুন। ক্ষৌরকর্ম্ম হইতে দর্শনাদি শাস্ত্রের মীমাংসা কর্ম্ম পর্য্যন্ত সকল

(বৈশাখ, ১৩৮৯, পৃঃ ১৮৫)

কর্মগুলিই অতি সুলভমূল্যে স্বল্প লাভ লইয়া সম্পন্ন করা হইবে। সুতরাং ক্রেতাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। সকলে আসিয়া আমার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করুন।"

অনতিবিলম্বে প্রায় বিদ্যালয়ের দুই শত ছাত্র এই অভিনব বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া, কেহ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, কেহ মনে করিল যে, ইহা ভণ্ডতা মাত্র, কেহ কিছুই তত্বোদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রহিল এবং যখন জন্ তাহাদের সম্মুখীন হইলেন, তখন প্রত্যেকেই তাঁহাকে নানারূপে উপহাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জন্ অন্য কোন উত্তর না দিয়া বিজ্ঞাপনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়া আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন। সেদিন প্রাতঃকালে তিনি বিদ্যালয় হইতে অবসর লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, তৎকালে নগরস্থ পণ্যবীথিকায় গিয়া, তাঁহার নিকট যে দশটি মুদ্রা ছিল, তদ্দ্বারা যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলেন। চীনের বাদাম ভর্জ্জন করিবার উপযোগী একটি নাতিপুরাতন লৌহময় যন্ত্র পূর্ব্বদিবস ভ্রমণকালে তিনি একস্থলে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অতি সুলভমূল্যে তাহা ক্রয় করিলেন। ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য একটী সুন্দর কাষ্ঠাসনও ক্রয় করিলেন এবং বিজ্ঞাপনে যে সমুদয় দ্রব্য উল্লেখ করিয়াছিলেন, সকলগুলিরই কিয়ৎ কিয়ৎ পরিমাণ আনয়ন করিয়া, অপরাহ্ণ ১টার সময় নূতন বাণিজ্যকর্ম্মে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচভাব আসিয়াছিল, কিন্তু স্বীয় মানসিক শক্তিবলে তিনি বৃথা অভিমানকে প্রায় একপ্রকার চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং লিখিত সময়ানুসারে ক্রেতাবর্গের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; এবং দেখিলেন যে, বিংশতি জন সহাধ্যায়ী বহির্দ্দেশে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে! জন্ গম্ভীর ভাবে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আসুন মহাশয়েরা, আপনাদের কোন্ বস্তু আবশ্যক? ক্ষৌরকর্ম্ম বা স্নান বিচার ইচ্ছা করেন, না, পাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন অথবা ভৃষ্ট চীনের বাদাম?"

সহাধ্যায়িগণ আশ্চর্য্যান্বিতের ন্যায় তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, এবং পরিশেষে উচ্চহাস্য করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহে আসনের সংখ্যা অত্যল্প থাকায় সকলেই গৃহসামগ্রীসমূহের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল "কি হে জন্, ব্যাপার কি? তুমি কি সত্য সত্যই দোকান খুলিয়াছ, না, পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিয়াছ?"

জন্ উত্তর করিলেন, "বিজ্ঞাপন পাঠ করুন"।

ইহাতে তাহাদিগের মধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া কহিল "আচ্ছা, আমায় ক্ষৌর করিয়া দাও।" ইহাতে জন্ তৎক্ষণাৎ একটি ক্ষুদ্র অন্তর্গৃহ হইতে ক্ষৌরোপযোগী একখানি সুন্দর আসন বাহির করিয়া আনিলেন। ইহা তিনি পূর্ব্বদিবস ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ আরও চমৎকৃত হইল। তদুপরি সহাধ্যায়ীকে উপবেশন করাইয়া একজন অভিজ্ঞ নাপিতের ন্যায় জন্ ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভ্রাতার ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বন্ধুবর্গ কত উপহাস করিতে লাগিল, যদিও তাহারা ক্ষৌরাসনে উপবিষ্ট সহাধ্যায়ীকে কত প্রকার ভয় দেখাইতে

(৮৩তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৮৬)

লাগিল, তথাপি জন্ এমন সুন্দররূপে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন যে, তদ্দর্শনে সকলে অবাক্ হইয়া গেল। ক্ষৌর শেষ হইলে, নাপিতদের প্রথানুসারে তিনি জিজ্ঞাসিলেন "ইহার পর আর কে ক্ষৌর হইতে চাহেন?" এবং প্রথমবন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া অর্থাধিকারীর নিকট আপনার দেয় দিউন।" ইহাতে সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, এবং উক্ত বন্ধু তাঁহার হস্তে একটি ডাইম্ (দশ সেণ্ট) দিলে তিনি স্বীয় অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া, অপর ক্ষৌরার্থীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এতদ্দর্শনে তাঁহার বন্ধুবর্গ তদীয় অবস্থার কুশলসম্বন্ধে কিছু সন্দিহান হইলেন। তাহারা তাঁহার অবস্থান্তরের কথা শুনে নাই, কিন্তু যখন বুঝিল যে জন্ পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিতেছে না, তখন তাহারা তাঁহার অবস্থার বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিল। অনেকে ভাবিতে লাগিল যে, জন্ এরূপ করিয়া কয়দিন চালাইতে পারিবে? এরূপ কর্ম্ম ভদ্রসন্তানের উপযোগী নহে। হয়তো দিন কয়েকের মধ্যে বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে হইবে। ইহার পর দুই ঘণ্টা ধরিয়া এরূপ সুন্দরভাবে জন্ স্বীথের কার্য্য চলিতে লাগিল যে, তিনি তত দূর আশা করেন নাই। নূতন নূতন বন্ধুর দল আসিতে লাগিল। দুষ্ট চীনের বাদামের ক্রেতা এত অধিক হইল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। কাগজ, কলম প্রভৃতির বিক্রয়ও অত্যধিক হইয়াছিল, কারণ সেই দিবস বিদ্যালয়ের কোন বিভাগে ছাত্রগণের পরীক্ষা হইতেছিল।

পাঁচটার পর জন্ স্বীয় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আর কোনও ক্রেতা ভিতরে আসিতে পারিল না। ইতিমধ্যে তিনি কিছুক্ষণের জন্য আপনার পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লইলেন, এবং দ্রব্যাদি কত বিক্রয় হইল তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সাতটার সময় পুনরায় দ্বার খুলিয়া দিলেন। সেই সময় বোধ হইল যে, বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্র তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই কিছু না কিছু আবশ্যক। চীনের বাদামের ছাল্লিতে গৃহতল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জন্ তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইলেন, কারণ তাহা বহু-বিক্রয়ের দ্যোতক।

রাত্রি দশটা বাজিলে, তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন ও তৎপরে সমস্ত দিবস ধরিয়া কত বিক্রয় করিয়াছেন তাহা গণনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি নিজেই চমৎকৃত হইলেন। তিনি সাত জন সহাধ্যায়ীকে ক্ষৌর করিয়াছেন, প্রত্যেককে দশ সেণ্টের হিসাবে; পনর যোড়া চর্ম্মপাদুকার চিক্কণতা সম্পাদন করিয়াছেন, প্রত্যেক যোড়াটি পাঁচ সেণ্টের হিসাবে; ছয় ডলার মূল্যের কাগজ, পেন্‌সিল ও কালি বিক্রয় করিয়া, তিনি তাহাতে ১ ডলার, ২০ সেণ্ট লাভ করিয়াছেন এবং চীনের বাদাম বিক্রয় করিয়া দুই ডলার লাভ করিয়াছেন। ব্যয় বাদে তাঁহার আয় সর্ব্বশুদ্ধ সার্দ্ধ চারি ডলার হইয়াছে। অধিকন্তু তিন চারি জন ছাত্র পুরাতন টুপি রঞ্জিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অলসপ্রকৃতির পণ্ডিত বিচারার্থ কতকগুলি প্রশ্নের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত কোন বাদসভার সভাপতি; তিনি সাতিশয় অলসতাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া, যখন শুনিলেন যে, জন্ স্মীথ্ বিচারার্থ প্রশ্নতালিকা

(বৈশাখ, ১৩৮৯, পৃঃ ১৮৭)

যোগাইবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তখন মূল্য দ্বারা যদি তাহা অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহা হইলে তিনি কেন তজ্জন্য বৃথা আয়াস স্বীকার করিবেন। পরদিন অপরাহ্ণে বিদ্যালয়ের যাবতীয় লোক এই উদ্যমশীল যুবকের সম্বন্ধে পরস্পরে কথোপকথন করিতে লাগিল। সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইতে না হইতে, তিনি এত ক্রেতা পাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার আর অবসর রহিল না। সুরঞ্জিত করিবার জন্য কত টুপি, বোতাম সীবনের জন্য কত জামা যে আসিতে লাগিল, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার কার্য্যে একটু আধটু ত্রুটি থাকিলেও ছাত্রেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না। সমস্ত দিন ধরিয়া চীনের বাদাম ভৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং চর্ম্মপাদুকার চিক্কণতা সম্পাদনে তিনি সাতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিলেন। ক্ষৌরকর্ম্ম অপেক্ষা তাহাতে তাঁহার অধিক লাভ হইতে লাগিল।

জুনমাস উপস্থিত। সভাপতি বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বিদ্যালয়ের বহির্দ্দেশে একটি বৃহৎ তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে, নানাবিধ উপদেশ সম্বলিত এক মনোহর বক্তৃতা করিলেন; জন্ স্মীথ্ও তাহাদের মধ্যে একজন। সুধীবর সভাপতি মহাশয় এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, "যে সদুপায় ও মহদুদ্যম অবলম্বন করিয়া তোমাদের মধ্যে একজন গত এক বৎসর ধরিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া আমি প্রীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছি। তোমাদের সহাধ্যায়ী—যে রূপে আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে সমর্থ করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি অন্য কেহই সেরূপ করেন নাই। যে মনুষ্যত্ব সৎপথে থাকিয়া কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমকে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর ও হেয় বলিয়া মনে করে না, সেই মনুষ্যত্বের জন্য আমি তোমাদের সহাধ্যায়ীকে সবিশেষ মান্য করি ও তোমাদেরও তদ্বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং আমেরিকার মনুষ্যত্বের আদর্শস্বরূপ জন্ স্মীথ্‌কে বারম্বার ধন্যবাদ দিবার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করি। উনি বাস্তবিকই আমাদের অনুকরণীয় হইয়াছেন।" সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে, সকলে উচ্চৈঃস্বরে জন্ স্মীথ্‌কে ধন্যবাদ দিয়া উঠিল ও বলিতে লাগিল "জন্ স্মীথ্, তুমি আমাদের কিছু বল, বল।"

ইহাতে জন্ স্মীথ্ স্বীয় অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের প্রীতি সম্ভাষণে বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া পড়িলেন, পরিশেষে দণ্ডায়মান হইয়া এই কয়েকটি কথা কহিলেন—

"বন্ধুগণ, আমি তোমাদের তাদৃশ প্রশংসাভাজন হইবার উপযুক্ত নই। আমি স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অভিমানী। অথচ আমার অন্য কোনও উচ্চকর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, সুতরাং আমাকে ক্ষৌরকর্ম্ম ও বিচারকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য একপ্রকার আপণ খুলিতে হইয়াছিল এবং তোমরা সকলে যাইয়া আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছ। সভাপতি মহাশয় অদ্য আমার প্রতি অত্যধিক দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে সমুচিত উত্তর দিবার আমার শক্তি নাই। বিশেষতঃ বক্তৃতা করণ বিষয়ে আমি সাতিশয় অপটু। তোমরা সকলে আমার গৃহে আইস, আমি ভৃষ্ট চীনের বাদাম দিয়া যথাসাধ্য তোমাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব।"

এই কয়েকটি কথা বলিয়া জন্ স্মীথ্ সহসা উপবিষ্ট হইলেন। এবং সকলে একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

(৮০তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৮৮)

এ আখ্যায়িকাটি মিথ্যা নহে, একটি সত্য ঘটনা। তবে যুবকের বর্ত্তমান নাম যদি জন্ স্মীথ্ না হয়, তাহাতে তাঁহার কিছু অপরাধ নাই।

("দি এ্যাড্ভান্স"—The Advance—নামক
কোন এক মার্কিন কাগজ হইতে অনুবাদিত।)

প্রশ্নোত্তর।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

সুনীল আকাশতলে শোভে চন্দ্রগ্রহতারা।
নীরব নির্ম্মল শান্ত জ্যোতিতে অনন্তভরা॥
যেদিকে ফিরিয়া চাই,
আদি অন্ত নাহি পাই,
কীটাণুর মত বিশ্ব অনন্তে বিলীয়মান্।
এবিশ্ব রহস্য ভেদে তবু জীব আগুয়ান্॥

এ ধৃষ্টতা জগজ্জন যখন বুঝিতে পায়।
অজ্ঞতার অন্ধকারে মর্ম্মে সে মরিয়া যায়॥
আমি কে এ প্রশ্ন তার,
সে সময় বারম্বার,
উঠে হৃদে, কেঁদে কেঁদে মর্ম্মে সে মরিয়া যায়।
তীব্র-তৃষা-শুষ্ক-কণ্ঠ, কি যেন কি প্রাণ চায়॥

সে তৃষার সম্পূরণে অসীম জলধিজল,
গণ্ডুষ বলিয়া জ্ঞান, তুচ্ছ উচ্চ হিমাচল॥
লোকলজ্জা ঘৃণা ভয়,
নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়,
ভাবমত্ত একচিত্ত—অন্য নাহি থাকে জ্ঞান।
তবে সে এ প্রশ্ন জীব ক'রে থাকে সমাধান॥

স্থির চিত্ত তবে তার হেন উপলব্ধি হয়,
আমি সে অনন্তরূপ অখণ্ড আনন্দময়॥
কূটস্থ জগতাধার,
মায়াতীত নির্ব্বিকার,
চন্দ্র সূর্য্য তারা যথা স্তিমিত কিরণরাশি।
আমি সেই, তুমি সেই, "সোঽহমস্মি" "তত্ত্বমসি"

(বৈশাখ, ১৩০৯, পৃঃ ১৮৯)

রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস্ নগরে বর্ত্তমান প্রদর্শনীর ধর্ম্মবিভাগে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় আগমন করিবেন। এ সংবাদে হিন্দুর মনে কত আশা সঞ্চার হয়। শুনিলাম, নাকি তিনি ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিবেন।

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

১লা চৈত্রের উদ্বোধনে, কয়েক স্থানের রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। পরে সংবাদ আসিল, ঢাকা এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রামনাদ, এই দুই জায়গায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হইয়াছিল। ঢাকাবাসী ভক্তগণ ঠাকুরের জন্মদিনে অতিথি-ভোজন দরিদ্র ও নিঃসহায়দিগকে যথাসাধ্য ভিক্ষাদান এবং সমস্ত দিন ভগবচ্চর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রামনাদের রাজা ঐ দিবস সহস্র সহস্র দরিদ্র ভোজন করান। উপনিষদের মহদাদর্শে সাধিত এই মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ মহাপুরুষের জীবন যতই জনসাধারণের প্রাণের অন্তর্ভূত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল।

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বজ্ বজ্ নিবাসী, উদ্বোধনের অনেক গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল ঘোষ, রামকৃষ্ণ মিশনের রাজপুতানা দুর্ভিক্ষমোচনালয়ে সাহায্যার্থ পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন।

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ২য় অধ্যায়ের ১০ শ্লোকের ভাষ্যের শেষাংশ ও বঙ্গানুবাদ, ১১ ও ১২ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ৩য় অধ্যায়ের ভাষ্য-এ প্রথমাংশ অনুবাদসহ—বর্ত্তমান সম্পাদক]

(৮৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৮০)

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১৫ই বৈশাখ। (১৩০৭ সাল) [৮ম সংখ্যা।]

ঈশ্বর কি কেবল দয়াময়?

—না; তিনি দয়াময়ও বটে, আবার নিষ্ঠুরও বটে। যেমন পুষ্পাদপি কোমল, তেমনিই আবার তিনি বজ্রাদপি কঠিন। তাঁহার লীলা বুঝা ভার। তাই বুঝি, সাধক কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন,—"কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী"। কখন তিনি অতি স্নেহময়ী জননী, আবার কখনও বা—অতি ভয়ঙ্করা কালকামিনী। তাঁহার রূপ অনন্ত; গুণও অনন্ত! কা'কে যে কখন কি ভাবে চালান, কি ভাবে কৃপা করেন, তা তিনিই জানেন; মনুষ্যের—মনুষ্যের কেন—দেবতাদিগেরও বুদ্ধির অগম্য। কখনও বা জগজ্জননী, মাতৃ-বেশে সন্তানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিনা প্রার্থনায় অদ্ভুত ও অলৌকিক স্নেহভরে কতই বিচরণ করেন, অতুলনীয় ভাবে কতই যত্ন করেন; সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া কতই পরমানন্দ প্রদান করেন। অপরদিকে আবার দেখুন—'স্যার জন লরেন্স' জাহাজ ডুবির সময়, ভূমিকম্পে 'চিরাপুঞ্জী'-পতনের সময়, ভাগলপুরে অকস্মাৎ ঘোগা-বন্যার সময়—সেই মায়ের কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! মৃত্যুকালীন কত লোকে নিজ নিজ প্রাণের তরে, কত পুত্র নিজ নিজ একমাত্র স্নেহময়ী জননীর জন্য, কতশত জননী ক্রোড়স্থ নিজ নিজ সন্তানের নিমিত্ত, কত অন্তরের সহিত, কত কাতর প্রাণে জগদম্বাকে ডাকিয়াছিলেন, সে করুণ প্রার্থনা কি তাঁহার নিকট পৌঁছিল না? সে সকল কাতর ক্রন্দনের এক অংশও যে, কঠোর পাষণ্ড মানব-হৃদয়কেও দ্রব করিয়া দেয়, হিংস্র জন্তুরও অন্তরে স্নেহের সঞ্চার করে। কিন্তু, আশ্চর্য্য! এত হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ কি অসীম দয়াময় জগৎপাতার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারিল না?

যদি কেহ বলেন,—"ইহাতে তাঁর অসীম দয়াময়ত্বে দোষ পড়ে না; তাহাদিগের কর্ম্মফলবশতঃ এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল, কর্ম্মফলবশতঃই তাহারা সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।" ইহার উত্তরস্বরূপ, রামপ্রসাদসেন গাইয়াছিলেন, "কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে, তবে কেন মা মা বলে মিছে মরি ডেকে"। যদি আমার কর্ম্মফল তিনি না খণ্ডন করিতে পারিলেন, যদি হৃদয়ের প্রবল অনুতাপ ও কাতর প্রার্থনা শুনিয়াও না অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, তবে আর তাঁর অসীম দয়াময় হইবার আবশ্যক কি? অমন একটু আধটু দয়া ত সামান্য জীবজন্তুরও থাকে।

যদি বলেন, তিনি কাহারও কাহারও প্রতি অসীম দয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন।—তাহা হইলে যেমন উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি—কাহারও কাহারও প্রতি আবার দয়া প্রকাশ নাও করিতে পারেন। তবে, তিনি পক্ষপাতী, তাঁর বিচার নাই।

যদি বলেন,—না; তিনি পক্ষপাতী হইতেই পারেন না। তিনি Stern Justice কঠোর বিচার কর্ত্তা; বিচারে যা হবে, তাই তিনি করেন, অর্থাৎ কেবল কর্ম্মফল দাতা।—কিন্তু, গীতাতে ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন, "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফল-

সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।" অর্থাৎ তিনি কাহারও কর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ব সৃজন করেন না, কর্ম্মফলের সংযোগও কাহারও প্রতি প্রয়োগ করেন না, কাহারও পাপ বা পুণ্যও গ্রহণ করেন না।

যদি বলেন, অন্যের পাপে তাহাদিগকে এইরূপ অভাবনীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল।—ভাল; স্যার জন্ লরেন্সে এত লোকের মধ্যে অনেক পুণ্যবানও ত ছিলেন, তাঁহাদের সম্মিলিত পুণ্যের জোরেও কি কেহই জীবন পাইল না? সকলেই ত জগন্নাথে যাইতেছিলেন, সকলেরই ভিতরে একটু পবিত্র ভাবের উদয় হইয়াছিলই, তা না হইলে আর, কেহ জগন্নাথে যায় না; তাহার উপর আবার, সেই মৃত্যুকালে প্রাণের দায়ে সকলেই যারপরনাই অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন। তাহাতেও এত লোকের সম্মিলিত পুণ্যের জোরে কি একজনেরও প্রাণ বাঁচিল না?

যদি বলেন, ভালই হইল, তাঁহারা জগন্নাথে যাইতেছিলেন, জগন্নাথ তাঁহাদিগকে একেবারেই টানিয়া লইলেন; তাঁহাদিগের ত সদ্‌গতিই হইল।—সদ্‌গতি কোথায় হইল? প্রাণে বাঁচিবার জন্যই ত ঈশ্বরকে এত ডাকিয়াছিল—ঈশ্বরের কাছে যাইবার জন্য নহে। তাহার উপর আবার, দম আটকাইয়া, জল খেয়ে জল খেয়ে মরিয়া গিয়াছিল; ইহা ত অপঘাতমৃত্যু! তাঁহাকে ডাকিয়া অবশেষে অপঘাতমৃত্যু?

যদি বলেন, উহাতে অপঘাতমৃত্যুর দোষ হয় না। অমৃতকুণ্ডতে, সজ্ঞানেই পড়, আর অজ্ঞানেই পড়, স্বেচ্ছায়ই পড়, আর অনিচ্ছায়ই পড়, অমৃতকুণ্ডতে পড়িলেই অমর। মৃত্যুকালীন ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াছিল ত বটে; সে ভগবৎ-স্মরণের ফল যাবে কোথায়?

—বেশকথা! কিন্তু অপরদিকে আবার দেখুন; স্যার জন্ লরেন্স, চিরাপুঞ্জী অথবা ঘোগা-বন্যা প্রভৃতি দুর্ঘটনায় যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এমন অনেক আত্মীয় স্বজন অন্যত্র ছিলেন, যাঁহারা ঐ কারণে একেবারে নিরাশ্রয়, বা অনাথ অনাথা হইয়া গিয়াছেন, অথবা দারুণ শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; এমন আমাদের অনেক জানতঃ আছে।

জগদীশ্বর যে প্রায়ই এইরূপ করেন, তাহার একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, এবং সেই ঘটনাটী সত্য।—

বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার।

কলিকাতা বাগবাজার রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে একটী অতি সৎলোক বাস করিতেন। নাম শ্রীমান শরচ্চন্দ্র সরকার; বয়স বোধ হয় ৩০'এর বেশী হইবে না। বাটীতে—মা, মাসী, দিদিমা, মাসতুতো ভাই ভগ্নী প্রভৃতি অনেকগুলি পরিবার। সকলেরই একমাত্র আশ্রয়—সেই শরৎ। শরৎ বৈ আর এ জগতে তাঁহাদের কেহই নাই। শরৎ যখন এক বৎসরের, তখন তাঁহার মা বিধবা হন। মা, নিজে না খাইয়া না পরিয়া কোনও রকমে অতি কষ্টে শরৎকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। শরৎ-অন্ত—মায়ের প্রাণ। শরতের খাইতে একটু বেলা হইলে বা আফিস হইতে আসিতে একটু সন্ধ্যা হইলে, তাঁহার মা যে, কি পর্য্যন্ত ব্যস্ত হন তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। —শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়—পৃঃ ৪৪, মূল্য ০'২৫

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা—স্বামী দেবানন্দ। ২য় সং, পৃঃ ৭৬, মূল্য ১'২৫

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪'০০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৪শ সং, পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪'০০

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২'৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত :

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ২'২৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত। ১৫শ সং, পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১০'৫০

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। ১৫শ সং, পৃঃ ৫১৯, মূল্য ১২'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ৪র্থ খণ্ড ৩'০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ—(স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ৩'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য (সাধারণ বাঁধাই) ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 APRIL 1982 Regd. No. WB/NC-19

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯
৮৪তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪\ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯\ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৪০\ টাকা, এয়ার মেল-এ ১১০\ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে, তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ— ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবতন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহেব মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। ররিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ— উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

কয়েকখানি নিত্যসঙ্গী বই ঃ

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৯৫ ০০ টাকা, প্রতি খণ্ড—২০.০০ টাকা, সুলভ সংস্করণ সেট ১৫৫ ০০ টাকা, প্রতি খণ্ড ১৬.০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম খণ্ড): ১ম ভাগ ২৮.০০ টাকা, ২য় ভাগ ২২.৫০ টাকা। সাধারণ: ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা, ২য় খণ্ড ৭.৮০ টাকা, ৩য় খণ্ড .২৫ টাকা, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫০ টাকা, ৫ম খণ্ড ১১ ৫০ টাকা।

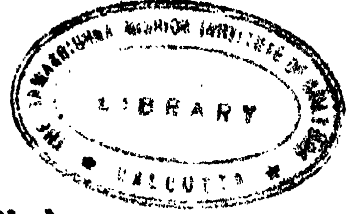
শ্রীশ্রীমায়ের কথা—প্রথম ভাগ ৭.৫০ টাকা; ২য় ভাগ ১২ ০০ টাকা।

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী— স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
১ম ভাগ ১৫.০০ টাকা; ২য় ভাগ ১১.০০ টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১ ০০ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত। ১০.৫০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত।
১২.৫০ টাকা।

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩



উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী : ধর্ম ও দর্শন	...	... ১৯৩
২।	কথাপ্রসঙ্গে : ধর্ম, দর্শন ও জীবন	...	... ১৯৪
৩।	বায় (কবিতা)	... 'বৈভব'	... ১৯৬
৪।	সাধকের চিন্তাধারা	... স্বামী দেবানন্দ	... ১৯৭
৫।	স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র	...	... ১৯৯
৬।	পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন	... স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	... ২০১
৭।	হে ভারত ভুলিও না (কবিতা)	... শ্রীসুশীলকুমার সিংহ	... ২০৭
৮।	দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়	... ডক্টর রমা চৌধুরী	... ২০৮
৯।	নব ভগীরথ (কবিতা)	... শ্রীনীলদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	২১২
১০।	শ্রীশ্রীমায়ের বাণী : সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে	... অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত	... ২১৩

১১।	ভ্রম-সংশোধন	...		... ২১৮
১২।	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা	...	স্বামী বুধানন্দ	... ২১৯
১৩।	রাতের পৃথিবী (কবিতা)	...	শ্রীমোক্ষদারঞ্জন সেনগুপ্ত	... ২২৪
১৪।	সমালোচনা	...	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	২২৫
		...	অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	... ২২৬
		...	স্বামী বিমলাত্মানন্দ	... ২২৬
		...	ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য	... ২২৭
১৫।	রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ	...		... ২২৯
১৬।	বিবিধ সংবাদ	...		... ২৩১
১৭।	উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা	...	পুনর্মুদ্রণ (বৈশাখ, ১৩০৭ ; পৃঃ ১৩৭-৪৪)	... ২৩৩



৮৪তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

ধর্ম ও দর্শন

আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক—বিশেষতঃ বর্তমানকালে—ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই ; যদি ধর্ম লাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। ধর্ম কিন্তু কথোপকথনের ব্যাপার নয়—প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আর যাহা বুঝিব, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই কথা বলো না কেন, তাহা দ্বারা ধর্ম লাভ হইবে না।

* * *

আমাদের সাধারণজ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে—তাকে 'অজ্ঞানভূমি' বা 'অবচেতন মন' বলা যেতে পারে ; আমরা যাকে 'সমগ্র মানুষ' বলি, জ্ঞান তার একটা অংশমাত্র। দর্শনশাস্ত্র মন সম্বন্ধে কতকগুলি আন্দাজমাত্র। ধর্ম কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রত্যক্ষদর্শন, যা জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি—তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে যায়, তখন সে যথার্থ বস্তু—যথার্থ বিষয়কেই উপলব্ধি করে। 'আপ্ত' তাঁদেরই বলে, যাঁরা ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ এই যে, তুমিও যদি তাঁদের প্রণালী অনুসরণ কর, তুমিও প্রত্যক্ষ করবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন।

* * *

প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ করা। যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইখানেই ধর্মের আরম্ভ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৮৭-৮৮ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৭,৩১২]

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম, দর্শন ও জীবন

শুধু আজ নয়, চিরদিনই 'ধর্ম' একটি বহু-বিতর্কিত শব্দ; বহু ঋষি-মনীষী ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন, আজও দিতেছেন; এবং ইহা-দ্বারাই প্রমাণিত হয় ধর্মের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। সংজ্ঞাগুলি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিলেই বুঝা যাইবে—মানুষের ব্যাপক মানসিকতা; কখনও স্বাধীন চিন্তা, কখন বা দুর্দান্ত সাহসিকতা, আবার কখনও নিতান্ত নিয়মনিষ্ঠা বা চিরাচরিত চিন্তাশূন্য গতানুগতিকতা। সত্যই, ধর্মের সন্ধানে বাহির হইয়া বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত হইতে হয়। তাই বলিয়া ধর্মের সন্ধানে মানুষের যাত্রা বন্ধ হয় নাই; উহা "চলিছে, চলিবে"।

কেহ বলিয়াছেন, ধর্ম জীবন-বিজ্ঞান—জীবনের উদ্দেশ্য-নিরূপক, জীবনযাত্রার 'পথ' অথবা জীবন-দর্শন! আবার কেহ বলিয়াছেন, ধর্ম দুষ্ট পুরোহিতদের জীবিকার্জনের একটা ফন্দী, ধর্ম রাজশক্তির আবিষ্কৃত একটি নেশাদ্রব্য, যাহা দ্বারা সাধারণ মানুষের মন নিষ্ক্রিয় নিশ্চিন্ত করিয়া রাখা যায় এবং সহজেই তাহাদের চালানো যায় মেষপালের মতো। ধর্মের আরো বহুতর সংজ্ঞা আছে, আরো নূতন সংজ্ঞা ছাপাখানার টাঁকশালে মুদ্রিত হইয়া সমাজে চালু হইতেছে। এ-সবের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ স্থাণু নয়—মানুষ 'চরৈবেতি' মন্ত্রের সাধক—সচল প্রাণী; শুধু দেখিতে হইবে, কোথা হইতে কোথায় চলিয়াছে! 'অ্যামিবা' ক্রমবিকশিত হইয়া অন্যান্য জীবজন্তুর মতো জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের নিয়মানুসারে এক উন্নততর জীব মানুষে পরিণত হইয়াছে; এই মানুষ সংঘবদ্ধ সমাজ রচনা করিয়া, বাস করিতে গিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত হইতেছে। এখন সময় আসিয়াছে—সেই অর্ধবিকশিত মানবকে পূর্ণ বিকশিত হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়: পশু-মানবকে বুদ্ধ-মানবে রূপায়িত হইতে হইবে। তাহার প্রথম সোপান 'ধর্ম'—হয়তো ইহাকে 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' বলিলে কেহ আপত্তি করিবেন না; বরং তাহাই সমীচীন।

কিন্তু এই যে যাত্রা—সুদীর্ঘ যাত্রা। কে পথের নির্দেশ দিবে? মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে ঠিকই, কিন্তু কতবার যে ভুল পথে চলিয়াছে—কে তাহার হিসাব দিবে? মানুষ কতবার সভ্যতা রচনা করিয়াছে, ভাঙিয়াছে আবার গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। তবু শ্রেষ্ঠ মনীষীরা খেদ করিয়া বলিয়াছেন: সভ্যতা এখনও আরম্ভই হয় নাই।

অতীত সভ্যতার প্রতি স্তরেই দেখা যায়, কোন না কোন প্রকার ধর্মভাব বা ধর্মবিশ্বাস লুক্কায়িত রহিয়াছে ভিত্তিস্তরে। সেই ভিত্তির উপর রচিত সৌধ কখনও আপনি ভাঙিয়া গিয়াছে কালের আঘাতে, কখনও বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে, কখনও বা দুর্ধর্ষ শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে; মানুষই মানুষের সভ্যতার পরম শত্রু, এবং সেই সঙ্গে বলিতে হইবে, মানুষই মানুষের ধর্মেরও শত্রু। ধর্মবিহীন সভ্যতা আজও গড়িয়া উঠে নাই, কখনও গড়িয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ, কারণ যে নিয়মনীতি আদর্শ লইয়া একদল মানুষ নূতন সমাজ সভ্যতা রচনা করিবে, আর একদল চিন্তাশীল মানুষ পরবর্তী কালে সেই নিয়মনীতিগুলিকেই 'ধর্ম' বলিবেন।

এখন প্রশ্ন—কেন এই ভাঙাগড়া এবং ইহা রোধ করিবার কোন উপায় আছে কিনা। তার পূর্বে আরও একটু দেখা যাক—ধর্ম কতটা মানুষের, আর কতটা ঈশ্বরের সৃষ্টি! যতটুকু পড়া যায়, শোনা যায়, বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয়—ধর্মের সার

ভাগ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তারপর যতকিছু অসার আচার আড়ম্বর মানুষের সৃষ্টি! ঈশ্বর যদি 'এক' হন—[বহু ঈশ্বর অযৌক্তিক] নিশ্চয় তিনি বহুর মধ্যেও একের পথই দেখাইবেন, এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে তাঁহার কাছেই লইয়া যাইবেন, মানবজীবনের এই ঈশ্বরাভিমুখী পথেরই নাম 'ধর্ম'! কিন্তু মানুষের মনের বিচিত্র চিন্তা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা—অহংকেন্দ্রিক স্বার্থচেষ্টা তাহাকে বহু-বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিভেদের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে, সে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে—কখনও অন্ধকারে, কখনও জঙ্গলে, কখনও মরুভূমিতে।

এখন উপায় কি! গত দুই শতাব্দীর বিজ্ঞান-আলোচনা, বিজ্ঞানের শিক্ষা ধর্ম-সম্বন্ধে অনেক অনাবশ্যক বিশ্বাস ধূলিসাৎ করিয়াছে, আরও করিবে! এগুলির অধিকাংশই আমাদের দেশী ও বিদেশী পুরাণের উপাদান। 'পুরাণ' মানেই যে অর্থহীন কল্পনা, এরূপ মনে করাও ঠিক হইবে না, এক যুগের মনীষীরা ইহারই সাহায্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন সে যুগের মানুষের মনে একটা সদ্‌ভাব উদ্‌বুদ্ধ করিয়া জাগ্রত রাখিবার; সেদিক দিয়া তাঁহারা কতকটা সফল যে হন নাই, তাহা নয়। যুক্তিবাদী বুদ্ধকেও দেখা যায়, জাতকের মাধ্যমে 'সদ্‌ধর্ম' প্রচার করিতেছেন। খ্রীষ্টও গল্পের মাধ্যমেই তাঁহার বক্তব্য জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক মনীষীরাও কি গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁহাদের ভাবাদর্শ প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন না?

তবে বলা যায়—এই যথেষ্ট নয়; অধিকাংশ মানুষের পক্ষে হয়তো এই পুরাণই যথেষ্ট, কিন্তু সংখ্যালঘু হইলেও একদল চিন্তাশীল মানুষ থাকিবেন—যাঁহারা চাহিবেন ধর্মের একটি দার্শনিক ভিত্তি, তাঁহাদের ভাব: আগে বিশ্বাস নয়—আগে যুক্তি, আগে বিচার। ভগবান্ মানুষকে শুধু যে হৃদয়, ভাব বা ভক্তি দিয়াছেন, তা নয়; তিনিই তো মানুষকে মস্তিষ্ক, বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়াছেন, সেগুলিরও ব্যবহার প্রয়োজন, এবং এইভাবেই রচিত হইবে এক নূতন 'ধর্ম', যেখানে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয় অথবা যুক্তির সহিত ভক্তি সমতালে পা ফেলিয়া চলিবে! এ ধর্ম যে একেবারে নূতন, তাও নয়, কালক্রমে এ ধর্ম নষ্ট হইয়া যায়; আবার ইহা পুনরুদ্ধৃত হয় বা পুনরাবির্ভূত হয়।

এইরূপই এক নূতন ধর্মের কথা—নবীভূত পুরাতন, চিরন্তন বা 'সনাতন' ধর্মের বার্তা বহন করিয়া আসিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যেখানে আমরা পাই পৃথিবীর সকল ধর্মের একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি, পাই ধর্মমাত্রেরই একটি দার্শনিক যুক্তি, সর্বোপরি পাই ধর্ম ও দর্শনের সহায়ে ও সমন্বয়ে গঠিত, বিশ্বাস ও বিচারের সমতালে চালিত একটি নবতম সভ্যতার ইঙ্গিত—যেখানে মানুষের জীবন—ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজজীবন খুঁজিয়া পায় তার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ। মানুষ খুঁজিয়া পায় তার জীবনের উদ্দেশ্য, সমাজ খুঁজিয়া পায় এক নূতন সার্থকতা

আমি আশা করি, আপনারা সর্বদাই এইটি মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম হয় না, তর্কবিচার করিতে পারিলেই ধর্ম হয় না, অথবা কতকগুলি মতবাদে সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান—এগুলি সবই ধর্মলাভের সহায় মাত্র, ধর্ম কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

যায়

'বৈশুব'

যায়—
সন্ধ্যাবেলায়
তারা চলে যায়
    আপন কুলায়।
যাবার বেলায়
সে কি মৌন হেলায়
    তারা ফিরে না তাকায়
তারা ক্লান্ত খেলায়,
    চলে যায়।
তারা শ্রান্ত ডানায়
ওই শান্ত হাওয়ায়
    ভেসে যায়
    ফেলে যায়
কোন্ উদাস মায়ায়
তারা সারা আকাশে ছড়ায়
    লঘু মেঘের ছায়ায়।
তারা চলে যায়—
    ঘন নীলিমায়
তারা হেলায় মাখায়
    ঘন কালিমায়।

তারা ভুলে যায়,
নিভে যায়, ভেসে যায়—
তারা ভুলে যায়।
গান ভুলে যায়—
দিনে গাওয়া গান তারা রাতে ভুলে যায়।
আঁধার নিশায়
সব আশা যে মিশায়
তাই, তারা ফিরে যায়
    আপন কুলায়।
তারা ফিরে নাহি চায়,
তারা তীরে নাহি ধায়,
অকূলে আপনহারা তারা ভেসে যায়—
পিছনের সব মায়া তারা ভুলে যায়;
শুধু, আঁধার আকাশে তারা তারারে ফুটায়;
সারা মনখানি টানি আকাশে লুটায়।
    তারা চলে যায়
    তারা ভুলে যায়—
যায়, তারা চলে যায়—
যুগ যুগ ধরে তারা
    এসে চলে যায়।

সাধকের চিন্তাধারা

স্বামী দেবানন্দ

মুক্তির পথ

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'যাকে ভূতে পায়, সে যদি জানতে পারে যে তাকে ভূতে পেয়েছে, তাহলে ভূত পালিয়ে যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব যদি একবার ঠিক জানতে পারে যে তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে, তাহলে মায়া তার নিকট থেকে তখনই পালায়।' আমরা নিজের সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ভুলে মায়ামোহাচ্ছন্ন হ'য়ে, কত জন্ম ধরে কত কষ্টই না ভোগ করি! অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার অন্তরে রয়েছে, তা একটুও চিন্তা করি না। প্রকৃত 'মান-হুঁশ' হ'তে পারছি না বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু উপাধি লাভ করেও। এত বিদ্যা-বুদ্ধি লাভ করেও নিজস্বরূপ অবগত নই। অমৃতের সন্তান আমরা, কিন্তু নিত্যানিত্যবস্তু-বিচারের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে আত্মবিস্মৃত। ভুলে গিয়েছি নিজের আসল স্বরূপ—অজর-অমর-নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, তাই আমাদের এত দুঃখকষ্ট। নিজেদের মিথ্যা দুঃখী-তাপী, জাত-মৃত ভেবে বৃথাই রোদন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: 'মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত।' গীতায় শ্রীভগবান্ বলছেন: 'মানুষ বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা নিজেই নিজেকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে; নিজেকে বিষয়াসক্ত করবে না। কারণ শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী (মুক্তির কারণ), এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু (বন্ধনের কারণ)।' (৬।৫)। মৈত্রায়ণী উপনিষদেও একই কথা আছে: 'মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয়।' এই বিষয়াসক্ত মনের জন্যই আমরা সংসার-সাগরে জন্মজন্মান্তর ধরে হাবু-ডুবু খাই। এই সংসার-সাগর পার হ'তে সদ্গুরুর প্রয়োজন। তাঁর কৃপালাভ না করা পর্যন্ত এ মায়ামোহময় সংসার থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। একমাত্র তিনিই পারেন আমাদের আসল স্বরূপকে চিনিয়ে দিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পে আছে: ছাগলের পালের মধ্যে একটা ব্যাঘ্র-শাবককে ঘাস খেতে দেখে বড় একটা বাঘ বিস্মিত হ'য়ে, তাকে টেনে ধরে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে ব'লল: 'তোর ও আমার মুখ এই জলের ভিতর চেয়ে দেখ্—আমরা উভয়েই বাঘ; তুই ছাগলের পালে মিশে ঘাস খেয়ে মিছে ভয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ কচ্ছিস্, শতধিক তোকে! তোর খাদ্য ঘাস নয়, এই মাংস খা আনন্দে—এটাই হ'ল তোর খাদ্য। তুই ছাগল নস্, আমাকে দেখে ওদের মতো মিছে ভয়ে কেন পালাবি, নিজে বাঘ হ'য়ে?' রক্ত-মাংসের আস্বাদ পেয়ে ব্যাঘ্র-শাবকটি গর্জে উঠে ঐ বাঘের সঙ্গে গভীর জঙ্গলে চলে গেল ছাগলের পাল ছেড়ে। এইরূপ জ্ঞানদাতা সদ্গুরুর কৃপায় অজ্ঞান হ'তে মুক্ত হ'য়ে, আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে সংসার-সাগরের দুঃখ-স্রোত রুদ্ধ করতে হবে।

গুরুকৃপা যেমন দরকার, তেমনি চাই সাধকের পুরুষকার—তীব্র ইচ্ছা ও অধ্যবসায়। এই মোহময় সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য চাই। কারণ ত্যাগ ব্যতীত শাশ্বতী শান্তি পাওয়া যায় না। উপনিষদ্ বলছেন: 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—উত্তমরূপে ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন কর।

সুখ, তৃষ্ণা ও আসক্তিই জন্মজন্মান্তরের স্রোত এবং দুঃখকষ্টের মূল কারণ জেনে, অনাসক্তভাবে সংসারের কর্তব্য-কর্মসমূহ সম্পাদন ক'রে যেতে হবে। 'অহং মম' বা 'আমি আমার' ভাব

ত্যাগ ক'রে, এ-সংসার-উদ্যানে বাগানের মালীর মতোই কাজ ক'রে যেতে হবে। ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হ'লে কর্ম আপনা থেকে ত্যাগ হ'য়ে যায়, জোর ক'রে ত্যাগ করতে হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন: 'ভক্তিলাভ করলে বিষয়-কর্ম আপনি আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?'

সংসারে থেকে সাধন-ভজন ক'রে ঈশ্বর লাভ করা যায়, ঈশ্বর লাভ হ'লে মানুষ মুক্ত হ'য়ে যায়। তবে এই মন যদি সংসারে আসক্ত হ'য়ে পড়ে—বন্ধন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন: 'জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার ভেতর যেন জল না ঢোকে; তা হ'লে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের মনের ভেতর যেন সংসারভাব না থাকে।'

শান্তির পথ

আমাদের বৈদিক ঋষিগণ সমস্বরে ব'লে গেছেন: পাঞ্চভৌতিক এ-দেহ তুমি নও; তুমি দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত সেই সূক্ষ্ম আত্মা। সেই আত্মারই শক্তিতে জ্ঞান-বুদ্ধি-দেহ-মন —সবকিছুই পরিচালিত হচ্ছে। তোমার স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দময়, আত্মাকে না জানায় অনন্ত অশান্তি ভোগ ক'রছ জন্ম জন্ম ধরে। মায়া-মোহে আচ্ছন্ন থাকায় সেই অফুরন্ত অনন্ত সুখের সন্ধান পাচ্ছ না। বাইরে শান্তি ও তৃপ্তি যতই খোঁজ না কেন, পরিবর্তনশীল এই প্রকৃতি-রাজ্যে কোন দিনই সেই চিরশান্তি পাবে না—শান্তি আমাদের অন্তরেই বিরাজিত। আন্তররাজ্যে বা আত্মাতেই শান্তি—এ অমৃতময়ী আশার বাণী আমাদের বৈদিক ঋষিরা বারবার ব'লে গেছেন। নশ্বরদেহে প্রবিষ্ট এবং সংসারে আসক্ত আত্মাই বদ্ধজীব। মোহনিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে কত কষ্টই না ভোগ করতে হচ্ছে নিজ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে। এই পরিবর্তনশীল মানবজীবনে তাঁকে ভুলে শত চেষ্টাতেও চিরশান্তির আশা করা বৃথা। বিয়োগ-বিচ্ছেদ, জন্ম-মৃত্যু এখানে অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি-রাজ্যের অনিত্যতা রূপ অলঙ্ঘ্য নিয়মে আয়ু-বল-বীর্য-সৌন্দর্য কোন কিছুই ধরে রাখা যাবে না। জরা-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ জীবনের লীলা-খেলা সবই ফুরিয়ে যায় দুদিন যেতে না যেতেই। যাদের মোহে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হ'য়ে চিরশান্তির পথ বিস্মৃত হচ্ছি, তারা যে অনিত্য ও নশ্বর তা একটুও আমরা ভেবে দেখি না। দুর্বোধ্য অদৃষ্টহেতু কত না জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে জন্মজন্মান্তর ধরে। অবিদ্যার পরপারে না যাওয়া পর্যন্ত এ দুঃখকষ্ট নিবৃত্তির কোন উপায় নেই লক্ষ চেষ্টা সত্বেও। তাঁরাই ধন্য, যাঁরা সংসারের ক্ষুদ্র সুখের আশা ও নশ্বর ভোগলালসায় মুগ্ধ না হ'য়ে, সেই চিরশান্তিময় শ্রেষ্ঠ-সত্য লাভের জন্য সংসারের প্রেয় পদার্থকে ত্যাগ ক'রে কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন। গীতা-ভাগবতের বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাতে: 'গুটিপোকা যেমন আপনারই নালে ঘর ক'রে আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্মে আপনি বদ্ধ হয়। যখন প্রজাপতি হয়, তখন কিন্তু ঘর কেটে বের হয়। তেমনি বিবেক-বৈরাগ্য হ'লে বদ্ধ জীবও মুক্ত হ'য়ে যায়।' মানুষ অজ্ঞানবশতঃ দেহাভিমানশূন্য সেই আত্মাকে ভুলে মোহান্ধকারে ডুবে থাকায় সে আর নিজের দুরবস্থা হ'তে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা একটুও করে না। নানাস্থানে ঘুরে শত চেষ্টাতেও সে সেই অনন্ত সুখের সন্ধান পায় না। বোঝে না, সে যা চায় তা তার নিজ অন্তঃপুরেই আছে। সেই অন্তর্নিহিত অমৃতই তার স্বরূপ। স্বীয় আন্তররাজ্যের সুখ-শান্তির কথা ভুলে বৃথা অসার সংসারের তুচ্ছ ক্ষণিক সুখে আবদ্ধ হ'য়ে

অনন্ত দুঃখকষ্টই বরণ করছে! আন্তররাজ্যে বা আত্মাতেই যে শান্তি—এ-কথা স্বপ্নেও ভাবে না। একবারও ভাবে না এ অপূর্ণতার রাজ্যে নশ্বর সংসারে অভাব, অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার অবসান কোনকালেই হবে না। স্বীয় আনন্দময় স্বরূপে স্থিত না হওয়া পর্যন্ত সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির কোন আশাই নেই।

ঠাকুরের সেই গল্পটির কথা মনে হয়—'এক ব্যক্তির তামাকের নেশা এত বেশী যে, সে অধিক রাতে একটা লণ্ঠন জেলে হাতে নিয়ে বের হ'ল এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে তাদের দরজায় বারবার ধাকা দিচ্ছে। ঐ শব্দে প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙে যায়। দরজা খুলে ওকে দেখেই বললে—'কি গো, এত রাতে কি মনে ক'রে?' উত্তরে সে বললে—'ভাই জান তো আমার তামাকের নেশা খুব বেশী, টিকে ধরাবার জন্যে একটু আগুনের খোঁজে ছুটে এসেছি তোমাদের বাড়ীতে এত রাতে।' প্রতিবেশী তখন বললে, 'বেশ মজার লোক তো তুমি! এত রাতে কষ্ট ক'রে এসে দোর ঠেলাঠেলি ক'রছ! তোমার হাতেই তো আগুন (লণ্ঠন) রয়েছে। নিজের ঘরে বসেই তো ওতে টিকে ধরাতে পারতে রাতে এতদূর না এসে।' তখন তার ভ্রম দূর হ'ল এবং লজ্জা বোধ করলে।

আমরাও নিজ অন্তর্নিহিত অমৃতত্বের কথা ভুলে গিয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করছি শান্তির জন্য। প্রকৃতির রাজ্যে—সংসার-রাজ্যে ঐ শান্তি কোথায়? অন্তরের রাজ্যে বা আত্মাতেই এই শান্তি বিরাজিত। এই শান্তি পেতে হ'লে মন-বুদ্ধির অতীত চিরশান্তিময় আন্তররাজ্যেই প্রবেশ করতে হবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'এই দুর্লভ মানবদেহ ধারণ ক'রে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ করতে না পারে, তার জন্মধারণ করাই বৃথা।'

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীঅন্নদাকান্ত বড়ুয়াকে শিলঙে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Belur Math P.o.
Dt. Howrah
10/1/31

শ্রীমান্ অন্নদাকান্ত,

তোমার পূর্ব্ব পত্রের জবাব দিতেছি। তোমার স্ত্রীকে তোমার সুবিধামত নিয়ে এসো। ঠাকুরের ইচ্ছায় শরীর ভাল থাকলে তাহাকেও ঠাকুরের নাম দিয়ে দিব।

বাবা, তোমরা ঠাকুর মা-ঠাকরুণ এঁদের জীবন আলোচনা করিবে—তিনিই তোমার ইষ্ট সহায় বুদ্ধি সম্বল জানিবে। তাঁর জীবনই মানব-জীবনের আদর্শ, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তাঁর চিন্তা, স্মরণ মনন করিলে তোমাদের মনেও ঐ সকল ভাব আসিবে—তোমরা নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে।

তুমি মনকে বিষয়-বিমুখী করে তাঁর পাদপদ্মে দিতে চাও—বিষয়-দাসত্ব পরিহার করতে চাও—তাই প্রথম প্রথম মন ঐরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। পরে তাঁর কৃপায়—তাঁর স্মরণ-মননে পবিত্র হয়ে ঐ মনই তোমাকে তাঁর সাক্ষাৎকার করিয়ে দিবে। কোন ভয় নাই—নিত্য তাঁর স্মরণ-মনন প্রার্থনাটুকু রাখবে এবং যথাসাধ্য সৎ ও পবিত্রভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করিবে। মন আপনা হইতেই বশীভূত হইয়া আসিবে। তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ Sri Ramakrishna Math
P.o. Belur Math
6|1|31

শ্রীমান্ অন্নদা,

তোমার প্রেরিত টাকা দুইটী পাইয়াছি। তোমার পূর্ব্ব পত্রও পাইয়াছি—উহা মানসিক বিকার কেন হইবে— যখন যেমন তোমার মনে হইবে জানাইও। ঐ পত্রের জবাব শীঘ্রই দিব।

প্রার্থনা করি—তোমার জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি লাভ করুক। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ Sri Ramakrishna Math
P.o. Belur Math
8|3|31

শ্রীমান্ অন্নদা,

তোমার প্রেরিত টাকা দুইটী ও তোমার কুশল সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি আমার শরীর—বাবা, ভাল নয়—ঠাকুর তোমাদের শান্তি দিবেন—কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ Sri Ramakrishna Math
P.o. Belur Math
5|4|31

শ্রীমান্ অন্নদাকুমার,

তোমার প্রেরিত টাকা দুইটী ও ওখানের উৎসবের সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। কেতকী মহারাজও পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দ ভাল আছেন জানিয়া প্রীত হইয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও এবং তুমি জানিবে। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। প্রার্থনা করি- ঠাকুর তোমার প্রেম ভক্তি বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি করে দিন। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ বেলুড় মঠ
২৫|১০|৩১

শ্রীমান্ অন্নদাকান্ত,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও বাসাস্থ সকলকে জানাইবে। মঠের সব মঙ্গল। তবে আমার শরীর তত ভাল নয়। ইতি

সতত
শিবানন্দ

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

খ্রীষ্টধর্মের অনেক নেতৃস্থানীয় লোকের সঙ্গে আমার কথা হ'ল। তাঁরাও বললেন: 'খ্রীষ্টান দুনিয়া আজ প্রাচ্যের দিকে চেয়ে আছে। ওরিয়েণ্টাল রিলিজিয়ন (Oriental Religion), —প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের দিকে তারা চেয়ে আছে।' এটা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে আনন্দের। কিন্তু ওদের দেশের লোকদের হিন্দুধর্মের প্রতি আগ্রহের সুযোগ নিয়ে এমন কিছু কিছু লোক এদেশ থেকে ওদেশে যাচ্ছেন, যাঁরা ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে ওদের মনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নানারকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। তাঁরা ধর্মটাকে ম্যাজিকের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। 'ধর্ম' মানে যেন শুধু অলৌকিক কাণ্ডকারখানা—এ-ছাড়া আর কিছু নয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—একজন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন: 'তুমি বিশ্বাস করো কি, বাবাজী এখনও বেঁচে আছেন?' আমি বললাম: 'বাবাজী? কোন্ বাবাজী?' 'তুমি বাবাজীর নাম শোননি?' বললাম: 'অনেক বাবাজীই তো আছেন—তুমি কার কথা ব'লছ, বুঝতে পারছি না।' তখন তিনি বলছেন: 'আমি যে বাবাজীর কথা বলছি, তাঁর বয়স ১০০০ বছর, এখনও বেঁচে আছেন তিনি।' আমি বললাম: 'না, এ-রকম কোন বাবাজীর কথা আমার জানা নেই।' এই-রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ওদের মুখে শুনতে হয়। এর জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের দেশেরই কিছু কিছু লোক তাদের মাথায় এ-সব উদ্ভট ধারণা ঢুকিয়েছে।

আর একদিন একটি অল্পবয়স্ক ছেলে—পেশায় সে ইঞ্জিনিয়ার, বেশ ভাল স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমান্ বলে মনে হ'ল—সে এসে আমাকে বলছে: 'তুমি অমুকের নাম শুনেছ?' যাঁর নাম সে ক'রল, তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি—সকলেই তাঁর নাম জানেন। আমি বললাম: 'খুব শুনেছি।' ছেলেটি ব'লল: 'তিনি আমার গুরু।' 'তাই নাকি? কি ক'রে তিনি তোমার গুরু হলেন?' 'আমি ভারতবর্ষে ওঁর আশ্রমে অনেকবার গেছি। ওখানে আমি থাকতাম। উনি আমাকে খুব ভালবাসতেন।' এই-সব কথাবার্তা হ'তে হ'তে হঠাৎ বলছে: 'জানো, উনি কৃষ্ণের বাঁশী শুনতে পেতেন!' আমি বললাম: 'তাই নাকি? আমি তো এ-রকম শুনিনি কখনও?' বলছে: 'হ্যাঁ, তিনি কৃষ্ণের বাঁশী শুনতেন।' আমি বললাম: 'খুব ভাল কথা।' এ-ছাড়া আমার আর কিই বা বলার থাকতে পারে! কিছুক্ষণ পরে সে বলছে: 'আমিও শুনি।' এই-রকম উদ্ভট উদ্ভট ধারণা ওদের 'ধর্ম' সম্বন্ধে। আমাদের দেশ থেকে নানা-রকম ধর্মগুরুরা যাচ্ছেন ওদেশে। নানারকম তাঁরা সব প্রচার করেন। ইস্কনেরও দেখলাম বেশ প্রভাব ওখানে। সবাই যে তাঁদের পছন্দ করেন, তা অবশ্য নয়। কেউ তাঁদের পছন্দ করেন, কেউ করেন না। আসলে মানুষ বিভ্রান্ত। হিন্দুধর্মটা আসলে কি—বুঝতে পারে না তারা। এর ফলে হয়েছে কি—একদল লোকের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে খুব অবজ্ঞা। আবার আর একদল লোকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা। যাদের শ্রদ্ধা আছে, তাদের মধ্যে একটা অংশ কিন্তু হিন্দুধর্মকে ঐ ম্যাজিক হিসেবে দেখছে। তাদের কাছে হিন্দুধর্ম মানে একটা অলৌকিক ব্যাপার, এ-ছাড়া আর কিছু নয়। সেই হিসেবে তারা হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করছে। কিন্তু আর একদল মানুষ আছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা আন্তরিক। তাঁরা গীতা, উপনিষদ্

অল্প-বিস্তর পড়েছেন বা 'কথামৃত' ইংরেজীতে বা জার্মান ভাষায় পড়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব আনন্দ পেয়েছি।

১লা নভেম্বর আমি বার্লিন থেকে চলে গেলাম ইংলণ্ড এবং সেখান থেকে ফ্রান্সে। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের কথা পরে ব'লব। ফ্রান্স থেকে পরের বারের জন্য পশ্চিম জার্মানিতে ফিরে এলাম ১০ই নভেম্বর। কারণ, পশ্চিম জার্মানির আরও কয়েকটি শহর থেকে আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল। আমি প্যারিস থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট হ'য়ে গেলাম 'ভিসব্যাডেন' (Wiesbaden)। এবার যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে এলাম—তখন দেখি চারদিক সাদা, বরফ পড়ছে। আগের বার দেখেছিলাম, প্লেনটা একেবারে এয়ারপোর্টের মধ্যে ঢুকে যায়। এবার কিন্তু বেশ একটু দূরে থামল। প্লেন থেকে নেমে বাসে এয়ারপোর্টে আসতে হ'ল—আমাদের দেশে যেমন হয়।

মিঃ নিমুথ (Mr. Niemuth) নামে ভিসব্যাডেনের এক জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। আগে তিনি প্রায়ই ভারতবর্ষে আসতেন। নরেন্দ্রপুরেও এসেছেন অনেকবার। বড় করুণ কাহিনী তাঁর। যুদ্ধের সময় তিনি এয়ার-ফোর্সে কাজ করতেন। তাঁর প্লেন দুর্ঘটনায় পড়ে। প্রায় দেড় বছর তিনি বন্দী হ'য়ে ছিলেন রাশিয়াতে। সেই বন্দী অবস্থায় অমানুষিক কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। সে-সব অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাকে অনেকবার বলেছেন। এবারও বলছিলেন। অদ্ভুত মানুষ এই নিমুথ। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা। একবার যখন তিনি নরেন্দ্রপুরে এসে আছেন, একদিন সকালবেলা দেখি, তিনি খালি গায়ে ধুতি পরে চলেছেন স্নান করতে। আমি বললাম: 'বাঃ, তোমাকে তো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন ব্রাহ্মণ।' তিনি বলছেন: 'আগের জন্মে আমি তো ব্রাহ্মণই ছিলাম।' একবার আমি তাঁকে নিয়ে গাড়ী ক'রে, কলকাতার ওপর দিয়ে কোথাও যাচ্ছি। কলকাতার রাস্তাঘাট তো নোংরা, আমার খুব লজ্জা করছে। আমি বলছি: 'কী নোংরা এ-সব রাস্তাঘাট! তোমার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে?' তিনি বলছেন: 'স্বামীজী, এর জন্য তোমরা ভেবো না। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে তোমরা যে-কোন দিন দেশের চেহারা পালটে দিতে পারবে। তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। তোমরা শুধু খেয়াল রেখো, তোমাদের আসল যে সম্পদ—আধ্যাত্মিকতা—সেটা যেন কখনও ভুলে না যাও।' আমি তাঁকে বলেছিলাম: তুমি দুর্গাপুর দেখতে যাবে?' তিনি বলছেন: 'দুর্গাপুর? কি আছে সেখানে?' আমি বললাম: 'বড় একটা স্টিল প্ল্যাণ্ট আছে।' তিনি হাসছেন: 'স্বামীজী, আমি পশ্চিম জার্মানির লোক, পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল ইস্পাত সেখানে তৈরী হয়—আর আমাকে তুমি দেখাবে দুর্গাপুর? তার চেয়ে বরং তুমি আমাকে কামারপুকুর-জয়রামবাটী নিয়ে চল—শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন।' তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম কামারপুকুর-জয়রামবাটীতে। খুব খুশী হয়েছিলেন কামারপুকুর-জয়রামবাটী দেখে। আমার একবার ইটাচুনা কলেজে স্বামীজীর ওপর বলবার কথা ছিল। তাঁকেও আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। বললাম: 'কিছু বলো তুমি।' ইংরেজি বেশ ভাল বলেন উনি। কলেজের ছেলেদের সেদিন উনি বলেছিলেন: 'দেখ, তোমাদের একটা কথা বলি—এই ভারতবর্ষ হচ্ছে তোমাদের মা। একে ধরে থাক। আর পাশ্চাত্যদেশ? সে হচ্ছে গ্ল্যামার গার্ল, ভাল ক'রে সেজেগুজে আছে তোমাদের প্রলুব্ধ করার জন্যে। আসলে কিন্তু সে

অন্তঃসারশূন্য। তার দিকে তাকিও না তোমরা, তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে নিজের মাকে ভুলে যেও না।'—এ থেকে বুঝতে পারা যায় কি ধরনের মানুষ তিনি। ভারতবর্ষকে তিনি কী দৃষ্টিতে দেখেন! অনেকদিন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমি কিছুদিন আগে শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলাম। উনিই আমাকে শ্রীলঙ্কা যাবার সব টাকা পাঠিয়ে লিখেছিলেন: 'আমি এবার ভারতবর্ষে যেতে পারছি না।—শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছি। তুমি যদি এখানে আসো, তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।' শ্রীলঙ্কায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

দুটো কারণে আমার ভিসব্যাডেনে যাবার ইচ্ছা ছিল। প্রথমতঃ, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা আর দ্বিতীয়তঃ—স্বামী যতীশ্বরানন্দজী ভিসব্যাডেনে একটি বেদান্তকেন্দ্র শুরু করেছিলেন, সেইজন্য জায়গাটা আমার দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্টে নিমুখের আমাকে নিতে আসার কথা ছিল এয়ারপোর্টে। কিন্তু প্লেন থেকে নেমে তাঁকে আর খুঁজে পাই না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপ ক'রে, কিন্তু তাঁর দেখা নেই। সব লোক চলে যাচ্ছে। আমার তো খুব ভয় করতে লাগল, কি ক'রব একা একা? সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছে—আমার কাছে কিছু ১০০ মার্কের নোট আছে। কিন্তু কোন খুচরো নেই, যা দিয়ে একটা টেলিফোন ক'রে জানাতে পারি যে, আমি এসেছি! ট্যাক্সি ক'রে যাব কিনা ভাবছি! ভাবতে ভাবতে একবার বাইরে এলাম, ভয়ানক শীত বাইরে। তারপরে ভাবলাম: আমার এ রকম ভেতর-বার করা উচিত না, একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত। আবার ভেতরে গিয়ে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি: দূরে একজন লোক কাকে যেন খুঁজছে। একটু কাছে এলে দেখলাম—নিমুখ। আমি হাসছি, কিন্তু আমাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি যদি সোজাসুজি তাকাতেন, তাহলে আর অত খুঁজতে হ'ত না—আমার পোশাক দেখেই চিনতে পারতেন। যাই হোক, যখন তিনি আমাকে দেখতে পেলেন একেবারে জড়িয়ে ধরলেন: 'স্বামীজী, তুমি এখানে আছ, আর আমি কতবার এখান দিয়ে তোমাকে খুঁজে গেছি!' অর্থাৎ আমি যে-সময়টা বাইরে গেছি, তখন তিনি আমাকে ওখানে খুঁজে গেছেন!

মিঃ নিমুখ আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর গাড়ীতে। আমাকে যেখানে নিয়ে তুললেন, সেটা কিন্তু তাঁর বাড়ী নয়—তাঁর স্ত্রীর বোনের বাড়ী। তাঁর সঙ্গেও আমার শ্রীলঙ্কায় পরিচয় হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন বড় শিল্পী। উনি একতলায় থাকেন। দোতলাটা ছেড়ে দিলেন আমার জন্য। গোটা বাড়ীটা চমৎকার সাজানো। শিল্পী তো! সাজানো-গোছানোর মধ্যেও সেটা ফুটে উঠেছে। নানারকম মূর্তি দেখলাম সারা বাড়ীটায়। সব তাঁর তৈরী। প্রচুর পয়সা আছে, সময়ও আছে ঐ মূর্তি তৈরী নিয়েই তিনি আছেন।

ভিসব্যাডেনে আমি একরাত্রি ছিলাম। ঐ একটা দিন অনেক কথাবার্তা হ'ল মিঃ নিমুখের সঙ্গে। আমাকে তিনি প্রায়ই এখানে লিখতেন: 'তুমি যদি একবার ভিসব্যাডেনে আসো, তাহলে এখানে যে বন আছে, সেখানে গিয়ে আমরা একসঙ্গে ধ্যান ক'রব!' আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'তোমার সেই বন কোথায়?' আমাকে তিনি দেখালেন সেই বন। দেখলাম, বরফ পড়ে সাদা হ'য়ে রয়েছে। বললেন: 'সময় পেলে আমি ঐখানে গিয়ে ধ্যান করি। তুমি যদি আরও দু-একদিন বেশী থাকো তাহলে ঐ-বনে গিয়ে আমরা একদিন ধ্যান ক'রে কাটাব।' কিন্তু আমার

একদিনের বেশী ওখানে থাকার উপায় ছিল না। কাজেই সে আর সম্ভব হয়নি। বাইরে থেকে শুধু বনটা দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: 'তুমি জানো কি স্বামী যতীশ্বরানন্দ এখানে ছিলেন?' উনি বললেন: 'তিনি এখানে থাকতে সেটা জানতাম না। তাঁর নামও তখন শুনিনি। ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁর নাম শুনেছিলাম। ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলাম, কিন্তু এখানে তিনি কোথায় থাকতেন, তা আমি জানি না।' আমি আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু কেউ বলতে পারল না যতীশ্বরানন্দজীর বেদান্তকেন্দ্র কোথায় ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যতীশ্বরানন্দজী ওখান থেকে চলে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। তবে বার্লিনে আমার দু-চারজনের সঙ্গে দেখা হ'ল, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁরা দু-একবার ভারতবর্ষেও এসেছেন। ঠাকুর-স্বামীজীর সম্পর্কে বই লিখে তাঁরা ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব ওখানে প্রচার করার চেষ্টা করছেন। 'কথামৃত'—জার্মান ভাষায় সংক্ষেপে অনুবাদ ক'রে ছাপাচ্ছেন। বেশ ভাল লাগল তাঁদের দেখে, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

ভিসব্যাডেন শহরটা খুবই সুন্দর। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ক্রমেই বড় হচ্ছে শহরটা। ভিসব্যাডেন থেকে আমি গেলাম পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন্-এ। বন্-এর একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাঁরা গাড়ী নিয়ে এলেন ভিসব্যাডেনে। ঐ গাড়ীতেই আমি বন্-এ গেলাম। গাড়ীতে যাওয়ার সময় ওখানকার গ্রামগুলি দেখতে পেলাম—অপূর্ব দৃশ্য! তখনও কিছু কিছু সবুজ আছে। তবে মানুষজন কম। খুব ভাল লাগল ঐ পথটুকু। বন্-এ আমাকে প্রথমেই ওঁরা নিয়ে গেলেন 'সেন্ট অগাস্টিনে'। অগাস্টিন ছিলেন একজন সাধু। তাঁর নামে একটা গীর্জা আছে। গীর্জার চারপাশে একটা শহর গড়ে উঠেছে। এখন শহরটারই নাম হ'য়ে গেছে 'সেন্ট অগাস্টিন'। সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল একটা 'সেমিনারী'তে। সেখানে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব (Christian Theology) নিয়ে গবেষণা হয়। ওখানে চীন সম্বন্ধে একটা বিরাট লাইব্রেরী দেখলাম। দু-একজনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তাঁরা চীনা ভাষায় পণ্ডিত। আগে তাঁরা চীনে প্রচার করতেন, এখন সেখানে চীন দেশ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। ঐ 'সেমিনারী'তে আমাকে একটানা ছ-ঘণ্টা ধর্মপ্রসঙ্গ করতে হ'ল। নানারকম তাদের প্রশ্ন। দু-একটা নমুনা দিই: 'ভগবান্ বলতে তোমরা কি বোঝ?' 'ভগবান্ একটা ব্যক্তি, না একটা শক্তি?' 'যদি ব্যক্তি হন, তাহলে কি তাঁর কোন নাম আছে? রূপ আছে?' 'কি তাঁর প্রকৃতি? তিনি দয়ালু, না নির্দয়?' 'যদি দয়ালু, তাহলে মৃত্যু কেন ঘটে? ব্যাধি হয় কেন? দুর্ঘটনা ঘটে কেন? একজন শিশু কেন অনাথ হয়? কেন একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে বিধবা হয়? এ-সব কে ঘটায়?' বেদান্ত বা হিন্দুধর্ম বা হিন্দুদর্শনের ভিত্তিতে ওদের বিভিন্ন প্রশ্নের আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দিলাম। এই-সব আলোচনা করতে করতে দেখলাম, আমার বক্তব্য ওরা বেশ আগ্রহ সহকারে শুনছে। এক-সময় ওরা স্বীকারই ক'রে ফেলল: 'আমাদের দুটো মত আছে। একটা মত হচ্ছে—আমাদের সরকারী মত (official view), যেটা আমরা বাইরে প্রকাশ করি। আর একটা হচ্ছে আমাদের বেসরকারী মত—ব্যক্তিগত মত (personal view)। ব্যক্তিগত মতটা আমরা বাইরে সবার সামনে বলি না। তবে সেটা আমাদের নিজস্ব মত, আমরা নিজেদের চিন্তা-যুক্তি দিয়ে সেই মতে পৌঁছেছি।' দেখলাম, ওদের চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন হচ্ছে।

ধীরে ধীরে, হয়তো ওদেরও অজ্ঞাতসারে, ওরা ক্রমশঃ হিন্দু-চিন্তা বা বেদান্ত-চিন্তার দিকে ঝুঁকছে।

আর একটা প্রশ্ন ওদেশে আমাকে বার বার শুনতে হয়েছে --এই 'সেমিনারী'তেও সেই প্রশ্ন উঠেছিল। সেটা হচ্ছে: 'তোমরা হিন্দুরা কেন তোমাদের চারপাশের আর্ত-দরিদ্র-অক্ষম-অভুক্তের দিকে তাকাও না? তোমাদের ধর্ম কেন এ-ব্যাপারে উদাসীন?' ওদের কাছে ধর্ম মানে সমাজসেবা (social action)—এ-ছাড়া আর কিছু নয়। আর কেবলই আমাকে জিজ্ঞেস করে: 'মাদার টেরেসাকে চেনো? [জার্মান ভাষায় "মাদার"কে বলে "মুটার" (Mutter) আর টেরেসা-র উচ্চারণ করে "টেরিজা"।] শুনেছি একমাত্র তিনিই নাকি ওখানে লোকের উপকার-টুপকার করছেন?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ, তাঁকে চিনি, পরিচয়ও আছে। তবে এটা ঠিক নয় যে, উনিই একমাত্র লোকের সেবা করছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞ চলছে সারা ভারত জুড়ে—জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে। আরও অনেক হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে, যাঁরা লোকের সেবা করছেন। সুতরাং এটা তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে, হিন্দুধর্ম মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে উদাসীন।'

সেণ্ট অগাস্টিনের 'সেমিনারী'র কয়েকজন প্রবীণ পণ্ডিত আমাকে বলেছিলেন: 'তুমি যদি ভবিষ্যতে আবার কোনদিন এখানে আসো, তাহলে আমরা আবার এইভাবে মিলিত হবো। তখন এই প্রশ্নগুলো আরও গভীরভাবে আমরা আলোচনা ক'রব। আসবে তো তুমি?' আমি বললাম: 'আসার অনেক অসুবিধা আছে। তবে তোমরা যদি আমাকে ডাকো, আমি নিশ্চয়ই আসার চেষ্টা ক'রব।'

আলোচনার শেষে 'সেমিনারী'র কর্মকর্তারা আমাকে বললেন: 'এখানে একটা সপ্তাহান্তিক সেমিনার (weekend seminar) হচ্ছে স্কুলের ছেলেমেয়েদের। তুমি তাদের সঙ্গে দেখা ('meet') করবে?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ, করতে পারি। কোন আপত্তি নেই।' একদল স্কুলের ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিলিত হলাম একটা ঘরে। একটি মেয়ে এসে আমার কাছে বসে, পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে ধরাল। তাদের শিক্ষয়িত্রীও সঙ্গে আছেন, আর আমিও একজন অপরিচিত লোক। কিন্তু সেজন্য স্কুলের ছাত্রীটির মধ্যে কোন সঙ্কোচ বা জড়তা নেই। সিগারেট টানতে টানতে সে জিজ্ঞেস করছে: 'আচ্ছা, তোমরা বলো প্রার্থনা করতে। কার কাছে প্রার্থনা ক'রব?' আমি বললাম: 'কেন? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে?' সে বলছে: 'ভগবান্? কে তিনি? কোথায় থাকেন? তিনি যে আছেন, তার কি প্রমাণ? থাকলেও, তিনি যে আমার প্রতি দরদী, তিনি যে আমার প্রার্থনা শোনেন, তার কি প্রমাণ? আমি অনেকবার প্রার্থনা ক'রে দেখেছি—তিনি শোনেন না।' এ-সব প্রশ্ন অন্য জায়গায়ও আমাকে শুনতে হয়েছে। এখন ওকে ওর উপযোগী ক'রে বললাম। আরও কেউ কেউ প্রশ্ন ক'রল। বেশ ভাল লাগল ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। খুব প্রাণবন্ত আর বেশ বুদ্ধিদীপ্ত।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। আমার থাকবার ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন ওখানকার একজনের বাড়ীতে। তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। আমাকে নিয়ে যাবেন তাঁর বাড়ীতে। তিনি আমাকে বললেন: 'আমার বাড়ী এখান থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে। গাড়ী ক'রে সেখানে যাব। যাওয়ার পথে একটা খ্রীষ্টান মঠ পড়বে। তুমি কি যাবে সেখানে?' আমি বললাম: 'নিশ্চয়ই যাব।' গাড়ীতে যাচ্ছি। রাত হচ্ছে। রাস্তায় দেখলাম, একটা পাহাড়ের ওপরে আলো দেখা যাচ্ছে। ঐ

পাহাড়ের ওপরে সেই মঠ। যখন সেখানে পৌঁছলাম, রাত হয়েছে—দরজা-টরজা সব বন্ধ। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক বোধ হয় আগে থেকে সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলেন। আমরা যেতেই দরজা খুলে দিলেন একজন সাধু। তাঁর মুখের চেহারা দেখেই বুঝলাম, অত্যন্ত গর্বিত তিনি। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম তাঁর দিকে। তিনি খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর হাত বাড়ালেন—যেন ময়লা লেগে যাবে হাতে। আমার সঙ্গের ভদ্রলোককে বললাম: 'মানুষটি খুব গর্বিত, না?' তিনি বললেন: 'ঠিক বলেছ তুমি। অত্যন্ত গর্বিত।'

আমাকে নিয়ে গেলেন, যেখানে ওঁদের 'মাস' ('Mass') হচ্ছে। 'মাস' মানে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে সংযোগ ('Communion')—যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যাওয়া। ওঁরা ওঁদের প্রার্থনা আর পূজার পর মনে করেন, যীশুখ্রীষ্টের 'রক্ত' আর 'মাংস' যেন তাঁরা গ্রহণ করছেন। তাঁর রক্তের প্রতীক হচ্ছে মদ আর তাঁর মাংসের প্রতীক হচ্ছে রুটি, বিস্কুট বা ঐ জাতীয় কিছু। ওঁরা ঐ মদ আর রুটি গ্রহণ করেন আর মনে করেন যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁদের একটা সংযোগ (Communion) স্থাপিত হচ্ছে। এই চার্চটা হচ্ছে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের। ওদের পূজা-পদ্ধতি দেখলাম দাঁড়িয়ে। খুব বর্ণাঢ্য। নানারকম পোশাক পরে সাধুরা ঢুকলেন। একদলের হাতে বাতি, আরেক দলের হাতে ধূপদানি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আবার জল ছিটানো, দেখলাম। তারপরে নানারকম প্রার্থনা উচ্চারণ করেন। লক্ষ্য করলাম, আমাদের পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে ওঁদের পূজার বেশ সাদৃশ্য আছে। প্রার্থনা হ'য়ে যাওয়ার পর, ওঁরা প্রসাদ গ্রহণ করেন—ঐ মদ আর রুটি। সাধুরা প্রথমে প্রসাদ নেন। তারপর সাধুরা পরস্পর কোলাকুলি করেন। এর পরে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের প্রসাদ দেওয়া হয়। সেদিন গীর্জাতে খুব কম লোক—পাঁচ-সাতজন মাত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। প্রসাদ যখন দিতে এলেন, আমি প্রথমে হাত বাড়ালাম। আমাকে দিলেন না। অন্য সবাইকে দিলেন। ঐ প্রসাদ নেওয়ার অর্থ হচ্ছে—যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে আমার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে। আমি তো খ্রীষ্টান নই, আমার সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের কি ক'রে যোগ হ'তে পারে? সেইজন্য আমাকে প্রসাদ দিলেন না। আমি যদি প্রোটেস্ট্যান্ট হতাম, তাহলেও কিন্তু ওঁরা আমাকে প্রসাদ দিতেন না। ওঁরা ক্যাথলিক। একমাত্র ক্যাথলিক হলেই ঐ প্রসাদ পাবে। আমাদের দেশে কিন্তু এটা করে না। যদি একজন অ-হিন্দু এসে প্রসাদ চায়, তাহলে নিশ্চয়ই সে প্রসাদ পাবে।

ঐ মঠ থেকে যখন রওনা হলাম, তখন আমি ভীষণ ক্লান্ত। কারণ, সকাল থেকেই আমাকে ঘুরতে হচ্ছে, কথাও বলতে হচ্ছে এক-নাগাড়ে। ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হ'য়ে আসছে, ভাবছি এখুনি শুয়ে প'ড়ব—এমন সময় ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী একটা বড় কাগজে প্রায় তিরিশটা প্রশ্ন লিখে এনেছেন। আমাকে সে-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে! উনি যোগ-অভ্যাস করেন, তাঁর নাকি কি-সব দর্শন হয়—সেই নিয়ে নানা-রকম প্রশ্ন। আমার চোখ বন্ধ হ'য়ে আসছে ঘুমে, তার মধ্যেই কিছু কিছু উত্তর দিলাম। আর যখন বসে থাকতে পারছি না, তখন বললাম: 'দেখ, আজ আমি সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছি। তুমি আমাকে পরে প্রশ্নগুলি লিখে পাঠিও। আমি তোমাকে উত্তর দেবো, সম্ভব হ'লে যোগের ওপরে কিছু কিছু বইও তোমাকে পাঠাবো।'—এই ব'লে তখন রেহাই পেলাম। ঐ ভদ্রলোক হচ্ছেন ক্যাথলিক, কিন্তু স্ত্রী

প্রোটেস্ট্যান্ট। সাধারণতঃ নিয়ম হচ্ছে, ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টের মধ্যে বিয়ে হয় না। যদি বিয়ে হয়, তাহলে এই শর্তে হবে যে, বিয়ের পরে ছেলেমেয়েরা ক্যাথলিক হবে। আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম: 'তোমার ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে?' উনি বললেন: 'সে ওর মা জানে। আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাই না।' আগে ওদের দেশে এই-সব নিয়ম খুব কড়া ছিল; এখন কিছুটা শিথিল হ'য়ে এসেছে। সাধারণ মানুষের ওপর চার্চের সে-প্রভাব আর নেই।

[ক্রমশঃ]

হে ভারত ভুলিও না

শ্রীসুশীলকুমার সিংহ

হে ভারত! তুমি ভুলিও না তব
ঋষি জীবনের শিক্ষা;
আসিছে সেদিন এ-ধরা যেদিন
তব পদে লবে দীক্ষা।
গুরুরূপে তোমা করিয়া বরণ
তব আদর্শে হবে নিমগন;
তব মহিমায় ভরিবে ভুবন
পূরিবে তব প্রতীক্ষা।

হে ভারত! তব তপস্তার ফল
চাহনি একার তরে—
চাহ গো মুক্তি সকলের সাথে
বিশ্বপিতার বরে।
পরহিত তরে তব আরাধনা
জগমঙ্গল তোমার সাধনা—
মানবে মানবে মিলন-কামনা
তব আদিকাল ধরে।

হে ভারত! তুমি চিরবরেণ্য
জগৎ-ধন্য তুমি!
মানবেরে চাহ দেবতা করিতে,
ধরারে স্বর্গভূমি।
শিখাইতে চাহ প্রকৃত তত্ত্ব—
ক্ষণ সুখ নয়, ভূমাই সত্য;
মানুষ লভিবে মনুষ্যত্ব
ত্যাগের মহিমা চুমি।

হে ভারত! তুমি মহাজীবনের
জ্বেলেছ জ্ঞানের আলো—
সে আলোক ছাড়া হবে নাকো দূর
জগতের যত কালো।
হবে নাকো দূর স্বার্থ-ছলনা
ঈর্ষা, হিংসা, ঘৃণা-বঞ্চনা—
জীবনের যত ক্লেদ ও কালিমা
পুড়ায়ে প্রদীপ জ্বালো।

হে ভারত! তুমি ঋষি-মুনিদের
মহাসাধনার ধন;
সে সাধন-ধারা বহিছে তোমার
অন্তরে অনুক্ষণ।
তাই তব হৃদি চাহে বারে বার
সবারে করিতে চির আপনার—
বিশ্বভুবনে আত্মা তোমার
চাহিছে আলিঙ্গন।

হে ভারত! তুমি তব আদর্শে
চির মহা-মহীয়ান্।
তব শুভব্রতে তুমি অবিচল
সাধো জীব-কল্যাণ।
তব পবিত্র অন্তর আশা
জীবে-শিবে প্রেম প্রীতি-ভালবাসা—
ব্যর্থ হবে না কভু এ পিপাসা
হও তুমি আগুয়ান।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[ফাল্গুন, ১৩৮৮ সংখ্যার পর]

মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের পরস্পর সম্বন্ধ

আমরা দেখেছি যে, 'মাধুর্য' এবং 'ঐশ্বর্য' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দুটি তুল্যমূল্য দিক। অর্থাৎ উভয়ই তাঁর স্বরূপশক্তির দুটি বৃত্তি, অবশ্য দুটি বিভিন্ন বৃত্তি। সেই দিক থেকে এ-কথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, শ্রীভগবানের স্বরূপের দিক থেকে তারা উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ, সমান প্রয়োজনীয়, সমান সম্মাননীয়। তা সত্ত্বেও এ-কথা সমান সত্য যে, বিভিন্ন বৈষ্ণব-বেদান্ত-সম্প্রদায়ে ঐ দুটির মধ্যে একটিকেই অধিকতর গুরুত্ব দান করা হয়েছে। যেমন—রামানুজ এবং মধ্বের মতবাদে 'ঐশ্বর্য'; এবং নিম্বার্ক, বল্লভ, বলদেব এবং বিশেষ ক'রে পরবর্তী গৌড়ীয় বেদান্ত-দর্শনে 'মাধুর্য' কেন্দ্র-স্থান অধিকার করেছে।

বস্তুতঃ সমগ্র বৈষ্ণব-বেদান্ত-দর্শনের সাধারণ মতবাদ এই যে, 'মাধুর্য' এবং 'ঐশ্বর্যের' পরস্পর-সম্বন্ধের দিক থেকে, নিঃসন্দেহে 'মাধুর্যে'রই প্রভাব সমধিক—যেহেতু 'ঐশ্বর্য' 'মাধুর্যে'র উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কিন্তু 'মাধুর্য' 'ঐশ্বর্যে'র উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে অনায়াসে।

তার প্রধান কারণ হ'ল এই যে, 'মাধুর্য' 'ঐশ্বর্য' অপেক্ষা ব্যাপকতর, বলবত্তর, বৃহত্তর। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-দর্শনে বিশেষ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবিধ 'মাধুর্যে'র উল্লেখ করা হয়েছে অত্যন্ত । এবং গৌরবের সঙ্গে। যথা—

পঞ্চবিধ মাধুর্য

(১) **লীলা-মাধুর্য :** শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ধামে বিভিন্ন ভক্তগণের সঙ্গে বিভিন্নভাবে লীলা ক'রে থাকেন। এই সকল লীলার মধ্যে তাঁর 'ঐশ্বর্য'-গুণের কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় না ; বরং তাঁর 'মাধুর্য'-গুণই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। যেমন—ব্রজলীলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতানুসারে 'সর্বরসঃ' ("সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ"—ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩।১৪।৪) শ্রীকৃষ্ণের সর্বরসই প্রকাশ পায় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'রাসলীলায়'; এবং সেজন্য সকল ব্রজলীলার মধ্যে এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ লীলারূপে সম্মানিত। এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এই 'রাসলীলা'র কথা স্মরণ করলে নিজেকেই বশে রাখতে পারেন না।

"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা
লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে
মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।১।১১)

"যদিও আমার প্রচুর মনোহর লীলা আছে, তথাপি রাসলীলার কথা স্মৃতিপথে উদিত হ'লে আমার মন যে কিরূপ হয়, তা বুঝতে পারি না।"

(২) **প্রেম-মাধুর্য :** সমগ্র বৈষ্ণব-মতবাদ প্রেম-মাধুর্যের মধুরতম রসে প্লাবিত। এটিকে বৈষ্ণব-দর্শনের একটি রমণীয়তম বৈশিষ্ট্য বলেও পরিগণিত করা হয়। কারণ এই মতানুসারে স্বয়ং শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রেমলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল —ভক্ত যেরূপ ঈশ্বরের প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল, ভগবান্ তার চেয়েও বহুগুণ অধিক আকুল।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তের এরূপ তুল্যমূল্য পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা স্মরণ করেই বৈষ্ণব-দর্শনের সর্বত্রই অতি সাহসভরে, অতি গৌরব-সহকারে, অতি

আনন্দসঞ্চারে এ-কথাও বলেছেন যে, শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ হ'ল—তিনি 'ভক্তদাস', 'ভক্তবশ', 'ভক্ত-পরাধীন' প্রভৃতি। (মাঘ ১৩৮৮, পৃঃ ১৭-১৮ দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে এ-কথা স্মরণীয় যে, এস্থলে 'প্রেম-মাধুর্যে'র মধ্যে রয়েছে 'ভক্তি-মাধুর্য' এবং 'প্রীতি-মাধুর্য' উভয়ই। বস্তুতঃ পূর্বেই যা বলা হয়েছে বৈষ্ণব-মতবাদে 'ভক্তি' ও 'প্রীতি' শব্দ দুটিকে ভক্ত নিজের ইচ্ছানুসারেই যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন, দুটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ না করেই। (মাঘ ১৩৮৮, পৃঃ ১৫ দ্রষ্টব্য)।

সে যা হোক, 'ভক্তিপ্রিয়' 'ভক্তিবশ' 'ভক্তিজিত' পরমেশ্বর, ভক্তি যে তাঁর পরম প্রিয়; এবং তাঁর অন্তরের 'মাধুর্য', 'অমৃত' এবং 'আনন্দাদি' মহান্ মধুরভাবের কারণ, স্বয়ং ভগবান্ সে-কথা উল্লেখ করেছেন বহুস্থানে আবেগভরে। সামান্য দু-একটি মাত্র উদাহরণ শুনুন। ভক্ত-প্রবর উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাভরে আদরসহকারে বলছেন—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৪।১৫)

"তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, স্বয়ং আত্মযোনি ব্রহ্মাও (আমার পুত্র হয়েও—শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি ব'লে তিনি তাঁর পুত্র) আমার সেরূপ প্রিয়তম নন; স্বয়ং শঙ্করও (আমার গুণাবতার হয়েও) আমার সেরূপ প্রিয়তম নন; স্বয়ং সঙ্কর্ষণও (বলরাম, আমার ভ্রাতা হয়েও) আমার সেরূপ প্রিয়তম নন; স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও (আমার কান্তা হয়েও) আমার সেরূপ প্রিয়তম নন; এমন কি, স্বয়ং আমিও (সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়েও) আমার সেরূপ প্রিয়তম নই।" কী রোমাঞ্চকর, রমণীয়, অত্যাশ্চর্য, অভিনব এই অনুপম ভগবদুক্তিটি!

পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ বারংবার ভক্তকে তাঁর সঙ্গে এইভাবে ভক্তির মাধ্যমে সমানভাবে মিলিত হ'তে সাদর সাগ্রহ সানুগ্রহ সানন্দ আহ্বান জানাচ্ছেন—

"সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ।
নৈষঃ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব ॥
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্।
নিঃশঙ্কপ্রণয়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে ॥"

(হরিভক্তিসুধোদয়, ১৪।২৭-২৮)

"হে বৎস! আমার গৌরবজনিত যে ভয় ও সম্ভ্রম তোমার হৃদয়ে উদিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাগ কর। ভক্তগণের এরূপ ভয় ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার আমার একেবারেই প্রিয় নয়। বরং তুমি নিজেকে আমার অধীন বা পরাধীন না ভেবে, একেবারেই 'স্বাধীনপ্রণয়ী' হও; অর্থাৎ একেবারেই স্বাধীনভাবে আমার সঙ্গে প্রণয় কর; আমাকে প্রীতি কর; আমাকে ভালবাসো। কারণ যে ভক্ত এইভাবে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে দর্শন করেন, এবং আমার সঙ্গে কথা বলেন, আমি পূর্ণকাম হলেও তিনি আমার নিকট নতুন হতেও নতুনরূপে প্রিয় ব'লে প্রতিভাত হন।"

সত্যই কী কল্পনাতীত সুন্দর এই ভাব! আমরা অতি সামান্য সাধারণজনেরাও তো এই কথাই মনে মনে চাই যে, আমাদের যাঁরা ভক্ত আছেন, তাঁরা যেন আমাদের পদানত হয়েই থাকেন চিরকাল; আমাদের সমান হবার স্পর্ধা না রেখে। যেমন—প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধে, রাজা-প্রজার সম্বন্ধে, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধে, পতি-পত্নীর সম্বন্ধে, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধে, মালিক-কর্মচারীর সম্বন্ধে—এরূপ শঙ্কা-সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব ও ব্যবহারই চান এবং আশাও করেন; তা না পেলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হন; তাদের ভর্ৎসনা ও শাস্তিদানও করেন। কিন্তু তাকিয়ে দেখুন—সর্বশক্তিমান মহত্তম উচ্চতম পূর্ণতম পরমেশ্বরের দিকে, তিনি

বরং ঠিক বিপরীত আচারাচরণই করছেন, বিপরীত ভাবভাবনাই পোষণ করছেন, বিপরীত নির্দেশদানই করছেন, বলছেন বারংবার—হে ভক্তবৃন্দ! পদানত থেকো না আমার বিন্দুমাত্রও, মুহূর্তমাত্রও; ভয় ক'র না আমাকে বিন্দুমাত্রও, মুহূর্তমাত্রও; নিজেকে নীচু ভেবো না আমার থেকে বিন্দুমাত্রও, মুহূর্তমাত্রও! বরং উন্নতমস্তকে, স্ফীতবক্ষে, নির্ভয়ে সমানভাবে আমার সঙ্গে মেশো—এই তো 'ঐশ্বর্য'শূন্য 'মাধুর্য'; এই তো পরমানন্দ; এই তো চরমা সিদ্ধি।

(৩) **ঐশ্বর্য-মাধুর্য** : 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে লীলা-মাধুর্য, প্রেম-মাধুর্য, বেণু-মাধুর্য ও রূপ-মাধুর্য —এই চতুর্বিধ 'মাধুর্যে'র কথা বলা আছে। কিন্তু 'লঘুভাগবতামৃতে', লীলা-মাধুর্য, ঐশ্বর্য-মাধুর্য, বেণু-মাধুর্য এবং রূপ-মাধুর্য—এই চতুর্বিধ 'মাধুর্যে'র কথা বলা হয়েছে।

এস্থলে প্রশ্ন হ'তে পারে স্বভাবতই যে, 'ঐশ্বর্য-মাধুর্য' যেন একটি স্ববিরোধ-দুষ্ট শব্দ—যেহেতু 'ঐশ্বর্যে'র মধ্যে পুনরায় 'মাধুর্য' থাকবে কিরূপে?

"চতুর্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
ঐশ্বর্যক্রীড়য়োর্বেণো স্তথা তদ্বিগ্রহস্য চ॥"

(লঘুভাগবতামৃত-কৃষ্ণামৃত, ৮০৬)

অর্থাৎ একমাত্র ব্রজেই এই প্রকারের চতুর্বিধ মাধুর্যের সহাবস্থিতি সম্ভবপর। যেহেতু ব্রজলীলায় মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হলেও সেস্থলে ঐশ্বর্যের অভাব নেই। যেমন—শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, কালীয়দমন, অঘাসুর-বকাসুরবধ, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ, গোবর্ধন-ধারণ, ব্রহ্ম-মোহন প্রভৃতি ঘটনা মাধুর্যপ্রধান কেবল নয়; মাধুর্যশ্রেষ্ঠ ব্রজলীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন 'ঐশ্বর্যে'র স্পষ্ট পরিচায়ক।

তবে সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে ব্রজলীলাতে রয়েছে অনন্ত অসীম শাশ্বত 'মাধুর্য', যা আস্বাদন ক'রে পরমমধু-রসঘন পরব্রহ্মও যেন বিমোহিত হ'য়ে যান নিমেষে নিমেষে।

"কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্বেণ মধুরৈশ্বর্যরাশিনা।
সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে॥"

(ঐ, ৮০৭)

"মাধুর্য ও ঐশ্বর্যরাশি দ্বারা সেব্যমান শ্রীহরি ব্রজধামে বিহার করেন সানন্দে।"

(৪) **বেণু-মাধুর্য** : 'বেণু' শ্রীভগবানের উদাত্ত-উদার-সাদর-সানন্দ-সাগ্রহ-সানুগ্রহ চিরন্তন আহ্বান—এবং এরূপ আহ্বানের অপেক্ষা মধুরতর আর কি হ'তে পারে পৃথিবীতে?

"যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী।
তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি॥
চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দমগ্নয়োঃ।
ভবেদ্ধর্মবিপর্যাসো যস্মিন্ ধ্বনিতে মোহনে।"

(ঐ, ৮১২-১৩)

"পৃথিবীতে যত রকম শব্দ-মাধুরী আছে, তা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এক কণিকাতেই বিলীন হ'য়ে যায়; অর্থাৎ এক কণিকারও সমান নয়। শ্রীকৃষ্ণের মধুর-মোহন বংশীধ্বনি যখন হয়, তখন সমস্ত চরাচর পরমানন্দমগ্ন হ'য়ে যায়, এবং জড়াজড়ের মধ্যে ধর্মবিপর্যয় সংঘটিত হয়—অর্থাৎ পর্বতাদি জড় বস্তু অজড় বস্তুর ন্যায় পুলকে কম্পিত হ'তে থাকে; এবং জীবাদি অজড় বস্তু জড় বস্তুর ন্যায় পুলকে নিশ্চল হ'য়ে যায়।"

সত্যই শ্রীভগবানের এই মধুর-মোহন মুরলীধ্বনি যখন একবার আমাদের চিত্তবীণাকে ঝঙ্কৃত করে, তখন অন্তরে বাহিরে তো কেবল তাঁরই নাদ শুনি—নদীর কল্লোলে কল্লোলে, বায়ুর হিল্লোলে হিল্লোলে, বনভূমির মর্মরে মর্মরে, বিহগের কূজনে কূজনে, মেঘের মন্দ্রে মন্দ্রে, সাগরের গর্জনে গর্জনে কেবল তাঁরই তো ধ্বনি শুনি, তাঁরই তো বাণী শুনি, তাঁরই তো আহ্বান শুনি সর্বদা; এবং তখন বিশ্বকবির সঙ্গে সুর

মিলিয়ে আমরাও সানন্দে বলতে পারি—

"বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে।
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।—

নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।

*　　*　　*

দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত
ভাষা, ঝরঝর রসধারা॥"

(৫) রূপ-মাধুর্য: প্রত্যেক মতবাদেই পরমদেবতাকে পরমসুন্দররূপেই পূজা নিবেদন করা হয়। উপনিষদে পরব্রহ্মের এই রমণীয় রূপকে দুটি রোমাঞ্চকর শব্দের দ্বারা সূচিত করা হয়—'আনন্দ' ও 'অমৃত'।

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥"
(মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।২।৭)

"তাঁকেই বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা
জ্ঞানিগণ করেন দর্শন।
আনন্দরূপে অমৃতরূপে
যিনি উদ্ভাসিত চিরন্তন॥"

বৈষ্ণব-দর্শনে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের দিব্য দেহমাধুর্যের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে সবিস্তারে আদ্যোপান্ত:

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ৯২)

"এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি মধুর মধুর; বদনখানি মধুর, মধুর, মধুর; মধুগন্ধি মন্দহাসিও মধুর, মধুর, মধুর, মধুর।"

"কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে　ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিকে বয়ে যায় পুর॥"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২।২১।১১৬-১৭)

চিরসুন্দরের কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর সমগ্র চিরসুন্দর জীবনভরেই গেয়েছেন সেই পরমরসঘন, পরমামৃতমোহন, পরমমধুময়, পরমসুধানির্ঝর পরমদেবতারই জয়গান—

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার।
নীল অম্বর চুম্বনরত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার॥"
(গীতিমালা—স্বরবিতান ১০)

'মাধুর্যে'র সর্বজনীনতা

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে যে, সর্বব্যাপী 'মাধুর্য' 'ঐশ্বর্য'কেও পরিপ্লাবিত ক'রে, নিজের অন্তর্ভুক্ত ক'রে, নিজের পরিচালনাধীন ক'রে তাকেও মাধুর্যবিমণ্ডিত ক'রে তোলে। সেজন্য প্রকৃত ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের 'ঐশ্বর্য'ও 'মাধুর্য'মণ্ডিত। এরূপে তখন শ্রীভগবানের তথাকথিত কঠোর-কঠিন রূপও হ'য়ে ওঠে কোমল-সরল-আনন্দরসঘন; এবং তাঁর শাসন, শাস্তিপ্রদানাদিও হ'য়ে ওঠে মঙ্গলেরই প্রতীক; এবং তখনই আমরা উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারি স্থির বিশ্বাসভরে, ধীর সাহস-সহকারে, চির আনন্দসঞ্চারে—

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি

জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ॥"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ৩।৬)

"তিনি জানতে পারলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই তাঁর স্থিতি, আনন্দেই তাঁর লয় ॥" এবং তখনই আমরা সর্বপ্রাণমন খুলে, কবির সুরে সুর মিলিয়ে সকল দুঃখ-দৈন্য-দুর্গতির মধ্যেও শান্তভাবে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে, দৃঢ়ভাবে বলতে পারব,

"তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে।
শাসন তোমার যতই গুরু,
তত‌ই টেনে লও বুকে ॥
সুখ পেলে দিই অবহেলা,
শরণ মাগি দুখের বেলা।
তবু ফেলে যাওনা চলে,
সদাই থাক সম্মুখে ॥"

(অতুলপ্রসাদ)

"এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব,
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে
আমার যত কালো।"

(রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, ৯১) [ক্রমশঃ]

নব ভগীরথ

শ্রীনীলদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

দেখেছ কি তাঁরে তুমি সমুদ্রের প্রচণ্ড নর্তনে,
পর্বত-কাঠিন্য মাঝে, ধরিত্রীর শ্যামল উচ্ছ্বাসে,
বিশ্ব প্রাণ শক্তিময় প্রচণ্ড স্পন্দনে,
কাল-নৃত্য-লীলা আর সৃষ্টির আবর্ত লীলা মাঝে।
মহারুদ্র, মহাশিব—একই অঙ্গে ধরেছে কি রূপ,
মানবেরে ভালবাসি—তারি তরে অশ্রু অপরূপ।
কে বলেছে—ভয় কি রে—মোরা সব জ্যোতির তনয়,
নাহি শঙ্কা, নাহি দৈন্য, নাহি দুঃখ, নাহি কোন ভয়।
কহো মোরে—এ জগতে কেবা সেই নব ভগীরথ,
তাপদগ্ধ পৃথিবীতে দেখাইল অমৃতের পথ।
একাধারে মহাবীর্য, মহাত্যাগ আর মহাপ্রেম,
জন্মসিদ্ধ মহাযোগী—অগ্নিময়, দীপ্তিময়, হেম।
কাহারে বক্ষেতে ধরি, গরবিনী এ ধরণী মাতা,
নিজেরে আহুতি দিয়া, সর্বশক্তি দিল কারে ধাতা।
বিশ্বমাঝে রুদ্রস্বরে কে ঘোষিল ভারতের বাণী,
রামকৃষ্ণ-সমর্পিত—বিবেক আনন্দ-সে যে জানি।

শ্রীশ্রীমায়ের বাণী ঃ
সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

মিশ্‌লে (Michelet) তাঁর 'মানবতার বাইবেল' গ্রন্থে অনুপম কয়েকটি কথা বলেছেন : "মানুষের বিশ্রাম চাই, তার বাঁচার জন্য নিঃশ্বাস নেওয়া চাই। তাকে তাই মহাজীবনের অমৃত-নির্ঝরগুলির নিকট আসতে হবে। মহাজীবনের অমৃত-নির্ঝরগুলির মধ্যেই মেলে নিত্যবস্তুর সন্ধান। যে ভূখণ্ড মানবজাতির শৈশবের লীলা-ক্ষেত্র, তার পবিত্র শৈলশিখরগুলির একদিক হ'তে প্রবাহিত সিন্ধু-গঙ্গা, অপরদিক হ'তে পারস্যের অমৃত-প্রবাহিণী স্রোতোধারাসমূহ। সেখানে ছাড়া আর কোথায় এই মহাজীবনের অমৃত-নির্ঝরের সন্ধান মিলবে? সঙ্কীর্ণ পশ্চিম, গ্রীসে শ্বাসরোধ হ'য়ে আসে, শুষ্ক মরুতুল্য জুডিয়া, তৃষ্ণায় সেখানে চিত্ত কাতর। তাই একবার এশিয়া তথা প্রজ্ঞায় গভীর প্রাচ্যের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করতে চাই। সেখানেই ভারত মহাসাগরের মতো দিগন্তবিস্তারী আমার মহাকাব্য বিরাজমান। দেবতার আশীষধারায় স্নাত, সূর্য-কিরণমালায় আলোকময় সে মহাকাব্য এক দিব্য সুরসঙ্গতির, তার মধ্যে কোথায়ও বিন্দুমাত্র ছন্দপতন নেই। তাতে রয়েছে এক পরমশান্তির রাজ্য, আর তার মধ্য হ'তে অন্তহীন মাধুর্য ও অপরিমেয় ভ্রাতৃত্ব— সঙ্ঘর্ষের মধ্যেও সর্বজীবে প্রসারিত। এ যেন এক নিস্তল নিঃসীম সমুদ্র— প্রেমের, কৃপার, বিগলিত হৃদয়ধারার। এতদিনে আমি যার সন্ধান ক'রে ফিরছিলাম, তাকেই পেলাম, পেলাম করুণার মহাকাব্যকে।"[১]

প্রজ্ঞাভূমি ভারতের এই করুণার মহাকাব্য শ্রীশ্রীমায়ের জীবন, ভারতের যুগ-যুগান্তের প্রেম-ধর্মের, জ্ঞান-কর্মের শ্রেষ্ঠ কাব্যকাহিনী। তাঁরই মহাজীবনের অমৃত-নির্ঝর মধ্যে নিহিত রয়েছে পিপাসিত মানুষের জন্য নিঃসীম শান্তি ও অনির্বচনীয় মাধুর্যের নির্মল বারি, রয়েছে মানব-জীবনের সঞ্জীবনী সুধা।

নিবেদিতার মতে শ্রীশ্রীমা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর সমগ্র জীবন হ'ল এক অপূর্ব সুরমূর্ছনায় পরিপূর্ণ ("one whose whole life was full of music"), তাঁর মধ্যে কোথাও কোন ছন্দপতন নেই। বস্তুতঃ আদর্শ হিসাবে তাঁর কোথাও বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নেই। তিনি আদর্শ মাতা, কন্যা, জায়া, আদর্শ গৃহী, আদর্শ সন্ন্যাসিনী, আদর্শ সেবাব্রতী—যেদিক দিয়েই দেখি না কেন তিনি পূর্ণতম আদর্শ।

তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তাঁর উপদেশ-কণিকা তাঁর মহাজীবনের অমৃত-নির্ঝর হ'তে নির্গলিত সুধা—অনির্বচনীয় মাধুর্য-মণ্ডিত ধ্রুব-বাক্য। উপনিষদ্ বলেছেন, "ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু..."[২]—এই সত্যই সর্বভূতের মধু। ধ্রুববাক্য যা, যাতে সত্যের প্রকাশ তা অমৃত-স্বরূপ, তা নিত্য শাশ্বত। মরজীবনকে তা অনিত্যতার সংশয় হ'তে, অপূর্ণতার রিক্ততা হ'তে, বিনাশের ভয় হ'তে, অজ্ঞানতার অন্ধকার হ'তে মুক্তি দেয়। এ মরজীবনেই মানুষ পূর্ণতার স্বাদ পায়, অনির্বচনীয় মাধুর্যের স্পর্শে জীবন হ'য়ে ওঠে মহা ঐশ্বর্যময়।

'বাণী' তখনই সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

১ Michelet—'The Bible of Humanity' গ্রন্থ হ'তে রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'Life of Ramakrishna' গ্রন্থের মধ্যে সূচনার পূর্বে এই পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। অনুবাদ— লেখিকা-কৃত।

২ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৫।১২

হয়, যখন তার মধ্যে ধরা পড়ে এই অফুরন্ত অনাস্বাদিত অনির্বচনীয় রসভাণ্ডার। মহৎ সাহিত্য ক্ষণিকের আনন্দমাত্র বহন ক'রে আনে না, একবার পাঠেই তার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়েও যায় না। সে-সাহিত্য পাঠান্তে সর্বকালে সর্বদেশেই মানুষ প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে ওঠে "শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" হ'তে মুক্ত হয় বারে বারে। সেজন্য তার প্রয়োজন কোন দিনই নিঃশেষ হ'য়ে যায় না। 'বাণী' কিন্তু মহাজীবন হ'তে উৎসারিত হয়েই এরূপ মাধুর্যের খনিতে পরিণত হয়। নতুবা 'বাণী' 'উপদেশ' বা slogan মাত্র। এরূপ বাণীর সত্যের ভিত্তিভূমি নেই। তাই তার মধ্যে 'মধুরে'র উৎসও নেই। Slogan যতই অগ্নিঝরাই হোক না কেন, আসল অগ্নিকণিকা মহাজীবন-বাণী, যা মানুষের মধ্যে মুহূর্তে প্রলয় ঘটাতে পারে, তুচ্ছ মানুষ মহাশক্তিধর মহান্ পুরুষে পরিণত হ'তে পারে। সেজন্যই 'উপনিষদ্', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'শ্রীশ্রীগীতা', 'জাতক', 'বাইবেল', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রভৃতি কালজয়ী সাহিত্য হয়েছে, যুগ-যুগান্ত ধরে এগুলি বহু মানুষের মনের খোরাক জুগিয়ে আসছে, আজ সমালোচকদের যত তীক্ষ্ণ বাণই না কেন তাদের উপর নিক্ষিপ্ত হোক। এগুলি যেমন প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট সমাদৃত, এমন আর কোন গ্রন্থ আছে? এগুলি থেকে তারা জীবনের রসদ পায়, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জৈবিক প্রয়োজন মিটবার পরও চাই দুটি জিনিস —এক, জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া; দুই, 'আনন্দ'। যে সাহিত্য যুগ যুগ ধরে মানুষকে এই দুটি বস্তু জুগিয়ে আসছে তা মহাজীবন ও মহাজীবন-বাণীকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। এ-সাহিত্য মানব-জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' বা বাণী-সঙ্কলন তেমনই অপূর্ব সাহিত্য, চিরকালের সম্পদ, মানব-জীবনে স্বর্গ-সুরধুনী।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' বা বাণী মায়ের মহাজীবনের সঙ্গে মেশামেশি ক'রে আছে। এ শুধু তাঁর বাণী-সঙ্কলন মাত্র নয়। অনেকাংশে মায়ের কথা ভক্তদের নিকট তাঁর স্ব-মুখে অনবদ্য নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীতে বর্ণিত তাঁর অনন্য জীবনকথা। কিন্তু সে জীবনকথা আগাগোড়াই এক মহত্তম বাণী সমষ্টি।

এই 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' যেমন একদিকে অপূর্ব মাধুর্যময়, অফুরন্ত সাহিত্যরসের ভাণ্ডার, তেমনি অপরদিকে সামাজিক জীবনের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ মা একটি জীবন যাপন ক'রে গিয়েছেন—যে জীবন অপূর্ব শ্রেয়োবোধের, পূর্ণ নির্বাসনার, মানবকল্যাণে পূর্ণ আত্মনিবেদনের ও অবিরাম সেবা ও করুণার এক আলোক-উৎসব। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি বর্ণিত কাহিনী অপূর্ব তাৎপর্যপূর্ণ, সমাজের স্থিতি, সংহতি, বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য নির্দেশ হ'ল সেগুলি। সমাজের পক্ষে ভিত্তিস্বরূপ হ'ল ব্যক্তির জীবন, সেখানে খুঁত থাকলে সমাজ-জীবনে ভাঙন ধরে। মায়ের জীবন এদিক দিয়ে এক অভ্রভেদী আকাশপ্রদীপের মতো যুগ-যুগান্তের পথকে আলোকিত ক'রে রেখেছে। সকল দেশের সকল কালের মানুষ তার ব্যক্তিজীবনকে মায়ের জীবনের দৃষ্টান্ত হ'তে নিখুঁত ক'রে গড়ে নিতে পারে।

মায়ের নিজ জীবনকথা মা যেভাবে বলেছেন সহজ সরলভাবে তা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে প্রয়োজন। এখানেই বলা প্রয়োজন যে, শ্রীশ্রীমায়ের বর্ণনাশৈলী অনবদ্য ঋজুতা-গুণ সম্পন্ন। তাঁর ভাষায় কোথাও কোন জড়িমা নেই, বাহুল্য-বর্জিত। সামগ্রিকভাবে তাঁর প্রকাশ-

ভঙ্গী ঝরঝরে, বেগবান স্রোতস্বতীর মতো, তার গতিতে ছন্দ আছে, প্রাণশক্তি আছে, তা পাঠকের মনে নির্মলবারিতে অবগাহন স্নানের ও তৃষ্ণা-নিবারণের তৃপ্তি এনে দেয়।

মায়ের বর্ণনায় স্বচ্ছন্দগতি ছাড়াও অপর বৈশিষ্ট্য অনন্য স্পষ্টতা, বা স্বচ্ছতা, সাহিত্য-সমালোচকদের ভাষায় চিত্রকল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা। তাঁর বর্ণনাগুণে উনবিংশ শতাব্দীর জয়রামবাটী গ্রামের গণ্ডগ্রাম রূপটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তার রুক্ষ প্রকৃতি, উন্মুক্ত প্রান্তর; স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে আরও তদানীন্তন গ্রাম্য অর্ধনৈতিক জীবনের চেহারা, করাল দুর্ভিক্ষের গ্রাসে কবলিত, অবক্ষয়মুখী যে জীবন। সবচেয়ে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তাঁর পিতৃগৃহ। বাহ্যতঃ দৈন্যভরা সংসার, মাটির কুটিরে বাস, কিন্তু তা ছিল এক মহাসম্পদে ধনী—তা হ'ল মনের সম্পদ। সেখানে ছিল অসীম সরলতা, নিষ্কলুষ, নিঃস্বার্থ জীবনযাপন। সেখানে কঠোর কায়িক শ্রম ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল আশ্চর্য নির্লোভতা। ছিল আরও ঈশ্বর-প্রীতি, ঈশ্বর-নির্ভরতা, দেবার্চনা, দুঃখী-আতুরের জন্য অনন্ত সহানুভূতি, দেবতার পূজার মতোই ছিল তাদের সেবার আয়োজন। গৃহ সেখানে কেবলমাত্র আহার ও নিদ্রার স্থানমাত্র ছিল না, দিনচর্যার শিল্পকুশলতার প্রয়োগে হয়েছিল সত্যই গার্হস্থ্য-আশ্রম। মায়ের এই বাল্যস্মৃতিচারণার দু-একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) একজনের প্রশ্ন ছিল—"ওদের ওখানে কেন জন্ম নিলে?" অর্থাৎ দরিদ্র সংসারে কেন তিনি আবির্ভূত হলেন। মায়ের তৎক্ষণাৎ দেওয়া উত্তর—"কেন? আমার বাপ-মা বড় ভাল ছিলেন। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন। মায়ের কত দয়া ছিল। লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন করতেন, কত সরল।"[৩]

এ চিত্রটি তাঁর পিতামাতার সরলতা, ঈশ্বরানুরাগ ও হৃদয়বত্তার চিত্র।

(২) দ্বিতীয় চিত্রটি তাঁর শৈশবের দারিদ্র্য ও কায়িক শ্রমের জীবনের—"ছেলেবেলায় গলা-সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল; ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।"[৪]

(৩) তৃতীয় চিত্রটি গ্রামে দুর্ভিক্ষের তাঁর পিতার সেবাব্রতের ও তাঁর চিত্তের করুণাধারার চিত্র "একবার সেখানে কী দুর্ভিক্ষই লাগল! কত লোক যে না খেতে পেয়ে আমাদের বাড়ী আসতো! আমাদের আগের বছরের ধান মরাই বাঁধা ছিল। বাবা সেই ধানে চাল করিয়ে কড়াইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন, বলতেন, 'বাড়ীর সবাই এই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্য খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে। সে আমার তাই খাবে।' এক একদিন এমন হোত, এত লোক এসে প'ড়ত যে খিচুড়িতে কুলাত না। তখনি আবার চড়ানো হ'ত। আর সেই গরম গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শীগ্‌গির জুড়োবে বলে আমি দু-হাতে বাতাস করতুম। আহা! খিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্য বসে আছে!"[৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে মায়ের পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, নিজ পরিবারের কথা চিন্তা না ক'রে নিজের খাদ্যপুঁজি দরিদ্র ক্ষুধিত মানুষদের সেবার জন্য অকাতরে দান করেছেন। দারিদ্র্য বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু মনুষ্যত্বগুণ বাহ্য ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভর করে—এ-কথাও সত্য নয়। এদিক দিয়ে মায়ের বাল্যজীবন-চিত্র আমাদের নিকট গভীর অর্থবহ।

৩ কথা, ২।১০৮ ৪ ঐ, ভূমিকা, ২১(২) ৫ ঐ, ১।১২৫-২৬

আরও দেখা যায় সেদিন ওই গণ্ডগ্রামে বাহ্য-শিক্ষার কোন আয়োজনই ছিল না। অথচ একটি নিরক্ষর গ্রাম্যকিশোরীর মধ্যে কী আশ্চর্য শ্রেয়োবোধের জাগরণ, প্রেয়কে বর্জন ক'রে শ্রেয়ের আহ্বানে কী সহজেই না সাড়া দেওয়া! সমাজের পক্ষে এর সবটুকু অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ ঘটনা। তাঁর মতো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে আর কজন নারীকে? মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে যার সঙ্গে তাঁর জীবনের গ্রন্থি বাঁধা পড়েছিল, কৈশোরে উত্তীর্ণ হ'য়ে দেখলেন যে, তিনি দেবোন্মাদ, একমাত্র ঈশ্বরের জন্যই তাঁর সর্বগ্রাসী আকুতি। কিন্তু তীক্ষ্ণধী, অপূর্ব শ্রেয়োবোধসম্পন্ন মেয়েটি লক্ষ্য করলেন, সেই দেবমানবের মধ্যে আছে এক পরমপ্রশান্তি, অনির্বচনীয় আনন্দধারা আর তিনি আশ্চর্য হৃদয়বান্, মায়ের জন্য তাঁর অন্তরে আছে অপরিমেয় নির্মল-প্রীতির ফল্গুধারা। আশ্চর্য এই দেবমানবের অসাধারণ জীবনে জীবন-সঙ্গিনী হ'তে তাঁর মধ্যে মুহূর্তের দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। ঐ দেবমানবের স্বর্গীয় স্নেহের ফল্গুধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন এবং তাঁর জীবনব্রতকে নিজ জীবনব্রত ব'লে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, কী আশ্চর্য তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি, যে শক্তিবলে এক পরমপুরুষকেও তাঁর ইষ্টপথের সহায় হবার আশ্বাস দেওয়া যায়! তাঁর সেবা করা, তাঁর সান্নিধ্যে ঈশ্বরলাভের পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের নিজের জন্য আর কিছু চাওয়ার ছিল না। ভারতের নারীজীবনে কোথাও সম্পূর্ণ নির্বাসনা হবার এই আশ্চর্য শক্তি নিহিত আছে—ইতিহাস তার প্রমাণ কিন্তু মায়ের জীবনে তার পূর্ণ উদ্ঘাটন ঘটেছে ভারতের নারীর আদর্শের এই পূর্ণপ্রতিমা ভবিষ্যতে চিরদিনই মানবকল্যাণ-ব্রতীদের পূজা পাবেন। সমাজ-জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে যে শক্তি, এ হ'ল সেই শক্তি। আজকের ইন্দ্রিয়ানুগ-সভ্যতার বিচারে তার স্বীকৃতি থাক বা না থাক। মায়ের জীবনের এই পূর্ণ নির্বাসনা—তাঁর জীবনের মহত্তম বাণী। উত্তরকালে তিনি এ-প্রসঙ্গে—"কোন্ জিনিসটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়," নিজের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "এক কথায় বলতে গেলে নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেন না, বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।"[৬]

আমরা চমকিত হ'য়ে যাই যখন দেখি শ্রীশ্রীমা বলছেন: "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম।"[৭] অর্থাৎ এক নীরস কর্তব্য পালনের দায় তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেননি। জীবনে যে অমৃত-উৎসের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি, জীবনদেবতার সে পরমদান সানন্দে সাগ্রহে তিনি গ্রহণ করেছেন, উত্তরকালে জনে জনে তা বিতরণ করবার দায়ভার নেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন, তেমনি সানন্দে ও পরম আগ্রহের সঙ্গে, নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত করেছেন বিশেষ সাধনার সহায়ে।

কিশোরী সারদার কামারপুকুরে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনের ও প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসার মাঝখানে দীর্ঘ চারটি বৎসরের বিচ্ছেদ রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সাধনা ও ঈশ্বরানুরাগের প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ের মধ্যে সেই দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। মা ছিলেন জয়রামবাটীতে, চার বৎসরে সামান্য সাড়াটুকুও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে তিনি পাননি। কেমন ক'রে কেটেছিল তাঁর সেই প্রাণবিধ্বংসী প্রতীক্ষার দিনগুলি? কেটেছিল অবিরাম সকলের সেবায়, নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারায় তিনি ডুবিয়ে রেখেছিলেন সেই দুঃসহ

৬ ঐ, ২।২৩৯

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব, পৃঃ ৩৫৩

দিনগুলিকে। তিনি ততদিনে নিঃস্বার্থ করুণার এক অপরূপ কল্যাণ-প্রতিমায় পরিণত হয়েছেন। এ-সময়কার বর্ণনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন : "উহা (শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের স্মৃতি) তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থ-দৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থপ্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের দুঃখ-কষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল।"[৮] এই সময় সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথা : "সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহমন ভাল থাকে। আমি যখন আগে জয়রামবাটীতে ছিলুম, দিনরাত কাজ করতুম! কোথাও কারো বাড়ী যেতুম না। গেলেই লোকে ব'লত, 'ও মা, শ্যামার মেয়ের ক্ষ্যাপা জামাইয়ের সঙ্গে বে হয়েছে।' ঐ কথা শুনতে হবে ব'লে কোনখানে যেতুম না।"[৯] মায়ের একটি বৈশিষ্ট্য এখানে পরিস্ফুট। জীবনে তিনি কোন কিছুতেই নিরাশ হননি, কোন পরিস্থিতিতেই তিনি দিশাহারা হননি। এই অসামান্য ধৈর্য তাঁর জীবনের অন্যতম বাণী। সমাজ-সংসারে শান্তি-বিধানের জন্য যার প্রয়োজনীয়তার শেষ নেই।

তারপর একদিন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এলেন। তারপর যা ঘ'টল, তা পরম বিস্ময়কর। শ্রীরামকৃষ্ণ সাদরে তাঁকে স্বাগত জানালেন। অবিলম্বে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর মা ও ভক্তবৃন্দের সেবার ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু স্বল্প পরিসর নহবত ঘরে বাস ও উদয়াস্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা ও হৃদয়ের আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না।[১০] আরও আশ্চর্য যা, তা হ'ল এই যে, এই-রকম অবিরাম গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও এক কঠিন অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। উত্তরকালে এ-প্রসঙ্গে বলেছেন : "প্রতিদিন লক্ষনাম জপ করতুম।" প্রতিদিন লক্ষনাম জপ—গৃহী বা কর্মী সন্ন্যাসী কল্পনাও করতে পারেন কি? কজন কর্মব্যস্ততার মধ্যে মনঃসংযোগ ক'রে ১০৮ বারই নাম জপ করতে পারেন? সেক্ষেত্রে কর্মী মাত্রই জানেন লক্ষনাম জপ করা কত কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। তার অর্থ তাঁর প্রতিটি কর্মই উপাসনায় পরিণত হয়েছিল, হাজার কাজের মধ্যেও প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে অখণ্ড ধ্যানযোগে যুক্ত। ঐ সময়কার সাধন-তন্ময়তা সম্বন্ধে নিজে বলেছেন : "আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম। কোন হুঁশ থাকত না। একদিন জোছনা-রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে ব'সে জপ করছি, চারদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর যে সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারিনি—অন্যদিন জুতোর শব্দে টের পাই।…ছেলে যোগেন সেদিন আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল।"[১১] আর এক স্থলে বলছেন : "তখন আমার মন এমন ছিল—দক্ষিণেশ্বরে রেতে কে বাঁশী বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠত, মনে হ'ত সাক্ষাৎ ভগবান্ বাঁশী বাজাচ্ছেন—অমনি সমাধি হ'য়ে যেত।"[১২]

---

৮ ঐ, পৃঃ ৩৫৪ ৯ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১।১৫

১০ "ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নহবতখানায় ছিলাম তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে থাকতে হ'ত। তার ভিতর কত জিনিসপত্র। ঠাকুরের জন্য হাঁড়িতে মাছ জিইয়ে রাখতাম। তাঁর সেবার জন্যে কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত।" ঐ, ২।২৩১। "দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।" ঐ, ২।৩২১

১১ ঐ, ১।১৪২-৪৩ ১২ ঐ, ১।১৪৭

জীবন যখন তাঁকে যে 'চ্যালেঞ্জ' দিয়েছে, অপার শক্তিমতী তিনি সাহসের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছেন; কখনও পরাজিত হননি। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে জয় ক'রে জপ-ধ্যান-সমাধিমগ্ন এক জীবন, যে জীবন এক অপার আনন্দের ছিল, তা তিনি এ-সময় যাপন করেছিলেন। প্রতিকূলতাকে জয় করবার এই অসীম ক্ষমতাও তাঁর জীবনের একটি অনন্য শিক্ষা। জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও ম্রিয়মাণ মানুষদের কাছে এ এক অতি আশার বাণী বহন ক'রে আনে ও শক্তি দেয়। তাঁর মধ্যে এই মহাশক্তিকে চিনতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভুল হয়নি। তাই তিনি বলেছিলেন: 'ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।'' উত্তরকালে তিনি তাঁরই ওপর বর্তমান সভ্যতায় পথহারা সংশয়দীর্ণ মানুষগুলিকে পথ দেখাবার ভার অর্পণ করেন। ঐ মহাশক্তিকেই আপন ইষ্টদেবীর আসনে বসিয়ে পূজাও করেছিলেন; তৎপূর্বে এবং তাঁরই পদতলে আপন অসামান্য সাধনার সকল ফলরাশি সমর্পণ করেছিলেন।

মায়ের সাধনা এই-সময়ে আরও একটি আশ্চর্য দিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এ-সময় তিনি প্রার্থনা করেছেন: "চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মধ্যে যেন কোন দাগ না থাকে।"[১৩] উত্তরকালে স্ত্রীভক্তদের এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "সে সব কি দিনই গিয়েছে মা। জোছনা-রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত ক'রে বলেছি, 'তোমার এই জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল ক'রে দাও।'"[১৪] উত্তরকালে তিনি যে শতসহস্রের জননী হবেন, জননীকে সন্তানের চোখে পবিত্রতা থেকেও পবিত্রতাস্বরূপিণী হ'তে হয়। শ্রীশ্রীমা আজন্ম তাই-ই ছিলেন, তবুও তাঁর এই প্রার্থনা লোকশিক্ষার জন্য। সমাজ-সংসারের ভিত্তিমূলে এর বড় প্রয়োজন। নৈতিক সভ্যতার দৃঢ়মূল এখানেই! তাঁর জীবনের অপূর্ব নির্বাসনা, নিষ্কলুষতা, ধ্যানতন্ময়তা, ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ, সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে ইষ্টপথে অগ্রসর হওয়া—এ-সবগুলিই অমূল্য অবদান এবং এগুলি সমাজ-জীবনের অমূল্য সম্পদও।* [ক্রমশঃ]

১৩ ঐ, ১।৩২১ ১৪ ঐ, ১।১৪৩

* ১৭ই মে ১৯৮১, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।—সঃ

ভ্রম-সংশোধন

চৈত্র, ১৩৮৮ সংখ্যায় পৃ: ১৩৫, উত্তরার্ধের ৯ম পঙ্‌ক্তিতে 'পুরুলিয়া প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের' স্থলে 'পুরুলিয়া (বাঁকুড়া) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের' এবং ১১শ পঙ্‌ক্তিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব' স্থলে 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব' হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৭

শ্রীমাতে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রকাশ

শ্রীমাকে জগতে বিভাসিত করার সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ একটি স্বপ্ন-সম্ভাবনা মায়ের কাছেই যেন শ্রীঠাকুর গচ্ছিত রেখে গিছলেন। পরে এ প্রকাশটি আমরা তাথ্যিক ও তাত্ত্বিকভাবে মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি।

জনৈক উৎসুক ভক্ত একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন; কিন্তু এবার আপনাকে রেখে ঠাকুর পূর্বে চলে গেলেন কেন?" তদুত্তরে মা বললেন: "বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। এই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"[৮৫]

প্রশ্নটি কিন্তু করা হয়েছিল অবতারের দিব্য কর্ম সম্বন্ধে। জবাবে মা যা বললেন, তার অন্য যে কোন তাত্ত্বিক অর্থ করা যাক না কেন, একটি সরল ও স্পষ্ট অর্থ এই যে, শ্রীঠাকুর মাকে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিকাশার্থে রেখে গিছলেন।

শ্রীমা এমন সহজভাবে কথাটি বললেন: "বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতে প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল", যেন সকলেই এ-কথাটি জানে ও বোঝে। বস্তুতঃ ঠাকুরের সম্বন্ধে শ্রীমায়ের এটি একটি বিস্ময়কর মৌলিক তত্ত্ব-প্রকাশ।

শ্রীঠাকুর নিজ অনুভূতিতে পেয়েছিলেন: ব্রহ্ম-শক্তি অভেদতত্ত্ব; পরমাত্মা ব্রহ্মতত্ত্ব; ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব; রামকৃষ্ণ অবতার-পুরুষ তত্ত্ব। আরও অনেক তত্ত্ব। এই সব তত্ত্বানুভূতির সামগ্রিকতার মধ্যে একটি গহন তত্ত্ব এই ছিল যে, কোন্ সময় থেকে যে তিনি ভবতারিণীর যন্ত্রত্ব থেকে তাঁর আত্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা অনির্দেশ্যই ছিল! যন্ত্রত্ব ও আত্মত্ব দুটো অবস্থাই হয়তো বা সমান্তরালভাবে তাঁর আন্তর জীবনে দিব্য স্রোতের মতো প্রবাহিত থাকত। ভবতারিণী যখনই শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ ক'রে তাঁর মাধ্যমে আপন লীলাবিস্তার করেছেন, তাতে জগন্মাতারই নিজস্ব ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সম্পূর্ণ অহংশূন্য ঠাকুরের অন্য কোন ভাবই আর স্থায়ী হ'তে পারত না। ঠাকুরের এই অবস্থাটিকেই বুঝিবা শ্রীমা তাঁর "জগতে প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব" ব'লে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে শ্রীমার ভূমা-সংহিত অন্তরে জগতের সঙ্গে প্রত্যেক ও প্রত্যেকের সঙ্গে ঠাকুরের মাতৃভাবটি কেমন কুসুমের সঙ্গে সৌরভের মতো সহজ-সমন্বিত হ'য়ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হ'ল।[৮৬]

---

৮৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১০৬

৮৬ স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের ভাবমুখে থাকার সংবেদটি যে অপূর্বভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতেই হয়তো বা আমরা শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে মায়ের এই উদ্ধৃত উক্তিটির মরমিয়া অনুরণনটি পেয়েছি। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন:

"এইরূপে ভাবময় ঠাকুর ভাবমুখে থাকিয়া স্ত্রীর কাছে স্ত্রী ও পুরুষের কাছে পুরুষ হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের সকল ভাব ঠিক ঠিক ধরিতেন। আমাদের কাহারো কাহারো কাছে এ-কথা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত (স্বামী প্রেমানন্দজীর মাতা-ঠাকুরাণী) আমাদিগকে বলিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিতেছেন, 'লোকের দিকে চেয়েই—কে কেমন বুঝতে পারি, কে ভাল কে মন্দ, কে সুজন্মা, কে বেজন্মা, কে জ্ঞানী, কে ভক্ত, কার হবে,

আর যে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রতিভাত হ'ল শ্রীমায়ের এই আপ্ত-বাক্য থেকে সেটি হচ্ছে এই : ঈশ্বরের যে মাতৃভাব শ্রীঠাকুরে প্রকাশিত হয়েছিল, সে মাতৃভাব বিকাশের জন্য শ্রীমাকে রেখে যাওয়া। বিশেষভাবে প্রকাশ করাকেই বিকাশ-করা বলে।

ধর্মসংস্থাপন ব্যাপারে এর চেয়ে গুরুতর দায়িত্ব কারো স্কন্ধে ন্যস্ত হ'তে পারে—এ-কথা ভাবা যায় না। ধর্মের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এ-রূপ আর দেখা যায়নি। আর কী অপূর্ব পূর্ণতাঢ্যতায় ও অবলীলায় মা এ-দায়িত্ব সুসম্পন্ন ক'রে রেখে গেলেন!

ষোড়শী-পূজার সময়ে দেবী সারদা ও পূজারী রামকৃষ্ণের যে একাত্মিত্বভিত্তিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল, সে অনুভূতির আলোকে পরবর্তী-কালে শ্রীমা উক্তি করেছেন: "যেই ঠাকুর, সেই আমি।"[৮৭] রামকৃষ্ণও ঘোষণা করেছেন: "এ জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!"[৮৮]

মা যে ঠাকুরের কাছ থেকে এই ভাবে-ভাষায় স্পষ্ট আদেশ পেলেন: "...তোমায় অনেক কিছু করতে হবে।"[৮৯]; "ভাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল বিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"[৯০]; "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।"[৯১] —এতে হ'ল ঠাকুরের কাছ থেকেই শোনা যে, তাঁর ধর্মসংস্থাপনের "ইষ্টপথে" মায়ের আগামী ভূমিকা-সাহায্য কত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সাহায্য-ভূমিকা কিভাবে প্রবর্তিত ও বিবর্তিত করতে হবে, সে সম্বন্ধে ঠাকুরের নির্দেশ মা যে-রূপ বুঝেছিলেন তাঁর নিজের জীবনব্রত রূপে, সে সম্বন্ধেই মা বললেন: "বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন

"এ আর কি করেছে? তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে।" ঠাকুরের এই উক্তি-আদেশের তাৎপর্য এই নয় কি যে, শ্রীমায়ের জীবনব্রত হবে ঠাকুরের জীবনব্রতেরই ছেদহীন

কার হবে না (ধর্মলাভ)—সব জানতে পারি; কিন্তু বলি না—তাদের মনে কষ্ট হবে, তাই!' ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাঁহার নিকট সদা সর্বক্ষণ ভাবময় বলিয়াই প্রতীত হইত। বোধ হইত—স্ত্রী-পুরুষ, গরু-ঘোড়া, কাঠ-মাটি সকলই যেন বিরাট মনে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টি-রূপে উঠিতেছে, ভাসিতেছে—আর ঐ ভাবাবরণের ভিতর দিয়া অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোথাও অল্প, কোথাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত রহিয়াছে; আবার কোথাও বা আবরণের নিবিড়তায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে! আনন্দময়ীর নিষ্কলঙ্ক মানস-পুত্র ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে স্বেচ্ছায় শরীর-মন, চিত্তবৃত্তি, সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সমাধিবলে অশরীরী আনন্দ-স্বরূপ-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় পৌঁছিয়া জগন্মাতার অন্তরূপ ইচ্ছা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত অনির্বচনীয় অবস্থায় লীন আপনার মনকে জোর করিয়া আবার বিদ্যার আবরণে আবরিত করিয়া নিয়ত মা-র আদেশ পালন করিতে থাকিলেন! অনন্তভাবময়ী জগজ্জননীও ঠাকুরের প্রতি প্রসন্না হইয়া ঠাকুরকে শরীরী করিয়া রাখিয়াও একত্বের এত উচ্চপদে তাঁহার মনটি সর্বক্ষণ রাখিয়া দিলেন যে, অনন্ত বিরাট মনে যত কিছু ভাবের উদয় হইতেছে, তৎসকলই সেখান হইতে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সর্বকালে অনুভূত হইত এবং এতদূর আয়ত্তীভূত হইয়া থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত—যিনিই মাতা তিনিই সন্তান এবং যিনিই সন্তান তিনিই মাতা—'চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম!'"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, (১৩৭২), গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৭-৩৮

৮৭ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৮৯   ৮৮ তদেব, পৃঃ ১২৭

৮৯ তদেব, পৃঃ ১৩৩   ৯০ তদেব, পৃঃ ১৩৪   ৯১ তদেব, পৃঃ ১৩৪

সম্প্রসারণ? আর এই সম্প্রসারণের ধারাটি হবে ঠাকুরেরই জীবনে প্রকাশিত ঈশ্বরের মাতৃভাবের বিকাশ।

ঈশ্বরের উদ্ধার-শক্তি প্রকাশে লক্ষিত দুটি ভাব:—পিতৃভাব, মাতৃভাব। এই ভাব-দুটি ঠিক পুরুষ-স্ত্রী বিভেদাত্মক নরত্বারোপমূলক নয়—ভগবানের কল্যাণশক্তির দুটি ঘরোয়া ভাব-প্রকাশ।

এই দুটি পারস্পরিক পরিপূরকভাবে বিধৃত হ'য়ে জীব আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রমে পূর্ণতা লাভ ক'রে ধন্য হয়।

পিতা পালন করেন, শাসন করেন, আশ্রয় দেন: মাতা লালন করেন, দোলনায় দোলান, তোষণ করেন, প্রশ্রয় দেন। সাধকের শাসন-তোষণ, আশ্রয়-প্রশ্রয় দুটিই চাই। সাধকের যদি শুধু শাসন মিলে, তোষণ যদি না মিলে; যদি মিলে আশ্রয়, না মিলে প্রশ্রয়—তার জীবন হয় দুর্বিষহ।

পিতার শর্তে ও সময়ে সন্তানের তাঁর কাছে যাওয়া-থাকা। পিতার শর্ত ও অনুশাসন না মানলে এমনকি ত্যাজ্যপুত্র হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু মাতার কোন শর্ত নেই। শর্ত সন্তানের। মাতার নিজের কোন সময় নেই। সময় সব সন্তানের। সন্তান মাঝরাতে চিৎকার শুরু করতে পারে। মাকে উঠতে হবে, অনেক ক'রে তাকে শান্ত ক'রে, আবার ঘুম পাড়াতে হবে। সন্তানের সময়ে ও শর্তে মাকে তাঁর কর্ম-মর্ম নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মাতা সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন এমন বড় শোনা যায় না। "কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি।"

সকল অবতারই তাঁদের নিজেদের নির্দিষ্ট শর্তে সাধককে মোক্ষবর্ত্মে অগ্রসর হ'তে আহ্বান করেছেন:

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "তুমি সর্বপ্রকার ধর্ম ও অধর্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর; আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত ক'রব। তুমি শোক ক'রো না।"

ভগবান্ বুদ্ধ বললেন: "সত্য হোক তোমার আলোক-বর্তিকা। শুধু সত্যে মুক্তির অন্বেষণ কর। নিজের শক্তি বিনা অন্য কোন বহিঃ-শক্তিতে সাহায্য অন্বেষণ ক'রো না। অধ্যবসায় সহকারে নিজের মুক্তি অর্জনে যত্নপর হও।"

যীশুখৃষ্ট বললেন: "তোমার নিজের ক্রুশ-খানি নিজের কাঁধে বয়ে আমার অনুসরণ কর। মৃতেরা মৃতের সৎকার করুক। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ক'রো না।"

এই হ'ল সাধকের প্রতি ভগবানের চিরকালের পিতৃভাবের অশনি-আহ্বান।

অবতারভাবে সাধকের প্রতি এই প্রভু-পিতৃ-ভাব প্রয়োগে যে রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পারংগম ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর শিক্ষায় রয়েছে:

"কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না।"[১২]

"ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু, এ-বোধ না হ'লে শুদ্ধা ভক্তি হয় না।"[১৩]

"ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; তাই এত কর্মভোগ"[১৪]

সকল অবতারপুরুষকে মানুষের উপর ধর্মের তাত্ত্বিক দিকের শাশ্বত আধ্যাত্মিক দাবীগুলি নির্লিপ্ত ও নির্মমভাবেই প্রকাশ করতে হয়।

উপনিষদ্ এই সত্যের ভিত্তিটি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, (১৩১৩), পৃঃ ১৪৮
১৩ তদেব, ৫ম ভাগ, (১৩১৫), পৃঃ ২০২
১৪ তদেব, ১ম ভাগ, (১৩৮২), পৃঃ ১৫৮

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ ॥
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥[১৫]

"এই ব্রহ্মেরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়; ভয়ে সূর্য উদিত হন; ইঁহারই ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় যম স্ব-স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন।"

এটি হ'ল ধর্মের পিতৃভাব। সাধককে সাধনার পরিমণ্ডলে নিজ অক্ষরেখায় স্বধর্ম-নিরত রাখতে ভগবানের পিতৃভাবের শাসন-অনুশাসন বড়ই প্রয়োজনীয়। যাঁরা শাশ্বত ধর্মগোপ্তা, তাঁরা এ-বিষয়ে অসত্য, অজ্ঞান বা দুর্বলতার সঙ্গে কোন আপস-মীমাংসার কথা ভাবতেই পারেন না।

তাঁদের এ-কথা বলতেই হয়; ধন্য শুদ্ধচিত্ত-ব্যক্তি, কারণ তাঁর ঈশ্বর দর্শন হবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, ভগবানের অবতার নির্লিপ্তভাবে তত্ত্বকথা বলেই চলে যান না। ঐ-সব কথা শাস্ত্রে তো যথেষ্ট রয়েছে। তিনি আসেন এমন এক ঈশ-ব্রত উদ্‌যাপন করতে, যা শুধু আইনের দ্বারা সম্ভব নয়।

অবতার এ-বিষয়ে বিশেষভাবেই অবহিত থাকেন যে, নির্লিপ্ততায় তাঁর ঈশ-কর্ম উদ্‌যাপিত হ'তে পারে না। তা যদি হ'ত, তবে তাঁর অবতরণের প্রয়োজন থাকত না। তিনি লিপ্ত হতেই আসেন!

যারা শুদ্ধচিত্ত নয়, এমন লোকের সংখ্যাই তো পৃথিবীতে বেশী। শাস্ত্রের রাঙা চোখ দেখলেই তারা শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে যায় না। তাদের কাছে বসতে হয়। তাদের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলতে-শুনতে হয়। তাদের পেটে অন্ন পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হয়। তাদের পীড়ায় সেবা করতে হয়। তাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তাদের ব্যভিচার উপেক্ষা করতে হয়। তাদের এই অনুভূতি দিতে হয় যে, তাদের অশেষ দৌর্দণ্ডকে উপেক্ষা ক'রে তাদের ভালবাসতে পারে—এমন দরদী আছে। এমন প্রেমী আছে যে, প্রতিদানের প্রত্যাশা না ক'রে ভালবাসে। সর্বস্ব, এমন কি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও তাদের উদ্ধার করবার ব্রতধারী নিঃস্বার্থ জন আছেন, যিনি পতিতের, আর্তের, আশাহীনের জন্যই যেন জীবন ধারণ করেন।

এই প্রয়োজনের দিকটা ভগবানের যে-ভাব ধারণ-পোষণ করে, সেটিকে বলা চলে ভগবানের মাতৃভাব।

শ্রীঠাকুরে এই ভাবের অত্যাশ্চর্য বিকাশ আমরা দেখতে পাই। তবে সাধনোত্তর কালে ধর্ম-সংস্থাপনে ব্রতী হ'য়ে ভগবানের পিতৃভাবটি প্রকট করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীমা যখন শ্রীজগদম্বার নিয়োগে ধর্মসংস্থাপন ব্যাপারে ঠাকুরের সহায়িকা হ'তে দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তখন ভগবানের মাতৃভাব প্রকাশ-বিকাশের দায়-দায়িত্ব অতি স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমায়ের স্বকীয় কর্মভাগে এল, যদিও কোন প্রকার পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এটি হয়নি।

তবে এ-সত্যটির অবধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, শ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের ঈশ-কর্মের পারস্পরিকতা নিরূপণে উভয়ের মাঝে আপাত-ভিন্নতাবোধের চেয়ে সত্যিকারের অভিন্নতা বোধই বেশী সহায়ক। তাঁদের পারস্পরিকতার প্রধান আশয় হচ্ছে ঈশ্বরের মাতৃভাব

আর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের যে মাতৃভাব, এটি কোন বৌদ্ধিক বিচার দ্বারা উপার্জিত ভাব নয়। এটি হৃদয়ের উপচে-পড়া অনৈচ্ছিক স্বগতভাব। নিজের ভেতরকার মাতৃভাবকে অস্বীকার করা বা চেপে-রাখা ঠাকুরের স্বভাবানুগ না হলেও তিনি তাঁর ভেতরকার মাতৃভাবের আত্যন্তিক প্রবণতাকে ভাবশৃঙ্খলার মধ্যেই যেন রাখতে চেষ্টিত ছিলেন। এ-সম্বন্ধে তাঁর কোন কোন

১৫ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৮

উক্তিতে ইঙ্গিত আছে :

"…এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন।…

"কুঠীর উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।' দ্যাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে !"[৯৬]

"এর ভেতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।"[৯৭]

তাঁর অন্তরে স্বয়ং অবস্থিতা থেকে ভবতারিণী ঠাকুরের দ্বারা এই যে 'কাজ করছেন', এটি তাঁর মাতৃভাবের মূল কথা। এই ভাবেরই অন্য একটি প্রকাশে জীবকারুণ্যের যে মধু ক্ষরিত হচ্ছে, তার তুলনা ভক্তিশাস্ত্রে দুর্লভ :

"ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—'ওঁ, ওঁ, ও—মা আমি কি বলছি ! মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ ক'রো না—মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে !—ভয়-তরাসে।—আমার মা চাই—ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার। ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাও গে। আনন্দময়ী ! আনন্দময়ী !"[৯৮]

পুনশ্চ :

"ঠাকুর ছোট্ট খাটটির উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সর্বদাই ভাবে পূর্ণ। ভাবচক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইলেন ; অঙ্গে পুলক হইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন ?

"দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঘরের মধ্যস্থ ভক্তেরা অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন করিতেছেন।

"কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয় ? যত এগিয়ে যাবে, ততই ঐশ্বর্যের ভাগ কম পড়ে যাবে।"[৯৯]

রাখালকে অবলম্বন-নিমিত্ত ক'রে শ্রীঠাকুরে ভগবানের যে দুর্বার মাতৃভাবের স্ফূর্তি হয়েছিল, তাকে যে দৃঢ়মুষ্টিতে ঠাকুর সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, সে কি নিজের মাঝে ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মাতৃভাবের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ?

এ ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন তিনি যে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন, তার প্রমাণ কথামৃতে রয়েছে :

"কিয়ৎক্ষণ পরে (ঠাকুর) মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকেদের চৈতন্য হ'ত।' ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন।

"ঠাকুর আবার বলিতেছেন—'তা রাখবে না।'

"ভক্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, 'তা রাখবে না,—সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে। একে কলিতে ধ্যান জপ নাই।"[১০০]

একদিকে সবাইকে সব কিছু দিয়ে দেবার মাতৃ-আকুতি, অন্যদিকে ধর্মসংস্থাপনে ভারসাম্য

৯৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, (১৩৭৩), পৃঃ ২৪০

৯৭ তদেব, পৃঃ ২৪১ ৯৮ তদেব, পৃঃ ৬৪ ৯৯ তদেব, পৃঃ ৫

১০০ তদেব, ৩য় ভাগ, (১৩৭৪), পৃঃ ২৫০

রক্ষার পিতৃ-দায়িত্ব।

যদিও তিনি এই যুগে ভগবানের মাতৃভাব বিকাশের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা স্বতই অনুভব করেছিলেন, সে-ভাব নিজেতে কিছু প্রকাশ ক'রে বিকাশের মুখ্য দায়িত্বটি শ্রীমায়ের জন্ত রাখলেন, কারণ, জানতেন শ্রীমা এই ব্রত নিয়েই তাঁর জীবনের পরিপূরিকা উত্তরসাধিকা হয়েই আবির্ভূ'তা হয়েছেন। [ক্রমশঃ]

রাতের পৃথিবী

শ্রীমোক্ষদারঞ্জন সেনগুপ্ত

রাতের পৃথিবীকে কখনও দেখেছ ভাল ক'রে ?
অভ্যস্ত চারদিকের সবকিছু কী অনন্য শোভা ধরে।
দেখেছ অন্ধকার আকাশে অজস্র
রূপোর চুমকি সম উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা ?
ছায়াপথ ?—আকাশের অনেক স্থান জুড়ে যেন
বিছানো সাদা তূলা।
দেখেছ নীল নভে পূর্ণিমার চাঁদকে অন্য চোখে—
যা হ'তে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ে ধরণীর বুকে ?
ঘোর অন্ধকারে অমাবস্যা রাতের রূপ—
কালোয় কালো কিবা অপরূপ।
গিয়েছ কভু গভীর রাতে নদীর ধারে,
দেখতে দুপারের গাছ-গাছালিতে কত রূপ ধরে ?
শুনেছ রাতের নদীর বুকে সে কী কলধ্বনি,
নিভৃতে সাগর-সঙ্গমে যাওয়ার হাতছানি।
দেখেছ কভু নিশীথ রাতের শ্মশান,
জীবনের কোলাহলমুক্ত সে শান্তির স্থান ?
যে মাটির মার কোলে রয়েছে শায়িত
জানা-অজানা শিশু-বৃদ্ধ-যুবা অগণন ;
অমর আত্মার শান্তির তরে
দুফোঁটা অশ্রু ক'রো বিসর্জন।
যেও সাহসভরে রাতের পৃথিবীকে দেখতে
সময় ক'রে যেও—এ পৃথিবীর গোপন কথা শুনতে ;
দেখবে রাতের গহনে কী অপূর্ব সবকিছু দেখায়,
শুনবে কী গভীর মর্মকথা।
এ মাটির মা কত কী শোনায়।

সমালোচনা

রামায়ণ-সমীক্ষা : জীবন ও দর্শন—ডঃ স্বস্তিকা দত্ত। প্রকাশিকা : শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত, ২৫।১৬৭ পি. জি. এম. শাহ্ রোড, কলিকাতা-৪৫। (১৯৭৯), পৃষ্ঠা ২২+২৪৪, মূল্য : ত্রিশ টাকা।

"'রামায়ণে'র সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে", রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। এর নায়ক রামচন্দ্রের মধ্যে আমরা আদর্শ মানুষের প্রতিচ্ছবি পাই আর সেটাই 'রামায়ণে'র প্রধান গৌরব। বাল্মীকি যখন তাঁর মহাকাব্যের জন্য উপযুক্ত নায়কের সন্ধান করছিলেন, তখন তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্ একটিমাত্র মানুষকে আশ্রয় ক'রে সমগ্রা লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করেছেন?' এর উত্তরে নারদ বলেন, দেবতাদের মধ্যে এত গুণযুক্ত কাউকে দেখা যায় না, তবে একমাত্র নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের মধ্যে সমস্ত গুণের সন্নিবেশ ঘটেছে। রামায়ণ এই বিরাট পুরুষের মহিমান্বিত মহাকাব্য।

এ-ধরনের জাতীয় মহাকাব্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য যে সশ্রদ্ধ মানসিকতার প্রয়োজন গ্রন্থকর্ত্রী ডঃ স্বস্তিকা দত্তের তা আছে; এর সঙ্গে আছে অনুসন্ধিৎসা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি নিপুণ গবেষকের অন্যান্য গুণ। তাঁর বিশ্লেষণ-শক্তিও প্রশংসনীয়। গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত-অংশে রামায়ণের উদ্ভব ও করুণরস আলোচনা করা হয়েছে। একই অধ্যায়ে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এবং সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বিশদভাবে আলোচিত হয়নি; আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হবে। ভালো গবেষকের কাছে সাধারণতঃ তথ্যপঞ্জীর অতিরিক্ত কিছুর জন্য আমাদের প্রত্যাশা থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'রামায়ণে উপনিষদের আদর্শের ক্রমবিকাশ'। গ্রন্থকর্ত্রী মনে করেন, উপনিষদর্থই 'রামায়ণে' ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত এবং 'রামায়ণে'র অধিকাংশ চরিত্রের কাছেই প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয় বেশী বরণীয়। বাল্মীকির মহাকাব্যে উপনিষদের মন্ত্রসমূহের সমপর্যায়ের বেশ কিছু শ্লোকের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। দার্শনিক-চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত শ্লোকগুলিকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—(১) ব্রহ্মস্বরূপ, পরমেশ্বর, (২) নিষ্কাম কর্ম, বিহিত কর্ম, শুভ কর্ম, ঈশ্বরার্পণ কর্ম, কর্মফল অপরিহার্য, (৩) জগতের অলীকত্ব ও নশ্বরত্ব, (৪) কালই পরমেশ্বর, কালের প্রভাব, নিয়তি, দৈব, বিধি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় 'রামায়ণের জীবনাদর্শ'। এই প্রসঙ্গে আদর্শ রাষ্ট্রীয় নীতির কথাও এসেছে। আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ দেখানোর জন্য কয়েকটি চরিত্র (রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, সীতা, মন্দোদরী) বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। চরিত্রবিশ্লেষণে পুনরুক্তি কি সত্য-সত্যই 'অপরিহার্য'? গবেষণাত্মক নিবন্ধকে গ্রন্থের রূপ দেওয়ার জন্য আর একটু যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে বনবাসের প্রথম রাত্রিতে রামের বিলাপ, সীতা-নির্বাসন, বালিবধ, সীতার স্বর্ণমৃগের প্রতি লোভ ও লক্ষ্মণের প্রতি কঠোর বাক্যপ্রয়োগ, কৈকেয়ী-কর্তৃক রামের নির্বাসন-প্রার্থনা প্রভৃতি কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এখানে লেখিকার মৌলিক চিন্তাশক্তির নিদর্শন আছে।

'রামায়ণ'-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিশ্রুত উক্তিগুলির সহিত লেখিকার আর একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাঞ্ছনীয় ছিল। ভূমিকায় তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের যে একটি ভূমিকা

লিখেছিলেন, সে-সম্পর্কে কি তিনি অবহিত আছেন? 'উপেক্ষিতা' উর্মিলাকে তিনিও উপেক্ষা করেছেন। 'তপোবন' প্রবন্ধটিও তাঁকে পড়তে অনুরোধ ক'রব। (এটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা গবেষণামূলক গ্রন্থে থাকা দরকার, আর দরকার উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং পাদ-টীকায় বঙ্গানুবাদ।

সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত এই গ্রন্থটি বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে একটি মূল্যবান্ সংযোজন।

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সবার পিছে সবার নীচে—মনকুমার সেন। প্রকাশক: শান্তিরঞ্জন দাস, আনন্দ ভবন, ১৮ আনন্দগড়, কলকাতা-৭০০০৫৬। (১৩৮৬), পৃ: ১১৪+৬; মূল্য: ছয় টাকা।

গান্ধীবাদী দর্শনের প্রবীণ ভাষ্যকার মনকুমার সেন রচিত পুস্তকটি মোট কুড়িটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। লেখক প্রধানতঃ গান্ধীজীর সমাজ-দর্শন ও অর্থ-নৈতিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ভারতীয় জীবনের সঙ্কটের মূলসূত্রটি উপস্থিত করেছেন। "ভারতের গ্রাম না বাঁচলে ভারত বাঁচবে না, জগতে ভারতের যে ব্রত রয়েছে তা লুপ্ত হ'য়ে যাবে"—গান্ধীজীর এই ঘোষণাকে অবলম্বন ক'রে লেখক বর্তমান অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, এমন কি ভারতীয় সংবিধানেরও ত্রুটি বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি এবং ভারতের বৈষয়িক উন্নতি প্রধানতঃ সহরমুখী ভারতের মূল শক্তি-উৎস গ্রামগুলি অবহেলিত—তাই আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ক্রমশঃ প্রকট হ'য়ে উঠছে। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ সত্ত্বেও 'রামা কৈবর্ত ও শেখ হাসিম' তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আজও অন্ধকারের অতলে—লেখক এই কথাই সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করেছেন

দুটি প্রবন্ধে লেখক গান্ধী-ভাবনার উত্তরসূরী আচার্য বিনোবাভাবের কর্ম-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নৈকট্যলাভের বর্ণনা দিয়েছেন। অপর দুটি প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সমাজবাদী চিন্তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। "ভারতীয় মৃত্তিকার গুণানুযায়ী সমাজের শেষতম মানুষটিকে সর্বপ্রথম স্থান দিয়ে সমাজবাদের নতুন রূপরেখা স্থাপন করতে হবে"—লেখক সুভাষচন্দ্রের সমাজবাদের হিসাবে এই আদর্শকে গ্রহণ ক'রে আচার্য বিনোবাভাবের সঙ্গে তাঁর চিন্তা-সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখক আমেরিকা ভ্রমণকালে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, শিকাগো ও সানফ্রান্সিসকোর বেদান্তকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। এগুলি পরিদর্শনকালে স্বভাবতই লেখকের মনে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর অনুবর্তী সন্ন্যাসিবৃন্দের মানবসেবামূলক কার্যাবলী রেখাপাত করেছিল। একটি প্রবন্ধে লেখক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করেছেন এবং ভারতবাসী হিসাবে তাঁর গৌরবের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। লেখকের শ্রদ্ধাবনত চিত্তের পরিচয় ফুটে উঠেছে—দার্শনিক-পণ্ডিত, সঙ্গীত-বিশারদ, মানবপ্রেমিক অ্যালবার্ট সোয়াইৎজারের জীবন সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনায়।

প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বিচ্ছিন্ন হলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত রচনাগুলির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র রক্ষা করেছে। স্বচ্ছন্দ ভাষা ও স্বচ্ছ চিন্তা শ্রীসেনের প্রবন্ধগুলিকে চিন্তার গভীরতা সত্ত্বেও সুখপাঠ্য করেছে। প্রচ্ছদে প্রখ্যাত শিল্পী মুকুল দে অঙ্কিত চিত্রটি পুস্তকটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

গুরু-মাহাত্ম্য: ভাষ্য ও সঙ্গীতে (স্বরলিপিসহ)—দিব্যানন্দ। প্রকাশক: শ্রীকমল গুহ, ১৫ চণ্ডী বোস লেন, কলিকাতা-১০। (১৯৭৯), পৃ: ৪৮, মূল্য: তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

"সচ্চিদানন্দই গুরু। যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই ঐরূপ ধারণ করেছেন।" "মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুতত্ত্বের উপদেশ 'দিব্যানন্দ'-রচিত 'গুরু-মাহাত্ম্য' নামক পুস্তিকাতে পনেরোটি গানের মধ্যে রূপায়িত। প্রত্যেকটি গানের কথা সুললিত, ভাষা স্বচ্ছন্দ। গানগুলির শেষে এক-একটি ক'রে রয়েছে ভাষ্য। ভাষ্যগুলিতে সহজ সরল শব্দে গুরুতত্ত্বের কঠিন অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন লেখক।

পুস্তিকার প্রথম গান শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'শ্রীগুরুস্তবাষ্টক' দেওয়াতে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পুস্তিকাটিতে দুটি বিভাগ—(১) গান ও ভাষ্য এবং (২) গানগুলির স্বরলিপি।

তবে গানগুলির মধ্যে কয়েকটি সংযোজন ও বিয়োজন করলে পুস্তিকার আরও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাবে। যেমন, দুই নম্বর গানে সপ্তম লাইনে 'দুখ' তে 'বিসর্গ' দিলে ঐ লাইনটি গায়কের ও শ্রোতার মনে দাগ কাটে। ছয় নম্বর গানে নবম লাইনে 'এ' বাদ দিলে ছন্দের মিল হয়। পুস্তিকার মধ্যে যে-সব শাস্ত্রীয় শ্লোক ও শ্রীশ্রীগুরুগীতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলির 'আকর নির্দেশিকা' দিলে ভাল হয়। অষ্টম পৃষ্ঠায় 'গুরুর ধ্যানে' 'গুরুম্' এবং 'বিগ্রহম্'-এর পরিবর্তে যথাক্রমে 'গুরুং' এবং 'বিগ্রহং' হবে। ধ্যানের দ্বিতীয় লাইনে 'শ্বেত-গন্ধানুলেপনম্'-এর পাঠান্তর আছে। [দ্রষ্টব্য : শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি, উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৬৯), পৃষ্ঠা আঠারোতে "শ্বেতমাল্যানুলেপনম্"]। আট নম্বর গানের ভাষ্যতে গীতা (৪।৩৪) থেকে উদ্ধৃত 'উপদেক্ষন্তি'-এর পরিবর্তে 'উপদেক্ষ্যন্তি' হবে। গানগুলি এবং স্বরলিপিতে গানের রাগ ও তাল দেওয়া থাকলে সঙ্গীত-চর্চাকারীদের যেমন সুবিধা হয়, তেমনি নবীন শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হন।

সর্বোপরি লেখকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে স্বাগত জানাই এবং পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

Reincarnation and Immortality : By Swami Paramananda. Published by Sri Ramakrishna Math, 11 Ramakrishna Math Road, Madras-600 004. First Indian Edition, 1980. pp. 100. Price : Rs. 3·00.

স্বামী পরমানন্দের 'Reincarnation and Immortality' শীর্ষক পুস্তিকাটির প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। স্বামী পরমানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য। উত্তরাধিকার সূত্রে গুরুর চিন্তার স্বচ্ছতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের গভীরতা অনেকাংশে প্রতিফলিত দেখা যায় স্বামী পরমানন্দের রচনার মধ্যে। আলোচ্য পুস্তিকাটিতেও তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে।

পুস্তিকাটির মধ্যে ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে : Life Hereafter, Karma and Fate, Harvest Field of Life, Law of Our Destiny, Overcoming Fear of Death, Reincarnation and Immortality. শেষোক্ত প্রবন্ধটির নামানুসারে পুস্তিকাটির নামকরণ করা হয়েছে। যে মূল বিষয়গুলিকে কেন্দ্র ক'রে হিন্দুর দর্শন ও ধর্মচিন্তা গড়ে উঠেছে সেগুলি খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের সূচনায় উপনিষদ্, গীতা অথবা মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রাদি থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থকার আলোচ্য প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে

ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন ; আবার ঐ উদ্ধৃতিগুলির পাশাপাশি বাইবেল অথবা ভারতের বাইরের বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ ও চিন্তানায়কদের রচনা থেকে উদ্ধৃতিও সাজিয়ে দিয়েছেন। এতে প্রবন্ধগুলির বক্তব্য আরও আকর্ষণীয় হয়েছে।

শুধু তত্ত্বকথা আলোচনাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। আধ্যাত্মিকতাই যে মানুষের পরমতম সম্পদ ও ঐশ্বর্য সে-কথা তিনি নানাভাবে বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন। বর্তমান পুস্তিকার মধ্যে যে পরম ইতিবাচক বাণীটি তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা তাঁর নিজের ভাষাতেই উল্লেখ করি : "What may seem tragic in our life at one time has its counterpart in another expression of the same life. If we can learn to wait our turn with ungrudging patience and watchful vigil, we shall find to our amazement how the long and short days of summer and winter are but pleasant pastimes for our soul, to renew and refresh her."

গ্রন্থকারের সহজ সাবলীল ভাষার একটি অনিবার্য আকর্ষণ আছে। এমন অজস্র বাক্যই তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছড়ানো রয়েছে, যেগুলির মধ্যে প্রবাদবাক্যের ছন্দোময় মাধুর্য, ধ্বনিময় গাম্ভীর্য এবং দ্ব্যর্থহীন হ্রস্বতা আমাদের চমকিত করে। কখনও কখনও সেগুলি বেকনের বাক্য-রচনাশৈলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ ভালই এবং কাগজ ও মুদ্রণমূল্যের সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বগতির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যও বেশী নয়।

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে: (১) উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগ ও মালদায় পুনর্বাসনকার্য যথারীতি অব্যাহত আছে।

(২) আসাম—ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ (১৯৮২): কাছাড় জেলায় শিলচরে ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত নরনারীকে শিলচর কেন্দ্রকর্তৃক প্রাথমিক সাহায্য শুরু করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে: দুইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্ত্র-বিতরণ, তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা চলিতেছে।

রাষ্ট্রপতির বেলুড় মঠ পরিদর্শন

গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৮২, সন্ধ্যায় ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডী সপরিবারে বেলুড় মঠ দর্শন করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সস্ত্রীক তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসক-আবাস উদ্বোধন

গত ২৮শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে চিকিৎসকদের জন্য নবনির্মিত আবাসিক ভবনের উদ্বোধন-কার্য অনুষ্ঠিত হয়।

শিশুদের বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

শিশুদের জন্য আয়োজিত ১৯৮২-র অষ্টম রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে রামহরিপুর বিদ্যালয় আদর্শ প্রতিরূপ (model) প্রদর্শনের জন্য প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। পূর্বভারত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতেও উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র জীববিজ্ঞান-প্রতিরূপের জন্য প্রথমস্থান অধিকার করিয়া 'জে. সি. বোস চ্যালেঞ্জ ট্রফি' লাভ করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

মালদহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রমের পরিচালনায় বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে গত ৯ই হইতে ১১ই এপ্রিল, ১৯৮২ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগীদের লইয়া যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। তিনি যুবসম্প্রদায়কে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নবীন ভারত গঠনের আহ্বান জানান। উক্ত সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যথাক্রমে ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও ডঃ প্রণয় কুণ্ডুর সভাপতিত্বে ভাষণ দান করেন—স্বামী বাগীশানন্দ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। ইহা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন স্থানীয় তরুণ-তরুণী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ৯ই এপ্রিল সকালে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, ক্লাব হইতে আগত তিন হাজারেরও অধিক তরুণ-তরুণী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। চিত্রপ্রদর্শনী, ছায়াছবি প্রদর্শন, ভক্তিগীতি পরিবেশন ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে উক্ত সম্মেলনকে আরও বেশী আকর্ষণীয় করিয়া তোলা হয়। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সমাজ-সেবা সংস্থা হইতে প্রায় ৫০০ জন তরুণ-তরুণী এবং প্রায় ৪৫০ জন বয়স্ক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

উৎসব

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২০শে হইতে ২২শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা, স্বামীজীর জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় এবং আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়

২০শে, বিকালের সভায় স্বামী অমলানন্দের পৌরোহিত্যে প্রধান অতিথি ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ পুরস্কার বিতরণ করেন। রাত্রে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রবৃন্দ 'ভক্ত প্রহ্লাদ' নাটকটি অভিনয় করে। ২১শে মঙ্গলারতি, স্তবপাঠ, ভজনগান, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০০ ভক্ত নর-নারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে বাউলগান পরিবেশন করেন শ্রীঋষিবর বাউল। সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রবাহ সম্মেলন' সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পর উপভোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২২শে, বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের ৮৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস

বলরাম মন্দিরে ১লা মে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে বলরাম মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ বলেন, জাতি ও ধর্মের বিভেদ একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথেই দূর হইতে পারে। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর উক্তি উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই জগতে শান্তি আনিতে পারে। তাঁহার ভাষণের পর স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন, বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের পিছনে আছে একটি বিরাট শক্তি। যতই দিন যাইতেছে দেশ-বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার সম্প্রতি ইউরোপ সফরের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী গহনানন্দ বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত আছেন। রাশিয়ার বিদ্বৎ-সমাজও শ্রীরামকৃষ্ণের উদার বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ধর্মান্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তিনি আরও বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সাফল্য শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর উপরই নির্ভর করে না, এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও অনুরাগীদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য তিনি ভক্তদের বিশেষ আহ্বান জানান।

পরিশেষে ব্রহ্ম-সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত-নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

উদ্বোধন-সংবাদ

১৮ই, ২৫শে এপ্রিল ও ৯ই মে (রবিবার) 'সারদানন্দ হলে' স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়ে বলেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ', 'মানুষ ও ভগবান্' এবং 'এক ও বহু'।

২৮শে এপ্রিল শ্রীশঙ্করাচার্য এবং ৭ই মে শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়।

সন্ধ্যার পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ অন্যান্য রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী অভয়ানন্দ (আশু মহারাজ) গত ১০ই মার্চ ১৯৮২, রাত্রি ৯-১৫ মিনিটে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর। দেহত্যাগের পূর্ব সপ্তাহে তাঁহার খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণে অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় এবং জীবাণুদ্বারা শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ায় উহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার দেহান্তের কারণ হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী সেবাশ্রমে যোগদান করেন, এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বহুকাল যাবৎ বারাণসী সেবাশ্রমে কার্য করিবার পর তিনি শেষদিকে কিষেনপুর আশ্রমে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। সরল অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সবার প্রিয় ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

শিরীষ কাগজ

শিরীষ কাগজ কাঠের জিনিস পালিশ করিতে কিংবা মরিচা তুলিতে প্রয়োজন হয়। যাহারা কাঠের কাজ করে তাহাদের পক্ষে এইটির বিশেষ প্রয়োজন। তৈয়ারী করিতে বেশী খরচ হয় না—দরকার হয় মাত্র কাঁচের গুঁড়া, মোটা ও শক্ত কাগজ এবং শিরীষ-আঠা।

কাঁচের গুঁড়াগুলি মিহি জালের ছাঁকনি দ্বারা ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয় এবং নজর রাখিতে হয়, যাহাতে মোটা দানা উহার মধ্যে না আসে। শক্ত শিরীষ-আঠা অল্প জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কয়েক ঘণ্টা ভিজানোর পর আঠা আঠা হইলে উনানে বসাইয়া গলাইতে হয়। মোটা কাগজকে প্রয়োজন মতো ছোট করিয়া তাহার উপর ব্রাশ দ্বারা গলানো আঠা পাতলা করিয়া প্রলেপ দিতে হয় এবং তাহার উপর মিহি কাঁচের গুঁড়া সমানভাগে ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহার পর একটা কাঠের বেলনার সঙ্গে পাতলা কাগজ জড়াইয়া আঠা লাগানো কাগজের উপর লুচি-বেলার মতো চাপ দিলে কাঁচের গুঁড়াগুলি সমানভাবে কাগজে লাগিয়া যায়। এইবার এইটি শুকাইয়া লইলে শিরীষ কাগজ তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর, ১৯৮১]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

কোচবিহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই এপ্রিল ১৯৮২, যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনের সম্মেলনে পাঁচটি অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল, ১৪ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোচবিহার সদর ও বিভিন্ন মহকুমার বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, চিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে সম্মেলনটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রত্যহ উপস্থিত ছিল ৪০০ জন প্রতিনিধি।

পূর্ণিয়া (বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল ১৯৮২, যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী স্মরণানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়।

ফলক উন্মোচন

খুলনা (বাংলাদেশে) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্তবৃন্দ খুলনা নগরীতে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। ১লা এপ্রিল ১৯৮২, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ উক্ত জমিতে পদার্পণ করিয়া আশ্রমের ফলক 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন খুলনার অতিরিক্ত জেলা-প্রশাসক জনাব মোশাররফ হসাইন সাহেব, স্বামী অক্ষরানন্দ, স্বামী পরদেবানন্দ প্রভৃতি। এই সভায় পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা' বিষয়ের উপর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

উৎসব

কোকরাঝাড় (আসাম) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, নগরপরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভক্তিগীতি, ভক্তগণকে বসাইয়া প্রসাদ-বিতরণ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

চিত্তরঞ্জন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্রে গত ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ ১৯৮২, তিনদিন যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর শুভ জন্মোৎসব বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়া সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শেষদিনের জনসভায় স্বামী পাবনানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী ডি. কে. গুপ্ত।

নার্টিয়াং মেঘালয়ের অন্তর্গত জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলার ছোট সহরে গত ২১শে মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগারতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুশোভিত প্রতিকৃতিসহ প্রায় ৫০০ ভক্ত নরনারীর একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। মেঘালয়ের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীমাহাম্ সিং শোভাযাত্রায় যোগদান করেন এবং অপরাহ্নের জনসভায় ভাষণ দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১০০০ জন শ্রোতা।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১২৯তম শুভ আবির্ভাব উৎসব মঙ্গলারতি, স্তব, পাঠ, বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। বিকালে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হুগলী চুঁচুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সমিতির উদ্যোগে ১১ই এপ্রিল ১৯৮২, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব স্মরণোৎসব চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্নের অধিবেশনে শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ ও স্বামী অঘোরানন্দ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন। অপরাহ্নের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মস্থানন্দ। শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভক্তি-গীতি এবং 'ইমামবাজার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ' কর্তৃক নাটক 'সাধক রামপ্রসাদ' অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :

ইন্দ্রাণী পার্ক (কলিকাতা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র। **ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লী** (হুগলী) সারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। **বালুরঘাট** (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্থ। **কাঁঠালবেড়িয়া** (নদীয়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম। **পাণ্ডু** (গৌহাটি) বিবেকানন্দ পাঠচক্র। **সিঁথি** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। **বরিশাল** (বাংলাদেশ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। **নিউ বনগাইগাঁও** (আসাম) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। **দোমড়া** (বর্ধমান) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। **ভাগলপুর। পূর্ণিয়া** (বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

আফিস হইতে আসিয়া সন্ধ্যা-আহারের পর প্রায়ই শরৎ পাড়ায় বাহির হন। মা, ঠিক সেই দরজার কাছে, ঠায় বসিয়া আছেন—তা রাত্রি ১১টাই বাজুক, ১২টাই বাজুক, আর ১টাই বাজুক। যেই সদর দরজায় একটু আওয়াজ পাইলেন, মা অমনি আনন্দে দাঁড়িয়া উঠিলেন—"বাবা! এলি রে" ? যদি "বাবা"র সাড়া না পান, প্রদীপ লইয়া নামিয়া আসেন ; দেখেন সদর দরজা যে ভেজানো সেই ভেজানই রহিয়াছে, (হয়ত ইঁদুর বিড়াল বা কুকুর দরজায় কোনও রকম আঘাত করিয়া গেছে, অথবা অন্য কোন আওয়াজকেই হয়ত ভ্রমে ঐরূপ শরতের আওয়াজ মনে করিয়াছেন ;) দরজা খুলিয়া একটুখানি শুনিতে থাকেন—যদি বাবার "ফটাং ফটাং" জুতোর আওয়াজ পান। কিছুই শুনিতে পাইলেন না। আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আবার যাইয়া সেই উপরকার দরজার কাছে প্রদীপটি জ্বালিয়া বসিলেন। কেবল ছটফট ছটফট !—"তাইত গা এখনো এলো না !"

শরচ্চন্দ্র হয়ত,—কোথায় সৎসঙ্গ, কোথায় হরিনাম ; কোথায় কার ব্যারাম হইয়াছে, সেবা করবার লোক নাই, তার খানিকটা সেবা করা ; কোথায় বা কা'রো কেউ কোথাও নাই, তার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া,—কেবল এইরূপ করিয়াই বেড়াইতেছেন। শরচ্চন্দ্র যেই কাহারও বাটীতে যান, অমনি যেন তাঁ'রা যথার্থ আকাশের শরচ্চন্দ্রই হাত বাড়াইয়া পান ; শরৎকে দেখে এমনিই তাঁহাদের হৃদয় প্রফুল্ল হয় ; যেই হাসিতে হাসিতে শরচ্চন্দ্র আসিলেন, অমনি গোষ্ঠীশুদ্ধ লোকের—ফরমাজ বল, আবদার বল, যত কিছু বক্তব্য—সব শরতের নিকট হইতে লাগিল। পাড়ার সকলেই শরৎকে যেন নিজেদের ছেলের চেয়েও বেশী দেখেন। শরতের মন অতি পবিত্র, হৃদয় অতি কোমল। সকলেরই প্রাণ দিয়া শরৎ উপকার করেন। পর বলিয়া কাহাকেও ভাবিতে পারেন না। "পরের উপকার" বলিয়াও করেন না ; নিতান্ত অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই সকলকার কার্য্য করেন। লোভ, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান, অসরলতা, বাড়িয়ে বলা, পরনিন্দা করা প্রভৃতি যে কাহাকে বলে, তাহার লেশমাত্রও শরৎ জানেন না ; সাধু সেবাই তাঁর ব্রত ; বিশেষ, পরমহংসদেবের ভক্তদিগকে অতিশয় ভালবাসেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রধান পরিশ্রমী লোক। অধিকাংশ সময় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যেই অতিবাহিত করেন।

নানা যায়গায় কায করিয়া, অনেকক্ষণ পরে শরৎ বাড়িতে আসিলেন। মা দূর থেকে "ফটাং ফটাং" আওয়াজ পাইয়াই প্রদীপ লইয়া আসিতেছেন—সিঁড়িটার ভিতর বড় অন্ধকার, পাছে "বাবা"র পায়ে ঠোক্কর লাগে বা পোকা মাকড় কামড়ায়।

"মা, তুমি এখনও জেগে !—ছি ছি ছি !! অসুখ করবে যে ? ছেলে ছেলে ক'রে গেলে। এত মায়া কেন কর মা ? দেখ দেখি, এতক্ষণ হরিনাম করলে না কেন ?"

মা অবশ্য খুব ধার্ম্মিক, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মায়ের প্রাণ কি না ;—কেমন ঐ তাঁর "বাবা"-অন্ত প্রাণ ; "বাবা"র মুখ দেখলেই যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পান। "বাবা"কে কখনও নদী পার হ'তে দেন না ; মনে করেন—"পাছে অভাগিনীর কিছু হয়।"

শরৎ কলিকাতায় এক সওদাগরের আফিসে চাকরি করেন। সামান্য মাহিনা পান—মাসে ৪৫টী টাকা। বাড়িতে অতগুলি ত পরিবার খাইতে ; তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯, পৃঃ ২৩৩)

সাক্ষাৎ এসব প্রত্যহই প্রায় ২।৪ জন করিয়া লাগিয়া আছেই। গরীব গুরুরো, সাধু-সন্তকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ দান করাও আছে। সুতরাং, প্রতিমাসেই প্রায় কিছু কিছু দেনা হয়; ভ্রূক্ষেপই নাই; বলেন—"ঈশ্বর দেবেন একরকম ক'রে চালিয়ে"। বেশী পেড়াপেড়ি ক'রে বল্লে উত্তর দেন, "ঐ যে আর একখানা বাড়ি আছে, সেইটা শীঘ্রই বিক্রী ক'রব।"

শরতের কাহারও সহিত আত্ম-পর জ্ঞান নাই। আফিসে জলখাবার ও পান লইয়া যান,—একা খাইতে পারেন না; যথাসম্ভব সকলকে বণ্টন করিয়া দিয়া খাইতেন। আফিসে বলুন, পাড়ায় বলুন, আত্মীয় কুটুম্বদিগের ভিতর বলুন,—এমন কেহই নাই, যাঁর কিছু না কিছু উপকার শরৎ না করিয়া থাকেন। আফিসের একটী দরওয়ান অতি ভালমানুষ; একদিন সে শরৎকে তার দুঃখের কাহিনী বলে। শরৎ সেই অবধি তাকে গরীব বলিয়া বড় ভালবাসেন। সেই দরওয়ান সম্প্রতি একটা তার নিজের মকদ্দমা উপলক্ষে অর্থাভাবে শরতের নিকট শরণাগত হইয়া পড়ে। শরতের নিকট কখনই কিছু অর্থ থাকে না। যখনই আসে তখনই সব খরচ হইয়া যায়। শরচ্চন্দ্র কি করেন তখন, নিজের বাটীর অলঙ্কার বন্ধক দিয়া তাহাকে টাকা আনিয়া দিলেন। আফিসের সেই সামান্য বেহারা হইতে বড়বাবু পর্য্যন্ত সকলেই শরতের এইরূপ অশেষ গুণে আকৃষ্ট।

বাল্যাবস্থায় শরচ্চন্দ্রের বিবাহ হয়। সন্তানাদির মধ্যে একটী মাত্র ৩ বৎসরের কন্যা। বধূটী আদর্শস্বরূপা এবং স্বামীর যথার্থ অনুরূপা।

মা যেমন শরচ্চন্দ্রের জন্য ব্যস্ত হন, শরৎও তেমনি মা কিসে সুখী থাকেন তাহার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন।

যদিচ বর্ণনা করা দুষ্কর, তত্রাচ একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি যে,—শরৎ কিরূপ পাড়ার, আফিসের, আত্মীয়-কুটুম্বের এবং সকলকারই—আনন্দের পাত্র। পূর্ব্বেই একটু আভাস দিয়াছি, রামকৃষ্ণ মিশনে শরৎ কিরূপ পরিশ্রম করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিগণ তাঁকে অতিশয় সৎ বলিয়া জানেন এবং অত্যন্ত ভালবাসেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

শরৎ তাঁহার সেই বৃহৎ পরিবারের কিরূপ একমাত্র আশ্রয় ও অন্ধের যষ্টি। পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি, শরতের মার কিরূপ শরৎ-অন্ত প্রাণ! সবই বলিয়াছি; বলিবার বিশেষ আর কিছু নাই। এক্ষণে কেবল ঈশ্বর আমাদের কেমন দয়াময়, তাহাই একটুখানি বলিব।

গত ২০শে চৈত্র, ২রা এপ্রেল সোমবার, প্রত্যূষে শরতের মা উঠিয়া শরতের জন্য আফিসের ভাত প্রস্তুত করিতে যাইবেন;—দেখেন শরৎ হঠাৎ ভীষণ বিসূচিকাক্রান্ত। পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই যেন মনে করিলেন নিজের ছেলেরই ব্যারাম হইয়াছে। সকলকারই কিন্তু ধ্রুব ধারণা হইল যে, হাজার ব্যারাম হউক, যে শরৎ এত লোকের প্রাণসম, সে শরতের কখন আয়ুরবসান হওয়া সম্ভব নয়। ভিতর ভিতর ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বাহিরে বৃদ্ধির বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা যায় নাই। বিসূচিকা যন্ত্রণায় যে অত্যন্ত অধীর হওয়া, তাহা শরচ্চন্দ্র হন নাই।

সকলেই প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শরচ্চন্দ্রের যাতে প্রাণ রক্ষা হয়, আহা! যাতে এতগুলি লোক না একেবারে পথে বসে! সকলিই বিফল হইল।

(৮৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৪)

—পাড়াশুদ্ধ লোকের প্রার্থনা বিফল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু সন্ত; সকলকারই প্রার্থনা বিফল; অমন পতিগতপ্রাণা বালিকা বধূরই প্রার্থনা বিফল; যার বাড়া নাই সেই স্নেহময়ী গর্ভধারিণী জননীরও প্রার্থনা বিফল হইল! বেলা ৪ ঘটিকার সময়, দয়াময় শরৎকে সকলকার নিকট হইতে ছিনিয়া লইলেন! তাঁহার নিকট সকলে কত মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, যদি শরৎকে ফিরাইয়া দেন, যদি শরৎ আবার জাগিয়া উঠে। কান্নার রোল উঠিল বটে, তখনও কাহারও পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই যে, শরৎ একেবারে গিয়াছে; হয়ত, এখনই নড়িয়া চড়িয়া উঠিবে।

পরে, যখন বাড়ি হইতে শব বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হইল, তখন মা বুঝিলেন তাঁর "বাবা" একেবারে চলিল; বালিকা-বধূ বুঝিলেন পতিহীনা হইলেন; পাড়াতেও অনেকের বাড়ি কান্না পড়িয়া গেল, সকলেই জানিলেন—তাঁরা এক পরম প্রিয়বন্ধুবিহীন হইলেন। শরচ্চন্দ্রের বাটী মহা শ্মশানের অপেক্ষাও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল; সে বাটিতে আর শরচ্চন্দ্র নাই—চতুর্দ্দিকে যেন ভয়ঙ্কর প্রলয় অন্ধকারে আবৃত হইল। এক শরচ্চন্দ্র বিহীনে বাটীশুদ্ধ অতগুলি লোক আজ অনাথ অনাথা! বিশেষ শরচ্চন্দ্রের বালিকা-বধূ ও গর্ভধারিণী একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল! মায়ের ঐ একমাত্র সন্তান, দয়াময়ের দৃষ্টি সেইটীরই উপর পড়িল!! অনেক অন্ধের, অনেক অনাথ অনাথার, ঐ একমাত্র যষ্টি ছিল, অসীম দয়াময় সেইটী ভগ্ন করিয়া দিলেন!!!

এই ত চক্ষুর উপর একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইলাম; অন্বেষণ করিলে এরূপ অনেক পাওয়া যায়। ঈশ্বর যেন খুঁজিয়া বেড়ান—কোথায় কার বাটীতে "সবে ঘরে ধন নীলমণি" আছে, কোথায় কার বিহীনে অনেকগুলি প্রাণীকে পথে বসিতে হয়, কোথায় কার মর্ম্ম-স্থান, কোথায় কাকে মারিলে এক ঢিলে অনেক পক্ষী মরে,—এইরূপ স্থলেই কৃপাময় আগে কৃপা করেন!

ঈশ্বরের এ সকল কার্য্য ত দয়ার কার্য্য বলিয়া বোধ হইল না। অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে হয়ত হইতে পারে—দয়ার কার্য্য; কিন্তু সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ত সামান্য মানবে সম্ভবে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান —ত্রিকালজ্ঞ না হইতে পারিলে আর এরূপ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি কেমন করিয়া লাভ করা যাইতে পারে বলুন?

যদি বলেন, ঈশ্বরকে চিরকাল দয়াময় বলিয়া আসিতেছি, আজ নিষ্ঠুর বলি কেমন ক'রে? পরন্তু, যদি তিনি নিষ্ঠুর হন, তা হইলে ত তাঁর কাছে প্রার্থনা করা বৃথা! ঈশ্বরের আরাধনা করারই বা ফল কি?

—ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিলে যদি আপনার প্রাণে লাগে, সে ত খুব ভাল কথা, সে ত ভালবাসার কথা—ঈশ্বরের প্রতি খুব ভক্তির কথা; কিন্তু প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে, বা কেহ কষ্ট পাইতেছে দেখিলে, তাঁহার উপর অভিমান বা দোষারোপ কেহ যেন না করেন। আর দেখুন, সাধন ভজন করা, ঈশ্বরকে ডাকা, তাঁহার নাম লওয়া—এ সমস্ত অতি নিষ্কামভাবেই করা উচিত। সাধন-ভজনেরই জন্য সাধন-ভজন করা উচিত, ঈশ্বরকে ডাকারই জন্য ঈশ্বরকে ডাকা কর্ত্তব্য, তাঁর নামেরই জন্য তাঁর নাম লওয়া উচিত, কোনও রকম কামনার সহিত এ সকল করা উচিত নহে।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯, পৃঃ ২৩৫)

গাজিপুরের "পওয়াহারী বাবা" বলিতেন—"যন্‌ সাধন, তন্‌ সিদ্ধি—যেই সাধন সেই সিদ্ধি।" তবে কি জানেন, মানুষের মন বড়ই দুর্ব্বল; বিশেষ, সাধন-ভজনের প্রথম অবস্থায় সকাম প্রার্থনা না করিয়া লোকে থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিবেন না—এরূপ ধারণা থাকিলে, তাঁকে ডাকতেও ইচ্ছা হয় না বটে; কিন্তু প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি কি করেন?—তিনি প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁকে না ডাকিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁকে না স্মরণ করিয়া থাকিতে পারেন না,—তাই করেন। প্রকৃত ভক্তের ঈশ্বর ছাড়া আর কেহই নাই, তাই আপদে বিপদে সম্পদে—যা কিছু বলবার, সবই ঈশ্বরের নিকটেই বলেন; বলিতে হয় বলিয়া বলেন; বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করিয়া বলেন না। তিনি জানেন—ঈশ্বর সবই হইতে পারেন, তাঁতে সকলই সম্ভব। তিনি দয়াময় হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন, প্রহ্লাদকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন বটে; আবার নিষ্ঠুর হইয়াও সীতাকে গর্ভাবস্থায় বনবাসে পাঠান; শ্রীমতীকে একশত বৎসর ব্যাপিয়া বিরহানলে দগ্ধ করান, আবার, দোষগুণশূন্য হইয়া, দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপে জ্ঞানিগণেরও উপাস্য হন। তিনি লোকের নিকট নিজেকে কখন অতি সূক্ষ্ম বিচারবান বা অসীম বুদ্ধিমানের মত দেখান; আবার কখনও বা অতি বালকের মত বা উন্মাদের মতও দেখান। তাঁর কার্য্যের "কেন" বা কারণ জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তবে হ্যাঁ,—যদি কখনও তাঁর মত অসীম বুদ্ধিমান হওয়া যায়, তা হ'লে তাঁর কার্য্যপ্রণালীর তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে; তা না হ'লে এই এক ছটাক মলিন বুদ্ধি লইয়া, সেই অনন্তের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা বাতুলতা। এই সামান্য মানবীয় চক্ষুতে যা দেখি, তাতে ত বোধ হয়, তিনি দয়াময়ও বটে, আবার নিষ্ঠুরও বটে।

যদি আপনি তবুও বলেন, তিনি দয়াময় ছাড়া হতেই পারেন না। সীতাকে যে বনবাস দিয়াছিলেন, এবং শ্রীমতীকে যে বিরহদগ্ধ করিয়াছিলেন, সে সকল কেবল তাঁহাদিগের পূর্ব্বশাপ ছিল বলিয়া। আর, স্যার জন্‌ লরেন্স প্রভৃতি সম্বন্ধে এই যে, তাহাদিগের পরকালে তিনি মঙ্গল করিবেন। আমরা তাঁর নির্ব্বোধ ছেলে—ভাল মন্দ, ভূত ভবিষ্যৎ ইত্যাদির ত জ্ঞান তত নাই। হয়ত অতি সুখকর বোধে কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলাম; সে বিষয়টা কিন্তু ভবিষ্যতে অতি অমঙ্গলজনক, আমরা তা জানি না। ঈশ্বর পরম দয়াল সর্ব্বজ্ঞ; তিনি আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না; আমরা বলিলাম ঈশ্বর নিষ্ঠুর। ছেলের বিকার রোগ হইয়াছে; এখন দধি রম্ভাদি খাইবার জন্য পিতার নিকট অতিশয় কাতর প্রার্থনা করিলেও কি পিতা সে প্রার্থনা রক্ষা করিবেন, না—সেজন্য পিতাকে নিষ্ঠুর বলিব?

—উত্তরে, ঠিক বিপরীতই বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের কোনও কার্য্যই দয়ার নহে; গোড়াতেই ত এককথা—তিনি এই মায়াময় জগতের সৃষ্টি করিলেন কেন? জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া সুখদুঃখে এত উৎপীড়িত করেন কেন? লীলাময় ত লীলা করিতেছেন; আর, যাদের লইয়া লীলা করিতেছেন, তাদের প্রাণ যে যায়! আর, যদিও বা লীলা করিবার এতই সাধ থাকে, তিনি ত সর্ব্বশক্তিমান,—এমন একটা কৌশল সৃষ্টি করিতে কি পারিলেন না, যাতে তাঁর লীলাও বেশ চলে, আর আমাদেরও প্রাণবধ হয় না? আর, পরকালের মঙ্গল সম্বন্ধে?—তখনকার কথা তখন। মনে করুন,—বৈদ্যনাথ, এখান হইতে অতি সামান্য দূর; এই সামান্য দূর বৈদ্যনাথে যাইলেই যখন,

(৮৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৩)

ভাষা আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই আর একরকম দেখিতে পাই, তখন এক জন্ম দূরের রাস্তা তফাতে পরলোক নামক এক সম্পূর্ণ নূতন ও আশ্চর্য্য স্থানে যাইলে, হয়ত চিন্তা-প্রণালী পর্য্যন্তরও সম্পূর্ণ ভিন্নতা সংগঠন হইতে পারে। সেই পরলোকে যাইলে হয়ত "দয়াময়" "নিষ্ঠুর" প্রভৃতি ভাব না'ও থাকিতে পারে; তখন হয়ত আর একরকম মন, আর একরকম বুদ্ধি, আর একরকম চিন্তা-প্রণালীর উদ্ভব হইতে পারে। তাহাও, যদি তখন তাঁহাকে দয়াময় বলিতে হয়, তখন বলিব। আপাততঃ এখন যেমন দেখিব, তেমনই বলিব; দয়াময়ের কার্য্য দেখি, দয়াময় বলিব; নিষ্ঠুরের কার্য্য দেখি—নিষ্ঠুর বলিব।

আচ্ছা বেশ, তাঁকে "অসীম দয়াময়" বলছেন ত বটে?—বেশ। তিনি যদি অসীম দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান; তিনি আর, এখানে সেখানে—ইহকালে ও পরকালে—তুই জায়গায়ই কি দয়াময়ত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেন না? এক জায়গায় দুঃখ দিতেছেন—আর এক জায়গায় সুখ দিবেন বলিয়া; কেন?—দু জায়গায়ই না হয় সুখ দিলেন; তা না হইলে তিনি দয়াময় কিসের? কি দেখে তাঁকে কেবল "অসীম দয়াময়" বলব?

লোকে এ'তো দয়াময় দয়াময় বলে কেন জান?—ভক্তি চটিয়া যাইবে ব'লে। নিষ্ঠুর বলিলে আর তাঁকে ডাকৃতে ইচ্ছা হইবে কেন? সুতরাং—তিনি নিষ্ঠুর হইলেও তাঁকে "দয়াময়" মানিয়া লইতে হইবে; "আহা মরি, আহা মরি, তিনি কি সুন্দর!"—ইত্যাদি রূপ না মানিয়া লইলে ভক্তি আসিবে কেন?—মন ছোট হইয়া যাইবে; আর, ঠাকুরও উড়িয়া যাইবে। ঠাকুরকে নিজেদের মনমত গড়িয়া লইতে হইবে কিনা, তা না হ'লে, মন বসিবে কেন? তাই দেখিতে পান না—পশ্চিমী ও দক্ষিণী কৃষ্ণ বা কালী একরকম; আর, বাঙ্গালী-কৃষ্ণ বা কালী আর একরকম? ঠাকুরকে ডাকবার প্রথাও অনেক অংশে ভিন্ন ভিন্ন রকম। কিন্তু, বস্তুতঃ ঠাকুর সব জায়গায়ই এক; ঠাকুরের নিকট সব ভাষা বা সব প্রথাই এক।

তবে কি, তিনি যে—"অসীম দয়াময়" একথা কি মিথ্যা?

কেন? মিথ্যা হ'তে যাবে কেন? বালাই! তিনি আমার এও বটে, তিনি আমার—ওও বটে; তিনি আমার—সব। তিনি যেমন অসীম দয়াময় হইতে পারেন, তেমনি আবার তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরও হইতে পারেন;—তাঁর ইচ্ছা। তিনি ত আমাদের মনের মত বা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলিবেন না। তাঁর ছাগল, যদি তিনি ল্যাজের দিকে কাটেন;—সে তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ঐশ্বরিক কার্য্যকলাপ, তাঁর সে অলৌকিক দেব চরিত্র, আমরা ক্ষুদ্র মানব,—কিরূপে বুঝিব?—বুঝিতে যাওয়াও যে blasphemy ব্লাসফেমী—মহা অপরাধ বা অত্যন্ত বাতুলতা!

আমাদের ভক্তি যেন তাঁর কার্য্যের উপর, গুণের উপর, বা রূপের উপর তত নির্ভর না করে। ভক্তি যেন অহেতুকীই হয়। তিনি দয়াময় হইলেই যে ভক্তি বাড়িবে; আর, তিনি নিষ্ঠুর হইলে বা প্রার্থনা না শুনিলেই যে ভক্তি উড়িয়া যাইবে—সেটা বড় খারাপ। তবে হাঁ—প্রবর্ত্তকের পক্ষে, বা প্রথম অবস্থায়, ঐরূপ সকাম ভক্তি মন্দ নয়।

এ মানুষ বুঝে না যে, ঠাকুরকে দয়াময় বল, নিষ্ঠুরই বল, আর যা'ই বল,—তাতে তত ক্ষতি হইতেছে না, যত ক্ষতি হয় তাঁকে না ডাকিলে পরে। তাঁকে ডাকা চাই,—তা, নিষ্ঠুর

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭, পৃঃ ২৩৭)

বলেই ডাকুন ; আর দয়াময়ই বলে ডাকুন। তিনি যাই হউন, আমার সে খবর জানবার আবশ্যক নাই ; জেনেও শেষ করিতে পারা যায় না ; আর জেনেই বা এমন কি ফল ? আমার আঁব খাবার আবশ্যক, আঁব খেতে পেলেই হইল। আঁবের কৃষিতত্ত্ব, আঁবের আমদানী তত্ত্ব প্রভৃতি অত তত্ত্বাতত্ত্ব তলিয়া বুঝিতে যাইবার দরকার ? আমাদের ডোবায় অল্প জল ; পিপাসা পাইয়া থাকে, উপর উপর থেকে লইয়া জল খান ; বেশী ঘোলাইতে গেলে যে, পাঁক উঠিয়া পড়িবে। আমাদের মন অতি ছোট, বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র ; এ মনবুদ্ধিকে বেশী খোঁচা খুঁচি করিতে গেলে খিচড়ে যাইবে।

আমার ঈশ্বর কিরকম জানেন ? এক। দুই দুই নাই ; ব্যভিচার নাই। আমি একজনকে ডাকি ; সেই একজনকেই লইয়া থাকি, সেই একজনকেই ভয় করি, সেই একজনকেই ভালবাসি। খেতে, শুতে, বেড়াতে—সেই একই জন। যা শুনি বা দেখি, সবই আমার সেই একই ঈশ্বর। আমার ঈশ্বর অমন ছোটখাট নয় যে, একটু চল বেচল হইলেই আমার কাছ থেকে ফস্ ক'রে উড়ে যাবে। আমার ঈশ্বর কূপমণ্ডুকের ঈশ্বর নয়। মুশলমানের যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর ; খৃষ্টানেরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর, হিন্দুরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর ; শাক্ত বৈষ্ণব ও বেদান্তীরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর। ঋষি তপস্যা দ্বারা সমাধিস্থ হইতেছেন—সেও ঈশ্বরের কার্য্য, জীব বাসনার দ্বারা বদ্ধ হইতেছেন, সেও সেই ঈশ্বরের কার্য্য ; পুণ্যাত্মা পুণ্য করিতেছেন, পাপাত্মা পাপাচরণ করিতেছেন—সেই ঈশ্বরেরই শক্তিতে। তিনি একরূপে চোর হ'য়ে চুরি করিতেছেন ; আবার সেই তিনিই আর এক রূপে জজ হ'য়ে শাস্তি দিতেছেন। যে যা করিতেছে, সবই ঈশ্বরের কার্য্য। গাছের পাতাটা নড়িতেছে—সেও সেই ঈশ্বরের কার্য্য। দয়া করাও ঈশ্বরের কার্য্য, নিষ্ঠুর হওয়াও ঈশ্বরের কার্য্য।

আজ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম ; দেখিলাম একটা বিড়াল ছানাকে কা'রা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিল—দিন দুই তিন হয়ত খেতে পায় নাই—অতি কাতর ও মৃদু স্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে একজনদের বাটীতে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে উঠিতে যাইতেছিল ; বোধ হয়, মনে ক'রেছিল বাটীতে আশ্রয় লইলে নিরাপদ হইবে। বাটীর দরজাটী রাস্তা হইতে একটু উঁচু ; ক্ষুধাতে এমন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনও মতে দরজার উপর উঠিতে পারিতেছিল না—যেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, আর অমনি নীচে পড়িয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে একটী বালক হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া বাচ্ছাটার ঘাড় ধ'রে সেই রাস্তার মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ; অমনি একখানি গাড়ি আসিয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। বাচ্ছাটী দুই আধখানা হইল।

জগতে যাবতীয় প্রাণীবিভাগেই এরূপ অহোরাত্র কতই না জানি ঘটিতেছে। এ সকল কি ঈশ্বরের কার্য্য নয় ?

আবার ইহাও শুনিয়াছি,—একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে দেখেন, একটা নীচবংশোদ্ভবা অস্পৃশ্যা গরীব স্ত্রীলোক বিসূচিকারোগাক্রান্তা হইয়া বিষ্ঠাক্তকলেবরে ফুটপাথের নীচে পড়ে ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় না কি দেখিয়াই স্বহস্তে স্ত্রীলোকটীকে, তৎক্ষণাৎ গাত্র হইতে বিষ্ঠাদি ধৌত করিয়া চিকিৎসার্থ ও তাহার প্রাণরক্ষার্থ নিজের বাটীতে লইয়া যাইলেন।

(৮৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৮)

ছেলেবেলায় অনেকে বইতে পড়িয়া থাকিবেন,—এক প্রভুভক্ত ভৃত্য কেমন প্রভু ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য, নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল ! এ সকলও কি ঈশ্বরের কার্য্য নহে ?

যদি বলেন, এ সকল ঘটনা অথবা স্যার জন্ লরেন্সের ঘটনা প্রভৃতি অদৃষ্টের লিখন। অদৃষ্ট কি ?—সেই ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই নহে।

যদি বলেন,—"আমরা যে ঈশ্বরকে কেবল দয়াময়ই বলি ; নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা করি না"—সেও কি ঈশ্বরের কার্য্য নহে ? আপনি ইহা খণ্ডন করেন কি হিসাবে ? আপনি ত বলিলেন যে, সবই ঈশ্বরের কার্য্য ; তা হ'লে, আমরা যে ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা করি না—"কেবল দয়াময়ই" বলি ;—সেও ঈশ্বরের কার্য্য। সে ঈশ্বরের কার্য্য বটে ; কিন্তু সেকথা মানবের চরম অবস্থার কথা। যখন একেবারে ভেদাভেদ জ্ঞান না থাকে, যখন যথার্থই সর্ব্বভূতে প্রত্যক্ষভাবে জলন্ত ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মানব এইরূপ জ্ঞান লাভ করে। যতক্ষণ বলা কওয়া, লেখাপড়া, তুমি আমি প্রভৃতির ভিতরে থাকা যায়, ততক্ষণ ও সকল কথা বলিলে নিতান্ত "শুনে বলার" ন্যায় অনধিকার চর্চ্চা হয়, অথবা "তর্কের খাতিরের" ন্যায় হইয়া পড়ে ; এবং ভালমন্দ বিচার করা চলে না। দ্বৈত জগতের মধ্যে যে সকল কথা বা ভাব বা অবস্থা আমরা কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিব, সেই সকলের সীমার বাহিরে চর্চ্চা করিলে অনধিকার চর্চ্চা হয়। পরন্তু, আপনি যেরূপ তর্ক তুলিতেছেন, তাহাতে অনবস্থা দোষ (Fallacy of never-ending) আসিয়া পড়ে। এরূপ তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম নাই, সুতরাং সিদ্ধান্তও হইতে পারে না। আপনি বলিবেন, আপনি যাহা বলিতেছেন—ঈশ্বরের কার্য্য ; আমিও বলিব, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাও ঈশ্বরের কার্য্য ; তাহার উপর আবার আপনিও বলিবেন, আপনি যাহা বলিতেছেন—ঈশ্বরের কার্য্য ; আবার আমিও ঐরূপ বলিব। এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

সাধক, সিদ্ধমহাপুরুষ, শাস্ত্র, সকলেই বলেন এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বেশ বোধগম্য হয়,—ঈশ্বর লীলাময় : তিনি দয়াময়ও বটে, তিনি নিষ্ঠুরও বটে ; আবার তিনি এই দুয়ের অতীত নির্গুণও বটে। তাঁতে সকলেই সম্ভব কি না—তিনি অনন্ত কি না, সবই হইতে পারেন। তাঁর অন্ত নাই, শেষ নাই। তাঁর "ইতি" নাই।

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥"

তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ; আবার, স্থূল হইতেও স্থূল। প্রাণিগণের হৃদয়েই তিনি আছেন। যিনি নিষ্কাম, যাঁহার শোক নাই, তিনিই মনের প্রসন্নতাহেতু—সেই আত্মার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন।

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥"

হৃদয়ে থাকিয়াও অবাঙ্মনসোগোচর, নিষ্ক্রিয় হইয়াও ক্রিয়াবান,- এরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন তাঁহাকে কে শীঘ্র জানিতে পারে ?

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯, পৃঃ ২৩৯)

বর্ত্তমান ভারত।

স্বামী বিবেকানন্দ] [১২৮ পৃষ্ঠার পর।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী শাসনযন্ত্র, অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায়, একপ্রান্তের পণ্য দ্রব্য অন্যপ্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে, দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্ব্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ কল্যাণ নির্দ্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎমঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাব সংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক ক্ষতি নাই, সকল কার্য্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তা, যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্ম্মনেতা, সমাজনেতা, সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে, বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহত শক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু, যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সেস্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতিবিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্ম্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে, অত্যল্পকালে বিজিতজাতির বহুকল্যাণ সাধনে সমর্থ, সেই শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত-জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা, সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমকশাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিতয়াহুদীবংশসম্ভূত হইয়াও খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পৌল কেশরী সম্রাটের সমক্ষে আপনার অপরাধ বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজ, কৃষ্ণবর্ণ বা "নেটিভ" অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে, ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের "জিহ্বাচ্ছেদ, শরীর ভেদাদি" পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে?

(৮৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৪০)

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত

উদ্বোধন

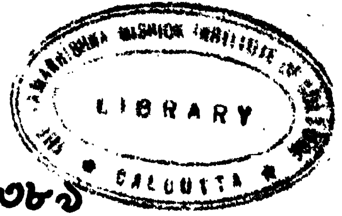
আষাঢ় ১৩৮৯

৮৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা





উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত



উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৮৯

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী। গুরুর লক্ষণ			২৪১
২।	কথাপ্রসঙ্গে। গুরু: ব্যক্তি ও শক্তি			২৪২
৩।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন			২৪৪
৪।	পত্রসংগ্রহ			২৪৬
৫।	শ্রীম-স্মরণে	(কবিতা)	শ্রীশান্তিকুমার মিত্র	২৪৮
৬।	প্রতীক্ষা	(কবিতা)	শ্রীমতী হিমানী রায়	২৪৮
৭।	পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন		স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	২৪৯
৮।	ভক্তের ভগবান্	(কবিতা)	শ্রীমতী মানসী বরাট	২৫৬
৯।	শ্রীশ্রীমায়ের বাণী: সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে		অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত	২৫৭

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। ...মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল।

ডিমাই সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

পত্রিকা: বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ।

ষষ্ঠ মুদ্রণ—দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৩

মূল্য—১৪৲

সাধনা

দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা...প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক...সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নবম সংস্করণ—১৪৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

১০	'কিমিদম্'		স্বামী ধ্যানেশানন্দ	২৬৪
১১	সর্বধর্মস্বরূপিণে	(কবিতা)	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ	২৬৯
১২	মহাভূত মহাতীর্থ		শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ	২৭০
১৩	এখনি নয়	(কবিতা)	ডক্টর অমিলেন্দু চক্রবর্তী	২৭৪
১৪	সমালোচনা		স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ	২৭৫
			শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী	২৭৬
			ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য	২৭৭
১৫।	নিবেদন			২৭৭
১৬।	রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ			২৭৮
১৭।	বিবিধ সংবাদ			২৭৯
১৮।	উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা		পুনর্মুদ্রণ (বৈশাখ, ১৩০৭ ; পৃঃ ১৪৫-৫২) ···	২৮১







পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়



৮৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

গুরুর লক্ষণ

গুরু সম্বন্ধে এইটুকু দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। জগতের সকলেই বেদ, বাইবেল বা কোরান পাঠ করিতেছে, কিন্তু এগুলি শুধু শব্দ ও ব্যাকরণ—ধর্মের কয়েকখানা শুষ্ক অস্থিমাত্র। যে-গুরু শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্মাচার্য।···

দ্বিতীয়তঃ গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক।···অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচার্য অশুদ্ধ-চিত্ত হইলে তাঁহাতে আদৌ ধর্মালোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কী ধর্ম শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিবার বা অপরে শক্তি সঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়—হৃদয় ও মনের পবিত্রতা। যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, ততদিন ভগবদ্দর্শন বা সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার আভাস-জ্ঞানও অসম্ভব।···

তৃতীয়তঃ···গুরু যেন অর্থ, নাম-যশ বা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন—সমগ্র মানবজাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেমই যেন তাঁহার কার্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ প্রেমের মাধ্যমেই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, লাভ বা যশের ইচ্ছা এক মুহূর্তে এই সঞ্চারের মাধ্যম নষ্ট করিয়া ফেলে। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবান্‌কে প্রেমস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে ভগবদ্ভাব শিক্ষা দিতে পারেন।

যদি দেখ গুরুতে এই-সব লক্ষণ বর্তমান, তবে জানিবে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ্ আছে; যেহেতু তিনি যদি হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তিনি হয়তো অসদ্ভাব সঞ্চার করিবেন। এই বিপদ্ হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে। 'যিনি বিদ্বান্ নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ', তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৭-২৯]

কথাপ্রসঙ্গে

গুরু : ব্যক্তি ও শক্তি

ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়ের পূর্ণিমা এক অমর্ত্য আলোকের বার্তা বহন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। এ সংসারে সমাজে সারা-বছরের নির্ঘণ্টে অনেক পূজা উৎসব ও প্রিয়-মিলনের দিন তারিখ ও তিথি আছে; কিন্তু সংসার ও সমাজের ঊর্ধ্বে, শরীর-সম্পর্কের অতীত সাক্ষাৎ ঈশ্বর-সান্নিধ্যলাভের তিথি বুঝি এই একটিই! অন্যান্য অনেকদিনই আমরা ঈশ্বর-সান্নিধ্য কল্পনা করি—হয় কোন মূর্তি বা প্রতিমা অথবা ছবি ও ছায়ার সম্মুখে; কিন্তু এদিন আমাদের এক অপূর্ব সুযোগ—সাক্ষাৎভাবে অথবা স্মৃতির সহায়ে মানবদেহধারী ঈশ্বরশক্তির সম্মুখে উপাসনা করিবার!

সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ী মনে অনেকগুলি প্রশ্ন আসিয়া একসঙ্গে ভিড় করে: ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, তিনি কি করিয়া সাদি সান্ত একটি মানুষে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেন? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, গুরু কি তাই? 'গুরুবাদ'ও একপ্রকার পুতুল-পূজা। উত্তরে শুধু এইটুকুই বলা যায়, চিন্তার স্বাধীনতা সকলেরই আছে, লেখা বা বলার স্বাধীনতাও অনেকের আছে। কিন্তু তাহাতে কি সমস্যার সমাধান হয়, না প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়?

শ্রুতি-যুক্তি-অনুভূতি সহায়েই অলৌকিক প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা চিরদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমষ্টি-জীবনে। ইহাই প্রশস্ত পথ—তথা প্রকৃত পথ। 'শ্রুতি' বলিতে আমরা প্রাচীন জ্ঞানসম্ভারই বুঝিয়া থাকি। ভারতে উপনিষদের বিশেষ মান, সেখানেও দেখি গুরুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, কারণ 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব'। ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ। অদ্বৈত-বেদান্ত-অনুসারে 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—সবই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ কথায়ও পাই —তুমি জানো আর নাই জানো, তুমি রাম। তবে যিনি জানিয়াছেন তিনি রাম, তাঁহার মূল্য নিশ্চয়ই একটু বেশী; যিনি বোধ করিতেছেন তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরসত্তা ও ঈশ্বরশক্তি, তিনিই তো গুরু—মনুষ্যদেহধারী ঐশীশক্তি। এ শক্তি বাহ্য সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের শক্তি নয়—এ শক্তি কল্যাণশক্তি; তবে সূক্ষ্মভাবে এ শক্তিও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের শক্তি! শিষ্যের মঙ্গলে গুরু তাহার জীবন নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাকে লালন পালন করিতেছেন, তাহার সাধন-জীবনের বাধাবিঘ্ন ধ্বংস করিতেছেন, সর্বশেষে তাহার অজ্ঞান লয় তাহাকেও স্বরূপজ্ঞানে ত করিতেছেন।

উপনিষদের বহু আখ্যানই শুরু হইয়াছে গুরুশিষ্য-সংবাদের পটভূমিতে; প্রশ্ন সেই একই: কিভাবে আত্মাকে জানা যায়? এমন কি আছে —যাহা জানিলে সব কিছু জানা যায়? কে সেই পুরুষ? কি এই রহস্যময় জ্যোতিঃ?

এই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর কোথাও দিতেছেন গুরুরূপী যম নচিকেতাকে, কোথাও ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী উমা দেবরাজ ইন্দ্রকে, কোথাও স্বামী স্ত্রীকে, কোথাও পিতা পুত্রকে; কখন অরণ্য-আশ্রমে, কখন বা রাজসভায় আয়োজিত বৈঠকে এই গভীর রহস্য আলোচিত হইয়াছে গুরুশিষ্য-কথোপকথনের মাধ্যমে!

পৌরাণিক যুগেও এই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে, কোথাও নারদ শিষ্য, পরে তিনিই গুরু; ক্রমশঃ দেখা যায় ঋষিমুনি অপেক্ষা আর এক উচ্চস্তরের গুরু: ঈশ্বরাবতার! যেন মনুষ্যদেহে জাত ঈশ্বর! শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্বিংশতি অবতারের অনেকেই গুরুরূপে অবতীর্ণ—নানাভাবে জ্ঞান ও ভক্তির শিক্ষা দিতেছেন। সর্বশেষে

পাই—ভাগবতের অপূর্ব স্বীকৃতি : 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। তিনিও নানাভাবের সহিত গুরুভাবই বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তিনিও শিষ্যসম বন্ধু উদ্ধব ও অর্জুনকে অবলম্বন করিয়া চরম জ্ঞান ও ভক্তির তত্ত্ব এবং কর্মযোগের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, আজও যাহা আধ্যাত্মিক জগতের পরম পাথেয়।

ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ শংকর নানকও প্রধানতঃ গুরুরূপেই আবির্ভূত ও প্রপূজিত। নানকের শিষ্যগণ তো 'শিষ্য' শব্দের দেশজ রূপ 'শিখ' নামেই পরিচিত। শংকরও বুদ্ধের মতো সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সংগঠিত করিয়া সমাজের উন্নতিবিধানে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্মান্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন, সেখানেও দেখা যায়—অবতারের গুরুভাবটির উপরই জোর বেশী। এখানে গুরুরূপেই শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা-উপাসনা প্রবর্তিত, 'শ্রীগুরু-মহারাজ' বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণকেই বোঝায়। চিঠি-পত্রে দেখা যায় স্বামীজী লিখিতেছেন, "বাহ্ গুরুকী ফতে" অর্থাৎ 'গুরুজীর জয়'—তাঁহার মনে তখন নিশ্চয়ই শিখদের গুরুভক্তির জয়-ঘোষণাই প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

গুরুকেন্দ্রিক গুরুভিত্তিক এই ধর্মান্দোলন যে ব্যক্তির সহিত সমাজকেও সুগঠিত করে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গুরু একটি আদর্শ মানব, পূর্ণবিকশিত কল্যাণশক্তি। গুরু একটি তত্ত্ব মাত্র নন, একটি 'বাদ' বা 'ভাব' মাত্র নন; সংক্ষেপে বলা চলে, গুরু একটি ব্যক্তি—গুরু একটি শক্তি; বর্তমান সমাজের অবক্ষয় রোধ করিতে, সুস্থ সবল সমাজ গঠন করিয়া তুলিতে আজ এই শক্তির একান্ত প্রয়োজন।

গুরুভক্তি-প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

আমাদের দেশে এখন সে গুরুভক্তি একেবারে নাই বলিলেই হয়।...যদি দেশ হইতে এই গুরুভক্তি উঠিয়া যায়, তবে ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি অন্তর্হিত হইবে। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার সমাজে রাজত্ব করিতে থাকিবে।' গুরুকরণ করিবার পূর্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পারো, কিন্তু একবার তাঁহাকে গ্রহণ করিলে মনকে এমনভাবে গঠিত করিতে হইবে যেন তাঁহার কথায় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারো। অনেকে মনে করেন, গুরুর উপর এইরূপ নির্ভর করিলে আমাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইবে ও আমরা ক্রমশঃ জড়পিণ্ডে পরিণত হইব। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। বাস্তবিক সদ্‌গুরু কখনও কাহারও মনের স্বাধীনতা হরণ করেন না, বরং যাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতা লাভ হয়, যাহাতে সে আপন পায়ে দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে সে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন, মনের বন্ধন, পরিবারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন সব কাটাইয়া মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেন।...হিন্দু যেদিন গুরুভক্তি ভুলিবে, সেদিন আর হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। মহাভারতের সেই গুরুভক্ত উপমন্যুর কথা স্মরণ কর। সেই গুরুভক্তি, সেই অটল শ্রদ্ধা, গুরুবাক্যে সেই অপার বিশ্বাস একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। যদি কখনও ভারতের আবার উন্নতি হয়, তবে এই গুরুভক্তি-সহায়েই হইবে, গুরুকে ঈশ্বর-জ্ঞানে হইবে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাঁহার নিকট প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত হইলে তবে আমরা আবার মহৎ মহৎ কর্ম করিতে সক্ষম হইব। শুধু নিজের মুক্তি সাধন করিতে কৃতকার্য হইব তাহা নহে, দেশের জন্য স্বজাতির জন্যও কিছু করিয়া যাইতে সমর্থ হইব।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সংকলন*

তুমি জানতে চেয়েছ—এই ভব-বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়? এর উত্তরে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জন্ম-জন্মান্তরের প্রারব্ধের ফল একদিনেই কাটানো যায় না। তুমি অবশ্য ঠিকই বলেছ যে, আমাদের কর্তব্য এই মুহূর্তেই সংসার-পাশ থেকে মুক্ত হওয়া। কারণ, কে জানে কখন মৃত্যু এসে প্রিয়জনের স্নেহ-ভালবাসার আলিঙ্গন থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই জন্মেই আমাদের হঠাৎ একটা সংকল্প ক'রে বসতে হবে। সাফল্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে—শ্রীভগবান্ দয়া ক'রে আমাদের যে অবস্থায় রেখেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। সেই সঙ্গে তোমার মনকে সর্বদা তাঁতেই নিমগ্ন রাখতে হবে—যেমন শিশু তার মা-বাপের মুখের দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকে সাহায্যের জন্য।

প্রভু দয়া ক'রে তোমাকে যে অবস্থায় যেখানে রেখেছেন, সেখানে শান্তিতে থেকো। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পাঠ ক'রে সেগুলির অনুধ্যান কর। তাঁর কথায়, "চারাগাছকে সযত্নে বেড়া দিয়ে ঘিরে রক্ষা করতে হয়, যাতে ছাগলে মুড়িয়ে না দেয়। কিন্তু চারাগাছটা বড় হ'য়ে গেলে শত শত ছাগল তার ছড়িয়ে-পড়া ডালপালার তলায় আশ্রয় নিতে পারে।" তাই সৌভাগ্যক্রমে কারো মনে যদি বিশ্বাস ও ত্যাগের ভাব একটুও অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে, তাহলে বিষয়ীদের সংসর্গ এড়িয়ে তাকে বিশেষ যত্নে সংরক্ষণ ও পরিপুষ্ট করা একান্ত কর্তব্য। তারপর অন্তরে সেটির মূল যখন দৃঢ়বদ্ধ হবে, তখন তাকে নড়াবার সাধ্য আর কারো হবে না।

*   *   *

ভাল ভাল বই পড়। যেমন ধর—"Imitation of Christ" (ঈশানুসরণ)। এই বইটি পড়ে তুমি খুবই শান্তি পাবে। লেখক টমাস এ কেম্পিস একজন যথার্থ ভগবদ্ভক্ত ও খ্রীষ্টানুরাগী। এই মহামূল্য পুস্তকটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে—সান্ত্বনা ও সত্যিকারের ভক্তির কথা—হৃদয়ে সেগুলি আঁকড়ে ধরে থেকো।

*   *   *

মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে—যতদিন আহার ও আশ্রয় পায়, পশু ততদিন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু সত্যিকারের মানুষ সর্বদা উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থায় উত্তরণের চেষ্টা ক'রে চলে। উচ্চতর আদর্শের প্রতি নিরন্তর অনুরাগই প্রকৃত মানুষের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও মহৎ জীবন-যাপনে অভিলাষী মানুষ-মাত্রেরই প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই বাণী অনুসরণ ক'রে চলা।

*   *   *

তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমরা সকলেই খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের পথই ভিন্ন। প্রত্যেককে তার নিজের পথ নিজেই তৈরী ক'রে নিতে হবে এবং ভগবান্ আমাদের যে-সব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেগুলির সদ্ব্যবহার করেই আমাদের এই পথে অগ্রসর হ'তে হবে।

---

* মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠ হইতে সংকলিত ও প্রকাশিত 'Consolation' নামক পুস্তিকা হইতে অনূদিত।—সঃ

* * *

আমাদের সকলেরই উচিত শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা, কিন্তু কখনও কি একেবারে এক আঘাতেই শৃঙ্খল চূর্ণ হ'য়ে যেতে দেখেছ ? শৃঙ্খল যদি ভাঙতে চাও, তাহলে ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত হানার ধৈর্য তোমাকে ধারণ করতেই হবে। হঠাৎ ক'রে বসলে কোন কিছুই মঙ্গলকর হয় না। মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হ'লে কোন বন্ধনই আর তোমাকে সংসার-বৃক্ষে আবদ্ধ রাখতে পারবে না—তুমি তখন পাকাফলের মতো আপনি বৃক্ষচ্যুত হ'য়ে শ্রীহরির কোলে আশ্রয় নেবে।

* * *

তুমি বল যে সংসার বড়ই প্রলোভনের জায়গা—সে-কথা সত্য! কিন্তু এটা কি তুমি জানো যে, প্রবল ঝড়ের আঘাতে দুর্বল গাছের মূল আরও দৃঢ় হয়? তোমার মধ্যে যে-সব নীতিবোধ এখনও তেমন পাকা হয়নি, প্রলোভনের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামের ফলে সেগুলি নিশ্চয়ই তোমার মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাবে। নিয়ত অনুশীলন ও শ্রমের দ্বারা দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যও এই নিয়মের ঊর্ধ্বে নয়। অবশ্য মাটি এত পিছল যে পদস্খলন ব্যতীত কারো পক্ষে তার উপর দিয়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়, কিন্তু এগিয়ে চলার পথে পতনের প্রতি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, যে নির্ভীকভাবে অগ্রসর হ'তে পারে, সে নিশ্চয়ই এই কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে যেতে সক্ষম হবে। তোমাকে সর্বদা সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে সাহসের সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হ'তে হবে। পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু কখনই দমে যাবে না—এইভাবেই তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিতভাবে জানছ যে, এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছ, যেখানে আর পাঁক নেই—যেখানে তোমার একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু, দীর্ঘকালের সাধনার ধন—সেই সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করেছ। মাঝে মাঝে যদি পিছলে পড়ে যাও, ভেবো না। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে প'ড়ো না। দৃঢ়পদে এগিয়ে চল। কোন মানুষই সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সংসারের পিছল পথ অতিক্রম করার আশা করতে পারে না। আর কর্দমাক্ত পথ পার হ'তে গিয়ে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কাদার মধ্যে বসে পড়াটাও নিছক মূর্খতা। "চেষ্টা কর, চেষ্টা কর—বারবার চেষ্টা কর"—এই মহামূল্য উপদেশবাণী ভুলে যেও না। স্কটল্যাণ্ডের ব্রুসের কথা স্মরণ কর, যিনি ছ-বার পরাজিত হয়েও হাল ছাড়েননি এবং অবশেষে সপ্তমবারে জয়লাভ করেন।

* * *

যা কিছু ঘটছে তা সবই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই—এই কথা মনে রেখে সব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থেকো। তাঁর কাছে সর্বদা প্রার্থনা জানাতে ভুলো না। যাতে তোমার প্রকৃত কল্যাণ হয়, সে-সবই তিনি তোমাকে দিতে পারেন তাঁর কৃপা হ'লে। সব সময়ে তাঁর শরণাগত হ'য়ে থেকো। শান্ত ও উদ্বেগহীন চিত্তে থাকতে চেষ্টা কর। অস্থিরচিত্ততা একটা রোগ-বিশেষ। এ-কথা জেনে রেখো যে, ধর্মের অর্থই হচ্ছে—দয়া এবং পরমেশ্বরের নিকট আত্ম-নিবেদনের আনন্দ।

"কাজ কর কাজ কর, সমুখে সময় বর্তমান;
অন্তরে তব জাগিছে হৃদয় মাথার উপরে ভগবান্!"

সুখ ও দুঃখ মানুষের চির সঙ্গী। যখন একটি আসে, অপরটি চলে যায়, কিন্তু কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কাজেই এদের প্রভাবে আমাদের বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়া কখনই উচিত নয়। ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা রেখে নিজের কর্তব্য পালন ক'রে চল। ঈশ্বরের বিধান সর্বদা মাথা পেতে নিও এবং সব কিছুর ভাল দিকটা নিয়েই তার বিচার ক'র। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হ'য়ো না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যই; কারণ মঙ্গলময়ের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে। এরই মধ্যে আমাদের উচিত কর্তব্য-নিষ্ঠ হ'য়ে চলা।

তোমার নিজের প্রতি এবং স্ত্রী-সন্তানাদি থাকলে তাদের প্রতি কর্তব্য-পরায়ণ হ'তে চেষ্টা কর। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রতি যথাসাধ্য কর্তব্য পালন ক'রে চল। দয়ালু, সৎ, সরল ও সত্যনিষ্ঠ হও। সর্বোপরি তোমার স্রষ্টা ভগবানের প্রতি তোমার যেন ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ থাকে। এইভাবে জীবন-যাপন ক'রে চল—যতদিন না এটা তোমার স্বভাবে পরিণত হয়। কারণ এটা সত্য ব'লে জেনো যে, দেহ ও মনে পবিত্র ও শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কারো যোগের পুণ্যপীঠে প্রবেশাধিকার জন্মায় না। কারণ 'যোগ' বলতে মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ক'রে রাখা, প্রাণায়ামাদি ও বিভিন্ন অঙ্গবিন্যাসকেই বোঝায় না। যোগ হচ্ছে—সকল চিত্তবৃত্তি বা কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি লাভ। কেবলমাত্র পবিত্র ব্যক্তির পক্ষেই কুবাসনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সুতরাং তোমার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য-পরায়ণ হ'তে সতত সচেষ্ট থেকে নিজেকে শুদ্ধসত্ত্ব ক'রে তোলার জন্য যত্নবান্ হও। আগে আদর্শ গৃহী হও, কারণ তা হওয়ার পরেই তোমার পক্ষে প্রকৃত যোগী হওয়া সম্ভব হবে।

পত্রসংগ্রহ

[াকান্ত বড়ুয়াকে শিলঙে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.o. Belur Math
7.5.31

শ্রীমান্ অন্নদা,

তোমার প্রেরিত টাকা দুইটী ও কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমার শরীর ভাল নয়, হাঁপানীর ভাবটা প্রায়ই আছে। সবই তাঁর ইচ্ছা—তোমরা কুশলে থাক—তোমাদের জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি লাভ করুক—তোমরা শান্তি লাভ কর। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.o. Belur Math
8.9.31

শ্রীমান্ অন্নদা,

তোমার প্রেরিত টাকা দুইটী পাইয়া সুখী হইয়াছি। আশা করি ঠাকুরের কৃপায় তুমি শারীরিক ও মানসিক ভাল আছ। প্রার্থনা করি—ঠাকুর তোমার প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
সারগাছি ১০ই মাঘ—
(24. 1. 1937)

পরম স্নেহাশীর্বাদমস্তু বিশেষঃ —

পরে সমাচার এই যে, তুমি বোধ হয় জান শ্রীমান্ অখিলানন্দ বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছে। New Year's Day-র (ইং নববর্ষের) দিন অন্নপূর্ণা ও ভক্তিকে লইয়া সে যে এখানে খাওয়া-দাওয়া করিয়া যায়, সে খবর বোধ হয় তোমার কাছে দিয়াছি। পরে গত ১৮।১ তারিখে অন্নপূর্ণা, ভক্তি ও অন্নপূর্ণার কন্যা Frances (ফ্রান্সেস) এখানে আসিয়া আহারাদি করে এবং বৈকালে ৫টার গাড়ীতে ফিরিয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে মঠের দুইজন মহারাজও ছিল। আগামী কল্য তাহারা কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করিবে, Colombo (কলম্বো) হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী Sail করিয়া via Pacific (প্যাসিফিকের পথে জাহাজে) আমেরিকা ফিরিবে।

পরে তুমি যে সোণামুগের ডাল পাঠাইয়াছিলে, তাহা অতি উত্তম। এ বৎসর স্বপ্নাদেশ পাইয়া আমি এখানে প্রতিমায় শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজার শুভানুষ্ঠান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ৪ঠা বৈশাখ শনিবার প্রথম পূজা ; এবং রবিবার শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা ও 'মহোৎসব' একসঙ্গেই হইবে। প্রায় সপ্তাহকাল মহোৎসবের জের থাকিবে। তোমাদের ওখানে সোণামুগের ডালের মণ প্রতি কত দাম এবং সুবিধা হইলে প্রায় ৫ মণ ডাল পাঠাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা, পত্রপাঠ জানাইবে।

আমি কবিরাজী চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়াই রহিয়াছি। প্রস্রাবে sugar (চিনি) কমিলেও আহার নিতান্ত অল্প এবং শরীর দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।

আশা করি তুমি ভাল আছ এবং শ্রীমতী সুরমাও ভাল আছে। তাহাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাইবে। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
স্বামী অখণ্ডানন্দ

শ্রীম-স্মরণে

শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

গুপ্তভাবে এলেন ঠাকুর জগৎ ছিল সুপ্ত;
ধর্ম নিয়ে হানাহানি, সত্য অবলুপ্ত।
তাঁহার সাথে এলে তুমি, তাঁরই কাজের তরে
'মণি', 'শ্রীম', 'মাষ্টার' নাম, সঙ্গোপনে ধরে।
সাদা জামা-কাপড়-পরা গৃহীর বেশে এলে
গুপ্ত-যোগী, অনুরাগী, এমন কোথায় মেলে!
ভাব-প্রেম-ভক্তি-রসে সদাই ডুবে যাই
মন-রাঙানো এমন মানুষ, কোথাও দেখি নাই।
ভক্ত কত হলেন সাধু, তোমার পরশ পেয়ে
গৃহী যে জন পায় ভরসা, তোমার পানে চেয়ে।
ভিড় জমে যায় ভক্ত-সাধুর নিত্য তোমার কাছে
জানি না তো কিসের 'যাদু' তোমার জানা আছে।
পরশমণি ছুঁয়ে তুমি শুধুই নিজের তরে,
রাখনি তো বিলায়েছ, সে ধন ঘরে ঘরে।
তাই কি ঠাকুর এনেছিলেন তোমায় সাথে ক'রে
শোনাতে 'শ্রীমুখের কথা' ধরায় অকাতরে।

প্রতীক্ষা

শ্রীমতী হিমানী রায়

ধরণীতে আবির্ভাব বার বার
হয়েছে তোমার,
এবার এসেছ তুমি রামকৃষ্ণরূপে।
স্মরণে, মননে, ধ্যানে,
ও রূপ তোমার
হৃদয়ে বরিতে চাই জ্বালায়ে মানসধূপে।
না মিলিলে কৃপাকণা
পূরে না বাসনা।
ওহে কৃপানাথ, কবে আসি অকস্মাৎ
ভরি দিবে তুমি মোর অন্তর বাহির,
তারই লাগি চিত্ত মোর আগ্রহে অধীর।

এস নাথ এস ত্বরা করি
আছি প্রতীক্ষায়,
জীবনের লগ্ন বয়ে যায়।
তোমার অমৃতস্পর্শে
প্রস্ফুটিত হবে মম জীবন কোরক,
চরণে অঞ্জলি দিব,
তোমার আশ্রয় পাব—
দেহমন হইবে সার্থক।

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সেণ্ট অগাস্টিন থেকে পরদিন আমি বন্-এ ফিরে এলাম। বন্-এ যে-প্রতিষ্ঠানের অতিথি ছিলাম, তাঁদের ওখানে আবার নানারকম ধর্মপ্রসঙ্গ হ'ল। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু সমালোচনা, মৃদু আক্রমণ—তাও হ'ল। কিছু কিছু ভুল ধারণা রয়েছে তাঁদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে। সাধ্যমতো চেষ্টা করলাম তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে—সেইসব ভুল ধারণা ভাঙতে। মনে হ'ল তাঁরা খুশীই হয়েছেন। আমাকে বললেন: 'এর পরে আমরা একটা বড় সেমিনার ক'রব, সেখানে তোমাকে আসতে হবে। আমরা তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রব।'

বন্-এ থাকাকালে 'বন্ রেডিও' থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো। 'বন্ রেডিও'তে দীপঙ্কর চক্রবর্তী নামে একজন তরুণ বাঙালী কাজ করেন। তিনি কলকাতার একজন সাংবাদিকের ছেলে। তিনি আমাকে 'বন্ রেডিও'তে নিয়ে গেলেন সেখান থেকে আমি বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় বললাম। 'বন্ রেডিও' থেকে বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এখন বাংলা একটা রাষ্ট্রের—বাংলাদেশের ভাষা। সেইজন্য বাংলাভাষাতেও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। বোধ হয়, সপ্তাহে একদিন ঘণ্টাখানেকের জন্য বাংলা অনুষ্ঠান থাকে। সেই অনুষ্ঠানে আমি বাংলাভাষায় ছোট একটা বক্তৃতা করলাম। সেই বক্তৃতাটা কলকাতার কেউ কেউ শুনেছিলেন। বাংলায় বক্তৃতার পর এক ইংরেজ মহিলা আমার একটা 'ইনটারভিউ' নিলেন। তিনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করলেন, আমি সেগুলির উত্তর দিলাম। প্রশ্নগুলি ছিল এই-রকম: 'রামকৃষ্ণদেবের বিশেষ অবদান কি?' 'কি তিনি বলতে চেয়েছেন?' 'মাদার টেরেসা নানারকম সেবাকাজ করেন। তোমরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকেও কি কর? কি কি সেবাকাজ কর তোমরা?'—ইত্যাদি। এই ইনটারভিউটা ওরা টেপ ক'রে রেখেছিল, পরে প্রচার করেছিল।

বন্ থেকে আমি গেলাম । সেখানে একজন বাঙালী ভদ্রলোক আছেন—কানাইলাল মুখার্জী। আমি পশ্চিম জার্মানিতে যাচ্ছি—খবর পেয়ে ওঁর স্ত্রী এবং উনি আমাকে এখানে বার বার লিখছিলেন যাতে আমি ডুসেলডর্ফে ওঁদের 'কটেজে' অন্ততঃ একদিনের জন্যেও যাই। ভদ্রলোক হচ্ছেন কলকাতার নন্দ মুখার্জীর ভাই। নন্দ মুখার্জী 'ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া'য় বড় চাকরি করেন। একজন ভাল লেখকও। শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, নেতাজী, ম্যাক্সমূলার এঁদের ওপরে তাঁর ইংরেজীতে বেশ কয়েকটি বই আছে। কানাইলাল মুখার্জী বিয়ে করেছেন এক জার্মান মহিলাকে। নাম—সিগলিণ্ডে ভিলবার্জ (Sieglinde Willberg)। ভদ্রমহিলা ওখানকার একজন সরকারী উকিল। ভারতবর্ষে আগে কয়েকবার এসেছেন। 'ইন্সটিট্যুটে'ও এসেছেন। মঠেও গিয়েছেন। ঠাকুর-স্বামীজীর খুব ভক্ত। আমাকে সিগলিণ্ডে বলেছিলেন যে, ভরত মহারাজ ওঁর নাম দিয়েছেন 'অশোকা'।

ভারতবর্ষের জন্য ওঁরা যা করছেন, তার কোন তুলনা হয় না। দু-এক বৎসর অন্তর অন্তর ওঁরা ভারতবর্ষে আসেন, এসে রঙীন 'স্লাইডস্'—পুরীর মন্দির, ভুবনেশ্বর মন্দির, কোনারক, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ প্রভৃতির ছবি তুলে নিয়ে যান, তারপর ওঁরা স্বামী-স্ত্রী সে-সব দেখান পশ্চিম জার্মানিতে, ফ্রান্সে ও সুইজারল্যাণ্ডে। ভদ্রমহিলা তো সরকারী উকিল—অনেক অর্থ উপার্জন করেন। আর

ভদ্রলোক ওখানকার একটি হিসাব-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মকর্তা। স্ত্রীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ওপর বিভিন্ন জায়গায় 'স্লাইডস্' দেখানো ছাড়া আরও একটি কাজ করেন তিনি। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির ওপর ভাল ভাল বই, ঠাকুর-স্বামীজীর বই, আমাদের মঠ-মিশনের বই—তিনি ওখানে প্রচার করেন। যদি কেউ পয়সা দিয়ে কেনে তো ভাল, না হ'লে বিনা পয়সাতেই বিতরণ করেন। যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন এখান থেকে প্রচুর বই কিনে নিয়ে যান। জার্মানিতে ভারতীয় ঐ ধরনের বই-এর খুব সমাদর। আমার সম্মানে ওঁদের বাড়ীতে ওঁরা একটা সভার আয়োজন করেছিলেন। অনেক ভারতীয় আর জার্মান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সবার জন্য ওঁরা খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওঁদের ওখানে আমি একরাত্রি ছিলাম। ভারী সুন্দর ওঁদের 'কটেজ'টি। এই পরিবারে গিয়ে, ওঁদের ওখানে ঐ সভাতে ব'লে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। ভারতীয় মসলার দোকানও দেখলাম জার্মানিতে। ভারতীয় জিনিসের খুব আদর পশ্চিম জার্মানিতে। ভারতীয় ধূপেরও খুব কদর। আমার তো ধারণা, কেউ যদি ওখানে গিয়ে ভারতীয় ধূপের ব্যবসা শুরু করে, তাহলে সে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারে

ডুসেলডর্ফে একজন জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। নাম—'মার্কার্ট' (Wilfried Marquardt)। তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর নামে একেবারে পাগল। আর্থিক সঙ্গতি তাঁর বিশেষ কিছু নেই। ভারতবর্ষে কখনও আসেননি—আসার মতো আর্থিক সামর্থ্যও নেই। তিনি নিজের খরচে ঠাকুর-স্বামীজীর বই অনুবাদ ক'রে ছাপিয়ে প্রচার করছেন। কেউ যদি পয়সা দিয়ে কেনে ভাল, না কিনলে তিনি বিনা পয়সাতেই সেইসব বই দিয়ে দেবেন—এই তাঁর কাজ।

জার্মানদের মধ্যে ভারতীয় ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখে যেমন আনন্দ হ'ল, তেমনি দুঃখ হ'ল ওখানকার একদল প্রবাসী ভারতীয়ের ব্যবহার দেখে। তাঁরা ভারতীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে নিন্দা করতে খুব উৎসুক। তাঁরা ব'লে বেড়াচ্ছেন, ভারতের যা কিছু সব খারাপ—পাশ্চাত্যের যা কিছু সব ভাল। ভারত দরিদ্র দেশ, ভারতের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, ভারতের মানুষের ধর্মপ্রাণতা ভারতের অগ্রগতির অন্তরায় ইত্যাদি। এইভাবে ভারতের ভাবমূর্তিটিকে তাঁরা নষ্ট করছেন। বার্লিনে প্রতি বছর 'ইণ্ডিয়া উইক' হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির নানারকম অনুষ্ঠান হয় সেখানে এবার নিখিল ব্যানার্জীর সেতার ছিল, কথাকলি নাচ ছিল, আরও কিছু কিছু অনুষ্ঠান ছিল, আর বেদান্ত সম্বন্ধে আমার একটা বক্তৃতা ছিল। নিখিল ব্যানার্জী একজন গুণী শিল্পী। দেখলাম, জার্মানরা ওঁকে খুব পছন্দ করেন, কিন্তু ওখানে যারা ভারতীয় আছেন তাঁদের তাঁর জন্য কোন গর্ববোধ করতে দেখলাম না। বিদেশে ভারতের একজন শিল্পী বাজাচ্ছেন, সমাদৃত হচ্ছেন, ভারতের একজন সাধু ভারতের মহিমার কথা বলছেন—তার জন্যে কোন গৌরব বা দেশাত্মবোধ তাঁদের নেই। তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন কতটা জার্মান হওয়া যায়। কোন সভায় হয়তো বেদান্ত বা ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বলোচ্ছ, বক্তৃতার পরে প্রশ্নোত্তর হচ্ছে। জার্মানরা বেশ ভাল ভাল প্রশ্ন করছে; ভারতীয়রাই হয়তো প্রশ্ন ক'রে ব'সল: 'বেদান্ত যদি এত ভাল হবে, তবে হরিজনদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে কেন?' আমি বেদান্তের আদর্শ ওখানে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, ভারতের একটি ভাল ভাবমূর্তি খাড়া করতে চেষ্টা করলাম; জার্মানরা দেখলাম তা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনছেন বা বোঝার চেষ্টা করছেন—সেখানে যদি আমাদের দেশেরই একজন ভারতের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লাগেন, তাহলে তার চেষ্টা

দুঃখের ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? ওদেশের লোকেরা যে এঁদের খুব ভাল চোখে দেখেন, তা নয়। অনেক জার্মান আমাকে বললেন: 'দেখ, এরা তোমার দেশের লোক, অথচ তোমার দেশ সম্বন্ধে এরা কিছুই জানে না। আমরা যতটুকু জানি, ততটুকুও না।' কিছু ভারতীয় অবশ্য আছেন—তাঁদের সংখ্যা অল্প—যাঁরা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করেন। যেমন মিঃ ত্রিপাঠী—যাঁর কথা আগে বলেছি, খুব পণ্ডিত লোক। জার্মানরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ডুসেলডর্ফের যে মুখার্জী দম্পতির কথা বলেছি, ওঁরাও ভারতের ভাবমূর্তিকে জার্মানিতে উজ্জ্বল ক'রে তোলার জন্যে খুব চেষ্টা করছেন। এঁদের দেখে খুব ভাল লাগল। আর মুগ্ধ হলাম ঐ সিগলিণ্ডে মেয়েটিকে দেখে। ভারতীয়রা নাকি ওঁর সঙ্গে তর্ক করেন ভারতের বিরুদ্ধে, আর উনি ভারতের পক্ষ নিয়ে তাদের দেখাতে চেষ্টা করেন—ভারতের মহত্ত্ব কোথায়।

ডুসেলডর্ফ থেকে আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ আসি একরাত্রের জন্যে। সেখানকার একটি প্রতিষ্ঠান আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর্ রিলিজিয়াস ফ্রীডম'। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আবার এলাম পশ্চিম বার্লিনে। বার্লিনে এবার আমি একটানা পনেরো-দিন ছিলাম—১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর। বার্লিনে এবার এসে আমি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেখলাম। সেগুলির একটি হচ্ছে 'চিলড্রেন্‌স্ গার্ডেন্‌স্' বা শিশু-উদ্যান। ইংরেজীতে যাকে 'ক্রাশ' (creche) বলে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকটা তাই। আমাদের দেশেও অবশ্য আজ-কাল এ-সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। ওখানকার ঐ শিশু-উদ্যানগুলিতে আড়াই বছর বয়স থেকে আরম্ভ ক'রে ১৪-১৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়ে থাকতে পারে। সারাদিনই প্রায় সেখানে থাকে। সাধারণতঃ তাদের বাবা-মা উভয়েই কাজ করেন। হয়তো দুজনেই এত ব্যস্ত যে, ছেলেমেয়ের দেখাশুনো করতে পারেন না। ছেলেমেয়েদের তাঁরা ওখানে রেখে যান। সেখানে তাদের থাকা-খাওয়া, খেলাধুলা বা অন্যান্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও আছে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা। আবার এর মধ্যে তাদেরকে নানারকম বিষয়ও শেখানো হয়। যেমন, গানবাজনা বা কোন হাতের কাজ। দেখলাম, ওদের বড় বড় সব বাড়ীঘর আছে, বাড়ীর সঙ্গে আবার বাগানও আছে। বাগানের জন্যই বোধ হয় নাম দিয়েছে 'গার্ডেন্‌স্'। এত বড় ব্যাপার চালানোর বিরাট খরচও আছে। আমি জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, কিছুটা খরচ ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা দেন—বাকিটা সরকার বহন করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'ছেলেমেয়েরা যারা বড় হয়েছে, তারা স্কুলে যায় না?' ওঁরা বললেন: 'হ্যাঁ যায়। এখান থেকেই যায়। আমরাই খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে এখান থেকেই স্কুলে পাঠিয়ে দিই। স্কুল থেকে ফিরে ওরা এখানেই আসে। তারপর খাওয়া-দাওয়া ক'রে বাবা-মা'র জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অনেকের হয়তো বাবা আছে মা নেই, বা মা আছে বাবা নেই। অফিস থেকে যখন তাঁরা ফেরেন, ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফেরেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'এখানে স্থান পাওয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় না?' বললেন: 'হ্যাঁ, ভয়ানক কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তবে সরকার থেকেই ঠিক ক'রে দেয় কাকে নেওয়া হবে, কাকে নেওয়া হবে না। কাজেই সেটা নিয়ে আমাদের কোন মাথা ঘামাতে হয় না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'এখান থেকে কেউ পালিয়ে যায় না?' ওঁরা বললেন: 'না,

কেউ পালিয়ে যায় না।' 'নিজেদের মধ্যে মারামারি করে না ?' বললেন : 'সে তো একটু করবেই। সে কি আর একেবারে বন্ধ করা যায় ! তবে সেটা কোন সমস্যা নয়।' এই প্রতিষ্ঠানটি দেখে খুব ভাল লাগল। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর সেখানকার কর্মীরা হাসিমুখে সব কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

বার্লিনে আমি একটা বিরাট মিউজিয়াম দেখেছি। তার একটা অংশ ভারতীয় বিভাগ। এই বিভাগে যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু রাখা আছে, সেগুলির অধিকাংশই নেওয়া হয়েছে মথুরা থেকে মাইল বিশেক দূরের একটা জায়গা থেকে। কি ক'রে ওরা যেন সেই জায়গাটা আবিষ্কার করে ! ভারত সরকারের সঙ্গে তারা এই-রকম একটি চুক্তি ক'রে নেয় যে, ঐ জায়গাটা তারা খুঁড়বে আর সেখানে যা যা জিনিস পাবে তা ওদের দেশে নিয়ে যাবে। সেইসব জিনিসগুলি নিয়ে গিয়ে ঐ মিউজিয়ামে তারা সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রেখেছে। অধিকাংশই বৌদ্ধযুগের। এর বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান আর অতীত এখানে পাশাপাশি দেখানো হচ্ছে। একদিকে ঐ অঞ্চলের একালের শ্রমিকদের (অধিকাংশই মেয়ে শ্রমিক), যারা ঐ জায়গাটা খুঁড়েছিল, তাদের পোশাক, নাকের নথ, পায়ের মল, হাতের চুড়ি প্রভৃতি দেখাচ্ছে। তার পাশাপাশি দেখাচ্ছে : অতীতে ওখানকার মানুষ কি ধরনের পোশাক বা গহনা প'রত, কি ধরনের বাসনপত্র ব্যবহার ক'রত—ইত্যাদি, যা তারা মাটি খুঁড়ে ঐ অঞ্চলে পেয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় : অতীত আর বর্তমানের মধ্যে তফাত সামান্যই। আমাদের পল্লীজীবন যেন একই রকম রয়ে গেছে—বিশেষ বদলায়নি। আর দেখলাম যে, বিভিন্ন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রও সেখানে সাজানো আছে, যেমন—বাঁশি, তবলা, মৃদঙ্গ, ঢোল, তানপুরা, বীণা প্রভৃতি নানারকম তারের যন্ত্র। আবার কোন্ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কি-রকম সেটা বোঝাবারও ব্যবস্থা আছে। যেমন—কেউ হয়তো মৃদঙ্গের আওয়াজটা শুনতে চায়। মৃদঙ্গটার পাশে একটা শোনার যন্ত্র রাখা আছে। তার পাশে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু পয়সা তাকে ফেলতে হবে। আমাদের এখানে ফোন করতে গেলে যেমন পয়সা দিতে হয়, সেই-রকম। তারপর ঐ শোনবার যন্ত্রটা কানে দিলেই সে মৃদঙ্গের আওয়াজ—যা ওখানে রেকর্ড করা আছে—শুনতে পাবে। এই মিউজিয়ামের বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে কোন গাইড নেই। পাহারা দেবার জন্য কয়েকজন লোক অবশ্য আছে। সুন্দর সাজপোশাক পরে তারা সব দাঁড়িয়ে থাকে। তারা লক্ষ্য রাখে : কেউ কোন জিনিস নষ্ট করছে কিনা, বা চুরি করবার চেষ্টা করছে কিনা। এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, গাইডের কোন প্রয়োজনই হয় না। একটা ক'রে হেডফোন (Head-phone) রাখা আছে। একজায়গায় একটা ছবি হয়তো টাঙানো আছে। কেউ সেটা সম্বন্ধে জানতে চাইলে, ছবিটির কাছাকাছি যে হেডফোন আছে—পয়সা দিয়ে ঐ হেডফোনটা কানে লাগালে, সে একটা রেকর্ড শুনতে পাবে : এই ছবিটির শিল্পীর নাম এই। এই সময়কার লোক ইনি। এই এঁর পরিচয়। এঁর উল্লেখযোগ্য অবদান এই। এঁর আরও কয়েকটা ছবি এই মিউজিয়ামে আছে। অমুক অমুক নম্বরের ছবি এঁর, ইত্যাদি। ইংরেজী, ইতালি, জার্মান এই তিনটি ভাষায় শোনবার ব্যবস্থা আছে—যার যে-ভাষায় সুবিধে

বার্লিনে থাকাকালে ওখানকার ভারতীয় দূতাবাস থেকে আমাকে একটা অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল। ওখানে যিনি এখন রাষ্ট্রদূত আছেন, তিনি একজন বাঙালী। প্রথমবার বার্লিনে পৌঁছেই আমি এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ীতে দেওয়ালীর

নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। খুব ধূমধাম ক'রে সেখানে দেওয়ালী পালন করা হয়। সেখানেই ঐ রাষ্ট্র-দূতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি তখন বলেছিলেন : 'আমার ইচ্ছে আপনি একদিন আমাদের ওখানে আসুন। সেখানে বিশিষ্ট কয়েকজনকে ডাকবো—আপনি 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বলবেন।' সেই অনুযায়ী আমি গেলাম একদিন তাঁদের কার্যালয়ে। কিন্তু যাঁদের তিনি ডেকেছেন, তাঁরা বিশিষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা এমন লোক যাঁদের বেদান্ত বা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন আগ্রহ আছে ব'লে আমার মনে হ'ল না। তাঁদের কাছে বেদান্ত-সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে আমি বিশেষ আনন্দ পেলাম না। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর। সেও খুব ভাল লাগল না। শেষপর্যন্ত একটা প্রশ্নই বড় হ'য়ে দাঁড়াল, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের দারিদ্র্য। পাকিস্তানের কয়েকজন ভারতের দারিদ্র্যের কথাই বার বার ক'রে বললেন। আমি পাকিস্তানে কখনও যাইনি, তবে লোকমুখে বা অন্য সূত্রে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় সেখানেও দারিদ্র্য কিছু কম নেই—খুবই আছে দারিদ্র্য। যা হোক, আমি ওঁদের একটা কথা বললাম : 'আপনারা দারিদ্র্য কোন্ দিক থেকে বিচার করেন, জানি না। যদি বলেন, ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের হাতে নগদ টাকা কত আছে, তাহলে নিশ্চয়ই ব'লব, নগদ টাকা তাদের হাতে বেশী নেই। আপনারা যদি ভারতের গ্রামে যান, সেখানকার লোক নগদ টাকা বেশী দেখাতে পারবে না; কিন্তু অনেক পরিবার আছে, তাদের ধানের জমি আছে, ফলের বাগান আছে, তরকারীর জমি আছে, পুকুরের মাছ আছে, নিজস্ব গরু আছে, গরুর দুধ আছে; কিন্তু হয়তো নগদ টাকা বিশেষ নেই কেউ যদি বলে, এখুনি আমাকে নগদ দু-দশ হাজার টাকা দাও, তা তারা দিতে পারবে না। কিন্তু তাদের অনেকে মোটামুটি ভাল খায়, ভাল পরে। যেহেতু তাদের মাসিক আয় টাকার হিসেবে খুবই কম, তাই পরিসংখ্যান অনুযায়ী তারা দরিদ্র অথবা দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের দরিদ্র বলা চলে না। আমাদের যে গ্রামীণ অর্থনীতি সেটা এই-রকমই।'—ব্যাপারটা আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

সভার পর আমি আমাদের রাষ্ট্রদূতকে বললাম : 'যাঁরা ভারতকে ভালবাসেন, তাঁদের তো আপনি ডাকেননি?' তিনি বললেন : 'আমাদের কাছে তো তাঁদের কোন তালিকা নেই। আমাদের হাতড়াতে হয়—কাকে ডাকবো আর ডাকবো না। এঁদের ডেকেছি, কারণ এঁরা আমাদের ডাকেন।' আমি বললাম : 'সেটা হয়তো কিছুটা করতে হয়; কিন্তু এইসব উপলক্ষে এমন লোকদেরই ডাকা উচিত, যাঁদের ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, ভারতের সম্বন্ধে, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁরা জানতে আগ্রহী।' উনি বললেন : 'আপনি যাঁদের আমন্ত্রণে বার্লিনে এসেছেন, তাঁদের যদি আমাদের কাছে এ-রকম লোকদের একটা তালিকা দিতে বলেন, তাহলে এর পরে যখনই ভারতীয় ধর্ম বা সংস্কৃতির ওপরে কোন অনুষ্ঠান হবে, আমরা তাঁদের ডাকবো।' ওখানে ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে বোঝায় একটা ভারতীয় নাচ বা একটা ভারতীয় গান—এ-ছাড়া আর কিছু না। আমি ওঁকে বললাম : 'আমাদের নৃত্য, সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য—সব-কিছুর মূলেই রয়েছে ধর্মচেতনা! এ সবকিছুই তার রস গ্রহণ করছে ধর্ম থেকে। তাই ধর্মকে বাদ দিলে, মূলোচ্ছেদ করলে আমাদের সংস্কৃতির কিছুই থাকে না। সেইজন্য ভারতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে হ'লে আগে ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা থাকা দরকার।' উনি বলছেন : 'কি ক'রব বলুন! এখানে তো

গাদা গাদা বই আছে, গাদা গাদা মাসিক পত্রিকা আসে, কিন্তু তাতে তো ধুলো জমছে, কেউ উল্টেও দেখে না!'—এই হচ্ছে অবস্থা। তবে এখন যিনি রাষ্ট্রদূত ওখানে, তিনি খুবই উৎসাহী। তিনি, তাঁর স্ত্রী উভয়েই এ-সম্বন্ধে খুব সচেতন যে, আমাদের দেশের ভাবমূর্তিটি ভালভাবে ওদেশে তুলে ধরতে হবে।

ওখানে যাবার পর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাকে বক্তৃতা করতে ডাকে। এগুলি আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব—এ-কথা আমি বলছি না, সেটা আমার উদ্দেশ্যও নয়। আমি যেটা বোঝাতে চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে: আমি একজন সাধারণ মানুষ ওখানে গেছি। ওখানে আমাকে কে জানে? কিন্তু লোকমুখে রটে গেছে, একজন হিন্দুসন্ন্যাসী এসেছেন। তাঁদের কৌতূহল, তাই তাঁরা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় ডাকছেন। আমি লক্ষ্য করলাম—আমি যেখানেই যাই, সেখানেই একজন জার্মান ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন। তারপরে তিনি নিজেই একদিন আমাকে পরিচয় দিয়ে বললেন: 'আমি তিনবছর ভারতবর্ষে ছিলাম। আমি হিমালয়-অঞ্চলে ঘুরেছি—নিঃস্ব অবস্থায়। ইচ্ছে করেই কপর্দকশূন্য অবস্থায় ঘুরেছি। ভাষাও জানতাম না, কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে আতিথেয়তা আমি পেয়েছি, তা কখনও ভুলব না। আমার সেখানে কোন অসুবিধা হয়নি। আমি তখন ছাত্র ছিলাম, এখন গবেষণা করছি। মেঘালয়ে যে 'নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি' আছে, সেখানে আমি কিছুদিন পড়িয়েও এসেছি। ভারতবর্ষকে আমার বড় ভাল লাগে। ভারতবর্ষকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি।' উনি আরও বললেন: 'আমি এবং আরও কয়েকজন এখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যোগ' নিয়ে গবেষণা করছি।' বাস্তবিক, যোগ এবং ধ্যান গোটা পাশ্চাত্যজগৎকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। পশ্চিম জার্মানিতেও যোগের খুব চল। বার্লিনেই ন-টা যোগের স্কুল রয়েছে, আগেই বলেছি। এই ভদ্রলোক এবং তাঁর সহকর্মীরা যোগের কি কি শারীরিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়, সেই নিয়ে গবেষণা করছেন। উনি বললেন: 'আমাদের মধ্যে একদল হচ্ছেন জীববিজ্ঞানী, আর একদল মনোবিজ্ঞানী। এই দুটো বিভাগের সঙ্গে আছে দর্শন-বিভাগ। এই তিনটে বিভাগ মিলিত-ভাবে যোগের সম্বন্ধে গবেষণা করছে। যোগশাস্ত্রে যে ষট্‌চক্রের কথা বলা আছে, সত্যিই কি সে-রকম কিছু আছে? ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্নার কথা বলা হয় সত্যিই কি সে-সব আছে? সত্যি কি একটা শক্তি শিরদাড়ার ভিতর দিয়ে ওপরে ওঠে? এগুলি নিয়ে আমরা গবেষণা করছি। এটা গেল শারীরিক দিক। যোগের কি কি শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা নিয়ে যেমন আমরা গবেষণা করছি, তেমনি করছি যোগ-অভ্যাস করলে মানসিক কি কি অনুভূতি হয়, তা নিয়েও।' তারপর আমাকে তিনি বললেন: 'আপনি যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বলেন এবং আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেন, তাহলে খুব ভাল হয়।' আমি রাজী হলাম এবং বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বেদান্ত-সম্বন্ধে বক্তৃতা করলাম এবং পরে আলোচনা প্রসঙ্গে 'পঞ্চকোষ' সম্বন্ধে বললাম। সেখানে গিয়ে দেখি, অনেক ছাত্রছাত্রী যোগ অভ্যাস করছে আর তাদের অধ্যাপক হচ্ছেন একজন শিখ ভদ্রলোক। কিন্তু চেহারা দেখে তাঁকে ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানলাম, তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক, সেখানে যোগশিক্ষা দেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বর্তমানে নিযুক্ত করেছে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ একটা আলাদা বিভাগ (faculty)। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে বক্তৃতা করেছিলাম, তাতে চারশোরও বেশী শ্রোতা

ছিল। পাশ্চাত্যে এত শ্রোতা সাধারণতঃ কোন বক্তৃতায় হয় না।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন ফিরে আসছি, তখন দেখলাম বরফ পড়ছে। আমার কাছে এ-এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমার পরনে ওভার-কোট। মাথা আর কান টুপীতে ঢাকা। বরফ পড়ে পোশাক সাদা হ'য়ে যাচ্ছে। তখন ঐ ভদ্রলোক ঠাট্টা ক'রে আমাকে বলছেন: 'Swamiji, you look like a snowman.'—'স্বামীজী, আপনাকে তুষার-মানবের মতো দেখাচ্ছে'। এখানে বলি, আমার পোশাকের জন্য আমাকে অনেক জায়গায় অনেক রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। সবাই অবাক হ'য়ে যেত, অনেকে আবার মুচকি মুচকি হাসত আমাকে দেখে! ছোট ছেলেমেয়েরা মজা ক'রত খুব। কি রকম বলি: আমার খুব ইচ্ছা ছিল একটা মাধ্যমিক স্কুলে যাব। ওরা আমাকে নিয়ে গেল একটা স্কুলে। সেখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল সেটা। ক্যাথলিকরা চালায়। তবে অন্য সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাও সেখানে পড়তে পারে। সেই স্কুলে আমি ঢুকছি। প্রিন্সিপ্যাল আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার পোশাক দেখে ছাত্রছাত্রীরা যা আরম্ভ করেছে, সে আর কি বলব! শিস্ দিচ্ছে, চিৎকার করছে, ডিগবাজী খাচ্ছে। আমিও হাসছি! ঐ পরিস্থিতিতে এ-ছাড়া আর কি-ই বা ক'রব? যদিও কান-টান নিশ্চয়ই লাল হ'য়ে গিয়েছিল। প্রিন্সিপ্যাল খুব লজ্জা পাচ্ছেন। আর আমাকে যে ভদ্রলোক ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি রেগে গিয়ে বলছেন: 'দেখেছ, আমাদের জার্মান ছেলেমেয়েরা কী দুষ্টু! একটুও ভদ্রতা জানে না।' আমি বললাম: 'দেখ, সব দেশের ছেলেমেয়েরাই এই-রকম এ কিছু না।' তারপর একটা ক্লাসে আমি ঢুকলাম। ছাত্রছাত্রীদের পনেরো-ষোল বছর বয়স। ওদের দেশে পনেরো-ষোল বছরের ছেলেমেয়েদের বেশ বড় দেখায়। কয়েকটি ছেলেকে দেখলাম খুবই লম্বা। তারা কেউ কেউ খুব মজা করছে আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে এসে হ্যাণ্ডশেক ক'রে বলছে: 'হ্যালো!' এটা আর কিছু না—একটা মজা আর কি! ক্লাসটা চালাচ্ছে দেখলাম একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে। তার ব্যক্তিত্ব দেখে অবাক হলাম। কোন ছেলে বা মেয়ে হয়তো গোলমাল করছে, সে আঙুল দেখিয়ে বলছে: 'you, over there!'—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলে বা মেয়ে চুপ ক'রে যাচ্ছে। এতটা ভয় করে তাকে! আমার জন্য তারা বেশ কয়েকটা প্রশ্ন লিখে রেখেছিল—সেগুলির আমি উত্তর দিলাম। নানারকম প্রশ্ন। 'তোমাদের দেশের ছেলেরা কি খেলাধুলো করে?' আমি বললাম, কি কি খেলা এদেশের ছেলেরা খেলে। ক্রিকেট খেলে শুনে তারা অবাক হ'য়ে গেছে! ওরা ক্রিকেট মোটেই খেলে না—হকি আর ফুটবল খুব খেলে। 'আচ্ছা, তারা গান ভালবাসে?' আমি বললাম: 'কে না গান ভালবাসে?' 'পপ মিউজিক?' 'না, পপ মিউজিক আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত খুব প্রচলিত হয়নি।' 'তারা নানা-রকমের বই পড়ে?' 'নিশ্চয়ই পড়ে।' আসলে ওদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানারকম উদ্ভট ধারণা এখনও আছে। মাঝে মাঝে ওখানে ভারতবর্ষের ওপরে প্রদর্শনী (Exhibition) হয়—কিছুদিন আগে ঐ স্কুলেই একটা প্রদর্শনী হ'য়ে গেছে। সেই প্রদর্শনীতে হয়তো ভারতের সম্বন্ধে নানারকম ছবি দেখানো হয়েছে। কি ধরনের ছবি? রাস্তার ওপরে গরু বসে আছে; নোংরা বস্তি; ভিখিরি ভিক্ষে করছে, ইত্যাদি। ওরা প্রশ্ন করছে: 'তোমরা গরু পূজো কর কেন?' আমি অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম—এই-সব প্রশ্নের জন্য। আমি জানতাম যে, ঘুরেফিরে এই-সব প্রশ্ন আসবেই।

আমি উত্তর দিলাম। তখন বলছে: 'তোমরা হিন্দুরা গরু খাও না কেন?' আমি বললাম: 'গরুর মতো এত উপকারী প্রাণীকে হত্যা করতে আমাদের খারাপ লাগে।' তখন ভারী মজার কথা বলছে ওরা: 'তাহলে মরা গরু খাও না কেন?' এ-সব কথাবার্তা হ'ল তাদের সঙ্গে। দেখলাম যে, খুব প্রাণবন্ত তারা। কোন ভয়-ডর বা সঙ্কোচ নেই।

বার্লিনে আমি আর একটা জিনিস দেখলাম: 'বার্লিন ফিলহার্মোনিক সোসাইটি' (Berlin Philharmonic Society)। ওখানে একটা অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে গেল ওরা। বিরাট হল। প্রায় চার হাজার লোক বসতে পারে। অনেক টাকা খরচ ক'রল আমার জন্য। একেবারে সামনের সারিতে বসালো আমাকে। ঐ হলটার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম—গ্যালারি বা পোর্টিকোগুলি এমনভাবে সাজানো, যাতে যেখানেই কেউ বসুন না কেন, স্টেজের খুব কাছেই থাকবেন তিনি। আমি যে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, সেটা একটা পিয়ানোর অনুষ্ঠান। ওঁরা বললেন: 'যিনি আজ পিয়ানো বাজাবেন, তিনি এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পিয়ানো-বাদক। ভদ্রলোক রাশিয়ান। দেশ থেকে পালিয়ে এসে জার্মানিতে রয়েছেন।' দেখলাম যে, তাঁর বাজনা শোনবার জন্য কী ভিড়! হল একেবারে ভর্তি। আমারও খুব ভাল লাগল সেই অনুষ্ঠান। মনে রাখবার মতো অভিজ্ঞতা।

আমি বার্লিন ছাড়লাম ১লা ডিসেম্বর ১৯৮১। বিদায়ের সময় দেখলাম অনেকের চোখে জল। আমার তো ধারণা ছিল—জার্মানরা খুব কাঠখোট্টা জাত, তারা কেবল লড়াই করতেই জানে। তাদের চোখে জল দেখে খুব অবাক লাগল। তারা অনেকে বলছে: 'কেন তুমি যাচ্ছ বল তো? থেকেই যাও না এখানে?' আবার বলছে: 'সামনের বছর তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে।' আমি দেশে ফিরে জানলাম, আমি এখানে এসে পৌছানোর আগেই তারা মঠে চিঠি দিয়েছে: 'উনি যেন সামনের বছর অক্টোবর মাসে আবার আসেন।' বাস্তবিক, মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়ে এদের কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি, সে আমার কাছে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। 'স্মরণীয়' এই কারণে যে, এই ভালবাসা আমার প্রতি নয়—রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একজন সন্ন্যাসীর প্রতি, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রতি। [ক্রমশঃ]

ভক্তের ভগবান্

শ্রীমতী মানসী বরাট

সুদীপ্ত-তেজ ভাস্করে আছ
স্নিগ্ধজ্যোতি চন্দ্রে।
লহরীমুখর পারাবারে আছ
শ্যাম-ঘন মেঘ মন্দ্রে।
অখণ্ড তব ব্যাপ্তি, আমার
আঁখি দুটি মোহ-অন্ধ,
দেখার সে দিঠি কোথা পাব হরি
বিশ্বাসে নীরন্ধ্র।
আছ চারি বেদে, ঋষি কণ্ঠের
সুললিত সামগানে
আছ, প্রাজ্ঞের জ্ঞানে, ধ্যানীর ধেয়ানে,
মানবের মাঝে পুরুষকার।
আমি জ্ঞানী নই, ধ্যানী নই আমি
কি হবে কেশব গতি আমার?
অস্তায়মান জীবন-সূর্য
ত্বরায় নামিবে রাত্রি।
কোন্ সে পাথেয় তরিবে ওপারে
নিঃস্ব এ একা যাত্রী।
একটি ভরসা আছে মোর হরি,
ভক্ত-হৃদয়-পদ্মমাঝ
আছ চিরদিন, দাও হে ভকতি
ভবার্ণবে তরিতে আজ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাণী ঃ
সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর যে বিশ্ববিমোহন মাতৃমূর্তিতে তিনি জগতে করুণাধারা ঢেলে দেবার ব্রত নিলেন, তার প্রস্তুতিতে তাঁর আরও একটি অশ্রুতপূর্ব প্রার্থনা ছিল। সেটি হ'ল: "ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনও কারও দোষ না দেখি।"[১৫] মায়ের চোখ সন্তানের দোষ দেখে না, মায়ের স্নেহে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, দোষ-গুণ—এ-সকলের বিচার নেই, তা অবারিত দুর্বার গতিতে সব সন্তানের দিকে ছোটে। শ্রীশ্রীমায়ের প্রার্থনা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। সেজন্য উত্তর-কালে তিনি ধনী-নির্ধন, সাধু-অসাধু, পাপী-পুণ্যবান্, উচ্চ-নীচ, সকলেরই 'মা' হয়েছেন, সকলের জন্যই তাঁর হৃদয়-দুয়ার সতত খোলা থাকত। যার নেই কোন সম্বল, কোন গুণ, কোন সুকৃতির পুঁজি, সমাজের চোখে নীচু, কৃতকর্মের জন্য যে সকলের চোখেই হেয়, এমন কি নিজের চোখেও—সেও তাঁর স্নেহ-করুণা-সেবা—অবিরল ধারায় পেয়েছে। বরঞ্চ যে দীন, সম্বলহীন, অনুতপ্ত দুষ্কৃতকারী, তার জন্য মায়ের স্নেহ একটু বেশী ছিল যা অবিরল ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে তার সব দুঃখ-বেদনাভার মুছে নিতে চেয়েছে। পূজ্যপাদ অরূপানন্দ মহারাজ লিখছেন: "যাহাকে কেহ দেখিতে পারে না, মা ঠিক তাহাকেই আরও আদর-যত্ন করিতেন। কেহ কোন মহা গর্হিত কার্য করিয়াও যদি তাঁহার নিকট অনুতপ্ত হইয়া যাইত, তিনি তাহাকে অভয় দিতেন। একবার একটি যুবতী এইরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে মা কোল দিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, যা করেছ করেছ, আর ক'রো না' এবং তাহার পাপরাশি নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, যাহাতে তাহার সুমতি হয়।"[১৬] এ বিষয়ে মায়ের কথা ছিল: "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি ক'রে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে ক-জনে?"[১৭] তিনি আরও বলতেন, "আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!"[১৮] "এই মাতৃসুলভ স্নেহ ও ক্ষমা দ্বারাই তিনি বিপথগামীকে সুপথে আনিতেন"[১৮]—বলেছেন স্বামী অরূপানন্দ। মায়ের দুরাচারী দুর্বল সন্তান পদ্মবিনোদের জন্য মায়ের বরাবরই ছিল অপার করুণা ও বিশেষ স্নেহ।

এই দোষদৃষ্টিহীন মাতৃসুলভ অসামান্য সাম্য-দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র জগৎকে তিনি এক ক'রে দেখেছেন। তার পশ্চাতে ছিল ব্রহ্মদর্শন—"তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি।" সকলেই তাঁর সন্তান, আত্মার আত্মীয়, কার দোষ দেখবেন, কাকে ছোট করবেন, কাকে ফিরিয়ে দেবেন? তাই তাঁর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য মহাশক্তিধর সারদানন্দও যে, আর বিধর্মী দস্যু আমজদও সে ("আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজদও তেমন ছেলে")। "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা"—তাঁর দর্পিত উক্তি। এ দর্পিত উক্তি একমাত্র বিশ্বচরাচরের জীবধাত্রী জননীর পক্ষেই সম্ভব। যিনি দস্যু আমজদ ও সন্ন্যাসী সারদানন্দকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন, কী বিস্ময়কর তাঁর সাম্যদৃষ্টি! জগৎকে এই দৃষ্টি

---

১৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৩৩৭ ১৬ ঐ, ২। (২৭) ১৭ ঐ, ২। (২৬)
১৮ ঐ, ২। (২৭)

দিয়ে দেখলে, এই অসামান্য সাম্যদর্শনের ভিত্তির উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, মানুষের হাতে-গড়া সব ভেদ-বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ হয়। বস্তুতঃ ভেদ-বৈষম্য দূরীকরণের অন্য পন্থা নেই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। আজ সাম্য-প্রতিষ্ঠার যে সকল প্রয়াস আমরা দেখছি, দেখছি তার পরিণামে নিত্য নতুন বৈষম্যের আবির্ভাব, গোষ্ঠী-ভেদের বিবাদ-বিসম্বাদ, নিদারুণ হিংসা ও রক্তপাত। হিংসা ও রক্তপাত মানুষকে পশু ক'রে তোলে। মানুষকে পশু ক'রে তুললে ভেদ-বৈষম্য কখনও দূর করা যায় না। যে বলবান্ সে দুর্বলকে গ্রাস করতে চাইবেই—এই হ'ল পাশবধর্ম। মানব ধর্ম দুর্বলকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, তাকে বাঁচতে সাহায্য করে, তাকে সব খর্বতা, সব অপূর্ণতাকে জয় ক'রে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'তে সহায়তা করে। এদিক দিয়ে শ্রীশ্রীমাই আমাদের বাঞ্ছিত সাম্য-সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁরই পদতলে সমবেত সাদা-কালো-পীত—নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, নানা ভাষাভাষী, নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের মানুষ, জন্মকর্মের, ভাষাধর্মের, জাতি-বর্ণের মানুষের হাতে-গড়া ভেদ-বৈষম্যের সকল প্রাচীর সেখানে ভেঙে পড়েছে। "মা আমাদের গণ্ডীভাঙা মা"—বলতেন পূজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ। সারা পৃথিবীর সকল মানুষ মায়ের নিকট একটি সুখী মানব-পরিবার, তিনি তাদের মা, আর তারা তাঁর সন্তান—এই তাদের একমাত্র পরিচয়। বস্তুতঃ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষকে মা তাদের বিচিত্র ধর্ম, বিচিত্র বেশ, বিচিত্র আচার-ব্যবহার-সহ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন, তাঁর পদতলে তারা যেন বিচিত্রবর্ণের বিভিন্ন পুষ্পরাশি দ্বারা গঠিত একটি পুষ্পস্তবক ("নানা ফুলের সাজি")। এ-বিষয়ে আশ্চর্য উদার ও মুক্ত মন ছিল তাঁর। নিবেদিতা লিখেছেন: তাঁর নিকট পাশ্চাত্যের বিবাহের রীতিনীতি ও বিবাহকালীন শপথের বাণী শুনে মা বলেছেন, 'কি সুন্দর ধর্মের কথা'। মনস্বিনী নিবেদিতা মায়ের আশ্চর্য গ্রহণশীলতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, একাল ও সেকালকে তিনি একই সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা প্রতিনিয়ত যে জাতীয় ঐক্য ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াসের কথা শুনছি, তিনি তা কি সহজেই না স্থাপন করেছেন।

যারা এই মায়ের চরণতলে আসত—অকৃতি অধন্য হ'তে বিদ্বান মনীষী, ত্যাগী-যোগী-সন্ন্যাসী কি পেত তারা তাঁর কাছে, কেন আসত, কি দেখত তাঁর মধ্যে? মায়েরই কৃপাধন্য এক সন্তানের ভাষায় তারা দেখত: "সম্মুখে স্নেহ-পারাবার—অপরূপ মা—অনন্ত আনন্দধাম।"[১৯] তাঁর কাছে আছে শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি—দুঃখভার হ'তে মুক্তি, রিক্ততার বোঝা হ'তে মুক্তি, পাপবোধ হ'তে মুক্তি। তিনি তাদের অভয় দিয়েছেন, তারা উঠে দাঁড়াতে পেরেছে। তাদের চিন্তা-চেষ্টা চরিত্র বদলে গিয়েছে।[২০] কেউ বা সব বন্ধনমুক্ত হ'য়ে গৈরিক ধারণ ক'রে প্রব্রজ্যার পথে গিয়েছেন, কেউ বা ভক্ত-ভগবানের সংসার নিয়ে থেকেছেন, কিন্তু তিনিও অনুভব করেছেন জন্ম-জন্মান্তরের পরম সংপ্রাপ্তি তাঁর মিলেছে। এমনই একজনের প্রতিবেদন—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

১৯ শ্রীশ্রীমা সারদামণি—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, (১৩৬৩), পৃঃ ২০৭

২০ এ-বিষয়ে একজন ভক্তের প্রতিবেদন—"শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ, অসীম করুণা এবং অনন্ত দয়ার কথা লিখিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।···শত শত ভক্ত সেই পরশমণি-স্পর্শে সোনা হইয়াছেন।" শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১।২৪৯

"যা দেখেছি, যা শুনেছি তুলনা তার নাই,
এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে, যে শতদল পদ্মরাজে,
তারই মধু করেছি পান, ধন্য আমি তাই।"[২১]

আশ্চর্য সংসারী মানুষ, যে শত ভুল করে, শত প্রলোভনে প্রলোভিত হয়, সংসারে সে দাবদাহে দগ্ধ—এ-সব সত্ত্বেও মায়ের চরণতলে যে কয়েকটি মুহূর্ত সে কাটিয়েছে সে-কটি মুহূর্তেই অনন্ত জীবনের অনন্ত পাওয়া পেয়ে গিয়েছে ব'লে সেও মনে করেছে। "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহম্—এই তাঁদের মর্মের কথা।[২২]

আজও তাঁর জীবন থেকে এই অভয়বাণী, স্নেহ-করুণা ও মুক্তির বাণীই ভক্তজনেরা সম্বল করেছে। তাঁর জীবন-বাণীর এই দিকটিই, আজও যারা তাঁর চরণে আশ্রয় নেয়, তাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। মা কখনও ঠাকুরের মতো আসর ক'রে বসে ধর্ম-প্রসঙ্গ করেননি বা তত্ত্ব আলোচনা করেননি। তিনি তারা যা চেয়েছে তাই দিয়েছেন—দিয়েছেন অভয়, আশ্বাস, করুণা, স্নেহ—ধরা ছোঁয়া যায় এমন জিনিস। তাদের পূজা-প্রণাম পেয়ে তিনি কখনও পাথরের দেবী হ'য়ে যাননি, কঠোর পরিশ্রম ক'রে তাদের সেবা করেছেন, নিজের মায়ের মতো যত্ন ক'রে খাইয়েছেন। অপূর্ব তিনি সেজন্য। কত সহজ, কত আপনার, তাঁর নিকট শত অপরাধ নিয়েও যাওয়া যায়, তাঁর কাছে আছে অপার ক্ষমা। তিনি সংসারেই থেকেছেন, তাদেরই সংসারপারে নিয়ে যাবার জন্য তিনিই চিরকালের মা। ধর্মোপদেশ বা তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য আছে 'কথামৃত', আছে স্বামীজীর রচনাবলী। মায়ের কাছে তারা চেয়েছে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস—অভয়, আশ্বাস, ক্ষমা, স্নেহ, করুণা ও কৃপা।

আমরা উপরে দেখেছি তাঁর সান্নিধ্যের অনির্বচনীয় প্রভাবে যারা তাঁর চরণতলে এসে পৌছুত তারা নিজেকে ধন্য মনে ক'রত। সূর্য-কিরণ যখন পৃথিবীর উপর এসে পড়ে, তখন মুহূর্তে সব তমসা দূর হ'য়ে যায়, চারিদিক আলোয় ঝলমল ক'রে ওঠে, দিকে দিকে প্রাণের স্পন্দন জাগে। এ ঠিক সেই রকম। এখানে উপদেশ বা তত্ত্বকথা নিম্নস্তরের জিনিস। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক সাধনার দ্বারা যে অমৃত মন্থন করেছিলেন, স্বামীজী যার বার্তা দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন, মা সেই সিদ্ধি-স্বরূপ বা অমৃত-স্বরূপ হ'য়ে বিরাজ করেছেন। তাই তাদের নিকট শুধু মায়ের করুণাঘন বিশ্বহিতে ধ্যানমগ্ন কল্যাণসুন্দর মাতৃমূর্তিখানির দর্শনই কাম্য ছিল মন্দিরে দেববিগ্রহের দর্শনের মতো, কাম্য ছিল শুধু তাঁর মঙ্গলস্পর্শ ও আশীর্বাদ। কথার এখানে স্থান কোথায়? কথা তো শাস্ত্রে, পুস্তকে, পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনের মস্তিষ্ক ও মগজে অনেক পাওয়া যায়। তার মূল্য কতটুকু? তা দিয়ে একটাও মানুষ কি তার জীবন-সমুদ্র পার হ'তে পারে, সমাজ-সংসারের সঙ্কটমোচন তো দূরের কথা? তা যদি হ'ত তো জগৎ-সংসারে আজ কোন সমস্যা থাকত না, সব সমস্যারই সমাধান হ'য়ে যেত? তাহলে কেন এত সঙ্কট? এত জটিলতা? অবক্ষয়ের এত প্রসার? তাঁরা কখনই মানুষকে দিতে পারেন না সেই বস্তু, যা দিয়ে সব সংশয় মোচন হয়, হৃদয়ের সব গ্রন্থি দূর হয়, মানুষ দুঃখ হ'তে, রিক্ততা হ'তে মুক্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হয় পূর্ণতার, শান্তি ও আনন্দের রাজ্যে। কিন্তু মায়ের কাছে ঠিক এই বস্তুই সকলে পেত—সব সংশয়ের অবসান, সব সমস্যার সন্দেহাতীত রূপে সমাধান, প্রশ্নাতীত তর্কাতীত প্রত্যয়ের বস্তু তাদের করতলগত হ'ত, অন্তরে লাভ হ'ত

২১ ৺মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত স্মৃতিচারণা কালে এ-কথা প্রায়ই বলতেন।
২২ "মায়ের পাদপদ্মই আমার অনন্তকোটি তীর্থ"—জনৈক ভক্ত—শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১।২২৭

শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ। এইটি হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান।

কিন্তু অগণিত সন্তানদের সংশয়-দীর্ণ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিগত স্তরে তিনি যা বলেছেন, সংশয় নিরসন ছলে বা যে অভয়বাণী দিয়েছিলেন, সে বাণীগুলিও অমূল্য রত্ন, সাহিত্য-রসে ভরপুর। আবার সেগুলি সমাজ-সংসারের রক্ষাকবচ স্বরূপও। সেগুলি অতি স্বল্প কথায় ব্যক্ত, অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রাণপ্রদ। সত্য এগুলির মধ্য দিয়ে প্রখর সূর্যের মতো দীপ্তিমান, সেই প্রখর সূর্যের দীপ্তির সঙ্গে এক অপার শান্তির স্নিগ্ধতা মিলিত হ'য়ে সেগুলিকে অনির্বচনীয় রসমাধুর্যে ভরপুর ক'রে তুলেছে। সেগুলি স্বয়ম্প্রভ, পাঠ করলে মুহূর্তের জন্যও সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে সেগুলি ধ্রুববাক্য। কিন্তু আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগে—তিনি তো প্রচলিত অর্থে লেখাপড়া জানতেন না, সাহিত্য পড়েননি (সামান্য মহাভারত রামায়ণ পাঠ শোনা ছাড়া) কোথা থেকে পেলেন এমন সতেজ প্রকাশভঙ্গী, অপূর্ব বাক্যশৈলী বা অনন্য শব্দচয়ন-ক্ষমতা? এ তাঁর অপূর্ব সাম্যদৃষ্টি, অসাধারণ স্থৈর্য ধৈর্য, সহনশীলতা, আশ্চর্য শ্রেয়োবোধের মতোই বিস্ময়কর। তার সম্পর্কে আগাগোড়া বিস্ময়, কেবলই বিস্ময়, আমাদের মনে থেকেই যায়। তাঁর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী ও বাক্যশৈলীর দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

(১) "ধ্যান কি ভাবে ক'রব?" একজনের এই প্রশ্নের উত্তরে মায়ের স্পষ্ট, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরটি হ'ল : "তাঁর চিন্তা।" মাত্র দুটি কথা হাজার কথার ব্যাখ্যার চেয়ে প্রাঞ্জল। এ নিয়ে শাস্ত্রের কথা যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন এ দুটিই ধ্যানের সারকথা।

(২) আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন, "সাধন ভজন কি ভাবে ক'রব?" তাঁর উত্তর : "তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা।"[২৩] সকল সাধনতত্ত্বের সার মা মাত্র এই কয়েকটি কথার দ্বারা তুলে ধরেছেন।

(৩) আর একটি প্রশ্ন—"অনুরাগ না থাকলে শুধু জপ করে কি হবে?" উত্তরে মায়ের সুন্দর উপমা প্রয়োগ: "জলেতে ইচ্ছে করেই পড়, ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই।"[২৩] নিঃসংশয়ে অতি সত্য কথা, এ এমন কথা যে পাঠকের মনও প্রত্যয়ে ভরে ওঠে।

তাঁর বাণীগুলির মধ্যে অধিকাংশই অভয়বাণী, সেগুলির মধ্যে অশেষ তেজ শক্তি, বল বীর্য নিহিত আছে—পড়ামাত্র পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। একজনের প্রশ্ন ছিল—"কত আর মনের সঙ্গে লড়াই করা যায়? এক বাসনা যাচ্ছে তো অন্য বাসনা উঠছে।" মায়েরও বলিষ্ঠ প্রত্যয়-ভরা উত্তর, "যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই।...তিনিই রক্ষা করবেন। যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হ'তে চায়, তাকে তিনি যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ।"[২৪] এ বলিষ্ঠ প্রত্যয় আমাদের মনেও প্রত্যয় জাগায়—যেমন দীপ থেকে দীপ জ্বলে ওঠে।

মায়ের বাণীর কতকগুলি বিশেষ ক'রে অপূর্ব কবিত্বসুষমামণ্ডিত। অথচ এগুলিও উচ্চতম জ্ঞান বা উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা। যেমন ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে বলছেন, "আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস ক'রে কি যায়? এও তো তেমনি। ধীরে ধীরে কর্মক্ষয় হয়।"[২৫] পুনরায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অধীর কোনও সন্তানকে বলেছিলেন, "দেখ বাবা, সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে নীচুতে।

২৩ ঐ, ১।৩২৪ ২৪ ঐ, ২।১১১ ২৫ ঐ, ২।৮৬

জলকে কি ডেকে বলতে হয়—'ওগো সূর্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও।' সূর্য আপনার স্বভাবে জলকে বাষ্প ক'রে উপরে তুলে নেয়। তোমাকে কিছু করতে হবে না।"[২৬] কথাগুলি অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ অথচ প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় অপূর্ব শক্তিমণ্ডিত এক অভয়-সম্পদে ভরা।

মায়ের কতগুলি কথার মধ্যে উচ্চতম জ্ঞান যেন প্রস্ফুটিত হ'য়ে আছে। যেমন, "কালে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হ'লে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠুকুর সবই মায়া।" কিংবা যেমন একই প্রসঙ্গে আবার বলেছেন, "জ্ঞান হ'লে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা, মা' শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হ'য়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা!"[২৭] এবং এই সহস্র-দলকমলের মতো প্রস্ফুটিত জ্ঞানের নিকট জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মনীষার দীপ্তসূর্য স্বামী বিবেকানন্দও নতশির, নতজানু। মায়ের নিজেরই বর্ণনা ঘটনাটি : "নরেন বলছিল, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।' আমি বললুম (হাসিয়া বলিতেছেন), 'দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!' নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?'"[২৮]

মায়ের শব্দচয়ন সম্পর্কে দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মধ্য দিয়ে মায়ের তীক্ষ্ণ মেধা সূর্যকিরণের মতো প্রদীপ্ত। স্বামীজী যখন অখণ্ডানন্দ মহারাজের সঙ্গে ভারত-পরিক্রমায় যাত্রা করেন, তার পূর্বে মায়ের আশীর্বাদ নিতে এলেন। মা পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দকে বললেন, "বাবা, তোমার হাতে আমাদের 'সর্বস্ব' দিলাম"। এই অল্প কয়েকটি কথার দ্বারা মা স্বামীজীর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও গুরুত্ব সব সুন্দরভাবে স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের দেহ-ত্যাগের পর মা আক্ষেপ ক'রে বলেন, "মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি—সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীরে আলো ক'রে বেড়াত।"[২৯] এখানে •রামকৃষ্ণ মহাসঙ্ঘে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের অনন্য স্থানটি—এই তিন কথা "শক্তি, ভক্তি ও যুক্তি"-এর দ্বারা অতি সুন্দর বুঝিয়েছেন। এখানে এ-কথা কয়টির অন্য কোন বিকল্প নেই। আর কোন শব্দই এত অর্থবহ হ'ত না।

মায়ের উপদেশের মধ্যে কয়েকটির তুল্য অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই ব'লে মনে হয়। যেমন এই কথা কয়টি "তিনি যত দুঃখকষ্ট দিচ্ছেন, তা তো বুক পেতে নিতে হবে।"[৩০] গীতার "সুখে-দুঃখে সমে কৃত্বা" শ্লোকটির মতো এ-কথা কয়টি গভীর অর্থবহ মনে হয়। এ-বাণীর অনন্যতা এখানে এই যে, এ-বাণী পাঠের সঙ্গে হৃদয়ে বল সঞ্চারিত হয়।

সামাজিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ মায়ের কয়েকটি বাণী নিম্নোক্তরূপ :

(ক) "দয়া যার শরীরে নেই, সে কি মানুষ? সে তো পশু।"[৩১] (খ) "কাউকে কষ্ট দেওয়া, কটু বলা ভাল নয়।"[৩২] (গ) "কথায় মত্ত হওয়া ভাল নয়। মন্দটা ভেবে ভেবে দুঃখ পেতে হয়।"[৩৩] (ঘ) "আমি তো চক্ষুলজ্জা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। 'অপ্রিয়বচন সত্য

২৬ শ্রীশ্রীমা সারদামণি, পৃঃ ২৫৯-৬০ ২৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৪৯

এইরূপ অপর দৃষ্টান্ত "ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, সদসৎ-বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়।" ঐ, ২।৩২

২৮ ঐ, ২।৪৯ ২৯ ঐ, ১।৯৪ ৩০ ঐ, ১।২৯৬

৩১ ঐ, ২।১২ ৩২ ঐ, ২।৪৭ ৩৩ ঐ, ২।৯১

কদাপি না কয়।'"[৩৩] (ঙ) "সহ্যগুন বড় গুণ—এর চেয়ে আর গুণ নেই।"[৩৪] (চ) "ক্ষমারূপ তপস্যা।"[৩৫] (ছ) "নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল।"[৩৬] (জ) "অপচয় করা সয় না।"[৩৭] (ঝ) যার যা প্রাপ্য, তা হ'তে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত? ইত্যাদি—"[৩৮]

একদিনের ঘটনাচ্ছলে একটি অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা সমাজের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনাটি হ'ল: একদিন একজন পরিচারিকা ঘর ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটি এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে মা তাকে ভৎর্সনা ক'রে বলেন, "ও কি গো, কাজটি হ'য়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা ক'রে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হ'য়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস ব'লে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে? তাছাড়া, এ সংসারে ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটি সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য ক'রে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।"[৩৯] অপূর্ব শিক্ষা! সংসারের সব তুচ্ছ কাজও যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে করা হয়, যার যা প্রাপ্য সম্মান, তা যদি তাকে দেওয়া হয়, সংসার তাহলে শান্তি ও সুখের আলয় হয়—এ নিঃসন্দেহে সত্য।

তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—"যদি শান্তি চাও, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখো, কেউ পর নয়, জগৎ তোমার আপনার।"[৪০] এ-কথাগুলি মন্ত্র, শান্তি মন্ত্র, এ-মন্ত্র অনুসরণ করলে জগতে সব হানাহানি, ভেদ-বৈষম্য ও অশান্তি দূর হয়।

মা এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো জগৎকে নতুন কিছু দেবার জন্য। আধুনিক একীকৃত জগতের প্রয়োজন ঐক্যদর্শন, যার সহায়তায় সমগ্র মানবজাতি এক অখণ্ড মানব-জাতি ব'লে নিজেদের মনে মনে অনুভব করতে পারে। মা যে শিক্ষা বা পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা এ-যুগের নয়, যুগ-যুগান্তের অতীতে তার মূল, যা তখনও বিনষ্ট হয়নি; বেশ সজীব, সতেজ ও সক্রিয় ছিল। কিন্তু তার জীবন-সম্মুখে প্রসারিত হ'য়ে স্পর্শ করেছে সমগ্র জগৎকে, তার দূর ভবিষ্যৎকে ব্রহ্মময় জগৎ এই ব্রহ্মানুভূতি প্রাচীন ধারায় অধ্যাত্ম-সাধনার মাধ্যমে লাভ ক'রে জগতের প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার দেবার একটি অঙ্গীকার তার জীবনে রয়েছে, সে অঙ্গীকার স্লোগানের রূপ নেয়নি, তা অনন্য ভারতের নিজস্ব পন্থায়—সর্বজীবে করুণা ও প্রীতি বিতরণের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে। আজকের একীভূত পৃথিবীর যে জন্য সংগ্রাম—শান্তি ও সাম্যের জন্য, তা তাঁর দুখানি করপুটে তিনি ধারণ ক'রে আছেন।

"জননী তোমার বক্ষে শান্তি,
কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন,
চরণে তোমার বিতর মুক্তি।"

—কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অঙ্কিত ভারতমাতার এই ছবি তাঁরই ছবি—তাঁর বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে অভয় উক্তি, হস্তে তিনি বহুজনকে অন্ন বিতরণ করেছেন, আর তাঁর চরণ মধ্যেই সহস্রজন পেয়েছে মুক্তি।

তাঁর মহামন্ত্র "জগতে কেউ পর নয়, জগৎ তোমার আপনার" আগামী সমাজের বাঁচার বীজমন্ত্র।

৩৪ ঐ, ২।৯৩ ৩৫ ঐ, ২।১২১ ৩৬ ঐ, ২।২৩৯ ৩৭ ঐ, ১।৭৯
৩৮ ঐ, ১।৮০ ৩৯ ঐ, ২।২৫৪ ৪০ ঐ, ২। (৩৮)

শুধু যে মায়ের বাণীর মধ্যে ভবিষ্যতের সমাজ-রচনার ভিত্তি রয়েছে, তা নয়; ভবিষ্যতের মানুষ মার জীবন ও বাণীর উপর রচনা করবে কত কাব্য, কত সাহিত্য। মায়ের একজন চরণাশ্রিত জীবনীকারের উক্তির এখানে অনুরণন করা যেতে পারে: "মার জীবনেতিহাস সত্যই একখানি নিছক কাব্য—একটা অমৃতমাখা সঙ্গীত। একটি ক্ষুদ্র কুঁড়ি জয়রামবাটীর প্রান্তরে জন্মিয়াছিল। দৈবক্রমে তাহা দক্ষিণেশ্বরের নহবত-ঘরে আসিয়া পড়িল। সেখানে এক যাদুকরের স্পর্শে তাহা দলের পর দল মেলিয়া এক বিশালায়তন প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইল। অপূর্ব তাহার রূপ, রস, গন্ধ।···যাদুকর অদৃশ্য হইলেন কুসুমটি জগৎকে দান করিয়া। কুসুমের কাজ আরম্ভ হইল। তাহার রূপ, রস, গন্ধ বিতরণের কাজ। কি তার ইতিহাস? একটি নিবেদিত জীবন—একটি স্নেহ-সেবার অবিরাম প্রবাহ, একটি শান্তি, মুক্তি ও অভয় বিতরণের অফুরন্ত উৎসব। মহাশক্তিময়ী মহাকরুণায় আবির্ভূতা। কে জানিত একখানি গ্রাম্য প্রান্তরের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য কুঁড়ির ভিতর এত সুধা, এত ঐশ্বর্য, শুধু প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল! এ কি বিকাশ! এ কি আবির্ভাব! এ এক মহাকাব্যকথা!

"বস্তুতঃ এই কাব্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত শুধুই বিস্ময় ও মাধুর্য—একটা অপার্থিব শোভা ও সৌন্দর্য। আমরা দেখিয়াছি, মার জীবনে কর্ম আছে, কিন্তু তার কোলাহল নাই। তিনি সেবা করেন, সহ্য করেন, স্নেহ-করুণা বিতরণ করেন, অপরের পাপ-তাপ গ্রহণ করেন; কিন্তু নিজে কিছু প্রত্যাশা করেন না।"[৪১]

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীমায়ের একটিই কামনা ছিল, তা হ'ল: সকলে সুখী হোক, কেউ যেন দুঃখ না পায়, সকলে মুক্ত হ'য়ে যাক।[৪২] আর একটিই কাজ তিনি সম্পন্ন করতে চেয়েছেন, তা হ'ল: সকলের দুঃখ পাপ-তাপ মুছে নিয়ে, তাকে আনন্দ ও শান্তির স্পর্শ দেওয়া। সকলের সুখ যেদিন সকলে মনেপ্রাণে চাইবে, সেদিন সত্যই সব দুঃখ দূর হ'য়ে যাবে, জগৎ-সংসার শান্তির আগার হবে, পৃথিবী সেদিন সত্যই পুণ্যগন্ধা পৃথিবীতে পরিণত হবে। মায়িক জগতে হয়তো সেই পূর্ণতায় কখনই পৌছনো যাবে না, কিন্তু তার কাছাকাছি যাবার প্রয়াস মানুষ চিরদিনই করবেন, কারণ মানুষের লক্ষ্য হ'ল সেই 'পূর্ণতা'।

স্মরণ রাখতে হবে—তাঁর আদর্শের মধ্যেই তিনি প্রস্ফুটিত হ'য়ে আছেন, জীবন্ত হ'য়ে আছেন তাঁর বাণীর মধ্যেই। তাঁর চিহ্নিত মানুষরা আজও পেয়ে আসছেন তাঁর মঙ্গল স্পর্শ তাঁর আদর্শের মধ্য দিয়ে, তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে। তার জন্য শুধু প্রয়োজন হৃদয়-দুয়ার খোলা রাখা। আর তিনি আছেন সঙ্ঘরূপে—আজও শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি, এবং এই মহাসঙ্ঘই অভ্রভেদী আকাশপ্রদীপের মতো আজকের বিভ্রান্ত পৃথিবীকে আলো দেখাচ্ছে। আজকে মানবকল্যাণব্রতীদের তাই এই আলোকে আলোকিত পথেই চলতে হবে।

পরিশেষে তাঁর বাণীর সাহিত্যিক মূল্য তার অসামান্য অনির্বচনীয় মাধুর্যের সম্পদে, দীপ্ত সত্যের প্রকাশের মধ্যে নিহিত; আর তার সামাজিক মূল্য নিত্য নব নব শক্তি ও প্রেরণায় মানুষকে সঞ্জীবিত করবার প্রাণসম্পদের মধ্যে।

৪১ শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী, পৃঃ ৫২৩

৪২ '···আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মুক্তিলাভ হোক। জন্ম-মৃত্যু বড় যন্ত্রণা, তা যেন তোমাদের আর ভুগতে না হয়।' শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১।৪২

'কিমিদম্'

স্বামী ধ্যানেশানন্দ

জীবনে চলার পথে কত মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কতজনের সংস্পর্শে আসি—তাদের সকলের কথাই কিন্তু আমাদের মনের মণিকোঠায় স্থান পায় না। এদের মধ্যে দৈবাৎ কদাচিৎ এমন মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি, যাঁর কথা আমরা জীবনে ভুলতে পারি না, যিনি আমাদের সমস্ত সত্তাকে আকর্ষণ ক'রে নেন। তাঁদের আমরা চিনতে বা বুঝতে না পারলেও তাঁদের প্রতি কী এক আকর্ষণ অনুভব করি! তখন ভিতর থেকে এক অস্ফুট প্রশ্ন জেগে ওঠে—'কিমিদং যক্ষম্?'—কে ইনি?

বর্তমান যুগে আমরা নিজেদের খুব সভ্য ব'লে মনে করি। কিন্তু জগৎময় রণভেরীর আভাস, মানুষে মানুষে নির্লজ্জ ঝগড়া-বিবাদ, পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ ও অশান্তির কালো ছায়া যখন দেখি, তখন হতাশায় মন ভরে ওঠে। বর্বর যুগের সঙ্গে তথাকথিত বর্তমান সভ্য যুগের কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। এত হতাশার মধ্যেও যখন কোন মানুষ শান্তির বার্তা নিয়ে আসেন, প্রেম-ভালবাসার কথা বলেন, শুধু বলেন না, অন্যকে তা বিতরণ করেন বা মানুষের জীবনে কি ক'রে শান্তি ফিরে আসবে, তার জন্য উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে পথ দেখান, তখন বিস্ময়াহত মন থমকে দাঁড়ায়; মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান দেখে অভিভূত হয়, আর হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ধ্বনি উৎসারিত হয়—কে ইনি?

আমরা এই নিবন্ধে এমন একজনের সম্বন্ধে আলোচনা করতে চলেছি, যাঁকে সমসাময়িক মানুষেরা দেখে ও যাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, হতবাক্ হয়েছিলেন, হতাশ জীবনে শান্তি ফিরে পেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলের ভিতর থেকে একই প্রশ্ন অনুরণিত হয়েছিল—কে ইনি? বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মানুষেরাও যদি ঐরূপ মানুষের কথা চিন্তা করেন, তাহলে শান্তি ও সান্ত্বনা পাবেন এবং তাঁদেরও মনে একই প্রশ্ন জাগবে।

মানব-মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা: অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখার প্রবণতা মানুষের স্বভাবজাত এবং এটাই তার বৈশিষ্ট্য। এইখানেই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য। যদিও জীববিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞায় মানুষ পশু-পদবাচ্য, তথাপি গরু, ঘোড়া, ভেড়ার সঙ্গে তার পার্থক্য সহজবোধ্য। দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণন মানুষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন: "Man is not a slave of environment. He can say 'no', but not the animal. He can impose discipline on his nature and check the drive of desire. He can create a new nature on the self. An animal cannot do all these." তিনি আরও বলেছেন: "As man possesses intellect and has a creative will, he achieves his fulfilment by effort and will." তাই মানুষ যা পেতে চায়, জানতে চায়, যতক্ষণ সে তা না পায়, ততক্ষণ তার চাওয়া শেষ হয় না। এই অনুসন্ধান ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য অনুসারে চলতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানুষের রূপটি কিন্তু আরও পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তিনি বলছেন: "A man is a man so long as he is struggling to rise above nature, and this nature is both internal and external." মানুষের রূপটি এখানে মহান্ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। মানুষের অনুসন্ধানের বিষয় কেবল বহিঃপ্রকৃতি নয়, অন্তরের প্রকৃতিও—আর এটাই

তার ধর্ম। সবকিছুকেই মানুষ আপন বুদ্ধির নিরিখে যাচাই ক'রে নিতে চায়, মন-পর্দায় কোন রকম কুয়াশা তার সহ্য হয় না। আর এই অসহনীয়তাই তার মধ্যে প্রশ্ন জাগায়—এই প্রশ্ন, এই জিজ্ঞাসা মানুষের চিরন্তন।

উদ্‌ভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত তরুণের জিজ্ঞাসা : আমরা এখানে একটি ঘটনার অবতারণা করছি, যাতে এক অশান্ত যুবকের জীবনধারা আমূল পরিবর্তিত হ'য়ে যায়।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ২৮।২৯ বছরের এক যুবক। সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত, ভাগ্নের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এক বাগান-পরিবেষ্টিত দেবালয়ে এসে উপস্থিত। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা দেখলেন, একটি ঘরে এক ব্যক্তি তক্তপোশে বসে সহাস্য বদনে হরিকথা বলছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসে আছেন। একটু শোনার পর যুবকটির মনে হ'ল : "যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ কীর্তন করিতেছেন।" যুবকটি আরও ভাবছেন— "কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা!" সন্ধ্যার পর যুবকদ্বয় আবার ঐ ঘরে এসে উপস্থিত। ঘরে অদ্ভুত মানুষটি একা বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যুবকটি লক্ষ্য ক'রল যে, মাঝে মাঝে তিনি অন্যমনস্ক হচ্ছেন—"যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না ; এ ঠিক সেইরূপ ভাব।" কিছু কথাবার্তার পর এই অদ্ভুত মানুষটি যুবকটিকে "আবার এসো" ব'লে বিদায় দিলেন। এই সাক্ষাৎকার যুবকটির চিন্তাজগতে বিপরীতমুখী স্রোত বইয়ে দিল। যুবকটি ফেরার সময় ভাবতে লাগলেন, "এ সৌম্য কে?"—এই সৌম্যকান্তি পুরুষ হচ্ছেন যুগ-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং যুবকটি স্বয়ং 'শ্রীম' বা মাস্টার মশায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মাস্টার মশায় আমাদের সকলের প্রতিভূ হ'য়ে আমাদের হৃদয়ের জিজ্ঞাসাটি যেন সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন। এ জিজ্ঞাসা সৌম্যকান্তি পুরুষের নাম, নিবাস বা পেশার খবর জানার জন্য নয়। এ জিজ্ঞাসা মানুষটিকে গভীরভাবে জানার জন্য।

কেনোপনিষদের আখ্যায়িকায় এই জিজ্ঞাসা : কেনোপনিষদে আমরা একটি সুন্দর আখ্যায়িকার সন্ধান পাই। সেখানে শুভ্রশির ঋষি শিষ্য-পরিবৃত হ'য়ে জগতের উচ্চতম তত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছেন। যেমন আশ্চর্য শিষ্য, ততোধিক আশ্চর্য গুরু। ঋষির উপদেশরীতিও অদ্ভুত! তত্ত্বোপদেশ দিতে দিতে তিনি মানব-ভাষার চরম শিখরে আরোহণ ক'রে পুনরায় অতি সাবলীলভাবে নিম্নতর মানবগ্রাহ্য ভাষায় উচ্চতম তত্ত্বটি শিষ্য-হৃদয়ে গ্রথিত ক'রে দেবার জন্য একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করেন। স্বর্গে দেবাসুর-সংগ্রামে দেবতারা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা আপন বলবীর্য গরিমায় উৎফুল্ল হ'য়ে আত্মশ্লাঘায় ভরপুর। এমন সময় তাঁদের সম্মুখে এক অপরূপ ও অপূর্ব মূর্তি আবির্ভূত হলেন। সেই অত্যদ্ভুত মূর্তি দেখে দেবতাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, "কিমিদম্"—কে ইনি? দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি, বায়ু এক এক ক'রে সেই আগন্তুক অত্যদ্ভুত মূর্তির পরিচয় জানার জন্য আপন আপন বল-বিক্রম নিয়ে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই চূর্ণিতগর্ব ও বিফলমনোরথ হ'য়ে ফিরে এলেন। সর্বশেষে দেবরাজ স্বয়ং জানার জন্য এগিয়ে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে আসতে দেখে ঐ মূর্তি অদৃশ্য হলেন। ইন্দ্র হতাশ হলেও ছাড়বার পাত্র

ছিলেন না। তিনি তখন বসে আত্মসমীক্ষা করতে লাগলেন। চিত্তের মলিনতা সরে যেতেই ইন্দ্রের চিত্তাকাশে এক অপরূপ শোভমানা দেবী, উমা হৈমবতীর আবির্ভাব হয়। তিনি ইন্দ্রের জিজ্ঞাস্য মূর্তির স্বরূপ ব'লে দিলেন। সেই মূর্তিই যে ব্রহ্ম, তা দেবরাজ ঐ মাতৃমূর্তির কাছ থেকেই জানতে পারেন। সর্বকালেই নিত্যশুদ্ধ বোধস্বরূপ ব্রহ্ম মানুষের কাছে অপরূপভাবে, আকর্ষণী-শক্তি নিয়ে মানবাকারে উপস্থিত হন এবং "কিমিদম্"—এই জীবন-জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-মনীষায় দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণ-সম্পর্কে ঔৎসুক্য: উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ভাগ্য নানা পঙ্কিল আবর্তে পাক খেতে খেতে ঘন অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে পড়ে। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্রুবতারার ন্যায় ভারতাকাশে উদিত হন। যেমন নাজরথের আকাশে উদিত উজ্জ্বল তারাটিকে সেখানকার লোকেরা চিনতে পারেননি, সেইরকম ভারতাকাশের এই ধ্রুবতারাটিকেও দেশবাসী তখন চিনতে পারেননি। সাধারণ লোক দেখেছে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর পূজারী বা পাগল ঠাকুর বা কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুয্যের ছেলে হিসাবে। মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁকে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও কিসের এক আকর্ষণে তাঁর কাছে এসে হতবাক্ হয়েছেন, বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাই এক-এক জন এক-এক রূপে আপন ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর যেন বহুরূপ, তিনি যেন বহুরূপী। এই সব দেখেই জ্ঞানী ভক্ত গেয়েছেন:

"কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমায় দেবতারি মান. / (আমি) গৌরব সব ত্যজিয়া দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান॥"

প্রায় সকল বঙ্গ-মনীষীর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। আমরা তাঁদের কয়েকজনের দৃষ্টি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার চেষ্টা ক'রব।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু, আর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের কালীবাড়ীর পূজারী। একদিন কুঠীবাড়ীর বারান্দায় মথুরবাবু আরাম-কেদারায় শায়িত রয়েছেন। হঠাৎ কালীবাড়ীর উত্তর-পূর্ব বারান্দায় তাঁর দৃষ্টি প'ড়ল। দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে পাদচারণ করছেন। যখন পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে যাচ্ছেন, মথুরবাবু দেখছেন, মা-কালী বরাভয়-করা রূপে অগ্রসর হচ্ছেন, আর যখন পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে যাচ্ছেন, শূলপাণি শিব ত্রিশূল হস্তে যাচ্ছেন। মথুরবাবু তাঁর এই দর্শনকে প্রথমে দৃষ্টিভ্রম ব'লে মনে করেছিলেন। তাই হাত দিয়ে ভাল ক'রে চোখ কচলিয়ে যখন একই দৃশ্য দেখলেন, তখন বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে তাঁর মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জেগেছিল—আমাদের পূজারী ঠাকুর তথা 'বাবা' তো শুধু রক্ত-মাংসের মানুষ নন! তবে ইনি কে?

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত কেশব সেনের সঙ্গে বেলঘরিয়ার উদ্যানে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একটি গান গাইতে গাইতে তিনি সমাধিস্থ হন। তারপর মিষ্টি মধুর হাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্যদশায় নেমে এসে গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সরল ভাষায় বলতে থাকেন। সকলে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর কথা শুনতে থাকেন। এই সাক্ষাৎকারের পর কেশবচন্দ্র 'মিরর' সংবাদপত্রে লিখলেন: "আমরা অল্পদিন হ'ল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করেছি। তাঁর গভীরতা, অন্তর্দৃ এবং বালক স্বভাব দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।" এই থেকে বুঝা যায় যে, কেশবচন্দ্রের মনে এমন একটা ছাপ পড়েছিল, যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল যে এই লোকটি তো আর দশজন লোকের মতো নয়! লোকটিকে ভাল ক'রে

দেখতে হবে, বুঝতে হবে—এই চিন্তা নিশ্চয়ই কেশবচন্দ্রকে ঠাকুরের সম্পর্কে 'মিরর' পত্রিকায় লেখার প্রেরণা যুগিয়েছিল।

সেকালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলার সাহিত্যসম্রাট এবং স্বাদেশিকতার উদ্‌গাতা ব'লে পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয় অধরচন্দ্র সেনের বাড়ীতে। দীর্ঘ সময় ধরে নানা বিষয়ে তাঁদের কথা হয়। অবশ্য ঠাকুরই সেখানে মূল বক্তা, বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে কথা ব'লে কথাবার্তার ধারা চালিয়ে গেছেন। বঙ্কিমবাবু ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন—এই দৃশ্যটি মাস্টার মশায়ের ভাষায়: "বঙ্কিমবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একাগ্র হয়ে কি ভাবছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন। গায়ে শুধু জামা। একটি বাবু চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া চাদর তাঁহার হস্তে দিলেন। বঙ্কিমবাবু কি ভাবিতেছিলেন?" মাস্টার মশায় এটুকু বলেই শেষ করেছেন কিন্তু একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব যে, এমন কোন প্রশ্ন বা সমস্যা তাঁর চিত্তপটে নিশ্চয়ই উদিত হয়েছিল, যাতে তাঁকে ভাবিত দেখাচ্ছিল। এখন প্রশ্ন, এই ভাবনার বিষয়বস্তু কি হ'তে পারে? প্রথমতঃ হ'তে পারে—যে বিষয় আলোচনা হচ্ছিল সেই বিষয়ক কোন সমস্যা, অথবা, যাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কথোপকথনের যে বর্ণনা পাই, তাতে বঙ্কিমবাবুর মতো মানুষকে তখনই ভাবিত করার মতো কোন বিষয় ছিল না। তবে একজন নিরক্ষর, পূজারী ব্রাহ্মণ অনর্গল সহজ সরল ও সরস ভাষায় নানা বিষয় কথা ব'লে যাচ্ছেন দেখে, বঙ্কিমবাবুর পক্ষে ভাবিত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। আর আমাদের ধারণা এটাই বঙ্কিমবাবুকে একাগ্রভাবে ভাবিত করেছিল।

মনীষী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদগোপ্তা, সর্বৈশ্বর্যময় প্রভৃতি ব'লে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন: "সর্বৈশ্বর্যময়! নিঃস্ব, বিরক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া তুমি আসিলেও তোমার চক্ষের ঐ প্রসন্ন দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি কে? তুমি নিরক্ষরতার ছলনা করিলেও অনুভব করিয়াছি—তুমিই সেই বেদগোপ্তা! নইলে কাহার বাক্যামৃতে বেদ ও বেদান্তবাণী এমন করিয়া নিঃসারিত হয়? তুমি চির-শঠ! এবার ছলনা করিলেও তোমার চাতুরী যে ধরিতে পারিয়াছি, দেবতা! তুমি রামকৃষ্ণ—একাধারে তুমিই কি রাম ও কৃষ্ণ নহ?"

তান্ত্রিক সাধক ও সুপণ্ডিত গৌরীকে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আচ্ছা, বৈষ্ণব-চরণ একে (নিজের শরীরকে দেখাইয়া) অবতার বলে; এটা কি হ'তে পারে? তোমার কি বোধ হয় বলো দেখি?" গৌরী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন: "বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে তো ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোক-কল্যাণ-সাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য সাধন করেন, আপনি তিনিই!"

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগ চিকিৎসা করছেন রোগীর চিকিৎসা করতে এসে নানা প্রসঙ্গাদি শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে ছয়-সাত ঘণ্টা কেটে যেত, তা ডাঃ সরকারের খেয়াল থাকত না। এই রকম যে ডাঃ সরকার, তাঁর বাড়ীতে মাস্টার মশায় একদিন ঠাকুরের অসুখের অবস্থা জানাতে এসেছেন। সেখানে ডাক্তারের একজন বন্ধু ডাক্তারকে বলছেন, "মহাশয়, শুনতে পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ 'অবতার' বলে। আপনি

তো রোজ দেখছেন, আপনার কি বোধ হয়?" ডাক্তার বললেন: "As man, I have the greatest regard for him." ডাক্তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও বস্তুবাদী। ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ ক'রে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, এ-কথা মানেন না। তাই মানুষ-হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভক্তির কথা কেবল বলেছেন। এখানে স্মরণীয় যে, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন ঠাকুরের ভাষায় 'গম্ভীরাত্মা', সহজে তিনি তাঁর ভাব প্রকাশ করতেন না সর্বসমক্ষে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য এবং একজন উচ্চস্তরের সাধক। পশ্চিমে তীর্থাদি ভ্রমণ ক'রে কলকাতায় ফিরেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বসলে, মহিমা চক্রবর্তী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, তীর্থ ক'রে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন।" বিজয়কৃষ্ণ বললেন, "কি ব'লবো! দেখছি যেখানে এখন ব'সে আছি, এখানেই সব; কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথায় চারি আনা, এই পর্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ যোল আনা দেখছি!"

শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয়: "প্রাথমিক দৃষ্টিতে যে কোন বস্তুই সসীম বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহাকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে—কি গুণের দিক দিয়া, কি সম্ভাবনার দিক দিয়া, কি শক্তির দিক দিয়া, কি সম্বন্ধের দিক দিয়া উহার কোন অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বিচারের দৃষ্টিতে উহা অসীম হইয়া দাঁড়ায়।" স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীকে অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই—একই বস্তু, তা ইট, কাঠ, পাথর বা মানুষ যাই হোক, তার দুটি পরিচয়: একটি আপাত বাহ্য পরিচয়, যা সসীম এবং অপরটি আন্তর পরিচয় তা অসীম বাহ্য পরিচয়টি সকলের কাছে সহজে প্রকাশ্য, কিন্তু আন্তর পরিচয় পাবার জন্য কিছু প্রযত্নের প্রয়োজন। বহু মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন। বেশীর ভাগ মানুষই তাঁর বাহ্য পরিচয় নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্তন করেছেন, কিন্তু কতিপয় ভাগ্যবান্ মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর কেবল বাহ্য পরিচয়টিতে সন্তুষ্ট থাকেননি, আন্তর পরিচয়ের কিছু খবর পেয়ে মুগ্ধচিত্তে প্রশান্তহৃদয়ে ফিরে গেছেন এবং জনসমাজে আপন আনন্দের ভাগ দেবার জন্য সোচ্চারে অপূর্ব মানুষটির কথা বলেছেন, যেমন শ্রুতির ঋষি গেয়েছেন:

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

—স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুষকে আমি জানি।

বহু সাধক ও মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁকে কেবল রক্ত-মাংসের মানুষরূপে দেখেননি। আর তাঁর পার্ষদ বা অনুগামী ভক্তরা যে তাঁকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন, সে-কথা "কথামৃত" ও "লীলাপ্রসঙ্গে"র পাঠকের কাছে অবিদিত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তাঁদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতেন, তাঁদের তাঁকে কি মনে হয়—অর্থাৎ তাঁকে একজন মানুষ বা ভক্ত সাধক হিসাবে, না অন্য কিছু রূপে। স্বামীজীর ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল—ভারতকে আবার উঠতে হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসেই তাকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। সুতরাং দেশবাসী শ্রীরামকৃষ্ণকে যে দৃষ্টিতে দেখবে, তার থেকে কিছু পাওয়া বা শিক্ষালাভ তদনুরূপ হবে। ইতিহাস অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই, পূর্বগ অবতার পুরুষদের অনুগামীরা পরবর্তীকালে তাঁর স্বরূপ বা আন্তর পরিচয়ের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর বাহ্যরূপের ভজনায় রত হ'য়ে তাঁকে সাধারণ দেবতায় পরিণত

করেছেন। তাই স্বামীজী বার বার নিষেধ করেছেন, যাতে আমরা যেন তাঁর শুধু বাহ্যরূপটিকে নিয়ে ভজনা না করি। আর এই জন্যই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক স্তব, স্তোত্রে বা প্রণাম মন্ত্রে বাহ্যরূপের বর্ণনা না ক'রে তাঁর আন্তররূপের বর্ণনা করেছেন। স্বামী অভেদানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানমন্ত্রে তাঁর স্বরূপের আভাস দিয়েছেন। এমনকি শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্র মশায়ের স্তবেও ঠাকুরের আন্তররূপের বর্ণনা দেখতে পাই। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ ব'লে মনে হলেও আসলে কিন্তু তাঁর পরিচয় এ-সবের উর্ধ্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে অতি কবিত্বময় ব্যঞ্জনায় নিজ স্বরূপ উদ্‌ঘোষণ ক'রে গেছেন। বলেছেন: প্রভাত সূর্য! মধ্যাহ্নে সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু প্রভাত সূর্যের দিকে চাওয়া যায়। অচিনে গাছ—যাকে লোকে চেনে না, জানে না। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের কোলে প্রাচীর; প্রাচীরে একটি ফোঁকর, যা দিয়ে অনন্ত দিগন্তকে দেখা যায়—সেই ফোঁকর।

সাধক-জীবনে জিজ্ঞাসার মূল্য: খুব স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন—আমাদের জীবনে এই-রকম জিজ্ঞাসার কি কোন সার্থকতা আছে? "লীলাপ্রসঙ্গ"কার স্বামী সারদানন্দজীর একটি উক্তি এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য: "ভক্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপস্থিত হইবেন, তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়া থাকেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃ: ২৪)। লক্ষ্য যেখানে জগদতীত অদ্বৈতবস্তু, সেখানে কোথাও থেমে থাকলে চলবে কেন? উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহের আবশ্যকতা তাই অনস্বীকার্য

সর্বধর্মস্বরূপিণে

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

তুমি করুণার বিশাল আধার
অশেষ সম্ভাবনা,
তুমি মুক্তির অমৃত-পদ্ম
পাপড়ি যায় না গোনা।
তপোরশ্মির প্রেম-সম্পাতে
ষোড়শানন্দ* জাগে,
সন্ন্যাস-পথে জগদ্ধিতায়
পার্থিব অনুরাগে।
লোকায়ত মহাশক্তি-ধারার
উৎস পরমহংস,
সিদ্ধ সেবকবৃন্দ তোমার
তপোবংশাবতংস।

হে অনির্বাণ, অনলস্তম্ভ
অমল স্নিগ্ধ জ্যোতি,
ব্রহ্ম-চেতনা জাগালে বিশ্বে
ঐশী পরমাগতি।
বরদা সারদা সিদ্ধিরূপিণী
কালিকা বজ্রতারা,
'ভ্রুবোর্মধ্যে' পূজিতা তোমার
প্রণব মন্ত্র পারা।
তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ তুমি হে
গরীয়ান্ গদাধর,
বিম্বিত তব নখ-দর্পণে
ত্রিভুবন চরাচর।

* ষোড়শানন্দ: স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, [illegible]দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

মহাভূত মহাতীর্থ

শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ সংখ্যার পর]

ব্যোমভূতলিঙ্গম্

চিদম্বরম্ ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কার প্রতিটি শিবভক্তের পরমতীর্থ। এখানে ব্যোম বা আকাশভূতলিঙ্গমের অধিষ্ঠান।

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

আকাশই লিঙ্গ, পৃথিবীই তাঁর গৌরীপট্ট। আকাশরূপী সেই লিঙ্গই সর্বদেবের আলয়। আলয় শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—আ-উপসর্গের সঙ্গে লয়-শব্দের যোগ হয়েছে। 'লয়' শব্দের অর্থ যেখানে সমস্ত লীন হ'য়ে যায়। এই অর্থেই লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আলয় শব্দের অর্থ স্থিতিস্থান—সমস্ত বস্তু নিজের উপাদান-কারণেই অবস্থিত। সুতরাং স্থিতিস্থান শব্দের অর্থ উপাদান-কারণ। উপাদান-কারণ হ'তে উদ্ভূত সমস্ত বস্তু উপাদান-কারণেই লীন হ'য়ে যায়। এই জন্যই উপাদান-কারণকে লয়-কারণ বলা হয়। ব্যোমরূপী শিবকে 'লিঙ্গ' নামে অভিহিত করায় এইটাই বোঝায় যে, তিনিই জগতের উপাদান-কারণ—স্থিতি এবং লয়েরও কারণ। এই শিব চৈতন্যস্বরূপ বলেই চিদম্বরম্ কথাটি ব্যবহৃত হয়।

ব্যোমভূতলিঙ্গের মূলবেদী শূন্যময়। শূন্যবেদী-পীঠিকার ওপর আকাশলিঙ্গের কল্পনা করা হয়েছে তাঁর মাথায় বিল্বপত্র অর্পণের জন্য তাই এখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। পীঠিকার ওপর থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে একত্র গাঁথা তিনটি সোনার বেলপাতা সুতোয় বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শূন্যবেদীস্থানে পুরোহিতেরা যন্ত্র অঙ্কিত ক'রে পরমাত্মা-রূপে শিবের আরাধনা করেন।

এই যন্ত্রই হ'ল 'চিদম্বরম্-রহস্যম্' চিদম্বরম্-যন্ত্রের সব রহস্য আমার জানা নেই। তবে যেটুকু জেনেছি তা হ'ল, এই যন্ত্রের অন্তঃস্থলে একটি বিন্দু থাকে। বিন্দুটি হ'ল ব্রহ্মের মননাত্মক জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা তিনি বিস্তারিত হ'তে চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন 'বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'।[১] বহু হওয়ার প্রথম পর্যায়ে তিনি ত্রিধাবিভক্ত হয়েছিলেন। বিন্দুকে ঘিরে তাই অঙ্কিত করা হয় এক ত্রিভুজ। রহস্যত্রিভুজের তিন শীর্ষ তিন শক্তি—ইচ্ছা, জ্ঞান আর ক্রিয়া; তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, সেইজন্য রহস্যত্রিভুজের বাহুপথ ধরে তাঁর গতি ঊর্ধ্বমুখী শিব লয় করেন, সেইজন্য ত্রিভুজশীর্ষ থেকে বাহুপথে তাঁর নিম্নগতি।

পালন করেন, তাই ত্রিভুজের ভূমিরেখা অবলম্বন ক'রে তাঁর স্থিতাবস্থা। সৃষ্টি ও লয় দুই বিপরীতধর্মী শক্তির মধ্যে তিনি সমতা রক্ষা ক'রে চলেন।

বেদীপীঠিকার সামনে অহরহ ঝোলানো থাকে একটি কালো পর্দা। এ আবরণ অন্ধকার অজ্ঞানের। 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' (গীতা ৫।১৫)। প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে রয়েছে জ্ঞানসূর্য, কিন্তু সে সূর্য অবিদ্যার কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন। মুগ্ধ মানুষ তাই পরমাত্মার অস্তিত্ব ভুলে যায়। মাঝে মাঝে যখন মেঘের বুকে দেখা দেয় বিদ্যুৎবিচ্ছুরণ তখনই আলো-অন্ধকারের খেলা, তখনই আবরণের আড়াল থেকে বিল্বপত্রের স্বর্ণাভা দর্শন। দৈনন্দিন পূজার পর পুরোহিতেরা প্রত্যহ তিনবার এই কালো আবরণ কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে রাখেন।

১ ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৬।২।৩

জনসাধারণ তথনই মহাকাশলিঙ্গের রত্নবেদী দর্শন করতে পারেন।

ভগবানের রত্নবেদীর চারটি স্তম্ভ। এরা চার বেদের প্রতীক। অথবা আত্মার চারটি পাদের প্রতীক। প্রথম পাদে তিনি 'বিশ্ব'—সমষ্টি বিরাট বা বৈশ্বানরের ব্যষ্টিরূপ। দ্বিতীয় পাদে তিনি তৈজস—সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মার ব্যষ্টিরূপ। তৃতীয় পাদে তিনি চেতোমুখ প্রাজ্ঞ—সমষ্টি ঈশ্বরের ব্যষ্টিরূপ। চতুর্থ পাদে তিনি তুরীয়—'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্'—জগৎচরাচরের অধিষ্ঠানভূত শান্ত শিব অদ্বৈত। তিনি 'অদৃষ্টম্ অব্যবহার্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশম্' (মাণ্ডুক্যোপনিষদ, ৭)—তাঁকে দেখা যায় না, ব্যবহার করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না, অনুমান করা যায় না, চিন্তা করা যায় না, বাক্যে প্রকাশ করা চলে না। ব্যষ্টি-সমষ্টির পারে তিনি। জীবজগৎ তাঁরই 'অবভাসমাত্রম্'। একমাত্র গভীর সমাধিতেই সাধক সেই পরমাত্মাকে অনুভব ক'রে থাকেন। নির্বিকল্প সমাধিতেই সাধক স্বপ্রকাশ সেই তুরীয় চৈতন্যকে, সেই জ্ঞানময় আকাশকে—চিৎ-অম্বরম্‌কে অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেন।

চিদম্বরম্-মন্দিরের মূলবেদী শূন্য হলেও গর্ভগৃহে আকাশলিঙ্গের ঠিক পাশেই আছেন নটরাজ,—পান্নায় তৈরী অতি অপরূপ নৃত্যমূর্তি। এঁকে কেউ বলেন রত্নসভাপতি, কেউ বলেন আড়িনায়, কেউ বলেন চিৎসভেশ, আবার কেউ বলেন আড়াভাল্লান। আড়াভাল্লানই এখানকার মুখ্য বিগ্রহ। চোলরাজের তিনি ছিলেন কুলদেবতা। চিদম্বরমের নটরাজকে ঘিরে কত যুগের কত আখ্যান কত ইতিহাসই না সঞ্চিত রয়েছে! নটরাজের বন্দনায় কত শ্লোক, কত শিল্প, কত সঙ্গীত, কত সাহিত্য রচিত হয়েছে; প্রবর্তিত হয়েছে বহুজন-প্রশংসিত উচ্চমার্গের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা; বিদগ্ধ জনসমাজে আলোচিত হয়েছে বহু তত্ত্ব ও তথ্য। দেশবিদেশের দার্শনিকেরা, শিল্পরসিকেরা নটরাজ-মূর্তি দেখে অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁরা বলেছেন—'Nataraja is the plastic presentation of a whole philosophy. In the whirl of dance he sees the primary energy which gives life to one's existence and so sustains the universe'. (Lord Ronaldshay, later the Marquis of Zetland). এক কথায় এ-মূর্তি হ'ল 'A Synthesis of science, religion and art' (Dr. Ananda Coomaraswamy)। অনবদ্য ভঙ্গিমায় আদিদেব এক পা শূন্যে তুলে তাণ্ডব করছেন। তামিলনাডের অন্যান্য মন্দিরগুলিতেও অবশ্য রয়েছে অপরূপ সব শিবতাণ্ডবমূর্তি। কিন্তু এ-মূর্তি সবার ওপরে। যেমন সকল তাণ্ডবের সেরা যে তাণ্ডব, সেই আনন্দতাণ্ডবমূর্তিই হয়েছেন এখানকার প্রধান দেবতা নটরাজ। তিরুনেলভেলির মুনিতাণ্ডবমূর্তিতে দেবাদিদেবের সৃষ্টিকৃত্যই শুধু ব্যক্ত হয়েছে। তিরুপুত্তুরের গৌরীতাণ্ডব মূর্তিতে রয়েছে তাঁর স্থিতিকৃত্যের প্রকাশ। কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরে তিনি সংহারতাণ্ডবে মত্ত। তিরুকুটালমের ত্রিপুরতাণ্ডবে তাঁর তিরোভাবকৃত্যের দ্যোতনা, আর তিরুভালানগাড়ুর ঊর্ধ্বতাণ্ডবে তাঁর অনুগ্রহকৃত্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু চিদম্বরমে মাত্র একটি নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব, অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত্যেরই পরিচ্ছন্ন পরিস্ফুটন রয়েছে। বিশ্বজীবের মুক্তিকল্পে 'নদন্তনৃত্যের' আনন্দছন্দে দেবাদিদেব তাঁর সকল কৃত্য ব্যক্ত করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এ-নৃত্যশালায় তিনিই নর্তক, তিনিই দর্শক। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, মহেশ্বর, সদাশিব। তাঁর ঊর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তের ডমরুমন্দ্রে সৃষ্টির আবির্ভাব, নিম্ন হস্তের

বরাভয় মুদ্রায় স্থিতির আশ্বাস।—আপন সৃষ্ট চেতন অচেতন জগৎপ্রপঞ্চকে শিবশঙ্কর সদাসর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। নটরাজের ঊর্ধ্ব বাম হস্তের অনলশিখায় সংহারের সংকেত, রুদ্ররূপে সকল অসত্যের তিনি বিনাশ সাধন করছেন। তাঁর দক্ষিণ পদমূল কর্মক্লান্ত শ্রান্ত আত্মার আশ্রয়—ওইখানেই মহেশ্বরের তিরোভাবকৃত্য। আর তাঁর উত্থিত বামপদে প্রাণিজগতের মুক্তি—সদাশিবের অপার অনুগ্রহ। আয়তবক্ষের ওপর লম্বমান নটরাজের 'গজহস্তে'র তর্জনী ওই উত্থিত বামপদের দিকেই নির্দেশ করছে। জীবের মুক্তিপথ তিনি নিজেই চিহ্নিত ক'রে দিচ্ছেন। নটরাজ মূর্তির চারদিক ঘিরে রয়েছে যে মণ্ডল তা হ'ল সৌর-জগৎ। সৌরজগতে আবর্তিত প্রজ্বলিত গ্রহ-মণ্ডলের শিখায় শিখায় তার সংকেত। আড়াভাল্লানের লীলায়িত শরীর হ'ল আকাশ, চতুর্ভুজ, চতুর্দিক, বাহুর আটটি অংশ অষ্টপ্রহর। তাঁর তিন চক্ষু তিন অগ্নি—সূর্য চন্দ্র আর যজ্ঞানল। তাঁর অঙ্গের সর্প প্রলয়কালীন ক্রোধ, অর্ধস্খলিত ব্যাঘ্রচর্ম বিষয়বাসনা, আর পদতলে নিষ্পিষ্ট অপস্মার পুরুষ হ'ল অবিদ্যার প্রতীক; নটরাজের উৎক্ষিপ্ত জটাজাল, আর উড়ন্ত উত্তরীয় দেখলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান। ঘূর্ণিত নৃত্যের তালে তালে নটরাজ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সূর্যলোক চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোক পরিক্রমা ক'রে বেড়াচ্ছেন। সকল লোক তাঁর নৃত্যের মহাছন্দে বাঁধা পড়ে গেছে। সূর্য নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব গগনে উদিত হচ্ছে, চন্দ্র নিয়মিত গতিতে কক্ষ পরিবর্তন করছে, ছয় ঋতু চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে, জীব জন্মমৃত্যুর অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে অনন্তকাল ধরে ভ্রমণ ক'রে চলেছে। 'বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে' তাঁরই নৃত্যচ্ছায়া কম্পমান, 'নৃত্যেই তাঁর মুক্তির রূপ', 'নৃত্যেই তাঁর মায়া'। 'যুগে যুগে কালে কালে' মহাযোগীরা ঋষি মনীষীরা তাঁর এই নৃত্যের লয়-তাল-ছন্দ অনুসন্ধান ক'রে চলেছেন।

পুরাণের এক সাংকেতিক গল্পে আছে এই-রকম দুই যোগীর কথা আর আটচল্লিশ হাজার মুনিঋষির কাহিনী। পুরাকালে দারুক বনে বাস করতেন আটচল্লিশ হাজার শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি। ঋষিদের সঙ্গে বাস করতেন তাঁদের পত্নীরা। এই ঋষি ও ঋষিপত্নীরা নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতেন। তাঁরা সব সময় নিজেদের নিরঙ্কুশ চরিত্রের কথা অহঙ্কার ক'রে বলে বেড়াতেন। সর্ব-গর্ব-খর্বকারী শিব এ-অহংকার সহ্য করলেন না। একদিন ভস্মমাখা বিবস্ত্র ভিক্ষুকের বেশে দারুক বনের ঋষিকুল সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন মোহিনীরূপী বিষ্ণু আর আদিশেষ অনন্তনাগ। মোহিনীর মন-ভুলানো রূপ দেখে ঋষিদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘ'টল, ভিক্ষুকের তেজোদীপ্ত কান্তি দেখে ঋষিপত্নীরা বিমনা হলেন। ঋষিরা নিজেদের বিভ্রান্তির কথা স্মরণ করলেন না, পত্নীদের অন্যমনস্কতার কারণ অনুসন্ধান ক'রে ভিক্ষুকের ওপর ভীষণ ক্ষেপে উঠলেন। তাঁরা একটি বৃহদাকার বাঘকে ভিক্ষুকের দিকে লেলিয়ে দিলেন। নিমেষের মধ্যে ভিক্ষুক বাঘটিকে হত্যা ক'রে তার দেহচর্ম নিজ অঙ্গে জড়িয়ে নিল। ঋষিরা তখন আরও কুপিত হ'য়ে একটি বিষধর সাপকে তার দিকে তাড়না ক'রে নিয়ে গেলেন। ভিক্ষুক মৃদু হেসে সাপটিকে আপন কণ্ঠে তুলিয়ে দিল। ক্রোধান্বিত ঋষিকুল এবার নিক্ষেপ করলেন প্রজ্বলিত অগ্নি। লোলজিহ্ব অগ্নিগোলকটি ভিক্ষুক অনায়াসেই বাম হাতের মুঠিতে চেপে রাখল। অস্থির আটচল্লিশ হাজার ঋষি তখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তপস্যায় বসলেন। তপঃ প্রভাবে জন্ম দিলেন এক বামন দৈত্যের। মূয়ালবান্ নামে সেই বামন দৈত্য দুরন্তবেগে ভিক্ষুকের দিকে ধাবিত হ'ল। ভিক্ষুক

মুহূর্তের মধ্যে দৈত্যের মেরুদণ্ড নিজের দক্ষিণ পদ-ভারে চূর্ণিত ক'রে তার দেহের ওপর উঠে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। বিস্মিত বিমোহিত ঋষি-সমাজ সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর তাণ্ডব দেখে শিবশঙ্করকে চিনলেন, নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। তাঁরা বিষ্ণু ও অনন্তনাগের সঙ্গে নটরাজের বন্দনা ক'রে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালেন।

অনন্তনাগের কিন্তু আশা মিটল না। তিনি শিবকে আরও একবার এই আনন্দতাণ্ডব দেখাতে অনুরোধ করলেন। শিব বললেন—'তথাস্তু। তিল্লৈবনে তুমি আবার দেখতে পাবে আমার এই আনন্দনৃত্য।' শিবনৃত্য দেখার মানসে অনন্তনাগ জন্ম নিলেন অত্রিপত্নী অনসূয়ার অঞ্জলিতে। অঞ্জলিতে সর্প দেখামাত্র অনসূয়া তা ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। অঞ্জলি থেকে পতিত নাগ নাগলোক ঘুরে ঋষি 'পতঞ্জলি' রূপে উপস্থিত হ'লেন তিল্লৈবনে। তিল্লৈবনে তখন বাস করতেন মধ্যন্দিন মুনির পুত্র ব্যাঘ্রপদ। ব্যাঘ্রপদের সঙ্গে পতঞ্জলি ঋষির পরিচয় হ'ল। উৎফুল্ল হ'য়ে ব্যাঘ্রমুনি বললেন, তিনিও একদিন ধ্যানে বসে দেখেছেন দারুকবনের আনন্দনৃত্য এবং অসীম আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছেন যদি আর একবার সেই নৃত্য দেখতে পান! দুই ঋষি তখন যুক্তি-পরামর্শ ক'রে বহু আশায় বুক বেঁধে তিল্লৈবনের এক জলাশয়ের ধারে বটবৃক্ষের তলায় প্রতিষ্ঠা করলেন পূর্বমুখী শিবলিঙ্গ। তারপর পরম শ্রদ্ধায় সেই শিবলিঙ্গের অর্চনা ক'রে যেতে লাগলেন। বহু যুগ অতীত হওয়ার পর ঋষিদ্বয়ের আরাধনায় তুষ্ট হ'য়ে এক পৌষমাসের পুষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে শিব আনন্দতাণ্ডব প্রদর্শন করলেন। ঋষিদের মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল।

এই চিদম্বরমই হচ্ছে সেই তিল্লৈবনম্। পুরা-কালে এখানে তিল্লৈবৃক্ষের ঘোর জঙ্গল ছিল। এখনও শহরের আশেপাশে কোথাও কোথাও গুচ্ছ গুচ্ছ তিল্লৈবৃক্ষ দেখা যায়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞরা এই বৃক্ষের নাম রেখেছেন 'তেজবল' (excœcaria agallocha)। জঙ্গলী পাদপ তেজবলই ব্যোম-ভূতক্ষেত্রের স্থলবৃক্ষ। প্রাচীন সংস্কৃত-পুঁথিতে তিল্লৈবনকে ব্যাঘ্রপুরা বা পুণ্ডরীকপুর নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—এই পুণ্ডরীক-পুর হ'ল বিরাটপুরুষের হৃদয়কমলম্ স্বরূপ। দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌছে পুণ্ডরীকপুর পরিণত হ'ল চিদম্বরমে। তখন অবশ্য চিদম্বরমের চৌহদ্দী ছিল বিশাল। উত্তরে মণিমুকুটনদী বা আজকের ভেল্লার, দক্ষিণে উদয়পুণ্যকাবেরী অর্থাৎ কোল্লিডম্, পুবে পূর্বসমুদ্র (বঙ্গোপসাগর), আর পশ্চিমে বীরনারায়ণ দীঘি।—এই ছিল সেদিনের চিদম্বরমের চতুঃসীমা। আজকের চিদম্বরম্ ১১°২৪′ উত্তর অক্ষাংশে আর ৭৯°৪৩′ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত দক্ষিণ আরকট্ জেলার এক সামান্য সদর-তালুক, দক্ষিণ রেলপথের ভিল্লুপুরম্-ময়রম্ শাখায় এক সাধারণ রেলস্টেশন, মন্দির আর আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে নাতিবৃহৎ এক জনবসতি। মাদ্রাজ শহর থেকে চিদম্বরমের দূরত্ব ২৪৩ কিলোমিটার, প্রখ্যাত শৈবতীর্থ তাঞ্জোর থেকে ১০৬ কিলোমিটার, আর ভিল্লুপুরম্ থেকে মাত্র ৮৫ কিলোমিটার। যাঁরা মাদ্রাজ-তিরুচি-মাদুরাই-রামেশ্বরমের থ্রু টিকিট কাটেন তাঁরা ভিল্লুপুরমে নেমে (break journey) চিদম্বরম্ দেখে নিতে পারেন। ভিল্লুপুরম্ স্টেশনে জিনিসপত্র রেখে খুব ভোরের গাড়ীতে চিদম্বরমে পৌছে মন্দিরদর্শন ক'রে দুপুরবেলার ট্রেন অথবা বাসে আবার ভিল্লুপুরমে ফিরে আসতে পারেন। বিকেলবেলায় তিরুচি-মাদুরাই-এর গাড়ী পাওয়া যাবে। রেলওয়ে স্টেশন থেকে আকাশমহা-ভূতলিঙ্গমের মন্দির খুব কাছে, তিন ফার্লং-এর বেশী নয়। চিদম্বরমে রাত্রিবাসের ইচ্ছা থাকলে রেলের বিশ্রাম কক্ষে, ডাকবাংলো বা

ধর্মশালাতেও থাকতে পারেন। স্টেশন থেকে মন্দিরে যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটা 'লজিং হাউস' দেখতে পাওয়া যাবে, সেখানেও থাকা যেতে পারে।

তবে দর্শনার্থী যদি সকাল সকাল মন্দিরে পৌঁছুতে পারেন তাহলে ৯টা ৯৷৷০টা নাগাদ দেখতে পাবেন দেবতার অভিষেকস্নান। সে দৃশ্য বড় সুন্দর। শিবের নিত্য অভিষেকস্নান সম্পন্ন হয় এক স্ফটিকলিঙ্গের শরীরে। দুষ্প্রাপ্য এই স্ফটিকমূর্তিটি এনে দিয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। দেশদেশান্তর ঘুরে তিনি সবশুদ্ধ পাঁচটি স্ফটিকলিঙ্গ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং মহাভারতের পাঁচটি পুণ্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠাও ক'রে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্ফটিকমূর্তি মুক্তিলিঙ্গ আছেন হিমালয়ের কেদারে, জরলিঙ্গ নেপালের নীলকণ্ঠক্ষেত্রে, ভোগলিঙ্গ কর্ণাটকের শৃঙ্গেরীতে, যোগলিঙ্গ দক্ষিণকাশী কাঞ্চীপুরমে, আর মোক্ষলিঙ্গ এই চিদম্বরমে। মোক্ষলিঙ্গের স্নান দর্শন করলে মর্ত্যবাসীর পুনর্জন্ম হয় না। মন্দিরের ঢাকা বারান্দায় যখন এই স্নানক্রিয়া হয়, তখন বহু ভক্তজন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তা দর্শন করেন। একজন পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শিবদেহে অগুরুগন্ধ হলুদ চন্দন লেপন করতে থাকেন, অপর জন বিরাট রূপোর পাত্র থেকে দুধ, দই, ঘি, মধু, শর্করা মিশ্রিত সুগন্ধিজল সোনার ঘটীতে ভরে ভরে শিবশিরে অর্পণ করেন। প্রথমে স্নান হয় রৌপ্যলিঙ্গের। তারপর রূপোর আবরণের আড়াল থেকে আবির্ভূত হন স্বর্ণশিব। স্বর্ণশিবের স্নান সমাপনান্তে দর্শন দেন স্ফটিকলিঙ্গ। পঞ্চামৃত ছাড়াও স্ফটিকলিঙ্গের স্নানে কমলারঙের এক ধরনের ছোট ছোট ফল ব্যবহার করা হয়। সম্ভবতঃ এ-ফল ঐ তিল্লৈবৃক্ষের। দর্শনার্থীরা পরমশ্রদ্ধায় কয়েকটি ক'রে ফল ও স্নানজল গ্রহণ করেন। অভিষেক শেষে স্ফটিকলিঙ্গের আবার রজতরূপ। রজতলিঙ্গ গর্ভমন্দিরে স্বর্ণভৈরব, কল্যাণসুন্দর, নটরাজ ও শিবকামবল্লীর বিজয় বিগ্রহের সঙ্গে অবস্থান করেন

ক্রমশ

এখনি নয়

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

এখনি তোমার জ্যোতির্ময় রূপ দেখতে চাই না,
চোখ আমার সবে ফুটতে শুরু হয়েছে।

এখনি তোমার বজ্রনির্ঘোষ শুনতে চাই না,
সবে কান পেতে শোনা শুরু হয়েছে।

এখনি তোমাকে স্পর্শ করতে চাই না,
সবে আগুনকে ছুঁতে শিখেছি।
সব জ্বলে যাবে॥

সমালোচনা

Universal Theology and Metaphysics. By Provas Chandra Mukherjee. Published by M. K. Mukherjee Advocate, Trustee, Universal Religious Centre, Apcar Garden, Asansol, West Bengal. pp. 335. Price : Rs. 12'00

আলোচ্য পুস্তকখানি লেখকের বাংলাগ্রন্থ 'সার্বভৌম ধর্ম ও তত্ত্ববিজ্ঞান'-এর ইংরেজী অনুবাদ। তিনভাগে বিভক্ত পুস্তকটির ১ম ভাগে ধর্ম, ২য় ভাগে তত্ত্ববিদ্যা এবং শেষভাগে ধর্মকে কার্যে পরিণত করার উপায় বর্ণিত হয়েছে। ভূতবিজ্ঞান ও বৈদিক ধর্মের সিদ্ধান্তসকল কিভাবে একসূত্রে গ্রথিত আছে, তা দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের তত্ত্বসমূহের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং লেখকের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির যত্র তত্র উল্লেখ বা ব্যঞ্জনা যুক্তিনির্ভর পাঠকের কাছে পুস্তকটির সার গ্রহণে প্রধান বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র যেমন পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তি না পেলে কল্পনাপ্রসূত কোন উচ্চসিদ্ধান্তকে সমাদর করতে পারেন না, দর্শনের ছাত্রেরাও তেমনি প্রতিপদে ন্যায়ানুমোদিত যুক্তিকে অবলম্বন ক'রে না চললে কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে পারেন না। আলোচ্য গ্রন্থের চিন্তাধারা উভয়ের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করেছে। 'Our Theory' এই অধ্যায়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে আচার্য শংকরের বেদান্ত ছাড়া সব-কটি দর্শনের সমালোচনা হয়েছে, শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে এ-সব মত খণ্ডনের সাধারণ যুক্তি গুরুত্ব পাবে না।

'চরমতত্ত্ব' অধ্যায়ে অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মকে গ্রহণ করা হয়েছে ব'লে মনে হয়। পরের অধ্যায়ে মায়ারও স্বীকৃতি আছে, কিন্তু অসীম অবকাশের সূর্যের ন্যায় কেন্দ্রীয় শক্তি (৫১ পৃঃ), ব্রহ্মের নির্গুণসত্তায় গুণাবলী সুপ্ত এবং সগুণ সত্তায় তার বিকাশ (৫৭ পৃঃ), অথবা পরম চৈতন্য প্রথম অবস্থায় আত্মজ্ঞানহীন বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে (৫৫ পৃঃ), কিংবা প্রকৃতি পরম সত্তার ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয় (৭০ পৃঃ)—এই সমস্ত উক্তিগুলি বিদ্বজ্জনের নিকট অত্যন্ত অযৌক্তিক ব'লে মনে হবে।

১০৫ পৃষ্ঠায় পরামাণুর ভিতর প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রন ছাড়া যে সার পদার্থের প্রবাহ, পরবর্তী পর্যায়ে X'Ray প্রভৃতির প্রকাশ, তার ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ নিরাময়-শক্তি, অথবা আণবিক বোমার সামগ্রী এবং সে সকলের সঙ্গে বেদে বর্ণিত সোমরসের ঐক্য; লেখক এ-সব বিষয় উপস্থাপিত করলেও বৈজ্ঞানিকেরা কিসের ভিত্তিতে এগুলিকে প্রামাণ্য ব'লে গ্রহণ করবেন? তারপর দেখা যায় (৫৪ এবং ৬৩ পৃঃ) পরমতত্ত্ব থেকে অণুস্তরে সর্বত্র বিভিন্ন রঙের উল্লেখ। দর্শনেন্দ্রিয়ের রূপগ্রাহিতা সাধনা-সহায়ে মনের শক্তিতেও ধরা পড়তে পারে যদি স্বীকার করা যায়; তবুও লেখক প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রনের রঙ যথাক্রমে পীত, নীল ও লাল বলেই বিরত হননি—পরম সত্তা যাকে কেন্দ্র ব'লে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাতেও (১১৪ পৃঃ) ঐ-সব রঙের বর্ণনা ক'রে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কারো নিকট গ্রহণযোগ্য করেননি।

লেখক 'সন্ন্যাস' এই অধ্যায়ে বর্তমানকালের সন্ন্যাসী সম্বন্ধে (২০৪ পৃঃ) অশোভন উক্তি ক'রে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সন্ন্যাস' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে সম্‌—নি+অস্‌ ধাতু থেকে, যার অর্থ সর্বস্ব ত্যাগ। লেখক স্বকীয় অর্থ দিয়েছেন (সৎ+ন্যাস) ভাল বা সত্যকে স্পর্শ। আবার ২৮৫ পৃষ্ঠায়, চরমতত্ত্ব লাভের পথে ভোগ থেকে বিরতিকে অনাবশ্যক ও অর্থহীন ব'লে ত্যাগের

আদর্শে মহান্ ভারতবর্ষের চিত্রকে মলিন করেছেন।

আর অধিক নিষ্প্রয়োজন। এ জাতীয় রচনা প্রাচীন জ্ঞানরাশির পক্ষে মানহানিকর। যেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলোকে প্রাচীন ধর্ম হেয় ব'লে পরিগণিত হ'তে যাচ্ছিল, স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বেদান্তের সার সত্যের দিকে আধুনিক বিজ্ঞানের নৈকট্য দেখাতে পেরেছেন, অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও ধর্মের সাদৃশ্য দেখার চেষ্টা ক'রে এ জাতীয় পুস্তক যুক্তির জগৎ থেকে পিছনের দিকে ফিরে চলেছে।

—স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ

সাধনায় সাম্যবাদ ও **গুরুতত্ত্ব** (প্রথম তরঙ্গ)—শ্রীসত্যবন্ধু ব্রহ্মচারী (ভাগবতশাস্ত্রী)। প্রকাশক: শ্রীমাখন লাল ধর, জয় জগদ্বন্ধু মিশন ইণ্টারন্যাশনাল, বন্ধুসুন্দর কানন, নিবাধুই গভঃ কলোনী, দত্তপুকুর, ২৪ পরগনা। (১৩৮৬), পৃঃ ৮৮; মূল্য: চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এই বইটিকে মূলতঃ চারটি প্রবন্ধের সমাহার বলা যায়, যার প্রথমটি 'সাধনায় সাম্যবাদ' এবং শেষটি 'গুরুতত্ত্ব'। আর এই প্রথম ও শেষ দিয়েই বইয়ের নাম। মধ্যবর্তী দুটি প্রবন্ধ হচ্ছে: 'পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও যোগসমন্বয়' এবং 'ত্রিশক্তি ও সাধনক্রম'। কিন্তু এ তো গেল চারটি প্রবন্ধের কথা—যা বইটির ক্ষুদ্র, অথচ মূল দেহকে ধারণ ক'রে রেখেছে। মূল দেহের বাইরে এই ক্ষুদ্র বইতে যুক্ত হয়েছে আরও চারটি উপদেহ—যেগুলি অসীম ধৈর্যসহকারে অতিক্রম করতে পারলেই মূল দেহে প্রবেশ করা সম্ভব। সেই চারটি উপদেহ হচ্ছে: ভূমিকা—লিখেছেন ডঃ রমা চৌধুরী; মুখবন্ধ—ডঃ জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ; 'আমার কথা' —নিশ্চিতভাবেই এটি লেখকের কথা এবং সর্বশেষে 'প্রকাশকের নিবেদন'

এই বইয়ের লেখক প্রথমেই বলেছেন: আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র—এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানবতার মৌলিক ভূমি হ'তে যেন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আস্বাদন করি। কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? সেটি সম্ভবতঃ 'জীবনে একটিমাত্র ধর্ম, তা হ'ল জীব-ভজন'। আর প্রতিপাদ্য যদি তাই হয়, তবে সেটা তো বহুপূর্বেই শাশ্বত সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে স্বামী বিবেকানন্দ এই একই তত্ত্বের উদ্গাতা। লেখক বলেছেন: একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়—এই তপশীল সমাজ ও নারীসমাজই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ও প্রাণ-কেন্দ্র। এও তো স্বামীজীরই কথা। তবে স্বামীজী 'শূদ্র' কথাটা ব্যবহার করেছেন, আর লেখক সরকারি পরিভাষাটা গ্রহণ ক'রে বিষয়টিকে সঙ্কুচিত করেছেন। কারণ, তপশীলের বাইরেও এক বিরাট অনগ্রসর শ্রেণী আছে এদেশে। সরকারের তালিকায় যাদের নাম, তারাই শুধু তপশীল। আর এ-ব্যাপারটা নিয়ে অনেকেই গভীর-ভাবে চিন্তা করেছেন। এটা বহুজনস্বীকৃত সত্য।

লেখক স্ববিরোধিতায় আচ্ছন্ন। তিনি একদিকে যখন সকলের সমান অধিকার দাবি করছেন, অন্যদিকে তিনি বলছেন: 'আমরা সকলেই স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করিবার জন্যই এই জীবন পাইয়াছি।...প্রত্যেককেই নিজের নিজের কর্মফল অনুসারে চলিতে হইতেছে।...প্রত্যেকেই আলাদা (পৃঃ ২৪) লেখক যদি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তাহলে জাতিভেদপ্রথাকে তো তিনি মেনেই নিলেন, তাহলে সকল মানুষকে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন কিভাবে?

এত সব অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এই বইটি পাঠ করতে শুরু করলে বেশ একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। লেখক বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনুসংহিতা, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আগ্রহী ও ধৈর্যশীল পাঠক

এই বই থেকে উপকৃত হবেন। তবে ভাষা যদি ভাবের যথার্থ বাহন হ'ত, তাহলে হয়তো বইটি সুখপাঠ্য হ'ত। কখনও কখনও লেখকের বাংলা ভাষা রীতিমতো চমক সৃষ্টি করে। যেমন: খাওয়ার ঘরে পোষা বিড়ালটি allow আছে। ধর্মগ্রন্থ ব'লে কি সব ভাষাই গ্রাহ্য?

—শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী

স্বামীজীর ভারত। প্রকাশিকা: প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭৬। (১৯৮১), পৃঃ ৭১, মূল্য: দুই টাকা।

ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে পবিত্র। অতীত ভারতের জন্য তিনি সগর্বে বলতেন: 'জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর—দেখিতে পাইবে, যেখানেই কোন উচ্চ আদর্শের সন্ধান মিলিবে—উহার জন্ম ভারতবর্ষে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতই মানব সমাজের নিকট অমূল্য ভাবসমূহের আকরস্বরূপ। সত্যই আমাদের মাতৃভূমির কাছে জগতের ঋণ অপরিসীম।' স্বামীজীর কাছে ভারত পুণ্যভূমি। এই পুণ্যভূমি ভারতের বর্তমান অধঃপতনের কারণ কি এবং পুনরুত্থানের উপায় কি—স্বামীজী তা ঐতিহাসিকের স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। ভারত বহু ভাষা, জাতি ও ধর্মের দেশ। বর্তমানে তাই বহু সমস্যা। স্বামীজীর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতের এই বিভিন্ন সমস্যাগুলি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল তিনি এই সমস্যাগুলির সমাধান এবং ভবিষ্যৎভারত-গঠনের পথনির্দেশ ক'রে গিয়েছেন বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনার মাধ্যমে। তাঁর রচনা এবং বক্তৃতাগুলি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'-গ্রন্থাকারে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই 'বাণী ও রচনা' এবং ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থ অবলম্বনে ভারত-সম্বন্ধে স্বামীজীর বিভিন্ন উক্তিগুলি 'স্বামীজীর ভারত' পুস্তিকায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পুস্তিকায় যে-সব বিষয়ের উপর স্বামীজীর উক্তি চয়ন করা হয়েছে, তা হ'ল—'মাতৃভূমি-ভারত', 'ভারতীয়-নারী', 'স্বদেশ-সেবা' ও 'ভাবী ভারত'।

স্বামীজী যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তাঁর পরিকল্পিত ভবিষ্যৎভারত-গঠনের জন্য তিনি শুধু সৎ বলিষ্ঠ পুরুষের উপর আস্থা রাখেননি—আস্থা রেখে-ছিলেন পবিত্র-স্বভাবা নারীর উপরও। তিনি বলছেন: 'পাঁচশত পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশত নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব।' (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ২৮৫)। এ-হেন আস্থা ছিল তাঁর নারীশক্তির উপর।

আমাদের যে-সব যুবক নেতা এবং তরুণী নেত্রী ভবিষ্যৎ ভারতগঠনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের এই পুস্তিকাটি নতুন পথের সন্ধান দেবে, নিঃসন্দেহে।

এই পুস্তিকাটিতে সংকলিত অংশগুলির আকর-নির্দেশ থাকায় পাঠক-পাঠিকার কাছে এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দু-একটি অংশে আকর-নির্দেশিত হয়নি (পৃঃ ৪)। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংযোজিত হবে। প্রচ্ছদে স্বামীজীর ধ্যান-মগ্নমূর্তি-সহ ভারতের মানচিত্রটি গভীর অর্থবহ। বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর। পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি। —ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

নিবেদন

ডাকমাশুল বৃদ্ধির জন্য উদ্বোধনের গ্রাহকগণকে জানানো যাইতেছে, ডুপ্লিকেট কপি পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাইবেন।—কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে : (১) গুম্মুপুর (উড়িষ্যা) এবং মালদায় (পশ্চিমবঙ্গ) পুনর্বাসনকার্য যথারীতি সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে। পুনর্বাসনকল্পে শ্রীকাকুলামে (অন্ধ্রপ্রদেশ) গৃহনির্মাণকার্য প্রায় সম্পূর্ণ।

(২) আসাম—ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ (১৯৮২): কাছাড় জেলায় শিলচরে ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দশটি গ্রামের ৭৭৭ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে ৩১০টি ধুতি, ২৮৭টি শাড়ী, ৫০ কিলো চিঁড়া, ২০ কিলো গুড় এবং ৩৬ কিলো শিশুখাদ্য বিতরণের পর প্রাথমিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৩রা মে ১৯৮২, পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরস্থিত নবনির্মিত সাধু-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

গত ১৩ই মে ১৯৮২, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় সহ বালি-দেওয়ানগঞ্জস্থিত পুনর্বাসন শিবির পরিদর্শনের পূর্বে সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের (পুনর্বাসিত কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয়) দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত ২৫,০০০ নরনারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পল্লীমঙ্গল

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ৩রা ও ৪ঠা মে (১৯৮২), দিঘড়া পরিদর্শন করেন। ৪ঠা মে দুলেদের পুনর্নির্মিত একটি শীতলা মন্দির উদ্বোধন ও সারদামণি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

মোরভির পুনর্বাসন কলোনি ও রাজকোটের আশ্রম পরিদর্শন

তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীবসন্ত শাঠে গত ২৪শে এপ্রিল ১৯৮২, মোরভিস্থিত পুনর্বাসন কলোনি এবং রাজকোট আশ্রম পরিদর্শন করেন।

গুজরাটের রাজ্যপালিকা শ্রীমতী শারদা মুখার্জি গত ১৪ই মে ১৯৮২, রাজকোট আশ্রম পরিদর্শনে গিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৫ই ও ১৬ই মে ১৯৮২, যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে যোগদান করেন উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধিবৃন্দ। দুইদিনে ছয়টি অধিবেশন হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অন্যান্য বক্তাগণ ছিলেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, স্বামী ভক্ত্যানন্দ, পুরীর জেলাশাসক শ্রীঅশোক-কুমার মিশ্র, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র প্রভৃতি। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানান এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী ও সাধারণ সহ-সম্পাদক স্বামী গহনানন্দের শুভবার্তা পাঠ করেন।

উৎসব

বালিয়াটী (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৭তম জন্মোৎসব গত ২রা হইতে ৫ই মে ১৯৮২, উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিনে প্রায় ১,০০০ দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে স্বামী অক্ষরানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীশরদিন্দু সাহা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ, শ্রীশিশিরকুমার সরকার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেটদ্বয় —জনাব রাইছউদ্দিন খান ও শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, জনাব মোসলেম উদ্দিন, আরশেদ আলী চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়। ৩রা হইতে ৫ই মে যথাক্রমে কৃষ্ণলীলা, গৌরকীর্তন ও রামায়ণ-গান অনুষ্ঠিত হয়।

রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের আমন্ত্রণে ও উদ্যোগে এপ্রিলের শেষসপ্তাহে স্বামী নিরাময়ানন্দ দণ্ডকারণ্যে যান। ইহার দল্লি-রাজাড়ায় একটি কালীমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি কালীমূর্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝাইয়া দেন। পরে পাথানজোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩০শে এপ্রিল তিনি 'বর্তমান সমস্যায় স্বামীজীর সমাধান' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ২৭শে মে (বৃহস্পতিবার) 'সারদানন্দ হলে' সন্ধ্যারতির পর 'ভগবৎ-প্রসঙ্গ' করেন। গত জানুআরি মাসে তিনি আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। গত ৫ই জুন তিনি আমেরিকার পথে যাত্রা করিয়াছেন।

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল ১৯৮২, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দ সভাপতিত্ব এবং 'তারাপদ বসু স্মৃতিকক্ষে'র দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বক্তা ছিলেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ ও ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রব্রাজিকা অমৃতপ্রাণার পৌরোহিত্যে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা। স্তোত্র ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ২৫শে হইতে ২৭শে এপ্রিল, স্বামী বিবেকানন্দের ১২০তম আবির্ভাব-উৎসব উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে শোভাযাত্রা, ভজন, পাঠ, খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি হয়। অনুষ্ঠিত ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনের ধর্মসভায় যথাক্রমে স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী যোগস্থানন্দ ও প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণার পৌরোহিত্যে ভাষণ দেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, স্বামী সত্যরূপানন্দ, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা প্রভৃতি। পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্থের উদ্যোগে গত ৮ই হইতে ১০ই মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও সংস্থার ৭ম বাৎসরিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, বসাইয়া ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় স্বামী বাগীশানন্দের পৌরোহিত্যে ভাষণ দেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ। তৃতীয় দিনে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অঙ্কন ও প্রবন্ধের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন শ্রীমতী অর্চনা গাঙ্গুলী। সন্ধ্যায় শ্রীমতী অরুণা দাসের পৌরোহিত্যে প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা ভাষণ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের সভাশেষে শ্রীনিখিল চট্টোপাধ্যায় রামায়ণ ও মহাভারত গান পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

গান্ধী কলোনি (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব গত ২২শে হইতে ২৪শে মে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনে উদ্যাপিত হয়। প্রথম দিনে প্রভাতফেরি ও বস্ত্র বিতরিত হয়। ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার।

রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে বিশেষ পূজা, হোম ও ১৫০০ জন দরিদ্রনরনারীকে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। শ্রীশিবানন্দ গিরি ও শ্রীঋষিবর বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শেষদিনে ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী সুস্মিতা রায়। রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বালকাশ্রমের সৌজন্যে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমস্থিত শ্রীবিবেকানন্দ যুবসঙ্ঘে গত ২৬শে মে সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে স্থানীয় আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য যুবকগণ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া প্রভাতফেরি করে। সন্ধ্যারতির পর আয়োজিত সভায় স্বামী স্মরণানন্দের পৌরোহিত্যে বক্তৃতা করেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

হীরক-জয়ন্তী

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে গত ৮ই হইতে ১০ই মে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হীরক-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডঃ দীপ্তিভূষণ দত্ত। সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দ। চারিদিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রদর্শনীতে বিদ্যালয়ের ৬০ বৎসরের ইতিহাস চিত্রে ও কথায় এবং ছাত্রগণ কর্তৃক বিভিন্ন মডেলের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ দেখানো হইয়াছে। ঐদিন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। দুইদিন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়। তাহাতে সভাপতিত্ব করেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ প্রণবেশ সিংহ রায়। ছয়দিন পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডঃ ভবেশ মৈত্র, শ্রীতাপস কুমার ঠাকুর প্রভৃতি। ছাত্রগণ 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'মরণ-ফাঁদ' এবং শিক্ষকগণ 'গুপ্ত' ও 'ওরা কাজ করে' অভিনয় করেন।

পরলোকে

সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য **লাবণ্য চক্রবর্তী** গত ৬ই মে ১৯৮২, সন্ধ্যা ৭-১৮ মিনিটে দুর্গাপুরস্থিত বাসভবনে ১০০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম (অধুনা বাংলাদেশ) ঢাকা-দক্ষিণগ্রামে। তিনি স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ মাস্টার মশায় প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করিয়াছিলেন তিনি একজন লেখক ছিলেন—উদ্বোধন, বসুমতী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় লিখিতেন।

প্রাচ্য আর্য্যাবর্ত্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরা "মারাঠা" জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমুত্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজসাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজ জাতির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব যেন তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকাররক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরাজ জাতির "গৌরব" সদা জাগরূক রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া, যুগপৎ হাস্য ও করুণ রসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী ইংরাজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য্য, অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতি বলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, যে সদা জাগরূক বিজ্ঞান-সহায় বাণিজ্যবুদ্ধিবলে সর্ব্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলণ্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাঁহাদিগের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরাজে থাকিবে, এমন ভারত রাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অর্জিত হইবে। কিন্তু, যদি ঐ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরব ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য এ সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও, অর্থহীন "গৌরব" রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে, প্রত্যক্ষশক্তিসংগ্রহরূপপ্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্যজ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে, স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে, জড়বিজ্ঞান, প্রচুরধনধান্য প্রভূতবল সঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহা-কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে, এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্বদেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনবিদুষীনারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপরস্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া, ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে, "ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।"

একদিকে, নব্যভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতিপত্নী নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

(আষাঢ়, ১৩৮৯, পৃঃ ২৮১)

হওয়া উচিত; কারণ, যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব। অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এদেশের ধারণা, প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন হইব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্ম্ম-আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল, ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আছে,—কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে, সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি, কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশভূষা অশন বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে,—মূর্ত্তিপূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহার বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টি মাত্রই, আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৮৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৮২)

বর্ত্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে ; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এ দেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য, স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে, তাহা না জানিয়া, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, দুর্ব্বলজাতির সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগীজ্, গ্রীক্ ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বলবানের দিকে সকলে যায় ;—গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটুও লাগে, দুর্ব্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীবেশভূষা মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !! চতুর্দ্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্শী এক্ষণে আর "নেটিভ্" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্য জাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচী, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল, ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, "আমায় মানুষ কর"।

(সম্পূর্ণ)।

(আষাঢ়, ১৩৮৯, পৃঃ ২৮৩)

রামকৃষ্ণ মিশন।

রাজপুতানা অনাথালয়।

বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সারদানন্দ উক্ত অনাথালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও হিসাব উদ্বোধনে মুদ্রিতকরণার্থ পাঠাইয়াছেন ;—

"রাজপুতানার অন্তর্গত কিষেণগড় রাজ্যে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে রামকৃষ্ণ মিশনভুক্ত স্বামী কল্যাণানন্দ দুর্ভিক্ষকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। উদ্বোধনেও তিনি এক্ষণে ১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১৯০০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আশ্রমের আয়ব্যয়তালিকা সাধারণসমক্ষে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মাননীয় কিষেণগড় দরবার এবং তত্রস্থ দেওয়ান বাবু শ্যামসুন্দর লালজী উক্ত অনাথালয়ে বিশেষ সাহায্য বরাবর করিয়া আসিতেছেন এবং তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাথদের থাকিবার জন্য রাজদরবার হইতে দুইটি বাটী বিনা ব্যয়ে কয়েক মাসের জন্য পাওয়া গিয়াছে। তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন সিপাহীকে দরবার সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন রন্ধনের আবশ্যকীয় প্রায় যাবতীয় কাষ্ঠ এতাবৎ কাল আমাদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিতেছেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র বিষয়েও অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, যথা, বিগত ডিসেম্বর মাসে ব্যবহারের জন্য কতকগুলি "গুদড়ি" (লেপ) এবং দরবার ভাণ্ডার হইতে স্বল্পব্যয়ে অনাথাশ্রমের আবশ্যকীয় চাল ডাল প্রভৃতি। দুর্ভিক্ষাশ্রমে এখন ৮৫ জন বালক বালিকা এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য বেলুড় মঠের একজন স্বামী ও ব্রহ্মচারী আছেন। ইহার মধ্যে বালক ৫৫ জন এবং অবশিষ্ট ৩০ জন বালিকা। আশ্রম স্থাপনের সময় কিসেণগড় দরবার স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বরূপানন্দকে বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষকার্য্য শেষ হইলে এই সকল বালক বালিকার মধ্যে যাহারা বাস্তবিক পিতৃমাতৃহীন অসহায় এবং যাহারা অন্য দেশ হইতে অসহায় অবস্থায় কিষেণগড়ে আসিয়াছে, তাহাদের সকলকে কোন অনুকূল স্থানে লইয়া গিয়া আমরা একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। এ বিষয়ের ফলাফল পরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যাঁহারা এই সৎকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ধাম এবং সাহায্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নে স্বীকার করিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের নাম পূর্ব্বকার উদ্বোধনে ছাপা হইয়াছিল।

জমা

কয়েকজন বন্ধু	বেনারস এবং এলাহাবাদ	...	৭॥০
নাথু ভাই	বোম্বাই	...	২৫৲
শ্রীমতী সরলা দেবী	কলিকাতা	...	২০৲
অদ্বৈতাশ্রম	মায়াবতী, কুমাউন্	...	৫০৲
ঐ	ঐ	...	২৪০৲
ঐ	ঐ	...	১০৲
বাবু মধুসূদন ঘোষ	দিনাজপুর	...	২৫৲
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	ভবানীপুর, কলিকাতা	...	৫৲
„ রামনাথ বসু	চাঁদপুর	...	২৲

জমা

ভারতী সম্পাদক	কলিকাতা		৮৬৲
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দেবী	ভাগলপুর		৬৲
বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উকীল)	খালিফাবাগ, ভাগলপুর		৫৲
„ বরদাপ্রসাদ বসু	দেবঘর, বৈদ্যনাথ		১০৲
„ গোষ্ঠবিহারী সেন	ময়মনসিং		
হরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	মায়াবতী, কুমাউন্		
বাবু চিত্তসখা সান্যাল	ময়মনসিং		১০৲
শ্রীমতী কাশীশ্বরী দেবী	দার্জ্জিলিং		১০৲
বাবু জগৎসুন্দর চৌধুরী			
ম্যানেজার ভারতী অফিস	কলিকাতা		
ধার্সি ভাই	কলিকাতা	...	৩০৲
বাবু ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	চন্দননগর	...	৩৲
„ হরিচরণ দত্ত	এলাহাবাদ	...	২৫৲
প্রতিবাসী সম্পাদক	কলিকাতা	...	২৫৲
আমেরিকা হইতে বেলুড় মঠে প্রেরিত		...	২৮৮৸৵০
টাকা ভাঙ্গাইবার বাটা হিসাবে প্রাপ্ত		...	৵৫
ভুসি বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত		...	৫।৶০
কার্পেট ফ্যাক্টারি হইতে দশজন বালকের বেতনস্বরূপ প্রাপ্ত		...	৯৷৵৫
			৯৬০॥১০

খরচ

খাই খরচ	...	৭১৬৸৵৫
জ্বালানি কাষ্ঠ	...	৬৶/১৫
রসুইয়া ব্রাহ্মণ চাকর ইত্যাদির মাহিনা	...	৭৲
কুলী খরচ	...	৪৸৶১৫
রেল ভাড়া	...	৩৬৶১৫
ষ্ট্যাম্প টেলিগ্রাফ এবং মনিঅর্ডার খরচ	...	১২৷৵০
রাধিবার হাঁড়ি ইত্যাদি	...	৭৷০
কাপড়	...	৩৭৶১০
খুচরা খরচ	...	১৬৷৵৫
		৮৪৭৷৴৫

সর্ব্বশুদ্ধ আয়	...	৯৬০॥১০
„ ব্যয়	...	৮৪৭৷৴৫
	হাতে বাকী	১১২৸৶৫

(আষাঢ়, ১৩৮৯, পৃঃ ২৮৫)

কল্যাণানন্দ স্বামী বলেন, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এখনও কমে নাই এবং জলকষ্টে আশ্রম-বাসীদের অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে হইতেছে। অন্ততঃ আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত আশ্রম হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করিতেই হইবে। আরো দুই এক মাস বেশী করিতে পারিলে ভাল হয়। এ নিমিত্ত সহৃদয় সাধারণের সহানুভূতি এবং সাহায্য প্রার্থনীয়। ঈশ্বরকৃপায় যেন এই দুঃসময় ভারত হইতে শীঘ্রই দূরীভূত হয়, এই প্রার্থনা।

আমেরিকাস্থ সাহায্যকারী বন্ধুগণের নাম ধাম পরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

মঠ, বেলুড়।
২৬শে এপ্রিল, ১৯০০ } (স্বাক্ষর) স্বামী সারদানন্দ

গভর্ণমেণ্ট তরফের ফেমিন কমিসনার সাহেব—মেজর জে, আর, ডন্‌লপ্ স্মিথ্—গত ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত আশ্রম দেখিয়া যে রিপোর্ট লেখেন, তাহার যথাযথ অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

"২৮শে ডিসেম্বর (১৮৯৯), অত্রস্থ দরবার কর্ত্তৃক এই স্থানে একটী অনাথাশ্রম খোলা হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রদেশস্থ রামকৃষ্ণ-মিশনের দ্বারা আশ্রমের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী পরিচালিত হইতেছে। এখানকার দেওয়ান-সাহেব তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। মিশনের প্রধান প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা ও আলমোড়ার সমীপবর্ত্তী মায়াবতী, এই দুই স্থান উক্ত মিশনের প্রধান কার্য্যস্থল। অনাথআশ্রমে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে একজন হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি লেখাপড়ার কাজ করেন। ঔষধাদি বিলি করিবার জন্য একজন লোক আছে। তদ্ভিন্ন, দুইজন মেথর ও দুইজন জল আনিবার লোক আছে। একজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ভার্য্যা রন্ধনাদি কার্য সম্পন্ন করেন। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আশ্রমস্থ বালিকাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আশ্রমস্থ বালকদিগের সংখ্যা ৫৪; বালিকাদিগের সংখ্যা ২৩। বালক ও বালিকাদিগকে পৃথক পৃথক মহলে রাখা হইয়াছে। তাহাদিগকে আহারের জন্য সকালে খিচড়ি, রাত্রে ডাল ও রুটী, এবং দুপুর বেলায় ছোলা ভাজা দেওয়া হয়। আমি পর পর তিন দিনের খরচের হিসাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, প্রত্যেক বালক বালিকার প্রাত্যহিক আহারের পরিমাণ আট ছটাকের কিছু উপর। অনাথদিগের সকল রকমের সুবিধার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়; তাহারা যে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে, দেখিলেই বোঝা যায়। নিকটস্থ সুতোর কলে ৫ জন বালক ও ৫ জন বালিকা, এবং কার্পেট-কারখানায় ১০ জন বালক কাজ করিতেছে। আশ্রমে যে ময়দা খরচ হয়, তাহা আশ্রমস্থ বালিকারা গম ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করে।"

তাঁবু।
১লা মার্চ্চ, ১৯০০। } (স্বাক্ষর) জে, আর, ডন্‌লপ্ স্মিথ্,
মেজর,
ফেমিন কমিসনার।

(৮৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৬)

রামকৃষ্ণ-মিশনের দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে

প্রাপ্তি স্বীকার—

উদ্বোধনের গ্রাহক—বাবু যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, হলদিবাড়ি	১০৲
উক্ত গ্রাহক মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—	
(১) মিঃ গর্ডন ওয়ালেস, হলদিবাড়ি	২০৲
(২) বাবু এন, জি, ভাদুড়ি, ঐ	১৫৲
উদ্বোধনের আর একজন গ্রাহক মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত, বড়বাজার, কলিকাতা	
শ্যামবাজার ডিবেটিং সোসাইটী, কলিকাতা	২৯৲

সমালোচনা

আমিত্বের প্রসার ঃ (কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য) যশোহর হইতে হিন্দু পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক বাবু যদুনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকস্থ প্রবন্ধগুলি প্রথমে হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু যদুনাথ মজুমদার মহাশয় এই পুস্তকের একটী ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় বলিতেছেন, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, 'মুক্তি হবে কবে? আমি যাবে যবে'। তবে এ অনর্থকর আমিকে পালিয়া পুষিয়া বড় করার প্রস্তাব কেন? 'আমিত্বের সংহার' পুস্তক না লিখিয়া 'আমিত্বের প্রসার' পুস্তক কেন? এতৎপ্রশ্নের উত্তরে প্রকাশক মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, আমিত্বের সংহার ও উহার প্রসার একার্থক বিভিন্ন বাক্যাবলি, কেবল আমিত্বের বিনাশ কথা দেহাত্মবাদী ব্যক্তির পক্ষে আপাততঃ অতি শ্রুতিকটু বলিয়া আর একটী মিষ্ট বচনে অভিহিত হইয়াছে।

প্রকাশক মহাশয় আর এক কথা বলিতেছেন,—পতিত ভারতের উন্নতির একমাত্র উপায় কর্ম্মযোগ, "নিরন্তর কর্ম্মযোগে আমিত্বের প্রসার কর," এইরূপ শিক্ষাতত্ত্বই অধুনা আমাদের অবশ্য আলোচ্য ও সাধ্য। আমিত্বের প্রসারকে মূলমন্ত্র স্বরূপ ধরিলে সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ অধিকারীরই পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। এই তত্ত্বই এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে 'পঞ্চযজ্ঞ', 'চতুরাশ্রম' ও 'চতুর্ব্বর্ণ', অল্লাধিক পরিমাণে বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, এই সমুদায়ই 'আমিত্বের প্রসার' সাধনের বিভিন্ন উপায় মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তার মতগুলি সুযুক্তিপূর্ণ ও উদার—গ্রন্থের ভাব প্রগাঢ়, অথচ ভাষার সারল্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

এই পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থকর্ত্তার

উপর (তিনি যিনিই হউন) আমাদের পরম শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। বাস্তবিক সরল ভাষায়, প্রাণের সুগুপ্ত অকপট ভাব গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে। উদ্বোধনের ক্ষুদ্র কলেবরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা সম্ভব না। তবে আমরা এইমাত্র বলি, যাঁহারা সাধুসঙ্গ অন্বেষণ করেন, তাঁহারা এ গ্রন্থে সাধুসঙ্গ পাইবেন, যাঁহারা সদুপদেশ চান, তাঁহারা সদুপদেশ পাইবেন, যাঁহারা গভীর তত্ত্বালোচনা চান, তাঁহারা তাহাই পাইবেন। আমরা বঙ্গীয় সকল পাঠককে এই পুস্তক পাঠে অনুরোধ করি।

গ্রন্থের শেষাংশ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম :—

'অতএব হে শূদ্র! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, তবে ব্রাহ্মণ হও, যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, তবে ক্ষত্রিয় হও, যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাও, বৈশ্য হও, বৈশ্য হইতে চাও, তাহা হইলে অকপটে ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ শূদ্র হও। ভক্তি দ্বারাই ভগবানের প্রতি ভক্তের, গুরুর প্রতি শিষ্যের, পিতার প্রতি পুত্রের আমিত্বের প্রসার হয়। অতএব ভক্তি দ্বারাই উচ্চাধিকারী যথার্থ ব্রাহ্মণাদির প্রতি শূদ্রের আমিত্বের প্রসার সাধিত ও তাহারই বলে অভীপ্সিত ধর্মোন্নতি সম্পাদিত হয়।"

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

বর্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাহার উদ্বোধন বন্ধ থাকিয়া আষাঢ় মাহা হইতে পুনরায় পূর্ব্বের মত নিয়মিতরূপে বাহির হইতে থাকিবে।

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ৩য় অধ্যায়ের ভাষ্য ভূমিকার শেষাংশ ও তাহার বঙ্গানুবাদ, ১-৩ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ৪র্থ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও ভাষ্যের কিয়দংশ— বর্তমান সম্পাদক]

(৮৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৮)

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। —শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত

জনৈক ভক্ত

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Rs. 0.85

MY MASTER
Price : Rs. 0.60

THOUGHTS ON VEDANTA
(Seventeenth Edition)
Price : Rs. 2.25

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3.80

CHRIST THE MESSENGER
(Eighth Edition)
Price : Rs. 1.25

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4.25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 6.00

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 1.80

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
Price : Rs. 2.50 (Ordinary)
Rs. 3.50 (Cloth)

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 6.25

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 1.00

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২'৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ১ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৮৬, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, ৭ম সং, মূল্য ১'০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পুনর্মুদ্রণ (১৩৮৮), পৃঃ ৭০, মূল্য ৩'০০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩'৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। ৮ম সং, পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৬'০০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬'২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে — স্বামী অখণ্ডানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী - পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়—পৃঃ ৪৪, মূল্য ০'২৫

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা — স্বামী সেবানন্দ। ২য় সং, পৃঃ ৭৬, মূল্য ১'২৫

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ— ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮ মূল্য ২'৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৭৪, মূল্য ২৪'০০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৪শ সং, পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪'০০

ধ্যান—স্বামী ধ্যানানন্দ। (২য় সং), পৃঃ ১০২, মূল্য ৩'৫০

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি— স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২'৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত:

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ২'২৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত। ১৫শ সং, পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১০'৫০

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। ১৫শ সং, পৃঃ ৫১৯, মূল্য ১২'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত' মূল্য: ৪র্থ খণ্ড ৩'০০; ৩য় অধ্যায় ১৩'০ , ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ—(স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত ভূমিকাসহ), পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ দত্ত পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য (সাধারণ বাঁধাই) ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ৪'০

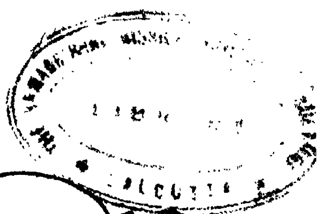
প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 JUNE 1982 Regd. No. WB/NC-19

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত

উদ্বোধন

শ্রাবণ ১৩৮৯
৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা





উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে টাকা, এয়ার মেল-এ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা **না** পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে, তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

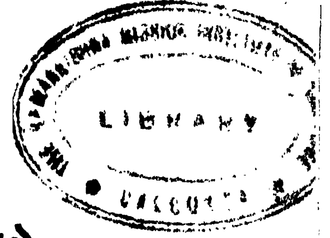
রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ— উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩



উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৮৯

সূচীপত্র

16 AUG 1982

১।	দিব্য বাণী। নর-নারায়ণের উপাসনা		... ২৮৯
২।	কথাপ্রসঙ্গে। জনগণের সমগ্র রূপ		... ২৯০
	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন		... ২৯২
	জগন্নাথের স্বরূপ-সন্ধানে	স্বামী গীতানন্দ	... ২৯৪
	দুঃখ দিয়ে জাগাও মোরে (কবিতা)	শ্রীমতী চিত্রা মিত্র	.. ২৯৯
৬।	মহাভূত মহাতীর্থ	শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ	... ৩০০
৭।	পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	... ৩০৯
৮।	স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের হিন্দু ছিলেন ?	ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	... ৩১৩

৯। দিশারী (কবিতা) ... স্বামী প্রভাকরানন্দ ... ৩১৮
১০। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা ... স্বামী বুধানন্দ ... ৩১৯
১১। প্রার্থনা (কবিতা) ... শ্রীসুবল কর ... ৩২৩
১২। সমালোচনা ... ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ ... ৩২৪
... স্বামী প্রভাকরানন্দ ... ৩২৬
১৩। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ... ৩২৭
১৪। বিবিধ সংবাদ ... ৩২৮
১৫। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ... পুনর্মুদ্রণ (আষাঢ়, ১৩০৭ ; পৃঃ ১৫৩-১৬০) ... ৩২৯







৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

নর-নারায়ণের উপাসনা

…নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান্ বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ। এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।

'যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন ও সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, তাঁরই উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।

'যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট সর্বরূপী, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞেয় সত্য ও সর্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।

'যাতে পূর্বজন্ম নেই, পরজন্ম নেই, বিনাশ নেই, গমনাগমন নেই, যাতে অবস্থিত থেকে আমরা সর্বদা অখণ্ডত্ব লাভ করছি এবং ভবিষ্যতেও ক'রব, তাঁরই উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।

'হে মূর্খগণ, যে-সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাঁকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ! তাঁর—সেই প্রত্যক্ষদেবতারই—উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩৬৪-৬৫]

কথাপ্রসঙ্গে

জনগণের সমগ্র রূপ

'জনগণ' কথাটির অর্থ আজকাল আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না—সকলেই জানে, বা মনে করে 'জানি'। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই আমাদের অজ্ঞতা ধরা পড়ে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক: ফুটপাথে সারি সারি দোকান বসিয়াছে; পথচারীদের চলিবার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে, তাহাদিগকে বিপদের ঝুঁকি লইয়া দ্রুতগামী-যানবহুল রাজপথ দিয়া ভীতত্রস্ত হইয়া হাঁটিতে হইতেছে। এ-বিষয়ে যদি তর্ক ওঠে, উহা বিতর্কে পরিণত হইবে। একদল তারস্বরে বলিবে—ফুটপাথে দোকান করা 'জনগণে'র অধিকার, উহা তাহাদের জীবিকা অর্জনের পথ ইত্যাদি…। আর একদল ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিবে, তবে কি ফুটপাথ দিয়া হাঁটা জনগণের অধিকার নয়? তাহারা রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া গাড়ি চাপা পড়িবে? উভয়েই তো জনগণ,—তবে অধিকারের তারতম্য কেন?

ব্যাপারটিতে স্পষ্ট হইল—'জনগণ' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কত অস্পষ্ট! কখন যে কাহাকে এবং কেন আমরা 'জনগণ' আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা আমরা ঠিক জানি না—তবে আজকাল বহুশব্দের অর্থ নির্ণীত হয় রাজনীতির কষ্টিপাথরে! জনগণের অধিকার এখন পর্যবসিত হইয়াছে ভোটের অধিকারে, এবং সেখানে সংখ্যা দ্বারাই ক্ষমতার লড়াই-এ জয়পরাজয় নির্ণীত হয়। একটি শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণীত হইল না—অথচ তাহা দ্বারা সমগ্র জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া গেল! জনগণই দুইভাগ হইয়া গেল—অধিকের বেদীমূলে অল্পের স্বার্থ বলিপ্রদত্ত হইল! উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি ফুটপাথের, কিন্তু ইহার প্রয়োগ জীবনের পথে সর্বত্র; সর্বত্র এই আংশিক অধিকারের নীতি জাতীয় জীবন বিপন্ন করিতেছে, সমাজের এক ভাবের 'জনগণ' অন্য ভাবের 'জনগণ' হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে, নিশ্চয়ই ইহাতে দেশের ঐক্য, সংহতি ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছে।

গণতন্ত্রের একদা-লীলাভূমি ইংলণ্ডের জনৈক সমাজবিজ্ঞানী দার্শনিক একবার মন্তব্য করেন: Politicians look to the next election, statesmen to the next generation and prophets to next centuries. সাধারণ রাজনীতিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ আগামী নির্বাচনের উপর, রাষ্ট্রনেতারা দেখেন আগামী প্রজন্ম, ধর্মনেতাদের লক্ষ্য—আগামী শতাব্দী! কথাগুলি সেই মনীষীই বলিতে পারেন, যাঁহার নখদর্পণে কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস প্রতিফলিত রহিয়াছে!

একটা জাতির জীবন—খেলার মাঠের ক্রীড়া কন্দুক নয়! একটা জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে গেলে অনেক গুণাবলী প্রয়োজন: সেই জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান, তারপর তাহার বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কৃষ্টি সম্বন্ধেও সচেতন হইবে, সর্বশেষ জানিতে হইবে—কি করিয়া ঐগুলি কার্যে পরিণত করা যায়।

'জনগণে'র মতো 'আন্তর্জাতিক' শব্দটিরও আজকাল বহুল ব্যবহার—এবং বহুক্ষেত্রেই অপ-ব্যবহার। আজকাল যে কোন কঠিন সমস্যাই শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক, অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী!—তার অর্থ আমাদের একার কিছু করার নাই!

এখন দেখা যাক, কিছু করার আছে কিনা। এ-বিষয়ে পূর্বে কেহ কিছু চিন্তা করিয়া গিয়াছেন কিনা—বা বলিয়া গিয়াছেন কিনা। লক্ষ্য অবশ্য 'জনগণের উন্নতি'—শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে নয়—আমরাও 'আন্তর্জাতিক' সুরেই কথা বলিতেছি। তবে মনে করি, আগে নিজের ঘরের কাছের সমস্যা সমাধান করিয়া বিশ্বসমস্যার চিন্তা করা সাধারণ বুদ্ধিমানের কাজ। অসাধারণ বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত কোথায় লইয়া যায়, বলা শক্ত।

ভারতের সমস্যাই যথেষ্ট! এখানেই লক্ষ লক্ষ অবহেলিত জনগণ যুগ যুগ ধরিয়া নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। জীবনধারণের সামান্য সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত! অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা চিকিৎসা কিছুই তাহাদের নাই। তাহারা দেশকে সমাজকে দিয়াছে ধনধান্য—শিল্পসম্পদ, পরিবর্তে পাইয়াছে সামান্য রুটির টুকরা, ছিন্নবস্ত্র, জীর্ণ কুটির! শিক্ষা ও চিকিৎসা—নামে আছে, কাজে নাই। বিভাগ আছে, পরিকল্পনা আছে—অর্থবরাদ্দও আছে, তার পর আছে—একটি বিরাট 'কিন্তু'!

এই 'কিন্তু'র বাধাকে জয় করিতে না পারিলে আমাদের অগ্রগতি অসম্ভব। যদিও এ-যুগে সব কাজই সংঘবদ্ধভাবে করাই রীতি, তাহা ছাড়া উপায়ও নাই। তবু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে—ঐখানেই আমাদের সবচেয়ে বাধা। আমরা পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিতে পারি না।

স্বামীজীর ভারত-ভ্রমণ ভারত-পর্যবেক্ষণ। সেই সময় তিনি অনেক কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, শিখিয়াছেন—ভারতের কৃষ্টি ও ইতিহাস, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ঘোষণা করিয়াছেন—ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন, 'No three of us can work together without hating each other.' পরস্পরকে ঘৃণা না করিয়া আমরা তিনজন একযোগে কাজ করিতে পারি না। তবু তিনি নিরাশ হন নাই। কাজের জন্য সংঘ স্থাপন করিয়াছেন, সংঘবদ্ধ কার্যে উৎসাহ দিয়াছেন। জাতীয় জীবনে তাঁহার দূরদৃষ্টি কতটা অভ্রান্ত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান-গুলির খণ্ডবিখণ্ড রূপ দেখিয়া। ছিন্নমস্তাও আমাদের উপাসিতা আদ্যাশক্তির একটি রূপ!

ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে স্বামীজী বুঝিলেন, ভারতের রোগ কোথায়, উহার কারণ কি এবং এই শতশতাব্দীর অধঃপতন রোধ করিয়া কিভাবে জাতীয় জীবনরথ উন্নতির পথে চালু করা যায়। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ব্যাপক অবনতির কারণঃ জনগণকে অবহেলা করা ও নারীজাতির অবমাননা। ধর্মদর্শন কাব্যসাহিত্যের গৌরবকীর্তনে আমরা জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তিই হারাইয়া ফেলিয়াছি; এখন দিশাহারা হইয়া এ উহাকে দোষ দিতেছি। সেই অন্ধগুলির মতো আংশিকভাবে হস্তী দর্শন করিতেছি।

মনুষ্য-সমাজের একটি সম্পূর্ণ দর্শন পাই আমরা 'পুরুষসূক্তে'—যাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা কখনই প্রচারিত হয় নাই, পরন্তু অপব্যাখ্যা খুবই প্রচলিত। ঐ সূক্তে সমগ্র সমাজকে একটি পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে—তাহার মাথা আছে চিন্তা করিবার জন্য, তাহার বাহু আছে কাজ করিবার জন্য, এবং নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য; তাহার মধ্য-ভাগ আছে দেহ সঞ্জীবিত রাখার জন্য, তাহার পদযুগল আছে চলিবার জন্য—এই চলাকেই অন্যত্র 'বিক্রম' বলা হইয়াছে। তাৎকালিক ভাবে ও ভাষায়—মাথাকে 'ব্রাহ্মণ', বাহুকে 'ক্ষত্রিয়', মধ্যভাগকে 'বৈশ্য', পদযুগলকে 'শূদ্র' বলা হইয়াছে। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কল্পনার মধ্যে ছোটবড় উচ্চনীচের প্রশ্ন আসে না—পরবর্তী কালে অবশ্য আসিয়াছে, এবং তখন হইতেই অবনতির সূচনা, এখন আবার এই সমগ্র পুরুষটির উপর মনোনিবেশ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি অঙ্গেরই প্রয়োজনীয়তা আছে, একটিকে বাদ দিলে সমাজ পঙ্গু হইয়া যাইবে বা গিয়াছে। এ-ব্যাপার যে শুধু ভারতবর্ষেই তা নয়, এগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য; সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানও সূক্ষ্মভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো—ইহার সত্যতা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে প্রমাণ করা না গেলেও জীবনে প্রত্যক্ষ করা যায়, অনুভব করা যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সংকলন*

তুমি জেনে খুশী হবে যে, আমাদের সঙ্ঘাধ্যক্ষকে[১] সঙ্গে ক'রে এখানে[২] নিয়ে আসার জন্য আমি পুরী যাচ্ছি। তাঁর মতো শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষ যা কিছু স্পর্শ করেন, তা শুধু পবিত্রই হ'য়ে ওঠে না—পাবনীশক্তি লাভ করে। তিনি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এখানে আসছেন না—আসছেন ধর্মার্থীদের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চার করতে। সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয় না। শুধু অন্তঃসারশূন্য কথায় কি লাভ? ধর্ম-বিষয়ে কথা সবাই বলতে পারে, কিন্তু অন্যের হৃদয়ে ধর্মভাব সঞ্চার করতে পারে এমন লোক কোথায়? ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর আশীর্বাদ যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ে শান্তির বারি বর্ষণ করে, যিনি মানুষের মনে ধর্মভাব সঞ্চার ক'রে তাদের জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী ক'রে তুলতে পারেন। বর্তমান যুগের তথাকথিত তত্ত্বকথার চরম অন্তঃসার-শূন্যতা সম্বন্ধে তোমাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাস্তবিক সংসারবদ্ধ ব্যক্তিদের রচিত বই পড়ে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। কারণ এইসব লেখকদের মন সত্যের অনন্ত আকাশে উড্ডীন হ'তে সক্ষম নয়। এদের চিন্তাধারার পরিণতি অজ্ঞেয়বাদ, সন্দেহবাদ অথবা নিরীশ্বরবাদে। এদের নীতিজ্ঞানের ভিত্তি সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ব'লে এদের বইগুলি অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। অজ্ঞানতার ফলে এরা জন্ম-মৃত্যুর বেড়াজালে-ঘেরা এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মধ্যেই বদ্ধ হ'য়ে আছে।

…তুমি এতদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পবিত্র কাজের জন্য যে উৎসাহ দেখিয়ে আসছ, তা এখন আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাবে এইটি জেনে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের মূর্তিমান্ বিগ্রহ, পরম পবিত্র পুণ্যাত্মা দাক্ষিণাত্যে শীঘ্র আসছেন।

* * *

কখনও অলসভাবে সময় কাটিও না, কারণ অলসতাই সকল কু-চিন্তার মূলে। সর্বদা সতর্ক হ'য়ে কর্তব্য পালন কর। মন থেকে সব জড়তা ঝেড়ে ফেল। অলসতার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। পূর্ণতা লাভের কোন কুসুমাস্তীর্ণ পথ নেই। ভাবাবেগে কোন লাভ হয় না। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং ভগবান্ তোমাকে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন, তাতেই সব সময়ে সন্তুষ্ট থাকবে। যদি ভগবানের জন্য সামান্য একটু সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ না করতে পারো, তাহলে তাঁর প্রতি তোমার প্রকৃত ভালবাসা নেই বলতে হবে! যে ব্যাপারগুলো এখন তোমার কাছে অপ্রিয় ব'লে বোধ হচ্ছে, সেগুলোই পরে তোমার পরম বন্ধু ব'লে মনে হবে। ভগবান্ যে কোন মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্। তোমার কি প্রয়োজন আর কোথায় তোমাকে রাখতে হবে, তা তিনি ভালই জানেন। যদি তাঁর বিধানে তুমি ক্ষুব্ধ হও, তবে তো তাঁর অনন্ত প্রেম ও করুণায় তুমি অসন্তোষ প্রকাশ করলে। আজ্ঞানুবর্তিতা দৈবী সম্পদ, অবাধ্যতাই আসুরিক।

* * *

শুধু নির্বুদ্ধিতার জন্যই আমরা অকারণ দুশ্চিন্তায় আমাদের মন ভারাক্রান্ত ক'রে তুলি।

---

* মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠ হইতে সংকলিত ও প্রকাশিত 'Consolation' নামক পুস্তিকা হইতে অনূদিত।—সঃ

(১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ (২) মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠে

কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়। নেতা এমন হবে যে, যার মধ্যে আমিত্বের লেশমাত্র নেই। "নাহং নাহং—তুঁহু, তুঁহু"—এই হবে তাঁর নীতি। এই ভাবটি মনে রেখে কাজ ক'রে যাও—জয়ী তুমি হবেই। সকলের সঙ্গে মধুরভাবে কথা ব'লো। হঠাৎ সব কিছুর সমাধান ক'রে ফেলার চেষ্টা ক'রো না। তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) আবির্ভাবে আধ্যাত্মিকতার যে প্রবল স্রোত সারা জগতে এমন অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে বাধা দিতে পারে, এমন শক্তি স্বর্গে বা মর্ত্যে কারো নেই। তুমি প্রভুর মনোনীত সন্তান—এইটি জেনে আনন্দিত হও। বেদান্ত সমিতির সকল সদস্যকে জানিও, কেবলমাত্র তাদের নিজেদের চৈতন্যলাভই যে অবশ্যম্ভাবী তা নয়, তাদের সংস্পর্শে যারাই আসবে, তাদেরও চৈতন্যের জাগরণ হবে।

* * *

নিজের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস রাখো। আত্মোন্নতির প্রযত্ন যাদের আছে, তারাই দৈবী সহায়তা লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে অপরের কাজেও সহযোগিতা কর। বাইরে থেকে যদি সাহায্য আসে—ভাল, না আসে—সেও ভাল। জেনো যে শ্রীগুরুমহারাজের কাজের জন্য তুমি আহূত এবং যে কেউ এই কাজে তোমার সঙ্গে যোগ দেবে, সে যেন নিজেকে বিশেষভাবে ভাগ্যবান্ মনে করে। কারণ, ভগবানের জন্য কাজ করার সৌভাগ্য সব লোকের সব সময় হয় না।

তাঁর কাজ কারো দ্বারা কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে—এ দুশ্চিন্তা ক'রো না। যদি কেউ উপরের দিকে থুতু নিক্ষেপ করে, সে থুতু তাকেই ময়লা করে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা সম্পর্কে নিশ্চিত থেকো। তাঁর সদাপবিত্র কার্যে কোথাও এতটুকু ভুল হ'তে পারে না। আমার শ্রীগুরুমহারাজের জন্য যদি কখন-কখন তোমার কাছে কিছু চাই, জেনো তা তোমারই কল্যাণের জন্য। ভগবান্ তোমাকে পবিত্র স্বভাবের অধিকারী করেই গড়েছেন এবং তুমি চেষ্টা করলেও অপবিত্র হ'তে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাজে তোমার ঐকান্তিক ও প্রাণঢালা পরিশ্রমের জন্য, তুমি সতত আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁর আশীর্বাদ তুমি তো লাভ করেছ। নিশ্চিত জেনো যে, ঐকান্তিক ও সৎ লোকমাত্রেই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাগ্যবান্, আর যখন তুমি তাদেরই একজন, তখন তাঁর কৃপা তো তুমি পেয়েই গেছ।

* * *

কোনও কাজ সফল হোক—এটা যদি ভাগবত ইচ্ছা হয়, তাহলে সে কাজের অগ্রগতি কোন কিছুরই দ্বারা ব্যাহত হ'তে পারে না। যাকে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়নি, সে ঠিক 'মানুষ' হয়েছে—এ-কথা বলা যায় না। আপদ-বিপদ থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষালাভ করি। প্রভুর শ্রীচরণে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারবে, তখনই শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনের প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করবে। জীবন একটা নিরন্তর সংগ্রাম। ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে তোমাকে কঠিন সংগ্রাম করতেই হবে—ফল যা কিছু, সব ভগবানের হাতে। সংগ্রামই তোমার কাজ—হারজিত সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরে নির্ভর করে।

জগন্নাথের স্বরূপ সন্ধানে

স্বামী গীতানন্দ

(১)

পনের শত বছরের ইতিহাস এবং পাঁচ হাজার বছরের প্রচলিত কাহিনী—এই মিলিয়ে পুরীর মন্দিরের ঐতিহ্য এবং জগন্নাথদেবের ভাবমূর্তি তৈরী হয়েছে। উড়িষ্যাতে, বিশেষ ক'রে পুরী-ধামে অতি প্রাচীনকাল থেকে বহু ধর্মের প্রভাব পড়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মই তার কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এক মহান্ সমন্বয়-সমৃদ্ধ ভাবধারার সাথে মিশে গেছে।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উড়িষ্যার কয়েকজন অধিবাসী ভগবান্ বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে এসে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। তারপর থেকেই উড়িষ্যাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন; তখন থেকে প্রায় সাত-আটশ' বছর ধরে উড়িষ্যাতে বৌদ্ধ-ধর্মের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে, পুরানো একটি বৌদ্ধ মন্দিরের জায়গাতেই বর্তমান জগন্নাথদেবের মন্দির তৈরী হয়েছে এবং ওখানে ভগবান্ বুদ্ধের দাঁত ছিল। ৩১১ খ্রীষ্টাব্দে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় বুদ্ধদেবের দাঁতটিকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত করা হয়।

বৌদ্ধধর্মের মতোই জৈনধর্মও উড়িষ্যাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর এখানে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন এবং উড়িষ্যার রাজারাও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। পুরীর মন্দিরে এখনও মহাবীরের মূর্তি রয়েছে। ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় যে, সেখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ ক'রে নিজেদের ধর্মমতের অনুশীলন ও প্রচার ক'রত।

উড়িষ্যার আদিম অধিবাসীরা আর্যেতর শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি বনবাসী, গিরিবাসী উপজাতিতে বিভক্ত ছিল এবং সম্ভবতঃ শবর-জাতির মধ্যেই আদি জগন্নাথের পূজা ভিন্ন নামে সীমাবদ্ধ ছিল। আগে যেমন প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি ক'রে গ্রাম্য দেবতা থাকত, সেই-রকম অনেক জায়গায় একটি রাষ্ট্রদেবতাও থাকত। দেশের লোকেরা বিশ্বাস ক'রত যে, ঐ রাষ্ট্রদেবতাই তাদের দেশকে রক্ষা করছেন। রাষ্ট্রদেবতা যাতে তাদের ওপর বিরূপ না হন, তিনি যাতে প্রসন্ন থেকে তাদের সর্বভাবে কল্যাণ করেন, তার জন্য তারা রাষ্ট্র-দেবতার পূজা ক'রত। আগের দিনে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রায় লেগেই থাকত। রাজার পরিবর্তন হ'লে, রাজা ভিন্নমতাবলম্বী হলেও দেশের রাষ্ট্রদেবতার পরিবর্তন হ'ত না। কোন আদিবাসীর রাজ্য যখন বহিরাগত কেউ এসে অধিকার ক'রত, তখন নতুন রাজারা রাষ্ট্রদেবতার কোন পরিবর্তন ক'রত না। রাষ্ট্রদেবতার পূজা আদিবাসীরা আগে যেমন ক'রত, নতুন রাজাদের আমলেও তারা আগের মতোই পূজা ক'রত। সম্ভবতঃ এর একটা রাজনৈতিক কারণও ছিল। বহিরাগত জাতিরা উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সমরকৌশলে আদিবাসীদের পরাজিত ক'রে রাজ্য অধিকার করলেও তারা জনগণকে হাতে রাখবার জন্য তাদের ধর্মভাবে আঘাত ক'রত না। ফলে, যখন কোন বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন রাজা আদিবাসী অথবা অন্যমতাবলম্বী কোন রাজার রাজ্য অধিকার ক'রত, তখনও দেশের রাষ্ট্রদেবতার পূজা আগের মতোই চলতে থাকত। অনেক সময় বিজয়ী রাজাদের ভাষায় রাষ্ট্রদেবতার নামের পরিবর্তন হ'ত বটে, কিন্তু পূজা আগের মতোই হ'ত। এইভাবে ধীরে ধীরে কালের প্রভাবে সকলের অলক্ষিতে বিজিত এবং বিজেতাদের মধ্যে ভাবের সংমিশ্রণ ঘ'টে রাষ্ট্রদেবতার পূজারও কিছুটা

পরিবর্তন হ'য়ে যেত

চতুর্থ/পঞ্চম শতাব্দীতে মাথরাস-বংশীয় রাজারা দক্ষিণ উড়িষ্যার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন নারায়ণের ভক্ত। কেউ কেউ বলেন যে, মাথরাস-বংশীয়েরা বৌদ্ধ-ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাথরাস-বংশের পরেই গঙ্গা এবং শৈলোদ্ভব-বংশীয় রাজারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছিলেন। গঙ্গা-বংশীয় রাজারা ছিলেন শৈব এবং তাঁরা গোকর্ণেশ্বর শিবের পূজা করতেন। শৈলোদ্ভব-বংশীয় রাজারা স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) দেবতার পূজা করতেন। উড়িষ্যার আদিবাসীরাই পরবর্তী রাজাদের সৈন্যরূপে নিয়োজিত হ'ত এবং এদের ধর্মভাবে যাতে আঘাত না লাগে, তার জন্য আদিম রাষ্ট্রদেবতাই বিভিন্ন নামে পরবর্তী কালেও পূজিত হ'ত। এই থেকে অনেকে মনে করেন যে, আদিবাসীদের পূজিত দারুনির্মিত রাষ্ট্রদেবতাকেই মাথরাসরা নারায়ণ রূপে, গঙ্গা-বংশীয়েরা গোকর্ণেশ্বর শিব রূপে এবং শৈলোদ্ভবেরা স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) রূপে পূজা করেছেন।

এই সময় পশ্চিম উড়িষ্যাতে স্তম্ভেশ্বরী দেবতার কথা পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ওখানকার আদিবাসীরা দারুনির্মিত স্তম্ভের (Pillar) অনুরূপ মূর্তির পূজা ক'রত। পরবর্তী কালে হিন্দু ও আদিবাসীদের ধর্মভাবের সংমিশ্রণের ফলে ব্রাহ্মণেরা আদিবাসীদের দেবতাকে সংস্কৃত নামে ভূষিত ক'রে স্তম্ভেশ্বরী-রূপে পূজা করতে থাকে। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে স্থানীয় আদিবাসীদের ভাব ও পূজাপদ্ধতি কিছুটা মিশে যায়।

অনুরূপভাবে মধ্য ও পূর্ব উড়িষ্যাতে ষষ্ঠ/সপ্তম শতাব্দীতে মণিনাগেশ্বরের পূজার প্রচলন দেখা যায়। প্রাচীনকালে আদিবাসী, বনবাসী প্রভৃতি উপজাতির মধ্যেই নাগদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। পরে হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরামকে অনন্তনাগের অবতার ব'লে পূজা করতে থাকে। এই থেকে অনুমান করা হয় যে, মধ্য ও পূর্ব উড়িষ্যার রাষ্ট্রদেবতা ছিলেন মণিনাগেশ্বর এবং পরে মণিনাগেশ্বরই বলরাম রূপে পূজিত হ'তে থাকেন।*

কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, এই সব রাষ্ট্রদেবতা—নারায়ণ, স্তম্ভেশ্বরী, মণিনাগেশ্বর—এঁরাই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কালে জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরাম-রূপে সকলের পূজা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন।

প্রাচীনকালে রাজারাই ছিলেন দেশের ধর্ম ও কৃষ্টির ধারক। সুতরাং দেশের ধর্মভাব এবং কৃষ্টির ওপর রাজাদের বিশেষ প্রভাব প'ড়ত। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হয়েছিল; রাজশক্তির সাহায্যেই ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্ম পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। বর্তমান যুগেও যখন মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত হয়েছে, বিভিন্ন মতবাদ বুঝতে শিখেছে, তখনও যে দল রাজ্য শাসন করে, তাদের মতবাদ অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য প্রাধান্য লাভ ক'রে থাকে। সুতরাং জগন্নাথ-মন্দিরের ভাবধারা বুঝতে হ'লে উড়িষ্যার রাজাদের ধর্মভাব সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার; কারণ বিভিন্ন দেশ থেকে লোকেরা উড়িষ্যায় এসে রাজত্ব করবার সময় তাদের নিজস্ব ভাবধারাও ধীরে ধীরে সেখানকার সনাতন ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছে। এইভাবে বহু শতাব্দী ধরে ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান জগন্নাথ-সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে।

ভৌম-বংশীয় রাজারা অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মধ্য ও পূর্ব উড়িষ্যাতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল বর্তমান জাজপুরে। তাঁরা বৌদ্ধধর্মেরও

* Cult of Jagannath by K. C. Mishra

পরিপোষক ছিলেন। সেইজন্য ওখানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জাজপুরে বিরজা দেবীর মন্দির ছাড়াও ওদিকে অনেক শক্তিপীঠ আছে। এই থেকে মনে হয়, বৌদ্ধ এবং তন্ত্রমতের সংমিশ্রণের ফলে সেখানে বৈষ্ণবধর্মেরও সমৃদ্ধি হয়েছিল।

ভৌমদের পরে সোম-বংশীয় রাজা যযাতি কেশরী (দ্বিতীয়) জাজপুর অধিকার করেন। সোম-বংশীয়েরা ছিলেন শৈব। প্রবল প্রতাপান্বিত যযাতি কেশরী (দ্বিতীয়) অনেক দেশ জয় ক'রে বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সব ধনরত্ন এবং ভৌম-বংশীয় রাজাদের সঞ্চিত অর্থের দ্বারা দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি পুরীতে রাষ্ট্রদেবতার মন্দির তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন। একই সঙ্গে তিনি ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ-মন্দিরও তৈরী করতে আরম্ভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি কোন মন্দিরই সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেননি। তাঁর বংশধরেরা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দির সম্পূর্ণ করলেও পুরীর মন্দিরের কাজ শেষ করবার জন্য যত্নপর হননি। সোম-বংশীয়েরা শৈব ছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁরা পুরীর মন্দিরের দিকে নজর দেননি।

গঙ্গা-বংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গা সোম-বংশীয়দের রাজত্ব অধিকার ক'রে ১১৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই পুরীর অসমাপ্ত মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন। প্রবাদ আছে যে, চোড়গঙ্গা নানা দেশ জয় ক'রে প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করেছিলেন। সেই সব ধনরত্ন এনে তিনি পুরীর বর্তমান মন্দির-প্রাঙ্গণের একটি কূয়ার মধ্যে ঢেলে দিতেন। কূয়াটি যখন ধনরত্নে সম্পূর্ণ ভরে গেল, তখনই তিনি মন্দির তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন। ঐ কূয়াটিকে এখনও "সুনা কূয়া" (সোনা কূয়া) বলা হয়। পুরীর মন্দির সম্পূর্ণ করার ফলে চোড়গঙ্গার প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়। একদিকে বহু বছরের অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রদেবতার মন্দির সম্পূর্ণ করার ফলে তিনি প্রজাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেন; অপর দিকে এই বিশাল মন্দিরকে অবলম্বন ক'রে নানা দেশ থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রী এবং ধর্মপ্রচারকদের আসার ফলে উড়িষ্যাতে ধর্মভাবের নবজাগরণ হ'তে আরম্ভ করে। ভারতের চারটি পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র—দ্বারকা, পুরী, রামেশ্বর, বদ্রীনাথ। পুরী বা জগন্নাথক্ষেত্র অন্যতম প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। সম্ভবতঃ এই সময়েই উত্তর ও পূর্ব ভারতের মুসলমানদের অত্যাচারে বহু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উড়িষ্যায় এসে বসবাস করতে থাকেন।

গঙ্গা-বংশীয় রাজারা আগে শৈব ছিলেন বটে; কিন্তু অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গা বৈষ্ণবভাবেরও পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। তিনি নিজেই "পরম-বৈষ্ণব" আখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় দক্ষিণ ভারতে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের বহুল প্রচার হয় এবং চোড়গঙ্গা নিজেও ঐভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর ফলে বৌদ্ধ, তন্ত্র, বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পূজাপদ্ধতি একত্র সমন্বিত হ'য়ে জগন্নাথ-মন্দিরে স্থান লাভ করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোড়গঙ্গার প্রপৌত্র অনঙ্গ-ভীমদেব (তৃতীয়) (১২১৬-১২৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) জগন্নাথ-মন্দিরের পরিচালনার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করেন। মন্দিরে পাণ্ডা-প্রথার প্রচলন ক'রে তিনি পাণ্ডাদের ওপর সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মভাব প্রচারের ভার দেন। বিভিন্ন দেশের লোকেদের সাথে মিশে পাণ্ডারা তাদের ভাষা এবং আচার-ব্যবহার শিখে নিত এবং তীর্থযাত্রীদের পুরীধামে আনবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রত এর ফলে একদিকে মন্দিরের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হ'ত, এবং অপর দিকে পাণ্ডারা বিভিন্ন রাজ্যের, বিশেষ ক'রে শত্রুপক্ষীয়দের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে গোপনে রাজাকে জানাত। অনঙ্গ-ভীমদেব জগন্নাথদেবকেই আসল সম্রাট এবং নিজেকে তাঁর প্রতিনিধি ভেবে রাজ্য চালাতেন।

তিনি নিজেকে "দুর্গাপুত্র", "শ্রীপুরুষোত্তমপুত্র", "রুদ্রপুত্র" আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। এই থেকে মনে হয় যে, তাঁর রাজত্বের সময় অতি সুন্দরভাবে শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবভাবের সমন্বয় হয়েছিল। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরের জগমোহন অংশটি তৈরী ক'রে তিনি জগন্নাথ-মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানেরা বহুবার উড়িষ্যা আক্রমণ ক'রে সেখানকার বহু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেছে। তারা জগন্নাথদেবের মন্দিরও কয়েকবার লুণ্ঠন করে। সেই সময় পাণ্ডারা মন্দিরের বিগ্রহ-সমূহকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেত।

গঙ্গা-বংশের পর সূর্য-বংশীয় রাজা কপিলেশ্বর উড়িষ্যায় আধিপত্য লাভ করেন। তিনিও জগন্নাথদেবকে উড়িষ্যার সর্বময় কর্তা এবং নিজেকে তাঁর প্রতিভূ ব'লে প্রচার করেছিলেন। প্রচলিত আছে যে, রাজ্যের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ তিনি জগন্নাথদেবকে জানাতেন এবং তাঁরই নির্দেশ মতো কাজ করতেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের দেওয়ালে তিনি লিখে দিয়েছিলেন এবং এখনও লেখাটি রয়েছে :

"উড়িষ্যার সকল প্রদেশের রাজারা দেশের সর্বময় কর্তার (জগন্নাথদেবের) জন্য কাজ করবে। সকলে অধর্মের পথ ত্যাগ ক'রে ধর্মপথে চলবে। যদি তারা রাজ্যের সর্বময় কর্তার বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হবে।" মন্দিরের দেওয়ালে এই-রকম নির্দেশের নজীর বোধ হয় আর কোথাও নেই। কপিলেশ্বর জগন্নাথদেবের মন্দিরের বাইরের দিকের প্রাচীর তৈরী ক'রে দেন।

১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কপিলেশ্বরের পুত্র পুরুষোত্তমদেব উড়িষ্যার রাজা হন। তিনিও পিতার মতোই জগন্নাথদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি বহু দেশ জয় করেছিলেন এবং দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। কথিত আছে, এক সময় কাঞ্চীর রাজা পুরীতে রথের সময় এসে দেখেন যে, উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম-দেব, নিজে জগন্নাথদেবের রথের সামনে ঝাড়ু দিচ্ছেন। রাজার এই হীন ধরনের কাজ দেখে, তিনি বিরক্ত হ'য়ে জগন্নাথদেবকে প্রণাম না করেই কাঞ্চীতে ফিরে যান। এই সংবাদ পেয়ে পুরুষোত্তমদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে, এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাঞ্চী আক্রমণ করেন। ১৪৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী-কাবেরীর যুদ্ধ করেন। প্রচলিত আছে যে, একটি সাদা এবং একটি কালো ঘোড়ায় চড়ে জগন্নাথ ও বলরাম রাজা পুরুষোত্তমদেবকে যুদ্ধে সাহায্য করেন। যুদ্ধযাত্রার এই ছবিটি এখনও জগন্নাথদেবের নাট-মন্দিরের দেওয়ালে দেখা যায়। পুরুষোত্তমদেব যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে কাঞ্চীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গণেশের মূর্তিটিকে পুরীতে এনে মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্থাপন করেন এবং ঐ গণেশ-মূর্তি এখন "ভাণ্ড গণেশ" নামে পরিচিত। ঐ যুদ্ধ থেকে ফেরবার সময় তিনি রাজমহেন্দ্রী থেকে "সাক্ষিগোপাল"কেও নিয়ে আসেন।

পুরুষোত্তমদেবের পর তাঁর পুত্র প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপরুদ্রের সময়ই শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবতঃ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরীধামে এসে বসবাস করতে থাকেন। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে উড়িষ্যায় সর্বত্র ভক্তিভাবের জোয়ার আসে এবং প্রতাপরুদ্র স্বয়ং চৈতন্যদেব এবং তাঁর প্রচারিত ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। চৈতন্যদেবের বহু পূর্বেই কবি জয়দেব "গীতগোবিন্দ" রচনা করেছিলেন। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কই গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই বৈষ্ণব-ভক্তেরা গীতগোবিন্দকে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক-

ভাবের বিবরণ বলেই মনে করেন। চৈতন্যদেব নিজেও রামানন্দ ও স্বরূপের সাথে গীতগোবিন্দের শ্লোক আবৃত্তি ক'রে ভক্তিরস আস্বাদন করতেন। প্রতাপরুদ্র হুকুমজারি করেছিলেন যে, জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে একমাত্র গীতগোবিন্দই গাওয়া হবে—আর কোন গানই মন্দিরে গাওয়া হবে না। এখনও পুরীর মন্দিরে নিত্য গীতগোবিন্দ গেয়ে জগন্নাথদেবকে শোনানো হয়। এই থেকে বোঝা যায় যে, প্রতাপরুদ্রের সময় থেকে মন্দিরে ভক্তিভাবের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় উড়িষ্যার লোকেরাও ভাগবত-ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হওয়ার ফলে জগন্নাথদেবকে লোকেরা বৈষ্ণবধর্মের উপাস্য দেবতা হিসেবে দেখতে থাকে।

প্রতাপরুদ্রের পরই উড়িষ্যার রাজশক্তি দুর্বল হ'য়ে পড়ে। তাঁর ছেলেরা হীনবল ছিল; ফলে প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় বাংলা, দিল্লী এবং গোলকুণ্ডা থেকে মুসলমান রাজারা বার বার উড়িষ্যা আক্রমণ করে। উড়িষ্যার এই দুর্দিনে চালুক্য-বংশীয় মুকুন্দদেব (তেলেঙ্গনা মুকুন্দ) রাজ্য অধিকার ক'রে (১৫৫৯—১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) মুসলমানদের আক্রমণ অনেকটা প্রতিহত করে-ছিলেন। ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যেও মুকুন্দদেব জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁরই কৃপার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন।

মুকুন্দদেবের পর ভোই-বংশীয় রামচন্দ্রদেব সিংহাসন অধিকার করেন। মুসলমানদের অত্যাচারে জগন্নাথদেবকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রামচন্দ্রদেব জগন্নাথদেবকে পুনরায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে মন্দিরের অনেক সংস্কার করেছিলেন এবং নিজে "অভিনব ইন্দ্রদ্যুম্ন" আখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় উড়িষ্যার আধিপত্য মোগলদের হাতে চলে যায় এবং প্রায় দু'শো বছর তারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করে।

মোগলদের পর উড়িষ্যা মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মারাঠারা জগন্নাথ-মন্দিরে কিছু কিছু নতুন অংশ তৈরী করেছিল। মন্দিরের সিংহদরজার সামনে যে অরুণ স্তম্ভটি রয়েছে, সেইটি মারাঠারা কোনারক থেকে এনে ওখানে স্থাপন করে। মারাঠাদের সময় মন্দিরে আবার পূজা, উৎসব ভালভাবে আরম্ভ হয় এবং মারাঠাদের কিছু কিছু ভাবও মন্দিরে পূজার মধ্যে মিশে যায়।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা উড়িষ্যা অধিকার করে। তারা মন্দিরের ভাব এবং পূজার্চনায় কোন রকম হস্তক্ষেপ করেনি। বর্তমান সময় কয়েকজন ট্রাস্টীর ওপর পুরীর মন্দির-পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে।

এইভাবে কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত অন্তর্বিপ্লব, কত ধর্মের সংঘাত, কত ধর্মের সমন্বয়, কত অত্যাচার, কত প্রেম, ভক্তির মধ্য দিয়ে জগন্নাথ-সংস্কৃতি বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

সুদূর নির্জন গিরিগুহার মধ্যে সামান্য একটা ছোট ঝরনার জল জমে জমে যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে, তখন আরও অনেক ছোট-বড় জল-প্রবাহ তার সঙ্গে মিশে, একটা বিরাট নদীর আকার ধারণ ক'রে, পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা ক'রে তোলে। আদি-ঝরনার সামান্য জল কেমন ক'রে বিরাট নদীতে পরিণত হ'ল, তার হুবহু বিবরণ যেমন পাওয়া যায় না, সেই-রকম কোন্ সুদূর প্রাচীনকালে এক অজ্ঞাত আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেবতা, বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির সংস্পর্শে এসে, মহাপ্রভু জগন্নাথে পরিণত হ'য়ে অসংখ্য মানুষের জীবনকে শান্তি ও আধ্যাত্মিকতায় মধুময় ক'রে দিয়েছে, তার যথার্থ ইতিহাসও আজ জানা সম্ভব নয়।

উড়িষ্যার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে,

প্রথম থেকেই এখানকার রাজারা প্রায় সকলেই জগন্নাথদেবের ভক্ত ছিলেন, যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ধর্ম এবং ভাবেরও পরিপোষক ছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন ধর্ম ও ভাবের একটা অপূর্ব সমন্বয় এখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আজকাল রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে যে পরজাতি, পরধর্ম, পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলা হয়, সেইভাব পুরীধামে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অনুসৃত হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে যে ভাবমূর্তি এখানে তৈরী হয়েছে, তাকে কোন বিশেষ ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকেরা জগন্নাথদেবের মধ্যে নিজেদের আদর্শকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি কোন বিশেষ ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়ের দেবতা নন, তিনি সকলের—সকল-জন-নিবাস—জগন্নাথ। [ক্রমশঃ]

দুঃখ দিয়ে জাগাও মোরে

শ্রীমতী চিত্রা মিত্র

চোখের জলে তোমায় পাব
তাই তো ফেলি চোখের জল
সুখ তো আমি চাইনে প্রভু,
দুখেই কাঁদি অবিরল।
এ সংসারে পথ যে আমার
কাঁটায় ঘেরা, নয় সরল।
অমানিশার বিভীষিকায়
দীপশিখা নয় অচঞ্চল।
তাই তো প্রভু, তোমায় ডাকি,
ভীরু ব্যাকুল আমার হিয়া ;
পথ চেনারি দায়ে বুঝি
পরাণ উঠে আকুলিয়া।

আঘাত পেয়ে মনটি আমার
ধায় যেন গো তোমার পানে
প্রাণ যেন মোর দুখের মাঝে
মেতে ওঠে তোমার গানে।
সুখের মাঝে দিবানিশি
অহঙ্কারে মত্ত থাকি।
তোমার কথা হয়না মনে,
আপনারে যে দিই ফাঁকি।
দুঃখ দিয়ে জাগাও মোরে
চেতন-মূলে আঘাত করো,
মোর জীবনে আঁধার নামুক
তুমি তারে আলোয় ভরো।

মহাভূত মহাতীর্থ

শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এককালে এই চিদম্বরম্-মন্দিরের চারদিকে ছিল জলপূর্ণ পরিখা। এখন মন্দিরে যেতে হ'লে আর পরিখা পার হ'তে হয় না। পরিখা ভরাট ক'রে নির্মিত হয়েছে ৬০ ফুট প্রশস্ত রথচলা পথ। পথ পেরুলেই পর পর দুই বিশাল প্রাকার-বেষ্টনী, গ্র্যানাইট্ পাথরে তৈরি। যেমন দৃঢ় তাদের মূল, তেমন বলিষ্ঠ তাদের গঠন। প্রথমটির নাম বীরাপ্পা নায়কন্ মাড়িল, আর দ্বিতীয়টির নাম রাজাক্কাল তাম্বিরাণ্ তিরুমালিগাই। একটি যোড়শ শতাব্দীতে তৈরি, অপরটি তারও অনেক আগে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। কোন্ দূরদেশ থেকে না জানি বয়ে আনা হয়েছিল এই প্রস্তররাশি, কত আয়াসসাধ্য ছিল না জানি সেগুলিকে মেজে-ঘষে এমন স্তরে স্তরে সাজানো। কেননা ভেল্লার, কোল্লিডম্ নদীদ্বয়ের উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত আকাশমহাভূতলিঙ্গম্-মন্দিরের ৭০ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে কোথাও গ্র্যানাইট্ পাথরের অস্তিত্ব নেই। অনেকে বলেন হয়তো ভেল্লার দিয়েই ভাসিয়ে আনা হয়েছিল এই পর্বতপ্রমাণ প্রস্তররাশি। সে যাই হোক, চক্চকে ঝক্ঝকে এই প্রাকার দু'টির মাঝখানে কিন্তু দর্শনীয় বস্তু তেমন কিছুই নেই। সেখানে শুধু নারকেল আর ফলফুলের বাগান। দ্বিতীয় প্রাকার 'রাজাক্কাল্ তাম্বিরাণ্' আর তৃতীয় প্রাকার 'বিক্রমচোলন্ তিরুমালিগাই'-এর মধ্যেই রয়েছে এ-মন্দিরের অধিকাংশ দ্রষ্টব্য স্থান। অতি অপরূপ গোপুরম্ চারটিও সংযোজিত রয়েছে দ্বিতীয় বেষ্টনী রাজাক্কাল্ তাম্বিরাণ্-প্রাকারের সঙ্গে। চিদম্বরম্-মন্দিরের চারটি গোপুরম্ চারজন নায়নারের নামে উৎসর্গীকৃত। পূর্বটি মাণিক্য-বাচ্‌করের নামে, পশ্চিমটি আপ্পারের নামে, উত্তরটি সুন্দরের নামে, আর দক্ষিণটি তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের নামে। এদের মধ্যে মাণিক্যবাচ্‌কর-গোপুরমটিকেই লোকেরা মন্দিরে প্রবেশের সহজতম পথ ব'লে বেছে নিয়েছেন। কেননা এই পূর্বদ্বার দিয়েই সব চাইতে কম সময়ে মূল পীঠস্থানে পৌছানো যায়। দর্শক ইচ্ছে করলে আগে এই পথে গিয়ে আকাশলিঙ্গের আসন ও নটরাজ-মূর্তি দর্শন ক'রে তারপর চত্বরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে পারেন, অথবা সকাল সকাল মন্দিরে পৌছে প্রথমে চত্বরটা ঘুরে নিয়ে ঠিক স্ফটিকলিঙ্গের অভিষেকস্নানের সময় মূল পীঠস্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন। এই প্রবন্ধে আমরা আগে চত্বরটা ঘুরে আসব।

চিদম্বরম্-মন্দিরের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে চের, চোল, পাণ্ড্য, পল্লব, নায়ক, সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ প্রভৃতি বংশীয় রাজাদের চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, চিদম্বরম্-মন্দিরের সকল চাকচিক্য, সব-রকম খ্যাতি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল চোলরাজাদের আমলে। সে সময়ে এ-মন্দির শুধু দেবস্থান বলেই মর্যাদা লাভ ক'রত না, এ-মন্দির জাতীয় কোষাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও সরকারী মহাফেজ্‌খানারূপেও পরিগণিত হ'ত। রাজা মূল্যবান্ নথিপত্র, ধনরত্ন নটরাজের চরণে গচ্ছিত রাখতেন, নতুন মণিমাণিক্য তাঁর হস্তগত হ'লে বিগ্রহদের নতুন রত্নভূষণে সাজিয়ে দিতেন। নতুন তেবারমে স্বরসংযোজন ক'রে রাজগায়ক দেবসমীপে পরিবেশন করতেন। রাজকবি মন্দির-মণ্ডপে বসে নতুন নতুন গ্রন্থ রচনা করতেন, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলি মন্দিরগ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হ'ত। নতুন রাজা সিংহাসনে বসবার আগে নটরাজ-মন্দিরে অভিষিক্ত হতেন। নতুন রাজ্য জয় ক'রে এলে রাজন্যবর্গ মন্দিরমণ্ডপে উৎসব পালন করতেন, আনন্দে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞচিত্তে

চৌহদ্দির মধ্যে নতুন নতুন জলাশয় খনন করতেন, নতুন নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁদের জন্য আবাস গড়ে দিতেন। এইভাবে প্রসারিত হ'তে হ'তে আজকের আকাশলিঙ্গ-মন্দির ৩৯ একর জমি নিয়ে জমজমাট।

প্রাচীন যুগে তিল্লৈবৃক্ষের জমাটি জঙ্গলে প্রথমে তৈরি হয়েছিল শুধু দু'টি মন্দির, এবং বাঙালী পাঠক জানলে খুশী হবেন, সে দু'টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার কৃতিত্ব আমাদের বাংলাদেশেরই এক রাজার। তাঁর নাম ছিল শ্বেতবর্মা চক্রবর্তী। ইতিহাসে ইনি সিংহবর্মন এবং হিরণ্যবর্মন নামেও পরিচিত। কেউ কেউ অবশ্য হিরণ্যবর্মনকে পল্লববংশোদ্ভূত ব'লে অনুমান করেছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরই মতে হিরণ্যবর্মন পশ্চিম-বাংলার অন্তর্গত গৌড়নগরের এক সূর্যবংশীয় রাজা এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। দুষ্ট-ব্যাধি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ায় তিনি আপন অনুজকে সিংহাসন দান ক'রে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে আসেন কাঞ্চীতীর্থে। সেখানে এসে শোনেন তিল্লৈবনের মাহাত্ম্যকথা, আর ব্যাঘ্রপদ, পতঞ্জলি, জৈমিনি ঋষির কাহিনী। কাঞ্চী ত্যাগ ক'রে হিরণ্যবর্মন আসেন তিল্লৈবনে। জলাশয় শিবগঙ্গায় স্নান ক'রে মুনিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত 'তিরুমূলনাথর্'-শিবের অর্চনা করেন। মূলনাথরের কৃপায় হিরণ্যবর্মন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ-রূপে মুক্তিলাভ করলেন। ব্যাঘ্রপদের অনুগামীরা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন ব্যাঘ্রপুরার রাজমুকুট, হাতে তুলে দিলেন ব্যাঘ্রচিহ্নিত রাজনিশান। কৃতজ্ঞচিত্তে রাজা হিরণ্যবর্মন তিল্লৈবনে দু'টি ছোট ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন—একটি তিরুমূল-নাথরের, অপরটি নটরাজের। নতুন সংবৎসরের সূচনা হ'ল, দেবসেবার জন্য 'অন্তর্বেদী' অর্থাৎ গঙ্গাযমুনাউপত্যকা থেকে নিয়ে আসা হ'ল তিন-হাজার বেদশিক্ষিত ব্রাহ্মণ। ব্যাঘ্রপুরায় তাঁদের বসতি দেওয়া হ'ল। এই তিনহাজার উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ, আর তাঁদের বংশধরেরা 'তিল্লৈ-মুভাইরাবর্' বা 'দীক্ষিতার্' নামে পরিচিত। দীক্ষিতার ব্রাহ্মণ বংশই এ যাবৎ চিদম্বরম্-মন্দিরের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম ও পূজা-উৎসবাদি নির্বাহ ক'রে আসছেন। এইজন্যই চিদম্বরম্‌তীর্থ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রীতিনীতি কৃষ্টিসংস্কৃতির এক মহামিলনক্ষেত্র।

রাজা হিরণ্যবর্মনপূজিত বিগ্রহ তিরুমূলনাথর্ রয়েছেন তৃতীয় প্রাকার বিক্রমচোলন্ তিরুমালি-গাই-এর ভিতরে, আর পুণ্যপুষ্করিণী শিবগঙ্গা রয়েছে এই প্রাচীরের বাইরে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাকারের মাঝখানে। এই বেষ্টনী দু'টির মধ্যে বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থান হ'ল শিবগঙ্গাদিঘি, সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ, শতস্তম্ভমণ্ডপ, তিরুক্কাম্মাকোট্টম্, কার্ত্তিকেয়-মন্দির ও গণেশ-মন্দির। গণপতির মন্দিরটি এ-চত্বরের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত, পূর্বদ্বার থেকে বেশ খানিকটা দূরে। দক্ষিণদ্বার দিয়ে ঢুকলে এ-মন্দির দেখা সহজ হয়। সুতরাং হাতে সময় থাকলেই দর্শক সিদ্ধিদাতাকে দেখতে যাবেন। আট ফুট উঁচু গণপতির বিগ্রহটি অতি চমৎকার এবং অতি প্রাচীন।

অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত পূর্বগোপুরমের সামনেই দর্শনার্থী দেখতে পাবেন শিবগঙ্গা দিঘিটিকে। এ দিঘিটির যেমন দৈর্ঘ্য, তেমন প্রস্থ। গভীরতাও নাকি তেমনি। গভীর গঙ্গার তলদেশে ডুব দিয়ে আছেন শিব। শিবগঙ্গার তীর্থের জল তাই শিবসম পবিত্র। দিঘির পশ্চিম পাড়ে তিরুক্কাম্মাকোট্টম্ থেকে মাতা শিবকামসুন্দরী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন পবিত্র তীর্থের দিকে। মাতৃমন্দিরের পুবদেওয়ালে আছে একটি গবাক্ষ, আর দিঘিঘেরা দরদালানে ঠিক তার সোজাসুজি আছে আর একটি গবাক্ষ—ওই

পথেই মাতা দেবদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শিবগঙ্গার পুবপাড়ে সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ—এটির নাম রাজসভা। রাজসভামণ্ডপটি নির্মিত হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে, নির্মাতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুলতুঙ্গ চোল। মণ্ডপটি সে যুগে রাজন্যবর্গের অভিষেকস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। রাজা দ্বিতীয় কুলতুঙ্গ চোল সর্বপ্রথম এখানে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এই মণ্ডপে বসেই তাঁর প্রধান-মন্ত্রী সেক্কিড়ার রচনা করেছিলেন ৪২৫৩টি স্তবকের গ্রন্থ পেরিয়াপুরাণ। নটরাজের আদেশে বেদোপম সেই গ্রন্থখানি তিনি এ-মণ্ডপে বসে পাঠও করেছিলেন। বৎসরাবধি পুরাণপাঠের পর পুঁথিটিকে পূজা করা হ'ল। তারপর সেটিকে রেশমী কাপড়ে মুড়ে স্বর্ণপেটিকায় পুরে হাতীর পিঠে চড়িয়ে নগরপরিক্রমা করানো হ'ল। নগরবাসীর সামনে প্রধান পুরোহিত পুরাণটিকে নটরাজের চরণে উৎসর্গ করলেন। এমনই কত ইতিহাস কত পুণ্যস্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই সভাগৃহের সঙ্গে। এখন রাজ-অভিষেকের পাট নেই, তবে পুরাণাদি পাঠ এখানে প্রায়ই হয়। আর অনুষ্ঠিত হয় রাজার রাজা নটরাজের মহাভিষেক স্নান। নটরাজ-শক্তি শিবকামীকে সঙ্গে নিয়ে বছরে দু'বার রাজসভামণ্ডপে আসেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'তিরুমঞ্জন'-উৎসবের সময়, আর অগ্রহায়ণ মাসে 'অরুদ্রদর্শনম্'-উৎসবের সময় শিবশক্তির মহাস্নান দর্শন করতে এ-মণ্ডপে সমবেত হন দূরদূরান্তের বহু মানুষ। ৩৪০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৮০ ফুট প্রস্থ বিশাল সভাগৃহটিতে তখন তিল-ধারণেরও স্থান থাকে না। রথারোহণের পর রত্নভূষণে সজ্জিত হরপার্বতী সহস্রস্তম্ভমণ্ডপে খানিক বিশ্রাম নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে ফিরে যান মূল মন্দিরে।

এই সহস্রস্তম্ভমণ্ডপের সামনে সেদিন দেখেছিলাম হস্তীমেলা।—ওদের মধ্যে প্রায় সবগুলিই ছিল জীবন্ত, মোটে দু'টি প্রস্তরীভূত। প্রস্তরীভূত হাতী দু'টি প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। মাঝখানের সোপান বেয়ে উঠে দেখেছিলাম মণ্ডপ আর সহস্রটি স্তম্ভের সারি। সহস্রটি একক পাথরে তৈরি স্তম্ভগুলির প্রত্যেকে স্থূলত্বে তিন বর্গফুট, উচ্চতায় অন্ততঃ ত্রিশ ফুট। আয়তনে আভিজাত্যে এ-মণ্ডপের 'রাজসভা'-নাম সার্থক।

রাজসভা ছাড়া আকাশলিঙ্গ-মন্দিরে আরও চারটি সভা আছে।—চিৎসভা, কনকসভা, দেবসভা আর নৃত্যসভা। চিৎসভা আর কনকসভাকে নিয়ে হ'ল মূল পীঠস্থান, এ-মন্দিরের সব চাইতে আভ্যন্তরিক অংশ। দেবসভা আর নৃত্যসভা বিক্রমচোল-পাচিলের ভিতরে। সুতরাং রাজসভা দেখা হ'লে দর্শক শিবগঙ্গার পাড় ধরে এগিয়ে যাবেন উত্তর দিকে। উত্তরে সুন্দরর্-গোপুরমের সামনে দেখবেন নবলিঙ্গ-মন্দির।

নবলিঙ্গস্থানের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এইখানে সপ্তম শতাব্দীতে নায়নার মাণিক্যবাচ্কর ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সিংহল থেকে আগত বৌদ্ধধর্মযাজকগণ চিদম্বরম্-ধর্মকেন্দ্র থেকে শৈবধর্মের উচ্ছেদ ক'রে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মাণিক্যবাচ্কর তাঁদের সঙ্গে হিন্দুধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেন এবং তর্কে তাঁদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। ধর্ম-যাজকগণ শেষপর্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে শ্রীলঙ্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। আজও চিদম্বরম্-মন্দিরে উচ্চকণ্ঠে গীত হয় মাণিক্যবাচ্করের বিজয়গাথা, তর্কযুদ্ধের বিশেষ দিনটিতে নটরাজ আসেন নবলিঙ্গক্ষেত্রে। ধর্মশাস্ত্র-আলোচনা এবং বীথিভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

নবলিঙ্গ-মন্দিরের পর দর্শক দেখবেন উত্তর-গোপুরম্। গোপুরমটির নির্মাতা যদিও দ্বিতীয় কুলতুঙ্গ চোল তবুও সকলে এটিকে কৃষ্ণদেবরায়ের

কীর্তি বলেই ঘোষণা করেন। কেননা গোপুরমটির পরিবর্ধন ও আমূল সংস্কার সাধন করেছিলেন বিজয়নগররাজ। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ জয়ের পর তিনি নটরাজকে প্রণাম জানাতে এসেছিলেন। দেবপূজা ও বিজয়োৎসবের পর তিনি তোরণটির শ্রীবৃদ্ধি করলেন, নটরাজের রথ-যাত্রার খরচা-হিসাবে ৮২টি গ্রাম দেবোত্তর ক'রে দিলেন। তোরণের গায়ে বিনম্রভঙ্গীতে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন কৃতজ্ঞচিত্ত রাজা কৃষ্ণদেবরায়। এ-গোপুরমের গায়ে দর্শক দেখতে পাবেন ব্যাঘ্র-পদমুনি ও ঋষি পতঞ্জলিকে, ভিক্ষার্থী শিব, কঙ্কালেশ্বর, কল্যাণসুন্দর ও আরও অনেককে। সকলেই অপরূপ, সকলেই প্রাণবন্ত। এই রায়গোপুরমটির উচ্চতা মাটির ওপর ১৪০ ফুট, সমুদ্রতল থেকে এর শীর্ষের উচ্চতা ১৫৭ ফুট। সেইজন্য বহুদিন পর্যন্ত তোরণটিকে আলোকস্তম্ভ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে ভাসমান দূরাগত নাবিকেরা তখন উত্তরতোরণ-শীর্ষের আলোকসঙ্কেত দেখে নিজেদের পথ চিনে নিতেন, আকাশলিঙ্গ ও নটরাজের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

উত্তরগোপুরমের সামনে নবলিঙ্গক্ষেত্রের বিপরীতে দর্শক দেখবেন কার্ত্তিকেয়-মন্দির। কার্ত্তিকেয়কে এখানকার মানুষেরা বলেন সুব্রহ্মণ্যম্, পাণ্ড্যনায়কম্। বিগ্রহ সুব্রহ্মণ্যম্ অষ্টম শতাব্দীর পাণ্ড্য রাজা 'বড়গুণ'-এর ইষ্টদেবতা ছিলেন। পাণ্ড্যনায়কম্-মন্দিরের কারুকার্য, সামনের রথাকার মণ্ডপ এবং সর্বোপরি সুব্রহ্মণ্যম্ মূর্তির শিল্পচাতুর্যের কথা বহুদিন দর্শকের মনে জাগরূক হ'য়ে থাকবে।

পাণ্ড্যনায়কমের পাশেই মাতৃমন্দির—'তিরু-কাম্মাকোট্টম্'। কোট্টমের অর্ধমণ্ডপটি অত্যন্ত সুগঠিত, দেশী-বিদেশী বহু স্থপতির উচ্চপ্রশংসিত। অর্ধমণ্ডপের একটি স্তম্ভশীর্ষে বিস্ময়কর একটি পাথরের শিকল দেখেছিলাম। সুদীর্ঘ মাত্র এক-খানি পাথরকে নিপুণ হাতে কেটে কেটে সুকৌশলে তৈরি হয়েছিল এই শিকল, যার প্রত্যেকটি প্রস্তর-চক্রকে হাত দিয়ে ঘোরানো যায়। কত প্রতিভাধর যে ছিলেন সে যুগের শিল্পীরা কল্পনাও করা যায় না!

তিরুকাম্মাকোট্টমে নটরাজের নিত্য আসা-যাওয়া। প্রত্যেক রাত্রে পূজাশেষে চতুর্দোলায় চড়ে শিব আসেন শিবকামীর মন্দিরে, সঙ্গে থাকে নানা বাদ্য, লোকজন, আলোর মশাল। মাতার সঙ্গে নটরাজ একসাথে আরতি গ্রহণ করেন, দুধ ভোগ হয়, তারপর বিশ্রাম। পুরোহিতেরা এই বিশ্রামকে বলেন 'মহাপ্রলয়'। প্রলয়কালে যেমন সৃষ্টির লয় হয়, জীবজগতের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনই নটরাজ যখন বিশ্রাম করেন তখন রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর সৃষ্টি লুপ্ত হ'য়ে যায়, দৃষ্টির গোচরে থাকে না। জীবগণ নিদ্রামগ্ন অবস্থায় মৃতপ্রায় অবস্থান করতে থাকে। প্রত্যূষে অন্ধকার হাল্কা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপ্রলয়ের শেষ, আবার শোভাযাত্রা। নটরাজ কনকসভার আসনে ফিরে এসে পুনরায় সৃষ্টিকর্মের সূচনা করেন।

মাতৃমন্দিরের দক্ষিণে দর্শক দেখবেন শতস্তম্ভ-মণ্ডপ। মণ্ডপটি প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন। প্রথম কুলতুঙ্গের মন্ত্রী নরলোক বীরন্ এটি নির্মাণ করেছিলেন। তথ্যজিজ্ঞাসুরা প্রাচীন এই সভা-গৃহটিতে প্রচুর শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন। ভগ্নদশাপ্রাপ্ত শতস্তম্ভমণ্ডপটি রক্ষা করবার জন্য তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের যত্নের অন্ত নেই।

শতস্তম্ভমণ্ডপের কারুকার্য দেখতে দেখতেই দর্শক পৌঁছে যাবেন পশ্চিমগোপুরমের সামনে। চারটি গোপুরমের মধ্যে পশ্চিমটিই সর্বপ্রাচীন। সেই বিক্রমচোলের আমলে তৈরি। এ-তোরণের প্রতিটি তলেই সুন্দর সুন্দর সব মূর্তি রয়েছে।

তাঁদের মধ্যে থেকে শিল্পরসিক ও ভক্তজনেরা আদি চণ্ডেশ্বর, ত্রিপুরসুন্দরী, ভদ্রকালী, সূর্যদেব, রুদ্র ও নারদকে নিশ্চয়ই চিনে নিতে পারবেন। মূর্তিগুলির অভিব্যক্তি ও ভঙ্গিমা দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করবে।

পশ্চিমগোপুরম্‌টির ঠিক সামনেই তৃতীয় প্রাকার 'বিক্রমচোলন্ তিরুমালিগাই' অতিক্রমের একটি দ্বার আছে। দ্বারশোভাটির নাম 'অকলঙ্ক তিরুভাসাল্'। অকলঙ্কদ্বারপথে প্রবেশ ক'রে একটু উত্তরে গেলেই দর্শক দেখতে পাবেন তিরুমূলনাথরুকে, যে বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই বিস্তারিত হয়েছিল, বিখ্যাত হয়েছিল এই তিল্লৈ-বনম্। তিল্লৈবনের এই বিগ্রহ খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ দু'শো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। ব্যাঘ্রপদ, পতঞ্জলি, জৈমিনি, হিরণ্যবর্মন সকলে এঁর পূজা করেছেন। সুপ্রাচীন মন্দিরটি পরবর্তী কালে বহুবার সংস্কার করা হয়েছে. ফলে হিরণ্যবর্মনের কোন স্মৃতি আর এতে অবশিষ্ট নেই। মূলনাথরের পাশে আছেন তাঁর শক্তি উমাপার্বতী। পার্বতী-মন্দিরের বিপরীতে চত্বরের পূবকোণে 'উৎসবমণ্ডপ'—দেবতাদের সাজঘর।

সাজগৃহের দক্ষিণে দেবসভা। দেবসভামণ্ডপে দেবতাদের বিজয়বিগ্রহগুলি বসবাস করেন, আর মিলিত হন মন্দিরের পূজারী দীক্ষিতাররা। এ-মণ্ডপে বসে দীক্ষিতাররা প্রশাসনিক কাজকর্ম ও উৎসবাদির বিষয় আলোচনা করেন, আইন-নিয়ম প্রণয়ন করেন, হিসাবনিকাশের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন। মণ্ডপটির ছাদ বা বিমান তামার পাতে আচ্ছাদিত। মণ্ডপবেদীর নিচে আছে এক পাতালঘর। পাতালঘরটিতে দেবতাদের ধনরত্ন অলঙ্কারাদি সুরক্ষিত করা হয়। শোনা যায় দেবসভার রত্নভাণ্ডারে মহাভারতের রাজা নল প্রদত্ত কণ্ঠহার থেকে শুরু ক'রে বিধর্মী হায়দর আলি ও টিপুসুলতানের প্রণামীও নাকি সঞ্চিত আছে।

দেবসভার দক্ষিণে চতুর্থ প্রাকার অতিক্রমের একটি দ্বার আছে, সেটি পার হ'লে মূল পীঠস্থানে পৌঁছানো যায়। তবে দর্শক যদি এখনই ওই দ্বারপথে না ঢুকে আর একটু দক্ষিণে আসেন, তাহলে দেখতে পাবেন এ-মন্দিরের ধ্বজস্তম্ভ, বলিপীঠম্ ও নৃত্যসভা। সুউচ্চ ধ্বজস্তম্ভটির আগাগোড়া পাকা সোনায় মোড়া, সামনের নৃত্যসভায় অতি অপরূপ কারুকার্য। নৃত্যসভা এ-মন্দিরের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ। নৃত্যসভা না দেখলে নটরাজ-মন্দির দেখা সম্পূর্ণ হয় না, চিদম্বরম্‌তীর্থে আসা সার্থক হয় না। মণ্ডপটি রথাকার। দুই পাশে দুই সারি চক্র, দুই সারি ছুটন্ত অশ্ব। ওপরে ৫৬টি কারুময় স্তম্ভ। স্তম্ভে স্তম্ভে নটরাজের ১০৮ 'করণ' অর্থাৎ ১০৮ নৃত্যভঙ্গিমা, নৃত্যমূর্তিগুলি যেমন ছন্দোময় তেমনই ভাবপূর্ণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের এমন বাস্তব রূপায়ণ, আর নবরসের এত সুন্দর ব্যঞ্জনা বুঝি আর হয় না!

নৃত্যসভার রঙ্গস্থলে কান পেতে দাঁড়ালে আগ্রহী আগন্তুক শুনতে পাবেন, বহুদূর থেকে ভেসে-আসা আর্য-অনার্যের সংঘাতস্বর। সুদূর অতীতে এ-সভামণ্ডপ নির্মিত হওয়ার অনেক কাল আগে এখানে পূজিত হতেন এক কালীমূর্তি। একদিন নটরাজ কালীমাতার অঙ্গনে অনধিকার প্রবেশ ক'রে, নৃত্য শুরু ক'রে দিলেন। দেবী নটরাজের এই অনুপ্রবেশে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, উভয়ের মধ্যে প্রচুর বাগ্‌বিতণ্ডা হ'ল। তারপর স্থির হ'ল, তাঁরা এক নৃত্যপ্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন। প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে থাকবেন গোবিন্দরাজ। যিনি জয়ী হবেন, একমাত্র তিনিই এখানে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন। গোবিন্দ-রাজের উপস্থিতিতে যথারীতি নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হ'ল। শিব ও কালী দু'জনেই ছিলেন এই শিল্পে সমান পারদর্শী, দ্বন্দ্বের আর কিছুতেই মীমাংসা হয় না। তখন বিষ্ণু অতি কৌশলে কালীমা-র

অগোচরে শিবকে ঊর্ধ্বতাণ্ডব দেখাতে ইঙ্গিত করলেন। শিব অমনি দক্ষিণপদ সোজা ঊর্ধ্বে তুলে পদবিক্ষেপ করতে লাগলেন। কালীমাতা এ-নৃত্যভঙ্গিমা অনুকরণ করতে পারলেন না, পরাজিতা হ'য়ে নৃত্যসভা ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। নটরাজ-মন্দিরের আধমাইল উত্তরে আক্কান্-পল্লীপ্পাডাইতে তিনি প্রতিষ্ঠিতা হ'য়ে রইলেন। তামিলনাড়ুর লোকেরা তাই বলেন, 'তিল্লৈকালী এল্লাইক্কাপ্পালে' অর্থাৎ তিল্লৈবনের কালীমাতাকে শেষপর্যন্ত মন্দিরসীমার বাইরে যেতে হ'ল। কথাটি একটি প্রবাদবাক্যের মতো তাঁদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। নৃত্যসভার মাঝখানে যে প্রস্তরটির ওপর কালীমাতা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, সেখানে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে শিবকালী-নৃত্যপ্রতিযোগিতার শেষ খোদিতচিত্র। তবে কালীমাতা নৃত্যসভা ত্যাগ করলেও দীক্ষিতারদের দ্বারাই পূজিতা হন, মাতার পূজা সাঙ্গ না হ'লে নটরাজের পূজা সমাপ্ত হয় না।

নৃত্যসভার পর ধ্বজস্তম্ভ, বলিপীঠম্ দেখে দর্শক শেষ প্রাকার-বেষ্টনীটি পার হবেন। এ-বেষ্টনীর নাম 'কুলতুঙ্গচোলন্ তিরুমালিগাই'। ধ্বজস্তম্ভের সামনেই প্রাকার অতিক্রমের দ্বার রয়েছে। দ্বারের দু'পাশে রয়েছে দুই বিশালকায় দ্বারপাল, ভিতরের অঙ্গনে একপাশে গোবিন্দরাজ, অপর-পাশে নটরাজ

গোবিন্দরাজ এখানকার আদিবাসিন্দা, সেই শিবকালী-নৃত্যপ্রতিযোগিতার সময় নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। তবে মাঝখানে বেশ কিছুদিনের জন্য তাঁকে বাস্তুচ্যুত হ'তে হয়। রাজা দ্বিতীয় কুলতুঙ্গ ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া শৈব। শিব ও বিষ্ণুর সমান মর্যাদা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পিতামহ প্রথম কুলতুঙ্গ যে উদারতা দেখিয়েছিলেন অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র দেবতা'কে ভিতরে রেখে এই যে সুরক্ষিত তিরুমালিগাই গড়েছিলেন এবং দুই দেবতার সমানভাবে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে-ছিলেন, সেটা তাঁর মোটেই পছন্দ হ'ল না। দেবাদিদেবের অন্দরমহলে 'ক্ষুদ্র দেবতা'র এতটা আধিপত্য তাঁর বিসদৃশ ঠেকায় তিনি হরিকে তাঁর পুরানো বাসস্থান অনন্ত সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করাই মনস্থ ক'রে ফেললেন। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। রাজ-আদেশে দ্বিতীয় কুলতুঙ্গের অনুচরেরা গোবিন্দরাজকে বহন ক'রে সমুদ্রের দিকে নিয়ে চললেন। পূর্ব-সমুদ্রের ধার বরাবর পৌঁছুতেই তাঁদের মন দুর্বল হ'ল—'এমন সুন্দর বিগ্রহ! তায় ইনিও তো দেবতা!' সুতরাং রাজার নিষ্ঠুর আজ্ঞা তাঁরা পুরোপুরি পালন করতে পারলেন না, ভেল্লার নদীর ধারে ভালুদালাম্পট্টু গ্রামে গোপনে গোবিন্দরাজকে রেখে পালিয়ে এলেন। এ ঘটনার প্রায় ২৫০ বছর পর পরমবৈষ্ণব বেদান্তদেশিকার উপস্থিত হলেন কৃষ্ণদেবরায়ের পুত্র অচ্যুতদেবরায়ের দরবারে। অচ্যুতরায়কে গোবিন্দরাজের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনাটা সবিনয়ে নিবেদন করলেন। এরপরই বিষ্ণুভক্ত রাজার উদারতায় ও বেদান্ত-দেশিকারের আপ্রাণ চেষ্টায় বৈখানস-সূত্র অনুযায়ী গোবিন্দরাজ পেরুমল নটরাজ-মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। রাজা ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা ও চারখানি গ্রামের আয় শ্রীহরির নিত্য-পূজার জন্য লিখে দিলেন। গোবিন্দরাজের মন্দিরপ্রকোষ্ঠ 'তিরুচিত্রকূটমে'র একপাশে দর্শক দেখতে পাবেন বেদান্ত-দেশিকারের প্রস্তরমূর্তি। যে-সকল ভক্ত গোবিন্দরাজ ও নটরাজ দুই দেবতাকেই সমান মর্যাদা দেন, তাঁরা সামনের অঙ্গনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে উভয়কে একত্রে দর্শন করেন।

তিরুচিত্রকূটমের উত্তর পাশে মূল পীঠস্থান চিৎসভা আর কনকসভা। একই মণ্ডপের দু'টি ভিন্ন অংশ। চিৎসভা-অংশে আছেন আকাশমহা-ভূতলিঙ্গম্, কনকসভা-অংশে নটরাজসহ অন্যান্য

দেবতারা। চিৎসভা-কনকসভার মেঝে সাধারণ পাথরে তৈরি। দেওয়াল ও বিমান কাঠের। বিমানের ভারবাহী ৬৪টি ঢালু কাঠের বরগায় পাকা সোনার আস্তরণ, বিমানের ওপরে ২১,৬০০ স্বর্ণটালির আচ্ছাদন। টালির সংযোগরেখায় বিমানশীর্ষের দীর্ঘ শিরায় পাশাপাশি সাজানো নয়টি সুগঠিত স্বর্ণকলস। মন্দিরের মধ্যে পাঁচটি রূপার সোপান, অর্ধমণ্ডপের প্রতিটি স্তম্ভে, দেওয়ালে রজতের আস্তরণ। আস্তরণে আস্তরণে ব্যাঘ্রপদ, পতঞ্জলি, জৈমিনি ঋষির জীবনকাহিনী। নটরাজ-বিগ্রহ ছিলেন চোলরাজদের 'কুলনায়কম্'। কুল-দেবতাকে তাঁরা কি দিয়ে সাজাবেন, কেমন ভাবে যত্ন করবেন, কতখানি উজাড় ক'রে দেবেন ভেবে কূলকিনারা করতে পারতেন না। নবম শতাব্দীর রাজা পরাস্তক চোল তো বলতেন—'আমি পুরাস্তক নটরাজের চরণে ভ্রমরস্বরূপ'। তাই তিনি যখন কঙ্গুদেশ[১] জয় ক'রে অপর্যাপ্ত সোনা-রূপা মণিমাণিক্য আহরণ করলেন, তখন তাঁর প্রথম কাজ হ'ল নটরাজের আবাসগৃহটি মণিমণ্ডিত করা। পরাস্তকের পর কতকাল অতীত হয়েছে, কিন্তু নটরাজের রত্নরাশির কোন ক্ষতি হয়নি। ধার্মিক দীক্ষিতাররা আর ধর্মবিশ্বাসী দক্ষিণীরা তাঁর ধনসম্পদ বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন।

দাক্ষিণাত্যবাসী পুরুষেরা অনাবৃত দেহে দেব-দর্শন করেন। স্ত্রীলোকের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নেই। দীক্ষিতাররাও সকলে অনাবৃত দেহে মন্দিরে বিচরণ করেন। তাঁরা বলেন, জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হন, তখন তাঁর কোন দেহবন্ধন থাকে না। সুতরাং যতটা সম্ভব বাহুল্য বর্জন ক'রে ভগবানের কাছে আসাই উচিত। দেবদর্শনের আগে প্রথমে মূল মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করতে হয়। দক্ষিণ দিকে দক্ষিণামূর্তি, তারপর ৬৩ জন নায়নারের মূর্তি, সব শেষে মন্দিরের পিছনে চণ্ডিকেশ্বর মূর্তিটি দর্শন করতে হয়। চণ্ডিকেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার করতালি দিয়ে বলতে হয়—'আমার মন পবিত্র কর', 'আমায় ভক্তি দাও', 'আমাকে দেবদর্শনের অনুমতি দাও'। অনুমতি নিয়ে অর্ধমণ্ডপের নিচে দাঁড়িয়ে নিরাকার আকাশলিঙ্গ ও সাকার নটরাজকে দর্শন করতে হয়।

চণ্ডিকেশ্বর ছিলেন নটরাজের পরমভক্ত। তিনি নটরাজের চরণে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেছিলেন। এ-চরণে আশ্রয় লাভের জন্য ছুটে এসেছিলেন নায়নার নন্দনার, তিরুনীলকান্তর, মেইকণ্ডাদেবর, মাণিক্যবাচ্‌কর, অরুমোলিনাথর, নাম্বিআন্দার-নাম্বি ও আরও অনেকে। এঁরা সকলেই এখানে নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে নটরাজ-অঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এঁরা ভাবতেন—

"ন পরং পুরমস্তি পুণ্ডরীকাৎ
শিবগঙ্গাসদৃশো ন কাপি সিন্ধুঃ।
অপি হেমসভানিভা ন গোষ্ঠী
নটরাজাদধিকো ন কোঽপি দেবঃ॥"

(রচনা—আপ্পায়া দীক্ষিতার)

সত্যিই নটরাজের তুল্য বিগ্রহ হয় না। অপরূপ তাঁর শ্রীঅঙ্গের শোভা। তাঁর অঙ্গশোভার পূর্ণ সৌন্দর্য দেখতে হ'লে দর্শককে যেতে হবে কর্পূরারতির সময়। স্ফটিকলিঙ্গের অভিষেকস্নান-শেষেই নটরাজের পূজা ও কর্পূরারতি হয়। সেদিন কনকসভার আসনে দেখেছিলাম নটরাজের আনন্দ-বিগ্রহটি। স্বর্ণদীপের কোটরে প্রজ্বলিত ছিল শ্বেতকর্পূরচূর্ণ। আরতির আবর্তনে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল নটরাজের পান্নাঅঙ্গের উত্থান-পতনে, মসৃণ গড়নে, মস্তকের 'ত্রৈলোক্যসার' মণিতে, ললাটের হীরকবিভূতিচিহ্নে, কর্ণের মুক্তা-কুণ্ডলে, আর 'কুঞ্চিতপদে'র মণিহারে। মণ্ডপময় বিচরণ করছিল শত সূর্যের শত সহস্র আলোক-

১ বর্তমানের কয়েম্বাটোর ও সালেম জেলা

রশ্মি। সহস্র রশ্মির মাঝখানে উদ্ভাসিত ছিলেন পূর্ণজ্যোতি পুরান্তক। পুরোহিত বলেছিলেন—'আমরা অবিদ্যা-কর্পূরে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে নিয়ে দেবাদিদেবের আরতি করি। অবিদ্যা পুড়ে নিঃশেষ হয়, থাকে শুধু যা সত্য, যা নিত্য।' আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চিরন্তন সত্য নটরাজের সে অবিস্মরণীয় রূপ, আর নিত্য চলে সে রূপচিন্তার রোমন্থন।

এ-মন্দিরে দিনে ছয়বার নটরাজের পূজারতি। প্রত্যুষে স্তোত্রপাঠের সঙ্গে দেবতার ঘুম ভাঙিয়ে পূজারতির শুরু, আবার মধ্যরাত্রে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে পূজারতির শেষ। দুইবারই দুধ ভোগের ব্যবস্থা। দুধ আগে নিবেদন করা হয় শিবকে, তারপর সেই প্রসাদী-দুধ শিবকামীকে। কোন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শিবের সামনে প্রসাদ গ্রহণ করেন না; মাতৃমন্দিরে দাঁড়িয়ে পিতামাতার প্রসাদ নেন। তাঁরা বলেন, মায়ের কৃপাই হ'ল আসল, তাঁর অনুগ্রহ না হ'লে জগৎপিতাকে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ উত্থাপন করেন সম্বন্ধরের কাহিনী—দেবী পার্বতী স্বহস্তে সম্বন্ধরকে দুধ পান করিয়েছিলেন। সেইজন্য মাত্র তিন বৎসর বয়সে তাঁর শিবজ্ঞান হয়েছিল। তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরকে স্মরণ ক'রে আজও আকাশমহাভূতলিঙ্গম্-মন্দিরে প্রত্যহ শিশুদের মধ্যে প্রসাদী দুধ ও তেল বিতরণ করা হয়। প্রায় হাজার বছর হ'ল সেই নরলোক বীরনের আমল থেকে এই ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা ব'লে রাখি—দাক্ষিণাত্যের অনেক মন্দিরেই দর্শক ৬৩ জন নায়নারের মূর্তি দেখতে পাবেন। তাঁদের মধ্যে তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরকে চিনে নিতে দর্শকজনের কোনই অসুবিধা হবে না। কেননা তিরুজ্ঞানই একমাত্র শিশু-নায়নার। আর একজনকে দর্শক অনায়াসেই চিনবেন; তিনি হলেন কারিক্কলের আম্মাই—একমাত্র মহিলা নায়নার। কারিক্কলের মাতাজী এই ব্যোমমহা-ভূতক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

এ-মন্দিরের আবহাওয়াতে অধ্যাত্মচিন্তা, স্থাপত্য বিন্যাসের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে উন্নত চিন্তার অভিব্যক্তি। মন্দিরের চারটি গোপুরমই সপ্ততলছন্দে তৈরি। সাতটি তলের সাত গবাক্ষ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও বুদ্ধির প্রতীক। গবাক্ষ বিন্যাসে বলা হয়েছে—

'ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥'
(গীতা, ৩।৪০)

—পঞ্চেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠান। কাম জ্ঞানকে আচ্ছাদিত ক'রে দেহী জীবকে মূঢ় ক'রে রাখে। সেইজন্য ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত ক'রে, কাম পরিত্যাগ ক'রে আধ্যাত্মিকমার্গে এগিয়ে যেতে হবে।

এ-মন্দিরের তিনটি দ্বারশোভা তিন গুণের প্রতীক—সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ। সত্ত্বগুণে মানুষ মনে করে 'সুখসঙ্গে আমি সুখী আছি।' রজোগুণে তার কর্মসঙ্গের তৃষ্ণা বাড়ে। তমোগুণে জন্মায় তার মোহ—প্রমাদ, আলস্য আর নিদ্রার বন্ধন। ভগবান্‌কে পেতে হ'লে এ-সকল বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা একান্তই আবশ্যক।

বলিপীঠম্ আর ধ্বজস্তম্ভের জন্য নতুন কোন দর্শনচিন্তা নেই। ধ্বজস্তম্ভের মতো মন স্থির ক'রে সাধনার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী-পদ্মকে জাগ্রত করতে হবে—এই কথাই বলা হয়েছে। 'মহামণ্ডপম্'-এর ১৮টি স্তম্ভ অষ্টাদশ পুরাণের প্রতীক, অর্ধমণ্ডপের ছয়টি স্তম্ভ ষড়দর্শন, চিৎসভা-কনকসভার আচ্ছাদন ২১,৬০০ সোনার টালি মানুষের সারা-দিনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। এই শ্বাস-প্রশ্বাস যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন অর্থাৎ ঈশ্বর বাস করেন প্রত্যেকের হৃদয়ে। সেইজন্য মনুষ্যদেহের ঠিক যে স্থানটিতে হৃদয়ের অবস্থান, মন্দিরচত্বরের ঠিক সেই অংশে চিৎসভার অবস্থান। বিমানের ২১,৬০০ সোনার

টালি ৭২,০০০ স্বর্ণকীলক দিয়ে গাঁথা। এই ৭২,০০০ স্বর্ণকীলক মানুষের শরীরের ৭২,০০০ স্নায়ুর সমষ্টি। মণ্ডপশীর্ষের নয়টি স্বর্ণকলস নবশক্তি। ৬৪টি সোনার বরগা এ-জগতের ৬৪ প্রকার শিল্পকলা, আর গর্ভগৃহের পাঁচটি রূপার সোপান শিবপঞ্চাক্ষর—'নমঃ শিবায়'। শৈবদের কাছে এই পাঁচটি অক্ষর পাঁচটি মহামূল্যবান্ রত্নস্বরূপ। শিবপঞ্চাক্ষর যিনি হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁর নটরাজ-দর্শনের ফললাভ হয়। শিবপঞ্চাক্ষর যিনি স্মরণ করেন, তাঁর নটরাজ-পূজা সাঙ্গ হয়। আবার বিপরীত দিকে নটরাজ-বিগ্রহ দর্শন করলেই শিব-পঞ্চাক্ষর ধারণ ও স্মরণ করা হয়। কেননা নটরাজের পাদদ্বয়ই হ'ল 'ন', নাভিমণ্ডল 'ম', স্কন্ধদ্বয় 'শি', মুখমণ্ডল 'বা', আর মস্তক 'য়'। 'শি' অক্ষরের অর্থ ঈশ্বর, 'বা' অক্ষরের অর্থ অনুগ্রহ, 'য়' অক্ষরে আত্মাকে বোঝায়। 'ন' মানে মুক্তি আর 'ম' হ'ল অহঙ্কার।[২] সুতরাং পঞ্চাক্ষর 'নমঃ শিবায়' হ'ল বিশ্বজীবের মুক্তিমন্ত্র।

এই মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ আপ্পার আর ক্ষুদ্র শিশু তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর, অস্পৃশ্য আদিদ্রবিড় নন্দনার আর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আপ্পায়া পরম পণ্ডিত রামলিঙ্গস্বামী আর নিরক্ষরা নারী কারিক্কলের আম্মাই। এই মহাভূততীর্থে আর্য-অনার্যের মিলন, অদ্বৈতদর্শন শৈবসিদ্ধান্তের লালন, প্রেম প্রত্যয় আত্মত্যাগের সঙ্গে শাস্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্রের বন্ধন। এখানে যেমন শ্রীযন্ত্রের পূজা, তেমনই পঞ্চাক্ষর জপের ব্যবস্থা। এ-তীর্থে যেমন শঙ্করাচার্যের পথানুসরণ, তেমনই মেইকান্দার-সূত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন। এখানে যেমন বেদ উপনিষদের আলোচনা, তেমনই তিরুবাচকম্, তিরুমন্দিরম্, তিরুত্তাণ্ডগমের স্তোত্রবন্দনা। এখানে যেমন সাকার ঈশ্বরের সাধনা, তেমনই নিরাকার নিরবয়বের আরাধনা, পাশাপাশি দু'টি আসনে দুইরূপে তাঁর অর্চনা। এখানে সকল অপরাবিদ্যা পরাবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে নিয়ত পরিবর্তিত ও পরিশোধিত হচ্ছে। এখানে শাস্ত্রগ্রন্থের শব্দসমষ্টি তার প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মজ্ঞানে উত্তরণ করছে। এখানে বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত ভক্তি-বিশ্বাস-অনুরাগের সমুদ্রে বিলীন হচ্ছে। আকাশলিঙ্গ-মন্দিরে মহাযোগী মহাত্যাগী মহাজ্ঞানী মহামানী সকল শ্রেণীর মানুষ সর্বকালে সর্বসময়ে মিলিত হচ্ছেন। এই ব্যোমমহাভূততীর্থ তাই ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মক্ষেত্র, অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনচিন্তা ও সংস্কৃতি-সভ্যতার জন্মভূমি।

পঞ্চমহাভূততীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মহাভূত	ক্ষেত্র	শিবের নাম	পার্বতীর নাম	স্থলবৃক্ষ	প্রধান তীর্থ
ক্ষিতি	কাঞ্চীপুরম্	একাম্রেশ্বর	অম্বিকা	আম্র	কাম্পাই / শিবগঙ্গা
অপ্	শ্রীরঙ্গম্	জম্বুকেশ্বর	অখিলাণ্ডেশ্বরী	জম্বু	কাবেরী / শঙ্করালম্
তেজ	তিরুভন্নামালাই	অরুণাচলেশ্বর	অপিতকুচাম্বল	বকুল	শিবগঙ্গা
মরুৎ	শ্রীকালহস্তী	কালহস্তীনাথ	জ্ঞানপুঙ্কোদৈ	বট	স্বর্ণমুখী নদী
ব্যোম	চিদম্বরম্	চিদম্বরম্-রহস্যম্ ও নটরাজ	শিবকামসুন্দরী	তিল্লৈ	শিবগঙ্গা

২ তামিল স্তবগ্রন্থ 'উন্মাই বিলাক্কম্' বা সত্যের প্রকাশ—রচনা 'মানবাচন্কতন্তার'।

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ইংল্যাণ্ড

এবার ইংল্যাণ্ড। আগেই বলেছি, অক্সফোর্ডের ওরিয়েণ্টাল কলেজ আমাকে গীতার ওপরে কিছু বলবার জন্যে ডেকেছিলেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় রামানুজাচার্য আর শঙ্করাচার্য কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করবার জন্যে। একজন বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী, আর একজন অদ্বৈতবাদী—দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে আলাদা। এঁরা কে কিভাবে একই জিনিসের ব্যাখ্যা করেছেন, তা দেখিয়ে দিতে হবে আমাকে। এ বিষয়টি নাকি যাঁরা ওখানে এম. ফিল. করছেন, তাঁদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। দুটি বক্তৃতায় আমার বক্তব্য শেষ করতে হবে। বার্লিন থেকে ১লা নভেম্বর (১৯৮১) সকালে আমি লণ্ডনে গিয়ে পৌছলাম। হীথরো বিমান-বন্দরে আমাকে নিতে পরিচিত ও অপরিচিত কয়েকজন এসেছিলেন। তার মধ্যে আমাদের ওখানকার কেন্দ্রের যিনি অধ্যক্ষ—স্বামী ভব্যানন্দ—তিনিও ছিলেন। অধ্যাপক মতিলাল আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি নিষেধ করেছিলাম। স্বামী ভব্যানন্দ আসবেন ব'লে তাঁর আসার প্রয়োজন নেই, লিখেছিলাম। হীথরো সম্বন্ধে আমার খুব ভয় ছিল। ভেবেছিলাম, এখানে আমার পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে অনেক হাঙ্গামা করবে। ওখানকার লোকেরা কালো চামড়ার লোক দেখলে, ধরে নেয় স্থায়ীভাবে ইংল্যাণ্ডে বাস করবার জন্যে এসেছে, আর কাগজপত্র যা সঙ্গে আছে, তা সব ভুয়ো। এমন ব্যবহার করে, যা বিরক্তিকর ও অপমানজনক। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল, আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। বেশ হাসিখুশি ও ভদ্র ব্যবহার করেছে, কিন্তু ফেরবার বেলায় একটু অন্যরকম। আমার এ্যাটাচি কেস্ খুলতে হ'ল, আর তার মধ্যে ছোট একটা নিকেলের কৌটো দেখে জিজ্ঞাসা ক'রল: 'ওটা কি?' আমি বললাম: 'আমার জপের মালা।' 'খোল দেখি।' খুলে দেখালাম, তবে ছাড়ল। বোধ হয় ভেবেছিল, বোমা। বোমাই বটে! কিন্তু আবার একটু আপ্যায়িত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রল: 'তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ কেন?' বললাম: 'আমার হাতে সময় কম, এর মধ্যে অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

ইংল্যাণ্ডে অনেকদিন থেকেই আমাদের একটা বেদান্তকেন্দ্র আছে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল ইংল্যাণ্ডে বেদান্ত খুব ভালভাবে জেঁকে বসবে। আমি বলছি না যে, বেদান্ত খুব জেঁকে বসেছে। তবে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আগে এই কেন্দ্র লণ্ডনে ছিল। এখন আছে বোর্ন এণ্ড (Bourne End), বাকিংহামশায়ার (Buckinghamshire) এলাকায়। একটু পাড়াগাঁ। লণ্ডন ছেড়ে একটু পাশে আসাতে ভালই হয়েছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে এখন আশ্রম। বর্তমান আশ্রমের বাড়ীটা হচ্ছে বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক এডগার ওয়ালেসের বাড়ী। এটা হচ্ছে তাঁর পল্লীভবন ('country seat')। এই বাড়ীতে বসে তিনি বহু উপন্যাস লিখেছেন। যেটা তাঁর পড়ার ঘর ছিল, যেখানে বসে তিনি লিখতেন, সেটা এখন আমাদের ঠাকুরঘর। সুন্দর বাড়ীটি। বিশেষ অদলবদল করা হয়নি। সেইভাবেই রয়েছে। আশেপাশে অনেক জায়গা। সুন্দর বাগানও আছে। সুন্দর, শান্ত পরিবেশ।

বহু লোক আমাদের এই বেদান্তকেন্দ্রে আসে। ঐ আশ্রমের প্রধান স্বামী ভব্যানন্দও দেখলাম ওখানে খুব জনপ্রিয়। দেখলাম শুধু ইংরেজ বা ভারতীয় নয়, ইওরোপের নানা জায়গার লোক ঐ বেদান্তকেন্দ্রে আসছে। আমি যেদিন বেদান্তকেন্দ্রে পৌঁছলাম, সেদিন ছিল রবিবার। প্রত্যেক রবিবার একটা বড় সভা ওখানে হয়। যাঁরা আসেন তাঁদের অনেকে আবার খেয়েও যান। দেখলাম, তাঁদের প্রত্যেকেই সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে আসেন। কেউ হয়তো একটু কেক নিয়ে এলেন, আর একজন হয়তো পুডিং বা আর একটা কিছু নিয়ে—কেউ ভারতীয় খাবার, কেউ ইংরেজী খাবার। একসঙ্গে বসে সবাই ভাগ ক'রে খান। সে-রাতে আশ্রমে আর রান্না হয় না। আমি সকালে পৌঁছলাম। আমাকে ভব্যানন্দজী বললেন: 'আপনাকে আজ বিকেলে আমরা একটা অভ্যর্থনা (Reception) দেব। সেখানে আপনাকে কিছু বলতে হবে।' আমি বললাম: 'কি বিষয়ে ব'লব?' উনি বললেন: 'আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান—এই বিষয়ে বলবেন।' বললাম। দেখলাম, শ্রোতাদের মধ্যে ভারতীয়, ইংরেজ, আবার অন্য দেশের লোকও আছে—যেমন, গ্রীক, ডাচ ইত্যাদি। ইংল্যাণ্ডের এই কেন্দ্রটি বাস্তবিক একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র।

আশ্রমে দেখলাম, সবাই নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই সমস্ত ক'রে নিচ্ছেন। ওখানে গৃহকর্ম করার লোক কেউ রাখতে পারে না। মাইনে-করা কাজের লোক রাখা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাই প্রত্যেকে নিজের কাজ নিজেই ক'রে নেয়। দেখলাম, সমস্ত সপ্তাহ ধরেই ভক্তেরা আশ্রমে আসছেন। আগে থেকে চিঠিপত্র লিখে ব্যবস্থা ক'রে তাঁরা আসেন। আর এসেই তাঁরা কাজে লেগে যান। তাঁদের একটা থাকার জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয়। এসেই তাঁরা হয়তো কেউ ঝাঁট দিতে শুরু করলেন, কেউ রান্না করতে শুরু করলেন, কেউ কাপড় কাচতে লাগলেন, কেউ বা কাপড়-জামা ইস্ত্রী করতে লাগলেন। শুধু নিজের কাজ নয়, সে-কাজ সকলের, সমস্ত আশ্রমের। একটা আপনার বোধ সবার মধ্যে। 'আশ্রম শুধু সাধুদেরই নয়—আমাদের সকলের আশ্রম'—এ-রকম একটা বোধ তাঁদের মধ্যে দেখলাম। দেখে খুব ভাল লাগলো। একজন মহিলা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আপনার কিছু কাপড়-চোপড় ধোবার আছে?' আমি একটু ইতস্ততঃ করছি কি ব'লব, কারণ সত্যি ধোবার আছে অনেক, তবে একজন অপরিচিত মহিলাকে কি ক'রে দিই? আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে তিনি বললেন: 'আপনার কাপড়-চোপড় ঘরের বাইরে রেখে দেবেন, আমি কিছুক্ষণ পরে এসে নিয়ে যাব।' লজ্জার মাথা খেয়ে আমি তাই করলাম। বুঝলাম, এটা এখানকার রীতি। তার পরদিন ব্রহ্মচারী পিটার আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় পাট ক'রে নিয়ে গেল। পিটার আমার দেখাশোনা ক'রত। রোজ ভোরবেলা আমার জন্যে চা তৈরী ক'রে এনে দরজায় টোকা দিত। প্রায় সাড়ে ছ-ফুট লম্বা, আবার মোটাও তেমনি। বাড়ী কাঁপিয়ে চ'লত। পিটারের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। কত বিষয়ে কথা হ'ত! আমি জানতে চাইলাম—কিভাবে সে এ-পথে এল। বললে: 'আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু ভারতীয় যোগ সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী ছিলাম। দিনকতক হিপি-গিরিও করেছি। শেষে এখানকার খবর পেয়ে এখানে এসে গেছি। বছর কয়েক এখানেই আছি।' কেমন লাগছে, জিজ্ঞাসা করলাম। বললে: 'খুব ভাল।' স্বামীজীর বই কতটা পড়েছে জানতে চাইলাম। যোগ

সম্বন্ধে স্বামীজীর বইগুলি পড়েছে, বললে। পিটারের সাধারণ শিক্ষা বেশী নেই। স্বামী ভব্যানন্দ তাই তাকে সপ্তাহে তুদিন কোন এক কলেজে পড়তে পাঠান। পড়াশোনার ওপর তার যে খুব একটা অনুরাগ আছে, তা আমার মনে হ'ল না। হয়তো পড়াশোনার ভয়েই বাড়ী থেকে পালিয়েছে। আবার সাধু হয়েও পড়াশোনা! তার ভাল না লাগারই কথা। বাড়ীতে মা আছেন। ছেলে যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে না, এক ভদ্র পরিবেশে শান্ত হ'য়ে আছে, তাতেই মা খুশী। তবে তিনি বেদান্ত কি, বোঝেন না।

আমি অনেকদিন থেকে শিক্ষার জগতে থাকায়, অনেক ছাত্র বিদেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। লণ্ডনেও অনেক ছাত্র আছে, কিন্তু আমি তো সকলের ঠিকানা জানি না। কাউকে জানাইওনি যে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমি যখন হীথরো এয়ারপোর্টে নামলাম, তখনই দেখলাম, সেখানে বেশ কয়েকজন ছাত্র এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তু-একজনকে তো বহুদিন পরে দেখলাম। এরা বেদান্তকেন্দ্র থেকে জেনেছে যে, আমি আসছি। তাই বহুদূর থেকেও এসেছে আমাকে অভ্যর্থনা করতে। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায় সর্বক্ষণ গাড়ী নিয়ে তৈরী থাকত, আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবার জন্মে। তবে ওখানে আমি সবচেয়ে ঋণী যাঁর কাছে— তিনি হচ্ছেন ডঃ সুহাসরঞ্জন দাশগুপ্ত। তিনি অবশ্য আমাদের ছাত্র নন। আগে আমাদের কলকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— এখন ইংল্যাণ্ডে আছেন। তিনি প্রত্যেকদিন আমার জন্মে গাড়ী নিয়ে আশ্রমে আসতেন। থাকতেন অনেক দূরে, ৭০।৮০ মাইল দূরে। একটা বড় হাসপাতালের দ্বিতীয় প্রধান। তবু ছুটি নিয়ে রোজ আসতেন আমার জন্মে। তাই তাঁর কথাটাই আমার বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে। তাঁর স্ত্রীর নাম রত্না। ওঁদের ৫।৬ বছরের একটি মেয়ে আছে—সুমি। সে বাংলা-টাংলা বিশেষ জানে না। ইংরেজীতেই কথা বলে। মা ওকে মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বলেন: 'তুমি ইংরেজীতে কথা ব'লছ কেন? বাংলায় বলো।' সঙ্গে সঙ্গে সে তখনকার মতো চুপ ক'রে যাবে। আর কথা বলবে না। বললে ইংরেজীতেই বলবে, নাহলে বলবে না। কারণ, বাংলা বলতে পারে না ভাল। আর বাংলা বলতে সে অভ্যস্তও নয়। বাড়ীতেই বাবা-মা ছাড়া আর তো বাংলা বলার লোক নেই। আর বাড়ীর বাইরে গেলেই তো তাকে ইংরেজী বলতেই হয়। তাই মা জোর না করলে সে বাড়ীতেও বাংলা বলতে চায় না। বাস্তবিক, পরিবেশ ভাষা শিখতে কতটা সাহায্য করে, তাকে দেখে বুঝলাম। আমি যতদিন ওখানে ছিলাম, ডঃ দাশগুপ্ত আমাকে রোজই গাড়ীতে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন। সঙ্গে থাকতেন ওঁর স্ত্রী আর তাঁদের ঐ ছোট মেয়েটি। ইংল্যাণ্ডের অনেক জায়গা আমাকে তাঁরা ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। প্রথম দিন আমরা যাচ্ছি; ঐ মেয়েটি বুঝতে পারছে না, কে আমি? দেখছে, ওর বাবা-মা খুব খাতির-যত্ন করছেন আমাকে। ও বুঝতে পারছে না, কি ব্যাপার, কেন আমাকে এত খাতির-যত্ন! ও প্রায়ই দেখলাম খুব কৌতূহল নিয়ে আমাকে দেখছে। আমার চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই তার কাছে নতুন। তাই আমাকে নিয়ে তার খুব কৌতূহল। এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে ওর বাবা-মা নেমে গেছেন কিছু কেনাকাটা করতে। ও আর আমি গাড়ীতে বসে আছি। আমি সামনের সীটে, ও পেছনের সীটে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল: 'Do you stay with God?'—'তুমি কি ভগবানের সঙ্গে থাক?' আমি বললাম: 'I try to.'—'আমি চেষ্টা করি তাঁর সঙ্গে থাকতে।'

ওকে হয়তো ওর বাবা-মা বলেছিলেন যে, আমি 'সাধু' বা 'holy man' জাতীয় কিছু। তাই বোধ হয় এই প্রশ্ন। এর কিছুক্ষণ পর ওর মা ফিরে এলেন। দেখলাম মার কাছে মেয়েটি তখন ফিস্ ফিস্ ক'রে কিছু একটা বলছে। কি বলছে আমি শুনতে পাচ্ছি না, তবে বুঝতে পারছি আমাকে নিয়েই কিছু বলছে। শুনতে পাচ্ছি ওর মা আবার তাকে ধমকও দিচ্ছেন চাপা গলায়। আমি জিজ্ঞেস করছি ওর মাকে: 'কি বলছে ও?' ওর মা তো বলতে চান না। আমি বললাম: 'আরে, বলই না কি বলছে ও।' তখন খুব সলজ্জভাবে, সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন: 'ও জিজ্ঞেস করছে, "Is he a man or a woman?"'—'উনি পুরুষ না নারী?' আমি বললাম: 'ওকে বলো, "I am neither."'—'আমি পুরুষও নই, নারীও নই।' বেদান্তের দৃষ্টিতে আমি তো আত্মা, আত্মায় তো স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই।

আমি ইংল্যাণ্ডে অনেকটা ব্রিটিশ কাউন্সিলের অতিথি হয়েই ছিলাম। আমাকে ওঁরা কিছু টাকাও দিয়েছিলেন হাতখরচের জন্যে। ওঁরা আমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবেন—কথাও ছিল। কিন্তু ডঃ সুহাস দাশগুপ্ত আমার সমস্ত দায়িত্ব নেওয়ায় আমি আর ব্রিটিশ কাউন্সিলের ওপর নির্ভর করিনি। তবে একদিন দুপুরবেলা ওঁরা আমাকে হোটেলে নিয়ে গেলেন খেতে। আমি আগে থেকে ব'লে দিয়েছিলাম নিরামিষ খাব। হোটেলে নিরামিষ খাওয়া মানে যে কী দুর্গতি, তা পরে বুঝলাম। প্রায় না খেয়ে থাকতে হয়। কিছুই দেয় না প্রায়, একেবারে ফাঁকি। একটা ভাল আইসক্রীম দিলেও হ'ত—তাও না। অথচ মোটা বিল। যা হোক, একটু কফি খেলাম। আমার সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা সব আমিষই খেলেন।

আমার অক্সফোর্ডে বক্তৃতা ছিল ৪ঠা আর ৫ই নভেম্বর, কিন্তু তার আগে আমি ইংল্যাণ্ডের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার খুব শখ ছিল লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এণ্ড রেকর্ডস' দেখার। ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল আগে থেকেই। এখন বিরাট একটা নতুন বাড়ীতে 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এণ্ড রেকর্ডস'। ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক পুরানো নথিপত্র আছে ওখানে। আর ভারতে প্রকাশিত এবং ভারত সম্পর্কে অসংখ্য বই-ও আছে। আমাদের মঠ-মিশন থেকে প্রকাশিত অনেক বই-ও সেখানে আছে। ইন্সটিট্যুট থেকে প্রকাশিত বইগুলিও আছে। এমনকি 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দও' আছে দেখলাম। আমারও একটু কৌতূহল হ'ল—দেখি তো 'তব কথামৃতম্' আছে কি না? বললাম ওঁদের। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এনে আমাকে দেখালেন—এই যে 'তব কথামৃতম্'। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'কি ক'রে আপনারা এ-সব যোগাড় করেন?' বললেন: 'আমাদের এজেন্সি আছে, তারাই সব বই পাঠায়।' ওখানে অনেক বাঙালী মহিলা কাজ করেন, দেখলাম। বাংলা বিভাগের এখন যিনি প্রধান, তিনি জনৈকা মিসেস বিশ্বাস। লাইব্রেরিটা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। আর সেখানে যে-সব কর্মী আছেন—তাঁদের ব্যবহারও খুব সুন্দর। পাঠকদের সাহায্য করবার জন্য সব সময় উদ্‌গ্রীব তাঁরা। লাইব্রেরিতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তো এটাই হওয়া উচিত যে, তাঁরাই সাহায্য করতে এগিয়ে যাবেন পাঠককে। পাঠক সাহায্যের জন্যে বলুন বা না বলুন। [ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের হিন্দু ছিলেন ?

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের নাম একাধিক কারণে স্মরণীয়। দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার মন্ত্র-উদ্গাতা, সমাজ-সংস্কারক, দার্শনিক, শিক্ষাগুরু, সাহিত্যস্রষ্টা প্রভৃতি নানাভাবে স্বামীজীর কর্মের মূল্যায়ন করা সম্ভব। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে ঐ শতাব্দীর শেষদিকের হিন্দু-পুনরভ্যুদয় আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা ব'লে মনে করেন, এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা আবার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের বিচার করেন, তাঁদের বিবেচনায় স্বামীজীর এই 'ধর্মগুরুর ভূমিকা ছিল মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীল।[১] স্বামীজীর সমসাময়িক কালে রক্ষণশীল হিন্দুরা কিন্তু তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রধান প্রবক্তা ব'লে স্বীকার করেননি, কারণ তাঁর আচার-আচরণ, আহার-বিহার সব সময় সনাতন শাস্ত্রের অনুসারী ছিল না, এবং পাশ্চাত্য দেশে তাঁর বেদান্ত-প্রচার এই সব প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিরা সমর্থন করতে পারেননি।[২] তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের হিন্দু ছিলেন, কোন্ ধর্মের পুনরভ্যুদয় তিনি চেয়েছিলেন?

প্রথমেই এ-কথা স্বীকার্য যে, হিন্দুধর্মের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি ভৌগোলিক। 'সিন্ধু' শব্দ হ'তে প্রাচীন যুগে পারসীকেরা 'হিন্দু' শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন। সিন্ধু নদের পূর্ব দিকের অধিবাসীদের তাঁরা 'হিন্দু' বলতেন, এবং পরবর্তী কালে তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য বিদেশী জাতিরাও ভারতীয়দের 'হিন্দু' বলতে আরম্ভ করেন।[৩] হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত হয়নি। বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের মতো হিন্দুধর্মের কোন কালে একজন ধর্মগুরু বা সঙ্ঘনেতা ছিলেন না, যাঁর ধর্মব্যাখ্যা বা অনুশাসন সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। বেদকে হিন্দুদের সবচেয়ে প্রামাণ্য শাস্ত্র ব'লে গণ্য করা হয়, কিন্তু বেদে বা উপনিষদে 'হিন্দুধর্ম' ব'লে কোন ধর্মের উল্লেখ নেই, গীতাতেও নেই, এমন কি মনুস্মৃতিতেও নেই। বেদের দুটি প্রধান ভাগ—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড 'উপনিষদ্' বা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। এই উপনিষদের আবার দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী প্রভৃতি নানা-রকম ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যার অনুবর্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছে, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সব সময় বিশেষ প্রীতিপূর্ণ হয়নি। হিন্দুর যে বিখ্যাত ষড়্দর্শন, তাদের মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বহু কথা রয়ে গেছে। বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের অনেকটা আবার কালক্রমে অপ্রচলিত হ'য়ে পড়েছে। যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান আজ হিন্দু-নামে অভিহিত ব্যক্তিদের ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ নয়। অন্যদিকে বেদবাহ্য বহু আচার বর্তমানে হিন্দুধর্মীয় আচার-রূপে সুপ্রচলিত। কর্মকাণ্ডের দিক হ'তে বিচার করলে বর্তমান যুগের হিন্দু-

---

১ **A. R. Desai, Social Background of Indian Nationalism** (Bombay, 1976), pp. 284, 328, 332.

২ স্বামী বিবেকানন্দ, 'বেদান্তের আলোকে' (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৮), ১৭৩ (৮ই এপ্রিল, ১৯০০ তারিখে, স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতা) ।

৩ **S. Radhakrishnan, Hindu View of Life** (London, 1957), p. 13.

ধর্মকে বৈদিক হিন্দুধর্ম না ব'লে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম বলা যেতে পারে, যদিও অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ—হিন্দুর এই তিনটি প্রধান সংস্কারের মধ্যে কিছু কিছু বৈদিক মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের স্থান আজও রয়েছে এবং ব্রাহ্মণের স্কন্ধের যজ্ঞসূত্র বৈদিক যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক কি ধরনের হিন্দু ছিলেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগে।

পূর্বপুরুষদের ধর্মের কথা বাদ দিলেও স্বামীজী যে নিজেকে হিন্দু বলেই বিবেচনা করতেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। শিকাগো ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩) তিনি হিন্দুধর্মের প্রবক্তা হিসাবেই যোগদান করেছিলেন, এবং তার পরে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও উদারতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরেও স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনায় হিন্দুধর্মের নবজাগরণের কথা বলেছেন, যদিও পৃথিবীর কোন ধর্মের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব ছিল না, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, বিভিন্ন ধর্মমত একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার বিভিন্ন পথ মাত্র। স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করলে মনে হয় যে, তিনি পৌরাণিক বা তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের চেয়েও বৈদিক বা বৈদান্তিক হিন্দুধর্মে অধিক আস্থাবান্ ছিলেন। মাদ্রাজে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টই বলেন যে, "পৌরাণিক শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে।"[৪] 'বৈদান্তিক ধর্ম' কথাটিকে আবার স্বামীজী খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। বৈদান্তিক ধর্মকে তিনি শুধু হিন্দুর ধর্ম ব'লে মনে করতেন না, তিনি একে বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তি ব'লে গণ্য করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মমতই বৈদান্তিক ধর্মের রূপান্তর মাত্র। শুধু দেশ, কাল ও জাতির পার্থক্যের কারণে এক বৈদান্তিক মতবাদ বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। আবার দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি মতবাদও একই বৈদান্তিক ধর্মের তিনটি বিভিন্ন সোপান। সাধন-মার্গে আরোহণ ক'রে একটিকে অতিক্রম ক'রে অপরটিতে যেতে হয়, এদের কোনটিই ত্যাজ্য নয়, প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়, এবং নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে এদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাধকের কাছে সেই পার্থক্য অনতিক্রম্য নয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে আমেরিকা থেকে শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী তাঁর এই বিশ্বাস সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: "Now I will tell you my discovery. All of religion is contained in the Vedanta, that is, in the three stages of the Vedanta philosophy, the Dvaita, Vishishtadvaita and Advaita; one comes after the other. These are the three stages of spiritual growth in man. Each one is necessary.' This is the essential of religion: the Vedanta, applied to the various ethnic customs and creeds of India, is Hinduism. The first stage i.e. Dvaita, applied to the ideas of the ethnic groups of Europe, is Christianity; as applied to the Semitic groups, Mohammedanism. The Advaita, as applied in its Yoga-perception form,

৪ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (কলিকাতা, ১৯৬৩), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২২।

is Buddhism etc. Now by religion is meant the Vedanta; the applications must vary according to the different needs, surroundings, and other circumstances of different nations."[৫] পরবর্তী কালে বোস্টনের Twentieth Century Club-এ প্রদত্ত এক ভাষণেও স্বামীজী বলেন, "বেদান্তের দাবি এই যে, এই চিন্তাধারা ভারতের ও বাহিরের সকল ধর্মমতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়; তবে কোথাও উহা পুরাণের রূপক-কাহিনীর আকারে প্রকাশিত, আবার কোথাও প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত।"[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি 'যত মত তত পথ' স্বামীজীর এই ব্যাখ্যার আলোকে যেন আরো গভীর এবং অর্থবহ হ'য়ে উঠেছে। পৃথিবীর সব ধর্মমতের ভিত্তি যদি বেদান্ত হয়, তাহলে বৈদান্তিক ধর্মকে আমরা বিশ্বজনীন ধর্ম ব'লে গ্রহণ করতে পারি, এবং সেক্ষেত্রে স্বামীজীকে সঙ্কীর্ণ অর্থে হিন্দুধর্মের প্রবক্তা না ব'লে এক ব্যাপক বিশ্বজনীন ধর্মের প্রচারক হিসাবে আমরা গণ্য করতে পারি। স্বামীজী নিজেও সম্ভবতঃ এই আশা পোষণ করতেন যে, ভবিষ্যতে বৈদান্তিক ধর্মই সারা পৃথিবীর না হলেও সভ্য জগতের এক বিরাট অংশের ধর্মমত, হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর কোন কোন চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, ভারতবর্ষের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করলেও তাঁর ধ্যানধারণা ও কার্যকলাপ সারা বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই অনুষ্ঠিত।[৭]

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি মতবাদকে একই বৈদান্তিক ধর্মের তিনটি বিভিন্ন সোপান ব'লে গণ্য করলেও স্বামীজীর ব্যক্তিগত প্রবণতা যে অদ্বৈতবাদের দিকেই ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁর মানসিক গঠন লক্ষ্য ক'রে প্রথম থেকেই তাঁকে অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী করতে চেষ্টা করেন এবং ঐ মতবাদের পরিপোষক 'অষ্টাবক্রসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ পড়তে উপদেশ দেন। ঠাকুরের আশ্চর্য স্পর্শে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত কালেই যুবক নরেন্দ্রনাথের অদ্বৈত-উপলব্ধি হয়েছিল।[৮] এই অদ্বৈতবাদী সাধনার ধারা অতীতে মুষ্টিমেয় সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং কখনই ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। রাজা রামমোহন রায় অবশ্য ইতিপূর্বে কয়েকটি উপনিষদের ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন (১৮১৫-১৭), কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশে একেশ্বরবাদী ও নিরাকার উপাসনার ধারাকে পুষ্ট করা এবং মূর্তিপূজা ও বহুদেবদেবীর পূজাকে নস্যাৎ করা। কিন্তু একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ এক বস্তু নয়, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদকে পরিত্যাগ করে। মহর্ষি তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, "কিন্তু যখন উপনিষদে দেখিলাম, 'সোঽহমস্মি', তিনিই আমি, 'তত্ত্বমসি',

৫ **Complete Works of Swami Vivekananda** (Calcutta, 1963), Vol. V, p. 82.

৬ স্বামী বিবেকানন্দ, 'বেদান্তের আলোকে', পৃঃ ১৩।

৭ যথা,—"My ideas are going to work better in the West than in India". (**Complete Works**, V, p. 92) "I belong as much to India as to the world." (**Complete Works**, V, p. 95) ইত্যাদি।

৮ স্বামী সারদানন্দ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ (কলিকাতা, ১৩৮৩ সন), পৃঃ ১৪৫, ১৪৯।

তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম।”[৯] ঐ 'আত্ম-জীবনী'রই অপর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, ১৭৭০ শকাব্দে (১৮৪৮ খ্রীঃ) তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ রচনা করেন, তার দ্বারা একই সঙ্গে “অদ্বৈতবাদ অবতারবাদ মায়াবাদ নিরস্ত হইল”।[১০] বিবেকানন্দ কিন্তু অদ্বৈতবাদে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ ছিলেন, এবং শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, গৃহীদের জন্যও অদ্বৈতবাদের ব্যাপক প্রয়োগের ক্ষেত্র আছে ব'লে মনে করতেন। বেদান্তের মৌলিক তত্ত্ব—'মানুষ ব্রহ্মের অথবা বিশ্ব-সত্তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন', এবং স্বামীজীর মতে সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই এই তত্ত্বটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষে মানুষে যা পার্থক্য, তা শুধু অন্তর্নিহিত ঐশী-শক্তির প্রকাশের তারতম্যের জন্যই ঘটে থাকে। এই তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তাহলে সমাজে কোন মানুষই বিশেষ সুবিধা ভোগ করবার অধিকার দাবী করতে পারে না। ব্যক্তিগত সুবিধা যতই ভেঙে যায়, সমাজে ততই জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসতে থাকে। ব্যক্তির পক্ষে যা সত্য, জাতির পক্ষে তা অধিকতর সত্য। দুটি জাতির মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে স্বভাবতঃ উন্নততর—বৈদান্তিকের কাছে এই ধারণা একেবারে নিরর্থক। আবার, সকল জীবাত্মা যদি এক অনন্ত সর্বব্যাপী আত্মার অংশ হয়, তাহলে প্রতিবেশীকে আঘাত করলে তার অর্থ হবে নিজেকেই আঘাত করা এবং প্রতিবেশীকে ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। শুধু নীতি-বোধ নয়, যথার্থ বিশ্বপ্রেমের ধারণা কেবল এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্ভব।[১১] স্বামীজী আমেরিকায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় বলেছেন, “মানুষ যখন তাহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, যখন নর-নারীর ভেদ, লিঙ্গভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না, যখন সে এই-সকল ভেদবৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্ব মানবের মিলনভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে।”[১২] বাস্তবজগতে বেদান্তের কার্যকারিতা সম্বন্ধে স্বামীজীর এই ব্যাখ্যা হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর আগে আর কোন হিন্দু সন্ন্যাসী বা সাধক এইভাবে বনের বেদান্তকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এনে প্রতিষ্ঠা করেননি। বিবেকানন্দ এই ব্যাপারে সত্যই অনন্য ও অনবদ্য।

স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাসের আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি বেদান্তের জ্ঞানমার্গের সঙ্গে গীতার নিষ্কাম কর্মের যোগসাধন করে-ছিলেন,—শুধু গৃহীর জন্য নয়, সন্ন্যাসীদের জন্যও—সাধনার অঙ্গহিসাবে, জনহিতকর কর্ম নিষ্কামভাবে করবার বিধান দিয়েছিলেন। স্বামীজী বলতেন, “বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম।…পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।”[১৩] সন্ন্যাসের এই মহান্ দর্শ,

৯ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী', সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত (বিশ্বভারতী, ১৯৬২ পৃঃ ১২৩-২৪। ১০ তদেব, পৃঃ ১৪০।

১১ স্বামী বিবেকানন্দ, 'বেদান্তের আলোকে', পৃঃ ৯, ১২, ১৪, ২৩-২৫।

১২ তদেব, পৃঃ ১৬। ১৩ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', নবম খণ্ড, পৃঃ ৫৪।

সংসারের প্রতি সন্ন্যাসীদের কর্তব্য, স্বামীজীর আগে আর কোন হিন্দু সন্ন্যাসীর মুখে এত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি। প্রাচীন হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের একটি বিরাট পার্থক্য এখানে লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধযুগের পরে ভারতে আর কোন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ স্বামীজীর অনুগামী সন্ন্যাসীদের মতো এত ব্যাপক ও বিচিত্রভাবে লোকহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেনি।

জ্ঞানকাণ্ডের মতো কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় আচারের দিক থেকে বিচার করলেও স্বামীজীকে ঠিক সনাতনপন্থী হিন্দু বলা চলে না। ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় তিনি ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন না। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরে আলাসিঙ্গাকে প্যারিস থেকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী জানান: "If the people in India want me to keep strictly to my Hindu diet, please tell them to send me a cook and money enough to keep him. This silly bossism without a mite of real help makes me laugh."[১৪] বেলুড় মঠে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলেন: "অনুভূতিই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বৈব বৃথা হ'ল। আর আচার-বর্জিত হ'য়ে কেউ যদি আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার।"[১৫] আর এক জায়গায় স্বামীজী তীব্র বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন, "আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর।...যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা-গারদে যাইতে হইবে।"[১৬] এ-ছাড়া বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথা, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে যা হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, স্বামীজীর কাছে একটি নিকৃষ্ট সামাজিক আচার হিসাবেই গণ্য হ'ত, এবং ছুঁৎমার্গ বা অস্পৃশ্যতার নিন্দায় তিনি চিরদিন মুখর ছিলেন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে (১৮ নভেম্বর, ১৮৯৪) তিনি লেখেন, "ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া...ইহার ভিত্তি অপরের প্রতি ঘৃণা। প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না।"[১৭] ছুঁৎমার্গ যে হিন্দুধর্ম নয়, শাস্ত্র-বহির্ভূত প্রাচীন আচারমাত্র, এ-কথাও তিনি নানাস্থানে বলেছেন। শুধু দেশাচার ও লোকাচার নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ শাস্ত্রীয় আচারেরও নিন্দা করেছেন। নারীদের বাল্যবিবাহের নির্দেশ শাস্ত্রসম্মত হলেও তা পালনীয় নয়, এ-কথা স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্টই বলেছেন।[১৮] ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সহবাস-সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে এদেশে যে আন্দোলন হয়েছিল, স্বামীজী তার তীব্র নিন্দা করেন।[১৯] অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কোন

১৪ **Complete Works**, Vol. V, p. 95.　১৫ 'বাণী ও রচনা', নবম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬-৯৭।
১৬ 'বাণী ও রচনা', পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।　১৭ 'বাণী ও রচনা', সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৭।
১৮ তদেব, পৃঃ ৭৫।　১৯ 'বাণী ও রচনা', নবম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫-২৬।

শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানেরও তিনি নিন্দা করেছিলেন। শাস্ত্রীয় বিধানগুলি যে অপরিবর্তনীয় নয়, এবং পরিবর্তনশীল, কালের প্রয়োজনে বারংবার ঐ বিধানগুলির পরিবর্তন যে কাম্য—এ-কথা ঘোষণা করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি একবার কালোপযোগী নতুন স্মৃতিশাস্ত্র বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে রচনা করবার নির্দেশ দেন, এবং এই প্রচেষ্টায় তাঁকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন,[২০] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দকে কোন বিচারেই 'সনাতন-পন্থী হিন্দু' বলা চলে না, এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় কখনই তিনি কামনা করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর যুগের হিন্দুসমাজ থেকে অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন, এবং তাঁর সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি অনুসরণ করবার ক্ষমতা শুধু সে-যুগে কেন, আজকের দিনেও বিরল। মানসিক দিক থেকে অন্য বহু মহাপুরুষের মতো তিনিও ছিলেন নিঃসঙ্গ।

২০ তদেব, পৃঃ ১৫৬-৫৮।

দিশারী

স্বামী প্রভাকরানন্দ

এমনি সে একদিন—
হিংসামত্ত-পৃথিবীর ক্রন্দনে
এসেছিলে তুমি—সন্ন্যাসী অমিতাভ,
ফেলে এসেছিলে রাজ্যসুখ-সম্পদ।
বলেছিলে—ছাড় এই হিংসাদ্বেষ;
মানুষকে ভালো বাসো—
ওগো মানুষ—।

আজও ফের দেখি হিংসার দাবানলে
তপ্ত পৃথিবী আর্তনাদ করছে,
নিখিলবিশ্বে চলে 'খাণ্ডবদাহ'—।
তাই আজ তোমায়
মনে পড়ে বেশী ক'রে।
মনে পড়ে সেই—'ত্যাগের প্রেমের বাণী'
আহ্বান জানায়—অন্তরে অন্তরে,
'রাজসন্ন্যাসী এসো ফিরে আর বার'
পথ দেখাও আসুক আলোক—
ঘুচুক অন্ধকার, দূর হোক হিংসাদ্বেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

পক্ষী, পশু, মানুষ—সকলের মধ্যেই মাতৃভাবের কিছুটা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মাতার হৃদয়ে স্বাভাবিক সন্তান-বাৎসল্য দিয়ে ভগবান্ তাদের লালন-বর্ধনের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। তবে মাতৃভাব রক্তের সম্পর্কে অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। কদাচিৎ আমরা এ-গণ্ডির সম্প্রসারণ দেখতে পাই। পক্ষিণী-মা আর মানবী-মায়ের মধ্যে প্রভেদ তখনই দৃষ্ট হয়, যখন কোন মাতা ঠিক নিজের সন্তানের মতো অন্যের সন্তানকেও ভালবাসতে শেখেন। কোন কোন স্থলে এই মানবী-মায়ের বাৎসল্য বিস্তার যে দেখা যায় না, তা নয়। তবে সে-বিস্তারের পরিধি সাধারণতঃ অতি পরিচিত-পরিমিত গণ্ডিতেই নিঃশেষিত হ'য়ে যায়।

মানুষের মাতৃভাব আর ভগবানের মাতৃভাবে প্রভেদ এই যে, মানুষের মাতৃভাব সীমিত, ভগবানের মাতৃভাবের কোন সীমা নেই। সারদা যখন ছোট্টটি, তখন থেকেই তাতে ঈশ্বরীয় মাতৃভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিছল। যে ঘটনাটি অবলম্বন ক'রে আমরা এই স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছি তার বর্ণনা শ্রীমা নিজেই করেছেন:

> "একবার সেখানে (জয়রামবাটী অঞ্চলে) কি দুর্ভিক্ষই লাগল—কত লোক যে খেতে না পেয়ে আমাদের বাড়ি আসত! আমাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাঁধা ছিল। বাবা সেই সব ধানে চাল করিয়ে কলায়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন। বলতেন, 'বাড়ির সবাই এই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্য খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে; সে আমার তাই খাবে।' এক একদিন এমন হ'ত, এত লোক এসে প'ড়ত যে খিচুড়িতে কুলত না। তখনি আবার চড়ানো হ'ত। আর সেই গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শীগ্‌গির জুড়বে ব'লে আমি দু-হাতে বাতাস করতুম। আহা! খিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে। একদিন একটি বাগ্‌দী বা ডোমের মেয়ে এসেছে—মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হ'য়ে গেছে তেলের অভাবে, চোখ উন্মাদের মতো। ছুটে এসে গরুর ডাবায় যে কুঁড়ো ভেজানো ছিল, তাই খেতে আরম্ভ করেছে! এত যে সকলে ডাকছে, 'বাড়ির ভিতরে এসে খিচুড়ি খা'—তা আর ধৈর্য মানছে না। খানিকটা কুঁড়ো খেয়ে তবে কথা তার কানে গেল। এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ! সেই বছর দুঃখ পেয়ে তবে লোকে ধান মরাইয়ে রাখতে আরম্ভ করলে।"[১০১]

এখানে আমরা বালিকা সারদার হৃদয়ের একখানি অনবদ্য আলেখ্য পাই। বুভুক্ষাপীড়িতদের জন্য তাঁর কী সুগভীর সহানুভূতি! ঐ ছোট্ট দুটি হাতে দ্রুত পাখা চালিয়ে গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা করার যে তৎপরতা, আর ঐ নিবিড় প্রেম-প্লুত ছোট্ট কথাটি, "আহা! ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে।"—সবকিছুর ভেতরেই

১০১ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৬-২৭

ছিল তাঁর সর্বজনীন স্ফুটনোন্মুখ মাতৃহৃদয়ের আকুতি! অনুভূতির দিক থেকে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, বালিকা সারদা এরই মধ্যে গোষ্ঠী-কুটুম্বের গণ্ডি থেকে অতি সহজে বেরিয়ে এসে সকল আর্তের ব্যথায় সমভাবে ব্যথিত হ'তে শিখেছেন। যদিও এটি একটি আভাস মাত্র বলা চলে, তবু এই আভাসটি একটি অতিমানুষীর প্রাণ-স্পন্দনের আভাস। এটি সামান্য ঘটনা নয়। সকলের ক্ষিদের জ্বালাকে নিজের হৃদঙ্গনে এমন সশ্রদ্ধ অধিষ্ঠান দান, পরবর্তী কালে অন্নপূর্ণার ভাবমূর্তিতে বিবর্তিত হয়েছিল শ্রীমাতে, যাঁর কল্যাণাশ্রয়ে সকল অজ্ঞানাচ্ছন্ন কীটপ্রায় মনুষ্য-কুলকে ঠাকুর রেখে গিছলেন দেহাবসানের পূর্বে।

তাঁর এই একান্ত একনিষ্ঠ স্বতঃস্পন্দিত মাতৃ-ভাবটি নিয়েই সারদা আবির্ভূতা হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। এ ভাবটি ঠাকুর তাঁকে শেখাননি। তাঁর ধর্মসংস্থাপনের কর্ম-প্রয়োজনে যখন ঠাকুর তাঁতে এ-ভাবটি অনুশীলন করতে উদ্যত হলেন, তখন দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, মাতৃভাব-চর্চার ব্যাপারে শ্রীমা স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা।

শ্রীমায়ের এই মাতৃভাবটি তাঁর 'অপনান'র সাধনায় কি সুগভীরভাবে পুষ্টিলাভ করেছিল, সে-বিষয়ে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। নহবতপীঠে সাধনকালে লজ্জাপটাবৃতা থেকেও শ্রীমা তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবের দুর্বার সর্বগ্রাহিতা অনুশীলন ক'রে চলেছিলেন। এ-বিষয়ে, তিনি ঠাকুরের অনুগতা থেকেও ছিলেন একান্ত স্বতন্ত্রা, ভাগবতী মাতৃভাবে স্বতঃমহিমান্বিতা।

দক্ষিণেশ্বরে একটি পাগলী ঠাকুরের নিকট যাতায়াত ক'রত। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য সকলে তাকে অপ্রকৃতিস্থ ব'লে জেনে সহানুভূতির সঙ্গে আলাপাদি করতেন। পরে প্রকাশ পেল যে, সে মধুরভাবের সাধিকা। এদিকে ঠাকুর স্বভাবতই জগদম্বার প্রতি মাতৃভাবাপন্ন। একদিন পাগলী ঠাকুরের প্রতি নিজের অন্তরের মধুরভাব ব্যক্ত করায়, বিপরীত ভাবের সংঘাতে তিনি তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ ক'রে ক্ষিপ্তপ্রায় কক্ষমধ্যে বিচরণ করতে করতে পাগলীকে তিরস্কার করতে থাকেন। শ্রীমা নহবত থেকে সব শুনে পাগলীর অবস্থায় নিজে লজ্জিত হ'য়ে গোলাপ-মাকে বললেন: "দেখ দেখি, সে যদি অবিবেচনার কথা বলেই থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়! এ-ভাবে গালাগালি করা কেন!" গোলাপ-মা দ্বারা পাগলীকে ডাকিয়ে এনে স্নেহভরে বললেন: "বাছা, উনি তোমায় দেখে যখন বিরক্ত হন, তখন নাই বা গেলে সেখানে; আমার কাছে এলেই তো পারো।"

ভগবানের পিতৃভাব পাগলীকে নীতিসম্মত ভাবেই যখন নিষ্কাশিত করলে, মা—ভগবানের মাতৃভাব-মূর্তিমতী মা, তাকে বহুস্নেহে বললেন: "…তখন নাই-বা গেলে সেখানে; আমার কাছে এলেই তো পারো।" অনুজ্ঞার সে কী এক মিনতি-শ্রী!

বালিকা সারদার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য সর্ব-জননীভাবের যে স্ফুরণ দেখা গিছল, সে-ভাবটি নিরবচ্ছিন্নভাবে সদা বর্ধমান থেকে তাঁর পরিণত বয়সে এমন একটি ভূমা-সংহিত বিশ্বাত্মক বিকাশ লাভ করেছিল, যার কোন তুলনা জগতের সাহিত্যে আছে ব'লে আমাদের জানা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীমায়ের ঈশ্বরীয় মাতৃভাবের যে বিকাশ হ'ল, তাতে এসে মিলিত হ'ল এক অত্যাশ্চর্য গুরুশক্তির গঙ্গাধারা। কিন্তু এই গুরুশক্তি ঈশ্বরীয় মাতৃভাবে এমনভাবে জারিত থাকল যে, মহাপুরুষগণ ছাড়া অন্যেরা বুঝতেই পারতেন না, এই সামান্যদর্শনা নারী নীরবে শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ ধর্মসংস্থাপন ও জীবোদ্ধারের কর্ম অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রে চলেছিলেন। সংঘমাতৃকারূপে শ্রীমায়ের যে

প্রজ্ঞাপ্রকাশ সদা প্রবাহমান, তাও ঈশ্বরের মাতৃভাবের অন্যতর প্রকাশ। আর তাঁর অস্তিত্বে ত্রিবেণীর অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মতো ছিল, জ্ঞানদায়িনীর স্বভাব ও শক্তি।

নিজের দেহাবসানের পূর্বেই শ্রীঠাকুর শ্রীমায়ের অন্তর্নিহিত এই ত্রিশক্তির বোধনই তাতে ক'রে গেছেন: মাতৃশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও গুরুশক্তি। তিনি সর্বাগ্রে শ্রীমায়ের কর্ণে তাঁর আত্ম-পরিচিতির মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন: "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ-শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীরূপ ব'লে তোমায় সর্বদা সত্য-সত্য দেখতে পাই।"[১০২] শ্রীমায়ের সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁর অপরোক্ষানুভূতির কথাটি এমনভাবে বললেন যে, এই মন্ত্রার্থটি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর জন্য চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে থাকল: "সাক্ষাৎ আনন্দময়ী", "সর্বদা সত্য-সত্য দেখতে পাই"। এটি সর্বদা সত্য-সত্য সাক্ষাৎ দেখে বলা। আর শ্রীমা এই ঘোষণা শুনে আশ্চর্যান্বিতা হয়েছিলেন, এমন কোন প্রমাণ সাহিত্যে নেই।

ঠাকুরই পুনঃ এই শুভ-শুভ্র ঘোষণাটি ক'রে গেলেন: "ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।"[১০৩]

শ্রীমায়ের অন্তর্নিহিত প্রকাশোন্মুখ গুরুশক্তির বোধন ও প্রশস্তি ক'রে ঠাকুর বললেন: "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"[১০৪] সময়ান্তরে নিজের জীবোদ্ধারে কৃত কর্মের সঙ্গে শ্রীমায়ের ভাবী কর্মের তুলনা ক'রে বলেছিলেন, "এ আর কি করেছে, তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।"[১০৫]

এই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপক কলকাতা, এটি সর্বকালের অজ্ঞানাবৃত জীবের কলকাতা। কত দরদের সঙ্গে বললেন: "তুমি তাদের দেখো"—তিনটি শব্দ, কিন্তু তাতেই বিশ্বকুটুম্বের চতুর্বর্গের ভার অবলীলায় ঘরোয়াভাবে শ্রীমাতে হস্তান্তরিত হ'ল।

পরবর্তীকালে ঠাকুর নরেনকে দিয়েছিলেন জীবকে শিক্ষা দিবার চাপরাশ, আর দিয়েছিলেন জীবের দুঃখ দূর করার জীবনব্রত। পরম গুরুভক্ত ব্রতৈকাগ্রমানস নরেন কী অপূর্ব নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে গুরুর আদেশ পালন ক'রে, মানুষের অমেয় কল্যাণসাধন ক'রে গেছেন ও ক'রে চলেছেন, তা সুবিদিত।

নরেনকে চাপরাশ দেবার পূর্বেই যে ঠাকুর জীবকে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ করবার আপন ঈশ-দায়িত্বটি শ্রীমায়ের স্কন্ধাসীন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে সচেষ্ট ছিলেন, এবং নরেনের সবটা জীবনব্রতই যে শ্রীমায়ের স্নেহাঙ্গনে লালিত, বর্ধিত, সিদ্ধ ও সার্থক হয়েছিল, এ তথ্য ও তত্ত্ব বিবেকানন্দ-মহিমায় মুগ্ধ সাধারণ জনগণ না জানলেও নরেন নিজের আত্মার অঙ্গীকারে তা জানতেন।

আমেরিকা থেকে এক চিঠিতে স্বামী স্বামী শিবানন্দকে লিখেছিলেন:

"...দাদা, রাগ ক'রো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ...ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। তারক ভায়া, আমেরিকায় আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি

১০২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫১
১০৩ তদেব, পৃঃ ১২৭
১০৪ তদেব, পৃঃ ১২৭
১০৫ তদেব, পৃঃ ১৩৪

লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ ক'রে পগার পার, এই বুঝ।..."১০৬

পাশ্চাত্যে যাবার পূর্বে স্বামীজী মায়ের কাছ থেকে প্রার্থিত যে সর্বজয়ী আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, সে আশীর্বাদের মহাশক্তিময়ী যুগান্তরকারী আলোক-যোজনা যে ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া শ্রীমায়েরই জীবনব্রতেরই সম্প্রসারণ, এটি অনুধাবনীয়।

শ্রীমা-ই ঠাকুরের জীবনে নির্মুক্ত আলোক-বন্যাকে আপন সহজ-সত্তায় স্তম্ভিত ক'রে দাওয়ায় বসিয়ে সব্বার উপযোগী অন্ন-ব্যঞ্জন ভাগ ক'রে পরম স্নেহে পরিবেশন করেছেন। অন্ধকারের কীট হঠাৎ বেশী আলো সইতে পারে না। অথচ আলোর প্রয়োজন তারই সব চেয়ে বেশী। তার এই আলোক-প্রয়োজনটি সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার ক'রে, তার উপযোগী ভাবে, ধৈর্য ধরে তাকে পাইয়ে-দেওয়ার সাধনায়, শ্রীমায়ের মতো কৃতার্থ যে আর কেহ হ'তে পারেন না—তার আন্তর কারণটি শুধু এই নয় যে তাঁর প্রশান্ত-গহন অস্তিত্বে মাতৃশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও গুরুশক্তি সমন্বিত ও সংহত হয়েছিল। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি মনে হয় এই যে, তাঁর গুরুশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, তাঁর মাতৃ-শক্তিতে জারিত হয়েছিল।

কী অভাবনীয় এই কান্ত মাতৃ-জ্ঞান-গুরু-শক্তির বিন্যাস ও বিস্তার! স্বামী প্রেমানন্দ এ-সম্বন্ধে কয়েকটি অতি সুন্দর কথা এক পত্রে লিখেছিলেন:

"...শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু মার? তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য লুপ্ত। এ কী মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা! জয় শক্তিময়ী মা! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছিনে, সব মার নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনন্ত শক্তি, অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস্? স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। তিনিও কত বাজিয়ে, বাছাই ক'রে লোক নিতেন। আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের খাদ্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হ'য়ে যাচ্ছে! মা! মা! জয় মা! মনে রেখো, সুখে দৈন্যে, সম্পদে বিপদে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, যুদ্ধে বিগ্রহে—সর্ব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা, সেই অপার করুণা! জয় মা! জয় মা!"১০৭

"শ্রীমাও একদিন ঠিক এই ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন। ভক্ত অনুযোগ করিলেন, 'ঠাকুরের কাছে যারা যেত, তাদের কত ভাব, সমাধি এ-সব হ'ত। আপনি তো আমাদের সে-রকম কিছুই করছেন না।' মা উত্তর দিলেন, 'সে আর কটিকে করে-ছিলেন। তাও কত বেছে। তাতেই তাঁর শরীর এত শীগ্গির গেল। আমার কাছে পিঁপড়ের সার ঠেলে দিয়েছেন। আমি যদি অমনটি করি, তবে কদিন এ-শরীর থাকবে? আমায় কত ছেলেকে দেখতে হচ্ছে।'"১০৮

ঠাকুর লীলাচ্ছলে কয়েকজন মহাশক্তিধর জগদ্গুরু সৃষ্টি ক'রে চলে গেলেন। অগণ্য নগণ্য পিঁপড়ের সারির ভার রেখে গেলেন মায়ের ওপর। শ্রীমা থেকে অভিন্নাত্মা ঠাকুর শ্রীমায়ের

১০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড (১৩৮০), পৃঃ ৭৬-৭৭
১০৭ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৯৮
১০৮ তদেব, পৃঃ ৪৯৮

মাঝে যে নিজ গুরুশক্তির পূর্ণতা প্রকট করলেন, তার কারণ এই যে, গুরুশক্তির মাতৃশক্তির মিশ্রণ বিনা এ ঝক্কি সামলানো দুরূহ ব্যাপার। ঠাকুর এই নিজ গুরুশক্তির অভাবনীয় এ পূর্ণতাকে শ্রীমায়ের মাধ্যমেই প্রকট ক'রে কৃত-কৃতার্থ হলেন। অন্ধকারে কীটের মতো কিলবিল করছে এমন মানুষগুলির জন্য ঠাকুরের অমোঘ যে কল্যাণচিন্তা ছিল, সে কল্যাণ-সম্ভাবনাকে শ্রীমা রামকৃষ্ণ-সংঘমাতৃকারূপে নিজের অতন্দ্র সেবা-শক্তি দ্বারা লালন-বর্ধন ক'রে যুগধর্মরূপে এ-ধরায় প্রতিষ্ঠা ক'রে চলেছেন। এটি অতীতের সংঘটিত ঘটনাই শুধু নয়, এটি বর্তমানের ঘটনা-প্রবাহও বটে; উপরন্তু এ নিছক আধ্যাত্মিকতার আগামী তরঙ্গ।

শ্রীমা সম্বন্ধে ঠাকুর গোলাপ-মাকে বলেছিলেন: "...এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"[১০৯]
অনন্ত আন্তর মহিমা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল বলেই হয়তো ঠাকুর মায়ের সম্বন্ধে রহস্য ক'রে বলতেন, "ছাই চাপা বেরাল"।

যে-রূপ শ্রীমা ঢেকে এসেছিলেন, সে-রূপ তাঁর ব্যক্তিত্বের অবিনাশী ঐশ্বর্যবলে নষ্ট হ'য়ে তো আর যেতে পারেনি। সে-রূপ তাঁর অন্তপ্রবিষ্ট হ'য়ে সৃষ্টি করেছিল এমন একখানি মন যা নিখিল-সৌন্দর্যে, আর্দ-ঔদার্যে ও অননুকরণীয় আভিজাত্যে সত্যি অতুলনীয়। পূর্ণতার এমন একখানি শান্ত, শাশ্বত, নম্র, সুন্দর প্রকাশ যে ধূলির ধরায় সম্ভব, তা শ্রীমায়ের অনাবির্ভাবে অকল্পনীয়ই থেকে যেত।

তাই ঠাকুরকে মায়ের স্বরূপ প্রকাশে ধর্ম-তৎপর হয়েও তাঁকে "ছাই চাপা বেরাল" বলতে হয়েছে। এই "ছাই চাপা বেরালের" মহিমা ধ্যান ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে মহাপুরুষগণ যা অল্প-বিস্তর ব্যক্ত করেছেন, তার সামান্যাংশ স্বামীজীর ও স্বামী প্রেমানন্দের উক্তিতে আমরা পেয়েছি। স্বামীজীর আপ্তবাক্যের আলোকে এমন কি ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ শ্রীমায়ের স্বরূপ উপলব্ধি নতুনভাবে করতে তৎপর হয়েছিলেন

সামান্যতার "দুরত্যয়া" মায়ার অন্তরালে শ্রীমাতে যে একটি মহাবির্ভাব হয়েছিল, সে শুভ সংবাদের ইঙ্গিত ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েই জীব ধন্য হয়েছে। ঠাকুরের নিকট জীবের অশেষ ঋণের মাঝে এ-ঋণটি অগ্রগণ্য কেন না, "পিঁপড়ের সারি" এমন সর্বদাত্রী আশ্রয় থেকে অন্যথায় হয়তো বা বঞ্চিত হ'ত।

[ক্রমশঃ]

১০৯ তদেব, পৃঃ ১২৭

প্রার্থনা

শ্রীসুবল কর

শূন্য হৃদয়ে মম এসো হে পূর্ণ
হে চির পূর্ণ এসো,
হে চির জ্যোতির্ময়, আনন্দ-প্রীতি
এ চীর-আসনে বসো!

করহে ব্যক্ত মোরে অনন্ত সংগীতে
অব্যক্ত ভঙ্গিতে
নিত্য যজ্ঞে তব, নির্বেদ কল্যাণে
অসীম লোকের পানে!

সকল চিন্তা মোর তোমাতে বিলীন করো—
হে অচিন্ত্য অশেষ!
শুদ্ধ শান্ত করি পরম প্রশান্তিতে
ধ্যান-সমাধিতে

এক ও অভেদ কর, কর নিঃসংশয়
সকল বিশ্বময়!
পূর্ণ-শূন্য ক'রে শূন্য-পূর্ণ করো—
হে নাথ, হে অনিমেষ!

সমালোচনা

জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ—অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি এইচ. ডি.; প্রকাশক: কে, পি, বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানি, ২৮৬ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২। (১৯৮১), পৃঃ ৭৫+১৭; মূল্য: দশ টাকা।

ঐতিহাসিক ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাজা রামমোহন রায় স্মারক বক্তৃতামালা' (১৯৭৮) একত্র সংগৃহীত হ'য়ে আলোচ্য বইটির প্রকাশ। শেষের দিকে মূল্যবান্ গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট সংযুক্ত। শোভন প্রচ্ছদ, সুচারু মুদ্রণ।

বইটির অধ্যায়-বিভাগ—জাতিভেদের উৎপত্তি ও বিবর্তন; মধ্যযুগের জাতিভেদ ব্যবস্থা; বৃত্তি, সামাজিক মর্যাদা ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; সামাজিক আচারের পরিবর্তন; জাতি-পঞ্চায়েতের শাসন; উনবিংশ শতকে জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলন; নাগর সমাজের প্রসার ও জাতিভেদ প্রথার অবক্ষয়।

প্রথম অধ্যায় 'জাতিভেদের উৎপত্তি ও বিবর্তন'-এ ডক্টর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য হ'ল বাংলাদেশে আধুনিক যুগের সূচনায় জাতিভেদ প্রথা কি অবস্থায় ছিল, এবং ব্রিটিশ শাসন, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে তার কি কি পরিবর্তন হ'ল, তাই আলোচনা করা। এই আলোচনা পুরাতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক আলোচনা নয়, সামাজিক ইতিহাসের গণ্ডির মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ থাকবে।" (পৃঃ ১) লেখক এই সীমা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আর একটু বিশদভাবে জাতিভেদপ্রথার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা থাকলে বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি হ'ত। তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, বাঙালীজীবনে জাতিভেদের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা থাকায় অতি উদারতা, অনুদারতা এবং সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা—এই তিন ধরনের মনোভাবই দেখা যায়। অমিতাভবাবুর বিষয়নিষ্ঠ আলোচনায় আমরা এই ত্রিবিধ মানসিকতা থেকে রক্ষা পাব।

ভারতীয় ইতিহাসে আর্যরা বহিরাগত, এই কথা মেনে নিয়েই সাধারণতঃ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা অগ্রসর হয়। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এ জাতীয় মনোভাব স্বীকার করেননি, উল্টে বলেছেন—"কোন বেদে, কোন সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন?" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য': উভয় সভ্যতার তুলনা।) স্বামীজীর দৃষ্টিতে—"অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্যসভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানা প্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষনিবারণ।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য: তদেব)

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিজেতা ও বিজিত-হিসাবেই উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভেদের কারণ দেখার চেষ্টা করেছেন। এমন কি 'বর্ণ' কথাটিও আর্যদের গায়ের রঙ বা অনার্যদের গায়ের রঙের দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এ জাতীয় ব্যাখ্যা বেশীদূর টেনে নেওয়া যায় না। বৈদিক পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ) বা গীতার অনুসরণে চতুর্বর্ণের ব্যাখ্যা মূলতঃ সহজাত বা অর্জিত বিদ্যা ও সংস্কারে মানুষের যে সব গুণ প্রধান হয়, সেই অনুসারে

শ্রেণীবিভাগ।

জাতিভেদের সূচনা বৈদিক যুগে। পরবর্তী কালে গুণগত না থেকে এই ভেদ জন্মগত হ'য়ে পড়াতেই হিন্দুসমাজব্যবস্থার অচলায়তনের সূচনা। ইসলামের আবির্ভাবেও হিন্দুসমাজব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। ইসলামযুগের শেষে বৃত্তি, সামাজিক ব্যবস্থা ও নব নব অর্থনৈতিক রূপান্তরে জাতিভেদের ধরন-ধারণ কিছু কিছু বদলাতে থাকে। ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্বে বাঙালী-সমাজে নতুন আভিজাত্যপ্রার্থী অ-ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীদের আন্দোলনের কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়—এ-সব আন্দোলন জাতিভেদপ্রথাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই কিছুটা উঁচু আসনের দাবী। ক্রমে ক্রমে বিবাহ বা যৌন-সম্বন্ধ এবং পানাহারের ক্ষেত্রেই জাতিভেদের অনুশাসন কঠোর থেকে কঠোরতর হ'তে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীসমাজের আন্দোলন-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বাংলায় ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাই শূদ্র। তবে কায়স্থ ও বৈদ্যেরা উঁচু-দরের, নবশাখেরা মাঝারি আর জলচল বা অচল নিম্নতম বর্ণেরা সবচেয়ে নিচু থাকের শূদ্র। উত্তরপশ্চিম ভারতে কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—চারটি বর্ণই রয়েছে। কুলীনপ্রথার সৃষ্টি একদা সমাজনেতৃত্বের প্রয়োজনে দেখা দিলেও এর বিষময় পরিণতি বাংলার ইতিহাসের একদা কলঙ্কিত অধ্যায়। বহুবিবাহ-প্রথার বীভৎস পরিণতির কথা বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। জাতিভেদপ্রথার প্রশ্রয়েই বাল্যবিবাহ ও বালবিধবার জীবনযন্ত্রণা সমাজের উচ্চবর্ণদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল—এ-কথাও ভোলবার নয়। 'সামাজিক আচারের পরিবর্তন'-অধ্যায়ে ডঃ মুখোপাধ্যায় বাঙালীজীবনে ধীরে ধীরে যে-সব অবশ্যম্ভাবী অদল-বদল আচার-বিচারের ক্ষেত্রে ঘটতে থাকে, তার সরস অথচ তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনগুলির তীব্রতা ততটা নেই কেন? সহমরণ, বিধবাবিবাহ, সহবাস, অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি সমস্যা এত লোককে বিচলিত করেছে, কিন্তু জাতিভেদের যুক্তি ও কু-যুক্তি সবকিছু নিয়ে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি যে প্রতিবাদের ধারা প্রবহমান, তার মধ্যে আক্রমণের তীব্রতায় বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে তুলনীয় কিছু আর কোথাও মেলে না। গণশিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে জনগণের হৃত মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার যে আদর্শ স্বামীজী বারংবার বলেছেন ও লিখেছেন, তার আন্দোলনগত দিকটি বিংশ শতাব্দীতেই ভাল-মন্দ যা হোক একটা রূপ নিয়ে অগ্রসর। বাংলা কথাসাহিত্যে এ সমস্যার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ শরৎচন্দ্রের রচনা-বলীতে। (গ্রন্থকারও উল্লেখ করেছেন।) তবু মোটের উপর উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি সমাজের অগ্রগতি বিচার করলে উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে জাতিভেদের বিপক্ষে মৌখিক প্রতিবাদের প্রবণতা দেখা গেলেও জাতিভেদের সুযোগ গ্রহণের প্রবণতাই বেশী সত্য। নিম্নবর্ণের জনসাধারণের উষ্মা ও বিরক্তি যতই থাক, আজ অবধি সে-সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব, যার দ্বারা এতকালের বঞ্চনার হাত থেকে যথার্থ মুক্তিলাভ ঘটে। এক্ষেত্রে সরকারী বৃত্তি ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা আর এক ধরনের সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করেছে। আত্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে জাগরণ এখনও বহুদূর। তাই জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনের একই সঙ্গে প্রগতি ও পশ্চাদ্গতি দুইই সমান সত্য। ডঃ মুখোপাধ্যায় নানা উদাহরণের দ্বারা এ-সত্যটি ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের নামকরণে 'নাগর' কথাটিতে আমাদের আপত্তি। 'নাগরিক' শব্দটি সুপ্রযোজ্য। নাগরিকতার বিস্তারে জাতিভেদের যে অপহ্নব

ঘটে, তা নিতান্ত বাহ্য। মূলতঃ গ্রাম-নির্ভর এ দেশে জাতিভেদের মূল শিকড়গুলি মানবমনস্তত্ত্বের এত গভীরে প্রসারিত যে, কেবল নাগরিক জীবনের পরিবর্তনে জাতিভেদপ্রথার অবসান বা উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবু নাগরিক জীবনের সঙ্গে জাতি-ভেদের সম্বন্ধ ভেবে দেখার মতো প্রসঙ্গ।

জাতিভেদ প্রসঙ্গে একধরনের আত্মতৃপ্তি আমাদের আছে। অনেকেই বলেন, পৃথিবীর সর্বত্রই একভাবে না একভাবে জাতিভেদ আছে, এবং থাকবে। এর উত্তরে বলা যায়, মানুষে মানুষে পার্থক্য তো আছেই, কিন্তু সে পার্থক্যের দরুন একদল সব সুযোগ-সুবিধা পাবে, আর একদল চিরকাল শোষিত হবে—এ-কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। স্বামীজী তাই 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-যুগের অবসানে ভাবী শূদ্র-যুগের নিশ্চিত আবির্ভাব ঘোষণা করেছেন। সে শূদ্রশক্তি যদি ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম-শক্তি, বৈশ্যের অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের প্রতীক হ'য়ে ওঠে, তাহলেই জাতিভেদের অবসান সম্ভব। তা না হ'লে শূদ্রেরাও আর এক শোষক ও অত্যাচারী শ্রেণীতে পরিণত হবে। সেও আর এক জাতিভেদ।

ছোট্ট পরিসরে ডঃ মুখোপাধ্যায় এ-গ্রন্থে অসংখ্য তথ্যসমাবেশ করেছেন এবং সঙ্গত কারণেই ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। কিন্তু এমন একটি জলন্ত জীবন্ত বিষয়ে তাঁর নিজস্ব সমাধানসূত্রের কোন ইঙ্গিত থাকলে সমস্ত বিষয়টি সাম্প্রতিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হ'ত। জাতিভেদ-প্রসঙ্গ নিয়ে যাঁরা চিন্তা ও কর্মে রত, তাঁদের পক্ষে এ-গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান্। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার বাঙালী হিন্দুসমাজকে তার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে সহায়তা করবে।

—ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

সাজি- ডাক্তার প্যারীমোহন পাণ্ডে। প্রকাশক : সোনামুখী, প্রেমনগর, পোঃ হিজলী, কো-অপারেটিভ্, খড়্গপুর, মেদিনীপুর। (১৯৭৮), পৃষ্ঠা ৭৮ ; দাম—চার টাকা।

ডাঃ পাণ্ডের 'সাজি' সঙ্গীত পুস্তিকাটি পঞ্চাশটি পুষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ ; তদুপরি অধিক একটি পুষ্প হ'ল—শ্রদ্ধেয় স্বামী পরমানন্দজী মহারাজের প্রশস্তি, তিনি উপনিষদের দুটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃতি ক'রে সঙ্গীতসৃষ্টির যে প্রশস্তি গেয়েছেন, তা ঈশ্বরের উদ্দেশে রচিত 'সুগন্ধিত নির্মাল্য' স্বরূপ। ডাঃ পাণ্ডের এই পূজার আয়োজন সুধী পাঠকেরা উপভোগ করবেন।

সাজিকে লেখক দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন, প্রথম পর্বে গানের অর্থগুলি সংযোজন ক'রে সাধারণ পাঠককে উপকৃত করেছেন। এই পর্বে— দুই, ছয়, নয়, সতের ও তেইশ সংখ্যক গানগুলি সুন্দর এবং ভাববহ। এখানে দু-একটি গানের নাম উদ্ধৃতিতে ত্রুটি রয়েছে, কয়েকটি গানে পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে এবং শুদ্ধিপত্র সত্ত্বেও বানান ত্রুটিমুক্ত নয়। বলাবাহুল্য শুদ্ধিপত্রটি সবশেষে হ'লে দেখতে শোভন হ'ত।

দ্বিতীয় পর্বে—'আশাহত', 'কেন দুঃখ', 'একাত্মতা', 'দাক্ষিণ্য' ও 'প্রতীক্ষা'র ন্যায় গানগুলি সাজির পুষ্পসম্ভারকে নিঃসন্দেহে সুগন্ধিত করেছে, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে পদের যমকসৃষ্টিতে অর্থহীন শব্দচয়ন করা হয়েছে, ছন্দপতনও ঘটেছে। আশা ক'রব আগামী সংস্করণে 'সাজি'কে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করতে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে এবং একটি সুন্দর প্রচ্ছদে সুসজ্জিত করা হবে। 'সাজি'—গৃহমন্দিরে আশ্রয় ক'রে নিক, এই প্রার্থনা।

—স্বামী প্রভাকরানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

(১) গুমসুর (উড়িষ্যা) এবং মালদায় (পশ্চিমবঙ্গ) **পুনর্বাসনকার্য** সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। গৃহনির্মাণকার্য শ্রীকাকুলামে (অন্ধ্রপ্রদেশ) সম্পূর্ণ এবং নবনির্মিত কলোনিটি উদ্বোধনের অপেক্ষায়। আরামবাগ শিবির (পশ্চিমবঙ্গ) ১৭ই জুন, ১৯৮২ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) রাজস্থানের **বিধ্বংসী বন্যা** (১৯৮১): গত ১লা জুন ১৯৮২ হইতে ২১শে জুন পর্যন্ত জয়পুর জেলার ১৮৬টি গ্রামের ১০,৫৬৩টি পরিবারের যথাক্রমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ২৭,২৭৫টি ধুতি এবং ২৭,৯০৩টি শাড়ী বিতরিত হয়। টঙ্ক, সয়াই-মাধোপুর এবং ভরতপুর জেলাতেও ধুতি ও শাড়ী বিতরিত হয়।

(৩) উড়িষ্যা—**ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ** (১৯৮২): গত ৫ই জুন হইতে—ঘূর্ণিবাত্যার অব্যবহিত পরেই উড়িষ্যার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু হইয়াছে। ২০শে জুন, ১৯৮২ পর্যন্ত জাম্বুলক শিবির হইতে—শহর এলাকা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কটক জেলার সুনীতি ও কাণ্ডারাপাতিয়ার বড় গ্রামগুলির ৫৬৬টি পরিবারের ৩,৩৯৬ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে ১,১৮০ কিলো চিঁড়া, ৩৯৬ কিলো গুড়, ২৫০ কিলো চাউল; হাঁড়ি, থালা, বাটি, গেলাস, ঘটি, হাতা প্রভৃতি ৫২২টি এবং শাড়ী বিতরণ করা হয়।

(৪) পশ্চিমবঙ্গ **খরাত্রাণ** (১৯৮২): গত ১২ই হইতে ২৬শে জুন, ১৯৮২ পর্যন্ত মালদা জেলার খরাপীড়িত ৩২৩টি গ্রামের ১৮,৪৩৫টি পরিবারের ৪৪,১২৯ জন পূর্ণবয়স্ক এবং ২৭,০২৫ জন নিম্নবয়স্কদের মধ্যে বামনগোলা ব্লকের—পাইকপাড়া, জি. পি. কলোনি ও পাকুয়াহাট শিবির; এবং হবিবপুর ব্লকের—রেহুতারা দাল্লা, হবিবপুর, বিজলী ও কেন্দপুকুর শিবির হইতে ৭১,৭৫০ কিলো চাউল এবং ৩,৪৫০ কিলো লবণ বিতরিত হয়।

(৫) পশ্চিমবঙ্গ **অগ্নিত্রাণ** (১৯৮২): বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের নিকট বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গিধুরিয়ার ৯৬টি বাড়ীর পুনর্নিমাণকার্য শীঘ্রই শুরু হইবে।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

চেরাপুঞ্জী (মেঘালয়) বিদ্যালয়ের "মেঘালয় বোর্ড অব স্কুল এডুকেশন"-অধীন ১৯৮২-র এইচ. এস. এল. সি. পরীক্ষায় দুইজন ছাত্র যথাক্রমে দ্বিতীয় ও নবম স্থান অধিকার করিয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় প্রেরিত শতকরা একশ জন ছাত্রই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ। জনৈক আবাসিক ছাত্র রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ভূগোলে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছে।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের একটি ছাত্র নিউ দিল্লীর "সেণ্ট্রাল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন"-অধীন ১৯৮২-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় ত্রয়োদশস্থান অধিকার করিয়াছে।

রাজ্যপালের আশ্রম পরিদর্শন

চেরাপুঞ্জী (মেঘালয়) রামকৃষ্ণ মিশনে গত ২৫শে মে ১৯৮২, রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ মেহরোত্র সস্ত্রীক আসিয়া প্রথমে মন্দিরে গিয়া প্রণাম জানান। কয়েকজন খাসিয়া ছাত্র মাতৃভাষায় ভজন গায় এবং রাজ্যপালও ভজনে যোগ দেন। তাঁহারা আশ্রমের ছুতারের কাজ, বয়নকর্ম, দর্জির কাজ ইত্যাদি অন্যান্য বিভাগেরও কাজকর্মাদি পরিদর্শন করেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই মাসে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ :

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ, ৭ম সং, পৃঃ ২০৬, মূল্য : ৬'০০ টাকা।

পরমার্থ-প্রসঙ্গ—স্বামী বিরজানন্দ, ১২শ সং, পৃঃ ১৩৭, মূল্য : ৪'৫০ টাকা।

Vedanta Philosophy— Swami Vivekananda, 9th edition, page 63, price : 3'00

বিবিধ সংবাদ

নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ১লা মে অনুষ্ঠিত সভায় বর্তমান বৎসরের 'নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার' দেওয়া হয় বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীসুনীল পালকে। তিনি তাঁহার ভাষণে শিল্প-আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার দানের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতিত্ব করেন স্বামী উমানাথানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীরথীন মৈত্র। সভায় হাওড়া জেলার বিদ্যালয়-ছাত্রদের জন্য 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেওয়া হয়।

হুগলী রথতলা "বিবেকানন্দ ভবনে" হুগলী-চুঁচুড়ার বিভিন্ন ভক্তপ্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত সভাগুলির আয়োজন করে :

২রা মে ১৯৮২, সকাল ১০টায় স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ শ্রীমৎ শংকরাচার্যের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ১৬ই এবং ২৩শে মে সকাল ৮টায় যথাক্রমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে "স্বদেশমন্ত্র" আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শিবিরে গত ৬ই জুন সকাল ১০টা হইতে বৈকাল ৫টার মধ্যে তিনটি অধিবেশন হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল : শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর প্রধান উপদেশ কোন্‌টি এবং কিভাবে সেইটিকে কার্যে রূপায়িত করা যায়? স্বামী জ্যোতীরূপানন্দজীর সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ছাত্র ও যুবকবৃন্দ।

হুগলী-চুঁচুড়া গত ৩০শে মে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সভায় সকাল নয়টায় শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে "অমূল্যনিকেতনে" "ভারতে বিবেকানন্দ" গ্রন্থান্তর্গত "আমি কি শিখিয়াছি" আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রায় ১০ জন ছাত্র ও বয়স্কব্যক্তি।

শ্যামপুকুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংসদে গত ৬ই জুন ১৯৮২, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-লিপির শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। কথামৃতপাঠ, সংগীত অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **প্রভাবতী দেবী** গত ৩১শে মে, ভোর ৪-৩৫ মিনিটে নৈহাটীস্থিত নিজ বাসভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে করোনারি থ্রম্বসিস রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী ৺সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯৭০ খৃঃ ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দম্পতি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট ১৯২৮ খৃঃ বেলুড় মঠে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।]   ১লা আষাঢ়।   (১৩০৭ সাল)   [৯ম সংখ্যা।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম———কথিত।

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।]

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজি ২৬শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের বাটীতে সিন্দুরিয়াপটী-ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। বাড়ীটী চিৎপুর রোডের উপর, পূর্ব্বধারে; হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সেখান হইতে কয়েকখানি দোকানবাড়ীর উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দুতালা হলঘরে হইত। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক; তাই শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন। উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষ-পল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজ একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভালবাসেন। তাই তিনি ব্রাহ্মভক্তদের এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতওয়ারা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথাবর্জ্জন ও তৈল-ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজ-গৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন, "হ্যাগা, শিবনাথ আস্‌বে না?" একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিলেন, "না,

(শ্রাবণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৩২৯)

   [পুনর্মুদ্রণ]

আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্‌তে পারবেন না"। পরমহংসদেব বলিলেন, "শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, আহা, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই; ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাকিলে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভয়ে, যদি কখনও ব'লে ফেলি যে, বাহ্যে যাব, বাহ্যে যদি না পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লেছিলুম্, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও'—যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বল্‌তে পারি নাই, 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য'। সব মাকে দিতে পাল্লুম, কিন্তু 'সত্য' মাকে দিতে পাল্লুম না"।

[উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও পরমহংসদেবের সমাধি।]

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। এই প্রণব সংযুক্ত ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেকের অন্তরের বাসনা নির্ব্বাপিত প্রায় হইতে লাগিল। চিত্ত অনেকটা স্থির হইল ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক্, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যেন আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে; আর দেহটী মাত্র শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধির অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন —সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র; তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা হরি-রস মদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন।

(৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩০)

বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে পরমহংসদেব কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

[গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।]

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ;—

"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ (মজুমদার) ব'লেছিল, 'মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরা তাই করিব।' আমি বল্লুম, 'মনে কল্লেই কি জনক রাজা হওয়া যায় ? জনক রাজা কত তপস্যা করেছিলেন। তিনি হেটমুণ্ড উর্দ্ধপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। জ্ঞানলাভ ক'রে, তবে সংসারে ফিরে গিছলেন।'

"তবে সংসারীর কি উপায় নাই ?—হাঁ অবশ্য আছে। দিনকতক নির্জ্জনে সাধন কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে সাধন ক'ল্লে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তার পর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রবে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাব্‌বে আমার কেহ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'রবে।

"যদি বল, কতদিন নির্জ্জনে সংসার ছেড়ে থাকব ? তা একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল ; তিনদিন থাক্‌লে আরও ভাল। বা বারদিন, একমাস, তিনমাস, এক বৎসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান-ভক্তি লাভ ক'রে, সংসার কল্লে, আর বড় বেশী ভয় নাই।

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আটা লাগে না। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই। একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও, সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোঁতা থাক, মাটী থেকে তোলবার পর সেই সোনাই থাকবে।

"মনটী দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার-জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জল মিশে যাবে, তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মন-দুধ থেকে যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রে জ্ঞান-ভক্তি রূপ মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনো সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসবে।"

[বিজয়ের নির্জ্জনে সাধন।]

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়া ছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ ?"

(শ্রাবণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৩১)

"দেখ, ছ'জন সাধু ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে একটী সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, এমন সময়ে অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী বল্লে, তুমি যে হাঁ' করে সহর দেখছ, তলপীতল্‌পা কোথায়? প্রথম সাধুটী বল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে তলপীতল্‌পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি।) "দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।"

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কাম কর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখ্‌তে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়কর্ম্ম কল্লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটী গুরু ক'রে ছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁমেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল এবং এক সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগ্‌লো; চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া ক'রে সেই দিকে যেতে লাগ্‌লো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলোও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগ্‌লো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুরুতে ঘুরুতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়া বস্‌লো। বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—ঐ মাছটা যত গোল ক'রেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।"

তবে, নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে ক'চ্চি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌ছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ, নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্ম ত্যাগ হয়; দুই একজন (নারদাদি) লোক-শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করেন।

[সন্ন্যাসী ও সঞ্চয় : 'Take no thought for the morrow']

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "অবধূতের আর একটী গুরু ছিল—মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করুতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর ক'রবে, তাদের সঞ্চয় কর্ত্তে নাই।

(৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩২)

"এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কর্ত্তে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়। পাখী আর দর্ব্বেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না, কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

"দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্‌কি থাকে, তা'হলে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায়* ঐরকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিন জন বসে আছেন, কেউ ডাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প কর্‌ছেন। ব'ল্‌ছেন, "আরে, ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া সাধুলোককো বহুত খিলায়া—পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়াথা।" (সকলের হাস্য)।

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐরকম সাধু দেখেছি। গলায় লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য)।

[প্রেম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আস্‌লে কর্ম্মত্যাগ আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে—সব ছেড়ে তুমি বলো, "মন তুই দ্যাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন :—

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো।
জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে)॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। "ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি; লোকে আমায় কি বল্‌বে,—এ সব ভাব ত্যাগ কর।

[লজ্জা, ঘৃণা, ভয়।]

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়; তিন থাকতে নয়।" লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, এ সব জীবের পাশ। এ সব গেলে তবে সংসার হ'তে মুক্তি হয়।

"পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম—দুর্লভ জিনিস। প্রথমে, স্ত্রীর যেমন

* রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেইখানে।

স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়; তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ-মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।"

"তারপর—ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

[প্রেম ও চৈতন্যদেব।]

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিস, তাও ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হ'য়ে যায়।" এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন :—

সে দিন কবে বা হবে?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়্বে (সে দিন কবে বা হবে?)
সংসার বাসনা যাবে (সেদিন কবে … …)
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে … …)

* * *

[ভাব ও কুম্ভক।]

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থিত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনী নাথ রায়।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন। আরও বলিতেছিলেন, "অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, মাছের চোখ ছাড়া মাছের আর কোন অঙ্গ দেখিতে পান নাই। এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

ঈশ্বরদর্শনের একটী লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে। উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

[শুধু পাণ্ডিত্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে)। "যাঁহারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর।" বেদে যাঁকে "রস স্বরূপ" ব'লেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে,' এ কথায় বুঝ্তে হবে, ঘোড়া আদপেই নাই, কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।" (সকলের হাস্য)।

(৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩৪)

[ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ।]

"কেউ কেউ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করে—বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে ; কিন্তু এ সব দুই দিনের জন্যে, কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে।—

"ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণাকালী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে?
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে॥
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

[অহঙ্কারের মহৌষধ।]

"আর টাকার অহঙ্কার কর্ত্তে নাই। যদি বল, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠ্‌লো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাব্‌তে লাগ্‌লো আমরা জগৎকে আলো দিচ্চি। কিছু পরে চন্দ্র উঠ্‌লো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে কল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাস্‌চে, আমি জগৎকে আলো দিচ্চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণ উদয় হ'লো; সূর্য্য উঠ্‌চেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল—ক্ষণিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না!

"এই গুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা' হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।"

"উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল; কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।"

জ্বলন।

(Combustion—কমবাশ্চান)

(বাবু মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত)।

এ জগতে আমরা যতপ্রকার নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, তন্মধ্যে জ্বলন সামান্য নহে। জ্বলন ব্যাপার সকলে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহার কারণ, স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে অনেকে নিতান্ত অজ্ঞ। এই অজ্ঞতানিবন্ধন হয়ত অনেকে বলিবেন যে, অগ্নির ভার বা ওজন এত, বা অগ্নি—পদার্থের সূক্ষ্মকণাবিশেষ। কিন্তু আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইহা অমূলক। অগ্নি আর কিছুই নহে, কেবল জড়পদার্থের এক অবস্থাবিশেষ।

কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু দগ্ধ হয়, তাহারা অগ্নির অনুকূল পদার্থ, আর জল প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, আমরা তাহাদিগকে অগ্নিপ্রতিকূল সংজ্ঞা দিলাম; অগ্নির অনুকূল

কোন কঠিন বস্তুকে যদি উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, ইহা শতাংশিক তাপমান-যন্ত্রের[১] (Centigrade) এক নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণতায় আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে; এবং আরও উত্তপ্ত করিলে, আলোকের ভিন্নতা দেখিতে পাইব। সকলের প্রত্যক্ষ একটী উদাহরণ দিতেছি :—কামারের দোকানে লৌহ উত্তপ্ত হইতে সকলে দেখিয়াছেন। লৌহ প্রথমে রক্তিমাকার ধারণ করে, পরে আরও অধিক উত্তাপ পাইলে ঈষৎ শ্বেতাকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। যত অধিক উত্তাপ পাইবে, ততই ইহার রক্তিমবর্ণ দূর হইয়া শ্বেতবর্ণ হইবে। তৎপরে দ্রব হইবে।

আমরা দেখিলাম, লৌহটি উত্তপ্ত হইয়া নানাবর্ণযুক্ত হয়—অল্পরক্তিমবর্ণ, অধিকরক্তিমবর্ণ, অল্পশ্বেত, অধিকশ্বেত ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক বস্তু এক এক নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রি উত্তাপে আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আলোক বিকিরণ করিবার তাপপরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন।

লৌহটি যখন রক্তিমাকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিতেছিল, তাহার পূর্ব্ব হইতেই উহার উপর রাসায়নিক কার্য্য হইতেছিল। যে সময় হইতে ইহা আলোক বিকিরণ করিতে আরম্ভ করিল, সে সময় হইতেই লৌহটি জ্বলিতে আরম্ভ করিল, বা সেই সময় হইতেই জ্বলন ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা হইলে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি দ্বারা জ্বলনের অনেকটা বুঝান যাইতে পারে ঃ রাসায়নিক সংযোগসঞ্জাত পর্য্যাপ্তপরিমাণ তাপদ্বারা কোন বস্তুর আলোক বিকিরণ করার নাম জ্বলন। কিন্তু সকল স্থানে উত্তাপ ও আলোকের একত্র অবস্থান থাকিলেই যে জ্বলন ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহা নহে। বায়ুনিষ্কাশিত কাচগোলকের (vacuous globe) মধ্যস্থিত অঙ্গারনির্ম্মিত[২] এক প্রকার তারের (carbon filaments) উপর দিয়া তাড়িৎপ্রবাহ চালিত করিলে, তারটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিতে থাকে, এস্থলে উত্তাপ ও আলোকের একত্র সমবায় থাকিলেও আমরা ইহাকে জ্বলনের উদাহরণ বলি না, কারণ ঐ তারটিতে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে না।

---

(১) যে যন্ত্র দ্বারা উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাহার নাম তাপমান যন্ত্র (Thermometer)। সাধারণতঃ যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা একটি পারদ দ্বারা পূর্ণ কন্দযুক্ত সূক্ষ্ম কাচের নল। ঐ নলটির ভিতরকার ছিদ্র সকল স্থানে সমায়তনবিশিষ্ট। কন্দ ও নলের কিয়দংশ পারদ দ্বারা পূর্ণ থাকে। দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে অধিকায়তন হয় ও শীতল হইলে কুঞ্চিতায়তন হয়। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ যন্ত্রের মধ্যস্থিত পারদের সঙ্কোচ ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে। দ্রবমাণ বরফে নিমজ্জিত হইলে পারদ যে বিন্দু পর্য্যন্ত নামিয়া যায়, তাহার নাম দ্রবণাঙ্ক, আর ফুটন্ত জলনিঃসৃত বাষ্পে নিমজ্জিত হইলে যে বিন্দুতে উত্থিত হয় তাহার নাম স্ফুটনাঙ্ক। এই দুই বিন্দুর মধ্যস্থিত স্থানকে কেহ ১৮০, কেহ ১০০, কেহ বা ৮০ অংশে বিভক্ত করেন; ঐ এক-এক অংশের নাম ডিগ্রি।

যে সকল যন্ত্রে ১০০টী অংশ থাকে তাহাদের নাম শতাংশিক তাপমান যন্ত্র। আমরা এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র শতাংশিক তাপমানের উল্লেখ করিতেছি, বুঝিতে হইবে।

(২) বিবাহাদি উৎসবে অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের বাটীতে এই প্রকার আলোক ব্যবহৃত হয় দেখা গিয়াছে। দেখা যায়, এক কাচগোলকের মধ্যে তারের মত কি এক পদার্থ রহিয়াছে। এই তার হইতেই আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত কাচপাত্রের মধ্য হইতে বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

(৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩৬)

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

...রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : ১ম ভাগ পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮·০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২·৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫·২৫ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭·৮০ ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪, মূল্য ৮·২৫ ; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯·৫০ ; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩·৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাঁধাই ৬·০০ ; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ১·৬৫

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৫·২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪·২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ (সাধারণ বাঁধাই) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২·২৫

„ (কাপড়ে বাঁধাই) পৃঃ „ মূল্য ২·৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন ; ১০ম সং, মূল্য ৩৩·০০

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ ; (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৯১, মূল্য ৯·০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭·৫০ ; ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২·০০

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২০·০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃ ২৫৬, মূল্য ৬·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)-স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৬·০০ (২য় সংস্করণ)

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৪, মূল্য ১৬·০০ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬·০০ ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮·০০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৩৬, মূল্য ৮·০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত

উদ্বোধন

ভাদ্র ১৩৮৯

৮৪তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ম (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত).গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে টাকা, এয়ার মেল-এ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্ম ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহ র পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭৷৷টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫৷৷টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

কয়েকখানি নিত্যসঙ্গী বই ঃ

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৯৫.০০ টাকা; প্রতি খণ্ড—২০.০০ টাকা, সুলভ সংস্করণ সেট ১৫৫.০০ টাকা; প্রতি খণ্ড ১৬.০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম খণ্ড): ১ম ভাগ ২৮.০০ টাকা, ২য় ভাগ ২২.৫০ টাকা। সাধারণ: ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা, ২য় খণ্ড ৭.৮০ টাকা, ৩য় খণ্ড .২৫ টাকা, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫০ টাকা, ৫ম খণ্ড ১১.৫০ টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—প্রথম ভাগ ৭.৫০ টাকা, ২য় ভাগ ১২.০০ টাকা।

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
১ম ভাগ ১৫.০০ টাকা; ২য় ভাগ ১১.০০ টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.০০ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত। ১০.৫০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত। ১২.৫০ টাকা।

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৮৯

-6 ... 1982

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী । শ্রীকৃষ্ণ		৩৩৭
২।	কথাপ্রসঙ্গে । কৃষ্ণচরিত্র		৩৩৮
৩।	স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকণা	স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত	৩৪০
৪।	জগন্নাথের স্বরূপ-সন্ধানে	স্বামী গীতানন্দ	৩৪২
৫।	বিবেকানন্দ (কবিতা)	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দরিপা	৩৪৭
৬।	পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	৩৪৮
৭।	দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়	ডক্টর রমা চৌধুরী	৩৫৩
৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা	স্বামী বুধানন্দ	৩৫৭
৯।	বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার	ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ	৩৬১

১০।	'কথামৃতে'র দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীমতী অভয়া দাশগুপ্ত	৩৬৫
১১।	রথযাত্রা (কবিতা)	ব্রহ্মচারিণী অজিতা	৩৭০
১২।	সমালোচনা	ডক্টর তারকনাথ ঘোষ	৩৭১
		ডক্টর জলধিকুমার সরকার	৩৭১
১৩।	রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ		৩৭৩
১৪।	বিবিধ সংবাদ		৩৭৬
১৫।	উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা	পুনর্মুদ্রণ (আষাঢ়, ১৩০৭ ; পৃঃ ১৬১-১৬৮)	৩৭৭



৮৪তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

শ্রীকৃষ্ণ

…তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ-কথা বলিতেছি, ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'—অন্যান্য অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

যখন আমরা তাঁহার বিবিধভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য বোধ হয় না যে, তাঁহার প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। সকল অবতারই, তাঁহারা যাহা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চির-জীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন; তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই। বাল্যকালে যে-শ্রীকৃষ্ণ সরলভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি সেই সরল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।



—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, [illegible] খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৪৯-৫০]

কথাপ্রসঙ্গে

কৃষ্ণচরিত্র

ভারতের ইতিহাস ভূগোল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে একটি নাম, একটি জীবন, একটি চরিত্র—যিনি ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম আজও প্রান্তে প্রান্তে উচ্চারিত, যাঁহার বাণী আজও সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মনীষীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে, যাঁহার জীবন যুগে যুগে ভারতবাসীর জীবন আলোকিত করিয়াছে—যাঁহার চরিত্র কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন উপাদান—এরূপ একটি নাম যদি করিতে হয়,—সেই একটি নাম—অবশ্যই 'কৃষ্ণ' বা শ্রীকৃষ্ণ—যিনি এই ভারতের প্রাণপুরুষ, আরও সংক্ষেপে যিনি 'ভারতপুরুষ'!

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার মৃত্যু নাই—তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য; তাঁহার দেহান্তও হইয়াছিল, তাহারও বিবরণ আছে—তথাপি বলিতে হয়, তাঁহারই ভাষায় 'অহমাত্মা'—আমি আত্মা—জন্মমরণহীন আত্মা—তাইতো ভাগবতকার চতুর্বিংশতি অবতারলীলা বলিতে বলিতে যখন শ্রীকৃষ্ণচরিতকথায় আসিলেন—তখন থমকিয়া গেলেন, বলিলেন—এতক্ষণ যাঁহাদের কথা বলিলাম, তাঁহারা ভগবানের অংশ বা কলা—এখন যাঁহার কথা বলিব, সেই 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং! কি অপূর্ব অনুভূতি, কি আশ্চর্য স্বীকৃতি!

আর একটি চরিত্র—যাহা ভারতীয় মনকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং ভারতের কাব্য-সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভাবিত করিয়াছে, তিনি বাল্মীকির রাম। কিন্তু সেই রাম আগে ইতিহাসে, না আগে কবিমানসে, নির্ণয় করা দুরূহ। 'রাম না জন্মাতে রামায়ণ' এই প্রবাদ-বাক্যই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের বিচার-অনুযায়ী: কৃষ্ণ-সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত, কারণ তাঁহার বন্ধু ও শত্রু—দুই-ই ছিল,—ভক্তস্তাবক ও নিন্দকসমালোচক দুই-ই ছিল—আজও আছে, তবু সব ছাপাইয়া উঠে তাঁহার অপূর্ব জীবন ও অদ্ভুত চরিত্র—যাহা শুনিলে বা পাঠ করিলে আজও মানুষ বিস্ময়ে বিমোহিত হয়। সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের এ এক ঘনীভূত রূপ!

বাল্মীকিরই ভাষায় রাম 'মর্যাদা পুরুষ' অর্থাৎ মানব চরিত্রের সীমা—মানুষের চরিত্র আর ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না, এই দৃষ্টি হইতেই বাল্মীকি রামচরিত্র আঁকিয়াছেন; কিন্তু ব্যাস ছবি আঁকেন নাই, তিনি একটি দুর্দমনীয় চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন—যিনি মানুষের সীমায় আবদ্ধ নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অনবদ্য ভাষায় বলিয়াছেন, 'অবতার অচিনে গাছ'—কোন জানা-শোনা মাপকাঠি দিয়া, ফুট ইঞ্চি সেন্টিমিটার দিয়া তাঁহাকে মাপা যায় না। এ অচিনে গাছ—এ গাছের পাতা কেউ চেনে না, এ এক নূতন আবির্ভাব! শ্রীরামকৃষ্ণ তবু নানা উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন অবতারের স্বরূপ: একটি ঘেরাটোপা বাগানের দেওয়ালে ফোকর আছে—সীমাবদ্ধ বাগানে চেনাজানা ফুলফল গাছপালা অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাহার বাহিরে কি আছে কেহ দেখিতে পায় না। মাঝে মাঝে দেওয়ালে ফোকর আছে—সেখানে দাঁড়াইলে দেখা যায়—ওধারে সীমাহীন মাঠ, এক অজানা অসীম জগৎ! এই সীমাবদ্ধ জগতের অনুভূতি লইয়া আমরা তাঁহার ধারণা করিতে পারি না। অবতার-জীবনের মাধ্যমে একটা অজানা অনুভূতি আমাদের অভিভূত করে।

অবতার-জীবনের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—তাহা বুঝিতে হইলে অবতারপুরুষের উচ্চারিত দু-চারিটি কথার মাধ্যমেই বুঝিতে হইবে—সেই সব কথাও অনেক সময় আমাদের পরিচিত ভাষা নয়—এক-প্রকার 'মিষ্টিক' ভাষা—রহস্যময় অথচ গভীর অনুভূতির দ্যোতক এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত। 'আমি ও আমার পিতা এক'—এই খৃষ্টবাণী কি মানুষ আজও

বুঝিয়াছে, বা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে? দুঃখ করিয়া বলা হয়—একদিন না বুঝিয়া একদল অবুঝ ইহুদী তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল; আজও তিনি আবির্ভূত হইলে তাঁহার নামাঙ্কিত ভক্তগণ কি তাঁহাকে চিনিতে পারিবে?

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে গেলে আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে তাঁহার জীবন, অনুধ্যান করিতে হইবে তাঁহার বাণী: তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্'—আমার জন্ম এবং কর্ম প্রাকৃত নয়, দিব্য! সেইভাবেই উহা বুঝিতে হইবে, তবেই কল্যাণ। নতুবা ছিদ্রান্বেষী কৃষ্ণচরিত্রে অনেক ছিদ্র খুঁজিয়া পাইবে: কেন তিনি সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইলেন, কেন তিনি বীর অর্জুনকে কাপুরুষের মতো নিরস্ত্র কর্ণকে মারিতে বলিতেছেন, সর্বশেষে কেন তিনি অন্যায়-ভাবে দর্পী রাজা দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করাইলেন! কিন্তু এতগুলি অন্যায়কার্যের তিনি কি উত্তর দিবেন? তিনি এতদপেক্ষা বহু অন্যায়ের সাক্ষী—তিনি এতগুলি অভিযোগের একটি উত্তর দিলেন: কোথায় ছিল তোমার ন্যায়বুদ্ধি, যখন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে অবমানিত করা হইতেছিল? স্বীয় মাতুল কংসকে তিনি স্বহস্তে মারিয়াছেন, কংস কি কি অন্যায় করিয়াছিল, তাহার হিসাব আমরা কয়জন লই!

কৃষ্ণজীবন দিয়াই কৃষ্ণচরিত্র অনুধ্যান করিতে হইবে;—বিচার নয়, কারণ সমগ্র জীবনটি এক অন্য স্তরে বিচরণ করিতেছে! সাধারণ মানুষের মারামারি, কাটা-কাটি বা ঘৃণা-ভালবাসার স্তরে নয়।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি ব্যাবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক! সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের তিনটি স্তর! সত্ত্বগুণের স্তর হইতে ক্ষমা এবং অহিংসা পরম ধর্ম—সন্দেহ নাই। কিন্তু অক্ষম তমোগুণীর স্তর হইতে? কেহ তাহার ঘরে আগুন দিতে আসিতেছে বা তাহাকে হত্যা করিতে আসিতেছে—তমোগুণী ব্যক্তি আততায়ীকে 'ক্ষমা' করিয়া পলায়ন করিবে। রজোগুণী ব্যক্তি তাহাকে প্রতিরোধ করিবে, প্রয়োজন হইলে আঘাত করিবে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা, যিনি গীতামুখে এই তিন গুণের অপূর্ব আলোচনা করিয়াছেন—সেই সঙ্গে করিয়াছেন—দেব এবং অসুর-প্রকৃতি মানুষের বিশ্লেষণ! মানুষকে আগে 'মানুষ' হইতে হইবে, তার পর সে 'দেবতা' হইবার কল্পনা করিবে। তাঁহার জীবন ও চরিত্রের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ মানুষকে জীবনের এই কল্যাণকর পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সাধারণ মানুষ দেহেন্দ্রিয়ের স্তরে বাস করে—খাওয়া-পরার সংস্থান ও বংশবিস্তার করিতেই তাহার জীবনশক্তি নিঃশেষিত হয়, অর্থাৎ জীবন রক্ষা করিতেই তাহার জীবনান্ত হয়,—এ কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এইখানেই সন্ধান শুরু; উপনিষদের মহা অনুভূতি 'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি'—এ জগতে এভাবে জীবন যাপন করাতে আমি ভোগের কিছু দেখি না! তখনই শুরু হইল ঊর্ধ্বতর জীবনের অনুসন্ধান—যাহার শেষে আমরা পাই উপনিষদের আর একটি মহাবাণী—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'—'সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি—চিনেছি'—তিনি আমারই আত্মা। সেই মহান্ আত্মা পরমাত্মাই দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করেন বা অবতীর্ণ হন, তখন মানুষ তাঁকে অবতার বলিয়া বরণ করে—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'। মনুষ্যশরীরে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত এই অপ্রাকৃত পুরুষকে ভক্তেরা বলেন, 'ভগবান্', যোগীরা 'পরমাত্মা', জ্ঞানীরা 'ব্রহ্ম'। উপনিষদের সেই মহান্ পুরুষই গীতার 'পুরুষোত্তম'। গীতামুখে তাঁহার ঘোষণা: যখন যেখানে প্রয়োজন অন্যায় অধর্ম ধ্বংস করিয়া ন্যায়ধর্ম স্থাপন করিব, তোমরা আমার সহায় হও।

নররূপী অর্জুনের মাধ্যমেই নারায়ণ 'কৃষ্ণ' ধর্ম-স্থাপন করেন, মানুষের রূপান্তর তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন; অবতারচরিত্র তথা কৃষ্ণচরিত্র-অনু-ধ্যানের মাধ্যমেই মানুষের এই রূপান্তর সহজে

স্বামী অখণ্ডানন্দের-স্মৃতিকণা

স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত

১৯২৭ খৃঃ সারগাছি, শীতকাল—কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবা চা-পানের সময় স্মৃতিকথা আলোচনা করিতেছেন :

"তখন সারগাছিতে আশ্রম করবার জন্য জমির চেষ্টা হচ্ছে। ২২ বিঘা জমির জন্য বহরমপুর কালেকটারীতে ১২৬০ টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও জমি পাওয়া গেল না, আর এক জায়গায় ৪ বিঘা দান-হিসাবে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু আশ্রমের উপযোগী হ'ল না। শেষে এই ৫০ বিঘা বাৎসরিক ২০০৲ টাকা খাজনায় কায়েমী বিলি বন্দোবস্ত করবার জন্য প্রস্তুত। পুষ্করিণী খনন, ইমারত প্রস্তুত, বৃক্ষ রোপণ-ছেদন আদি জমিদারের সমস্ত অধিকার (rights) বিলি করতে রাজী—এই মর্মে দলিল লেখাপড়া হবে, বহরমপুরের উকিল বৈকুণ্ঠবাবু দলিল লিখে দেবেন। আমি বললাম, 'আমার নামে জমি নেওয়া হবে না, এ তো আমার নিজের কিছু নয়—এ মিশনের—এ ঠাকুরের। মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে নেওয়া হবে।' বৈকুণ্ঠবাবুকে বেলুড় মঠ থেকে 'মিশনের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী'র নকল আনতে বললাম। সব দেখেশুনে তিনি মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ ও আমি—এই তিনজনকে ট্রাস্টি (অছি) ক'রে দলিল তৈরী ক'রে দিলেন।

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন পুরীতে। তাঁর কাছে দলিল পাঠানো হ'ল ; বাৎসরিক ২০০৲ খাজনার দায়িত্ব নিতে তিনি রাজী নন, বৈকুণ্ঠবাবুকে বাৎসরিক খাজনা কমাবার জন্য পত্র দিলেন। আমাকেও লিখলেন। উপরন্তু বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি পুরীর আইনবিদ্‌রা কিছু অদল-বদল করেছিলেন। এই কথা শুনে জমিদার অসন্তুষ্ট। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সব কথা বুঝিয়ে বলবার জন্য আশ্রমের এক ভক্ত-সেবককে পুরী পাঠালাম। ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁকে বললেন, 'আমি কলকাতায় গেলে, গঙ্গাধরকে আমার কাছে আসতে বলবে—তার মুখে সব শুনে আমার যা বলবার তাকে ব'লব।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলকাতায় এলে, আমি সব বলে এলাম। সেই সময় ভাগলপুরে রিলিফের কাজ ফেরত স্বামী শঙ্করানন্দ (অমূল্য মহারাজ) স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে জমি দেখতে সারগাছির পুরানো আশ্রমে এসে হাজির ; তিনি আশ্রম-স্কুলের শিক্ষক—আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ—কালী ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে শিবনগর থেকে জমি দেখতে গেলেন। জমি দেখে পছন্দ করলেন বটে, কিন্তু বললেন, 'মহারাজ ২৫ বিঘা জমি নিন, ৫০ বিঘা আয়ত্তে রাখা বড় শক্ত—অর্ধেকটা নিন।' অমূল্য মহারাজ মঠে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঐ মর্মেই পত্র দিলেন। বিকালবেলা আমি পোস্টকার্ডখানি পেলাম। এত কাণ্ড ক'রে জমি নেবার সব ঠিকঠাক হ'ল, এখন যদি অর্ধেক নেবার প্রস্তাব করা যায়—তাহলে জমিদার অগ্নিমূর্তি হ'য়ে উঠবে। এই সব অবস্থা কিভাবে সামলানো যাবে—এই চিন্তায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। মাঝরাত্রি কেটে গেল, ঘুম এল না—তারপর তন্দ্রাভাব এসেছে, এমন সময় স্বপ্নে দেখি—স্বামীজী, মহারাজ, হরি মহারাজ, এঁরা সব এসেছেন, সঙ্গে অমূল্য মহারাজ—উনি দূতী কিনা! স্বামীজী এসে বলছেন, 'গ্যাঞ্জেস্, একটু তেলমাখা গরম মুড়ি আর দুটো লঙ্কা নিয়ে আয়।'—স্বামীজীকে দেখে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলাম। অমূল্য মহারাজকে বললাম, 'যাও অমূল্য, রান্নাঘরে যাও—লুচি, আলুর দম, হালুয়া—যা যা তুমি জানো তা কর গিয়ে, ভাঁড়ারঘরে সব আছে—যাও, শিগ্‌গির যাও।' স্বামীজী বললেন, 'গ্যাঞ্জেস্, দে, মুড়ি দে, আগে নিয়ে আয়।' মুড়ি লঙ্কা এনে দিলাম, স্বামীজী খেতে

আরম্ভ করলেন। বললেন, 'হাম্ এক লোটা ভাঙ্ লেঙ্গে—৫০ বিঘার কম নেশা হবে না।' স্বামীজী বলছেন আর মুড়ি খাচ্ছেন—স্বামীজীর মুড়ি খাওয়া হ'য়ে গেলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সব চিন্তার অবসান হ'য়ে গেল, সব মীমাংসা হ'য়ে গেল। পরদিন মঠে পত্র লিখে দিলাম স্বপ্নের কথা উল্লেখ ক'রে। আর কোন কথা উঠল না। ৫০ বিঘা জমিই নেওয়া ঠিক হ'য়ে গেল। এবার দলিল রেজিস্টারীর পালা। মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ) তখন কনখলে চলে গেছেন,—দলিল প্রস্তুত ক'রে সই করবার জন্য মহারাজের কাছে পাঠানো হ'ল। ৯০ দিন কেটে গেল। শেষে আমিই গেলাম কনখলে অম্মোক্তারনামা (Power of Attorney) সই করাতে। ওটি বাংলায় লেখা ছিল। উত্তরপ্রদেশে রেজিস্টারী করা হবে, তাই সেটি ইংরেজী করতে উকিলবাড়ী ছুটতে হ'ল। তারপর রুড়কীতে মহারাজকে নিয়ে গিয়ে রেজিস্টারী করানো হ'ল।

"এখন শরৎ মহারাজের পালা। 'উদ্বোধনে' গিয়ে তাঁকে ধরায় তিনি বললেন, 'ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নাম আছে, আবার আমার নাম ঢুকিয়েছ কেন?' যাই হোক তাঁর মত করিয়ে কলকাতায় রেজিস্টারী করিয়ে নিয়ে সারগাছিতে ফিরলাম। ১৯১২ খৃঃ আগস্ট মাসে বহরমপুরে দলিল রেজিস্টারী করা হ'ল।

"'হাম এক লোটা ভাঙ্ লেঙ্গে' ব্যাপারটা কি জানো?—কাশীতে চিমটাধারী একপ্রকার নাগা সন্ন্যাসী গৃহস্থদের বাড়ীতে ঢুকে চিমটে পুঁতে দিয়ে বলেন—'এক লোটা ভাঙ্ লেঙ্গে';—এক লোটা ভাঙ্ নিয়ে তবে চিমটে মাটি থেকে তুলবেন। এই রকম তাঁদের জোর জুলুম। স্বামীজী তাদের ভঙ্গীতে বলছিলেন।

"দেখ, সারগাছি আশ্রমের ছাপ এখানকার মুসলমানদের ওপরও বেশ একটু পড়েছে। আশ্রমের কাছাকাছি এমন সব পরিবারও দেখা যায়, যারা নিরামিষ খায়।

"এই প্রসঙ্গে ১৯০৩ খৃঃ দেখা এক স্বপ্নের কথা বলি: বহরমপুরে (রামদাস সেনের বাড়ীতে) গেছি, সেখানে স্বামীজী এসেছেন; লম্বা দাড়ি, কোমরে লোহার শিকল, হাতে চিমটে, সঙ্গে তিনজন—গৌরবর্ণ, লম্বা, খুব চওড়া বুক, খুব বড় দাড়ি, হাতে খড়পা। স্বামীজীর চেহারা অন্যরকম হলেও ধরে ফেলেছি, ইনি স্বামীজী স্বয়ং। স্বামীজী বললেন, 'আমি এখন অন্য শরীর ধারণ করেছি, আমার সঙ্গে ইরান, তুরান, খোরাসান।' স্বামীজী বললেন, 'যা, এদের গঙ্গা স্নান করিয়ে নিয়ে আয়।' তাদের তিনজনকে নিয়ে বহরমপুরের বাবুদের ঘাটে গেলাম। গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে তাঁদের জলে নেমে স্নান করতে ইঙ্গিত করাতে তাঁরা স্নান করলেন। তাঁদের ভাবভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। স্নানান্তে তাঁদের নিয়ে স্বামীজীর কাছে ফিরলে স্বামীজী বললেন, 'কেমন দেখলি?' আমি বললাম, 'এরা তোমার সাহেব বিবির ওপরে গেছে।'

"আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, বহু সাধু ফকির সন্ন্যাসী দেখেছি। আগ্রায় দুজন মুসলমান ফকিরের কথা বেশ মনে পড়ে। একজন 'হাফেজ'ও ছিলেন। সমস্ত কোরান যাঁর মুখস্থ তাঁকে 'হাফেজ' বলে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'কি উপলব্ধি করেছেন?' তিনি বললেন, 'লবণ-সমুদ্রে এক খণ্ড কাঠ। কাঠটা জরে জরে নুন হয়ে গেছে।' গুজরাটে আর একজন বৃদ্ধ মুসলমান ফকির দেখি। তখন রোজার সময়। বিকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, বৃদ্ধের চমৎকার বর্ণ ও গঠন, লম্বা দাড়ি। ফরাসে বসে আছেন, হাতে সাদা মালা। সামনে সরবৎ ইত্যাদি রয়েছে রোজা ভাঙবার জন্য। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব-ধর্ম-মত-অনুযায়ী সাধন-ভজনের কথা বলায় বৃদ্ধ মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। মালার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'আরবের মাছের দাঁতের মালা, এখন রোজার সময় সর্বদা জপ করতে হয়, ছাড়তে পারি না। অন্য সময় হ'লে আপনাকে দিতাম।' এমনি তাঁর শিষ্টাচার। সূর্য ডুবু ডুবু দেখে ফকির জপ করতে লাগলেন। কী তাঁর ভাব!"

জগন্নাথের স্বরূপ-সন্ধানে

স্বামী গীতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

(২)

ঋগ্বেদে পুরুষোত্তম এবং দারু-ব্রহ্মের কথা পাওয়া যায়। এই থেকে মনে হয় যে, ইতিহাসের আলো যেখানে পৌছায়নি, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই কোন না কোনভাবে জগন্নাথদেবের পূজার প্রচলন ছিল। উড়িষ্যার অধিবাসীরা ভগবান্ বিষ্ণুকে চক্রধরমাধব, ললিতমাধব, শবরী-মাধব, নীলমাধব প্রভৃতি রূপে পূজা ক'রত। নীলমাধব ছিল জড় শবর-বংশের দেবতা এবং তাঁকেই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ বলা হ'ত। শবরেরা তাঁকে 'জগনাইলো' অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ব'লত এবং শবর-গ্রামে এখনও এই 'জগনাইলো' নামই ব্যবহার করা হয়। সম্ভবতঃ 'জগনাইলো' থেকেই জগন্নাথ নামের প্রচলন হয়েছে।

পৌরাণিক যুগের বিভিন্ন পুরাণে শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এবং মন্দির তৈরীর কথা রয়েছে। এ-ছাড়াও উড়িষ্যার প্রাচীন পণ্ডিতদের লেখা পুঁথি এবং প্রচলিত কিংবদন্তী থেকেও জগন্নাথদেবের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। যদিও এই সব লেখা এবং প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবু এই সব একত্রিত ক'রে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাত্বত-বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বসু শবর ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের জ্ঞাতি-ভাই। যদু-বংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবার পর, জড় শবরের বাণে যখন শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয়, তখন তাঁর শরীর কিভাবে সৎকার করা হবে, এই নিয়ে পাণ্ডব এবং শবরদের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয়। অর্জুন এবং জড় শবর তখন শ্রীকৃষ্ণের দেহ বহু দূরে এক সমুদ্রের পারে নিয়ে গিয়ে সৎকার করেন। সম্ভবতঃ পুরীর 'কৈলি বৈকুণ্ঠ' (কৈবল্য বৈকুণ্ঠ) ছিল সেই শ্মশান-ক্ষেত্র। সেখানে শবরেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ইন্দ্রনীল-মণিটি পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিহ্ন হিসেবে সেই ইন্দ্রনীল-মণিটির পূজা করতে থাকে। ইন্দ্রনীলমণি থেকেই নীলমাধবের পূজার প্রচলন হয়। শ্রীকৃষ্ণের দেহ যখন আগুনে সৎকার করা হচ্ছিল, তখন সেই অর্ধদগ্ধ দেহটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবার জন্য দৈববাণী শোনা গেল। সেই অর্ধদগ্ধ কৃষ্ণ-দেহ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দারুরূপে পুরীর রোহিণী কুণ্ডে এসে লাগে। এদিকে জড় শবর না জেনে, হরিণ মনে ক'রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেছিল; এই দুঃখে এবং আত্মগ্লানিতে সে তখন হন্যে হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের দেহাবশেষ খুঁজতে থাকে এবং রোহিণী কুণ্ডে এসে দারুরূপী শ্রীকৃষ্ণের দেহপিণ্ড পায়। জড় শবর তখন ঐ দারু নিয়ে গিয়ে অতি গোপনে আদিবাসীদের নিয়মানুযায়ী তাদের অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে থাকে। সম্ভবতঃ দারু এবং ইন্দ্রনীলমণি একই সঙ্গে রেখে পূজা ক'রত।

বহু বছর কেটে গেছে; জড় শবরের পর তার পুত্র বিশ্ববসুও পরম ভক্তির সঙ্গে সেই দারু-ব্রহ্ম নীলমাধবের পূজা করতে থাকে। এদিকে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন ভগবান্ বিষ্ণুর পরম ভক্ত। তিনি লোকমুখে নীলমাধবের সংবাদ পেয়ে শবর-গ্রাম থেকে তাঁকে এনে নীলগিরিতে প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্প করলেন। নীলমাধব যে কোথায় রয়েছেন, বাইরের কেউই তা জানত না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর মন্ত্রী বিদ্যাপতিকে নীলমাধবের সন্ধানে পাঠালেন। বিদ্যাপতি শবর-গ্রামে গিয়ে শবর রাজা বিশ্ববসুর

কন্যা ললিতাকে বিয়ে করেন, ললিতার সাহায্যে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নীলমাধবের সন্ধান পান। বিদ্যাপতি রাজাকে নীলমাধবের সংবাদ জানালে, ইন্দ্রদ্যুম্ন শবরদের সাহায্যে সেই দারু প্রচুর জাঁক-জমকের সঙ্গে নীলাচলে নিয়ে যান এবং সেই দারু থেকে, এখন আমরা জগন্নাথের মন্দিরে যে তিনটি বিগ্রহ দেখি, ঠিক সেই-রকম তিনটি মূর্তি করান। বিশ্বকর্মা স্বয়ং বৃদ্ধ ছুতারের বেশে রাজার কাছে এসে মূর্তি তৈরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কথা ছিল যে, যতদিন মূর্তি তৈরী না হবে, ততদিন মন্দিরের দরজা খোলা হবে না। কিন্তু রাজা অধৈর্য হ'য়ে সেই কথা না মেনে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মন্দিরের দরজা খুলে ফেলেন। ফলে তিনটি মূর্তিই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। রাজা তখন শ্রীকৃষ্ণের দেহাবশেষ-দারু থেকে নির্মিত সেই তিনটি মূর্তিই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম-রূপে পূজা করতে থাকেন।

কমবেশী ১২ বছর পর পর, যে বছর মল মাস আষাঢ় মাসে পড়ে, সেই বছর যখন 'নবকলেবর' হয় তখন আগের মূর্তির বিভিন্ন অংশের মাপ এবং গড়ন অনুযায়ী নিম কাঠ দিয়ে নূতন মূর্তি তৈরী করা হয়। যদিও মূর্তি বদল হচ্ছে, তবুও মূর্তির মাপ এবং গড়ন, সেই প্রথম যে মূর্তি তৈরী হয়েছিল, ঠিক সেই-রকম হুবহু রয়ে গেছে। নবকলেবরের সময় পুরানো মূর্তি থেকে 'ব্রহ্মকে' নূতন মূর্তিতে স্থানান্তরিত করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রনীলমণি, যেটি শবরেরা পূজা ক'রত, সেইটি-ই 'ব্রহ্ম' রূপে নবকলেবরের সময় নূতন দারু মূর্তিতে স্থাপন করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে কি যে স্থানান্তরিত করা হয়, তা কেউ-ই জানে না; কারণ যিনি 'ব্রহ্মকে' পুরানো মূর্তি থেকে বের ক'রে নূতন মূর্তিতে স্থাপন করেন, তাঁর চোখ তখন বাঁধা থাকে।

যাই হোক, মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের কাছে চারটি প্রার্থনা করেন :

প্রথমতঃ, শবর রাজা বিশ্ববসুর বংশধরেরা 'দৈতপতি' নামে অভিহিত হবে এবং তারা অদর্শন-কালে (স্নানযাত্রার পর থেকে রথযাত্রা পর্যন্ত) এবং রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেবের সেবা-পূজা করবে।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাপতির শবর পত্নী ললিতার বংশধরেরা 'সুপকার' নামে পরিচিত হবে এবং বংশানুক্রমে তারা জগন্নাথদেবের ভোগ রান্না করবে।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ পত্নীর বংশধরেরা জগন্নাথদেবের পূজারী হবে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে যখন তাঁর চতুর্থ প্রার্থনার কথা জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তখন তিনি বললেন যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার বংশ লোপ পেয়ে যায়; কারণ তাঁর বংশধরেরা হয়তো পরে গর্ব ক'রে বলবে যে, এই মন্দির তাদেরই পূর্বপুরুষেরা তৈরী করেছিল। জগন্নাথদেব সন্তুষ্ট হ'য়ে রাজার চারটি প্রার্থনাই পূর্ণ করেছেন। উপরোক্ত প্রার্থনানুযায়ী এখন পর্যন্ত মন্দিরের বিভিন্ন কাজ সেই সেই বংশের লোকেরাই ক'রে থাকে।

যদিও বিভিন্ন পুরাণ এবং প্রচলিত কাহিনীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে মন্দির এবং মূর্তির নির্মাতা বলা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসে এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িত কোন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নাম পাওয়া যায় না। এই থেকে মনে হয় যে, 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' কোন রাজার নাম নয়—এইটি একটি পদবী বিশেষ। সেই জন্য যযাতি কেশরীকে (দ্বিতীয়) 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' এবং ভোই-বংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেবকে 'অভিনব ইন্দ্রদ্যুম্ন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরের অসমাপ্ত মূর্তির দার্শনিক ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন যে, জগন্নাথদেব হচ্ছেন নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা মানুষের পক্ষে যে সম্ভব নয়,

সেই কথাই মন্দিরের অসমাপ্ত মূর্তিগুলিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী রয়েছে। দ্বারকাতে একদিন শ্রীকৃষ্ণের পুরনারীরা রোহিণী দেবীর কাছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা শুনছিলেন। সেই সময় দরজার কাছে সুভদ্রা পাহারা দিচ্ছিলেন, যাতে বাইরের কেউ সেখানে হঠাৎ এসে উপস্থিত না হয়। বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা যখন অনেকটা এগিয়েছে, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অন্দর মহলে যাবার জন্য দরজার কাছে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন, "যদিও আমি নানা মূর্তিতে নানা মনোহর লীলা ক'রে থাকি, তথাপি রাসলীলার কথা স্মরণ হ'লে আমার মন যে কেমন হ'য়ে যায়, বুঝতে পারি না।" দরজার কাছে এসে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম শুনতে পেলেন যে, মা রোহিণী রাসলীলার কথাই বলতে আরম্ভ করেছেন। শুনতে শুনতে তিনজনেই—শ্রীকৃষ্ণ, সুভদ্রা ও বলরাম—মহাভাবে বিভোর হ'য়ে পড়লেন; তাঁদের শরীরে তখন অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল; হাত পা ছোট হ'য়ে গেল এবং মহাবিস্ময়ে চোখগুলি ক্রমেই বড় হ'তে লাগল। ঠিক এই সময় নারদ সেখানে গিয়ে তাঁদের ভাববিহ্বলতা দেখে অভিভূত হ'য়ে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা করলেন, যেন তাঁরা কলিযুগের মানুষকে এইরূপে দর্শন দেন। নারদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁরা বর দেন যে, কলিকালে নীলাচলে তাঁরা এই মূর্তিতে আবির্ভূত হবেন। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, জগন্নাথ-মন্দিরের মূর্তিগুলি অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের, মহাপ্রেমের মূর্তি। ভগবানের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে অবলম্বন ক'রে যদি আমরা একে অপরকে দেখবার চেষ্টা করি, তাহলে সেখানে কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না; একমাত্র প্রেমই সেখানে বিরাজ করবে। এই প্রেমের জন্যই নারদ কলিযুগের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাই বোধ হয়, জগন্নাথদেবের মন্দিরে বিভিন্ন ভাবের লোকেরা নিজের নিজের ভাবে, ভগবানের এই প্রেমমূর্তিকে অনুভব করবার চেষ্টা ক'রে থাকে।

মন্দিরের রত্নবেদীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা ছাড়াও সুদর্শন, মাধব, শ্রীদেবী ও ভূদেবীর মূর্তি রয়েছে। সুদর্শনের আকার অনেকটা থামের (**Pillar**) মতো। অপর তিনটি সাধারণ ছোট মূর্তি।

আর্যরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, আর্যেতর শবর রাজা—বিশ্ববসুর সাহায্যে জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেইজন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা জগন্নাথদেবের পূজা এবং অন্যান্য বিষয়ে শবরদের বিশেষ অধিকার দিয়ে গেছেন। এই থেকে মনে হয় যে, আর্য এবং আর্যেতর, বৈদিক এবং অবৈদিক জাতির ভাব ও কৃষ্টির সংমিশ্রণে অতি প্রাচীনকাল থেকেই জগন্নাথ-মন্দিরের উদার ভাবধারা চলে আসছে। এখানে বৈদিক এবং অবৈদিক—এই দুইভাবেই বিভিন্ন সময়ে দেবতার সেবা-পূজা করা হয়।

শবরেরা বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণ থেকেই জগন্নাথদেবের উদ্ভব হয়েছে; শ্রীকৃষ্ণই জগন্নাথ, এবং তারা সাত্বত-বংশোদ্ভূত ব'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিশ্ববসুর বংশধর দৈতপতিরা (দৈত অর্থাৎ দয়িত, প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণ যাদের পতি; প্রভু অর্থাৎ শবরেরা) এখনও জগন্নাথদেবের সেবা-পূজা নিজেদের ভাবেই ক'রে থাকে।

স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রা পর্যন্ত এবং রথের কয়েক দিন, জগন্নাথদেবের পূজা মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা করে না—শবরেরাই তাদের মতো পূজা করে। স্নানযাত্রার সময় দেবতাকে বাইরে এনে 'সুনা কুয়া' থেকে ১০৮ ঘড়া জল তুলে স্নান করানো হয়।

বৈদিক মতে প্রবহমান নদী, ঝরনা অথবা খোলা কুয়ার জল দিয়ে অভিষেক করা হয়। কিন্তু শবরেরা বদ্ধ জায়গার জল, যেখানে সূর্যের আলো পড়ে না, এমন জায়গার জলকে পবিত্র ব'লে মনে করে। মন্দিরের উত্তর দিকে 'সুনা কুয়া' সারা বছর ঢেকে রাখা হয়; কেবল স্নানযাত্রার সময় এই কুয়ার জল ব্যবহৃত হয়।

স্নানযাত্রার পর থেকে প্রায় ১৫ দিন জগন্নাথদেবের দর্শন বন্ধ থাকে। এই সময় দৈত-পতিরা নিজেদের ভাবে জগন্নাথদেবের সেবা-পূজা করে। তারা শবর-প্রথা অনুযায়ী নানা জিনিস দিয়ে জগন্নাথদেবকে ক্রমাগত সাজাতে থাকে। বৈদিক নিয়ম মতো মন্দিরে যে ভোগের ব্যবস্থা রয়েছে, সেই সময় সেই ভোগও হয় না। শবরেরা দেবতাকে ফল দিয়ে মন্দিরের মধ্যেই তারা সেই ফল-প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণের সখারা যেমন প্রথমে একটু ফল খেয়ে ভাল লাগলে তা শ্রীকৃষ্ণকে খেতে দিত, শবরেরাও অনেক সময় তাই করে। জগন্নাথদেবের প্রতি এদের ভক্তি ভালবাসা কোন বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকে না; স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের টানেই তার অভিব্যক্তি হয়।

রথের সময় যখন জগন্নাথদেবকে মন্দির থেকে রথে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দৈতপতিরা দেবতার বাহুতে গাছের পাতা, শিকড় ইত্যাদি বেঁধে দেয়, যাতে অপদেবতার দৃষ্টি তাঁর ওপর না পড়ে। অতি প্রিয়জনকে যেভাবে গলায় হাত দিয়ে নানা গল্প করতে করতে নিয়ে যায়, জগন্নাথদেবকেও দৈতপতিরা ঠিক সেইভাবেই রথে নিয়ে যায়। আবার রথ যখন চলতে আরম্ভ করে, তখন রথের সারথি অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে থাকে। শবরদের বিশ্বাস যে, এতে অপদেবতারা রথ বা দেবতার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের কাছে নানা আপদ-বিপদ থেকে রথ ও দেবতাকে রক্ষা করাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

প্রভাসে যদুবংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবার পর শ্রীকৃষ্ণ রাত্রির অন্ধকারে একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন। জড় শবর দূর থেকে গাছের পাতার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দেখে, হরিণ মনে ক'রে তীর ছুঁড়েছিল। সেই সর্বনাশা রাত্রি ছিল আষাঢ়ের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি। এখনও আষাঢ়ের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রিতেই জগন্নাথদেবের নবকলেবর অনুষ্ঠান হয় এবং সেই রাত্রিতেই দৈত-পতিরা মন্দির-সংলগ্ন 'কৈলি বৈকুণ্ঠে' পুরানো মূর্তি বিসর্জন দিয়ে নিজেরা ১০ দিন অশৌচ পালন করে। পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষকে ভগবন্মুখী করবার জন্য যিনি শ্রীকৃষ্ণ-রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে শবরদের কি সম্পর্ক, তা ইতিহাসের মাধ্যমে জানার কোন উপায় নেই; কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তীর মধ্য দিয়ে শবরেরা এখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রেখেছে।

মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিমলা দেবীর মন্দির রয়েছে। তন্ত্রমতে বিমলাকে ভৈরবী এবং জগন্নাথদেবকে ভৈরব বলা হয়। বিমলা দেবীর মন্দিরে দুর্গাপূজার সময় শাক্তমতে পূজা, এমন কি ছাগ বলিও হয়। এই পূজার সময় মন্দিরের পূজারীরা থাকে না। রাত্রিতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের দরজা বন্ধ হ'য়ে যাবার পর, শাক্তমতের পূজারীরা প্রাচীর ডিঙিয়ে বিমলা দেবীর মন্দিরে এসে পূজা, বলি, ভোগ নিবেদন ইত্যাদি ক'রে ভোর হবার আগেই চলে যায়। এই থেকে মনে হয় যে, এক সময় এখানে তন্ত্রমতের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তারই কিছু কিছু আচার-ব্যবহার এখনও মন্দিরে রয়ে গেছে।

জগন্নাথ-মন্দিরের আর একটি বিশেষ জিনিস হচ্ছে—ভোগের ব্যবস্থা। মন্দিরে যে ভোগ রান্না হয়, তার মধ্যেও বিশেষত্ব রয়েছে। যেখানে ভোগ রান্না হয়, সেখানে প্রত্যেক দিন প্রথমে হোম ক'রে

তারপর রান্না আরম্ভ হয়। রান্না হ'য়ে যাবার পর সূপকারেরা বাঁকে ক'রে, যা রান্না হয়েছে সব জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিয়ে যায়। জগন্নাথদেবের ভোগ নিবেদন হ'য়ে যাবার পর, সেই ভোগ আবার বিমলাকে নিবেদন করা হয় এবং তখনই তা মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। মন্দিরে প্রত্যেক দিন এক লক্ষ লোকের মহাপ্রসাদ রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে। মহাপ্রসাদকে অত্যন্ত পবিত্র বলা হয়; মহাপ্রসাদে কোন রকম ছোঁয়াছুঁয়ি এবং জাত-বিচারের বালাই নেই; বিভিন্ন জাতের লোক একই সঙ্গে বসে মহাপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে থাকে। কিন্তু ভোগ নিবেদনের আগে, সূপকার এবং পূজারীরা ছাড়া যদি কেউ সেই ভোগ মন্দিরে আনবার সময় অসাবধানতাবশতঃ ছুঁয়ে ফেলে, তবে সেই সমস্ত ভোগ ফেলে দিয়ে আবার নূতন ক'রে ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। একই সঙ্গে বৈদিক এবং অবৈদিক ভাবের মিশ্রণেই বোধ হয় এই-রকম প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে।

জগন্নাথদেবের মন্দিরে হিন্দুদের পাঁচটি বিশেষ দেবতা—নারায়ণ, শিব, গণেশ, সূর্য এবং দুর্গা—অধিষ্ঠিত আছেন। বিভিন্ন দেবদেবীর সমবায়ে জগন্নাথ-ভাবের ক্রমবিকাশ হওয়ার ফলে বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌর এবং শাক্ত—সকলের কাছেই জগন্নাথদেব হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। একই দেবতাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাদের নিজেদের নিয়মানুযায়ী পূজা করবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন মন্দিরেই পাওয়া যায় না।

ভারতের মর্মবাণী—অপরকে সাহায্য কর, অপরের ভাবকে গ্রহণ কর, শান্তি এবং মৈত্রীকে আশ্রয় কর—এই বাণীই জগন্নাথের ভাবধারায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। এখানে বহু ধর্ম, বহু জাতি, বহু সম্প্রদায়, তাদের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতি নিয়ে মিলিত হ'য়ে এমন এক নূতন ভাব-ধারার সৃষ্টি করেছে, যা সকলের পক্ষেই গ্রহণীয় এবং কল্যাণকর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় সকলকে আহ্বান ক'রে বলেছেন:

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত,
সব অপমান ভার।

কবি-মানসে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র ভারতের যে রূপ ফুটে উঠেছে, সেই সপ্রেম মিলনরূপই জগন্নাথক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলে সকলের সঙ্গে প্রেমে মিলিত হবার যে আদর্শ পুরীধামে রূপায়িত হয়েছে, পৃথিবীর আর কোথাও এভাবে আচরিত হয়নি; কিন্তু তা না হ'লে তো মানুষের মন থেকে হিংসা, দ্বন্দ্ব দূর হ'য়ে জগতে যথার্থ শান্তি আসবে না। তাই জগন্নাথ-সংস্কৃতির বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহু ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে বলেছেন যে, সব ধর্মই সত্য, সব ভাবের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একক জীবনে সাধনার দ্বারা যে সত্য লাভ করেছেন, পুরীধামে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য সাধক জগন্নাথদেবকে অবলম্বন ক'রে সেই সত্যেরই এক-একটা দিক্ অনুভব করেছেন। তাঁরা নিজেদের ভাবকে সত্য ব'লে জেনেছেন; কিন্তু অপরের ভাবও যে সত্য, সে-কথা জানতে পারেননি; কারণ তাঁরা কেবল মাত্র একটি ভাব নিয়েই সাধন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বলেছেন "সর্বধর্মস্বরূপিণে"। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন ভাবের সাধক তাঁর কাছে এসেছেন এবং তাঁরা সকলেই

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে তাঁদের আদর্শকে জীবন্তরূপে দেখেছেন। "সর্বধর্মস্বরূপিণে" বিশেষণটি জগন্নাথদেবের পক্ষেও প্রযোজ্য; কারণ অনাদি কাল থেকেই বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—সকলেই জগন্নাথদেবের মধ্যে তাঁদের নিজেদের আদর্শকেই অনুভব করেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগন্নাথদেবের দ্বিতীয় মূর্তি বললে অত্যুক্তি হবে না। বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক ভক্ত জগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন। শবরেরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে পুরীধামে এসে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি, জগন্নাথদেবকে লাভ করেছিলেন, সেই ভাবেই কি শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীরা পুরীতে জগন্নাথদেবের মধ্যে "যে রাম, যে কৃষ্ণ" সেই তাঁকেই দেখতে পান? তাহলেই প্রমাণিত হবে যে, জগন্নাথ-সংস্কৃতির পরিধি এখনও বেড়েই চলেছে।

বিবেকানন্দ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দরিপা

থে থে থে লঙ্গ রঙ্গ-ভঙ্গ
কে ঐ এলোরে কে এলো ঐ,
পদভরে ধরা টলমল করে
তাতা থৈ থৈ তা থৈ থৈ।
বিষাণে রণিত রণ-হুঙ্কার
কণ্ঠে উদার বাণী মাভৈঃ,
থে থে থে লঙ্গ রঙ্গ-ভঙ্গ
বিবেকানন্দ এসেছে ঐ॥

হৃদয়ের রাজা আমরা তোমাকে
হৃদয়াসনে বরিয়া লই
দীপ্ত তোমার ও দিব্য আননে
মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রই।
জীবে প্রেম ওরে ঈশ্বর-সেবা—
বহুরূপে রাজে কে তিনি বই?
বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
বিবেকানন্দ এসেছে ঐ॥

হর হর হর শঙ্কর তব
ডম্বরু-নাদে চকিত হই
গৈরিক ধ্বজা ঊর্ধ্বে উড়ালে
চৌদিকে তার কি রৈ রৈ।
তুমি বল দাও হে মহাতাপস
এ ধ্বজা বই যে শকতি কই?
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ
বিবেকানন্দ এসেছে ঐ॥

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

লণ্ডনে 'রয়াল কমন্‌ওএলথ্‌ সোসাইটি ফর দি ব্লাইণ্ড' (Royal Commonwealth Society for the Blind) নামে একটা অন্ধদের প্রতিষ্ঠান আছে। সেটা আমি দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানকার কর্তৃপক্ষের কয়েকজন আমাকে নামে জানতেন, কিন্তু কারুর সঙ্গে খুব পরিচয় ছিল না। নামে জানতেন এই কারণে যে, নরেন্দ্রপুরে আমাদের একটা অন্ধ-বিদ্যালয় আছে। আমি যখন নরেন্দ্রপুরে ছিলাম, তখন ওঁদের সঙ্গে আমার অনেক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল, নরেন্দ্র-পুরের শিক্ষকরা তাঁদের ওখানে স্কলারশিপ নিয়ে ট্রেনিং-এর জন্যে গেছেন। আমাকে তাঁরা খুব আদর যত্ন করলেন, ঘুরিয়ে সব দেখালেন। সত্যি সুন্দর প্রতিষ্ঠান—দেখে ভাল লাগল খুব। এ-সব দেখাশুনার পর একদিন কেম্ব্রিজ ঘুরে এলাম। কেম্ব্রিজ অনেক দূর আমাদের আশ্রম থেকে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মতিলাল (এঁর কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি) আমার কেম্ব্রিজ যাবার খবর দিয়ে দিলেন ডঃ জে. জে. লিপনার (Dr. J. J. Lipner) নামে কেম্ব্রিজের একজন অধ্যাপককে, আর আমাকে ব'লে দিলেন : 'আপনি কেম্ব্রিজে গিয়ে ডঃ লিপনারের সঙ্গে দেখা করবেন। উনি আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন।' শুনলাম, ডঃ লিপনার চেকোশ্লোভাকিয়ার লোক। ওঁর বাবা 'বাটা কোম্পানি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বোধ হয় বাটার 'ডেপুটি ম্যানেজার' ছিলেন এক-সময়। ডঃ লিপনার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিভিনিটি স্কুল' (Divinity School) বিভাগে আছেন। আসলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগেরই নাম হয়েছে 'ডিভিনিটি স্কুল'। আমাকে কেম্ব্রিজে নিয়ে গিয়েছিলেন ডঃ সুহাসরঞ্জন দাশগুপ্ত। ওঁরই গাড়ীতে ক'রে আমরা গিয়েছিলাম। সঙ্গে ওঁর স্ত্রী আর ঐ বাচ্চা মেয়েটি। 'ডিভিনিটি স্কুল'-এ পৌঁছলে একজন আমাদের নিয়ে গেলেন ডঃ লিপনারের কাছে। গিয়ে দেখি ভদ্রলোক উপনিষদের ক্লাস নিচ্ছেন। নিজের ঘরেই ক্লাস নিচ্ছেন। সাদর অভ্যর্থনা করলেন তিনি। বললেন : 'আমি খবর পেয়েছি আপনি আসছেন। খুব ভাল লাগছে, আপনি এখানে এসেছেন।' তারপর বললেন : 'স্বামীজী, আপনাকে একটা অনুরোধ ক'রব—যদি রাখেন খুব খুশী হব। আপনি আসছেন শুনে আজ বিকেল সাড়ে তিনটের সময় আমরা একটা সেমিনারের ব্যবস্থা করেছি। তাতে আমি আমাদের ছাত্রছাত্রী, গবেষক আর আমার সহকর্মী অধ্যাপকদের ডাকব —সেখানে আপনি বেদান্ত সম্বন্ধে বলবেন।' আমি বললাম : 'বেশ তো, ব'লব।' বিকেল সাড়ে তিনটের সময় সেমিনার শুরু হ'ল। বিষয়—বেদান্ত। অবাক হ'য়ে গেলাম ওখানকার ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং অধ্যাপকদের বেদান্ত সম্পর্কে পড়াশুনো এবং জ্ঞান দেখে। এত উঁচুস্তরের আলোচনা হবে, ভাবতেও পারিনি। খুব ভাল লাগল আমার এই সেমিনারে অংশগ্রহণ ক'রে। অনেকক্ষণ বলেছিলাম। অনেক প্রশ্নও ওঁরা আমাকে করেছিলেন। আমি যা বলেছিলাম, মনে হয়, ওঁদেরও ভাল লেগেছিল। কারণ, আলোচনার পর ডঃ লিপনার আমাকে বললেন : 'স্বামীজী, এর পরে আমরা ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটা সেমিনার

ক'রব। সেখানে আপনাকে ডাকব। আপনি আসবেন তো?' আমি বললাম: 'আসতে পারব কিনা জানি না, তবে সে তো আমার সম্মানের কথা—আমার সৌভাগ্য। আমি নিশ্চয়ই আসতে চেষ্টা ক'রব।'

আলোচনা হওয়ার পর ডঃ লিপনার খুব ভাল ক'রে কেম্ব্রিজের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন। দেখা-টেখা হ'লে—এতক্ষণ সব কথা ইংরেজীতে হচ্ছিল—এবার হঠাৎ তিনি পরিষ্কার বাংলায় ব'লে উঠলেন: 'এইবার চলুন, স্বামীজী, আমার বাড়ীতে, একটু চা-টা খাবেন আমি তো অবাক হ'য়ে গেছি। বললাম: 'একি, আপনি বাংলা জানেন দেখছি!' উনি বললেন: 'না জেনে উপায় কি বলুন? আমার যে বাঙালী স্ত্রী। বাংলা না জানলে কি বাড়ীতে খাওয়া জুটবে?' তারপরে বললেন, কে. সি. নিয়োগীর ভাইপোর মেয়ে ওঁর স্ত্রী। উনি আমাকে ওঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। নিশ্চয়ই আগে থেকে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। গিয়ে দেখি 'চা'-এর সঙ্গে যে 'টা'-র ব্যবস্থা হয়েছে, তা সত্যি সত্যি বাঙালীর 'টা'। আমাকে ডঃ লিপনার আগেই বলেছিলেন: 'স্বামীজী, আমার স্ত্রী একটা অপূর্ব জিনিস রান্না করেন, খেয়ে কিন্তু নিন্দে করতে পারবেন না।' আমি বললাম: 'কি জিনিস?' বললেন: 'পায়েস।' আমি বললাম: 'সে তো সত্যিই অপূর্ব জিনিস!' সেই পায়েস খেলাম—সুন্দর পায়েস! ডঃ লিপনারকে দেখলাম, সেই অপূর্ব পায়েসটি অনেকটা খেতে। আরও অনেক রকম খাবার ছিল—দেশী, বিদেশী দুই-ই। পুরো 'ডিনার'ই হ'য়ে গেল একেবারে! ডঃ লিপনারদের দুটি সন্তান, সুমির বয়সের কাছাকাছি। দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে সুমির সঙ্গে তাদের ভাব হ'য়ে গেল। এতক্ষণ কথা বলতে না পারায় তার প্রায় দম বন্ধ হ'য়ে এসেছিল। কারণ তার বাবা-মা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত, তার সঙ্গে কেউ কথা বলছিলেন না। আর কথা বলার বড় অন্তরায় ভাষা। কারণ, আগেই বলেছি, তার মা চান না যে সে ইংরেজীতে কথা বলে। বোধ হয় তাঁর বেশী আপত্তি আমার জন্যে। আমার সামনে আমরা সবাই বাঙালী হয়েও ইংরেজীতে কথা ব'লব তার জন্যে, এটা তাঁর অভিপ্রেত নয়। অথবা এমনও হ'তে পারে যে, সে বাংলা বলার অভ্যাস করুক, এটা তিনি চান। কিন্তু ফলে এই দাঁড়ালো যে, বেচারী সুমি আদৌ কথা বলতে পারে না। তাই লিপনারের সন্তানদের পেয়ে তার ভয়ানক স্ফূর্তি! তখন সে মুখরা। কত কথা যে সে তাদের বলতে লাগল! সে এখন তাদের অভিভাবক, তাদের সব শেখাচ্ছে, বোঝাচ্ছে। আমার একটা কৌতূহল—আমার সম্বন্ধে সে কি বললো তাদের! যাহোক, ডঃ লিপনারের বাড়ীতে চা এবং 'টা' খেয়ে আমরা অনেক রাত্রে বাকিংহামশায়ারে আমাদের বেদান্ত-কেন্দ্রে ফিরে এলাম।

লণ্ডনে থাকতে আমি আরও কয়েকটা দর্শনীয় জিনিস দেখলাম ঐ দাশগুপ্ত-পরিবারের সঙ্গে। আমাকে অনেকেই বলেছিলেন ওখানকার মাদাম তুসো (Madame Tussaud's) মিউজিয়ামের কথা। এই মিউজিয়ামটি বিশ্ববিখ্যাত। সেখানে মজা হচ্ছে নানারকম মোমের মূর্তি রয়েছে। এমন সজীব সব মূর্তি যে, কোন্‌টা মূর্তি আর কোন্‌টা সত্যিকারের মানুষ বোঝবার উপায় নেই। ওখানকার একজন লোক হয়তো আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি মনে করছি মূর্তি। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে, সে হয়তো আমার দিকে চেয়ে হাসছে। তখন বোঝা গেল মূর্তি নয়, মানুষ। আবার যাকে মানুষ মনে করছি, সেটি হয়তো মূর্তি। ঢুকতেই একটা জায়গায় একটা কাউণ্টার রয়েছে। দেখে মনে হবে, এখানে বুঝি টিকিট করতে হবে। আসলে নকল কাউণ্টার: কয়েকটি মূর্তি

বসিয়ে রেখেছে। কিন্তু এমন সজীব মূর্তি যে, দেখলে মানুষ ব'লে মনে হবে। সবাই এভাবে ঠকে এখানে। এখানে ইংল্যাণ্ড ও পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা শিল্পী, ক্রীড়াবিদ্ ও রাজনৈতিক নেতার মূর্তি আছে। কোন কোন মূর্তি নিখুঁত, কিন্তু কোন কোন মূর্তি উৎরোয়নি। ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি দেখলাম, মোটেই তাঁর মতো হয়নি। মিউজিয়ামে একটা ঘর আছে; তার নাম 'দি চেম্বার অব হররস্' (The Chamber of Horrors)। সেখানে দেখানো হয়েছে, মানুষকে কি-রকম পীড়ন করা হ'ত আগেকার দিনে। বীভৎস সব দৃশ্য! কিন্তু সব ঐতিহাসিক ঘটনা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে, অথবা লোভ বা হিংসার বশবর্তী হ'য়ে মানুষ মানুষকে কত কষ্ট দিয়েছে, তার সাক্ষ্য। আর একটা ঘর আছে—সেখানে লেখা আছে, 'আই লস্ট মাই হেড' ('I lost my head.')। ঐ ঘরে যে ঢোকে, ক্যামেরায় তার ছবি ওঠে। কিন্তু শুধু মাথার ছবিটা উঠবে, আর কিছু উঠবে না। আমারও শুধু মাথার ছবিটা তুলল। ধড় নয়, শুধু মুণ্ডুটা। যেন আমার মাথাটা কেউ কেটে নিয়ে দেখাচ্ছে। এইজন্য ঐ ঘরটার নাম: 'আই লস্ট মাই হেড' অর্থাৎ আমার মাথাটা যেন আমি সেই ঘরে ফেলে এসেছি। ছবিতে নিজের মাথা ঐভাবে দেখলে কি-রকম যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। বিশেষতঃ ঐ 'দি চেম্বার অব হররস্' দেখার পর।

এর পর আমি অক্সফোর্ডে গেলাম। ওখানে আমি তিন রাত্রি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হ'য়ে ছিলাম। অক্সফোর্ডে আমার দুটো বক্তৃতা করার কথা ছিল। আমার মনে হয়, প্রথম বক্তৃতায় আমি ভালই করেছিলাম। সবাই খুব পছন্দ করেছিলেন; আমারও ব'লে তৃপ্তি হয়েছিল। দ্বিতীয়টা, আমার মনে হয়, প্রথম বক্তৃতার মতো তত ভাল হয়নি। তবে ওঁরা অবশ্য ভালই বললেন। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর হয়েছিল। আমার তো ভয় ছিল, হয়তো ওঁদের খুশী করতে পারব না। বেশ ভাল ভাল সব প্রশ্ন, তবে খুব কঠিন প্রশ্ন কেউ করেননি। মনে হ'ল, উত্তরে ওঁরা খুশীই হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, দ্বিতীয় দিনে অক্সফোর্ডের যিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক—এক ইংরেজ ভদ্রলোক—তিনি আমাকে এমন কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, যেগুলি আমি তাঁর কাছ থেকে আশা করিনি। যেমন, আমরা সবাই জানি 'সত্য' বলতে সেই জিনিসই বোঝায় যা কিনা নিত্য, তিনকালেই যা সত্য। উনি সেটা মানবেন না। উনি বলছেন: 'নিত্য হ'তে হবে কেন? এই মুহূর্তে যেটা সত্য, পরমুহূর্তে সেটা সত্য নাও হ'তে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তের সত্যটাও সত্য।' আমি বললাম: "হাঁ, সত্য। তবে তা আপেক্ষিক সত্য। এইজন্য 'আপেক্ষিক' যে, এই মুহূর্তে তা সত্য। এই মুহূর্ত চলে গেলে তা আর সত্য নয়।' অথবা এই স্থানে তা সত্য, অন্যত্র নয়। স্থান-কাল নির্ভর বা বস্তু-ব্যক্তি নির্ভর সত্য সত্য নয়। আমরা হিন্দুরা তাকে 'সত্য' বলি না, বলি 'আপেক্ষিক সত্য'। কারণ, একটা বিশেষ স্থান, বিশেষ সময় ইত্যাদি দ্বারা সেটা সীমাবদ্ধ।" এইসব ব'লে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। দেখলাম তিনি চুপ ক'রে গেলেন। জানি না মানলেন কি না। এখানে দু-দিনই আমার বক্তৃতায় শ-খানেক শ্রোতা ছিল। সাধারণ শ্রোতা কেউ নন—ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপকরাই শ্রোতা।

অক্সফোর্ডের 'অল সোল্‌স্ কলেজে' (All Souls College) আমি ছিলাম। এই কলেজের কথা আমি আগে আমাদের বন্ধু ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজিত নাথ রায়ের মুখে অনেক শুনেছিলাম। উনি অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলেন। কেম্ব্রিজ আর অক্সফোর্ড দুটোই খুব ভালভাবে

ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কিন্তু আমার মনে হ'ল কেম্ব্রিজ যেন তুলনায় অনেক বেশী শান্ত জায়গা। অক্সফোর্ডের চেয়ে কেম্ব্রিজের পরিবেশটা যেন আরও ভাল। আমাকে কেউ কেউ ওখানে বললেন: 'অক্সফোর্ডে এখন কিছু কিছু কল-কারখানা ঢুকে গেছে। কাজেই কিছু কিছু বাইরের লোক সেখানে আছেন, যাঁরা শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত নন।' কেম্ব্রিজে কিন্তু দেখলাম তা নয়। দোকান আছে, বাজারও আছে। কিন্তু পুরো শহরটাই বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। শুধু কেন্দ্র নয়, পীঠস্থান। রাস্তা দিয়ে কত লোক যাচ্ছে—তারা হয় ছাত্র, নয় গবেষক অথবা শিক্ষক। একটা আলাদা পরিবেশ, একটা আলাদা জগৎ। কিন্তু অক্সফোর্ডে একটু অন্যরকম মনে হবে। তবুও Oxford is Oxford; তার আলাদা ঐতিহ্য। অক্সফোর্ডের পুরানো গির্জা, বিভিন্ন 'হল'—এ-সব দেখে অবাক হ'য়ে থাকতে হয়। দলে দলে লোক আসে অক্সফোর্ড দেখতে। বিভিন্ন দেশের লোক। অনেক ভারতীয়কেও দেখলাম। অবশ্য কেম্ব্রিজও অনেকে দেখতে যায়। ওঁরা আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন অল সোল্‌স্ কলেজের একজন 'ফেলো' (Fellow)-র ঘরে। সম্পূর্ণ ঘরটাই আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। সকালে-বিকেলে আমার চা-জলখাবার ঘরেই দিয়ে যেত। কিন্তু দুপুরের আর রাত্রের খাওয়ার জন্য আমাকে অল সোল্‌স্-এর ডাইনিং হলে যেতে হ'ত। সেই হলেই সমস্ত অধ্যাপক, ছাত্র, গবেষক খেতে যান। তাঁদের সাজসজ্জা, আদবকায়দা দেখে প্রায় মাথা ঘুরে যায়। ওখানে সকলকেই আলাদা গাউন প'রে ঢুকতে হয়। সেটা আবশ্যিক। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য ওঁরা ব্যতিক্রম করেছিলেন। আমাকে গেরুয়া পোশাকেই যেতে দিয়েছিলেন। সেখানে খাবার পরিবেশন করা হলেই খাওয়া শুরু করা যাবে না। প্রতিদিন একজনকে 'হেড অব্ দ্য টেবল' করা হয়। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাটিনে মন্ত্র পড়বেন, তারপর সবাই খেতে শুরু করবেন। আমাদের 'ব্রহ্মার্পণম্'-এর মতোই অনেকটা বলা যেতে পারে। নানারকমের খাওয়ার ব্যবস্থা, নানাপর্যায়ে খাওয়া। প্রথমে টেবিলে বসে খাওয়া হ'ল। তারপরে মিষ্টি খাওয়ার জন্য আর একটা ঘরে যেতে হবে; কফি খাওয়ার জন্য আর একটা ঘরে, সিগার খাওয়ার জন্য আর একটা ঘরে—এই-রকম ব্যবস্থা। আমি তো প্রথমে ঐ বিদগ্ধ পরিবেশে অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করছিলাম। কিন্তু আমাকে ওঁরা সবাই একটু বিশেষভাবে আদরযত্ন করেছেন। কেন করেছেন জানি না। আমাকে একেবারে 'হেড অব্ দ্য টেবল'-এর পাশে বসাতেন ওঁরা। একজন খুব প্রাচীন বিখ্যাত অধ্যাপক তো খুবই অনুরক্ত হ'য়ে পড়লেন আমার প্রতি। আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। আমি তখন খুব অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম। স্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা। ঐ হলে ডঃ অমর্ত্য সেনকেও দেখলাম। অবশ্য আমার চেয়ে অনেকখানি দূরে ওঁর আসন ছিল। তাই খাওয়ার টেবিলে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি; পরে কথা হ'ল। প্রথম দিন উনি আমাকে ওখানে দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন। আমার সঙ্গে ওঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। উনি এখন অক্সফোর্ডের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। সবাই ওঁকে খুব সম্মান করেন। শুনলাম উনি নাকি নোবল্ প্রাইজ পেতে পারেন। শুনে খুব গর্ব হ'ল আমার। অক্সফোর্ডে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম: ওঁদের একটু আত্মম্ভরিতা। আবার অন্যদিকে ছোট-বড় সবার সঙ্গে মেলামেশা করার একটা প্রবণতাও আছে। যেমন ঐ খাওয়ার টেবিলে আমার পাশেই বসেছিলেন ইতিহাসের এক বিখ্যাত অধ্যাপক। আর আমি তো ইতিহাসের—বলতে

গেলে—তেমন কিছুই জানি না। বোকার মতো আমি তাঁকে ইতিহাসের দু-একটা প্রশ্ন করছি। তিনি কিন্তু বেশ ধৈর্যসহকারে যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন। তাঁকে বললাম: 'আমরা শুনি, ভারতীয় চিন্তা গ্রীক চিন্তার ওপরে খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার শুনি, বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টধর্মের ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার এও শুনি যে, এক সময় ভারতবর্ষের মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল—এবং পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে। এ-সম্বন্ধে আপনার কি মত?' ভদ্রলোক বললেন: 'আপনি যা বলছেন সব ঠিক। এগুলি ঐতিহাসিক সত্য।' তাঁর বিনয়, ভদ্রতা, নিরহংকার দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। আমি অক্সফোর্ডে তিনদিন ছিলাম। এই তিনদিনের অভিজ্ঞতা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। অনেক কিছু দেখেছি এই তিনদিনে, শিখেছিও অনেক। বস্তুতঃ আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল: আমি এখানে শিখতে এসেছি। কি আর শেখাব? কাকে শেখাব? নানা লোকের সঙ্গে মিশেছি, কথাবার্তা বলেছি, তার ফলে আমিই ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্যার ইসাইয়া বার্লিন (Sir Isaiah Berlin)-এর সঙ্গে আলাপ করার। কলকাতায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রধান রবিন টোয়াইট (Robin Twite) তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন আমি যাচ্ছি ব'লে। স্যার ইসাইয়ার জন্ম রাশিয়ায়, কিন্তু এখন ব্রিটিশ নাগরিক। এমন বিষয় নাকি কম আছে যা তিনি জানেন না। অদ্ভুত বক্তা। মৌলিক চিন্তাবীর। প্রায় কিংবদন্তী-পুরুষ। ভারতবর্ষে কয়েকবার এসেছেন; ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাও আছে। তাঁর ঘরে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে তাঁর সঙ্গে একান্তে অনেক বিষয়ে কথাও বলেছি। এই সময়ে দেখলাম, অনবরত স্লিপ আসছে ওঁর কাছে। যাঁরা স্লিপ পাঠাচ্ছেন, তাঁরা সব ওঁর দর্শনার্থী। কিন্তু কাউকে ওঁর সঙ্গে তখন দেখা করার অনুমতি উনি দিলেন না। এতটা সময় শুধু একা আমার সঙ্গেই আলাপ করলেন। সত্যি এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হ'ল আমার। দেখলাম যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই উদার মন। কোনও বিষয়ে গোঁড়ামি নেই।

এখানে অধ্যাপক মতিলালের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। তাঁর জন্যেই আমার অক্সফোর্ডের আমন্ত্রণ। অক্সফোর্ডে অধ্যাপক মতিলাল সব সময় সঙ্গে থেকে আমার দেখাশোনা করতেন। তিনি শুধু একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতই নন, অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তিও। তিনি আমাকে অক্সফোর্ডের যা কিছু দ্রষ্টব্য সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে আমার জন্যে এক ভোজসভার ব্যবস্থা করলেন। অনেক বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। সবার মুখে এক কথা: 'এদেশে আর থাকা চলে না, এখানকার লোকদের ব্যবহার অসহনীয়।' ঠিক কথা, কিন্তু কি করবেন তাঁরা? প্রথমতঃ দেশে ফিরে তাঁরা পছন্দমতো কাজ পাবেন না। পেলেও, যে সুখ বা আরামের মধ্যে এখন আছেন, তা পেতে গেলে যে পরিমাণের উপার্জন চাই, তা দেশে তাঁদের হবে না কখনও। দ্বিতীয়তঃ—এবং এইটিই সব চেয়ে বড় সমস্যা—ছেলেমেয়েরা এদেশে আসতে চায় না। তারা মাতৃভাষা শেখেনি, আর-তাদের এদেশের জলবায়ু, খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক রীতিনীতি কিছুই ভাল লাগে না।

[ক্রমশঃ

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

'বলদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

পূর্ব সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯), ব্রহ্মের প্রধান সপ্তগুণের অন্তর্গত শেষগুণ, বা শ্রেষ্ঠগুণ ও তাঁর অন্যান্য সকল গুণের সমাহার 'সৌন্দর্যে'র অংশীভূত সপ্তমহাগুণের মধ্যে প্রথম দুটি গুণ 'মাধুর্য' ও 'ঐশ্বর্য' সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় সেই সপ্তমহাগুণের অবশিষ্ট চারটি গুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হচ্ছে।

ব্রহ্মের শৌর্য ও বীর্য: এই সপ্ত-গুণের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ গুণ হ'ল 'শৌর্য' ও 'বীর্য'। সাধারণতঃ 'শৌর্য' ও 'বীর্য'কে সমার্থক ব'লে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এস্থলে যখন এই দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত করা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে, তাদের মধ্যে প্রভেদও কিছু আছে। সেজন্য এক্ষেত্রে 'শৌর্যে'র অর্থ ধরা হয়েছে অন্তরের দিক থেকে মহাবীরত্ব এবং 'বীর্যে'র বাইরের দিক থেকে মহাবীরত্ব (ভাদ্র, ১৩৮৬ দ্রষ্টব্য)।

এ সম্বন্ধে পুনরায় নতুন ক'রে বিশদভাবে প্রপঞ্চনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ ব্রহ্ম যে সর্ব-শক্তিমান্, সে বিষয়ে সকলেই একমত। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।২।১) —এক ও অদ্বিতীয় ব'লে তিনি ব্যতীত আর অন্য কোন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নেই। সেজন্য তাঁরই পাশাপাশি তাঁর সমান অন্য কেহই নেই; তাঁর অপেক্ষা অধিক শক্তিধর আর কোন ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা অন্য কারো প্রশ্ন তো ওঠেই না এক্ষেত্রে। সেজন্যই উপনিষদে (কঠোপনিষদ্, ১।৩।১১) বারংবার বলা হয়েছে গভীর শ্রদ্ধাভরে :

'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥'

'পুরুষের অপেক্ষা আর শ্রেয়ঃ কিছু নেই ;
তিনিই শেষ, তিনিই পরমা গতি ॥'

'তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥'

(ঐ, ২।২।৮)

'কেহই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।'

'তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। নাতঃ পরমস্তীতি ॥' (প্রশ্নোপনিষদ্, ৬।৭)

পিপ্পলাদ ঋষি তাঁদের বললেন : 'এই পর-ব্রহ্মকে আমি এই পর্যন্তই জানি। এঁর অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছুই নেই।'

'দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥'

(মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।১।২)

'তিনিই দিব্য অমূর্ত পুরুষ।
বাহ্যাভ্যন্তরবর্তী জন্মবিহীন ॥
তিনিই প্রাণাদি-পঞ্চবায়ুবর্জিত, ইন্দ্রিয়-মনহীন।
শ্রেষ্ঠ অক্ষর থেকেও শ্রেয়ঃ চিরদিন ॥'

'তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥' (ঐ, ৩।২।৮)

প্রবহমান নদীসমূহ যেমন,
নামরূপ ত্যাগ ক'রে সমুদ্রে করে প্রবেশ,
'তেমনি নামরূপবিযুক্ত বিদ্বান্
শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেয়ঃ পুরুষে করেন প্রবেশ ॥'

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥'

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৬।৭)

'ঈশ্বর মধ্যে পরমেশ্বর তিনি,
দেবগণ মধ্যে দেবতা পরম।
পতিগণ মধ্যে বর পতি তিনি,
পরগণ মধ্যে তথা পরতম॥
ভুবনেশ্বর তিনি ত্রিভুবনবন্দিত।
তাঁরেই জেনেছি আমি, অতুল্যনন্দিত॥'

'ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥' (ঐ, ৬।৮)

'তাঁর শরীর ও ইন্দ্রিয় নেই;
তাঁর সমান ও অধিক দৃষ্ট হয় না কোনদিন।
তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি বিবিধ ব'লে বর্ণিত,
তাঁর জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক চিরদিন॥'

'ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥' (ঐ, ৬।৯)

'জগতে তাঁর কেহই প্রভু নেই,
নেই কোন নিয়ন্তা, চিহ্ন অনুমান-সাধক।
তিনিই সর্বকারণ, সর্বেন্দ্রিয়াধিপতিরও অধিপতি,
নেই তাঁর জনয়িতা, অধিপতি, চালক॥'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের স্বরূপের এই অত্যাবশ্যক দিকটিকে প্রকটিত করা হয়েছে দুটি সুন্দর বিশেষণ দ্বারা—'অসাম্যাতিশয়' এবং 'অনন্যসিদ্ধ'। যথা, শ্রীকৃষ্ণের 'অসাম্যাতিশয়ত্ব' সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে (৩।২।২১) উদ্ধব নারদকে বলছেন:

'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীট-কোটীড়িতপাদপীঠঃ॥'

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখেছেন—

'ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য, যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ'—ইত্যাদি 'যাঁর সমান অথবা অধিক কিছুই নেই'—ইত্যাদি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাঁর টীকায় একই কথা বলেছেন:

'ন বিদ্যতে সাম্যং কিমুতাতিশয়ো যস্য সঃ'—ইত্যাদি। 'যাঁর সমান কেহই নেই; অধিক তো আরোই নেই'—ইত্যাদি।

অতএব উপরের শ্লোকটির এরূপ অর্থ—

'শ্রীকৃষ্ণ তিনের অধীশ্বর—অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিলোকের; চিচ্ছক্তি-জীবশক্তি-মায়াশক্তি—এই ত্রিশক্তির; সত্ত্ব-রজস্-তমস্—এই ত্রিগুণের অধীশ্বর। তিনি পরমানন্দ রসঘন ব'লে তিনি আপ্তকাম, অথবা তাঁর সকল কামনাই আদ্যন্তকাল পূর্ণ হয়েই রয়েছে। সুতরাং তাঁর সমান কেহই নেই; এবং অধিকও যে কেহই নেই—তা বলাই বাহুল্য। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাগণ, স্থিতিকর্তা বিষ্ণুগণ, সংহারকর্তা রুদ্রগণ কিরীটযুক্তমস্তকে তাঁর পাদপীঠের স্তুতি করেন।'

পুনরায়—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ 'অনন্যসিদ্ধ' অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণরূপেই স্বনির্ভরশীল, বিন্দুমাত্রও মুহূর্তমাত্রও পরনির্ভরশীল নন।

সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪) বলা হয়েছে—

'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং
দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥'

'গোপীগণ কি অপূর্ব তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা নেত্রদ্বারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করছেন—যে রূপ অন্যত্র দুর্লভ; যা নিত্য নবরূপে বিলসিত; যা লাবণ্যের সারস্বরূপ; যা অসমোর্ধ্ব, অর্থাৎ যার সমানও নেই, অধিকও নেই; যা অনন্যসিদ্ধ, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, অপর থেকে প্রাপ্ত নয়; এবং যা ঐশ্বর্য যশ ও শ্রীর একান্তধাম অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয়।

ব্রহ্মের 'সৌকর্য': ব্রহ্মের 'সৌকর্য'কে উপরে উল্লিখিত সপ্ত মহাগুণের পঞ্চম গুণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

'সৌকর্যে'র অর্থ হ'ল—সহজ-সুলভতা। অর্থাৎ ব্রহ্মের নিকট সব কিছুই অতি সহজসাধ্য; কোন কিছুর জন্যই তাঁকে প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম করতে হয় না বিন্দুমাত্রও।

আমাদের নিকট যে কোন কর্মই বহু পরিশ্রম-সাধ্য ও প্রচেষ্টাসাধ্য—এমন কি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদির ন্যায় নিত্য কর্মও—তাদেরও পশ্চাতে রয়েছে আমাদের বহুবিধ জটিল দৈহিক প্রক্রিয়াদি। এতদ্ব্যতীত সাধারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মের কথা তো আমরা জানিই। সে-সব ক্ষেত্রে রয়েছে লক্ষ্য ও উপায় সম্বন্ধে কতই না চিন্তাভাবনা, কতই না প্রচেষ্টা-পরিশ্রম। কিন্তু সর্বজ্ঞ-সর্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে ঐ সবের স্থান কোথায়? তিনি অনায়াসে, লীলাভরে কৃপাভরে আনন্দ-সহকারে প্রীতি-সহকারে নিমেষে নিমেষে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, অসংখ্য জীব সৃষ্টি করছেন; তাদের ধারণ ক'রে স্থিতি করাচ্ছেন; তাদের সংহার ক'রে লয় ঘটাচ্ছেন; সৃষ্টির পূর্বে কর্মবাদানুসারে সেই সব অসংখ্য জীবদের তাদের স্বকৃত ও স্বেচ্ছাকৃত অসংখ্য অভুক্ত সকাম কর্মের সঙ্গে নির্ভুলভাবে সংযোগ স্থাপন করছেন; তাদের সাধনানুসারে তাদের মুক্তিদান করছেন; তাদের যথাযোগ্য শাসন করছেন; অসংখ্য সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সুশৃঙ্খলভাবে দৃঢ়হস্তে পরিচালিত করছেন।—

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥'
(কঠোপনিষদ্, ২।৩।২)

'সকল চঞ্চল বস্তু প্রাণ থেকে হ'য়ে নিঃসৃত,
প্রাণেই হয় সদাকম্পিত।
উদ্যত বজ্রের ন্যায় তিনি অতি ভয়ানক,
যিনি এরূপ জানেন তিনি অমৃত হন নিয়ত॥'

'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥'
(ঐ, ২।৩।৩)

'তাঁরি ভয়ে অগ্নি হয় প্রজ্বলিত,
তাঁরি ভয়ে সূর্য দেয় তাপ নিয়ত।
তাঁরি ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু
স্ব স্ব কার্যে হয় পরিচালিত॥'

এই ভাবের উল্লেখ সামান্য পরিবর্তিত অন্য ভাষায় পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়োপনিষদেও (২।৮)—

'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥'

সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদেও (৩।৮।৯) একই কথা বলা হয়েছে বিশদতর ভাবে—

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'—ইত্যাদি।

'হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হ'য়ে রয়েছে; দ্যাবাপৃথিবী বিধৃত হ'য়ে রয়েছে, নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সম্বৎসর বিধৃত হ'য়ে রয়েছে; শ্বেত পর্বত থেকে উৎপন্ন হ'য়ে প্রাচ্য নদীসমূহ যার যে দিকে গতি সে সেই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, মনুষ্যগণ বদান্যকে প্রশংসা করছেন; দেবগণ যজমানের ও পিতৃগণ দর্বীহোমের অনুগত হ'য়ে রয়েছেন।'

এরূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বহু কঠিন কঠিন কার্যও স্বীয় অনন্ত-অচিন্ত্য-গুণ-শক্তিবলে অনায়াসে সাধন করেন ব'লে, তিনি 'সৌকর্য' গুণধারী—সবই তাঁর নিকট অতি সহজ সরল সুলভ সুকর।

ব্রহ্মের 'সৌকুমার্য': উপরে উল্লিখিত, সপ্ত মহাগুণের মধ্যে ষষ্ঠ হ'ল 'সৌকুমার্য'। ঠিক পূর্বের 'সৌকর্যে'র মধ্যে রয়েছে অনেকখানি কঠিন ভাব, ভয়ের ভাব। সেই ভাবটিকেই যেন আমরা ব্রহ্মের প্রধান রূপ ব'লে মনে না ক'রে বসি—সেজন্য চিরসাবধানী বলদেব

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উত্থানপতনশীল রীতির মাধ্যমে (ফাল্গুন, ১৩৮৭ পৃঃ ৬৬) ঠিক তার পরেই এনে ফেললেন শ্রীভগবানের অতি কোমল, অতি ললিত, অতি স্নিগ্ধ দিকের কথা। যতই না হন তিনি সুকঠোর শাসক ও পরিচালক, তিনি অন্তরের অন্তস্তলে অতি কোমল, অতি নিকট, অতি আপন, অতি মধুর—সেজন্য শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভীতির নয়, প্রীতির; শাসনের নয়, আদরের; দূরের নয়, নিকটের। ঐ কথা পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে। (যথা, মাঘ, ১৩৮৮)।

'সৌন্দর্য' সম্বন্ধে প্রথমে উল্লেখ ক'রে পুনরায় 'সৌকুমার্য' বিষয়ে স্বতন্ত্র পুনরুল্লেখ এই কারণে করা হয়েছে যে, 'সৌন্দর্যে'র পাশাপাশি 'ঐশ্বর্য'কেও স্মরণ করা হয় সাধারণতঃ (ফাল্গুন, ১৩৮৮)। কিন্তু 'সৌকুমার্য' হ'ল একেবারে নির্ভেজাল, খাঁটি, পরিপূর্ণ কোমলতা, যার পাশে আর অন্য কিছুই নেই—একেবারেই। এইটিই বৈষ্ণব-বেদান্তসম্মত ব্রহ্মের প্রধান লক্ষণ।

ব্রহ্মের 'গাম্ভীর্য': উল্লিখিত ব্রহ্মের সপ্ত মহাগুণের শেষ গুণ হ'ল 'গাম্ভীর্য'—যে শব্দটির উল্লেখ বেদোপনিষদে নেই। এর অর্থ অবশ্য বোঝা কঠিন নয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্থির ধীর, শান্ত সমাহিত, অচঞ্চল অবিচলিত। আমাদের চঞ্চল করে কি? বিচলিত করে কি? উদ্ভ্রান্ত করে কি? তা হ'ল অতি নিশ্চয়ই আমাদেরই অপূর্ণ বাসনা-কামনা; স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ঘৃণ্য, ত্যাজ্য সাংসারিক বাসনা-কামনা। এরূপ বাসনা-কামনার তাড়নায় আমরা অতি চঞ্চল হ'য়ে পার্থিব লক্ষ্যের পশ্চাতে, বস্তুর পশ্চাতে মূঢ়বৎ, মত্তবৎ, অন্ধবৎ ধাবিত হই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে—

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥'
(মনু স্মৃতি, ২।৯৪)

'কামোপভোগের দ্বারা হয় না কাম
কোনদিন নিবৃত্ত।
আগুনে ঘি ঢালার মত,
হয় তা বরং বর্ধিত॥'

এরূপে যে বস্তু আমাদের সুখ দেবে ব'লে আমরা ভাবি, স্বভাবতই আমরা তা লাভ করবার জন্য সর্বক্ষণ অস্থির হ'য়ে বেড়াই। একই ভাবে যে বস্তু আমাদের দুঃখ দেবে ব'লে আমরা ভাবি, স্বভাবতই আমরা তা দূরে রাখবার জন্য পূর্ববৎ সর্বদা অস্থির হ'য়ে বেড়াই। এরূপ নিরন্তর অস্থিরতা, চঞ্চলতা, অধৈর্য, অশান্তি প্রভৃতির অপেক্ষা বিরক্তিকর, নৈরাশ্যজনক, দুঃখদায়ক আর কি হ'তে পারে?

সেজন্য বাসনা-কামনাহীন, আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত শ্রীভগবান্ অচঞ্চল, গম্ভীর, আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট, শান্ত, প্রয়াসবিহীন, উদ্যোগবিহীন, লক্ষ্যবিহীন, সাধনা-বিহীন—কারণ এ-সবের তো প্রয়োজনই নেই একেবারেই তাঁর ক্ষেত্রে—যেহেতু তাঁর অপ্রাপ্ত বস্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তো একটিও নেই; অপূর্ণ বাসনাও নয়। এই জন্যই তাঁর উদ্দেশে উপনিষদে (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, ৭) বিশেষ শ্রদ্ধা-ভরে বলা হয়েছে—

'শান্তং শিবমদ্বৈতম্।'
'তিনি শান্ত, মঙ্গলময়, দ্বৈতবিহীন।'

এইভাবে তাঁর সমগ্র স্বরূপ নিয়ে, তাঁর সকল গুণশক্তি নিয়ে, তাঁর সব যা কিছু আছে নিয়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ং জীবজগতে পরিণত হয়েও পদ্মপত্রে জলের মতো সাংসারিক-স্পর্শশূন্য, সম্পর্কশূন্য—নিত্যগমনশীল জগতেও একমাত্র স্থির ধীর গম্ভীর। এই তো তাঁর অনন্ত অচিন্ত্য মহিমা, গরিমা, মধুরিমা।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৮

ঈশ-মাতৃভাবে শ্রীমায়ের ধর্ম-সংস্থাপন 'তপস্'

দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বে জয়রামবাটী থাকা কালে সারদা সহানুভূতি-সম্পন্না প্রতিবেশিনীদের দুঃখ ক'রে বলতে শুনতেন যে, বিবাহিত জীবনে সন্তানহীনা থাকা এক অতি দুর্ভাগ্যের বা অলক্ষণের কথা। এমন কি শ্রীমায়ের জননী শ্যামাসুন্দরী প্রায়ই অনুশোচনা ক'রে বলতেন : "এমন পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম! আহা ঘরসংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হ'ল না ; 'মা'-বলাও শুনলে না।"[১১০]

শাশুড়ীর এই আক্ষেপ শুনে ঠাকুর একদিন বললেন : "শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না ; আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন, 'মা'-ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হ'য়ে উঠবে।"[১১১]

এ-সব কথা হামেশা শুনতে শুনতে নিজ মনে কি ভাব উদিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছেন :

"মেয়েদের কাছে কামারপুকুরে আর এখানেও খালি শুনতুম, ছেলের মা না হ'লে কোন কাজই সে মেয়েমানুষ করতে পারে না। বাঁঝা কোন শুভ কাজে এয়ো হ'তে পারে না। আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলুম। ঐ সব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে দুঃখু হ'ত—তাই তো একটা ছেলেও আমার হবে না? দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঐ কথাটা একবার মনে পড়ে। যেদিন মনে হওয়া—কাউকে কিছু বলিনি—ঠাকুর আপনা হ'তে বললেন, 'তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন-ছেলে দিয়ে যাব, মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষে পায় না। পরে দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা ব'লে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হ'য়ে উঠবে।"[১১২]

ঠাকুরের মহাসমাধির পরে এ শূন্যজগতে একান্ত সঙ্গীহীনা শ্রীমায়ের মনে যে ভাবের ফুট উঠত, সে সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন :

"যখন ঠাকুর চলে গেলেন, একা একা বসে ভাবতুম—তখন কামারপুকুরে রয়েছি—'ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে?' একদিন ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, 'ভাবছ কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এই-সব রত্ন-ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে মা-মা ব'লে ডাকবে।'"[১১৩]

তাঁর প্রসন্ন ঈশ-দৃষ্টির দাক্ষিণ্যে ঠাকুর শ্রীমাকে যে সত্যি-সত্যি মা আনন্দময়ী রূপে দেখতে পেতেন, এবং এটিই যে তাঁর সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব, তাঁর এই দর্শনকে তিনি মানবের ভাবী ধর্মসম্ভাবনার জন্য এবং অধুনা ধর্মসংস্থাপনের জন্য, এত মূল্যবান্ ব'লে জেনেছিলেন যে, তাঁর মানবীত্বের কোন ভাব-কুয়াশাকে তিনি আমল দেননি। বরং সাময়িক কুয়াশাচ্ছন্নতা থেকে উদীয়মানতাকে শ্রীমায়ের ও অন্যের সুমুখে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরে, আপন সাধন-বলে তার শাশ্বত সত্যতাও প্রমাণ করেছেন।

---

১১০ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৩৯

১১১ তদেব, পৃঃ ১৩৯-৪০

১১২ তদেব, পৃঃ ১৪০

১১৩ তদেব, পৃঃ ১৪০

এ হিসাবে ঠাকুরকে যেমন আমরা শ্রীমায়ের সাধনার ফলশ্রুতিরূপে পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি শ্রীমাকে ঠাকুরের সাধনার ফলশ্রুতিরূপে। তাঁরা কেহই ব্যক্তিগত একক সাধনার ফল নহেন।

এটি বুঝতে যেন আমাদের ভুল না হয় যে, ঈশ্বরের মাতৃভাব সাধারণ নারীর জৈব মাতৃভাবের সীমাহীন সম্প্রসারণ নয়। ঈশ্বরের মাতৃত্বে জৈবভাবের কোন আঁষটে গন্ধ নেই। এটি হ'ল আত্মভাবের অধিষ্ঠানে আপাত-অসমে সমদর্শন ও মোক্ষবর্ত্মে সার্বিক অভিকর্ষণ।

গলাকাটা 'তপিস্যে' করেও যে-সব রত্ন-ছেলে পাওয়া যায় না—তারা ও অন্ধকারে কিলবিল করছে এমন কীটসদৃশ লোকগুলি—সবাইকে, ঠাকুর শ্রীমায়ের লালনাঙ্গনে, ব্রতধারিণীর অপত্যদায়িত্ব-রূপে রেখে গেলেন। এমন ঘরে সকলকে সমপ্রেমে আধ্যাত্মিক ক্রমবর্ধমানতায় পরিপালন করা ও ক'রে চলাই ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি মুখ্য প্রকাশ।

এটি সংসারী মানবীতে সম্ভব নয়, সন্ন্যাসিনীতেও না—যা কেবল শ্রীমাতেই ঐতিহাসিক যুগে সম্ভব হয়েছিল। এই মাতৃভাবের প্রকাশ শ্রীঠাকুরে আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এ-ভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য শ্রীঠাকুর মা-কেই চিহ্নিত ক'রে রেখে গিছলেন। এর যে পূর্তি শ্রীমাতে সার্থক হ'ল, সেটিই হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার চরম ও পরম উৎকর্ষ, যাতে ক'রে 'এ মানবজমিন' আধ্যাত্মিক শস্য-শ্যামল হ'য়ে রয়েছে অনাগত কালের জন্যেও। কালের মাঠে-মাঠে, আমরা সে সোনার ফসল দেখে ধন্য হবার আশা রাখতে পারি।

ঠাকুর যেহেতু 'সব রত্ন-ছেলে' রেখে গেলেন মায়ের অঙ্গনে, যাদের উপর সংসারে ফিরে না গিয়ে সাধন করার, শিক্ষা দিবার ও লোকের দুঃখ দূর করার ভার দেওয়া রইল—সেই হেতু আক্ষরিকভাবে সন্ন্যাসী-সংঘের ভার শ্রীমায়ের উপর না থাকলেও আত্মিকভাবে ও আধ্যাত্মিক-ভাবে একটি নিয়ামক সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই থাকল। ক্রমে দেখা গেল যে, যদিও বিবেকানন্দ প্রমুখ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ সংঘ পরিচালনা করছিলেন, শ্রীমাই হলেন এর সত্যিকারের পরিপালয়িতা অধিকর্ত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী। রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ ক্রমে আবিষ্কার করলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাতে বর্তে আছেন। শ্রীমা তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে এমনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণে লুপ্ত করতে সক্ষমা হয়েছিলেন যে, তাঁর মাঝে জগন্মাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ্ম অবস্থিতির একটি অত্যাশ্চর্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপেও তাঁকে তাঁরা পেলেন।

অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপন করতে এসে তাঁর যন্ত্ররূপে এই যে সংঘটিকে রেখে গেলেন, শ্রীমায়ের মাঝে বিকশিত ঈশ্বরের মাতৃভাবই সে সংঘটিকে লালন-পালন ক'রে 'মানুষ' ক'রে তুলেছিলেন। এটি কাব্য-কথা নয়, আক্ষরিকভাবে গদ্য-সত্য।

সংঘের দৈহিক, মানসিক, বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি-ঋদ্ধি-সিদ্ধি সব কিছুতেই শ্রীমায়ের অবদান অমেয়। সংঘগঠন ব্যাপারে, যে-নরেনের কৃতিত্বের অবধি নেই, সে-নরেন জানতেন এই মহিমময়ী শ্রীমায়ের প্রজ্ঞাধারা সর্বদা সর্বথা অপ্রতিহত এবং তাঁর নিজের সমগ্র জীবনী-শক্তি মাতৃ-নির্দিষ্ট অক্ষরেখায় বিধৃত ও নিশ্চিন্ত।

স্বামীজী ভারত-পরিব্রজ্যায় নিষ্ক্রান্ত হবার প্রাক্কালে[১১৪] এবং বিশ্বধর্মমেলায় যোগ দিবার জন্য আমেরিকা যাত্রার পূর্বে, শ্রীমায়ের যে আশীর্বাদ চেয়ে পেয়েছিলেন, তার কি রক্ষণ-বীক্ষণ শক্তি, বিবেকানন্দ সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। যাঁকে মনে মনে প্রণাম ক'রে তিনি চিকাগোর ধর্মসভায় তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন,

১১৪ দ্রষ্টব্য : তদেব, পৃঃ ১৮২-৮৩

তিনিই হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিঘোষিত জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী—শ্রীমা। নহবতপীঠে তপস্যারতা অন্নপূর্ণার নিজের হাতে রাঁধা মোটা রুটি আর ছোলার ডাল নরেনের সত্তায় কি আধ্যাত্মিক পুষ্টি সঞ্চার করেছিল, তার দুরূহ হিসাবের চেষ্টা না-ই বা করা গেল।

ভগবানের মাতৃভাব কিভাবে শ্রীমায়ের লালন-ললিতা শক্তির মাধ্যমে এ সংঘকে পালন-বর্ধন ক'রে এসেছে, সে যেন একটি অলিখিত মহাকাব্য।

বেহিসেবি ভগবানকে একটু হিসেব শেখানোর ভার সব সময়েই গিয়ে পড়ে জগদম্বার উপর। কারণ তাঁকেই সৃষ্টির ক্রীড়ায়নে ঘর সামলাতে হয়। আর ইনি তো 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা!'

বেগে বিচ্ছুরিত মহাঈশশক্তিকে কেন্দ্রীভূত অবয়ব দান করতে কিভাবে শ্রীমায়ের অমোঘ ইচ্ছাশক্তির দ্যুতি ধ্যান-জ্ঞান-যোগ-কর্ম-তৎপর হয়েছিল, সেই প্রার্থনা-গীতিই রামকৃষ্ণ-সংঘের আদিকাণ্ড।

পূর্বে উল্লিখিত ঐ প্রার্থনায় শ্রীমা ঠাকুরকে বলেছিলেন: "আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে:

ক. তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়।

খ. ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে।

গ. আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে।

ঘ. এই জন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠে।"[১১৫]

শ্রীমায়ের এই হৃদয়-নিংড়ানো সরল সবল প্রাঞ্জল প্রার্থনা দ্বারা যুগধর্ম-সংস্থাপনার্থ যে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিগ্‌-দর্শন নির্ণীত হ'য়ে রইল, এই তত্ত্বটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। বৌদ্ধিক দিক থেকে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের 'সম্বন্ধ-প্রয়োজনের' কোন স্পষ্টতর ব্যাখ্যা আর কোথাও ব্যক্ত হয়নি, যেমন হয়েছে শ্রীমায়ের হৃদয়োত্থিত এই স্বতউদ্গীত প্রার্থনায়।

সংঘের জীবন-দর্শনে ব্যাবহারিক ও পারমার্থিকের এমন সশ্রদ্ধ সুসমঞ্জস সমন্বয়ও আর কোথাও পাওয়া যাবে না। "কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ"[১১৬]—ঠাকুরের নিজের কথা। বৈদিক ঋষিদের বাণীতে "অন্নং বহু কুর্বীত",[১১৭] "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ",[১১৮] "অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"[১১৯] এই-সব মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায় তো মনে হয়, অন্নের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক কলিকালে স্থাপিত হয়নি, যদিও কলিযুগে সম্পর্কটি প্রাণান্তিক হয়েছে! কাজেই যাতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি প'ড়ে যুগধর্মস্থাপনের ব্যাপারটাই মাঠে মারা না যায়, মায়ের প্রার্থনার চতুঃসূত্রীর প্রথম সূত্র: "তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব যেন না হয়।"

মায়ের প্রার্থনার দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে: "ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে।" "বাউলের দল এল, নৃত্যগীত করলে, চলে গেল, কেউ চিনলে না"—এ-সব রস-রহস্য-কথা, শুনতে মিঠে, কিন্তু ধর্মের চিঁড়ে এতে ভেজে না। অবতার তা ভাল করেই জানেন! সে-জন্যই যাবার আগে বাউলের দলের কর্তাকে সযত্নে হাটে হাঁড়িটি ভাঙতে হয়। বলতে হয়: এই দেখ আমি এসে গেলুম! মা তাৎপর্যতঃ বললেন: বাঃ, এই এলুম, এই চল্লুম, এ-সব চমক-চালাকি চলবে না। লক্ষ্মীটি, ভুলে যেও না,

১১৫ তদেব, পৃঃ ৩৫৯-৬০   ১১৬ রামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮২, পৃঃ ৭৭
১১৭ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌, ৩/৯   ১১৮ তদেব, ৩/২   ১১৯ তদেব, ৩/৭

অনেক ক'রে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীর ধারণ ক'রে তপস্যায়—জীবের পাপ হলাহল গ্রহণে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। এত ক'রে এসে, এত সহজে ঝট্ ক'রে তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না। বিদেহ হয়েছ সে তো উত্তম কথা। থাকার সুবিধে। হাটে হাঁড়িটি ভেঙে দেহেতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়! কিন্তু কোথাও যাওয়া চলবে না।

"ওরা সব তোমাকে, তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে থাকবে।" মনে পড়ে না কি, কৃষ্ণাবতারে বলেছিলে: "যাঁদের চিত্ত আমাতেই অর্পিত, যাঁরা মদ্‌গতপ্রাণ, এমন ভক্তগণ পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান, বল ও বীর্যাদিবিশিষ্ট আমার প্রসঙ্গ ও গুণকীর্তনাদি ক'রে পরমসন্তোষলাভ করেন। তাঁদের আর কোন অভাব থাকে না, তাঁরা পরম আনন্দ সম্ভোগ করেন।"[১২০]

কিন্তু তা কি তোমা বিনা সম্ভব? তাই তোমার যাওয়া হবে না। যাবে কোথায়? যাবে কি ক'রে? যেতে দিচ্ছে কে? "ওরা তোমাকে নিয়ে থাকবে"—এ-কথার তাৎপর্য স্পষ্ট। তোমাকে ওদের নিয়ে থাকতে হবে। ওরা তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। তোমার অভাবে তোমার ভাবে কি ক'রে থাকবে? তুমি ওদের নিয়ে না থাকলে, তোমার ভাব-উপদেশের রসপ্রাণ কি ক'রে সজীব থাকবে? তাই বাউলের দলের কর্তার নাচা-গাওয়া বন্ধ করলে চলবে না। এখন সে নাচা-গাওয়া না-হয় হোক 'হৃদি-বৃন্দাবনে', 'হৃদি-দক্ষিণেশ্বরে'; তাতে আপত্তি নেই। তুমি ওদের সবাইকে নিয়ে থাকবে। তখনই শুধু ওদের তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্র থাকা সম্ভব হবে। আর এরূপ থাকা থেকেই উদ্ভূত হবে ধর্ম-সৃজনী-সম্পন্না অজেয় অমেয় সংঘশক্তি, আর এই সংঘশক্তি হবে সর্বমঙ্গলা।

শ্রীমায়ের প্রার্থনার তৃতীয় সূত্রটি হচ্ছে: "আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে।" এটি শুধু আজকের নবযুগপ্রয়োজনের কথা নয়। যখন তুমি কৃষ্ণাবতারে এসেছিলে তখনও এ-কথাটি হয়েছিল:

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"[১২১]

"ঈশ্বর লাভ জীবনের উদ্দেশ্য"—এ মহাবাক্যে সকলের জীবনের লক্ষ্য চিরতরে নির্ণীত হ'য়ে আছে। যতদিন এই লক্ষ্যাভিমুখে জীবনের সকল চিন্তা ও চেষ্টা নিয়মিত না হয়, ততদিন "তপ্তজীবনম্"। কিভাবে সকল চিন্তা ও কর্মকে এই লক্ষ্যে সংযুক্ত করতে হবে? ঠাকুর সাবধানী বাণী উচ্চারণ ক'রে গেছেন: "সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তাদের সংসার ত্যাগ নয়।"[১২২] এরূপ লোকই তো সংসারে বেশী। তারা কি করবে? যাঁরা ভোগান্তে ঈশ্বরকৃপায় সংসার ত্যাগ ক'রে বস্তুলাভান্তে আনন্দময় হ'য়ে যুগাবতারের লীলা ও বাণীর ভারী হ'য়ে সংসারের বাইরে বিরাজ করছেন, তাঁদের কাছে এরা যাবে ও ঠাকুরের বাণীর আলোকে জীবন উদ্দীপ্ত ক'রে শান্তি পাবে।

শ্রীমায়ের প্রার্থনার চতুর্থ সূত্রটি হচ্ছে: "এই জন্যই তো তোমার আসা।" তোমার এই কারণে আসাটুকুই, আর্ত-জিজ্ঞাসু-অর্থার্থী-জ্ঞানী সকল জীবেরই আশা-ভরসা। তোমার আসা ক্ষণেকে বিদ্যুৎ চমকানো নয়; চিরকালের অনন্তমেয় সূর্যোদয়। [ক্রমশঃ]

১২০ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১০, ৯

১২১ শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, গোপীগীতা,

১২২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পঞ্চম ভাগ, ১৩৭৫, পৃঃ ৩১

বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

৫ই আগস্ট, ১৮৮২—৫ই আগস্ট, ১৯৮২—একশো বছর পূর্ণ হ'ল। বিশ্বমনা দুই মহামানব—বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ একশো বছর আগে শ্রীম বা মাস্টারমশাইয়ের শুভ প্রচেষ্টায় কলকাতায় বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে ওই একটি দিনই মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু লিপিকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সে সাক্ষাতের যে বিবরণ 'কথামৃতে'র তৃতীয় ভাগে রেখে গেছেন অনুলেখন হিসাবে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু বিশ্বসাহিত্যে বিরল। দুটি মহাপ্রাণের উদাত্ত মিলনসংগীত চিরকালের মতো যাঁর অমর লেখনীতে বিধৃত, তাঁর উদ্দেশে সর্বাগ্রে প্রণাম।

Vini Vidi Vici—এলাম, দেখলাম, জয় করলাম—এমন জয় সচরাচর ঘটে না। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা এই জয়ীর ভূমিকা। জয়ী, কিন্তু অন্য পক্ষকে পরাজিত না ক'রে জয়ী। বিদ্যাসাগরের অনন্য কর্মসাধনার অন্তরালে যে অধ্যাত্মপ্রেরণার নিহিত সম্পদ, তার মহামূল্য সম্বন্ধে সেদিনের শ্রোতাদের (তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর প্রধান), ও ভবিষ্যতের জিজ্ঞাসুদের সচেতন ক'রে দিয়ে দর্শনপ্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ এ সাক্ষাৎকারের আদি ও অন্তে অনন্য একক বক্তা। আর বিদ্যাসাগর—তাঁর প্রায় নীরব, সুভদ্র, শ্রদ্ধানত আচরণে মহৎ আবির্ভাবের সামনে মৌন থাকার সময়োচিত মহিমায় পাঠক-চিত্তে আদর্শ শ্রোতা। বক্তা ও শ্রোতা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর—এ দুর্লভ মণিকাঞ্চনযোগ বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ, বাংলার নব-জাগরণের প্রতীকী ঘটনা।

উনবিংশ শতাব্দীর দুই বিস্ময়কর মহাপুরুষকে প্রতিদিনের পরিচয়ে একান্ত সান্নিধ্যে দেখার সৌভাগ্য শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন। কালের অনন্ত প্রবাহে কচিৎ যে চিরমুহূর্তগুলি রচিত হয়, তারই একটি অমল হীরক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগরের আলাপচারী। এ দুই চরিত্রের ভাষা ও ভাব-অবলম্বনে যে নাট্যসুষমার সৃষ্টি শ্রীম করেছেন, তা কল্পিত নয় বলেই এত প্রাণবন্ত, অভিনয়ের প্রশ্ন নেই বলেই এমন স্বতউৎসারিত।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)।

"বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান! (হাস্য)।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য)। তুমি ক্ষীর সমুদ্র! (সকলের হাস্য)।

"বিদ্যাসাগর—তা বলতে পারেন বটে। [বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন]। [ঠাকুর কথা কহিতেছেন]।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই।"

আমরা ইচ্ছে ক'রে উপরে উদ্ধৃত অংশ নাটকের অনুসরণে সাজিয়ে দিলাম। পাঠক যে মহানাটকের সংলাপ শুনছেন (বা পড়ছেন), তা যেমন দীপ্তবুদ্ধির স্ফুলিঙ্গকণা, তেমনি দুটি চরিত্রের নিজস্ব দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনরূপ নাটকের এই বুদ্ধিসমুজ্জ্বল দৃশ্যটির আগে শ্রীম বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা ক'রে পাঠকচিত্তকে এইভাবে প্রস্তুত করেছেন—

(১) কামারপুকুর এবং বীরসিংহ—এ দুটি

গ্রাম কাছাকাছি হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগরের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও দয়া সম্বন্ধে দক্ষিণেশ্বরে এসে বিশদভাবে জানতে পারেন। বিদ্যাসাগরের স্কুলেই মাস্টার-মশাই পড়ান জেনে বিদ্যাসাগরকে দেখার ইচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল হয়।

বিদ্যাসাগরের জিজ্ঞাসার উত্তরে মাস্টারমশাই শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিচয়ের অন্যান্য কথার সঙ্গে বললেন, "কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই.—তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশি তাঁরই চিন্তা করেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিচয় কারুর কাছে দিতে হ'লে এই সবচেয়ে বড়ো কথা। তারপর শ্রোতার মানসিকতা ও গ্রহণক্ষমতা বুঝে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ গভীরতর হ'তে পারে। তবে এই দিনটিতে বিদ্যাসাগরের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ আপন প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও আলাপচারীর দ্বারাই সবচেয়ে বেশী আত্মপরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বর-প্রসঙ্গে সংশয়ী বিদ্যাসাগরের কাছে একমাত্র ঈশ্বরতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপ্রকাশ!

(২) বিদ্যাসাগরের বাড়ীর, বিশেষ ক'রে বৈঠকখানার সবিস্তার বর্ণনায় মানবপ্রেমিক দরিদ্রবান্ধব বিদ্যাসাগরসত্তার বিদ্যাচর্চারও কিছুটা আভাস। গাড়ী থেকে নেমে শ্রীরামকৃষ্ণ বুক-খোলা জামার দিকে ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞাসা করছেন, "বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না?" উত্তরে মাস্টারমশাই বোঝালেন, "আপনার কিছুতে দোষ হবে না।"

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথোপকথন শুরু হওয়ার একটু আগে শ্রীম বিদ্যাসাগরের গুণবর্ণনা করেছেন—"বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম—বিদ্যানুরাগ। একদিন মাস্টারের কাছে এই বলতে বলতে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কৈ তা হ'ল! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।' দ্বিতীয়—দয়া সর্বজীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়া-ছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না—ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়—স্বাধীনতা-প্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত না হওয়াতে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ—লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড়োভাতের কাপড় বগলে ক'রে এসে উপস্থিত। পঞ্চম—মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আসো তা হ'লে আমার ভারী মন খারাপ হবে,—তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া উপস্থিত! বললেন—মা, এসেছি!"

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের যে গুণগুলি শ্রীম-কে সব থেকে আকৃষ্ট করেছে, সেগুলির বিবরণ আমরা পেলাম। বিদ্যাসাগরের কাছে আসতে আসতে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তাও লক্ষণীয়।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী থেকে ঠিকাগাড়ীতে রওনা হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ক্রমে বাদুড়বাগানের কাছে এসেছেন এতক্ষণ 'বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প' করছিলেন গাড়ী আমহার্স্ট স্ট্রীটে এলে তাঁর ভাবান্তর দেখা গেল। 'যেন ঈশ্বরাবেশ

হইবার উপক্রম।'

গাড়ী যখন রামমোহন রায়ের বাগানবাড়ীর পাশ দিয়ে চলেছে, তখন মাস্টারমশাই সেদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে বিরক্ত। বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে এসে পৌঁছবার আগেই তিনি 'ভাবাবিষ্ট'।

এইবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা অনুধাবন করতে পারি। তাঁর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় ঈশ্বরচেতনা। তারপরেই—বৈশিষ্ট্য গুণগ্রাহিতা। যাঁরা ত্যাগী ভক্ত তাঁদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ, আবার যাঁদেরই কোন বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য—তাঁদের মধ্যেও ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত —এই জ্ঞানে তিনি তাঁদের বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতেন। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী —এঁদের সঙ্গে তিনি নিজে থেকে দেখা করেছেন। বিদ্যাসাগর এই শ্রেণীর ধর্মানুরাগী না হলেও অশেষ গুণের অধিকারী বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন।

তখনকার কলকাতায় গাঁয়ের মানুষেরা কালীঘাট, চিড়িয়াখানা ঘুরে বিদ্যাসাগরকে দেখতে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিদ্যাসাগরকে দেখতে গেলেন তখন অবশ্যদ্রষ্টব্যের তালিকায় অনন্য একজনকে দেখতেই গিয়েছিলেন। কিন্তু সব-ক্ষেত্রেই তাঁর লক্ষ্য ঈশ্বরদর্শন—বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তিনি 'ঈশ্বরাবেশে মত্ত' হ'য়ে আলাপমগ্ন। কথামৃতে তাঁর যত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ—তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনার আগে ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেঞ্চে বসতে যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগরের সাহায্যপ্রার্থী একটি ছোকরাকে দেখে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বলছেন, "মা! এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার অবিদ্যার সংসার! এ অবিদ্যার ছেলে!"

আর একটি ভক্ত ছেলের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের কাছে উল্লেখ করলেন, সামনে উপবিষ্ট সেই ছেলেটি সম্বন্ধে তিনি বললেন, "এ ছেলেটি বেশ সৎ, আর অন্তঃসার যেমন ফল্গুনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়!"

লোকচরিত্রের ব্যাপারে সদসৎ-বিচার এই সামান্যক্ষণের মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। অনুক্ষণ ঈশ্বরতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। সে আলোচনায় যাবার আগে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের ভাবজগতের মিল-অমিলের আরো কিছু দিক লক্ষ্য করতে পারি।

বিদ্যাসাগর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনেই মাতৃভক্ত। বিদ্যাসাগর কাশীতে বাবা-মার সেবা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কারণটি মানবিক। কিন্তু পিতৃমাতৃ-সেবাকে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ মনে করেছেন। এমনকি বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাদর্শনও প্রয়োজন মনে করেননি।

অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে সেই জগতের মা-ই জন্মদায়িনী জননীরূপে এসেছেন। তাঁর সব সাধনা ও ভাবোন্মাদনাসত্ত্বেও তিনি মায়ের সেবায় কখনো অমনোযোগী হননি। দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছটিতে এনে নহবতখানার উপরে রেখে দিয়েছেন। সহধর্মিণীর দ্বারা সেবাযত্নের সব বন্দোবস্তই করেছেন। প্রয়াণ-কালে মায়ের অন্তিম কাজেও তাঁর সমান যত্ন। এই মাকে কাছে রেখেই তাঁর অধিকাংশ সাধনা।

সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা—এ দুটি ভগবানলাভের আবশ্যিক শর্ত ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধারণা। বিদ্যাসাগর-চরিত্রেও অনেক পরিমাণে এ দুটি গুণের সমাবেশ। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো অতটা একনিষ্ঠ সত্যের সাধনা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণেশ্বরে যাবেন বলেও যে যাননি,

সে অনুযোগ শ্রীরামকৃষ্ণদেবই করেছেন। শুধু অন্তরে নয়, বচনেও সত্যরক্ষা—এই তাঁর আদর্শ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মনে করতেন, জগতের মূল কারণ ঈশ্বরকে জানলেই যথার্থ জীবসেবা সম্ভব। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্বন্ধে অনিশ্চিত, ইহজগৎকে যথাসম্ভব সর্বজনের স্বর্গোপম ক'রে তুলতে আগ্রহী। তাই তাঁর এত দয়া, এত দান। এ দানের পিছনে যে করুণার্দ্র হৃদয়টি আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সে হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। কিন্তু শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে-প্রেরণা তিনি 'নরেন্দ্র' বিবেকানন্দকে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত পার্থক্য।

দানের ক্ষেত্রে অন্নবস্ত্রের অভাবপূরণের কথাই সর্বাগ্রে মনে জাগে। কিন্তু দেখা যায়—ওই অভাব পূরণ হ'য়ে গেলে মানুষের মনোজগতের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবী এসে দেখা দেয়। ফলে যার খেয়ে প'রে মানুষ হয়, তার বিরুদ্ধেই মানুষের সব থেকে বেশী অভিযোগ দেখা দেয়। অকৃতজ্ঞতার আসল কারণ, দেহের অভাব-পূরণ হ'য়ে মনের অভাব যখন দেখা দিয়েছে, তখন সেই দাবী পূরণ করতে না-পারা।

তাছাড়া নির্বিচার দান গ্রহীতাকে যত ছোট করে, তত আর কিছুতে নয়। অন্যের সাহায্য নিতে নিতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে মানুষ ভুলে যায়। তখন সাহায্যকারীর কাছে ভিক্ষার বদলে দাবীর বহর বাড়তে থাকে। এজন্য যথার্থ পরোপকারী খেয়াল রাখেন,যাতে দানগ্রহণকারীর নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নষ্ট না হয়। যার আত্মবিশ্বাস জেগেছে, সে একদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অন্যকেও সাহায্য করতে পারবে। তা না হ'লে অপাত্রে দান সমাজের ক্ষতিও কম করে না।

দাতার মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও দানের ব্যাপারটি বিচার্য। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দানের দ্বারা অন্যের উপর প্রভুত্ববিস্তারের আকাঙ্ক্ষা জাগে। নিষ্কামচিত্তে দান করতে না পারলে দানের অহঙ্কার ক্রমে দাতার মনে মানুষের কাছে নানা প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। আর সে-সব প্রত্যাশা পূরণ না হ'লে মানুষের প্রতি অবিশ্বাস এসে যায়। ভেবে দেখলে খুব কম মানুষই চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকতে পারে। একবার দান গ্রহণ ক'রে চিরকাল মাথা হেঁট ক'রে থাকবে, এমন আশাও বাতুলতা। আমাদের অধিকাংশ দাতার মনস্তত্ত্ব কিন্তু এই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই 'জীবে দয়া'-র বদলে 'জীব-সেবা' কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। অন্যের সেবার অধিকার পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞ হবে, সেবাকে নিজের অহঙ্কার চরিতার্থ করার উপায় মনে করবে না—এই ভাবটি মনে থাকলে সেবা-ধর্মই ঈশ্বর-সাধনার উপায় হ'য়ে ওঠে।

'দয়া' বা 'সেবা' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যটুকু মনে রেখে আমরা একালের ধর্মচেতনার দিক থেকেও তাঁদের সাক্ষাৎকারের বিষয়টি ভেবে দেখতে পারি।

সেকালে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্ম-বিরোধিতাকেই প্রগতির চরম ব'লে মনে করতেন। (অবশ্য অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের সমালোচনা সমানভাবে দেখা দিলে তথাকথিত 'প্রগতি'র স্বরূপটি বোঝা যেত।) একালের প্রগতিবাদীদের মধ্যেও ধর্মসম্বন্ধে অবজ্ঞা বা অনীহা একটি আবশ্যিক লক্ষণ। বলা বাহুল্য, ধর্মাচরণ ও সামাজিক আচারবিচারের দুস্তর ব্যবধানই এর মূলে। কেমন ক'রে যুক্তিবাদী মানবপ্রেমিক হয়েও পরমসত্যের অনুসন্ধানী সাধক হওয়া যায়, সে-কথা অনেকেই ভাবতে পারেন না। প্রগতি সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণায় অবিশ্বাসী হওয়ার আদর্শই প্রাধান্য লাভ করেছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একালের প্রগতিবাদীদের অত্যুৎসাহের কারণও এইখানে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরোপকারের

আদর্শ এই প্রগতিবাদীরা কতটা মেনে চলেন? অধিকাংশেরই বিদ্যাবুদ্ধি নিজ নিজ পরিবার-পরিমণ্ডলীর উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ। বিদ্যাসাগরের মতো সব শ্রেণীর দীনদুঃখীর প্রতি এমন অকাতর ভালোবাসা এক বিবেকানন্দের জীবনেই প্রত্যক্ষ করা যায়। অথচ ঈশ্বর-চেতনার সিদ্ধসাধকরূপে বিবেকানন্দ এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক!

নিষ্কাম জীবসেবা ও সেবাযোগে সাধনা—এ দুয়ের যোগসূত্রটি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিদ্যাসাগরের প্রভাবে বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শেই মিলিত হ'তে দেখি। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের আদর্শকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণমহিমার পরেই স্থান দিতেন। তাঁর মতে, সমকালীন উত্তরভারতে এমন একটিও শিক্ষিত লোক ছিল না, যে বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। বিদ্যা-সাগরের মনুষ্যত্ব, করুণা, কর্মশক্তি, সাহসিকতা—এ সবই বিবেকানন্দের মতো মহামানবের কাছে শ্রদ্ধেয় আদর্শ। কিন্তু মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে আত্মসত্যের উপলব্ধি না থাকলে পরোপ-কার বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায়। জগতে বাসনারও শেষ নেই, উপকারের আশারও অন্ত নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণসাধনার বাণীবিগ্রহ শ্রীশ্রীমা বলতেন, ভগবানের কাছে নির্বাসনাই চাইতে হয়। মানুষের মনোজগৎটি কত উচ্চস্তরে উন্নীত হ'লে এই নির্বাসনার প্রার্থনা সম্ভব, সে-কথা শুধু অনুমানই করা যায়। তবু দেখা যায়, মানবজীবনের পূর্ণতা আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তিতে নয়, নির্বাসনা ও শান্তিতে। মানুষের সেবা ও ঈশ্বরের সাধনা, দীনদুঃখীর প্রতি দয়া আর দীনদুঃখীকে জীবন্ত ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা—এ দুই আদর্শের এক অপূর্ব সামঞ্জস্য বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত নবযুগের ধর্মাদর্শে নানাভাবে প্রকাশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঈশ্বরতন্ময়তার আলোকে বিদ্যাসাগরকে দেখা পৃথিবীর ইতিহাসে একান্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা। দিনে দিনে আমরা এ ঘটনার তাৎপর্য অনুভব ক'রব।

'কথামৃতে'র দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমতী অভয়া দাশগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ কে? কি তাঁর পরিচয়? এই প্রশ্ন ১৩১৩ সালে স্বরাজ পত্রিকাতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ। —রামকৃষ্ণ কে। কে তাই জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে, এই সোনার বাংলায় এমন সোনার চাঁদ—গোরাচাঁদের পর—আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই। আহা—তাঁহার ভাগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল।"—এর কয়েক বছর পরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীসারদা দেবীর মুখেও আবার শুনতে পাই: "হাজরা ঠাকুরকে বলেছিল, 'আপনি নরেন-টরেন ওদের জন্য অত ভাবেন কেন? তারা আপনার মনে খাচ্ছে দাচ্ছে, আছে। আপনি ভগবানের চিন্তায় মনস্থির করুন। আপনার আবার মায়া কেন?' ঠাকুর তার কথামত সব মায়া কাটিয়ে ভগবানে মন লীন করলেন। দাড়ির চুল, মাথার চুল এমনি (দেখাইয়া) সোজা হ'য়ে কাঁটা দিলে—কদম ফুলের মতো। একবার ভাবো দেখি, সে লোকটি কি ছিলেন।"

এই সব উক্তি থেকে বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এক আলাদা জাতের মানুষ। এই মানুষটির সঙ্গে পরিচয় করালেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার 'শ্রীম'। 'শ্রীম' অথবা 'মাস্টারমশাই' এই নামেই

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সর্বত্র পরিচিত। শুধুমাত্র ভারতবাসীর কাছে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত রূপটি তুলে ধরেছে এই শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। আবার শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়: "এই যে মাস্টারমশাই—এরা কি কম লোক গা? যত কথা সব লিখে নিয়েছে। কোন্ অবতারের ছবি আছে, বা কথাবার্তা এই-রকম ক'রে লেখা আছে?" কথামৃত যেন একটি দর্পণ, এই দর্পণে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি, মুগ্ধ নয়নে দেখি। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের কোন জীবনী লিখে রেখে যাননি, কোন পত্র-পত্রিকাতে তাঁর সম্পর্কে কোন প্রবন্ধও লেখেননি, শুধু রেখে গেছেন তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের দিনগুলির স্মৃতিলিপি। তাতে পাওয়া যায়—বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সব, আর পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য চিত্র, নানা ভঙ্গীতে, নানা অবস্থায়, এ যেন ছবিতে ঠাসা এক আর্ট গ্যালারী। ১৮৮২ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে প্রথম, শেষ সাক্ষাৎ ১৮৮৬ খৃঃ আগস্টে। এই অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কত ছবি তুলে রেখেছেন শ্রীম। আর কী সব সজীব ছবি! প্রথম সাক্ষাতের বিবরণেই পাই এর এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

"গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে।…সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন, এক ঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন। মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে।…মাস্টার অবাক হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, 'আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।'…মাস্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, 'এ সৌম্য কে?'—যাহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে—বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?—কি আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, 'আবার এসো!' কাল কি পরশু সকালে আসিব।" আমাদেরও মনে প্রশ্ন জাগে, "এই সৌম্য কে?"—কৌতুহলাক্রান্ত হ'য়ে কথামৃতকার মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে আমরাও যেন সেই গঙ্গাতীরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হই আর শুনতে পাই এই মানুষটির আহ্বানবাণী—"আবার এসো।" এমন আন্তরিক অহেতুক ভালবাসার আহ্বান মর্মে প্রবেশ করে। এখানেই শ্রীম-র কৃতিত্ব। যে সৌম্য মানুষটি এই গ্রন্থের সূচনা, শ্রীম-র যোগ্য গ্রন্থনায় এবং পরিবেশনায় সেই সৌম্যকে যেভাবে পাই আর কোন গ্রন্থে তা পাই না। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে, তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের স্থান অতুলনীয়। কথামৃতকার শ্রীম কথামৃতে অবলুপ্ত। একজন লেখকের পক্ষে এ-সংযম দুর্লভ। কথামৃত-সৌরমণ্ডলের সূর্য শ্রীরামকৃষ্ণ, আর সব গ্রহ যেন নিষ্প্রভ, কিন্তু সবচেয়ে নিষ্প্রভ শ্রীম নিজে; তবে স্বেচ্ছায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি চিত্র পাই দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ এইদিনে বোঝাচ্ছেন: "'একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো না যে—এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।'

"মাস্টার দুই-ই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। এ-কথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।...

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'তুমি মাটির প্রতিমা পূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন, যাঁর জগৎ তিনিই এ-সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।'" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথমভাগের আদিতেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকের দর্প চূর্ণ ক'রে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন: "ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান।"

যে-সব কথা একদিন ছিল শুধু তত্ত্বকথা, শ্রীম-র কৃপায় সে-সব এখন সর্বসাধারণের হৃদয়ের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে দক্ষিণেশ্বর-মন্দির-প্রাঙ্গণ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেখানে ভারতের সত্যিকারের পুনরুত্থান শুরু হয়েছিল, শ্রীম-র দিনপঞ্জী তার সাক্ষ্য। নানা ধারা, নানা প্রবাহ, নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, তাদের সঙ্গমস্থলের আর এক নাম যে শ্রীরামকৃষ্ণ, এ তারই এক সাক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে এক নতুন শক্তির অভ্যুত্থান ঘটেছে, যে-শক্তি শুধু ভারতকে নয়, সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি মনে হয়? মনে হয়, এই গ্রন্থের যিনি কেন্দ্রবিন্দু সেই মানুষটি কী সরল! একদিকে এত জ্ঞান, অপরদিকে এত সরল! কি ক'রে এটা সম্ভব? সারদা দেবীর ভাষাতেই আবার বলতে ইচ্ছা হয়: "একবার ভাবো দেখি, সে লোকটি কেমন ছিলেন।"

পৃথিবীর ধর্মজগতে যতগুলি সাধনপথ আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ সবগুলিরই সার্থক পথিক। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশাল, যেন সমুদ্র। যেমন আয়তন, তেমনই গভীরতা। একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে প্রেম, ভালবাসা। কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা ভাবেন: "এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন ক'রে হ'ল! কি আশ্চর্য! কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই! সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই।"—শ্রীরামকৃষ্ণ গাইছেন, "সাকার আকার নিরাকারা।" বললেন, "ঈশ্বরের ইতি করা যায় না।" শিক্ষাভিমানী বাংলা দেশের এক নিরক্ষর সাধক জানালেন, ভারতের সনাতন ধর্ম কোন মত পথকে অগ্রাহ্য করেনি। ভারতবর্ষ চিরকাল প্রেম-ভালবাসায় সকল মত গ্রহণ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই করেছেন। সকলকে গ্রহণ করেই তিনি এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেছেন। দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গমস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যমান। একদিকে সে-যুগের ইংরেজী শিক্ষায় প্রভাবিত লোক, যাদের তখনকার পরিভাষায় বলা হ'ত 'ইয়ং বেঙ্গল'; অপরদিকে অতীতের অতি বিশ্বাসী 'ওল্ড ফুল'। এই দুই শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নবযুগের সূচনা হয়। সেই নবযুগের পথপ্রদর্শক এই নিরক্ষর সাধক। মত ও পথের সমন্বয় এই নবযুগের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—ভাবনায়, কথায় আর ব্যবহারে মিল। এর তুলনা নেই। তাঁর সব কিছু একটি আদর্শের সুরে ও ছন্দে গাঁথা; ব্যতিক্রম নেই। কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করছেন। সমান শ্রদ্ধায় সব মত ও পথকে গ্রহণ করেছেন। এর বিপরীত দেখলে কষ্ট পাচ্ছেন। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যক্তিত্বের সহজ প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যের পূজারী ছিলেন। সত্যের জন্যে তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত, কিন্তু কোন কিছুর জন্যে সত্যকে ত্যাগ করতে পারছেন না। বলছেন, "মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন

সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন…এই লও তোমার সত্য, এই লও তোমার মিথ্যা—এ-কথা বলতে পারলাম না।" সব কিছু ত্যাগ ক'রে একমাত্র সত্যকে তিনি আঁকড়ে ধ'রে ছিলেন বলেই বলতে পারছেন—মন মুখে এক করো। তিনি তা নিজে ক'রে দেখাচ্ছেন। আবার বলছেন, "ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, 'মা, যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও।' মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—এসব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিদ্, আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সর্বশাস্ত্রসার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লোকগুরু, তাই সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ ভাষায় কথা বলতেন। লৌকিক ভাষা, লোক-জীবনের উপমায় জীবনসম্পৃক্ত। গল্প উপাখ্যানে তিনি ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করলেন। জীবনের সঙ্গে যুক্ত ভাষায় যে-কথা তিনি বলতেন, সেই সব কথার সংকলনগ্রন্থ 'কথামৃত' বাংলা গদ্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের উপমার কথা মনে পড়ে। তিনি জনগণের ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুকে যথার্থ মূল্য দেবার জন্যেই যেন জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করেছেন। দেশের আপামর জনসাধারণের ভেতর ধর্মের নবজাগরণ আনতে হ'লে বাংলা গদ্যসাহিত্যের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব—এ-সত্য যেন নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরে বসে উপলব্ধি করেছিলেন। জনশিক্ষার প্রয়োজন, তাই গিরিশকে থিয়েটার ছাড়তে নিষেধ করলেন। গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ভারতের সনাতন ধর্মের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব নয়। এজন্যেই যেন গণভাষার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তখন সংস্কৃত পণ্ডিতদের এবং পাশ্চাত্য-ভাবে ভাবিত নেতাদের গণধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ভারতের জনমানসকে কুসংস্কারে ডুবিয়ে রেখেছিল। তারা দেখেছিল অপর সম্প্রদায়ে স্বয়ং ভগবান্ পিতারূপে মানুষের হৃদয়-দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তখন মনে হয়েছিল এই পরম পিতাকে পেলে সাধারণ মানুষের অর্থহীন জীবন চরম মূল্য লাভ করে। হিন্দু জনসাধারণ এ-রকম এক আশ্রয় খুঁজছিল। ঠিক সেই চরমমুহূর্তে এলেন কালীসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সাধারণতঃ মাতৃরূপে সাকারের উপাসনা করতে ভালবাসে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কালীকে স্বীকার করলেন, বললেন, কালী তাঁর মা। জনসাধারণের মা, সকলের মা। তিনি শুধু শাক্ত নন, বৈষ্ণব। আবার দেখি তিনি বেদান্তবাদী; তাই গাইছেন, "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" কখনও বা বলছেন, "তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট, তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী, তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার কবি গেয়েছিলেন:

"ডুব দেরে মন কালী ব'লে,
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দুচার ডুবে ধন না পেলে।"

প্রায় শতাব্দীর ব্যবধানে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে সেই গান শোনা যায়। ইংরেজী না জানা এই মহাপুরুষ অধিকাংশ গৃহী ও তরুণ ভক্তদের উদ্দেশ ক'রে বলছেন, "ডুব দিলে কুমীর ধরতে পারে, কিন্তু হলুদ মাখলে কুমীর ছোঁয় না। 'হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে' কামাদি ছয়টি কুমীর আছে। কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমায় ছোঁবে না। পাণ্ডিত্য কি

লোকাচারে কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না আসে। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু; এর নাম বিবেক।" এমন সুন্দর ক'রে, এমন সহজ ভাষায় গানের মধ্য দিয়ে গভীর দুরূহ তত্ত্বকে গণমানুষের হৃদয়-দ্বারে তিনি পৌঁছে দিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের এক জায়গায় শ্রীম বলছেন, "শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন—কিন্তু কোঁচড় পরিপূর্ণ হয়েছে, এত ভার বোধ হচ্ছে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার, আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্যা উদয় হয়েছে, সব সমস্যা পূরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা অবাক হয়েছেন। দয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখলেন, তখন আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন, আমরা এত বেদ-বেদান্ত কেবল পড়েছি কিন্তু এই মহাপুরুষে তার ফল দেখিতেছি; এঁকে দেখে প্রমাণ হ'ল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন ক'রে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান। আবার ইংরাজী পড়া কেশবচন্দ্র সেনাদি ঠাকুরকে দেখে অবাক হয়েছেন। ভাবেন, কি আশ্চর্য, নিরক্ষর ব্যক্তি এ-সব কথা কিরূপে বলছেন। এ যে ঠিক যীশুখৃষ্টের মত কথা! গ্রাম্যভাষা! সেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝান—যাতে পুরুষ স্ত্রী ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে। যীশু ফাদার (পিতা) ফাদার (পিতা) ক'রে পাগল হয়েছিলেন, ইনি 'মা' 'মা' ক'রে পাগল।" যখন তিনি বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন 'আল্লা' 'আল্লা' করছেন তখন আল্লাকেই সর্বস্ব মনে করেছেন। বর্ণনা নৈপুণ্যে কয়েকটি কালির আঁচড়ে শ্রীম আমাদের জন্যে এমনই এক-একটি ছবি রেখে দিলেন, যা দেখে মনে হয় আমরাও এই বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভারের উত্তরাধিকার লাভ করছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব যে-প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে আবার শোনা গেল সেই প্রেমের মন্ত্র। সেই প্রেম তিনি মুঠো মুঠো ক'রে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে বিতরণ করেছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় গোরাচাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ সোনার চাঁদের তুলনা করেছেন। চৈতন্যদেবকে জানবার জন্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাংলা-সাহিত্যে যেমন অমূল্যগ্রন্থ, শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝবার জন্যে কথামৃত সমগ্র সাহিত্যজগতে, দর্শনশাস্ত্রে, ভক্তিশাস্ত্রে সেরূপ একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে আছে: "কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন, 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।'" এঁরা যেন সত্যের এক-একটা দিক, শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র সত্য।

সবশেষে বলা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসাধনায় নবযুগের যে সিংহদ্বার খুলে গেল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত গ্রন্থ তারই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মূল—সর্বধর্ম সমন্বয়, সর্ব-ভাব আদর্শ ও তত্ত্বের সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব-ধর্মসার, সর্বশাস্ত্রসার, চিরন্তন সত্যের নানারূপকে নিজ জীবনে আচরণ ক'রে জানিয়ে দিলেন—সব পথ সত্য। সব মানুষকে, সব আদর্শকে আলিঙ্গন ও স্বীকৃতি দিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণের এই উজ্জ্বল পরিচয় পাই। গ্রন্থকারের বর্ণনায় নয়; শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতেই তাঁর পরিচয়। এখানেই এই গ্রন্থের অনন্যতা। অথচ গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। বাগ্-বৈদগ্ধ্য তাঁর অসামান্য; তথাপি তিনি নিরভিমান, নিরহংকার, আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। যোগ্য গুরুর তিনি যথার্থ শিষ্য

রথযাত্রা

ব্রহ্মচারিণী অজিতা

দিগন্ত বিস্তৃত নীল-সিন্ধুতটে পুণ্যধাম,
বিরাজেন সেথা ভক্ত-প্রিয় দেব জগন্নাথ—
বিশাল এ বসুধার নাথ,
সুবিশাল রথখানি তাঁর; মহীয়ান্ সে রথযাত্রা
মহা-আড়ম্বরে বর্ষে বর্ষে হয় যে উৎসব
জানে সর্বজন। কিন্তু একি এ বিস্ময় !!

অপার জলধি কোথা? কোথা বা সে দিব্যধাম?
কর্মকোলাহল-কল্লোলিত উত্তাল সমুদ্রে
এই মহানগরীরই বুকে
ঘটেছিল একদিন অপূর্ব ঘটনা—
'জগন্নাথের রথের রশি টেনেছিল নিজে
জগন্নাথ'—জড় পেল গতি,
অচেতনে দেখা দিল চৈতন্যসঞ্চার;
অর্ধমৃত পায় প্রাণ,
অভ্যুদয় হ'ল এক নবীন যুগের।

দেবালয় নয়; নয় পুণ্যতীর্থ—
শুদ্ধসত্ত্ব ভকত-আলয়। ছোট এক রথ,
সংকীর্ণ প্রাঙ্গণ—অঙ্গুলিমেয় ভক্ত কয়জন,
—পুরোভাগে আত্মভোলা পূজারী ব্রাহ্মণ।
সুমধুর সঙ্কীর্তনে—
উদ্দাম নর্তনে মুখরিত সে পুণ্য-ভবন।

একি তুচ্ছ একটি ঘটনা?
কিংবা শুধু অতীতের সুমধুর স্মৃতি?

চিন্তা করি যবে—মনে হয়
এর চেয়ে বিস্ময়ের কিছু
ঘটেছে কি কভু এই ধরা'পরে?
কোন কালজয়ী ঘটনার বীজ
সেথা হ'ল অঙ্কুরিত? কি এর রহস্য?
কে বা জানে তাহা? যত ভাবি
নাহি পাই দিশা, সীমা নাহি মিলে কভু তার।

শুধু দেখি সবিস্ময়ে, সুদূর অতীতে
নীরবে সূচনা যার—
আজও নহে স্তব্ধ সেই গতি।
সদা চলমান সেই দিব্যরথখানি
বিশ্বজুড়ে চলছে সে—দিনে দিনে
প্রতিক্ষণে বাড়িছে চলার বেগ,
যে গতি অতি সংগোপনে প্রাণে জ্বেলে দেয়
এগিয়ে চলার অনির্বাণ প্রেরণা,
না !! 'তালধ্বজ'[1] কিংবা 'নন্দীঘোষ' নয়—
কোন পৌরাণিক অভিধায় নয় অভিহিত,
নবযুগে অনুপম এই মহারথ—
'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন'—রথী ও সারথি[2]
নররূপধারী নারায়ণ—
জগন্নাথ স্বয়ং 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব'—
প্রণাম সে দিব্য রথ—রথীরে প্রণাম।

১ তালধ্বজ, নন্দীঘোষ—জগন্নাথদেব ও বলরামদেবের রথের নাম।

২ বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর রথ টেনেছিলেন। এখানেই মিশনের প্রথম অধিবেশন হয়। রথ গতির প্রতীক।

সমালোচনা

স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীমৎ অমলচৈতন্য ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : শ্রীমৎ করুণা ব্রহ্মচারী, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ (আশ্রম বিভাগ), হালিসহর, ২৪ পরগনা। (১৩৮৪), পৃষ্ঠা ১৩ +২২৪; মূল্য : দশ টাকা।

শ্রীমৎ অনির্বাণের 'মুখবন্ধ' স্বামী সিদ্ধানন্দের 'দু'টি কথা', ডক্টর রমা চৌধুরীর 'শুভেচ্ছা', 'সুদর্শন'-সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের 'ভূমিকা'—এগুলি কিছুটা বিষয়বস্তুর সূত্রস্বরূপ, কিছুটা বা লেখকের পরিচয়ার্থ অথবা উৎসাহবর্ধনের জন্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। শেষের উদ্দেশ্যটি নিষ্প্রয়োজন, কেননা গ্রন্থটিতে লেখকের অধিকার আর প্রযত্ন দুয়েরই প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে শ্রীমৎ অনির্বাণের আড়াই পৃষ্ঠার 'মুখবন্ধ'টি একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এটিতে সমর্থ আচার্যের বিদ্যাবত্তা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর রসবোধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে 'মুখবন্ধ'-কথিত অনেক বিষয়ই মূল গ্রন্থে অনুপস্থিত।

সাধক-লেখক বৈদিক ও ঔপনিষদ সাহিত্য, সাংখ্য-যোগ-বৈশেষিক-ন্যায়-বেদান্ত এই পাঁচটি দর্শন (পূর্বমীমাংসা অনালোচিত), পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মনুসংহিতা আর তন্ত্র অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন শাস্ত্রে সৃষ্টি আর স্রষ্টা কিভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক যে বিভিন্ন আকরগ্রন্থ স্বাধ্যায়বৎ সযত্নে অধ্যয়ন করেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র তথ্যসংগ্রহ করেননি, শাস্ত্রবিশেষের মূল ভাবটি পরিস্ফুট করার দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল, সেজন্য প্রয়োজনমত গ্রহণ-বর্জনও করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বৃহদারণ্যক, প্রশ্ন বা ঐতরেয় উপনিষদের সৃষ্টি-প্রকরণের পরিচয় দিলেও ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রিবৃৎকরণ বা অনুরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। এই অধ্যায়ে তিনি গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার ক'রে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে পরিপুষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যদিও গীতাকে শিথিলভাবে উপনিষদ বলা হলেও বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টিতে শ্রুতি নয়, স্মৃতিমাত্র। এই অধ্যায়েই উল্লিখিত 'পঞ্চদশী'-প্রমুখ প্রকরণ-গ্রন্থও শ্রুতিপ্রমাণের তুল্যমূল্য ব'লে গ্রাহ্য হয় কি!

'সৃষ্টিপরিণামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' গ্রন্থটির উপসংহার-পদবাচ্য। এই অধ্যায়ে শাস্ত্রনির্ভরতা অতিক্রম ক'রে লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টি আর স্বকীয় চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ বিষয়টি সুবিস্তৃত—বিশেষতঃ ভূরিপ্রমাণ শাস্ত্রাদির কথা স্মরণ করলে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হলেও লেখক যেভাবে সারবস্তুটি পরিবেশন করেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। আগ্রহী সাধারণ পাঠকের উপযোগী তাঁর এই গ্রন্থটি তত্ত্বাশ্রয়ী সাহিত্যের ধারায় একটি মূল্যবান্ সংযোজন। তত্ত্বগ্রন্থ হলেও ভাষার সাবলীলতা আর অন্তর্নিহিত সাহিত্যরস গ্রন্থটিকে উপাদেয় ক'রে তুলেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরগ্রন্থের নির্দেশ থাকলে ভাল হ'ত।

মুদ্রণ, বাঁধাই ইত্যাদি বহিরঙ্গ পারিপাট্য প্রশংসনীয়। মুদ্রণাশুদ্ধি বিরল।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা—সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশক : ননীগোপাল সেনগুপ্ত, ১৮।২ সেলিমপুর লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১। (১৯৮১), পৃঃ ১৬১৭+২১; মূল্য : ৬৫ টাকা।

এই বৃহদাকার গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে (১—৭৬৩ পৃষ্ঠা) 'সৃষ্টির সূচনা', 'পরলোক', 'জন্মান্তরবাদ' প্রভৃতি ২৬টি প্রবন্ধ; দ্বিতীয় খণ্ডে (৭৬৪—১৪৮০ পৃষ্ঠা) 'প্রকৃতিতে

ব্রহ্মদর্শন', 'মায়াবাদের সগুণ ব্রহ্ম', 'বিবর্তবাদ', 'সুষুপ্তি' প্রভৃতি ২৪টি প্রবন্ধ ও তৃতীয় খণ্ডে (১৪৮১—১৫০৪ পৃষ্ঠা) 'ধর্ম ও জড় বিজ্ঞানের বিরোধ' এবং 'জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ' ২টি প্রবন্ধ ও 'উপসংহার' আছে। তাছাড়া 'পরিশিষ্টে' (১৫০৫—১৬১৭ পৃষ্ঠা) 'ব্রহ্মের অস্তিত্ব', 'জগতে দুঃখ বিপদ কেন' প্রভৃতি ৮টি প্রবন্ধ আছে। লেখক সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে তাঁর গুরু গুরুনাথ-লিখিত তিনখানি পুস্তক, 'তত্ত্বজ্ঞান', 'সত্যধর্ম' ও 'সত্যামৃত'। গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান হলেও এর অনেকখানি অংশে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এর কারণ হিসাবে লেখক ঠিকই বলেছেন, "সৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ ও তাহাদের সম্বন্ধ ও পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।···সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা উৎপন্ন না হইলে দর্শনশাস্ত্রের কঠিন সমস্যা-সমূহ, যথা—'আমি কে?' 'আমি কোথা হইতে আসিয়াছি?' 'আমি কেন আসিয়াছি?' 'আমি কোথায় যাইব?' প্রভৃতির সুসমাধান অসম্ভব।"

গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিস্তৃত আলোচনা। লেখক নিজেই সম্ভাব্য বহু প্রশ্ন তুলে তার উত্তর দিয়েছেন, এবং সেই উত্তর দিতে গিয়ে শুধু বেদ উপনিষদ্ এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থই আনেননি, অতীত ও বর্তমান যুগের বহু দার্শনিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতামতও এনেছেন। এতে লেখকের বিরাট ও বিবিধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফলে, আলোচনা কখন কখন মূল বিষয়বস্তু হ'তে অনেক দূরে চলে গেছে। এই সম্বন্ধে লেখকের অভিমত: "গ্রন্থে লিখিত বিষয়সমূহের সংক্ষেপ আলোচনা করিতে গেলে উহার জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে বই হ্রাস পাইবে না। তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।" বলা বাহুল্য, লেখকের এই মতের উত্তরেও বলা যেতে পারে যে, আলোচনার বিস্তৃতি বেশী হলেও অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু এত বিরাট এবং এর আলোচনায় এত প্রশ্নোত্তর আনা হয়েছে যে, লেখকের সব মতগুলি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হ'তে পারে। এই-রকম হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ব্রহ্ম ও সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের আজ পর্যন্ত নির্বিবাদ সমাধান হয়নি, যদিও বহু শাস্ত্রকার ও মনীষী এইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে গেছেন, পুস্তক রচনা ক'রে গেছেন এবং নিজ মতের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সৃষ্টি ক'রে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি:

(ক) 'ধর্মের প্রকৃত অর্থ নিয়মানুবর্তিতা অর্থাৎ গুরুদেব ও মহাজনদিগের উপদেশ অনুযায়ী মোক্ষপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যে জীবনকে নিয়মিত করা, তাহাকে ধর্ম বলা যাইতে পারে।' (পৃঃ ৬১)

(খ) 'জড়বাদে সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য নহে এবং ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি ও পালনকর্তা।' (পৃঃ ৩২৯)

(গ) 'পরলোকের অস্তিত্ব সত্য, সত্য, মহাসত্য'। (পৃঃ ৭৬২)

(ঘ) 'সোঽহংবাদ সত্য নহে।' (পৃঃ ১০৭৮)

(ঙ) 'শঙ্কর মতে···মূলেই গোলমাল।'(পৃঃ ১১৬০)

(চ) মায়াবাদ ভিত্তিহীন (পৃঃ ১৩৪৯)

ইত্যাদি।

তাছাড়া গ্রন্থটির অনেক জায়গায় লেখকের নিজস্ব ভক্তির আতিশয্যের জন্য যুক্তিধর্মী পাঠকের মানসিকতাকে আঘাত করে।

সে যাই হোক, গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে, ধর্মের নানা দুরূহ তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা। লেখকের সঙ্গে সর্ববিষয়ে পাঠক একমত না হ'তে পারেন, কিন্তু লেখকের উপনিষদ্, বিভিন্ন দর্শন, আধুনিক ধর্মীয় মতবাদ ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি থাকায় আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও উপভোগ্য হয়েছে। মনে হয়, এই ধরনের উচ্চমানের

আলোচনা খুব কম পুস্তকেই আছে, এবং এরূপ আলোচনা করবার মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সংখ্যাও বেশী নেই। তাছাড়া সকলের পক্ষে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের পুস্তক পাঠ ক'রে জ্ঞানলাভ করা সহজ নয়। সেজন্য বৃহদাকার হলেও সহজবোধ্য এই পুস্তক পাঠে সকলেরই নিঃসন্দেহে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যাবে।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখে বলেছিলেন: "এই গ্রন্থখানি আমাকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে—কেবলমাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ বিষয়বস্তু ও পাণ্ডিত্যের জন্য নহে—অন্তর্দৃষ্টির বিশাল প্রসারতার জন্য এবং আন্তর-রাজ্যের জ্বলন্ত বিশ্বাসের জন্যই। গ্রন্থকারকে এই গ্রন্থের আশু প্রকাশ করিবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি। মানব সভ্যতার বর্তমান কালই এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও প্রকাশের উপযুক্ত সময়।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখক অর্থাভাবে তাঁর জীবিতকালে এই গ্রন্থ ছাপাতে পারেননি। লেখা সম্পূর্ণ হবার প্রায় ২৩ বছর পরে লেখকের পুত্র শ্রীননীগোপাল সেনগুপ্ত গ্রন্থটি ছাপাতে সক্ষম হয়েছেন।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

(১) **অন্ধ্রপ্রদেশে** শ্রীকাকুলাম জেলায় ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বংশধারা নদীর ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২০০ দুঃস্থ পরিবারের জন্য ২০০টি পাকা বাড়ি তৈরীর কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

(২) **উড়িষ্যায়** কোরাপুট জেলায় গুনুপুরে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বংশধারা নদীর প্রবল বন্যায় গৃহহারা ২৫০টি নিঃস্ব আদিবাসী পরিবারের জন্য ২৫০টি পাকা বাড়ি তৈরীর কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

(৩) **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) মালদা জেলার কালিয়াচক অঞ্চলে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের বন্যায় বিধ্বস্ত ১৮০০ গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ১০০০ পরিবারকে গৃহনির্মাণোপকরণ বিতরণ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলিতেছে।

(খ) মালদা জেলায় খরাপীড়িত হবিবপুর ও বামনগোলা অঞ্চলে প্রত্যহ প্রায় ১০,০০০ লোককে চাউল ও লবণ বিতরণের মাধ্যমে প্রাথমিক সেবাকার্য শুরু হইয়াছে।

(গ) বাঁকুড়া জেলায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত একটি আদিবাসী গ্রামে গৃহহীনদের মধ্যে গৃহনির্মাণোপকরণ বিতরণের কাজ হাতে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

(৪) **উড়িষ্যায়** ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও প্রাথমিক সেবাকার্য চলিতেছে।

(৫) **রাজস্থানে** ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য রাজস্থান সরকারের নিকট হইতে পাওয়া ৪৩,৮৫০ খানা শাড়ী এবং ৫৫,৫৭৮ খানা ধুতি বিতরণের কাজ চলিতেছে।

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ২৪শে হইতে ৩০শে জুলাই ১৯৮২, সপ্তাহব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:

২৪শে জুলাই শনিবার সকালে বিবেকানন্দ চিকিৎসা-বিজ্ঞান কেন্দ্রের (Vivekananda

Institute of Medical Sciences) নবনির্মিত ত্রিতল ভবনের একতলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সকাল দশটায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বিবেকানন্দ চিকিৎসা-বিজ্ঞান কেন্দ্র ভবনটি শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ অনুষ্ঠানে স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ, স্বামী গহনানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ প্রভৃতি দুইশত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এবং অগণিত ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। পূজনীয় প্রেসিডেণ্ট মহারাজ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেবাপ্রতিষ্ঠানের সর্ববিধ সেবাকার্যের প্রশংসা করেন এবং পঞ্চাশ বছরের এই প্রতিষ্ঠানটিতে ভবিষ্যতেও যেন সেবাধর্মের প্রদীপটি উজ্জ্বল রাখা হয়, তাহা নির্দেশ দেন। পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'শালগ্রাম শিলায় ঈশ্বরের পূজা হয়; আর মানুষে কি হয় না?' মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর রয়েছেন, তাঁর পূজা—দরিদ্র-নারায়ণ, আর্তনারায়ণের পূজাই, স্বামীজীর কার্যে পরিণত বেদান্ত। ভারতের সনাতন আদর্শ সেবা আর ত্যাগের ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আপনারা এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন; আজ এই শুভদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ সতত এই প্রতিষ্ঠানটির উপর বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা করি।" পূজনীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী তাঁহার ভাষণে বলেন, "স্বামী দয়ানন্দের প্রচেষ্টায় বকুলবাগান রোডের ছোট্ট শিশুমঙ্গল আজ এই বৃহৎ সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমরা অনেক পথ এসেছি আরও অনেক পথ বাকি আছে। সেবাভাবরূপী আদর্শের প্রতি লক্ষ্য ঠিক থাকলে এখানকার প্রাণ সতেজ থাকবে এবং জগতের সামনে একটি সুন্দর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।" স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করিয়া বলেন, "এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন আমি দেখিনি, কারণ আমি এক বছর পর মঠে যোগদান করি; তবে আগে থেকেই মঠে যাতায়াত ছিল। '৫৪-৫৫ সালে আমি এখানকার কর্মী হিসাবে আসি এবং বছর দুই থাকি। স্বামী দয়ানন্দের যে কঠোর কর্মজীবন আমি দেখেছি, তা সত্যই বিরল। জীবের কল্যাণ-কামনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য, কোনও পাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। ভবিষ্যতে এই কেন্দ্রটি মঠ-মিশনের একটি সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, আমরা এই আশা করি।" স্বামী রঙ্গনাথানন্দ তাঁহার ভাষণে সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী ও সেবিকাদের স্বামীজীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-ভাবে কার্য করার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আশীর্বাদ এই প্রতিষ্ঠানের উপর সতত বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা করেন।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় পূজনীয় প্রেসিডেণ্ট মহারাজ একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় আহূত উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে পূজনীয় প্রেসিডেণ্ট মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। ব্রহ্মচারীদের বৈদিক মন্ত্র-পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। স্বামী বন্দনানন্দের স্বাগত ভাষণের পর সেবা-প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন স্বামী গহনানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য এবং সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর ও পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। তিনজনই তাঁহাদের ভাষণে অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় সেবা-প্রতিষ্ঠানের যে বৈশিষ্ট্য, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। রাজ্যপাল বি. ডি. পাণ্ডের লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়া শোনান পরিষদীয় মন্ত্রী ও চীফ হুইপ শ্রীপতিতপাবন পাঠক। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅশোক সেন।

২৫শে হইতে ২৮শে জুলাই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের এক আলোচনা-সভা (Scientific Symposium) আহূত হয়। ২৫শে সকাল সাড়ে আটটায় এই আলোচনা-সভার উদ্বোধন-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, পূজনীয় প্রেসিডেণ্ট মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ করেন স্বামী বন্দনানন্দ; উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন ইন্‌ডিয়ান্ কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের ডাইরেক্টর জেনারেল প্রফেসর রামলিঙ্গ স্বামী এবং 'স্বামী দয়ানন্দ-স্মারক' বক্তৃতা প্রদান করেন প্রফেসর ডঃ অজিতকুমার বসু। চারদিনের এই আলোচনা-সভাগুলিতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দেন। ২৮শে জুলাই বিকাল সাড়ে চারটায় সমাপ্তি ভাষণে স্বামী ভূতেশানন্দজী বলেন, "শাস্ত্র বলছেন, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্' —তাই শরীরকে বিভিন্ন উপায়ে সুস্থ, সবল রাখা একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু এটি ভুলে গেলে চলবে না যে, শরীর আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ আর তা লাভ করার জন্য শরীর একটি উপায় মাত্র।"

২৯শে জুলাই নার্সিং বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী গহনানন্দ; সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সবিতাব্রত দত্ত ও অধীর বাগ্‌চি।

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। ২৫শে জুলাই রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্ররা 'কৃষ্ণ সুদামা', ২৮শে জুলাই সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দ 'বুড়ি বালামের তীরে' এবং ৩০শে জুলাই সেবাপ্রতিষ্ঠানের নার্সিং বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ও নার্সিং স্টাফ্ 'সারথি শ্রীকৃষ্ণ' নাট্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে।

উদ্বোধন-সংবাদ

১৯শে জুলাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়।

২৩শে জুলাই 'সারদানন্দ হলে' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-লিপি আরম্ভের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য মাসিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষের প্রারম্ভিক ভাষণের পর তিনি 'শ্রীম ও কথামৃত' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই মাসে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ :

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—স্বামী বিবেকানন্দ, ৭ম সং, পৃঃ ১৮০, মূল্য : ৫·০০ টাকা।

ভারতীয় নারী—স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮শ সং, পৃঃ ৯৩, মূল্য : ৩·৫০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ)—স্বামী ভূতেশানন্দ। ২য় সং, পৃঃ ২০৮, মূল্য : ১০·০০ টাকা।

দেহত্যাগ

স্বামী স্থিতানন্দ (তিল্লাইনাথন্) গত ২রা জুলাই ১৯৮২, ৬৮ বৎসর বয়সে সিঙ্গাপুর হাসপাতালে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার দেহান্ত হয়। ১৬ই জুন প্রচণ্ডভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে সিঙ্গাপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁহার বুকের বহির্দেশে পেস-মেকার যন্ত্র। বসানো হয়, সকল

প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তাঁহার অবস্থার আবার অবনতি ঘটে এবং শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি তামিল, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ ছিলেন।

স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ খৃঃ তিনি সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ খৃঃ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সিঙ্গাপুর মিশনের কর্মী ছিলেন। বিনয়ী ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

গ্রন্থ-উদ্বোধন

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৫ই জুলাই ১৯৮২, অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু-সম্পাদিত 'Letters of Sister Nivedita' শীর্ষক গ্রন্থটির দুই খণ্ড স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কর্তৃক গোলপার্ক, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিট্যুট অব কালচারের 'শিবানন্দ হলে' আয়োজিত সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন ডক্টর নিমাইসাধন বসু। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুইখানি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অধ্যাপক বসু গ্রন্থটি প্রস্তুতির জন্য যাঁহাদের নিকট হইতে অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উৎসব

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৭ ও ১৮ই এপ্রিল '৮২, দুইদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক জন্মোৎসব নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। প্রথম দিবসে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণ গান পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিনের প্রভাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ১৫০০ জনের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পর শ্রীসমীরণ দে সহশিল্পিবৃন্দসহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন। উক্ত জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত বার্সিক-বিবরণীতে আশ্রমের বিবিধ কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালক ও বালিকা উভয় বিভাগ), পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক, চক্ষুবিভাগ, মহিলা ও শিশু বিভাগ, দুগ্ধ ও পাউরুটি কেন্দ্র, ছাত্রাবাস, নিত্য পাঠ ও কীর্তনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বারাসাত রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রমে ১৯শে জুলাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম ও রামকৃষ্ণ সহস্রনাম অর্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

হুগলী-চুঁচুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসমিতির উদ্যোগে ২৫শে জুলাই ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরিতে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর তিনি স্বামীজীর বিষয় একটি ভাষণ দেন। সমাপ্তি ভাষণ ও সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শেষ হয়।

ইহার নাম Incandescence (ইন্‌ক্যান্‌ডেসেন্স্)। তারটিতে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে না, তাহার প্রমাণ এই যে, তারের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে না। তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ করিলেই ইহার উপলব্ধি হইবে। Incandescence আর জলনের প্রভেদ এই, পূর্ব্বোক্তটিতে কোন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না, দ্বিতীয়োক্তটিতে রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। প্রথমটি দ্বারা দ্রব্যটির ভার বা গুণসম্বন্ধে বা কোন বিষয়ে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু শেষোক্তটিতে দ্রব্যটি পরিবর্ত্তিত হয়।

জলনে বিকীর্ণ আলোক যে কেবলমাত্র রক্তিমবর্ণ হইবে, তাহা নহে, বস্তুভেদে আলোকের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। উদাহরণ দিতেছি: কাষ্ঠের জলনজনিত আলোক রক্তিমবর্ণ হইতে পারে, কিন্তু Hydrogen(১) (হাইড্রোজেন) বা উদজান নামক গ্যাস্ জলিলে ঈষৎ নীলবর্ণ আলোক বিকীর্ণ হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জলনব্যাপারে রাসায়নিক সংযোগ অত্যাবশ্যক; আমরা সচরাচর যে সমস্ত জলন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহাতে Oxygen(২) (অক্সিজেন) বা অম্লজান নামক এক প্রকার গ্যাসের সহিত রাসায়নিক সংযোগ হইয়া থাকে।

এই অম্লজান চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর প্রধান উপকরণ। এই বায়ু হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় অম্লজান গৃহীত হইয়া থাকে। বায়ুযুক্ত স্থানে একটি প্রদীপ রাখিয়া দাও; তাহা জালিয়া দিলে জলিতে থাকিবে, কিন্তু যদি উহাকে কোন নির্ব্বাত স্থানে রাখা যায়, তাহা হইলে উহা অচিরে নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল জলনের কারণ অম্লজান নহে। Chlorine (ক্লোরিণ) নামক গ্যাসে পরিপূর্ণ কাচ নলের মধ্যে Antimony (এণ্টিমনি) নামক ধাতু নিক্ষেপ করিলে, ইহা তৎক্ষণাৎ জলিয়া উঠে। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। জলনে আলোক ও উত্তাপ উভয়ই দৃষ্ট হয় বলা গিয়াছে। উত্তাপের কারণ রাসায়নিক সংযোগ, আলোকের কারণ উষ্ণতার আধিক্য (High temperature)।

১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জলনের কারণ জানিতেন না। তাহারা উহার এক বিচিত্র ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে, যে সকল পদার্থে Phlogiston (ফ্লোজিষ্টন্) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহারাই দাহ্য। যাহাতে অধিক Phlogiston আছে, তাহারা অধিক পরিমাণে দাহ্য। কোন পদার্থ দগ্ধ করিলে Phlogiston অংশ চলিয়া যায় এবং যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম Calx (ক্যাল্‌ক্স্)। এই Calx (ক্যাল্‌ক্স্) ও Phlogiston (ফ্লোজিষ্টন্) এর সংযোগেই দাহ্য পদার্থের উৎপত্তি। তাঁহাদের মতে দাহ্য বস্তুটি Calx অপেক্ষা অধিক ওজনের। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, সকল বস্তু সম্বন্ধে এই মত প্রযুক্ত হইতে

(১) Hydrogen (হাইড্রোজেন): এক প্রকার গ্যাস্; ইহার বর্ণ নাই, বায়ুর ন্যায় ইহা অদৃশ্য। ইহা সকল গ্যাস্ অপেক্ষা লঘু। ইহা জলের এক প্রধান উপকরণ। এই Gas ও Oxygen বা অম্লজান নামক এক প্রকার গ্যাসের সংযোগে জল প্রস্তুত হয়।

(২) Oxygen বা অম্লজান: ইহা বায়ুর এক প্রধান উপকরণ। এই গ্যাসের জন্যই আমরা জীবিত আছি। অম্লজান না থাকিলে আমরা প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। নিঃশ্বাসের সময় আমরা বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করি।

(ভাদ্র, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৭৭)

[পুনর্মুদ্রণ]

পারে না। Magnesium (ম্যাগ্নিসিয়ম) নামক এক প্রকার ধাতু দগ্ধ হইলে যে দাহাবশেষ থাকে, তাহা দাহ্য পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর ভারযুক্ত।

জ্বলন কি, আমাদের অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। এক্ষণে এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বিবৃত করা যাউক। কেবল মাত্র বায়ুতে যে কোন বস্তু দগ্ধ হয়, এমত নহে।

ক্লোরিণ (হরিতক) (১) গন্ধক গ্যাস্(২) ইত্যাদি নানা গ্যাসেও জ্বলনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সকল গ্যাসে জ্বলনক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া, ইহাদের নাম জ্বলনসম্পাদক (Supporter of Combustion)। কিন্তু তাহা বলিয়া, বায়ু বা ক্লোরিণ দাহ্য পদার্থ নহে। অম্লজান প্রভৃতি গ্যাস্ দহনসম্পাদক ও অঙ্গার, লৌহ, উদজান প্রভৃতি বস্তু দাহ্য। দহনসম্পাদক ও দাহ্য পদার্থে বিশেষ সম্বন্ধ।

উদজানকে অম্লজানের মধ্যে দগ্ধ করা যাইতে পারে এবং অম্লজানকেও (যদিও ইহা দহন-সম্পাদক) দাহ্যমান উদজনক গ্যাস্ মধ্যে প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে।

এমন কতকগুলি বস্তু আছে, যাহারা দাহ্যও নহে, দহনসম্পাদকও নহে। যেমন এমোনিয়া(৩) গ্যাস্, দ্ব্যম্লাঙ্গারক গ্যাস্(৪) (Carbon dioxide)।

জ্বলনক্রিয়ার কতিপয় নিয়ম আছে ; তাহারা এই :—

(ক) প্রত্যেক বস্তুর দহনের এক একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতা আছে ; নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অল্প হইলে জ্বলিবে না। এই তাপপরিমাণ বস্তুভেদে ভিন্ন। যেমন গন্ধক ২৫০ ডিগ্রি উষ্ণতায় জ্বলিতে থাকে। ফস্‌ফরাস(৫) (Phosphorus) ৬০ ডিগ্রি উষ্ণতায় জ্বলিতে থাকে। গন্ধক ২৫০ ডিগ্রিতে দগ্ধ হয় বলিয়া, একই অবস্থায়, ২৪৯ ডিগ্রিতে দগ্ধ হইবে না।

(খ) জ্বলন গ্যাসের নিরন্তরতা বা ঘনত্বের (Density) (৬) উপরও নির্ভর করে। প্রত্যেক গ্যাস্ এক নির্দিষ্ট ঘনত্বে জ্বলিবে। যতই কেন উত্তাপের বৃদ্ধি হউক না, এই ঘনত্বের অল্পতা

(১) ক্লোরিণ এক প্রকার গ্যাস্। হরিৎবর্ণ বলিয়া ইহার নাম হরিতক। এই গ্যাস্ আঘ্রাণ করিলে নাসিকা ও গলা জ্বলিতে থাকে; ইহা দূষিত গ্যাস্। অধিক পরিমাণে ঘ্রাণ করিলে মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

(২) গন্ধক গ্যাস্ : গন্ধক দগ্ধ করিলে যে গ্যাস্ উত্থিত হয়, তাহার নাম গন্ধক গ্যাস্।

(৩) এমোনিয়া : ইহা একটি যৌগিক পদার্থ ; যবক্ষারজান বা Nitrogen এবং উদজানের রাসায়নিক সংযোগে ইহার উৎপত্তি। যে স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা যায়, সে স্থানে এক প্রকার ঝাঁজযুক্ত গ্যাস্ ঘ্রাণ করা যায়, তাহা (Amonia) এমোনিয়া জনিত।

(৪) দ্ব্যম্লাঙ্গারক গ্যাস্ বা Carbon dioxide। ইহা এক প্রকার যৌগিক পদার্থ। অঙ্গার এবং অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন। এই গ্যাস্ বায়ুতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় এই গ্যাস্ ত্যাগ করিয়া থাকি। লেমনেড্ বা সোডা ওয়াটারের বোতল খুলিলে দেখা যায় যে, এক প্রকার গ্যাস্ বহির্গত হইতেছে। ইহাই Carbon dioxide।

(৫) Phosphorus : ইহা সামান্য উত্তাপ সংযোগেই জ্বলিয়া উঠে। দিয়াশালাইয়ের গাত্রে (যাহার উপর কাটিটি ঘর্ষিত হয় তাহার উপর) ফস্‌ফরাস আছে।

(৬) Density (ঘনত্ব) : সমান আয়তন দুইটী বস্তুর ওজন যদি যথাক্রমে ৫ সের ও ১০ সের হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তু প্রথম অপেক্ষা দ্বিগুণ ঘন।

(৮৪তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৭৮)

ঘটিলে জ্বলিবে না। এই কারণেই ফুৎকার দ্বারা প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। যে গ্যাস্ জ্বলিতেছিল, তাহা ফুৎকার দ্বারা চারিদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া অল্পঘন হইল ; সুতরাং পূর্ব্বকার উত্তাপ থাকিতেও আর প্রজ্বলিত হইবে না। আর একটী উদাহণ দিতেছি :—পূর্ব্বে বলিয়াছি, উদজান গ্যাস্ অত্যন্ত দাহ্য কিন্তু একটী ঘরে ১০ মিনিট কিম্বা আধঘণ্টা কাল ধরিয়া উদজান গ্যাস্ পূর্ণ করিয়া, যদি একটী দীপশিখা প্রজ্বলিত করা যায়, তাহা হইলে গৃহস্থিত উদজনক গ্যাস্ জ্বলিবে না। কিন্তু একটী অল্লায়তন চোঙ্গের মুখ হইতে বহির্গত অত্যন্ত ঘন উদজান সামান্য অগ্নি প্রয়োগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

(গ) দাহ্য পদার্থের আকৃতি অনেকটা জ্বলনের পরিমাণ নির্ণয় করে। সূত্রাকৃতি Magnesium (ম্যাগনিসিয়ম্) (১) নামক ধাতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ম্যাগনিসিয়ম্ অপেক্ষা শীঘ্র জ্বলিবে। Anthracite (২) (এনথ্রাসাইট) নামক এক প্রকার কঠিন অঙ্গারকে তালযুক্ত করিয়া বিভক্ত করিলে দগ্ধ হয় না।

(ঘ) দহনসম্পাদক পদার্থের বিশেষ অবস্থা অনুসারে দহনক্রিয়ার তারতম্য দৃষ্ট হয়। Anthracite কেবল মাত্র প্রবল বায়ুতেই প্রজ্বলিত হয়।

(ঙ) দাহ্য পদার্থের তাপবিকিরণ করিবার ক্ষমতাও জ্বলনের পরিমাণ নির্ণয় করে। এই নিয়মটি প্রথম নিয়মের অন্তর্গত। যে বস্তু শীঘ্র শীঘ্র তাপ বিকিরণ করে, তাহার শীঘ্রই নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতার হ্রাস হয় ও তাহা শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হয়।

(চ) দাহ্য পদার্থের নিকটস্থ বস্তুও দহনক্রিয়ার পরিমাণ নির্ণয় করে। যেমন এক খণ্ড প্রজ্বলিত অঙ্গারের চতুর্দ্দিকে Anthracite রাখিয়া দাও। অঙ্গারটি শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ হইবে। এই নিয়মটিও ১ম নিয়মের অন্তর্গত।

অতএব জ্বলন ব্যাপারে উষ্ণতার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে কার্য্যকরী :—

দাহ্য পদার্থের উষ্ণতার পরিমাণ, তাপবিকিরণ করিবার ক্ষমতা, দাহ্য পদার্থের দ্রব্যপরিমাণ (Mass) (৩), ইহার আকৃতি, অল্প বা অধিক তাপশোষকারী পদার্থের সহিত দাহ্য পদার্থের সংযোগ, দাহ্যবস্তু কর্ত্তৃক অপর বস্তুর তাপ শোষণ করিবার ক্ষমতা (absorbing power), দাহ্য পদার্থের উপরিস্থিত প্রযুক্ত ভার, দাহ্য পদার্থের উপকরণ, দহনসম্পাদক পদার্থের গতি ও স্থিতি।

(১) এক প্রকার ধাতু। কালী পূজার সময় এক প্রকার তার বিক্রীত হয় ; এই তার পোড়াইলে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হয়। এই তার ম্যাগনিসিয়ম্ নামক ধাতু হইতে গঠিত।

(২) Anthracite ইহা এক প্রকার কঠিন কয়লা ; ইহাতে অঙ্গারের ভাগ অন্যান্য কয়লা অপেক্ষা বেশী। এই কয়লা কলে ব্যবহৃত হয়।

(৩) যদি এক বস্তুর ওজন ৫ সের ও আর একটী বস্তুর ওজন ১০ সের হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তুটির পরিমাণ বা Mass প্রথম বস্তুটির দ্বিগুণ।

(ভাদ্র, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৭৯)

ভালবাসা।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত)

(সংসারী ও উদাসীর পুনর্ম্মিলন।)

সংসারী। সে দিন 'ব্যবহারিক পারমার্থিক' অনেক কথা হ'ল, কিন্তু একটা ভাব তোমার এখনও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তুমি অত নির্জ্জনে নির্জ্জনে থাক কেন? যদিই বা আমাদের কারুর সঙ্গে এলে, তবু তোমাকে যেন আমাদের মত বোধ হয় না। তোমার কি এই পৃথিবীতে ভালবাসার কোন জিনিষ নাই! আমরা ত ভাই, ভালবাসা নিয়েই বেঁচে আছি। ভালবাসা না থাক্‌লে জগতে আছে কি? যদি তোমার মতে ওটাও ছেড়ে দিতে হয়, তাহ'লে ত ঈশ্বরকেই একরকম ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সব ধর্ম্মেই ত বলে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।

উদাসী। যা বল্‌বার, সব ব'লে যাও।

সংসারী। বল্‌বার আর কি; তোমার ভাবখানা কি, একবার খুলেই বল না। তুমি কি সত্যই পেসিমিষ্ট (Pessimist)? সে দিনের কথায় ত তোমায় তাই ঠাওরালুম।

উদাসী। ঠাউরেছ—ভালই। পেসিমিষ্ট (Pessimist) মানে কি গা?

সংসারী। যে কিছুই ভালবাসে না, ওর চেয়ে আরও একটা ভাল কথা বল্‌তে পারা যায় মিসান্‌থ্রোপ (Misanthrope)।

উদাসী। আমি কি তা জানি না; আমি মূল ভালবাসার অন্বেষণ করছি। ভালবাসার মূল প্রস্রবণে যাবার যোগাড়ে আছি। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় পিছ্‌লে পিছ্‌লে তোমাদের ভালবাসায় পড়ে যাচ্ছি। তোমাদের ভালবাসাটা আমার মতে অতি অসার, হাড় চামড়ার ভালবাসা; তাই এমন গভীর; খাঁটি ভালবাসার অনুসন্ধান কচ্চি, যাতে একেবারে মজে থাক্‌তে পারি।

সংসারী। আমার ত মনে হয়, তুমি এমন একটা জিনিষের অনুসন্ধান কর্‌ছ, যা পাবার নয়—আসমানে ঘর বানাবার চেষ্টায় আছ।

উদাসী। তা হবে। যার যে ভাব, সেই বুঝে। আমি কিন্তু ভাই, তোমাদেরটাকে ঠিক তাই বা ততোধিক মনে করি। মনে করি—তোমাদের ভালবাসা ইত্যাদি যেন আলেয়ার অনুসরণ। সত্যি করে বল দেখি, কোথাও কিছু রস কস পেয়েছ।

সংসারী। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) হাঁ, তা যা বল্‌ছ, বড় মিছা নয়। আচ্ছা, কিন্তু একটা কথা দেখ—মায়ের ভালবাসা তোমাকে নিঃস্বার্থ নিশ্চয়ই মান্‌তে হবে।

উদাসী। ভাই, পাগল ছাগল মানুষ—আমাকে কেন ঘাঁটাচ্ছ? আমার কথায় তোমার রুচি হবে না।

সংসারী। ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমরা যা বলি না কেন, তুমি ও সব ধরো না। আমি কি সত্যি সত্যি তোমার কথা খণ্ডন করি? তা নয়, আমিও সত্য অনুসন্ধান কচ্চি। তোমাকে মহাজ্ঞানী বলে বিশ্বাস করি—তাই তোমার সঙ্গে বেড়ান। নইলে কি আর স্ফুর্ত্তি কর্‌বার ইয়ার পেতুম না? তোমার ভেতরের ভাব আমার কাছে গোপন কোরো না।

(৮৪তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৮০)

উদাসী। শুন্‌বে, তবে শোন :—মায়ের ভালবাসাও আমার নিঃস্বার্থ বোধ হয় না। অন্যান্য ভালবাসার চেয়ে উচ্চ দরের ও পবিত্র বল্‌তে পার বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভালবাসা বাইরে থেকে হয় না। আপনাকে আপনি ভালবাস্‌তে পারলে তার পর যে সর্ব্বভূতের 'আত্মার' প্রতি ভালবাসা হয়, সেই ভালবাসাই ভালবাসা। তাকে ভালবাসাও বল্‌তে পার—বৈরাগ্যও বলতে পার। সে অবস্থার ভাব এই রকম হয়,—

'দাও আর ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।'

আমরা চাই কি জান?—সকলে আমায় কেন ভালবাস্‌লে না। ও আমায় কেন ঘৃণা করে—এই আমার অভিমান। আমি যে প্রেমিকের কথা বল্‌ছি, সে রাজার রাজা—মহারাজা। তার কিছু কামনা নেই—যে দুঘা জুতো মারে, তাকেও সে আলিঙ্গন করে। আর তুমি যে রকম ভালবাসার কথা বল্‌ছিলে তাতে কোন না কোন রকম অহং বুদ্ধি থাকে। মা ভালবাসে—'আমার ছেলে' বলে। আর একজনের ছেলে আসুক, দেখি, মা কি তারও মা হ'তে পারে?—তাকেও ছেলে বলে কোলে টান্‌তে পারে? সত্যি যে মা—সে মা সকলের মা,—সকল মানুষের মা, সে মা পাপীর মা, পুণ্যাত্মার মা, সে মা পশুপক্ষীরও মা—তাঁকে যে দেখে, তারই বল্‌তে ইচ্ছা হয়—'মা'। আবার সে মা কেমন জান? ছেলের উপকারের জন্য সে মা দরকার হ'লে, তার শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত কর্‌তে পারেন—আসক্তি নেই। সেই মাকেই শাস্ত্রে ভগবতী বলেছে, আর সব অবিদ্যা অংশের মা—ভাই, রাগ করো না।

সংসারী। তোমার কথাগুলি ভাই, বড়ই প্রাণে লাগ্‌ছে।

উদাসী। তবে, আরো বলি শোন। আসক্তিটা বড় পাজি জিনিস—ওই মায়া। কিন্তু ওকে খারাপ বলে, মায়া বলে জান্‌তে পার্‌লেই মুস্কিল—ও যে সংযত হবে। তাই মড়ার উপর রাশখানেক ফুল চাপিয়ে, তার কুৎসিতত্ব ঢেকে রাখবার চেষ্টার মত, সমস্ত সংসার এই আসক্তিটার মন্দভাবগুলো ঢাক্‌বার জন্য, ওর একটা নূতন ভাল ভাবের নামকরণ করেছে—নাম দিয়েচে 'ভালবাসা'। * * * এই কামই নানামূর্ত্তি ধরে সংসারে বিচরণ কর্‌ছে। কোন খানে ভয়ানক, কোন খানে বা উহা একটু বেশ বদ্‌লে দেখা দেয়, কিন্তু বেশ বদ্‌লালে কি হবে, ঐ কাম। তাই ওকে খারাপ জেনে, 'আপনাতে আপনি থেকো মন' কর্‌তে শিখি এস। তা হ'লেই যথার্থ আনন্দ পাব—আর সংসার সব ভালবাসাময় হ'য়ে যাবে—সংসারের অন্ধকারময় স্থানগুলো পর্য্যন্ত আলো হ'য়ে যাবে—সব স্বর্গ বলে বোধ হবে। তখনই খাঁটি ফিলানথ্রপিক (Philanthropic) হবে, লোককে ভালবাস্‌তে পারবে। যতদিন না তা হচ্চে, ততদিন মিসানথ্রোপ (Misanthrope)। কোথাও পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, কি ঝোড় জঙ্গলে গিয়ে, আপনার আসক্তিকে নাশ কর্‌বার জোগাড় দেখিগে, এস। সংসারে এখন আমাদের স্থান নেই।

সংসারী। ভাই, অতটা এখনও পার্‌বো না! এখন একটু একটু এরই ভেতর চেষ্টা করে দেখা যাগ—কি রকম হয়। তার পরে যা হয়, করা যাবে।

উদাসী। সেই ভাল। তবে আজ থেকেই আরম্ভ করে দাও। আমার ত আছেই।

(ভাদ্র, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৮১)

রামকৃষ্ণ মিশন।

নিউ ইয়র্ক।

'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' আমেরিকার একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্র। গত ৪ঠা মার্চ্চের কাগজে উহাতে 'স্বামী অভেদানন্দ ও তাঁহার ছোট ছোট ছাত্র' শীর্ষক একটি চিত্র এবং একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে এই প্রবন্ধের যে অনুবাদ দেওয়া গেল, তদ্দ্বারা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, আমেরিকার মজ্জায় মজ্জায় কিরূপ বেদান্তের ভাব প্রবেশ করিতেছে—

"আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ধারণা—ভারতবর্ষ উপধর্ম্মাবলম্বী ও ভ্রান্তদিগের দেশ। কিন্তু সেই ভারতবর্ষ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রে হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক পাঠাইতেছেন, ইহা আজকালকার নানা অদ্ভুত ব্যাপারের মধ্যে বড় কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই নিউ ইয়র্ক সহরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি সুন্দর সুন্দর সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। উহা এত দৃঢ়মূল হইতেছে এবং এত শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এই সহরের অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে শিক্ষিত হইতেছে। তাহারা প্রতি সপ্তাহে পূর্ব্বদেশীয় মহাত্মার (স্বামী অভেদানন্দ) পদতলে বসিয়া জ্ঞানশিক্ষার জন্য এবং যাহাতে উত্তরোত্তর তাহাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য ও শক্তির বিকাশ হয়, তজ্জন্য তাহাদের পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে।

ইষ্ট ৫৫ ষ্ট্রীটস্থ বেদান্ত সমাজের গৃহে প্রতি শনিবারে অপরাহ্ণে ছোট ছোট বালক বালিকার সম্মিলন হইয়া থাকে। তাহারা ঘণ্টাখানেক স্বামী অভেদানন্দের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে। তাহাদিগকে অতি মনোরমভাবে হিন্দুদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা অতি আগ্রহের সহিত উহা শুনিতে থাকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা প্রফুল্ল আশাপূর্ণ মুখে বেদান্ত সমাজের গৃহে আসিয়া এই সুন্দর পূর্ব্বদেশীয় স্বামীর চতুর্দ্দিকে চেয়ার টানিয়া বসে। স্বামী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের পোষাক পরিয়া মধ্যস্থলে বসেন—হাতে একখানি হিতোপদেশ। হিতোপদেশ অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ; খ্রীষ্টের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। আমাদের পশুপক্ষী বা পরীর যত গল্প আছে, সকলগুলিরই মূল—এই 'হিতোপদেশ'।

বেদান্তদর্শন শিক্ষা দিবার সময় যীশুখ্রীষ্টের জীবনী ও উপদেশের খুব সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। কোন উপদেশ বা তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য প্রায়ই যীশুর কোন উক্তি বা জীবনের কোন ঘটনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন উপদেশের ভিতরই ইহা ফাঁক যায় না। প্রতি শনিবার বৈকালে স্বামীজি হিতোপদেশ হইতে একটী গল্প বাছিয়া লইয়া ছেলেদিগকে উহা শুনান। গল্প সব রাজা রাণী পশু পক্ষী সম্বন্ধে। গল্পে ইহারা অবাধে পরস্পরে কথা কহিতেছে—এমন সব বিষয়ে কথা হইতেছে, যাহা ছেলেদের বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু ছেলেরা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিয়া থাকে, প্রত্যেক কথার জন্য ইহারা যেন হাঁ করিয়া থাকে। বেদের সব মত অদ্ভুত অদ্ভুত এবং উজ্জ্বল কল্পনাসূত্রে গ্রথিত—যেমন পুনর্জ্জন্মবাদ, কর্ম্ম, যোগী ইত্যাদি। এই সকল তত্ত্ব এমন

কৌশলের সহিত জ্ঞান এবং সদুপদেশ মিশাইয়া প্রদত্ত হয় যে, নিশ্চয়ই ঐ সকল সারাজীবন ছেলেদের স্মরণ থাকিবে।

স্বামীজি গল্পটী শেষ করিলেন, অমনি ঐ গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। প্রত্যেক ছেলেকে নিজে নিজে ঐ গল্পটী বলিতে এবং উহা হইতে কি সদুপদেশ বা তত্ত্ব পাইয়াছে, তাহা বলিতে বলা হইল। ইহাদের মাথায় গল্পগুলি কতদূর প্রবেশ করিতেছে এবং তাহারা আরও কতদূর তত্ত্ব পাইবার জন্য ব্যাকুল, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে দর্শন সব ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তাহা অনেক প্রবীণ লোকের পক্ষে, একটু বেশী গোছ উদার বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই ছোট ছোট ছেলেরা বোধ হয়, অতি আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

এই ক্লাসের একটী ছোট ছেলের এতদূর অনুরাগ যে, সে সপ্তাহের মধ্যে তাহার যে ছুটীর দিনটী, সেই দিনের সমুদয় আমোদ একেবারে ত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট হইতে জ্ঞানশিক্ষা গ্রহণার্থ প্রত্যহ শনিবার প্রাতে ব্রুকলিন হইতে 'বেদান্ত সমাজে' আইসে। (রেলে ৪০ মিনিটের পথ)। সেখানে তাহাকে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র,—যাহারা স্বামী অভেদানন্দের নিকট উপনিষদ্ পড়িতেছে,—তাহাদের সহিত এক সঙ্গে পড়িতে দেওয়া হয়।

যখন এই ছেলেদের ক্লাস প্রথম খোলা হয়, তখন ছেলেদের মা খুড়ী সকলকেই আসিতে দেওয়া হইত। ক্রমশঃ দেখা গেল, ইহাতে ছেলেদের মা প্রভৃতি স্বামীজির উপদেশ শিক্ষা আদিতে যোগ দিতে এতদূর আগ্রহান্বিত হয় যে, তাহারাই স্বামীজির সমুদয় মনোযোগ আকর্ষণ করে, ছেলেরা আর অবসর পায় না। এক্ষণে বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে এই ক্লাসে আর আসিতে দেওয়া হয় না। স্বামীজি এবং ছেলেরাই কেবল থাকিয়া ইচ্ছামত আলোচনা করেন।"

ভাবদা-অনাথাশ্রম, বহরমপুর।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুর সহরের নিকটবর্ত্তী ভাবদা গ্রামস্থ অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত পত্র পাইয়াছি :—

১৮৯৮ সালের মে মাস হইতে ১৮৯৯ সালের এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত অনাথ-আশ্রমের আয় ব্যয় বিবরণ আমরা সাধারণের সমক্ষে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আশ্রমের ৯৯ সালের মে মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই ৮ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা

পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত	...	...	১৬৷৴১৫
এককালীন দান	...	...	১৫৪৶০
মাসিক চাঁদা	...	...	৪১৬৲
		মোট	৫৮৬৷৵১৫

(ভাদ্র, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৮৩)

খরচ

ঘৃত, তৈল, লবণ, চিনি ও মসলা প্রভৃতি ...	১১৸১২৷৹
ফল, মূল ও শাক সবজী প্রভৃতি ...	২৬৷১০
দুগ্ধ প্রভৃতি ...	৪০৸৵১৫
চাউল ও ডাউল ...	৫৭৷৶৭৷৹
জ্বালানি কাষ্ঠ ...	১৪৸৵১৫
জলখাবার ...	৮৷৭৷৹
আশ্রমের দ্রব্যাদি আনাইবার গাড়ীভাড়া এবং যাতায়াতের গাড়ী রেল ও ষ্টীমার ভাড়া ...	৩৯৸৴১০
আশ্রমের জন্য হোমিওপ্যাথিক্ এবং অন্যান্য কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ও বার্লি প্রভৃতি দ্রব্য খরিদ ...	১৫৸৴০
ডাক্তার কর্ত্তৃক চিকিৎসার ব্যয় ...	১২৲
লেপ কম্বল জুতা এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ...	৬৭৸১৫
আশ্রমোপযোগী গৃহসামগ্রী, বালকদিগের ভোজন পাত্র এবং রন্ধনের তৈজস পাত্রাদি ...	৬২৸৴৭৷৹
বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক, কয়েকটী ছবির ব্লক্ ও বহি এবং আশ্রম লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক খরিদ এবং তাহার বাঁধাই খরচ ...	২৫৴১৫
কাগজ, কলম, নিব, কালি, পেন্সিল, চিঠির কাগজ ও লেপাফা প্রভৃতি ...	১০৸৴১০
পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প, ডাক্ ও রেলওয়ে পারসেল, এবং মনি অর্ডার খরচা ...	১৬৸৴৫
বাঙ্গালা শিক্ষক, সূত্রধর, তন্তুবায় এবং দরজী শিক্ষকের বেতন ...	৩৪৸৵১৫
সূত্রধর কার্য্যের জন্য যন্ত্রাদি, কাপড় বুনিবার তাঁত ও সুতা ; এবং দরজীর কার্য্যের জন্য সূচ সুতা প্রভৃতি ...	৩৬৷৫
কুলির মজুরী ...	৫৷৴৫
দুঃস্থদিগকে সাহায্য দান ...	১৯৶০
মেথরের বেতন ...	৪৲১৫
রজক ...	১৶১৫
নাপিত খরচ প্রভৃতি বিবিধ ব্যয় ...	৭৷৶৫
মোট	৫৮৫৷৶০
উদ্বৃত্ত	৸৶১৫
	৫৮৬৷৶১৫

(৮৪তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৮৪)

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত

জনৈক

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন বাঁধাই : ১ম ভাগ পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮·০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২·৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫·২৫; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭·৮০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪, মূল্য ৮·২৫; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯·৫০; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩·৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাঁধাই ৬·০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ১·৬৫

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৫·২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪·২৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ (সাধারণ বাঁধাই) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২·২৫

„ (কাপড়ে বাঁধাই) পৃঃ „ মূল্য ২·৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন; ১০ম সং, মূল্য ৩৩·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ; (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৯১, মূল্য ৯·০০

„ „ (১ম খণ্ড), ২য় সং, পৃঃ ২০৮, মূল্য—১০·০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭·৫০; ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২·০০

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২০·০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৬·০০ (২য় সংস্করণ)

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১৬·০০; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬·০০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৩৬, মূল্য ৮·০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণ
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৭০০০০৩



"দুর্ব্বল মস্তিষ্ক — কিছু করিতে পারে না ; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে - ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও — ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুট্‌বল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইবে। তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮৯

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী		৩৮৫
২।	**কথাপ্রসঙ্গে :** মায়ের আহ্বান		৩৮৬
৩।	ডাক (কবিতা)	'বৈভব'	৩৮৮
৪।	সন্ন্যাসাশ্রম ও বর্তমান যুগে সমাজের প্রতি কর্তব্য	স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	৩৮৯
৫।	সতী ও উমা	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	৩৯৩
৬।	শিব-গৌরী (কবিতা)	শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী	৩৯৭

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু আংশিক গ্রাহক নয়, **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে সি-মেল-এ ৫০৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১২৫৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে জানাইলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

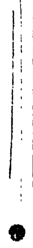
সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় : সকাল ৭টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ —উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৩৯৮
৮।	'বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসে' নিবেদিতা। একটি স্মৃতিকথা	অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু	৪০৩
৯।	এক ও বহু : বিরোধ ও মিলন (কবিতা)	ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী	৪১২
১০।	মায়ের কাছে (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাশ	৪১২
১১।	শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে হাস্যরস : বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ	ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ	৪১৩
১২।	কথামৃত-প্রবেশ	স্বামী চেতনানন্দ	৪১৮
১৩।	শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র	অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৪২৬
১৪।	দৈবজ্ঞ (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার	৪৪০
১৫।	অদ্বৈতবেদান্তমতে সৎপদার্থের স্বরূপ	অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য	৪৪১
১৬।	স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম	অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন	৪৪৫





১৭।	উড়িয়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব	ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা	৪৫১
১৮।	পূজাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণ	ডক্টর তারকনাথ ঘোষ	৪৫৯
১৯।	'আনন্দমঠ'-এর মাতৃমূর্তি	শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়	৪৬৫
২০।	শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্	স্বামী জীবানন্দ	৪৭৩
২১।	স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকণা	স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত	৪৭৪
২২।	সমালোচনা	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪৭৭
		ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য	৪৭৮
২৩।	রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ		৪৭৯
২৪।	বিবিধ সংবাদ		৪৮০
২৫।	শ্রীশ্রীদুর্গার চিত্র		
২৬।	শিব-সতীর চিত্র	শ্রীনন্দলাল বসু	

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক

রোগীর আরোগ্য এবং ডাক্তারের সুনাম নির্ভর করে বিশুদ্ধ ঔষধের উপর। আমাদের প্রতিষ্ঠান সুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি ঔষধ পাইতে হইলে আমাদের নিকট আসুন।

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ (২৫ সং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৩০'০০ টাকা মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার যে জ্ঞানলাভ হইবে অন্যান্য বহু পুস্তক পাঠেও তাহা হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ করুন। নকল হইতে সাবধান। আমাদের প্রকাশিত পুস্তক যত্নপূর্বক দেখিয়া লইবেন।

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত ষোড়শ সংস্করণও পাওয়া যায়। মূল্য টাঃ ১১'০০ মাত্র।

বহু ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ক্যাটালগ দেখুন।

ধর্মপুস্তক

গীতা ও চণ্ডী (কেবল মূল)—পাঠের জন্য বড় অক্ষরে ছাপা। মূল্য ৭'০০ টাকা হিসাবে।

স্তোত্রাবলী—বাছাই করা বৈদিক শান্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অতি সুন্দর সংগ্রহ প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য টাঃ ৪'৫০ মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ২৫'০০ টাকা।

এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

Tels—SIMILICURE হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্ এণ্ড পাবলিশার্স Phone : 22-2536

৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

পাইওনীয়ার



মানেই ভালো গেঞ্জী

সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ, পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা-২

ডক্টর হরিশচন্দ্র সিংহের

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ (দুই খণ্ডে) ৩২'০০

ভগবৎ প্রসঙ্গ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৮'০০

সন্ত তেরেসা ও পূর্ণতার সাধন ৩'০০

ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা (৩য় সং) ২'০০

শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত

শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায় জন্মশতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ ... ৩'৫০

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত

স্তোত্র-মালিকা ... ২'০০

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের

সন্ধ্যামালতী (ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ৩'০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির—৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫ ; মহেশ লাইব্রেরী ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ; সারদা পীঠ (বেলুড় মঠ) :

ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।

—শ্রীসারদাদেবী

* *

*

* *

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূরে হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব





দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।২১



৮৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

জগৎকারণকে 'মা' বলিয়া, জগদম্বা বলিয়া ডাকা একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বহুকাল পবিত্র ও সংযতভাবে শক্তিপূজার ফলে ভারতের ঋষিরাই প্রথম জ্ঞাত হইয়া প্রচার করিয়াছেন যে, জগদম্বা সগুণা এবং নির্গুণা উভয়ই। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়া ভারতের দর্শনকার যে দুই পদার্থ জগতের মূল নির্দেশ করিয়াছেন, উহা একই বস্তুর একই কালে বিদ্যমান দুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশবিশেষ। তবে দেশকালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাবলম্বনে সবাহ্যান্তর্জ্জগৎ-উপলব্ধিকারী মানবমন একই কালে, একেবারে জগদম্বার ঐ দুই ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম। কারণ, মানবমন স্বভাবতঃ এমন উপাদানে গঠিত যে, উহা আলোকান্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ভাবকে একত্রে একই সময়ে গ্রহণে অপারগ। সেজন্য দেশ-কালাবচ্ছিন্ন সগুণ ভাবের উপলব্ধির সময় সে জগদম্বার নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং সমাধিসহায়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যখন সে জগন্মাতার নির্গুণ স্বরূপের প্রত্যক্ষ করে, তখন আর তাহার নয়নে তাঁহার সগুণ ভাবের ও সগুণ-ভাবপ্রসূত জগতের উপলব্ধি হয় না। তবে সমাধিভূমি হইতে নামিয়া পুনরায় সাধারণভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহার সমাধিকালানুভূত জগদম্বার নির্গুণ ভাবের যে কতকটা স্মৃতি থাকিয়া যায় তাহাতেই সে নিঃসংশয় বুঝিতে পারে, তিনি নির্গুণা ও সগুণা উভয়ই। সেজন্য জগৎকারণের স্বরূপসম্বন্ধীয় পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করিবার একমাত্র পথই যে নির্বিকল্প সমাধিলাভ, এ-কথা ভারতের সকল ঋষি ও দর্শনকারই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

—স্বামী সারদানন্দ

[ভারতে শক্তিপূজা, ৯ম সং, পৃঃ (১)-(২)]

কথাপ্রসঙ্গে

মায়ের আহ্বান

মায়ের আহ্বান—মধুর আহ্বান—আমরা সকলেই শুনিয়াছি, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি। এ যে মায়া-মিশ্রিত মহামায়ার আহ্বান! অথবা মহামায়ারই মায়ার খেলা! মানুষের সাধ্য কি এই দুরতিক্রমণীয়া দৈবী মায়া নিজ অহমিকা-কেন্দ্রিক ক্ষুদ্রশক্তিতে পার হইবে? 'যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়ার পারে যাইতে পারে।'—গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি। গীতা শ্রীভগবানেরই মাতৃরূপ, গীতাই মুক্তিদায়িনী মহামায়া।

মায়ের আহ্বান—আমরা শুনিয়াছি সেই শৈশবে আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে। ঘুমন্ত শিশুকে মা ডাকিতেছেন, 'ওঠ, জাগো—বেলা হ'ল—আর ঘুমোয় না'—তন্দ্রাজড়িত শিশু নয়ন মেলিয়া দেখিল মায়ের হাসিমুখ—শুনিল মায়ের মধুর বাণী: 'ওঠ, জাগো!' কিছুটা ইচ্ছায়, কিছুটা অনিচ্ছায় শিশু মায়ের ডাকে সাড়া দিল—উঠিল, জাগিল; কিন্তু দিনের খেলায় মত্ত হইয়া গেল! এ জাগরণ জগৎ-লীলায়, সংসার-লীলায়, এ তমঃ হইতে রজোগুণে উত্তরণ! মা নিজেও কোথায় হারাইয়া গেলেন! লীলাময়ী মনকে চোখ ঠারিয়া দিয়াছেন, 'এখন খেলা কর গে'। খেলার মাঝেও মাঝে মাঝে মায়ের আহ্বান আসে, কিন্তু কোলাহলে হারাইয়া যায়!—কর্ম-কোলাহলে! প্রমত্ত জীবন-লীলায় কে আর মাকে মনে রাখিবার সময় পায়?

মা-ই মনে রাখেন শিশুকে; সন্তানকে তিনি তো ভুলিতে পারেন না। দিনান্তে তিনি খুঁজিতেছেন পলাতক শিশুকে, ডাকিতেছেন—দুরন্ত সন্তানকে: 'খোকা তুমি কোথা?' 'আমি নীচে।' সন্তান এ-বিষয়ে সজাগ যে, মা উপরে, আমি নীচে—অনেক দূরে।

'ওখানে কি ক'রছ?'

'খেলা করছি!'

'অনেক খেলা হয়েছে, এবার ওপরে এস!'

'না, আর একটু খেলব!'

সন্তানের ইচ্ছাধীনা স্নেহময়ী জননী চুপ করিয়া অপেক্ষা করেন, কিন্তু সন্তানের কল্যাণে নিজের শাসন শিথিল করেন না—এবার দৃঢ় কণ্ঠে আহ্বান করেন:

'অনেক খেলা হয়েছে। আর খেলা নয়—এবার ওপরে এস, আমার কাছে।' 'যাচ্ছি' বলিয়া সন্তান মায়ের স্নেহের আহ্বানে সাড়া দেয়, ছুটিয়া উপরে আসে, মায়ের কাছেই তার বিশ্রাম, শান্তি—সারাদিনের হিসাব-নিকাশ, সুখ-দুঃখের পরি-পূর্ণতা। এ আর এক উত্তরণ—রজঃ হইতে সত্ত্বে!

খেলাশেষে আর এক জননী অপেক্ষা করিতেছেন। ইনি শ্রুতিজননী—গায়ত্রীজননী, উপনিষদ্‌মুখে ইনি ডাকিতেছেন: ওঠ, জাগো—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এ মোহনিদ্রা হইতে ওঠ, কতদিন আর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকিবে? এই দুঃস্বপনের নিদ্রা হইতে জাগো। কত আর স্বপ্ন দেখিবে—তাও যদি সুখের স্বপ্ন হইত! এ যে দুঃস্বপ্নের পর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছ, চীৎকার করিতেছ—তাই বলি, ওঠ জাগো, সুখদুঃখের মোহনিদ্রা হইতে, জন্মমরণের দুঃস্বপ্ন হইতে। তুমি তো দেহ নও, মন নও, তুমি আত্মা—অজর অমর অব্যয় অক্ষয় আত্মা। সত্যি তুমি সেই—'তৎ ত্বম্ অসি'।

বার বার শুনিলেও এ-কথা বিশ্বাস হয় না—এ সত্য ধারণা হয় না। কিন্তু শ্রুতিজননী জানেন, এ ছাড়া পথ নাই: 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—অতএব এই পথেই সন্তানকে লইয়া যাইতে হইবে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে, মৃত্যু হইতে অমৃতে! তাই বার বার শ্রুতি বলিতেছেন: আমার কথা অবহেলা করিও না—আমার কথা বিশ্বাস কর—

শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্য! আমি তোমার কল্যাণকামী স্নেহময়ী জননী—আমার কথা অবিশ্বাস করিও না, সন্দেহ করিও না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাকে জ্ঞান ভক্তি মুক্তির পথে লইয়া যাওয়া, ওঠ, জাগো, চলো আমার সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে আর এক কাহিনী—উপর হইতে পড়িয়া গিয়া যাহার পা ভাঙিয়া গিয়াছে, সে যাইবে কি করিয়া—পাহাড়ের দুর্গম গহ্বরে পড়িয়া গিয়া পা জখম হইয়া গিয়াছে—যাইবার উপায় নাই। এদিকে রাত্রি আসিতেছে—ওদিকে নেকড়ে বাঘ বাহির হইয়াছে, বিকট ডাকিতেছে, মেষশিশু ভয়ে কাঁপিতেছে—তাহারই মধ্যে মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে ডাকিতেছে। আবার ওদিকে মেষপালকের ঘুম নাই, সেও ডাকিতেছে—ধীরে ধীরে দুই ডাক কাছাকাছি হইল, গহ্বরে নামিয়া মেষপালক মেষশিশুটিকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া মায়ের কাছে আনিয়া দিল।

কী অপূর্ব চিত্রকল্প! আধ্যাত্মিক জীবনে পতন ও পরিত্রাণের এক পরিপূর্ণ চিত্র! প্রমাণিত হইল পতন স্বাভাবিক, প্রমাণিত হইল পরিত্রাণের দায়িত্ব এক ঊর্ধ্বতর শক্তির। তবে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—হারোনো ও প্রাপ্তির মধ্যে এখানে যোগাযোগ শব্দশক্তির শ্রুতির, ডাকাডাকির বা পরস্পরের আহ্বানের!

আর এক আহ্বান! এও মায়েরই আহ্বান, তবে মহামায়ার সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী মহাশক্তির! সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—তিনই তাঁহার লীলা—তিনেই তাঁহার আনন্দ! তিনি চান সন্তান তাঁর খেলার সাথী হউক! সন্তানও তাঁহার এই ত্রিবিধ লীলার মর্ম অবগত হইয়া দুঃখ অতিক্রম করুক। ত্রিগুণকে অতিক্রম করুক।

প্রথম লীলায় সন্তান নিদ্রাচ্ছন্ন, তাহারই মধ্যে সৃষ্টি শুরু হইয়া গিয়াছে, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব জীবকে পীড়িত করিতেছে। জীবন কখনও মধু, কখনও কটু বলিয়া বোধ হইতেছে! সৃষ্টির উষাকালেই বুঝিবা প্রলয় হয়! তাই পালনপরা মহামায়া তামসী রূপ লইয়া দূরে সরিয়া গেলেন এবং পালনশক্তি বিরুদ্ধ দ্বন্দ্বভাব দূর করিয়া সাম্য স্থাপন করিলেন, যাহাতে পালন-লীলা সহজ ও সুন্দর হয়!

কিন্তু দুঃখের বিষয় সাম্যভাব বড়ই অস্থায়ী—আবার অসাম্য আসিয়া পড়ে, আবার দ্বন্দ্ব ভাব! এবারের দ্বন্দ্ব দেবতা ও অসুরের। দেবতা দেবীকে জানে তাহাদেরই অন্তর্নিহিত সম্মিলিত শক্তিরূপে। দেবতারা তাঁহাকে চেনে তাহাদের অন্তরের অন্তরতম বলিয়া। অসুর তাঁহাকে মনে করে প্রতিদ্বন্দ্বী—তাই তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রমত্ত হয়, এবং পরিশেষে পরাজিত হয়। দেবীশক্তি সহায়ে দেবতারা স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পায় এবং মহাসমারোহে এই পালনীশক্তির পূজা করে! পূজা পরিতুষ্টা দেবী এই বলিয়া অন্তর্হিতা হন :

"যখনই দুঃখ আসিবে, বিপদে পড়িবে, আমাকে ডাকিও, সর্বদা মনে রাখিও, তোমাদের একজন মা আছেন।"

কিছুদিন পরে দেবপ্রকৃতি সন্তান আবার অসুরপ্রকৃতি সন্তান দ্বারা নির্জিত নিপীড়িত হয়! তাহাদের মাকে মনে পড়ে—মাকে ডাকে। ষোড়শীরূপা মা ছল করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কাহাকে ডাকিতেছ, কেন?' তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি আবির্ভূত হইয়া বলেন, এরা আমারই স্তব করিতেছে, পূজা করিতেছে। বিপন্ন দেবগণ মাকে চিনিতে পারে 'মা' বলিয়া; অসুর পারে না। অসুর মনে করে—এ অপরূপা নারীরত্ন আমাদেরই ভোগ্যা,—এই প্রকার চিন্তাই তাহাদের মৃত্যুবীজ!

সৃষ্টিস্থিতিলয়ের লীলা চলিয়াছে, চিরকাল চলিবে। মা শুধু চান, সন্তান যেন তাঁহাকে ভুলিয়া না যায়। বিপন্ন হইয়া যেন তাঁহাকেই ডাকে। হাঁ তিনি আরও চান—সন্তান তাঁহার খেলার সাথী হউক। তবে যে মুক্তি চায়, সে মুক্তি পায়। মা কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া খেলার সাথীদের ডাকিয়া যান—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়!

ডাক

'বৈভব'

আমায় ডাকতে শেখাও মা
আমি যে ডাকতে জানি না।
যে নামেতে শিশু ডাকে
তার, একটি মাত্র চেনা মাকে
কেঁদে কেঁদে থেকে থেকে
ডাকে 'মা, মা, মা'—
যে ডাক শুনে ছুটে আসে
কাজ ফেলে মা ছেলের পাশে
সে ডাকটি আজ শিখিয়ে দে-না মা।

শিখিয়েছিলি ভুলে গেছি।
তাই, ডাকতে পারি না।

কতদিন আর রইবি ভুলে
এবার নে মা কোলে তুলে
কানে কানে 'মা, মা' বলে
শেষের ডাকটি শিখিয়ে দে-না মা।

'মা, মা' মন্ত্রে খেলা শুরু
মা-ই জগতের মহাগুরু
যবে, মরণ বুকে দুরু দুরু
শুধু 'মা, মা' বলে শেষ ডাক তুই ডেকে নে না।
যার ডাক তুই তারে দিয়ে—
এবার, মায়ের মাঝে হারিয়ে যা না।

সন্ন্যাসাশ্রম ও বর্তমান যুগে সমাজের প্রতি সন্ন্যাসীর কর্তব্য*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

'সন্ন্যাসাশ্রম ও বর্তমান যুগে সমাজের প্রতি সন্ন্যাসীর কর্তব্য'—আজকের এই আলোচ্য বিষয়টি বেশ শক্ত; কারণ এতে মনে হ'তে পারে আমি যেন আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি। তাই সর্বাগ্রে পরিষ্কার ক'রে বলছি যে, আমার বক্তব্য আপনাদের কোন রকম উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়—বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে আমার মনে যা চিন্তা এসেছে, তাই শুধু আপনাদের কাছে প্রকাশ করছি। বিষয়টি নিয়ে নীরবে যা ভেবেছি, এ যেন তারই সরব প্রকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দ খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের বলেছেন যে, প্রত্যেক জাতির এক-একটি মহান্ আদর্শ আছে এবং সেই আদর্শে পৌঁছুতে এবং উপলব্ধি করতে সেটিকে সযত্নে পোষণ করতে হয়। যতদিন সেই আদর্শ উজ্জ্বল থাকে, ততদিন জাতি উন্নতি লাভ করতে থাকে, কিন্তু যখনই সেই আদর্শ নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে, তখন জাতিরও অবনতি ঘটে—শেষে আদর্শভ্রষ্ট হ'য়ে সে তার অস্তিত্ব হারায়। অন্য জাতির মতো ভারতবর্ষেরও নিজস্ব কিছু আদর্শ আছে। ভারতবর্ষ তার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে ধর্ম ও মোক্ষকে এবং গত চার হাজার বছর বা তারও অধিক কাল এই মহান্ আদর্শকে ভারতবর্ষ ধরে আছে। এই আদর্শ কখন ছিল উজ্জ্বল, কখন ম্লান, কিন্তু এই আদর্শকে কখনও জাতি বর্জন করেনি। ভারতবর্ষে সব সময়ে এমন অনেক মানুষ ছিলেন, যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন ঈশ্বরোপলব্ধি ও মোক্ষলাভের সাধনা দ্বারা এই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। জাতির সামনে আদর্শকে এই-রকমভাবে তুলে ধরা হয়েছিল যে, সকলে যাতে ধীরে ধীরে এই দিকে অগ্রসর হ'তে পারে। ভারতবর্ষের ঋষিরা জানতেন, প্রত্যেকেই প্রথম থেকে ঐ মহান্ আদর্শের যোগ্য অধিকারী নয়। তাই এই আদর্শলাভের জন্য বিশেষ শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন। আর এই শিক্ষা-কালে তাদের নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী জীবনকে উপভোগ করার কিছু স্বাধীনতাও তাদের দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সমগ্র সমাজ চতুরাশ্রমে বিভক্ত হয়েছিল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ এবং সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রম। এই আশ্রমগুলির প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারিত ছিল। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ছাত্রদের জন্য এই-রকম সব কর্তব্য নির্দিষ্ট থাকত, যা তাদের সংসার থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। শিক্ষার্থীরা উন্নত-চরিত্র শিক্ষকের সাহচর্যে সংসার থেকে দূরে বাস ক'রত। শিক্ষান্তে তারা আবার সমাজে ফিরে গিয়ে জনহিতকর কাজ করার অনুমতি পেত। গার্হস্থ্য আশ্রমীদের বলা হ'ত—অর্থ উপার্জন করতে, জীবনে কিছু ভোগ ক'রে নিতে, সমাজের উন্নতি-সাধনে সহায়তা করতে, এবং আদর্শকে এমনভাবে স্থাপনা করতে, যাতে সকলেই সুযোগ পেতে পারে মোক্ষরূপ ঐ চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর

* ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮১, কনখল (হরিদ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আয়োজিত সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসী ও মণ্ডলেশ্বরের সম্মুখে এই ভাষণটি প্রদত্ত হয়। বঙ্গানুবাদ: ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য।—সঃ

হ'তে।—গার্হস্থ্য আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্যই ছিল এই। প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমই ছিল অন্য তিন আশ্রমের প্রধান অবলম্বন এবং নির্ভর। গার্হস্থ্য আশ্রমই ছিল সমগ্র সমাজের, সমগ্র জাতির স্তম্ভস্বরূপ। সর্বশেষে ছিল সন্ন্যাস আশ্রম —যেখানে মানুষ সবকিছু পরিত্যাগ ক'রে উচ্চতম আদর্শ-উপলব্ধির জন্য আত্মনিয়োগ ক'রত। এই সন্ন্যাসীরাই ত্যাগের আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরতেন এবং তাঁদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়েই তাঁরা মোক্ষের আদর্শকে জাতির সম্মুখে রাখতেন। এইভাবে তাঁরা সমাজের সেবা করতেন তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে, এবং সমাজও বিনিময়ে খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তাঁদের জন্য যোগাত। কোন অভাবের চিন্তা তাঁদের করতে হ'ত না। সমাজ সন্ন্যাসীদের সাহায্য ক'রত জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যুগিয়ে, যাতে তাঁরা নির্বিঘ্নে সাধনা করতে পারেন। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি আর সে-রকম নয়। সমাজ-জীবনে, জাতীয়-জীবনে আজ সে-শৃঙ্খলা নেই। গীতার প্রথমেই আমরা পড়ি—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, যুদ্ধ করা ভাল নয়, কারণ এর ফল—নরহত্যা আর পরিণামে অধর্মের বৃদ্ধি। যখনই অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন সব-রকমের অনাচার দেখা দেয়, জীবনের উচ্চমূল্যবোধ ভুল হ'য়ে যায় এবং সমগ্র সমাজ কলুষিত হয়

বর্তমান যুগে দুটি বিরাট বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা দেখতে পাই—অর্জুন যা বলেছিলেন, তা আক্ষরিক সত্য। সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, জীবনের উচ্চমূল্যবোধ নষ্ট হ'য়ে গেছে এবং মানুষ অনাচারে লিপ্ত। এই বিশৃঙ্খল অবস্থা শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা বিশ্বে। আমরা চারদিকে দেখতে পাচ্ছি দুঃখদায়ক দৃশ্য। এই বেদনাদায়ক অবস্থায় সন্ন্যাসী হিসাবে আমাদের কি কর্তব্য? আমরা সন্ন্যাসীরা একটা সঙ্কট অবস্থার সম্মুখীন। এ সমস্যা সমাধান করার মাত্র দুটি পথ আমাদের আছে: যেমন এতকাল চলে আসছে—সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি, যেন আমাদের কিছুই করণীয় নেই সেখানে। অথবা, একান্ত আপন-বোধে সমাজের দুঃখকষ্টকে অনুভব ক'রে সাধারণ মানুষের স্তরে গিয়ে, তাদের সঙ্গে একযোগে সমাজের জন্য উন্নয়নের কাজ করতে পারি। আমি মনে করি, দ্বিতীয় পথটির উপরই বেশী জোর দেওয়া উচিত। কারণ, আমরা যদি সমাজ থেকে দূরে সরে থাকি এবং জনসাধারণের সঙ্গে না মিশি, তাহলে আমাদের সন্ন্যাস আশ্রম বিপন্ন হবে এবং ক্রমে তা সব দিক থেকেই শক্তিহীন হ'য়ে পড়বে। আমি যতদূর জানি, প্রায় সব সন্ন্যাসী-সঙ্ঘেই ত্যাগী কর্মীর অভাব। আমার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আদর্শ সন্ন্যাসীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কেন? কারণ, সমাজে সাধারণতঃ ত্যাগের আদর্শ এখন নেই। আমরা সন্ন্যাসীরা স্বর্গ থেকে আসিনি—এসেছি সমাজ থেকে। নৈতিক স্বাস্থ্যবান্ ও দৃঢ় চরিত্রবলসম্পন্ন সমাজই মাত্র পারে আদর্শ সন্ন্যাসী সৃষ্টি করতে। যদি আমরা সাধারণের সঙ্গে না মিশি এবং তাদের মধ্যে কাজ না ক'রে এড়িয়ে চলি, তাহলে তারা কেমন ক'রে নিজেদের সংশোধন করবে এবং ঠিক পথে চলবে? যদি তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি না হয়, তাহলে আমরাও বা কেমন ক'রে সেই সমাজ থেকে তেজস্বী ত্যাগী ছেলেদের পাব? আর যদি এই-রকম দুর্বল সমাজ থেকে ছেলেরা আসে সাধু হবার জন্য, তারা হবে—যেমন শ্রীধর স্বামী তাঁর গীতার টীকায় বলেছেন, 'পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ'—সব সময় পরের দোষ-অন্বেষী এবং ঝগড়াটে। সুতরাং আমাদের নিজেদের স্বার্থে আমাদের কর্তব্য জনসাধারণের কাছে গিয়ে তাদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা

করা। অধিকন্তু সাধু হিসাবে সমাজের কাছে আমাদের ঋণও রয়েছে। কেন-না এতদিন আমরা সমাজের কাছে সেবা পেয়ে এসেছি। তাই জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা ক'রে এবং উন্নততর ভিত্তির উপর সমাজ-পুনর্গঠনে তাদের সাহায্য ক'রে আমাদের সেই ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করা উচিত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধুরা এই-রকম উন্নয়নমূলক কাজ কিভাবে করবে। আমার মনে হয়, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের মূলে রয়েছে শিক্ষা-পদ্ধতি। প্রচলিত যে-শিক্ষাব্যবস্থা, তা আদৌ 'শিক্ষা' নামেরই যোগ্য নয়। এ শিক্ষা নেতিবাচক। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নীতি বা ধর্মের কোন স্থান নেই। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছেলেদের মধ্যে যথার্থ শুভসংস্কারকে জাগাতে মোটেই পারছে না। যদি শিক্ষাব্যবস্থা খারাপ হয়, তাহলে আমরা আশা করতে পারি না যে, এর মধ্য থেকে যোগ্য লোক বেরিয়ে এসে জাতির দায়িত্ব নেবে এবং জনগণের উন্নতির জন্য সাহায্য করবে। সুতরাং এই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সত্যকার শিক্ষা হবে—যেমন স্বামীজী বলেছেন, 'মানুষ তৈরি' করার উপযোগী। শিক্ষার ভার নিতে হবে সন্ন্যাসীদেরই, তবেই শিক্ষাব্যবস্থাকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যেতে পারে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই-রকম শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। সেই সময়ে লৌকিক বিষয়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক দিকটার উপর খুব জোর দেওয়া হ'ত। নারদের সেই গল্পটি আমার মনে পড়ছে—নারদ একবার ঋষি সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বললেন, 'সমগ্র বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েছি, মনে শান্তি পাচ্ছি না।' গুরু সনৎকুমার বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এটা ওটা অনেক জেনেছ, কিন্তু তুমি কি সেই সত্যকে জানো, যা জানলে সবকিছু জানা যায়?' নারদ উত্তর দিলেন, 'না'। এই গল্পের তাৎপর্য—ধর্মের ভিত্তি ছাড়া আমাদের শিক্ষা অর্থহীন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ফলে যতই আমরা চন্দ্র বা মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে যাওয়ার জন্য গর্ব বোধ করি না কেন, এতে আমরা আমাদের আদর্শে পৌঁছুতে পারি না।

এইখানেই আমাদের সাধুসমাজ 'ইতি'-বাচক কিছু করতে পারেন। যখন স্কুল এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছেলেদের চরিত্রগঠনের শিক্ষা দিতে পারছে না, তখন আমাদের সন্ন্যাসীদেরই একান্ত কর্তব্য শিক্ষার কাজটিকে হাতে তুলে নেওয়া এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের যথার্থ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা। একমাত্র ধনসম্পদ মানুষকে রক্ষা করতে পারে না—যেমন কথায় বলে 'মানুষ শুধু ভাতরুটি খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না।' তার বেঁচে থাকার জন্য আরো কিছুর প্রয়োজন এবং সেই 'আরো কিছু' হ'ল জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ জাগাতে আমাদের সাধুসমাজকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রত্যেক মানুষকে শেখাতে হবে—একদিকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এবং চরিত্রগঠনমূলক বিজ্ঞান; অপরদিকে কুটিরশিল্প এবং স্বাস্থ্যবিধি। আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। সেইজন্য কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় খুব বেশী কাজ হবে না। সর্বাগ্রে তাদের সাহায্য করতে হবে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হ'তে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'খালিপেটে ধর্ম হয় না।'

সুতরাং আমাদের সাধুরা বিশ্বের মানুষের কাছে গিয়ে, মানুষে মানুষে যে অস্বাভাবিক ভেদ এবং জাতিভেদ-কুসংস্কারজনিত অসাম্য, তা দূর ক'রে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গঠনে সাহায্য করতে পারেন। তাঁদের উচিত—আরো বেশী স্কুল-কলেজ খোলা, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা শিখবে লৌকিক বিষয়ের সঙ্গে ভারতীয় জীবনের মূল্যবোধ। এতে

সাধুদের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ আরো বেশী হবে। আমরা সন্ন্যাসীরা সবাই যদি জনসাধারণের সঙ্গে এই-রকম সম্পর্ক রাখতাম, তাহলে আমাদের অনেক ভাই-বোনের অন্যধর্ম গ্রহণের যে দুঃখজনক ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে, তা হয়তো আদৌ ঘটত না। অবশ্য এর থেকেও এখন আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত, এবং সমাজে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে আমরা যেন সক্রিয় হ'য়ে উঠি। লৌকিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষের আদর্শ উপলব্ধির জন্যও তাদের প্রস্তুত করতে হবে। আমরা তাদের মোক্ষের আদর্শ শিখিয়ে আসছি ঠিক, কিন্তু খালিপেটে সে-শিক্ষা হ'তে পারে না। সুতরাং আমাদের সাধুসমাজের সদস্যদের অবশ্যই উচ্চস্থান থেকে নেমে এসে জনগণের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের শিক্ষা দিয়ে উন্নত করতে হবে—অর্থনৈতিক, শারীরিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে। যখন সব দিক থেকে উন্নতি হয়, তখনই মানুষ ধর্মের দিকে আসতে পারে। যখন সমাজে এই-রকম সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হবে, তখন আমরা জাগতিক কাজকর্ম থেকে বিরত হ'য়ে আমাদের আশ্রমে বা অরণ্যে বিরাম নিতে পারব এবং পূর্বের মতো সাধনভজন ক'রে জীবন কাটাতে পারি। আমি মনে করি, এইটাই স্বামীজীর আদর্শের অনুযায়ী ভাব।

আশঙ্কা হচ্ছে, আমি আমার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছি কিনা, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কোনও রকম উপদেশ দেওয়ার জন্য এই কথাগুলি বলিনি। অনুগ্রহ ক'রে আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার কোন অধিকার নেই সাধুসমাজের মহাত্মাদের উপদেশ দেওয়ার। শুধু আমি যেটা চিন্তা করেছি, সেটাই আপনাদের কাছে উচ্চস্বরে বললাম। এইভাবে আমি এক-রকম আত্মবিশ্লেষণই করলাম। ইদানীং সব সময় আমি এই চিন্তাই ক'রে আসছি যে, আমরা সন্ন্যাসীরা সমাজের জন্য কি করতে পারি, এবং এটা সেই চিন্তারই একটু বহিঃপ্রকাশ—তা-ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর মানে এই নয় যে, শুধু সন্ন্যাসীরাই এই-সব কাজ করবেন। গৃহী ভক্তদেরও এই কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর গৃহী ভক্তদের কর্তব্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাহায্য করা। তবেই তাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত ব'লে নিজেদের পরিচয় প্রদানের যোগ্য হবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষণ করুন যেন আমরা এই সঙ্কট অতিক্রম করতে পারি; কেবলমাত্র ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে যেন এক নবীন সমাজের অভ্যুদয় হয়, যেখানে মানুষ ধর্মপথে চলবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে এবং শান্তিতে থাকবে, তাঁদের শ্রীচরণে এই-ই আমার প্রার্থনা।



শিব-সতী

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮২ নন্দলাল বসু—অঙ্কিত চিত্র

সতী ও উমা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সুরথ-রাজা মেধস-মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিলেন, সেই দেবী কে? কি ভাবে তিনি উৎপন্না হন, আর তাঁহার কর্মই বা কি প্রকার?" মুনির উত্তর: "সেই মহামায়া নিত্যা, তাঁহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তিনি জগদ্রূপিণী, যাহা কিছু দেখিতেছ, তিনি সকলকে ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। তবুও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি কখনও কখনও মূর্তি পরিগ্রহ করেন। তখন লৌকিকভাবে তাঁহাকে 'উৎপন্না' বলা হয়। এই প্রকার জন্ম তাঁহার বহুবার হইয়াছে। আমি বলিয়া যাই, শুন।" (চণ্ডী ১।৬০, ৬৪-৬৬)

ঋষি পর পর মহামায়ার তিনটি অবতরণের কথা বর্ণনা করিলেন। চণ্ডীগ্রন্থে দেবীর সেই সব কীর্তিকলাপের কথা পড়িয়া আমরা রোমাঞ্চিত হই, যিনি অমূর্তা—সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি তিনি শরীর ধারণ করিয়া কী বীর্য প্রকাশ করেন, স্বর্গে মর্ত্যে নানা অশুভ সঙ্কট দূর করিয়া কী কল্যাণ ও শান্তি বিকীর্ণ করেন, তাহা শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় হয়। 'মা' 'মা' বলিয়া আমরা দেবীর স্তুতি করি, তাঁহার কৃপাভিক্ষা করি।

চণ্ডীতে নাই—অন্যান্য পুরাণগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মহামায়ার অপর এমন দুটি জন্ম ও কর্ম-বৃত্তান্ত যুগ যুগ ধরিয়া ভক্তের হৃদয়ে অনুপম মাধুর্য সিঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। সতী-মা এবং উমা-মায়ের কাহিনী। শুনিতে শুনিতে আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হই, কাঁদিয়া উঠি, আবার আনন্দে আপ্লুত হই।

লোকপিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্রদের মধ্যে প্রজাপতি দক্ষ শৌর্য-বীর্য-মেধা-পরাক্রমে ত্রিলোক-মান্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি কন্যা ছিল। সর্বকনিষ্ঠা সতী। জগজ্জননী মহামায়াকে কন্যারূপে পাইবার জন্য দক্ষ অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। মহামায়া তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা-রূপে জন্ম লইলেন। এই কন্যাই সতী। বালিকার অসাধারণ রূপগুণ এবং চরিত্রমাধুর্য তাহাকে সকলের সমাদৃতা এবং স্নেহপাত্রী করিয়াছিল। পিতা দক্ষের সে ছিল নয়নমণি। ক্রমশঃ বালিকা বিবাহযোগ্যা হইলে পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের নিকট প্রস্তাব করিলেন, সতীকে শিবের হাতে সমর্পণ কর। পরম শান্ত সর্বভূতাত্মদর্শী যোগীশ্বর দেবতাশ্রেষ্ঠ শিবের অপেক্ষা সতীর উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে?

শিবের তখনও বিবাহ হয় নাই, কৈলাসে একান্ত বাস করিতেছেন। মহাদেবের উপর প্রজাপতি দক্ষের ধারণা বড় ভাল ছিল না, কেননা যদিও তিনি অশেষ সাত্ত্বিক দৈব ঐশ্বর্যে বিভূষিত এবং সর্বজীবস্পর্শী উদার প্রেম, ধৈর্য ও ক্ষমার জন্য সকলের বরণীয়, তবুও তাঁহার জীবন-চর্যার অনেক কিছু সভ্যসমাজের অনুগামী ছিল না। যাহা হউক লোকপিতামহের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা যায় না, অতএব দক্ষ বিবাহে সম্মতি দিলেন। বড় ঘটা করিয়া শিব-ঠাকুরের সহিত সতীর পরিণয় হইয়া গেল।

কৈলাসে শিবের সংসারে গৃহস্থালীর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আজন্ম ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে পরিপালিতা দক্ষকন্যা শিবের পরিচর্যায় লাগিয়া গেলেন। কাজের সাহায্যের জন্য দাস-দাসী নাই আছে অবশ্য এক পাল বেয়াড়া

শিব-অনুচর, কিন্তু তাহাদের দিয়া গোছগাছ অসম্ভব। কর্তার মতো না আছে তাহাদের সময়ের বা ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞান, না আছে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস। বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ব্যোম্ ব্যোম্ রবে গলা ফাটাইয়া চিৎকার করে। তবে সতীকে দেখিলে তাহাদের সকল উন্মত্ততা নিমেষে থামিয়া যায়। শিবগেহিনীর চরণ দুটির দিকে চাহিয়া তাহারা করজোড়ে গদ্‌গদ স্বরে বলিয়া উঠে, মা, মা, জয় মা। সতী হাত তুলিয়া সস্মিত দৃষ্টিতে তাহাদের আশীর্বাদ করেন। মহাদেব ধ্যানের আসনে বসিয়া সব দেখেন, বড় প্রীতি লাভ করেন।

এদিকে কোনও এক ঊর্ধ্বলোকে প্রজাপতিদের এক মহৎ যজ্ঞের উদ্যোগ চলিতেছে। দেবতারা উপস্থিত আছেন, অনেক ঋষি মুনি ব্রাহ্মণগণও। যজ্ঞের পূর্বে সভা বসিয়াছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট। দেবতারা যে যাঁহার স্থানে আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রজাপতি দক্ষের আসিতে একটু দেরী হইয়াছে। তিনি সূর্যের ন্যায় তেজে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। সকলেই উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রহ্মা উঠিলেন না - কেননা তিনি সকলের গরিষ্ঠ, তাঁহার কাহাকেও মান দিবার কথা নয়। কিন্তু শিব উঠিলেন না কেন? তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দক্ষও দেখিলেন এবং নিজেকে দারুণ অপমানিত বোধ করিলেন। তাঁহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। যাহা হউক তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শিব নির্বিকার বসিয়া আছেন

দক্ষের ক্রোধাগ্নি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে মহর্ষিগণ, দেবগণ, অগ্নিগণ—আপনারা দেখিলেন, শিব আমার জামাতা হইয়াও কি নির্লজ্জভাবে আমার অপমান করিল। তাহার আচরণ সাধুজন-বিগর্হিত। হইবেই না কেন? সে যে কত বড় অসভ্য, তাহা তো সকলেই জানে। কেশ আলুথালু, সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। ভূতপ্রেতগণের সহিত উন্মাদের ন্যায় শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহার নাম শিব, বস্তুতঃ এ নিজে অশিব। ইহার হাতে আমার আদরিণী কন্যাকে দিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কেবল পিতামহের আদেশে দিয়াছি। এখন আমার বড়ই আফসোস হইতেছে।"

সভায় তুমুল বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। দক্ষের অনুগামী ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ দক্ষের পক্ষ লইয়া শিবের সমালোচনা করিতে লাগিলেন, মহর্ষি ও দেবগণের অনেকে দেবদেব মহাদেবের গরিমা কীর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দক্ষের ক্রোধ শান্ত হইল না। তিনি শিবকে অভিশাপ দিলেন—"দেবতাদের যজ্ঞ-সময়ে এই দেবাধম শিব ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যেন যজ্ঞভাগ না পায়।" দক্ষ ক্রোধভরে সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। শিব কিন্তু শ্বশুর দক্ষের কটু কথায় এবং অভিশাপে একটুও রুষ্ট হন নাই। ধীরে ধীরে উঠিয়া সভাস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৪।২)

* * *

কৈলাসে শিবের সাহচর্যে শিবের সেবায় পরমানন্দে সতীর দিন কাটিতেছে। কখনও কখনও মন ধ্যানের গভীরে চলিয়া যায়—নিজের শাশ্বত স্বরূপকে স্পর্শ করে। কে আমি? কে আমি?—এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। উত্তর পান—আমি সেই সনাতন ব্রহ্মশক্তি। শিব সাধারণ দেবতামাত্র নন—তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। আমি তাঁহার শক্তি। তাঁহারই কাজে যুগে যুগে নূতন কলেবর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই। এবার দক্ষ প্রজাপতির গৃহে তাঁহার দুহিতারূপে আমার জন্ম। এই জন্মের নিশ্চয়ই কোন সার্থকতা

আছে। উহা কি তাহা এখন জানিবার প্রয়োজনই বা কি? ধ্যান ভাঙে। সতীর মন আবার প্রাত্যহিক জগতে ফিরিয়া আসে। বিশ্বসংসারের যিনি বিধাত্রী তিনি বধূবেশে শিবের ক্ষুদ্র সংসারের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেন।

একদিন নারদ-মুনি বীণা বাজাইয়া শ্রীহরির নাম গাহিতে গাহিতে কৈলাসপুরীর দরজায় উপস্থিত। হরিনাম শুনিয়া ধ্যানস্থ মহাদেবের সর্বাঙ্গে শিহরণ দেখা দিল। মন উচ্চ ভূমি হইতে নীচে নামিয়া আসিল। নারদ তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শিব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ মুনিবর?" নারদ বলিলেন, "একটা বিশেষ সংবাদ দিতে আসিলাম। লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্যে স্থাপন করিয়াছেন। এই সম্মান-লাভে দক্ষ এক বিরাট যজ্ঞোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। যাবতীয় দেবতা, পিতৃগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ—তাঁহাদের কামিনীগণ সহ এই উপলক্ষে দক্ষালয়ে সমবেত হইতেছেন।

শিব কহিলেন, "কই, আমার তো নিমন্ত্রণ আসে নাই।" নারদ চুপ করিয়া রহিলেন। সতী কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছেন। পিতৃগৃহে এত বড় উৎসব। কত দিন পিতামাতাকে ও স্নেহময়ী ভগিনীদের দেখেন নাই, তাঁহাকে যাইতেই হইবে। হৃদয়ের আর্তি ভর্তাকে জানাইলেন। বলিলেন, "পিতা দক্ষ তো তোমার নিজের শ্বশুর। এত বড় উৎসবের ব্যস্ততায় তোমাকে নিমন্ত্রণ পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। তুমি ও আমি গেলে নিশ্চয়ই তিনি সুখী হইবেন। আপনার লোকের গৃহে যাইতে নিমন্ত্রণের কি প্রয়োজন?"

মহাদেব কহিলেন, "তুমি জান না দেবি, তোমার পিতা আমার প্রতি অকারণে কিরূপ বিদ্বেষপরায়ণ। বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, দেহ, বয়স ও কুল—এইগুলি যেমন মর্যাদার হেতু তেমনি অহঙ্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিতে এইগুলি দোষরূপে পরিণত হয়। প্রজাপতিদের সভায় তিনি প্রবেশ করিলে আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য আসন হইতে উঠি নাই বলিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছি এবং সেই জন্য আমাকে কত কটু কথা বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহা তো তুমি জানো। জ্ঞানী ব্যক্তি সকলের ভিতর পরমাত্মাকে দেখিয়া মনে মনে সকলকে সম্মান করেন। তাঁহাদের পক্ষে লোক-দেখানো শিষ্টাচারের প্রয়োজন হয় না। আমিও তোমার পিতাকে মানসে নমস্কারাদি করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি নাই। কিন্তু ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা তাঁহার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। আমাকে তিনি শত্রু মনে করেন। এখন তুমি যদি অনাহূত হইয়া পিতৃগৃহে যাও, তুমি তাঁহার আদরিণী কন্যা হইলেও আমার সহিত তোমার সম্পর্ক বশতঃ দক্ষ তোমার সমাদর করিবেন না। তুমি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইবে। অতএব তুমি পিতৃগৃহে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

কিন্তু সতীর মন তখন পিতামাতা এবং ভগিনীদের সহিত সাক্ষাতের জন্য এত উতলা হইয়াছে যে, মহাদেবের সদুপদেশ তাঁহার কানে গেল না। তিনি একাই দক্ষালয়ের উদ্দেশে রওনা হইলেন। বহুসংখ্যক শিবানুচর দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। তাহারা দেবীকে অনুনয় করিয়া শিবের বাহন বৃষেন্দ্রের পিঠে উঠাইয়া দিল।

সতী পিত্রালয়ে পৌঁছিলেন। চারিদিকে উৎসব-সজ্জা এবং মহাযজ্ঞের নানা আয়োজন। কিন্তু দক্ষ সতীকে দেখিয়া কোনও আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। সতীর জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন কেহই দক্ষের ভয়ে তাঁহাকে সমাদর দেখাইল না। সতী বুঝিলেন, পিতা দক্ষ দেবদেব রুদ্রকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

মনে হইল সেই তেজে সমস্ত লোক পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। সতীর ক্রোধাবেশ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কতকগুলি ভূত দক্ষের বিনাশের জন্য উত্থিত হইল। সতী নিজ তেজ দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহার পর তিনি যজ্ঞশালায় গিয়া সমবেত দেবতা, ঋষি, মুনি, যক্ষ, বিদ্যাধর, কিন্নর, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলের সমক্ষে প্রজাপতি দক্ষকে কহিলেন, "পিতঃ, ইহলোকে যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু নাই, যিনি দেহধারী সকলের অন্তরাত্মা, কাহারও সহিত যাঁহার বিরোধ নাই, আপনার ন্যায় দাম্ভিক ব্যতীত কে সেই দেবদেব মহাদেবের প্রতিকূলতা করিতে পারে? যাঁহার নাম 'শিব'—এই দুইটি অক্ষর শুধু একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে মানুষের সকল পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, যাঁহার কীর্তি অতি পবিত্র, যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নয়, আপনি সেই বিশ্ববন্ধু শিবের বিদ্বেষ করিতেছেন। আপনি ভগবান্ নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী, আপনা হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি আর ধারণ করিব না।"

পিতার প্রতি ঐ ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া দাক্ষায়ণী সতী মৌনাবলম্বনপূর্বক উত্তরমুখী হইয়া ভূমিতে বসিলেন এবং যোগস্থা হইয়া সর্বাঙ্গে বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন। তাঁহার চিত্ত জগদ্গুরু শিবের পাদপদ্মে নিবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইল। সমাধিপ্রসূত যোগাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার নিষ্পাপ দেহকে দগ্ধ করিল। আকাশ ও পৃথিবীতে মহান্ হাহারব উঠিল। সকলে সন্তপ্ত হইয়া কহিতে লাগিল—"কী খেদের বিষয়! সর্বজনপূজ্য দেবাদিদেব মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গিনী সতীদেবী পিতার শিবদ্বেষ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। দক্ষ কী কঠিনহৃদয় এবং ব্রহ্মদ্রোহী!"

শিবানুচর প্রমথগণ, যাহারা জননী সতীদেবীর সহিত আসিয়াছিল, বিষম ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং নিজ নিজ যুদ্ধাস্ত্র লইয়া দক্ষকে বধ করিতে উদ্যত হইল। যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত মহর্ষি ভৃগু মন্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

দেবর্ষি নারদ সতীর আত্মবিসর্জনের মর্মান্তিক সংবাদ কৈলাসে পৌঁছাইয়া দিলেন। রুদ্রের ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিয়া জটা হইতে একটি কেশ উৎপাটন করিলেন। ঐ কেশ বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখার ন্যায় উগ্রভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। শিব গম্ভীর শব্দে হাসিতে হাসিতে কেশটি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কেশ হইতে এক মহাকায় পুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি শিবাংশ বীরভদ্র। মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তাঁহার সহস্র বাহু। সূর্যের ন্যায় জ্বলন্ত তিনটি চক্ষু, দংষ্ট্রা অতি করাল, কেশভার আগুনের ন্যায় জাজ্বল্যমান। তাঁহার গলায় নরকপালের মালা এবং হাতে নানাপ্রকার শস্ত্র। বীরভদ্র শিবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভু, আদেশ করুন, কি করিতে হইবে।"

শিব বলিলেন, "যাও, যজ্ঞসহ দক্ষকে ধ্বংস কর।"

মহাদেবের আদেশে তাঁহার পার্ষদগণও সিংহনাদ করিতে করিতে বীরভদ্রের অনুগামী হইল। দক্ষের যজ্ঞসভায় তুমুল বিপর্যয় উপস্থিত হইল। রুদ্রানুচরগণ যজ্ঞশালার তোরণ, স্তম্ভ এবং আশে-পাশের বাড়ীঘর ভাঙিয়া চুরমার করিল। কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ভগ্ন করিল, কেহ বা অগ্নি নষ্ট করিয়া ফেলিল। ঋত্বিক্ সভাসদ প্রভৃতি প্রহৃত হইতে লাগিলেন। বীরভদ্র দক্ষের মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন।

শিব তখন স্বয়ং যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলেন। দক্ষপত্নীর কাতর ক্রন্দনে এবং দক্ষপিতা ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব দক্ষকে প্রাণ দান করিলেন, কিন্তু শিবনিন্দা-কলুষিত তাঁহার মুণ্ডের পরিবর্তে

একটি ছাগমুণ্ড তাঁহার দেহে বসাইয়া দিলেন।

সতীর প্রাণহীন দেহ ভূমিতে লুটাইয়া। ধীরে ধীরে শোকাকুল মহাদেব সেই নিষ্পাপ দেহ কাঁধে তুলিয়া লইয়া ভীষণ তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিলেন। ত্রিলোক কাঁপিয়া উঠিল। তখন সৃষ্টি ধ্বংস হইবার উপক্রম দেখিয়া বিষ্ণু তাঁহার চক্র দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিলেন। মোট একান্নটি খণ্ড পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত হইল। যে যে স্থানে দেবীর দেহাংশ পড়িয়াছিল, উহারা একান্ন মহাপীঠ নামে পরে খ্যাত হইয়াছে।

হরিদ্বারের কনখলে যে-স্থানে দক্ষযজ্ঞ এবং সতীর আত্মবিসর্জন ঘটিয়াছিল সে-স্থান আজ মহাতীর্থ হইয়াছে। শত সহস্র নরনারী সতী-মায়ের মন্দিরে তাঁহার পাবন মূর্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অত্যদ্ভুত চরিত্রের অনুধ্যান করিয়া ধন্য হয়। পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল আদর্শ এবং দেবদেব মহাদেবের লোকোত্তর মাহাত্ম্য প্রকট করিবার জন্যই মহামায়ার সতী-লীলা।

[ক্রমশঃ]

শিব-গৌরী

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সেখানে সবার শেষগতি জেনে
　　শ্মশানে নিয়েছে ঠাঁই,
ভস্মেতে শেষ পরিণতি তাই
　　অঙ্গে মেখেছে ছাই।

মৃত্যুর দূত কৃষ্ণগরল
　　কণ্ঠে ধরেছে তায়,
ভীষণভূষণ কাল-ভুজঙ্গ
　　সকল অঙ্গে ছায়।

জ্ঞানের বহ্নি ললাটে জ্বলিয়া
　　প্রলয়ের গীতি গায়,
প্রেমের ইন্দু শেখরে নামিয়া
　　শান্ত করিছে তায়।

আত্মধ্যানের জ্ঞানের মূরতি
　　শিবের স্বভাব জানি,
তাঁর অনুরাগী বিশ্ব-বিরাগী
　　হ'তে চাবে কোন্ প্রাণী ?

এ-কথা বুঝিয়া বিশ্ব-জননী
　　বিশ্ব-জীবের লাগি,
রাজ-নন্দিনী শক্তি-রূপিণী
　　শিবে হ'ল অনুরাগী।

প্রলয়ের কোলে সৃষ্টি বসিল
　　শিবের ক্রোড়েতে শক্তি,
ত্যাগের শ্মশানে হ্লাদিনী বিরাজে
　　জ্ঞানের আগুনে ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

প্রাক্‌কথন

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বিরাট—বিপুল। আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত কালজয়ী হ'য়ে সঙ্গীত ও তার অনুশীলন বেঁচে আছে, তবে তার রূপ, ধারা ও প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন।

আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য সঙ্গীতের অনুশীলন ও আদর্শকে অধ্যাত্মসাধনার অভিমুখী করা। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এ-ধরনের নিদর্শনের অভাব নেই। সমাজের সকল-কিছু পরিবেশে ও অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের আমরা অনুশীলন করি, কিন্তু সঙ্গীতের লক্ষ্য ও যথার্থ আদর্শ অক্ষুন্ন থাকে, যদি সঙ্গীত মানুষের জীবনে আনে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রেরণা এবং সমস্যাময় জীবনে আনে শাশ্বত শান্তি, সান্ত্বনা ও আনন্দময় অনুভূতি।

বর্তমান উনবিংশ-বিংশ সমাজের সন্দেহ-সমাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হয়েছিল অভ্যুদয়। তিনি অতীতের সকল-কিছুকে পরিত্যাগ ও বর্জন না ক'রে সংস্কারসাধন করলেন সকল ধর্ম-মতের ও পথের মৈত্রী-মিলনের এক অভিনব ও অপরূপ তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের উদার উদ্ভিন্ন আলোকে পরিপূর্ণ ও চিরস্নাত হ'ল বিশ্বের সকল জাতির সকল-কিছু ধর্মবিশ্বাস ও সাধনা জীবনের পরম ও চরম আদর্শকে নির্দেশ ক'রে ও সার্থক ক'রে।

সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণের মতো সঙ্গীতকে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করলেন তাঁর জীবনের সকল অবস্থায় এবং অধ্যাত্ম-সাধনায় অপার্থিব রস-ভাব-সঞ্চারের সহায়ক-রূপে। প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হ'ল তাঁর জীবন এবং সার্থক করলেন সকলের জীবনকে—যাঁরাই এলেন তাঁর পুণ্যস্পর্শে। সঙ্গীতের প্রাণপ্রদীপ প্রজ্বলিত হ'ল তাঁর জীবনসাধনার পথে, সঙ্গীত-তত্ত্বরস মিলিত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনতত্ত্বরসের সঙ্গে,—প্রবাহিত হ'ল দুটি তত্ত্বরসের ধারা একই লক্ষ্য ও আদর্শকে অনুসরণ ক'রে। আজ আলোচনার ক্ষেত্রে সেই মর্মকথারই পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রব শ্রীরামকৃষ্ণেরই অপার মাধুর্য-মহিমাকে স্মরণ ও বরণ ক'রে।

এবার 'ছন্দম্'-সঙ্গীত-সংস্থার শিল্পিবৃন্দ পরিবেশন করলেন 'প্রথম-আদি তব শক্তি' প্রভৃতি গান।

ভাষণ : 'প্রথম-আদি তব শক্তি'—প্রভৃতি গানে মুখরিত সৃষ্টিরই সচঞ্চল বীজময়ী মহাপ্রকৃতি। এই মহাপ্রকৃতি অব্যাকৃতিকে নিয়ে মায়োপহিত কিন্তু মায়াধীশ সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করেন। ব্রহ্মসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২)-সূত্র সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরের সৃষ্টির মর্মকথারই পরিচয় দিয়েছে। কঠোপনিষদের 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' (২।৩।২) এই মন্ত্র,—আচার্য শঙ্কর এই মন্ত্রের বা উপনিষদ্বাক্যের ভাষ্যে বলেছেন: 'যৎ কিঞ্চেদং জগৎ সর্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজতি কম্পতে। তত এব নিঃসৃতং নির্গতং সৎ প্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে'। এভাবে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হ'ল তেমনি বিশ্ববৈচিত্র্যেরই অন্যতম উপাদান সঙ্গীতও সৃষ্টি হ'ল কারণশব্দ নাদ বা প্রণব থেকে। নাদ বা প্রণব শব্দময় মহাসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ ঐ উপনিষদ্বাক্যের প্রসঙ্গে বলেছেন: 'এক মহাপ্রাণের অনন্ত কম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল-বিচিত্র বিশ্বসঙ্গীত ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই। অনন্ত প্রাণের সেই অনির্দেশ্যতা অনির্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়'।

সঙ্গীতশাস্ত্রকাররাও নাদ—আদি বা প্রথম শব্দ ওঙ্কারকে অনাহত ও আহত-ভেদে দু-রকম

বলেন। আহত-নাদ বা বৈখরী-শব্দ থেকেই সঙ্গীতের হ'ল সৃষ্টি। তন্ত্রে কামকলা-কুণ্ডলিনীকেও মহাসঙ্গীতের কারণ বা উৎস ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। সঙ্গীতও রচনা করা হয়েছে কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্দেশে—

জাগো জাগো কুণ্ডলিনী!
আদি-শকতি পরাবিদ্যা নারায়ণী,
ব্রহ্মসনাতনী বাগ্‌বাদিনী ॥—প্রভৃতি।

প্রকৃতপক্ষে আধারশক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণ না হ'লে সঙ্গীতের স্বর, সাহিত্য, ব্যঞ্জনা ও তত্ত্ব কোন-কিছুরই প্রকাশ হয় না সার্থকভাবে। যাইহোক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গীতসাধনার প্রসঙ্গ থেকেই আমরা আমাদের আলোচনার সূচনা করলাম। সেজন্য প্রথমেই ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র-রচিত গান—

দুঃখিনী-ব্রাহ্মণী কোলে,
কে শুয়েছ আলো ক'রে
কেরে ওরে দিগম্বর,
এসেছ কুটীর-ঘরে।

প্রভৃতি গান পরিবেশিত হ'ল শিল্পিগণ-কর্তৃক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ভক্তিসঙ্গীত ও শাক্তসঙ্গীতের সহায়তা নিয়েছিলেন তাঁর অধ্যাত্মসাধনায়। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন সাধক রামপ্রসাদ এবং তাঁর সমগ্র জীবনে শক্তি-সাধনায় শক্তিতত্ত্বানুভূতির উদ্বোধক-রূপে গ্রহণ করেছিলেন শাক্তসঙ্গীতকে—বিশেষভাবে যে সঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন তিনি নিজে। সমগ্র বাঙলাদেশে (তাঁর সময়ে বিহার-আসাম-বঙ্গদেশ ও উৎকল বা উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত ছিল 'বৃহৎ-বঙ্গ' বা বৃহত্তর-বাঙলাদেশ।) সাধক রামপ্রসাদের রচিত গান বা শাক্তসঙ্গীত বাঙলার শুধু নয়—সমগ্র ভারতের সাধকসম্প্রদায়ের আদরণীয়। সাধক রামপ্রসাদ-রচিত—

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল (মায়ের)।
(যাঁর) নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তাঁর কেন কালোরূপ হ'ল ॥
কালোরূপ অনেক আছে
এ বড় আশ্চর্য কালো।
(যাঁরে) হৃদমাঝারে রাখলে পরে
হৃদয়পদ্ম করে আলো ॥—প্রভৃতি।

করুণাময়ী কালীর ভাব অনন্ত এবং সকল ভাবের তিনি অতীত—এ-কথাই রামপ্রসাদ শক্তিসাধনায় বুঝেছিলেন এবং সেজন্য তাঁর জীবনসাধনায় কালীতত্ত্বকে জপমালা ক'রে সংসার-সমস্যার পারে উপনীত হ'য়ে বলেছিলেন—'কালী ব্রহ্ম, জেনে মর্ম, (আমি) ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি'। সাধক রামপ্রসাদ এদিক থেকে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উত্তরসূরী, কেননা পূর্বেই বলেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সাধক রামপ্রসাদের মতো বিভিন্ন তত্ত্বের ও ভাবের সঙ্গীতকে তাঁর সাধনার সহায়-সহচর করেছিলেন।

সাধক রামপ্রসাদের পর শাক্তসঙ্গীতের রচয়িতা ও উদ্‌গাতা-রূপে পাই সাধক কমলা-কান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতিকে। সাধক কমলাকান্তের অসংখ্য গানের মধ্যে দুটি গান—

(১) মা কি আমার কালো রে,
লোকে বলে কালী কালো,
আমার মন তো বলে না কালো রে।
—প্রভৃতি।

(২) আপনাতে আপনি থেকো মন
যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥
—প্রভৃতি।

এ-ধরনের ভাববিদগ্ধ তত্ত্বাশ্রয়ী গান কমলাকান্ত রচনা করেছিলেন নিজের জন্য ও বিশ্ববাসী মাতৃসাধক ও ভগবৎসাধকদের জন্য। রাজা রামকৃষ্ণের আকুল-প্রার্থনার গান—

আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম
(আমার) দিও কর্ণ মূলে ॥—প্রভৃতি।

স্মরণ করিয়ে দেয় সাধনার সময়ে রাজা রামকৃষ্ণের অন্তরের গোপনকথা! শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ সকল গান গাইতেন ভাবময় সাগরে অবগাহন ক'রে। সঙ্গীত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে রস ও ভাবতত্ত্বের উদ্বোধক-রূপে এবং শিক্ষা দিয়েছেন তিনি সকল সাধককে ও বিশ্বের সকল মানুষকে তত্ত্বপূর্ণ ও ভাবদীপ্ত সঙ্গীতের সাহচর্যকে গ্রহণ করতে অধ্যাত্মসাধনায় ও সকল-কিছু জীবনের চিন্তায় ও কর্মে। সঙ্গীত শুধুই শিল্পরূপে জীবনে আলোচনার সামগ্রী নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সঙ্গীত মানুষের অন্তরে প্রসুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত ও প্রদীপ্ত করে এবং তাকে পরিচালিত করে বন্ধন থেকে চিরশাশ্বত মুক্তির পথে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু বাণী ও উপদেশই আছে। এক স্থানে তিনি বলেছেন: 'ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি! তারা (সংসারীরা) কি ভক্তি খোঁজে? তা হ'লে ভাল। ভগবান্ লাভ যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলেই ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা—এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকা চাই। নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়। এই বলিয়া ঠাকুর রামপ্রসাদের গান ধরিলেন—

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে ॥'—প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন: 'আর শাস্ত্র বলো, দর্শন বলো, বেদান্ত বলো—কিছুতে তিনি নাই। তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হ'লে কিছু হবে না'। এই ব'লে পুনরায় তিনি গান করলেন—

ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন,
আগম-নিগম-তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।

তারপর গাইলেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাকতে আমার
জাগা-ঘরে চুরি ॥

কিন্তু জাগা-ঘরে কি চুরি হয়? হ্যাঁ, মানুষ ঘুমে যদি অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে, তবেই চোর ঘরে ঢুকে চুরি করে। গানের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলার উদ্দেশ্য এই যে, চৈতন্যময়ী শ্যামা-মা আত্মা-রূপে সর্বদাই হৃদয়পুরে থাকেন, তবে মানুষ যদি অজ্ঞানের আবরণে সেই হৃদয়ের দ্বার আবদ্ধ ক'রে রাখে, তাহলে আর আত্মার অপরূপ রূপ দেখে জন্ম-মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করবে কেমন ক'রে!

এভাবে কত: গান গাইতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষকে গানের তত্ত্বের দিকে জাগ্রত ক'রে অজ্ঞানের নেশা দূর করার জন্য। সাধকের অধ্যাত্মসাধনার বহুতত্ত্বই গানের ভাবতত্ত্বে উন্মুক্ত ও জাগ্রত হয়। গানের উদ্দেশ্য তাই অধ্যাত্ম-সাধনাকে গানের ভাবপ্রদীপ্তি দিয়ে প্রদীপ্ত করা ও যথার্থ-মুক্তিপথের পরিচয় লাভ করা। গান সেখানে সাধন-গৃহের উজ্জ্বল-প্রদীপ সাধককে সিদ্ধিপথের সন্ধান দেওয়ার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সমগ্র জীবনে গান ছিল লোকশিক্ষার জন্য, মানুষের অবরুদ্ধ লক্ষ্যকে উন্মুক্ত করার জন্য।

এরপর স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত গান 'হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি' প্রভৃতি গানটি ছন্দমের শিল্পিগণ কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

ভাষণ: স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম মিলন

হয়েছিল গানে। স্বামীজী তদানীন্তন স্কটিশ-চার্চ-কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর হেস্টি সাহেবের কাছে দক্ষিণেশ্বরের ঈশ্বরপাগল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনেছিলেন। একদিন নিজে তিনি উপস্থিতও হলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। তাঁর অন্তরে আকুল পিপাসা তখন ঈশ্বরদর্শনের জন্য। তিনি জিজ্ঞাসাও করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে—'ঈশ্বরকে কি দ্যাখা যায়?' উত্তরও পেলেন সুস্পষ্টভাবে—'হ্যাঁ, দ্যাখা যায়—তোমাকে যেমন আমি দেখছি—সেইভাবে।' স্বামীজী আশ্চর্যান্বিত হলেন তাঁর প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর পেয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরোধে তিনি পরে আরও একটি গান গেয়েছিলেন—

যাবে কি হে দিন আমার
বিফলে চলিয়ে।'—প্রভৃতি।

তিনি সমগ্র জীবনে আকুল হ'য়ে আশা-পথ চেয়ে বসে আছেন—কে তাঁকে সন্ধান দেবে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জীবনসাধনার পথে। তিনি সন্ধান পেলেন সেদিন তাঁর জীবনের ও সাধনপথের পরিচালক প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তিনি প্রণাম জানালেন সাষ্টাঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। সেদিন সঙ্গীতই তাঁর জীবনদেবতার সন্ধান দিল দীর্ঘ-আকুল-অনুসন্ধানের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ ক'রে। তিনি সেই জীবনসার্থকতার স্বর্ণময় স্মৃতিকে জাগ্রত করেই পরে শুনিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একটি গান—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥—প্রভৃতি।

ঈশ্বরদর্শন বা আত্মানুভূতি যে নিজ-নিকেতন ও স্বদেশ এবং পরবাস ও বিদেশ ভোগ-বাসনাময় সংসার বা পৃথিবী—এ-কথা তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন সেদিন এবং বুঝিয়েছিলেন বিশ্বের সকল মানুষকে তাঁর জীবনের আদর্শ দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন রীতিমতভাবে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের উস্তাদদের কাছেই। শুধু ধ্রুপদ নয়,—খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের বাংলাগানও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। সঙ্গীতের একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন— যার নাম 'সঙ্গীত-কল্পতরু'। তিনি রচনা করেছিলেন 'আর্ট-মিউজিক' তথা ক্ল্যাসিক্যাল-সঙ্গীতের শ্রেণীভুক্ত অন্ততঃ পাঁচটি গান—যাদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে দুটি কালজয়ী গানের কথা—

(১) এক, রূপ-অরূপ, নাম-বরণ,
অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন,
'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।—প্রভৃতি।

(২) নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ,
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম
ছবি বিশ্ব-চরাচর॥—প্রভৃতি।

একটি সৃষ্টির ও অপরটি প্রলয়ের, একটি সমাধি থেকে ব্যুত্থানের বা জাগরণের ও অপরটি সমাধির সমতলে সকল-কিছুর বিলয়ের কথা! তাছাড়া শিবপ্রসঙ্গেও তিনি দুটি গান রচনা করেছিলেন শিবসমাধিসাগরে নিমজ্জিত হ'য়ে।

এরপর শিল্পিগণ-কর্তৃক স্বামীজী-রচিত 'এক, রূপ-অরূপ, নাম-বরণ' প্রভৃতি গানটি পরিবেশিত হয়। গানটিতে এক ও অখণ্ড এবং সর্ব-বিশেষণ-বিবর্জিত পরমসত্তার স্বরূপ অপরূপভাবে বিশ্লেষিত ও বর্ণিত হয়েছে—যদিও ভাষা, সুর ও শব্দ দিয়ে ঐ পরম ও দুরাবগাহী তত্ত্বের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না! 'এক, রূপ-অরূপ, নাম-বরণ' প্রভৃতি গানটির শেষচরণ 'সেই সূর্য তারি কিরণ', 'যেই সূর্য সেই কিরণ' একান্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-পূর্ণ। গানের দুটি কথা ধ্যানচিত্ত সাধকদের সমাজে এক রহস্যময় ইঙ্গিত: একটি—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী

সাধক যাঁরা এবং অপরটি—অদ্বৈতবাদী সাধক যাঁরা—তাঁদের কাছে। কি স্বামী বিবেকানন্দ, কি স্বামী অভেদানন্দ ও কি স্বামী সারদানন্দ এঁদের সকলেরই অভিমত ছিল যে, অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতসাধনা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এর সাধনাও 'সোপানবৎ'—ধীরে ধীরে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনস্তরদুটিকে অতিক্রম ক'রে তারপর অদ্বৈতসাধনভূমিতে অবতীর্ণ হওয়া। দ্বৈতভূমির সাধনায়ই স্বভাবতঃ ও সাধারণভাবে মানুষ আসক্ত। সেজন্য স্থিতপ্রজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ সৃষ্টিমূলক: 'এক, রূপ-অরূপ, নাম-বরণ' গানটির শেষচরণে প্রথমে বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার কথা 'সেই সূর্য তারি কিরণ'-ভাবের পরিচয় দিয়ে পরে তার পরিপূর্ণতায় অদ্বৈততত্ত্ব-সাধনার মর্মকথার পরিচয় দিয়ে বলেছেন: 'যেই সূর্য সেই কিরণ'। এখানে সূর্য ও তার কিরণে কোন ভেদ বা পার্থক্য নেই—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'মণি ও তার জ্যোতিঃ, সূর্য ও তার কিরণ, জল ও তরঙ্গ যেমন এক ও অভিন্ন'। এ সম্বন্ধে আমার 'বিবেকানন্দের সাধনায় মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত'-গ্রন্থে বিশেষভাবে আমি আলোচনা করেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ ছাত্রজীবনে ও তার কিছু পূর্ব-পর্যন্ত তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসঙ্গীতও রীতিমতভাবে শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর জীবনে, সাধনায়, অনুভূতির ক্ষেত্রে ও সঙ্গীতের শিক্ষায় যথেষ্ট-কিছু ভাবের ও রীতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতকে তাঁর সাধনার সহচররূপে গ্রহণ করেছিলেন সঙ্গীতের আদর্শকে প্রদীপ্ত ও প্রাণময় করবার জন্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এই সঞ্জীবনী মহামন্ত্র লাভ করেছিলেন তিনি জীবনে তাঁর প্রেমময় ও জ্ঞানময় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট থেকে। গীতার (৬।২৯) 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি'-মন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে এবং সেই মন্ত্র প্রাণময় ও আলোকময় করেছিল স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীরামকৃষ্ণের সকল অন্তরঙ্গ-পার্ষদদের জীবনকে!

পরিশেষে বলি, সঙ্গীত যে অধ্যাত্মসাধনার সহায়ক এর নিদর্শন বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল নয়। নানান্ দিক থেকে বিচার ক'রে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর যুগকে আমরা 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নবযুগ' বলতে পারি। সঙ্গীতের প্রচলন এই বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের সর্বত্রই আছে, তবে এর লক্ষ্য ও আদর্শের দিক মনে হয় ধীরে ধীরে অবহেলিতই হচ্ছে। সেজন্য তাদের পুনর্জাগরণ একান্তপক্ষে প্রয়োজন। বাঙলাদেশে এমন এক সময় ছিল—যখন প্রতিটি দুর্গামণ্ডপে ও চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের সকলে সমবেত হ'য়ে বিভিন্ন বিষয়ের চর্চার ও অনুশীলনের মতো কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তনের অনুষ্ঠানও করতেন কেবলই আনন্দ-বিলাসের জন্য নয়, জীবনসাধনার প্রেরণাকে উজ্জীবন ও প্রদীপ্ত করার জন্যও। সেজন্য বলি যে, এই 'উদ্বোধন'—মায়ের বাড়ীতে বর্তমান 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য-সমারোহ' আমাদের জীবনে সৃষ্টি করুক নবপ্রেরণা ও অধ্যাত্মজীবনে সঙ্গীতের কল্যাণময়ী চেতনা—যে নবপ্রেরণা ও চেতনা শুধু বাঙলাদেশের সঙ্গীতসমাজেই নয়, সমগ্র ভারতীয় জীবনে ও সঙ্গীতসমাজে মুক্তিময় ও শান্তিময় জীবনাদর্শের করবে প্রতিষ্ঠা ও দেবে শাশ্বত আনন্দের অনুভূতি!*

* ৯ই এপ্রিল ১৯৮২, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে আলোচিত প্রবন্ধ।—সঃ

'বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসে' নিবেদিতাঃ একটি স্মৃতিকথা

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ প্রচারকেই প্রধান কর্তব্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন তখন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে বা স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, নিজের ভাবধারা ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান 'বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউস'।

১৯০৩ সালে স্থাপিত বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের অন্যতম আবাসিক ছাত্র প্রমথরঞ্জন পাল বেশ কয়েকটি চিঠিতে আমার কাছে ঐ বোর্ডিং হাউস ও সেইসূত্রে নিবেদিতার সান্নিধ্যের চমৎকার কথাচিত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। ঐ বহুদর্শী প্রজ্ঞাবান্, নানা ভাষা ও বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন মানুষটি যখন (১৯৬৮-৭০) আমার সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন (আমি নিবেদিতা-গবেষণায় লিপ্ত জেনে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে চিঠি লেখেন), তখন তাঁর বয়স ৮৪, কিন্তু স্মৃতিশক্তি সতেজ। তিনি জানিয়েছিলেন—উল্লিখিত ছাত্রাবাস ছিল ৬৪/১ মেছোবাজার স্ট্রীটে, যার বর্তমান নাম মহেন্দ্র শ্রীমানী রোড। তার পাশেই ছিল ভিক্টোরিয়া গার্লস্ স্কুল। চারিদিকে মুসলমান বস্তী। বাড়িটি বিরাট, তবে ভূতের বাড়ি ব'লে দুর্নাম থাকায় সামান্য ভাড়ায় পাওয়া গিয়েছিল। তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন "প্রখর ব্যক্তিত্বশালী স্বামী সচ্চিদানন্দ"। প্রমথরঞ্জন যখন ভর্তি হন, তখন আবাসিকের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ।

প্রমথরঞ্জন কয়েকজন আবাসিকের নাম-ধাম ও পরবর্তী কর্মজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। সেইসঙ্গে কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তিদের তিনি ওখানে দেখেছেন, তাও বলেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, বিপ্লবী নেতা পি. মিত্র, টাকীর জমিদার যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী। ভগিনী নিবেদিতা তো নিশ্চয়ই।

প্রমথরঞ্জনের প্রথম নিবেদিতা-দর্শনের স্মৃতি এই প্রকার :

"মুর্শিদাবাদ সিল্কের গাউন পরিহিতা ; মাথায় চূড়া-করা ঘন সোনালি রঙের চুল ; গলায় বড় রুদ্রাক্ষের মালা ; শান্ত সৌম্য সমাহিত দৃষ্টি। তাঁর দিকে তাকালে আপনা হতেই দৃষ্টি শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে আসে। এক-কথায় তাঁর হাতে একটি বীণা বসিয়ে দিলে সাক্ষাৎ বীণাপাণি—বেদ-বর্ণিত দেবী উষার রূপ, অথবা বেদ-প্রসিদ্ধ উষার মূর্তি।"

বোর্ডিং হাউসের ব্যবস্থাপনায় নিবেদিতার কি রকম সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তার বিবরণ প্রমথরঞ্জন দিয়েছেন। নিবেদিতার আবাসে তাঁর প্রথম গমনের স্মৃতিকথা তিনি আবেগভরে লিখেছেন :

"উনি আমাদের সকলকে তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'রবিবারে এসো আমার বাড়িতে।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তো নতুন এসেছি, আপনার বাড়ি তো চিনিনে।' উনি সহাস্যে বললেন, 'এরা তোমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে। এবার আসবে তো?' আমি বললাম, 'হাঁ'।

"তারপর রবিবার আমরা কয়েকজন ছেলে তাঁর বোসপাড়ার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তিনি পথ দেখিয়ে বাড়ির দোতলায় নিয়ে গেলেন। দোতলায় দুটি কি তিনটি কামরা। তার একটিতে আমরা তাঁর অনুসরণে গিয়ে ঢুকলাম। কামরাটিতে আসবাবপত্র প্রায় কিছু নেই, মেঝেতে

শুধু একটা মোটা কম্বল পাতা। ঘরের এক কোণে একটি তক্তপোশ। তার উপরেই দেওয়ালে স্বামীজীর একটি বিরাট আবক্ষ প্রতিমূর্তি [প্রতিচ্ছবি ?]। ভগিনী অঙ্গুলিনির্দেশে আমাকে তক্তপোশের তলাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা আছে বার ক'রে নিয়ে এসো তো!' তক্তপোশের তলায় ঢুকে যা বার ক'রে আনলাম তা দেখে আমাদের রসনা একেবারে সিক্ত হ'য়ে উঠল। ভগিনী হেসে বললেন, 'তোমরা সবাই ভাগ ক'রে খেয়ে নাও এবার।' বলবার আর অপেক্ষা ছিল না—বাগবাজারের প্রমাণ-সাইজের রসগোল্লাগুলি দেখে আমরা ব্যগ্র ও উন্মুখ হয়েই ছিলাম। দেখতে-দেখতে বিরাট হাঁড়িটি শূন্য হ'য়ে গেল। ভগিনী কৌতুকময় দৃষ্টিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন। খাওয়া শেষ হ'তে বললেন, 'কুঁজোতে জল আছে, গড়িয়ে খেয়ে নাও।'

"খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি আমাদের তাঁর নীচের কামরায় নিয়ে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে খানিক আলাপ করলাম। তিনি স্বহস্তে চা তৈরী ক'রে আমাদের খাওয়ালেন। তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'অন্যদিন তো তোমাদের সময় হবে না, আমিও ব্যস্ত থাকব। তোমরা রবিবার-রবিবার এখানে চলে আসবে। যেদিন আসতে পারবে না, সেদিন আগে থেকে একটা পোস্টকার্ড লিখে জানিয়ে দিও।' আমরা তাঁকে করবদ্ধ ক'রে নমস্কার জানালাম বিদায়ের প্রাক্কালে। তিনিও অনুরূপ-ভাবে প্রত্যুত্তর জানালেন। আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম।

"সবাই নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি। সেই মহান্ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে অভিভূত হয়েছি। বিদেশী মহিলা যেভাবে মুহূর্তে আমাদের অন্তরঙ্গ ক'রে নিলেন, সেটাই বার বার মনে প'ড়ে অনাস্বাদিত পুলকে আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল।"

প্রমথরঞ্জন নিবেদিতার বাড়িতে আরও কয়েকটি রবিবাসরীয় অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে গোপালকৃষ্ণ গোখলের আগমন, পুনার 'সার্ভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি' ও তার প্রাণপুরুষ মহাদেব গোবিন্দ রানাডে সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা, সেইসূত্রে এদেশীয় শিক্ষাতত্ত্বের আদর্শ রূপের বিবরণ ইত্যাদি রয়েছে। জগদীশচন্দ্রের দর্শনের কথাও ইনি বলেছেন—

"ভগিনী এক রবিবারে আমাদের সঙ্গে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এক সুপুরুষ ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, 'এঁকে হয়তো তোমরা দেখেছ, এঁর সম্বন্ধে শুনেছ, কিন্তু সম্ভবতঃ এঁর মুখের কথা শোনোনি। ইনি বিরাট বৈজ্ঞানিক, বিরাট দ্রষ্টা, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির রহস্য দর্শন করেছেন।'

"ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু হাঁটু মুড়ে আমাদের পাশে বসলেন। আমরা তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। তিনি বললেন, 'তোমরা সকলে জানো—জড় ও চৈতন্যের পাশাপাশি অবস্থান এই সৃষ্টিতে। চৈতন্যযুক্ত বলতে আমরা বুঝি, নর, পশু, পাখী ইত্যাদি। আর গাছ পাথর ইত্যাদিকে জড় বলি। কিন্তু যাকে জড় বলি, তাদের ভিতরও life (জীবন) আছে। সকলের ভিতরেই ব্রহ্মশক্তি।'

"গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি বলছিলেন: তৃণ, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতির বোধশক্তি (senses) আছে। লজ্জাবতী লতা তোমরা দেখেছ। এদের মধ্যে আছে অদ্ভুত সহিষ্ণুতা, স্পর্শবোধ, হাসি-কান্না। তোমরা খেজুরগাছ, তালগাছ, নারিকেল-গাছের গলা কেটে মিষ্ট রস বার ক'রে নিচ্ছ। কিন্তু তারা তবু তোমাদের ফলদানে কার্পণ্য করছে না। বড় অদ্ভুত এদের জীবন।

"উনি বললেন, এ-সম্বন্ধে এখানে তোমাদের সবকিছু বোঝানো সম্ভব নয়। আমি ইউনিভার্সিটি

ইনস্টিটিউটে তোমাদের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাবো। আশা করি তোমরা সেখানে যাবে।

"আমরা তারপর তাঁর আমন্ত্রণে একদিন সকলে মিলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যাই। সেখানে তিনি যন্ত্রের মাধ্যমে পর্দার বুকে দেখালেন বনস্পতিদের জীবন। এক নতুন সত্য আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।"

স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা :

"আর একটি রবিবারের ঘটনা। ভগিনীর বোসপাড়ার বাড়িতে আমরা উপস্থিত। নবীন ময়রার দোকানের হাঁড়িটি তত দিনে আমার সুপরিচিত হ'য়ে গিয়েছে। সেদিনও ভগিনীর স্বহস্তে প্রস্তুত চা পান ক'রে আমরা পূর্ব নির্ধারিত ঘরে কম্বলাসনে এসে বসেছি। পাশের কামরা থেকে সহসা ভগিনী গৈরিক বসনধারী ঈষৎ স্থূলকায় এক সৌম্য পুরুষকে এনে আমাদের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে আমি স্বামী সারদানন্দের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি বেলুড় মঠের বিরাট এক সাধু। তোমরা এঁর সঙ্গে আলাপ করো।' আমরা যুগপৎ সন্ত্রস্ত হ'য়ে ও সসম্ভ্রমে নবাগতকে নিরীক্ষণ করলাম। ইনিই তাহলে স্বামী সারদানন্দ! আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের বললেন, 'তোমরা সকলে বাড়ি ছেড়ে এখানে পড়তে এসেছ। তোমাদের বোর্ডিংকে তোমরা আশ্রম বলেই ভাববে। যে-যুগপুরুষের স্মৃতিতে তোমাদের বোর্ডিং, তিনি এ-যুগের মহা ঋষি। তাঁর নামে স্থাপিত বোর্ডিংকে তোমরা নিজের বাড়ির মতোই আপন ক'রে নেবে।'

"আমরা লক্ষ্য করেছি, স্বামীজীর প্রসঙ্গ উঠলেই ভগিনীর দৃষ্টি অশ্রুসজল হ'য়ে উঠত, তিনি নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকতেন। সারদানন্দ মহারাজ স্বামীজীর কথা বলতেই ভগিনীর সেই অবস্থা আবার লক্ষ্য করলাম।

"সারদানন্দ-স্বামীজী আরও বললেন, 'ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে আবাহন ক'রে এনে তাকে দূর বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিলেন, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দও সনাতন হিন্দুধর্মের মূল কথাটিকে প্রাচ্য হ'তে প্রতীচী পর্যন্ত বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিলেন।' "

এ সকলই আনন্দের স্মৃতি। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার স্মৃতিও ছিল, যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রমথরঞ্জনকে কাঁটার মতো বিঁধে থেকে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করেছে। সে স্মৃতি এই :

"প্রসঙ্গক্রমে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে, যার অভিজ্ঞতা আমার কাছে যেমন তিক্ত তেমনি বেদনাদায়ক। তা এখনো পর্যন্ত, জীবনের এই শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, অপরাধবোধে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। সেদিনকার রবিবার এই গ্লানিকর ঘটনা ঘটাবে জানলে, আমি কখনই আমার বাল্য-বন্ধুটিকে নিয়ে ভগিনীর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম না। আর সেইকথা আপনাদের জানিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করতে হ'ত না।

"যথারীতি সেদিন আমরা সকলে মিলে নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে গেছি; রসগোল্লার হাঁড়িও তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার জীবন শেষ করেছে; আমরা হাত-মুখ ধুয়ে নীচের ঘরে এসেছি। ইতিমধ্যে ভগিনী তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত চা নিয়ে এসে আমাদের সকলকে পরিবেশন করতে আরম্ভ করেছেন। সেদিন স্বামী সারদানন্দও উপস্থিত আছেন। চা পরিবেশন-রত ভগিনী আমার উক্ত নবাগত বাল্যবন্ধুটির দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে বললেন, 'নাও, ধরো।'

"ছেলেটি আপত্তি জানিয়ে দৃঢ়স্বরে ব'লল, 'না।'

"ভগিনী বিস্মিত হ'য়ে বললেন, 'কেন, তুমি চা-পান করো না?'

"ছেলেটি পূর্বের মতোই কণ্ঠে অস্বাভাবিক বিকৃত দৃঢ়তা এনে ব'লল, 'হাঁ, আমি চা-পান করি। কিন্তু আমি হিন্দু।'

"ভগিনীকে নিমেষে নিষ্প্রভ হ'তে দেখলাম। তাঁর মুখে-চোখে নিদারুণ ক্ষোভ ও বিস্ময়। তাঁর সেই পাণ্ডুর চেহারা এখনো আমার চোখে ভাসছে। ভগিনী অস্ফুট স্বরে স্বামী সারদানন্দকে বললেন, 'স্বামীজী! আমি কি হিন্দু নই?' তাঁর কণ্ঠস্বরের কাতরতা ও বিস্ময় আমাদের কানে নিদারুণ শোনাল

"স্বামী সারদানন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'কে ব'লল তুমি হিন্দু নও?'

"নিবেদিতা বললেন, 'এই ছেলেটি যে আমার তৈরী-করা চা পান ক'রল না!'

"স্বামী সারদানন্দ ছেলেটির দিকে চেয়ে সরোষ কটাক্ষে বললেন, 'হিন্দু? হিন্দু কে? তুমি কি জানো, ভারতবর্ষ পূর্বে সিন্ধুদেশ নামে খ্যাত ছিল। পারসিকরা 'স' উচ্চারণ করতে পারত না। তারা উচ্চারণ ক'রত 'হ'। ফলে সিন্ধু নাম বদলে হ'য়ে গেল হিন্দু। সিন্ধু-সভ্যতাকে তারা জানল হিন্দু-সভ্যতা ব'লে। সুতরাং সে সময়ে সিন্ধুদেশবাসী মাত্রকেই হিন্দু ব'লে ডাকা হ'ত। সে সময় বর্ণাশ্রম ব'লে কিছু ছিল না। সুতরাং বুঝতে পারছ, তোমার কি মূঢ় ধারণা।'

"সারদানন্দ-স্বামী ছেলেটির মূঢ়তাকে বিদ্রূপ ক'রে বললেন, 'ঐ যে জাতিভেদ—ও-বস্তু বিদেশীয়দের অধিকারের পরেই আসে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মানুষের গুণ ও বৃত্তির দ্বারাই বর্ণভেদ হয়। জন্মের দ্বারা বর্ণভেদ নয়। সুতরাং তোমার ধারণা একেবারে ভ্রান্ত।'

"সারদানন্দ-স্বামী তারপর আমাদের সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'ছুতার, কামার, কুমোর, তাঁতি, ধোপা, ঝাড়ুদার—সবাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের মতোই উত্তম হিন্দু—কারণ সবাই সিন্ধু-নদের পরবর্তী অংশের অধিবাসী। সাম্প্রদায়িকতা এসেছে পরে যখন বৌদ্ধ, জৈন বা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে এদেশের অধিবাসীরা। তারপর যারা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী, অর্থাৎ যারা বেদ-উপনিষদকে গ্রহণ করেছে, পুরাণাদি শাস্ত্রকে মান্য করেছে—তারা 'হিন্দু' চিহ্নিত হয়েছে।'

"নিবেদিতাকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন, 'তুমি দুঃখ পেয়ো না। ছেলেটির বোধবৃত্তি ব'লে কিছু নেই। তুমি সনাতন ধর্মের একান্ত ভক্ত, তুমি বৈদান্তিক। তুমি অবশ্যই আমাদের সকলের মতোই হিন্দু।'

প্রমথরঞ্জন লিখেছেন, স্বামী সারদানন্দের কথায় ভগিনী নিবেদিতা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। প্রমথরঞ্জন নিজে কিন্তু সান্ত্বনা পাননি। আমাকে পুনশ্চ এক পত্রে লিখেছিলেন: "আপনাকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেই দুর্দিনের ঘটনা জানাচ্ছি, যদি বুকটা হালকা হয়। সেজন্য ঘটনাটি বহুলোকের কাছে বলেছি। তবু আজও শান্তি হারাই, যখনই ঐ কথা মনে আসে। ভগিনী স্বয়ং তারপর কতদিন আমাকে বুঝিয়েছেন—ঐ ব্যাপারে মন খারাপ না করতে। তাঁর উচ্চ মন, উদার হৃদয়, তিনি দেবী—কিন্তু আমি মানুষ।"

স্মরণীয় এই কাহিনী। নিবেদিতাকে তাঁর ভারত-তপস্যার সময়ে কোন্ মূল্য দিতে হয়েছিল, তা এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারি। ভালবাসায় ক্রুশবিদ্ধ ছিল তাঁর জীবন। অপরপক্ষে তাঁর অপমানকে সুদীর্ঘ জীবন ধরে বহন করার মতো স্পর্শকাতর মনও ছিল, তাও দেখতে পাই।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব-সূত্রে নিবেদিতার আর একটি ছবি তিনি দিয়েছেন। "উক্ত দিবসে বেলুড় মঠে প্রচুর জনসমাগম হ'ত। গঙ্গার ঘাটে ছোটখাট মেলা বসে যেত। আমরা ছাত্ররা প্রায় সকলেই উৎসবে যোগদান করতাম। ক্যালকাটা স্টীম নেভিগেশন যাত্রী পারাপারের বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। বেলুড়ে অস্থায়ী জেটি নির্মাণ করা হ'ত। স্টীমারের সঙ্গে গাধাবোটও জুড়ে দেওয়া হ'ত অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য।

কলকাতা থেকে যাওয়া-আসার মাশুল ছিল আট আনা। এ ছাড়াও বহু অবস্থাপন্ন ভক্ত কলকাতা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে পরিজনদের নিয়ে উৎসবে যোগদান করতে আসতেন। তখনও মোটর গাড়ির চল নেই। স্থানীয় ভক্ত ছাড়াও হাওড়া জেলা ও হুগলি জেলা থেকে বহু ভক্ত আসতেন। অপূর্ব ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হ'ত। আন্দুলের কালীকীর্তন সম্প্রদায় তাঁদের মধুর কীর্তনের দ্বারা উৎসবে উদ্দীপনা আনতেন। তাঁরা ধ্রুপদরাগে কীর্তন করতেন। সহস্র-সহস্র তীর্থযাত্রীদের আপ্যায়িত করা হ'ত লুচি, তরকারি ও মোহন-ভোগের অঢেল ব্যবস্থায়। ঠাকুরের শিষ্যরা প্রসাদ পরিবেশন করতেন। সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারা প্রভূত সংখ্যায় উৎসবে যোগদান করতেন। তাঁদের অনেকে মা সারদাদেবীর শিষ্যা।

"উৎসবের দিনে ভক্তিমতী নিবেদিতা একান্তে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরে সমাধিস্থ হ'য়ে বসে থাকতেন। একজন বিদেশিনীকে এইরূপ সমাধিস্থ নিশ্চল দেখে স্বভাবতই অনেকে কৌতূহলী ও ও বিস্মিত হতেন। মহিলারা উৎসুক হ'য়ে নানা প্রশ্ন করতেন। অনেকে তাঁকে করজোড়ে নমস্কার করতেন। ভগিনী সকলকেই মৃদুকণ্ঠে যথাযোগ্য উত্তর দিতেন। কিন্তু কারো চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতেন না। প্রতিনমস্কারও করতেন মাটির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে। কথাবার্তার মধ্যেও মনে হ'ত, তাঁর অন্তরাত্মা যেন অন্য কোন অলৌকিক জগতে বিচরণ করছে; তাঁর গুরুদেবের নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হলেও তিনি তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার ক'রে আছেন।

আর একটি ঘটনা ও তার অনুস্মৃতির উল্লেখেই প্রমথরঞ্জনের স্মৃতিকথা মোটামুটি শেষ হয়েছে। নিবেদিতার আবাসে ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা, তার সূত্রে 'বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসে'র আবাসিকদের সামনে নিবেদিতার অগ্নিঝলকের মতো একটি ভাষণ—এবং তার শেষে আশ্চর্য এক উচ্চারণ—যা প্রমথরঞ্জনের কাছে মনে হয়েছিল ভবিষ্যতের ভেরীধ্বনি। নিবেদিতা এই ধরনের ঘটনার সৃষ্টি হয়তো অবিরাম করতেন, কিন্তু একটি তরুণের মনোজগতে তা কী অসাধারণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—ঘটনা ঘটে যাবার বহু বৎসর পরে লেখা স্মৃতিকাহিনী থেকে তা জানতে পেরে আশ্চর্য হ'তে হয়। এর থেকে বুঝতে পারি, নিবেদিতা কিভাবে তরুণদের মনে আগুন জ্বালাতেন।

প্রমথরঞ্জন লিখেছেন :

"১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরের এক রবিবার, তখন বেলা প্রায় একটা, ছুটির দিন, আমরা কেহ স্নান করছি, কেহ-বা আহারে বসবার উপক্রম করছি, হঠাৎ ভগিনী উপস্থিত। আমরা তাঁকে দেখে সবাই খুশি। তিনি বললেন, কোন বিশেষ কাজে ভবানীপুর গিয়েছিলেন, ফেরার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন আমরা অনেকদিন কেন তাঁর কাছে যাইনি, জিজ্ঞাসা করলেন এবং ঐদিন তাঁর আবাসে বিকালে যাবার জন্য ব'লে গেলেন। আমরা ৬-৭ জন বন্ধু মিলে তাঁর ওখানে বেলা ৪-৩০ নাগাদ গেলাম।...তাঁর বসার ঘরে সবাই কম্বলের আসনের উপর উপবেশন করলে তিনিও আমাদের পাশে বসলেন। প্রথম আমাদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া, অভাব-অসুবিধা ইত্যাদি খুঁটিনাটির খবর নিলেন। আমরা কেন আসিনি জিজ্ঞাসা করলে কেহ বলেন (আমিও বলি) ডন সোসাইটি ও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভ্য হওয়ায় ওসব স্থানে যাওয়ার জন্য নিয়মিত আসা সম্ভব হয় না। ডন সোসাইটির সভ্য হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, বললেন, উক্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তারপর...শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের দু-একটি ধর্ম-উপদেশের প্রসঙ্গ উঠলে ভগিনী আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা ধর্ম বলতে কী বোঝ?' আমরা একে-একে পাঁচ-ছয়জন উত্তর দিই :

"(১) ধর্ম মানে, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ; এবং সকল অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্ট থাকা।

"(২) ধর্ম মানে, পিতামাতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্য করা; কেবল নিজের ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসা নয়, সকল পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্য মানুষকে ভালবাসা।

"(৩) ধর্ম মানে, শাস্ত্রে যে-সব বিধিবিধান আছে তাদের সযত্নে পুরোপুরি পালন করা।

"(৪) ধর্ম মানে, বাক্যে ও কর্মে সত্যসন্ধ ও বিশ্বস্ত হওয়া; প্রত্যেকের সঙ্গে ন্যায়সম্মত ভদ্র আচরণ করা।

"(৫) ধর্ম মানে, অপরের কল্যাণ করা, তাদের সাহায্য করা এবং তা করবার সময় কোন কিছুর পরোয়া না করা—তাতে যত দুঃখ, বিপদ আসে আসুক, মৃত্যুও যদি হয় হোক।

"(৬) ধর্ম মানে, মহাভারত যা বলেছে: 'ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। যৎ ধারণা সংযুক্তম্, স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।' [উপস্থিত সংস্কৃত কলেজের এক ছাত্র শ্লোকটি ইংরেজী অনুবাদ-সহ বলেন]।

"ভগিনী বললেন: 'আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে তোমরা যা বলেছ, শুনেছি। তোমাদের মতামত অতি সুন্দর, আমাকে অত্যন্ত সুখী করেছে। ঠিক, তোমরা যাকে এখনি সনাতন ধর্ম বললে, তা তাই শিক্ষা দেয়। সনাতন ধর্মের তাৎপর্য তাই।

" 'কিন্তু তরুণ বালকগণ, ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের এই সকল জ্ঞান ও ধারণার অতিরিক্ত তোমাদের কিছু ব'লব, তোমাদের জীবনের পক্ষে যা উচ্চতর মহত্তর, পবিত্রতর বস্তু—যাকে অনুসরণ করবার জন্য, কর্মে পরিণত করবার জন্য, আমি তোমাদের আন্তরিকভাবে দৃঢ়ভাবে প্রণোদিত করছি—তাই হোক তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বমহান্, সর্ববৃহৎ নৈতিক কর্তব্য।

" 'তোমাদের প্রথমেই জানতে হবে তোমাদের মহামাতাকে—তোমাদের মাতৃভূমিকে—মাতা ভারতবর্ষকে। তোমরা কোনমতে নিজ মাতা ও দেশমাতার মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্যবোধ করবে না।

" 'তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, দেশ-মাতাকে দর্শন করো, তাঁর পরিক্রমণ করো, তাঁর সন্তানদের জানো—জানো তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, রীতি-নীতি, ঐতিহ্যকে—এক-কথায় তাদের সম্পূর্ণ ইতিহাসকে। তাদের সাক্ষাতে যাও, তাদের সঙ্গে সুযোগ পেলেই ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেশো এবং তাদের ভালবাসো। যেমন পুত্র বা কন্যা নিজের মায়ের একান্ত সন্নিধানে থাকে, মায়ের সঙ্গে যেমন তাদের নিবিড় ভাল-বাসার সম্পর্ক, তেমনি হোক দেশমাতার সঙ্গেও তোমাদের সম্পর্ক। মাতার মতোই তাঁকে শ্রদ্ধা করো; সেবা করো, পূজা করো—গভীর গভীর ভক্তিতে। ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্।'

"ভগিনী 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করলেন সুস্পষ্ট সংস্কৃতে। তারপর নীরব হ'য়ে গেলেন।

"শুধু আমি নয়, অন্য সকলেই তাঁকে ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি—যতক্ষণ তিনি মাতৃভূমি ভারতমাতার সম্বন্ধে বলছিলেন, ততক্ষণ তাঁর মুখ-মণ্ডল এক অনির্বচনীয় দিব্য জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল।

"কিছু পরে তিনি বললেন, 'তোমাদের বোর্ডিং-এ, তোমাদের আবাসে ফিরে যাও—এই মহত্তম মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্', এবং পবিত্র বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করো—এর উপর ধ্যান করো।'

"ঘটনার কাল ১৯০৩ সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর।

"সেদিন ঐ ব'লে তিনি আমাদের কাছে বিদায় নিলেন। অন্যান্য দিন আমাদের অন্য দু-চার কথা বলতেন, সেদিন ঐ 'বন্দেমাতরম্' ছিল তাঁর শেষ বাণী। আমাদের সকলের মনে কি-যেন-এক পরম পবিত্র ভাবের উদয় হ'ল।··· ফেরবার সময়ে আমরা পরস্পর কোন আলোচনা না ক'রে শুধু ঐ দৃশ্য বা ঘটনার চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। তাঁর উদাত্ত উক্তির মধ্য দিয়ে কি গুরুগতপ্রাণা ব্রহ্মবাদিনী ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই শোনাননি, গুরুর আত্মাই কি প্রিয় শিষ্যার দেহাবলম্বনে দেশমাতৃকার সেবার শিক্ষাদান করেনি ?

"সেদিন ভগিনীর 'বন্দেমাতরম্' বাণী শুনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর অবদান আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সত্যানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতির কথা স্মৃতিপথে আসে। আমি তার আগে আনন্দমঠ অভিনীত হ'তে দেখেছিলাম—কলকাতার স্টার থিয়েটারে এবং মেদিনীপুরের হিন্দু থিয়েটারে। কিন্তু তাদের সঙ্গে এই দিনকার সম্বন্ধ খুঁজে পাইনি।

"বোর্ডিং-এ ফিরে হাত-পা-মুখ ধুয়ে যে যার কামরায় গেলাম। আমার কেবলই মনে পড়ছিল ভগিনীর তেজোদৃপ্ত বাণী—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। বন্দেমাতরম্।

"খাবার ঘণ্টা পড়লে খাবার ঘরে গেলাম দফায়-দফায় আহার হ'ত। আহারের পরে প্রাঙ্গণে বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ত। সেদিন কথাবার্তার সময়ে ভগিনীর বাড়িতে অপরাহ্ণের ঘটনার কথা উঠল। যারা সেদিন যায়নি, তারা অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে লাগল। কয়েক দফায় ঘটনার কথা বিবৃত করা হ'ল।

"পরদিন অপরাহ্ণে কলেজ থেকে ফিরে আমরা জলখাবার নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় একজন তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল যে, ভগিনী নিবেদিতার গাড়ি ফটকের সামনে উপস্থিত। সাধারণতঃ তিনি সেকেণ্ড ক্লাস বন্ধ গাড়িতে আসতেন, তাতে রাস্তায় লোহার চাকার ঘর্ষণধ্বনি শুনে আমরা বুঝতে পারতাম, তিনি এসেছেন। কিন্তু সেদিন এলেন ফার্স্ট ক্লাস ফিটন গাড়িতে যা চৌরঙ্গীর ইউরোপীয়দের বাসস্থানের নিকটে ব্যবহৃত হ'ত। ঐসব গাড়ির চাকা রবার-মোড়া ব'লে শব্দ হ'ত না। আমরা বুঝলাম, তিনি চৌরঙ্গীর দিক থেকে এসেছেন।···

"ভগিনীর আগমনে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। দেখি যে, তিনি দারোয়ানকে গাড়ি থেকে একটা বেশ লম্বা প্যাকেট নামাতে বললেন। খবর পেয়ে ম্যানেজার শশব্যস্ত হ'য়ে এলেন।···ভগিনী উপরে এলে আমরা তাঁকে অভিবাদন জানালাম। তিনি প্রতিনমস্কার করলেন। তাঁকে বাড়ির মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আনা হ'ল। তিনি একজনকে বললেন, পরিচালক-স্বামীজী যদি অসুবিধা বোধ না করেন, একবার যেন আসেন। তিনি এলে ভগিনী হাঁটু গেড়ে নতমস্তকে প্রণাম করলেন।···

"ভগিনী ম্যানেজার-মহাশয়কে আগেই একটি বড় পেরেক ও হাতুড়ি আনতে বলেছিলেন। দারোয়ান সেগুলি আনলে ভগিনী স্বামীজীকে দেওয়ালে পেরেক পুঁতবার অনুমতি চাইলেন। তারপর দারোয়ানকে বললেন, প্যাকেটটি খুলতে। প্যাকেট খুললে দেখা গেল, সেটি ভারতবর্ষের একটি বিরাট মানচিত্র, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট, প্রস্থে প্রায় ৫ ফুট। খোলামাত্র ভিতর থেকে ক্যাশমেমো প'ড়ল—ভারতবর্ষের দেওয়াল-ম্যাপ, দাম ২৫ টাকা, থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোং ইত্যাদি। উপরে-নীচে রোলার দেওয়া, পিছনে কাপড় লাগানো। বুঝলাম, কেন তিনি ফার্স্ট ক্লাস ফিটনে এসেছেন। মানচিত্রটি দেওয়ালে টাঙানো হ'ল।

"ভগিনী স্বামীজী-মহারাজকে উদ্দেশ ক'রে বললেন :

"'স্বামীজী, গত সন্ধ্যায় আপনার এখানকার কয়েকটি ছেলে আমার ওখানে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার আনন্দে সময় কেটেছে। কথাপ্রসঙ্গে বিতর্ক দেখা গেল যখন তাদের "ধর্ম কি", এই প্রশ্ন করলাম। তাদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা মনোহারী। একজন ব'লল, ধর্ম মানে, নীতি পালন। অন্যজন ব'লল, ঈশ্বর ও তাঁর কার্যে বিশ্বাস। একজন মহাভারত থেকে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রল, যার অর্থ, যা আমাদের ধারণ করে তারই নাম ধর্ম। পাল [অর্থাৎ আমি] ব'লল, জীবন উৎসর্গ করেও দীন-দরিদ্রকে সাহায্য করার নামই ধর্ম। তাদের ব্যাখ্যা আমার কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা যা ব'লছ, সে-সকলই সনাতন ধর্ম-সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তোমরা ভারতীয় যুবক, এখন তোমাদের কাছে ধর্ম হ'ল—তোমাদের মাতৃভূমিকে নিজ মাতা জ্ঞান করা এবং তাঁর অর্চনা করা।

"'স্বামীজী, আপনার অনুমতি নিয়ে এইসব ছেলেদের দু-একটি কথা বলতে চাই।'

"স্বামীজী বললেন, 'সানন্দে রাজি।' তখন ভগিনী আমাদের বললেন, 'প্রিয় বালকগণ! বিদ্যালয়ে তোমরা সকলেই ভূগোল পড়েছ। সেখানে তোমরা কেবল ভারতের পাহাড়-পর্বত, নদী-হ্রদ, প্রান্তর, মরুভূমি-সহ প্রাকৃতিক অবস্থার কথাই জেনেছ। কিন্তু তোমরা এখন এই যে দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্র দেখছ, এ কেবল মুদ্রিত মস্ত আকারের একটি কাগজ নয়—এ তোমাদের মাতার চিত্র। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী—একটা স্পন্দিত জীবন্ত অখণ্ড অস্তিত্ব। পাহাড়-পর্বত মাতার অস্থিসংস্থান, নদ-নদী-নির্ঝরিণী তাঁর স্নায়ু-শিরা, বিস্তীর্ণ প্রান্তর নিছক মৃত্তিকাপুঞ্জ নয়, মাতার দেহমাংস, বৃক্ষলতা তাঁর কেশপুঞ্জ।'···

"এই ধরনের অনেক কথাই তিনি ব'লে চললেন: 'তোমাদের এই পুণ্যভূমি যুগে-যুগে মহাপুরুষদের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে, রচিত হয়েছে মহাগ্রন্থগুলি, যাদের তুলনা নেই। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা—বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বেদব্যাস রচনা করেছেন তোমাদের সংস্কৃতির মূল ইতিহাস। মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের নীতিশাস্ত্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের মৌলিকতা ও বিচক্ষণতায় সবাই বিস্মিত, অর্থশাস্ত্রের জগতে নূতন দিশার সন্ধান দিয়েছে তা। কুরুক্ষেত্রে উচ্চারিত গীতা পৃথিবীতে অতুলনীয়, যে-সম্পদের জন্য যুগ-যুগ ধরে ভারতবাসী গর্ববোধ করতে পারে। কুম্ভমেলার বিরাট উৎসব, যেখানে লক্ষ-লক্ষ মানুষের সমাবেশ, তার হোতা এই ভারতবর্ষ। পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান ক'রে ক্লেদমুক্ত হওয়ার কি সুন্দর সামাজিক উৎসব। প্রতি বারো বৎসরে চারটি বিশিষ্ট স্থানে—উজ্জয়িনী, নাসিক, হরিদ্বার, প্রয়াগে এই উৎসব হয় স্মরণাতীত কাল থেকে।

"'এই ভারতবর্ষেই শান্তিদূত গৌতম বুদ্ধের মহানির্বাণ। ধর্মগুরু আচার্য শঙ্কর, রামানুজ ও চৈতন্যদেবের বাণী ও শিক্ষা এখানে প্রচারিত হ'য়ে পৃথিবীকে আলোক দিয়েছে। সাধক রামপ্রসাদের ভক্তিরসের সঙ্গীতগুলি আপ্লুত করেছে এদেশবাসীকে। নবযুগে অবতার হ'য়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ সুগভীর উপদেশ দেশে-দেশে আলোড়ন এনেছে। তাঁর শিষ্য ও মন্ত্রপুত্র [স্বামী বিবেকানন্দ] সর্বত্র প্রচার করেছেন এই ধর্ম-সত্য, তিনি পৃথিবীর কাছে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন এই ধর্মের মর্যাদা।

"'রত্নগর্ভা ভারতমাতার আরও যে-সব কৃতী সন্তান সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের উল্লেখ না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অজস্র তাঁরা। তাঁদের অগ্রণী রাজা রামমোহন রায়, সতীদাহ

প্রথা উচ্ছেদের জন্য তিনি চিরস্মরণীয়; শত-শত অসহায় বিধবাকে বেঁচে থাকার অধিকার তিনি দিয়েছিলেন। তাতেও বিধবাদের চোখের জল শুকোয়নি। সমাজের নিষ্ঠুর বাধা, সমাজপতিদের বিচিত্র উন্নাসিকতার জন্য বিধবাদের জীবন সুকঠিন যন্ত্রণায় পূর্ণ। মুক্তিমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বিধবা-বিবাহের প্রচলনকারী। সামাজিক প্রথার কশাঘাতে যে-সব নিষ্পাপ নিরপরাধ ফুলের মতো মেয়েরা কুঁড়িতেই শুকিয়ে যেত, তাদের তিনি প্রাণভরে পৃথিবীর আলো ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। পুনার মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, ডাঃ রঘুনাথ পুরুষোত্তম বাজপেয়ী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বাংলার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখরা শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়েছেন। এ ছাড়াও আরও অনেক মনীষী আছেন, যাঁদের নাম তোমরা ক্রমে জানবে, বিস্মিত হবে তাঁদের গভীর জ্ঞান ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে।

" 'তোমরা অবকাশ পেলেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবে। ভ্রমণের দ্বারা মাতৃভূমির স্বরূপ বুঝতে পারবে। যে প্রান্তেই যাও, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করবে। বিচিত্র জ্ঞানের সন্ধান পেতে ভ্রমণ

" 'তোমরা যেমন আজ তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের পথ অবলম্বন ক'রে চলেছ, তাঁদের নির্দেশিত পথ আজ যেমন তোমাদের উপকৃত করছে, ঠিক তেমনি তোমাদের উত্তরসূরীরা যেন তোমাদের পথে চলতে পারে—এইভাবে নিজেদের গড়ে তুলবে।

" 'উত্তরকালে তোমরা শিক্ষা বা বাণিজ্যের জন্য, কিংবা দেশভ্রমণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাবে। কিন্তু একটা কথা সব সময় স্মরণ রাখবে—যে-দেশেই যাও, ভারতমাতার মূর্তি যেন তোমাদের মনে মলিন না হয়। তিনি যেন তোমাদের হৃদয়কেন্দ্রে বিরাজ করেন।'

"ভাবাবেগে ভগিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল। তিনি নির্নিমেষ নয়নে কিছুকাল ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। আমরা বিভোর হ'য়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। ভগিনীর কথায় আমাদের সংবিৎ ফিরল তিনি বললেন :

'তোমরা সকলে এবার কিছুকালের জন্য বন্ধ করো! মানসচক্ষে ভারতমাতার চরণদর্শন করো! প্রণতি জানাও সেখানে। আর আমার সঙ্গে একবার কণ্ঠ মিলিয়ে বলো—বন্দেমাতরম্।'

"আমাদের সমবেত উদাত্ত ধ্বনি—বন্দে-মাতরম্—ছাত্রাবাসের প্রাকারে প্রতিধ্বনি তুলল—ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্।"

প্রমথরঞ্জন পালের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি এখন লোকান্তরিত। কিন্তু তাঁর এই স্মৃতিকথা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে—নিবেদিতা কোন্ প্রবল ভাবস্রোতে তরুণদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন।

প্রমথরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথার শেষে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

"১৯০৩ সালে একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে যে-পূত শব্দটি ['বন্দেমাতরম্'] উচ্চারিত হয়েছিল, তা অল্পদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে মাতৃমন্ত্র তুলে এনে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছিলেন।"

এক ও বহু : বিরোধ ও মিলন

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

তুমি নিভৃত অন্ধকারের মধ্য থেকে
দেখো আলোকিত বৃত্তগুলিকে,
নৈঃশব্দ্যের অতলে থেকে
শোনো বজ্রনাদ কিংবা কলধ্বনি,
তুমি শাদাপাতায় মন খুলে
দেখো রূপ ও বাণীর কত রঙসাজ।

তুমি রসাতলে মগ্ন হ'য়ে
দুলতে থাকো তরঙ্গ-দোলায়,
বীজমূলে অধিষ্ঠান ক'রে
নিরীক্ষণ করো ফলিত বৃক্ষকে,
তুমি কেন্দ্রবিন্দুতে স্বস্থিত হ'য়ে
ঘুরে বেড়াও বহুবৃত্তে।

তুমি এক হ'য়ে বহুকে বিচ্ছিন্ন করো—
একাত্ম হও বহুর আলিঙ্গনে।

মায়ের কাছে

শ্রীশান্তশীল দাশ

মায়ের কাছে আছি আমি
দিনে রাতে সকাল সাঁঝে—
এই কথাটি নিত্য যেন
বাজে আমার মনের মাঝে।

নইতো আমি স্বজনহারা,
মিছেই ঝরে নয়নধারা ;
সবার আপন যে-জন আমার
সে-জন আছে আমার কাছে।

যতই আঘাত, যতই ব্যাঘাত
আসুক আমার এই জীবনে,
করবো না ভয়, থাকবো অটল,
জপবো আমি মনে মনে—

মা আছে যার, ভয় কেন তার,
ভয়হারিণী মা যে আমার ;
শ্রান্তিহরা ওই চরণের
তলায় অপার শান্তি রাজে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে হাস্যরস : বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

"সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো!"—অশ্বিনী দত্ত লিখেছিলেন প্রাণের ভাই শ্রীম-কে। 'কথামৃত' প্রথম ভাগের শেষ-দিকে এই চিঠিটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা মনে করতেই পারেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো 'মজার মানুষ' আর হয় না!

সেই 'মজার মানুষ', 'নতুন মানুষ' শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিদ্যাসাগরকে দেখতে এলেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা অল্প কিছু লোকের সামনে প্রতিভাত হয়েছিল। বহুকল্পদুর্লভ এই সাক্ষাৎকারটি শ্রীম-র অমর লেখনীতে বিধৃত হ'য়ে 'কথামৃতে'র তৃতীয় ভাগে প্রথম দিকেই উপস্থাপিত।

এ সাক্ষাতের প্রথম থেকেই নির্মল গভীর স্নিগ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনে দুই মহাপুরুষ আপন আপন প্রতিভার নিঃসংশয় পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের আলাপচারীতে। খাল বিল নদী পার হ'য়ে এইবার 'সাগর' দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, উত্তরে বিদ্যাসাগর বলছেন, নোনা জল নিয়ে যেতে, (সাগরের জল তো নোনাই হয়!), প্রত্যুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, বিদ্যার সাগর", "তুমি ক্ষীরসমুদ্র"।

এই প্রথম প্রত্যুত্তরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে জয় করলেন, নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত ক'রে বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনাকে আলোকিত করলেন। কিন্তু যে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি উত্তরটি দিলেন, সে তাঁর প্রখর সজাগ বুদ্ধিরই প্রকাশ। বিদ্যাসাগর নিজের সম্বন্ধে এই নব-মূল্যায়নে স্মিত প্রসন্নতায় স্তব্ধ।

এরপর বিদ্যাসাগরের দয়াধর্মের অপূর্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য: "আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।" জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপন্থাগুলির সাধনলোকে উত্তীর্ণ পরম সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিদ্যাসাগরকে 'সিদ্ধ' বলছেন, তখন শ্রোতাদের বিস্মিত হবার পালা। বিদ্যাসাগরও বিস্মিত। প্রশ্ন করছেন, "মহাশয়, কেমন ক'রে?"

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আলু পটল সিদ্ধ হ'লে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য)।

"বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নয় গো; শুধু পণ্ডিত-গুলো দরকচা পড়া! না এদিক, না ওদিক।"

পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধারণা প্রচলিত চিন্তাধারার বহু ঊর্ধ্বে। মনুষ্যত্ব যদি না থাকে, তাহলে সে পাণ্ডিত্য তাঁর কাছে নিতান্ত অবজ্ঞার বস্তু। যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি না খুলে থাকে, তাহলে পণ্ডিতের সঙ্গে শকুনির তুলনা তাঁর মনে জাগে। "যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে।···দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।"

বিদ্যাসাগরের দয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে যথার্থ বিদ্যারই পরিচায়ক! বিদ্যাসাগর সাধারণ অর্থে বিদ্যার সাগর নন, 'করুণার সিন্ধু'রূপেও বিদ্যাসাগর। কিন্তু লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় অহংকার এসে জোটে। তেমন অহংকার বিদ্যাসাগরের ছিল না, অথচ অমন

পণ্ডিত দেশে তখন কজনই বা ছিলেন! তবে পড়াশুনো যতই থাক, যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আরও অনেক উঁচুস্তরের ব্যাপার। সেক্ষেত্রেও দেখা যায়, সামান্য সাধনভজন করেই অনেকে নিজেদের মহাপুরুষপর্যায়ে উত্তীর্ণ মনে করেন! মানবমনের এই হাস্যকর দুর্বলতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মজ্ঞান প্রসঙ্গে বলছেন, "ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না। মানুষ মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগলো, যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাবো।"

ছোট্ট পিঁপড়ের এই অসাধ্যসাধনের কল্পনাই সব পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যকামনার মর্ম কথা। যতক্ষণ জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য, ততক্ষণ ওই পিঁপড়ের অহংকারই জগতের সবস্তরের পণ্ডিতদের পুঁজি। সব বহির্মুখী পাণ্ডিত্যের অবসানেই একদিন উপলব্ধির অতল সমুদ্রে লীন হওয়া।

"লুণের ছবি (পুতুল) সমুদ্র মাপতে গিছলো। (সকলের হাস্য)। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?"

'পিঁপড়ে' আর 'নুনের পুতুল'—দুয়েরই আপন স্বরূপ সম্বন্ধে অন্তহীন অজ্ঞতা। আমরা সামান্য জ্ঞানের মাপকাঠিতে অনন্ত অপরিমেয়কে মাপবার জন্য ব্যস্ত। পরমজ্ঞানের পারাবারের ওপ্রান্তে বসে শ্রীরামকৃষ্ণই এ কাণ্ড দেখে হাসতে পারেন, সকলকে হাসাতে পারেন!

এরপর এলো 'কথা'র কথা। নুনের পুতুল যদি সাগরে মিশেই যায়, আর কি কথা বলার কেউ থাকবে? আছেন কেউ কেউ!

একজন প্রশ্ন করলেন: "সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তিনি কি আর কথা কন না?"

বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্ কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হ'য়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়!

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হ'য়ে যায়। মধু পান করবার পর মাতাল হ'য়ে আবার কখনও কখনও গুন্ গুন্ করে।

"পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হ'য়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য) তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয়, তা হ'লে আবার শব্দ হয়। (হাস্য)।"

উপমার পর উপমার মালা গেঁথে সবশেষে হাসির স্বর্ণসূত্রটি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। লুচির 'ছ্যাঁক্ কল্ কল্', মৌমাছির 'ভন্ ভন্ গুন্ গুন্', কলসীর 'ভক্ ভক্'—এ-সব কিছুতে অনুকার-শব্দের মজাদার ব্যবহার এক-দিকে; অন্যদিকে প্রতিটি উপমার অনিবার্যতায় একদিকে হরণ আর একদিকে পূরণের চাতুর্য—এ-সব কিছুই সেরা হাস্যরসিকের প্রচ্ছন্ন কৌতুক-পরিহাসের মাধুর্যে শ্রোতৃহৃদয় পূর্ণ করার অসামান্য দৃষ্টান্ত। লুচি থেকে মৌমাছি, মৌমাছি থেকে কলসী—ধীরে ধীরে যে হাস্যরস পুঞ্জিত হ'তে থাকে, শেষদিকে কলসীর পূর্ণ হওয়ায় আর কলসীর ঢালাঢালিতে তার সশব্দ আত্মপ্রকাশ—সকলের হাস্য।

ব্রহ্মজ্ঞানের শিখরচূড়ায় প্রতিফলিত শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যরশ্মি এরপর আশ্চর্য কৌশলে অধ্যাত্মজ্ঞানের নানাস্তরে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

বাবু ও ভগবানের উপমা—"এই জীব জগৎ, মন বুদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য, জ্ঞান—এ-সব তাঁর ঐশ্বর্য। (সহাস্যে) যে বাবুর ঘর দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেলো, সে বাবু কিসের বাবু? (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকতো তা হ'লে কে মানতো। (সকলের হাস্য)।"

শক্তির তারতম্য নিয়ে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ—

শ্রীরামকৃষ্ণ—"দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি।

"বিদ্যাসাগর—তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য)। তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ-কথা মানো কি না? [বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন]।"

ঐশ্বর্য দিয়ে ঈশ্বরকে চেনার প্রসঙ্গটি আমাদের সেকালের ধনী বাবুসমাজের বাড়ী গাড়ী জাঁক-জমকের সঙ্গে ঈশ্বরের নানা মহিমাকে এক উপমায় কী সুন্দর গেঁথে তুলেছে! অথচ এই বাবুকেই তার আপন জনেরা ভালবাসে মানুষটির কথা ভেবে—তখন আর বাবুকে মানার প্রশ্ন ওঠে না, আপন সম্বন্ধের কথাই সব ঐশ্বর্য ভুলিয়ে দেয়। তবু ঐশ্বর্যই তাঁকে ঈশ্বর করেছে—তাঁকে মানার মূলে তাঁর সর্বব্যাপী শক্তি। কিন্তু এমন একটি তত্ত্ব-কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে সরল হাস্যরসের উপাদান হ'য়ে উঠেছে।

অনেকের মনে ঈশ্বরের সমদর্শিতা আর সব মানুষের সমান শক্তি বুঝি এক জিনিস। সূর্যের আলো সব কিছুরই উপর সমান ভাবে পড়ে, কিন্তু তাকে গ্রহণ করার শক্তি সকলের সমান নয়। সেইসঙ্গে বিশেষ আধারে শক্তির বিশেষ প্রকাশ এ-কথাটিও স্মরণীয়। মৃদু হাস্যরসে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ও দয়াকে ভগবৎ-ঐশ্বর্যের প্রকাশরূপে দেখিয়ে ধর্মক্ষেত্রেও গণতন্ত্রবাদের সাধারণ প্রয়োগ যে হাস্যরসের উপাদান তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ওই স্মিত প্রশ্নটিতে পরিস্ফুট হ'ল—তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো?

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসছেন, বিদ্যাসাগরও হাসছেন। ঘরশুদ্ধ লোকের মুখভরা হাসি আমরা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে শ্রীম একজন, যাঁর লেখায় ওই হাসি চিরকালের মতো ধরা পড়েছে!

কথায় কথায় এমনি হাস্যরসের চমক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগরের আলাপচারীতে। 'অহং' সহজে যায় না—সে-কথা বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণস্য উপমা—(১) "অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পর দিন ফেকড়ি বেরিয়েছে! (সকলের হাস্য)।" (২) "জীবের আমি লয়েই তো যত যন্ত্রণা। গরু 'হাম্বা হাম্বা' (আমি আমি) করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়—তখন খুব পেটে। (হাস্য)।

"তবুও নিস্তার নাই। শেষে নাড়ী-ভুঁড়ী থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর

যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে 'তুঁহু' 'তুঁহু' (অর্থাৎ 'তুমি' 'তুমি')। যখন 'তুমি' 'তুমি' বলে, তখন নিস্তার।…

"সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হ'য়ে।"

কত ছলেই যে অহং এসে পড়ে, তার উপমায় অশ্বত্থের 'ফেক্ড়ি'—গাছ যে কেটে ফেলেছে, তার বিরক্তি ও বিস্ময়কে মনে করিয়ে এক স্বত-উৎসারিত হাস্যরসের সৃষ্টি করে। অহং-এর স্বরূপটিও ছবির মতো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। 'হাম্বা-হাম্বা' থেকে 'তুঁহু তুঁহু' শব্দ নিয়ে খেলার বিচিত্র উদাহরণ, সেইসঙ্গে অহং থেকে শরণাগতিতে আত্মনিবেদনের অপূর্ব বাণীচিত্র। দুই ক্ষেত্রেই হাস্যরসের পরিবেশন প্রত্যক্ষ, যথাযথ, উপমা-সুন্দর।

অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে থাকার উদাহরণে দুটি ঘটনার সন্নিবেশ। ভ্রান্ত মোহের অভিব্যক্তির মাধ্যমে সংসারের আসল স্বরূপ চিনে নিতে আমাদের পরমসহায় শ্রীরামকৃষ্ণের স্মিতহাস্যমিশ্রিত দুটি চিত্র—(১) "বড় মানুষের বাগানের সরকার; বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে 'এ বাগানটি আমাদের', 'এ পুকুর আমাদের পুকুর।' কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা ল'য়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য)।"

(২) "ভগবান্ দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 'মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দিব'—তখন একবার হাসেন; এই ব'লে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কি না বলে আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা, এ-কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, 'এ দিকটা আমার, ওদিকটা তোমার,' তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, 'এ জায়গা আমার আর তোমার'।"

এই দুই চিত্রেই হাস্যরসের উপাদান 'আমার আমার' বোধ। অথচ এই কর্তৃত্ববোধটুকু আছে বলেই জগতের কর্তা মানুষের চোখের আড়ালে থেকে যান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ দুটি উদাহরণের আড়ালে একটু ব্যঙ্গের আমেজ আছে, কিন্তু লক্ষ্য এক—তাঁর অমৃতহাসির উদ্ভাসনে পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করানো। জগদ্ব্যাপী মায়ার আবরণের অন্তরালে আনন্দস্বরূপের নিত্য অবস্থানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সজাগ করা।

কর্মযোগী বিদ্যাসাগর মানবমঙ্গলের নানা কর্মে রাত্রিদিন ব্যতিব্যস্ত। এ-কর্মযজ্ঞের নিজস্ব সার্থকতা স্বীকার করেই বলা যায়, সব কর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ঈশ্বরের। যে সম্পূর্ণ ঈশ্বর-তন্ময় হ'য়ে কাজ করছে, ধীরে ধীরে তার বাইরের কাজের বাড়াবাড়ি কমে গিয়ে অন্তরে ঈশ্বরসত্তার আবির্ভাব প্রাধান্য পেতে থাকে। তখনই মনে হয়, তাঁর ইচ্ছাই তো কাজ, আর যে কাজ তাঁকে ভুলিয়ে রাখে, সে কাজ বন্ধনের পর বন্ধন সৃষ্টি ক'রে চলে। আর সব নেশার মতোই নেশার মুহূর্তটি পেরিয়ে গেলে মহাশূন্যতায় সে কাজের অর্থহীন পরিসমাপ্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ এই বহির্মুখী কাজের কোলাহল থেকে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি অন্তর্লোকে ফেরাতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, বিদ্যাসাগরের "অন্তরে সোনা চাপা আছে। একটু মাটি চাপা আছে।" সেই মাটিটুকু সরাতে চেয়েই বলেছিলেন, "জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন।" বিদ্যাসাগরের অন্তরে তিনিই মানুষের সেবার জন্য দয়া সঞ্চার করেছেন।

তাই বিদ্যাসাগরের কর্তব্য বাইরের কাজ কমিয়ে অন্তরের ঈশ্বরকে অনুভব করা।

"...যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়।"

এ উপমায় উপস্থিত সকলেই হাস্যরোলে সমর্থন জানালেন। বিদ্যাসাগরকে সত্ত্বগুণজাত রাজসিক কর্ম থেকে আরও এগিয়ে ক্রমে সেই কাঠুরের মতো সোনার খনি, হীরের খনি—ঈশ্বরের রাজত্বে এগিয়ে যেতে আহ্বান ক'রে সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীরূপ এই ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণপ্রসঙ্গ সকলকে তখন স্তব্ধ ক'রে রেখেছে। হাস্যরস কখন উপলব্ধির আলোকে মহামৌনের অন্তরালে পরমানন্দস্বরূপে মগ্ন।

* * *

যখন প্রথম দেখা, তখন 'সাগর দেখা'—যখন যাওয়ার পালা, তখন 'জাহাজের' উদ্দেশে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আসার আহ্বান! আসা-যাওয়া দুই বারেই উপমায় ও হাস্যরসে শ্রীরামকৃষ্ণের একক জয়।

অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে বিদ্যাসাগরের কাছে তুলে ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রাত হয়েছে, এবার যাওয়ার পালা। শনিবারের বিকেলটি ভারী সুন্দর কেটেছে সন্দেহ নেই। যাবার আগে পরম বিনয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এ যা বললুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ-রাজার খপর নাই! (সকলের হাস্য)।

"বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তা আপনি বলতে পারেন।"

শাস্ত্রপাণ্ডিত্যের বিদ্যাসাগর অধ্যাত্মজ্ঞানের অনন্ত বিদ্যার অধিকারীর বিশেষ অধিকার স্বীকার ক'রে নিলেন। তিনি জানেন এ-সব, উপলব্ধি করার অবসর হয়েছে কি? আবার সত্যি কি সবই জানেন? শাস্ত্রে কি সব কথাই লিপিবদ্ধ?

সহাস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন, "হাঁগো, অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম (সকলের হাস্য)—বা বাড়ীর কোথায় কি দামী জিনিস আছে।" আপন মহিমা সম্বন্ধে উদাসীন বিদ্যাসাগর সত্যিই জানেন না, তাঁর অন্তরে চিরকালের সম্পদ নিহিত! শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে যে সম্পদ পরিপূর্ণভাবে তিনি লাভ করতে পারতেন, মাত্র একটি দিনের বিকেলে কিছুক্ষণের জন্য সেই অফুরান আনন্দ-অমৃতের পারাবারের একটু স্বাদ নিয়েই তাঁকে পরিতৃপ্ত থাকতে হ'ল।

যাবার আগে একটি বিনম্র উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে আবৃত ক'রে, বিদ্যাসাগরের মহিমা উজ্জ্বল ক'রে ফোটাতে চেয়েছেন। তিনি 'জেলেডিঙি', বিদ্যাসাগর 'জাহাজ'। জেলেডিঙির আমন্ত্রণ জাহাজের উদ্দেশে—বিদ্যাসাগর যেন একবার দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগান দেখতে যান! বিদ্যাসাগর বললেন, "আপনি এলেন, আমি যাবো না!" শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অকিঞ্চিৎ-করতা সম্বন্ধে নিশ্চিত—"আমার কাছে? ছি! ছি!" বিদ্যাসাগর এর অর্থ বুঝতে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, "আমরা জেলেডিঙি। (সকলের হাস্য)। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়।

(সকলের হাস্য) বিদ্যাসাগর এ-কথার পর চুপ ক'রে রইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যোজ্জ্বল বাক্‌চাতুরীর কাছে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে ক'রে হয়তো এই নীরবতা। শ্রীরামকৃষ্ণই নীরবতার উত্তরে সমস্যার সমাধান নিয়ে এগিয়ে এলেন—"তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।" এ সময় অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে।

বিদ্যাসাগর সে-কথা মেনে নিয়ে সহাস্যে মন্তব্য করলেন, "হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে!" পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীম—বর্ষাকালের ব্যঞ্জনা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যত্র কথিত উপমাসূত্রে—"নবানুরাগের বর্ষা, নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে।" কিন্তু শেষ অবধি বিদ্যাসাগরের আর শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের সৌভাগ্য হয়নি। কথায় কথায় সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের ধারণা কী, তা জানতে চেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—"আচ্ছা তোমার কি ভাব?" বিদ্যাসাগর মৃদু হাসতে হাসতে সে উত্তর এড়িয়ে গেলেন—শুধু বললেন, "আচ্ছা সে-কথা আপনাকে একলা একলা একদিন ব'লব। (সকলের হাস্য)।"

উপস্থিত সবাই জানতেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে দুজনার দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পার্থক্য, হয়তো তাই এই সম্মিলিত হাসি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেদিন তাঁর প্রসন্ন স্মিত হাস্যে বিদ্যাসাগরের অন্তর্নিহিত মানবপ্রেমিক সত্তার উদ্দেশে আপন সমর্থন জানিয়ে গেলেন। শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরপ্রেমিক ও শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিকের মিলনমুহূর্তের হাস্যরসধারা আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনবোধের এ দুটি স্তর বড়ো কাছাকাছি, জীবনসত্যের প্রায় এ পিঠ ও পিঠ।

কথামৃত-প্রবেশ

স্বামী চেতনানন্দ

'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' যেন মিছরির রুটি। সিধে করেই হোক আর আড় করেই হোক, যেভাবেই আস্বাদ করা যাক না কেন, মিষ্ট লাগবেই লাগবে। কথামৃতপাঠ যেখান থেকে খুশী আরম্ভ করা যেতে পারে এবং শেষ করা যেতে পারে। এ গ্রন্থের উপক্রম থেকে উপসংহার পর্যন্ত একই ঈশ্বরীয় কথা। এ-কথা শ্রবণে বা পাঠে বিরক্তি বা একঘেয়েমি আসে না, কারণ এ নিত্য নতুন, অপূর্ব এবং অনন্তপ্রসারী। আনন্দময় ভগবানের কথা শুনলে কি নিরানন্দ আসতে পারে?

হিন্দুদের জনপ্রিয় দুটি গ্রন্থ: গীতা ও চণ্ডী। দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীগ্রন্থে ওর পাঠের বিধি ও নিষেধের উল্লেখ আছে। গীতাশাস্ত্র পাঠের বিধি ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে উল্লেখ আছে। আবার গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ নিষেধমুখে অর্জুনকে বলছেন, "গীতাশাস্ত্র তপস্যাবিহীন, ভক্তিবর্জিত, শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং আমার প্রতি অসূয়াকারী ব্যক্তিকে কখনও বলবে না।" 'কথামৃত' কিন্তু বিধিনিষেধের বহির্ভূত। এ-গ্রন্থে আপামর জনসাধারণের অধিকার।

শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র পাঠক সাধারণতঃ প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বা শ্রীম'র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন থেকে পড়া শুরু করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, পাঠক যদি শ্রীম'র রচনাশৈলীর কয়েকটা মূল্যবান্ বিষয় পূর্ব থেকে জেনে নেন, তবে আরও বেশী রসাস্বাদ করতে পারবেন। এই প্রবন্ধে

আমরা চারটি বিষয়ের আলোচনা ক'রব: ১। কথামৃতের মঙ্গলাচরণ, ২। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণচরিতামৃত, ৩। কথামৃতের পরিবেশ, ৪। কথামৃতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য।

১। কথামৃতের মঙ্গলাচরণ

শাস্ত্রগ্রন্থ নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য লেখক মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীম সেই সনাতনরীতি অনুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত রাসপঞ্চাধ্যায়ের গোপীগীতা থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি কথামৃতের মঙ্গলাচরণরূপে ব্যবহার করেছেন।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
　　কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
　　ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

বহু লেখক এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন, তবুও মনে হয় যেন আরও অনেক কথা ওতে লুকিয়ে রয়েছে। রাসলীলাকালে গোপীদের অহংকার হয়েছিল, তাই কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন। যেখানে অহংকার সেখানে ভগবান্ নেই। তারপর শুরু হ'ল কৃষ্ণের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বিরহবিধুর গোপীদের গীতি ও সকরুণ প্রার্থনা। শ্লোকগুলি যেন তাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত এবং চোখের জলে সিক্ত। শুনলে পাষাণেরও হৃদয় গলে। অনুরাগ-অশ্রু জন্ম-জন্মান্তরের মনের গ্লানি ধুয়ে দেয়। নিস্তব্ধ নিশীথে যমুনা-সৈকতে গোপীদের হৃদয়বিদারী ব্যাকুলতা, কান্না, আন্তরিকতা দেখে কৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হলেন।

শ্রীম এই মঙ্গলাচরণে ইঙ্গিত করছেন—ভগবান্ লাভ করতে হ'লে গোপীদের মতো নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জল দিয়ে অহংকারকে ধুয়ে ফেল।

'তব কথামৃতম্'—তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। অমৃত খেলে মানুষ অমর হয়। কিন্তু ভগবানের কথা পান ক'রে কে অমর হয়েছে? লোকে 'কথামৃত' পড়ে, শোনে; কথামৃতের উপর বক্তৃতা দেয়, প্রবন্ধ লেখে; কিন্তু 'কথামৃত' পান করতে জানে কয় জন? শ্রীভগবৎকথা পান করেছিলেন শাপগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী পরীক্ষিৎ। তিনি শুককে বলেছিলেন, "গায়তঃ বিষ্ণুগাথা।" শুক সাতদিন সাতরাত ধরে গাইলেন ভাগবতের ১৮০০০ শ্লোক; আর তা প্রাণভরে পান করলেন পরীক্ষিৎ দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে। ভাগবতে বর্ণিত আছে—শুক কর্তৃক ভগবৎকথা শুনে রাজা পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে কুশাসনে উত্তরমুখে বসে মহাযোগসম্পন্ন সঙ্গরহিত ও সংশয়শূন্য ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে গেলেন। তক্ষক এসে তাঁর প্রাণহীন দেহকে কামড়াল, কিন্তু তার পূর্বেই তিনি অমরত্ব লাভ করলেন।

কথামৃতকার শ্রীম বুঝাতে চাইছেন যে, এই 'কথামৃত' পান করলেও পরীক্ষিতের মতো 'ব্রাহ্মীস্থিতিঃ' হবে।

'তপ্তজীবনম্'—ভগবানের কথা সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ঠাণ্ডা করে। ছাতিফাটা তৃষ্ণায় যেমন শীতল জল শান্তি দেয়, তেমনি ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ জীবগণের পক্ষে কথামৃত। শ্রীম'র মর্টন স্কুলে 'কথামৃত' পাঠ্য ছিল। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ ব'লত যে, এই বই-বেচার ফিকিরে স্কুলে ওটা পাঠ্য করা হয়েছে। জনৈক শিক্ষকের মুখে সমালোচনা শুনে শ্রীম প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন, "এই পড়ার ফল বুঝবে ছেলেরা যখন সংসারে ঢুকবে। 'সংসার জলন্ত অনল', ঠাকুর বলতেন, আর আমরাও তা ভাল ক'রে বুঝেছি। সংসারে প্রবেশ ক'রে যখন দুঃখকষ্টের পেষণে দিশেহারা হবে, তখন তাঁর অমৃতময়ী কথা মায়ের মতো বাঁচিয়ে রাখবে। এর একটা কথাও যদি মনে থাকে, উহাই তখন সংসার-সমুদ্রে ভেলার ন্যায় শান্তির সীমানায় পৌঁছে দেবে।" (শ্রীম-দর্শন, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ১১)

'কবিভিরীড়িতম্'—ক্রান্তদর্শী কবিরা শ্রীভগবানের কথার স্তুতি করেন। প্রতি অবতারের জীবন ও বাণী উপজীব্য ক'রে সৃষ্ট হয় নতুন সাহিত্য, কাব্য, গাথা, গান, স্তবস্তুতি, নাটক, গল্প, সঙ্গীত, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য। কথামৃত অবলম্বন ক'রে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হবে। একবার গিরিশচন্দ্রকে তাঁর বিল্বমঙ্গল নাটকের সুখ্যাতি করায় তিনি বলেছিলেন, "নাটক লেখা তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাছে শেখা। নরেন্দ্র বলে, বিজ্ঞান তাঁর কাছে শেখা; মহেন্দ্রমাস্টার বলেন, মাস্টারী শেখা তাঁর কাছে।"

'কল্মষাপহম্'—কথামৃত কল্মষ কালিমা বা পাপবোধ দূর ক'রে দেয় মন থেকে। প্রত্যেক অবতারকে পতিতপাবনের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। কথামৃত-পাঠে ও শ্রবণে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন শুদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে ও তাঁকে চিন্তা ক'রে গিরিশচন্দ্রের কলঙ্কিত জীবনে রূপান্তর হয়েছিল। পরবর্তী কালে তাঁর কাছে ঠাকুরের কথা শুনতে গেলে তিনি বলতেন: আমাকে দেখলে তোরা ঠাকুরের মহিমা আরও বেশী বুঝতে পারবি। গ্যাখ, তাঁকে চিন্তা ক'রে আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি।

'শ্রবণমঙ্গলম্'—মঙ্গলময় ভগবানের কথা শুনলে মঙ্গল হবেই হবে। শ্রীম বলতেন, "ঠাকুরের প্রতিটি কথা মন্ত্র।" জেনে বা না জেনে লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, তেমনি ঠাকুরের কথা শুনলে কল্যাণ হবে।

'শ্রীমৎ'—ভগবানের কথা শ্রী বা ঐশ্বর্যে পূর্ণ, সৌন্দর্যে ভরা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনবার জন্য দিগ্বিদিক থেকে লোক ছুটে যেত দক্ষিণেশ্বরে। তিনি নিজেই বলতেন, "কি আশ্চর্য, আমি মূর্খ! —তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য! এতে তো বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা!" (কথামৃত, ৪।২৭।৫)।

'আততম্'—তাঁর কথা সুদূরপ্রসারী এবং সহজ-প্রাপ্ত।

'ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ'—যাঁরা ভগবানের কথা বিতরণ করেন, তাঁদের মতো দাতা আর নেই। অন্নদান, ভূমিদান, অর্থদান প্রভৃতি বাহ্য। ভগবৎকথা-দান দাতা ও গ্রহীতাকে ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে দেয়। এ ধ্যান অজ্ঞানধ্বংসী। 'ভূরিদা জনাঃ'-র অপর অর্থ খুব উদার চিত্ত যাদের। সংসারের ভোগবাসনা যাদের চলে গেছে, যারা কেবল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করতে চায়, তারাই কেবল তাঁর কথা বলবার যোগ্য। ভগবান্ যাদের ইচ্ছা করেন, কেবল তারাই তাঁর কথা বলতে পারে। আবার যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, ততক্ষণই বলতে পারে।

২। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণচরিতামৃত

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী 'রাহোঃশিরে'র ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে ছেড়ে অপরটিকে ভাবা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-জীবন, আত্মকথা, সাধনকথা, দর্শন, উপদেশ কথামৃতের পাতায় পাতায় রয়েছে, তবুও শ্রীম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাতে উল্লেখ করেছেন। এই জীবনী তথ্যপূর্ণ ও কবিত্বপূর্ণ।

শ্রীম ঠাকুরের চরিতামৃতে লিখেছেন, "ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন, যিনিই পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা। ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছেন, 'তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে।'" এই-সব ঈশ্বরনির্বাচিত ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথনই কথামৃত। শ্রীম এ-সব অপূর্ব ভক্তদের তালিকা চরিতামৃতে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন ২৬শে

ফেব্রুআরি ১৮৮২, রবিবার।* তিনি এই দর্শনের কথা কথামৃতে লিখেছেন, "গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত Joseph Cook (জোসেফ কুক)-এর সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঠাকুর Steamer-এ (স্টীমারে) বেড়াইয়াছিলেন—তাহারই কয়েকদিন পরে।" (কথামৃত, ১।১।২)।

শ্রীম এখানে যে জন্মোৎসবের উল্লেখ করেছেন, তার বিবরণ প্রকাশিত হয় তত্ত্বমঞ্জরীর ১০ম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩১৩)। এই মূল্যবান্ তথ্যটি শ্রীরামকৃষ্ণচরিতের একটি বাড়তি উপাদান।

"অদ্য ঠাকুরের জন্মদিন। ফাল্গুনী দ্বিতীয়া, শুক্লপক্ষ, রবিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা আট ঘটিকার সময় হইতে ভক্তগণের দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আগমন হয়। ৯টার সময় কেদারবাবু, নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত তথায় পৌঁছেন। ঠাকুর তৎকালে একটি বারান্দায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। কেদারবাবু উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর এককালে স্থির সমাধিতে চলিয়া গেলেন। সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সমাধি ভঙ্গ হইল না। এমন সময় একজন পশ্চিমাঞ্চলের যোগী আসিয়া তাঁহাকে দুই-একবার নাড়াচাড়া করিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহা জানিতেও পারিলেন না। যোগীকে ওরূপ অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করা হইল। অনন্তর নরেন্দ্রকে 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন' এই গীতটি গান করিতে অনুরোধ করা হইল। এই গানে ঠাকুরের সংজ্ঞা হইল—তিনিও গান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আরও কয়েকটি গান হইল। ক্রমে সেই স্থানে ২৩।২৫টি ভক্ত আসিয়া পৌঁছিলেন, বেলা তখন প্রায় ১১টা হইবে। উপদেশের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, সংসারে জীব আহারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলে হানি নাই, কিন্তু মনটা যেন সেই পরমাত্মায় থাকে; যেমন বালকরা যখন খুঁটি ধরিয়া ঘুরিতে থাকে, তখন সে অন্যান্য বালকের সহিত কত প্রকার রঙ্গভঙ্গ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার মন কোথায়? তাহার মন সেই খুঁটিতে আছে, খুঁটি ভুলিয়া যাইলে হাত পিছলিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

"বেলা দুই প্রহরের সময় অনুমান ৫০।৬০ জন ভক্ত মিলিয়া ঠাকুর পঞ্চবটী নামক স্থলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। পঞ্চবটী—এইস্থানে ঠাকুর যোগসাধন করিয়াছিলেন। পূর্বে এইস্থানে একখানি পর্ণকুটীর ছিল এবং তাহার সম্মুখে বট, আমলকী, নিম্ব, বিল্ব ও অশ্বত্থ গাছ ছিল। বট বৃক্ষটিতে মাধবী ও মালতী লতিকা বেষ্টিত। এই বটবৃক্ষ অতিশয় পুরাতন, ইহার শাখা-প্রশাখা চতুর্দ্দিকস্থ অনুমান এক বিঘা জমি ব্যাপিয়া আছে। ইহার গোড়াটি ইষ্টকাদি দ্বারা বাঁধান এবং এক পাশে সিঁড়ি আছে। এইস্থানে সূর্য্যকিরণ একেবারে যাইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অতএব সেই বৃক্ষ-শাখাই চন্দ্রাতপের

* কথামৃতে প্রথমদর্শনের তারিখ নিয়ে মতভেদ:

১। কথামৃত, ১ম ভাগ, ১০ম সং, ১৩৩০ (শ্রীম'র জীবদ্দশায়): "ইংরাজী ১৮৮২ মার্চ মাস।"
২। কথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩শ সং, ১৩৪১: "আজ রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৪ই ফাল্গুন।"
৩। কথামৃত, ১ম ভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৬৮: "আজ রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই ফাল্গুন।"
৪। ইংরেজী গসপেলে মার্চ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে।

কার্য্য করিয়াছিল।

"সেইস্থানে কেবল সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। এই সঙ্কীর্ত্তন বেলা চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত হয়। ইহার মধ্যে এক ঘণ্টা ঠাকুর অনুপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর সেই সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। এমন অদ্ভুত নৃত্য কেহ কখন দর্শন করেন নাই। প্রেমের লহরী চলিয়াছিল, সকলেই আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সময় যেমন উল্লিখিত আছে—সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমের প্রবাহ চলিত, ভক্তগণ সেই শোনা কথা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলেন—ভক্তেরা মনে করিলেন, মরি মরি কি শুভদিন আজ পোহাইয়াছিল। ভক্তবৎসল হরি, আজ কি পাপীদের উদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্য দিয়া প্রেম ঢালিয়া সকলকে হরিপ্রেমে মাতাল করিয়া দিলেন। ধন্য আমরা বঙ্গবাসী, এই ঘোর কলিকাল—যে সময়ে ধর্মের এতদূর অধোগতি, ধর্মের ভান করিয়া যে সময়ে লোকে কেবল নিরয়পথ পরিষ্কার করিতেছে, ভক্তি প্রেম মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছে—এমন সময় যে আবার বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিতে বঙ্গবাসীদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে তাহা কাহারও মনে ছিল না। এইরূপ বোধ করি সকলের অভিপ্রায় হইয়াছিল—কেন না সেই সময়ে এই গীতটী সকলে উন্মত্ততার সহিত গান করিয়াছিলেন—

'সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে—
ও তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে,
নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে।'

"পরে 'এই আমাদের প্রেমদাতা' এই ধুয়া ধরিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। ঠাকুর তখন একেবারে স্থির সমাধিতে ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন। এই সময়ের ভাব লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। যখন সকলে এই ভাবে নিমগ্ন, এমন সময়ে কয়েকটি ইংরাজ স্ত্রী ও পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই সরল ও কোমল, প্রেমের স্রোতে তাঁহারা অভিভূত হইয়া অনিমেষলোচনে ঠাকুরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখাকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইল যে, তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। পুরুষেরাও তদ্রূপ, কিন্তু উঁহাদের মধ্যে একজন নিকটে আসিয়া কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ ব্যক্তির (ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া) কি মরিবার পূর্ব্ব লক্ষণ ? সে বলিল, ঈশ্বরের নামে ভাব হইয়াছে।

"এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। কিয়ৎকাল (বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা) অবাক হইয়া থাকিয়া কখন চলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা দেখি নাই। সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্যগোপালও সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের সঙ্গে তাহারও সমাধি ভঙ্গ হইল।

"বেলা অপরাহ্ণপ্রায় দেখিয়া ঠাকুর রামকে আহারের আয়োজন করিতে বলিলেন। পরে সাড়ে চারটার সময় ঠাকুর, ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থগণ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলে প্রীতি ভোজন করিলেন। ভোজনও অতি তৃপ্তিকর হইয়াছিল। অনুমান আশিজন ব্যক্তি ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার ব্যয় সুরেন্দ্রবাবু সহ্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে সকলে কেহ শকটারোহণে এবং কেহ নৌকাপথে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন।"

৩। কথামৃতের পরিবেশ

কথামৃতে প্রবেশকারী পাঠককে শ্রীম একটি অপরূপ পরিবেশ পরিবেশন করেছেন। তিনি এই পরিবেশের নাম দিয়েছেন 'আনন্দ-নিকেতন'। শ্রীম'র বর্ণনা: "কালীবাড়ী আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্র দর্শন।

আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুম-বিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। নহবৎ হইতে রাগ-রাগিণী সর্বদা বাজিতেছে।…ধন্য রাণী রাসমণি! তোমারই সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রতিমা—এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।" (কথামৃত, ১।১।১৪-১৫, ১।১।৮)।

সংসার-দাবানলে দগ্ধ ও চঞ্চলমনা মানুষকে শ্রীম আনন্দ-নিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যাতে তারা আনন্দময়ীর নিত্যোৎসব দেখে, নহবতের সঙ্গীতলহরী শুনে এবং সচল প্রতিমা শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে জাগতিক জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলতে পারে। অবশ্য শ্রীম'র বাস্তব বর্ণনা এখন পাঠককে ভাবচক্ষে দেখতে হবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

কথামৃতের প্রথম ভাগে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী কথা শোনানর পূর্বে, প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীম পাঠকের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করতে চান দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী ও উদ্যান। তাঁর উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রসঙ্গ শোনবার পূর্বে তীর্থপরিক্রমা ক'রে মন শুদ্ধ করলে পর তাঁর কথা ভাল বোঝা যাবে। পরবর্তী কালে শ্রীম ভক্তদের সঙ্গে ক'রে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরের সম্পর্কিত প্রতিটি স্থানের মাহাত্ম্য, ঘটনা প্রভৃতি বলতেন। তীর্থে করণীয় কি—সে-প্রসঙ্গে শ্রীম বলেছেন, "শাস্ত্রে…পরিক্রমার কথা আছে। তীর্থে গেলে অন্ততঃ তিনবার পরিক্রমা করা উচিত। পরিক্রমার মানে হ'ল ঘুরে ফিরে দেখা। তাহলে ভাল ক'রে মনে থাকবে।…একবার করলেও হয় কারো কারো, যাদের power of observation আর retentive faculty খুব strong (অবলোকন-শক্তি আর ধারণা-শক্তি অতি প্রবল)।…তীর্থে গিয়ে কি কি করতে হয়? প্রথম, চরণামৃত নিতে হয়। দ্বিতীয়, বসতে হয়। তৃতীয়, গান কি স্তোত্রপাঠ চেঁচিয়ে করতে হয়। …চতুর্থ, কোথাও কোথাও সাধু ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। …এ-সব করলে মনে হয় কিছু করলুম। এমনই আমাদের মনের constitution (গঠন)। পঞ্চম, পূজোর জন্য ফল কি মিষ্টি কিছু হাতে ক'রে নিয়ে যেতে হয়। ষষ্ঠ, বিত্তশাঠ্য না হওয়া। 'বিত্ত' মানে ধন, 'শাঠ্য'—শঠতা, কৃপণতা। টাকা পয়সায় ফাঁকি দিতে নেই।" (শ্রীম-দর্শন, ৪।১.৬-১৭)।

শ্রীম'র দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও উদ্যানের বর্ণনা কথামৃতের প্রথম ভাগে রয়েছে, সুতরাং তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদের জীবনীর সামান্য ঘটনাগুলিও মধুময় ও মূল্যবান্। ঐসব পুণ্য হারানো স্মৃতিগুলি পাঠকের মনে জাগিয়ে দেয় ব্যাকুলতা এবং জিজ্ঞাসা, "আজ যদি ঠাকুর স্থূল শরীরে থাকতেন?"

এবার আমরা শ্রীম-প্রদর্শিত দক্ষিণেশ্বর-তীর্থ পরিক্রমা ক'রব এবং কখন কখন 'শ্রীম দর্শন' গ্রন্থগুলি থেকে এবং অন্যান্য স্থান থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধৃত ক'রব। পাঠককে মনে রাখতে হবে—শ্রীম'র বর্ণনা প্রায় ১০০ বছরের পুরানো, কিন্তু তাঁর অমর লেখনী শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবন্ত ক'রে রেখেছে।

চাঁদনী—কালীবাড়ীটি কলকাতা থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা থেকে নেমে চাঁদনী দিয়ে কালীবাড়ীতে ঢুকতে হয়। এখন যাঁরা বাসে যান, তাঁরাও গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ ক'রে দেবদেবী দর্শনে চাঁদনী দিয়ে ঢোকেন। এই চাঁদনীর ঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণ স্নান করতেন। পরবর্তী কালে শ্রীম যখন দক্ষিণেশ্বরে

আসতেন তখন এই ঘাটে তোয়ালেখানা জলে চুবিয়ে কলকাতায় নিয়ে যেতেন এবং উপস্থিত ভক্তদের মাথায় ঐ গঙ্গাবারি সিঞ্চন করতেন। আপাতদৃষ্টিতে এ-সব কার্যকলাপ পাগলামি ব'লে মনে হয়, কিন্তু ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই দিব্য পাগলামির স্পর্শ লাভ করে।

"শ্রীম গঙ্গার বড় ঘাটে আসিয়াছেন। উপরের দিক থেকে দ্বিতীয় সোপানে বসিলেন—উত্তর দিক হইতে আট হাত দক্ষিণে। বলিতেছেন,—'এইখানে ঠাকুর এসে বসতেন কেশব সেনেরা এলে'।" (শ্রীম-দর্শন, ৬।৯০)। পারাপারের কাণ্ডারী ঠাকুর বসে থাকতেন এই ঘাটে। যে আন্তরিকভাবে ভবসমুদ্র পার হ'তে চাইত, তাকেই পার ক'রে দিতেন।

শ্রীশ্রীভবতারিণী মা-কালী—কথামৃতে শ্রীম মা-কালীর মূর্তির যে অনুপম বর্ণনা দিয়াছেন, তাতে তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এখন আমরা মা-কালী দর্শনে যাই। একটু প্রাণভরে প্রণামও করতে পারি না এবং চোখ চেয়ে যে মাকে একটু ভালভাবে দেখব, তাও হ'য়ে উঠে না। লাইনে দাঁড়াই, ধাক্কা খেতে খেতে এক দিক দিয়ে ঢুকি এবং এক ঝলক মাকে দেখে অন্য দিক থেকে বেরিয়ে আসি।

যে শ্রীম তৃতীয় দর্শন কালে 'মাটীর প্রতিমার' প্রসঙ্গ তুলে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্ক করতে গিছলেন, সেই শ্রীম'র কালীর বর্ণনা পড়লে মনে হয়, তিনি কী ভাবেই না রূপান্তরিত হয়েছিলেন! মায়ের যে-সব গহনার উল্লেখ কথামৃতে আছে সে-সব গহনা সম্বন্ধে আধুনিক মহিলারা ওয়াকিবহাল আছেন কিনা সন্দেহ। মা-কালী বর্ণনা কালে শ্রীম মাঝে মাঝে ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন: "শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্চম, পাঁজেব, চুটকী আর জবাবিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন।...দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন।...বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণ-শিলা; একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরাম-চন্দ্রের বিগ্রহমূর্তি ও বাণেশ্বর শিব।" (কথামৃত,১।১)।

মা ভবতারিণীর মূর্তির উচ্চতা ৩৩½ ইঞ্চি। এই মূর্তি সম্বন্ধে শ্রীম বলেছেন, "ঠাকুরের মুখে শুনেছি, নবীন ভাস্কর সারাদিনে বেলা তিনটার সময় একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। অত সংযত হ'য়ে—অত তপস্যা ক'রে তবে দক্ষিণে-শ্বরের মা-কালীকে বানিয়েছেন। তাই তো অত জীবন্ত। যে বানাবে তার মন ঐ দৈবভাবে একেবারে মিলে যাবে, তবে হাত দিয়ে ঐ ভাব পাথরে ফুটে উঠে।" (শ্রীম-দর্শন, ৪।২০০-০১)। বাংলাদেশে কত কালীমূর্তি আছে, কিন্তু দক্ষিণে-শ্বরের মূর্তি দেখে সাধ মিটে না। মনে হয় যেন বার বার দেখি। এর কারণ ঠাকুর মাকে জাগ্রতা ক'রে গেছেন। তিনি দেবীর নাকে তুলো ধরে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন মা জীবন্ত। মন্দিরশীর্ষে তিনি নূপুরপরিহিতা, আলুলায়িতকুন্তলা মাকে গঙ্গাদর্শন করতে দেখতেন; তাই তিনি যখন পূজারী ছিলেন কালীমন্দিরের পশ্চিমের দরজা খুলে দিয়ে মাকে গঙ্গাদর্শন করাতেন।

চাতাল—নাটমন্দির ও মায়ের মন্দিরে উঠবার সিঁড়ির মধ্যস্থলে চাতাল। "ঠা এখানে বসিতেন কখনও একাকী, কখনও ভক্তসঙ্গে। ঠিক সম্মুখে মা ভবতারিণী, পিছনে নাটমন্দির। ঠাকুর বসিতেন নাটমন্দিরের ভিত্তির অদূরে। একদিন ঠাকুর শ্রীমকে লইয়া আসিয়া এই স্থানে বসিয়াছিলেন।...'ভবদারা ভয়হরা নাম নিয়েছি তোমার।/এবার তার তার না তার তারিণী॥'—ঠাকুর এই গানটি গাহিয়া

শ্রীমকে মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।" (শ্রীম-দর্শন, ১২।১৭৫)।

আর একদিন চাতাল ও নাটমন্দির সংলগ্ন পূর্বদিকের স্তম্ভের আধ হাত উত্তরে বসে ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন, "দেহসুখ চাই না মা। অষ্ট সিদ্ধি চাই না মা। শত সিদ্ধি চাই না মা। লোকমান্য চাই না মা। শরণাগতি, শরণাগতি, শরণাগতি। আর এই করো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।" (শ্রীম-দর্শন, ৬।৯১)।

নাটমন্দির—"নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব এবং নন্দী ও ভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৺মহাদেবকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেন—যেন তাঁহার লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন।" (কথামৃত, ১।১)। নাটমন্দিরের ভৈরব ত্রিশূল নিয়ে ঠাকুরকে ধ্যানকালে পাহারা দিতেন।

"নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে এক সারি পিলার। তাহার দক্ষিণে আর এক সারি পিলার। এই দ্বিতীয় সারির বাম হাতের পিলারের কাছে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইলেন। সম্মুখে মা ভবতারিণী। তারপর এই পিলারকে সপ্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল রহিলেন। বলিলেন, 'এটিতে ঠাকুরের পবিত্র স্পর্শ রহিয়াছে। নীলকণ্ঠের যাত্রাগান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবেশে এই পিলারটিকে ভগবদ্বুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।'" (শ্রীম-দর্শন, ১২।১৭৪)।

এই নাটমন্দিরে এক সন্ধ্যায় শ্রীম দেখেছিলেন, "ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকের মধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী,—নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন। আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ!" (কথামৃত, ১।১।১০)।

ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা, বলিস্থান, দপ্তরখানা—"চকমিলান উঠানের পশ্চিম পার্শ্বে দ্বাদশমন্দির, আর তিন পার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্বদিকের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান" এবং তার দক্ষিণে দপ্তরখানা বা অফিস। (কথামৃত, ১।১)।

শ্রীম এ-সব খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশন করেছেন, কারণ এ হ'ল মা জগদম্বার সংসার। তীর্থযাত্রীদের কাছে এ-সব তত প্রয়োজনীয় না হ'লেও সাধু, অতিথি, ভক্ত ও কাঙালদের কাছে এ-সবের প্রয়োজন আছে।

দ্বাদশ শিবমন্দির—উঠানের পশ্চিমে দ্বাদশ শিবের মন্দির। মধ্যদেশে চাঁদনীর দেউড়ী। দ্বাদশ শিবের দ্বাদশ নাম। "নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, 'ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী!'" (কথামৃত, ১।১)।

নিবেদিতা সুন্দর লিখেছেন, "দক্ষিণেশ্বর মন্দির···রাণী রাসমণি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ···মানবীয় দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না থাকিলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও থাকিতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ না থাকিলে পাশ্চাত্যদেশে কোন প্রচারকার্যও হই'ত না।" (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ২৮৮)।

"শিবমন্দিরশ্রেণীর উত্তরের সোপানকুঞ্জের নিম্ন হইতে দ্বিতীয় সোপানে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর তৃতীয় সোপানে ললাট স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন, উত্তর দিক হইতে আড়াই হাত দূরে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্থানে সমাধিস্থ [হইয়া] বসিয়াছিলেন। যে ফটো আজকাল

সর্বত্র পূজিত হয়, সেইটি ঐ সময়ে এখানে লওয়া হয়।"* (শ্রীম-দর্শন, ১৩।২২০-২১)।

পাকা উঠান—সেই উঠান, যার উপর দিয়ে ঠাকুর হেঁটে যেতেন কালীঘরে, তারপর ভাবাবেশে মত্ত হ'য়ে ফিরতেন ঘরে।

শ্রীম তাঁর সাংসারিক কলহ ও যন্ত্রণাকে ভগবানের বর রূপে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তা তাঁকে নিয়ে গিছল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। প্রথম দর্শনের "সাত-আট দিন পর উঠান দিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুর। মণি (শ্রীম) বলছেন ঠাকুরকে, এ-সব যন্ত্রণা থেকে আত্মহত্যা করাই ভাল। ঠাকুর শুনেই উত্তর করলেন, ওকথা কেন? তোমার যে গুরু লাভ হয়েছে। তোমার আবার ভাবনা কি? বললেন, গুরু যে তোমার পিছু পিছু রয়েছেন। যাকে কষ্ট ভাবছ তা যে তিনি ইচ্ছা করলেই দূর ক'রে দিতে পারেন, সহজ ক'রে দেন। অনেক গাঁটওয়ালা একটা দড়ি বাজিকর কয়েক হাজার লোকের সামনে ফেলে দিল, কেউ একটা গাঁটও খুলতে পারলে না। কিন্তু বাজিকর হুড়হুড় ক'রে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সবগুলি খুলে ফেলবে। ভাবনা কি, গুরু সব মোড় ফিরিয়ে দেবেন।" (শ্রীম-দর্শন, ১।৩৪০)। [ক্রমশঃ]

* আমাদের যতদূর জানা আছে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্ত ফটো শ্রীশ্রীরাধাকান্তমন্দিরের বারান্দায় তোলা হইয়াছিল।—সঃ

শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১

গিরিশচন্দ্র শ্রীমায়ের প্রথম কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভের পূর্বেই তিনি পেয়েছিলেন শ্রীমায়ের আশ্রয়, অথচ সেই গিরিশচন্দ্রই শ্রীমাকে চিনেছেন সবশেষে।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় দু-বছর পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন গিরিশচন্দ্র। এই দ্বিতীয়বার বিবাহের মাস ছয়েক পরে তিনি দারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হ'ল না, কিন্তু চিকিৎসকদের সবচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে গিরিশ ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললেন। আত্মীয়-স্বজনেরা শেষ মুহূর্তটির জন্য উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায়—এমন সময়ে গিরিশের মগ্নচৈতন্যে এসে দাঁড়ালেন এক নারীমূর্তি, হাতে তাঁর মহাপ্রসাদ। অভয়দাত্রী সেই মূর্তি তাঁর মুখে মহাপ্রসাদ দিয়ে বললেন, "তুমি ভাল হ'য়ে গেছ।" ধীরে ধীরে চিকিৎসকদের বিস্মিত ক'রে গিরিশ চেতনা ফিরে পেলেন—কিন্তু তাঁর মনে বিপুল বিস্ময়। এ কি স্বপ্ন? তখনো তাঁর মুখে টাটকা মহাপ্রসাদের স্বাদ, তাকেই বা অস্বীকার করেন কি ক'রে! সুস্থ হ'য়ে উঠলেন ক্রমশঃ গিরিশচন্দ্র—তাঁর মনের মধ্যে জাগল তীব্র আলোড়ন "কে এই নারী? একি তাঁর একাদশ-বর্ষে লোকান্তরিত গর্ভধারিণী জননী? কিন্তু সে মুখ তো নয়!" এই রহস্যের সমাধান কিন্তু তখনই হ'ল না। শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়লাভের পর তিনি আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণই দেবীমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে তাঁকে আসন্নমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু মাতৃকৃপালাভের এই ঘটনা যে গিরিশের মনের ওপর ছায়াবিস্তার করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসেছেন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। তার পূর্ববর্তী মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাতে দেখতে পাই—প্রথম জীবনের নাস্তিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে মুক্তির জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা ক্রমশঃ তীব্র হ'য়ে

উঠেছে—মাসিক একবার তারকেশ্বর এবং সাপ্তাহিক কালীঘাটের কালীমন্দিরে গমন তাঁর এই তীব্র আকাঙ্ক্ষারই সাক্ষ্য, কিন্তু আস্তিকতায় পুরোপুরি স্থিতি লাভ করেননি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটক দেখার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছেন, "বা! তুমি বেশ সব লিখেছো!" উত্তরে গিরিশ বলেছেন, "মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।"[১] বেলুড় মঠে একটি বক্তৃতায় গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রয় পাইবার ৪।৫ দিন পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'তোর কি হইল?' তাহাতে আমি এই উত্তর করি যে, 'আমি আর কিছু ভয় করি না।'"[২] মনে রাখা দরকার 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটক দেখার দিনও (১৪।১২।১৮৮৪) গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণে আত্মসমর্পিত নন। সেইকালে তাঁর মন সংশয়ে দোদুল্যমান—ভক্তিবিশ্বাসের নিঃসংশয় পথটি খুঁজে পাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত গিরিশের আত্মসংকট ঘোচেনি, রামকৃষ্ণে শরণাগতিতেই তিনি ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছেন। অথচ গিরিশচন্দ্রের কথা থেকেই জানা যায়, এই সময়ে তিনি দৈবীপ্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার-কালে কুমুদবন্ধু সেন প্রশ্ন করেন, "আপনি যে নাটক লেখেন, তা যে inspiration-এ লেখেন, তা কি লেখবার সময় বোধ হয়?"

গিরিশচন্দ্র উত্তরে বলেন, "বোধ কি হবে? আমি দেখেছি, আর কে যেন আমাকে লিখিয়ে দেয়। এই লাইনগুলো মা আমাকে হাত ধরে লিখিয়ে দিয়েছেন—

বুঝ দেবি কলিযুগে কৃপা তব কত!
শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে
বিফল পরাণ তব,
নাহি জানি তবে
যবে 'মা' বলে তোমারে
ডাকিবে কলির নর।
ব্যাকুল অন্তর কত হবে হৈমবতি
ধন্যযুগ,
যাহে নাম-বলে মোক্ষধাম
লভিবে কীটাণু নরে।
যেবা তব শরণ লইবে,
অমরত্ব পাবে
মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয়—
কোলে তুলে লবে তারে সতি—।"[৩]

অংশটি 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের (৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)—প্রথম অভিনয়ের দিন ২১ জুলাই ১৮৮৩ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শরণাগতির প্রায় দেড় বছর আগে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে, তাঁকে বকলমা দানের পূর্বে গিরিশের এই প্রেরণাদাত্রী কে, যিনি স্বয়ং তাঁকে "হাত ধরে" লিখিয়ে নিয়েছিলেন? এইকালে দৈবীপ্রেরণা সম্পর্কে তাঁর মন নিঃসংশয় হ'য়ে ওঠেনি। অথচ তিনি সকলের অলক্ষ্যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে জীবনদাত্রী নারীমূর্তিকে অন্তরের মধ্যে ধারণ ক'রে রেখেছেন (গিরিশ তাঁর স্বপ্নদর্শনের কথা সারদাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কারও কাছে প্রকাশ করেছেন ব'লে জানা যায় না, কিন্তু সারদাদেবীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, পনের বছর পরেও সেই নারীমূর্তি অস্পষ্ট হ'য়ে যায়নি)। সেই জীবনদাত্রী দেবীমূর্তিই যে গিরিশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকর্মের দিশারীরূপে তাঁর অন্তর আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেন, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, ৯ম সং, পৃঃ ১০৬।
২। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সম্পাদনা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমল চন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ১৯৬।
৩। তদেব, পৃঃ ২০৪।

সেই স্বপ্নের দেবীমূর্তি তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে দাঁড়াল জয়রামবাটীতে।

সারদাদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন গিরিশ এর আগে কখনো পাননি, যদিও সহজ সুযোগ একবার এসেছিল। শ্রীমা তখন বলরাম বসুর বাড়িতে। সেদিনের ঘটনা সারদাদেবী গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুরতকুমারীর মুখে শুনেছিলেন এবং শ্রীমায়ের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি: "গিরিশ ও তার পরিবার তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিল। আমি তখন বলরামবাবুর বাড়িতে, বিকেল বেলা ছাদে গেছি। গিরিশের ছাদ হ'তে তাকালে যে দেখা যায়, সেটা আমি লক্ষ্য করিনি। পরে তার পরিবারের কাছে শুনলুম, সে গিরিশকে বলেছিল, 'ঐ দেখ, মা ওবাড়ির ছাদে বেড়াচ্ছেন।' গিরিশ ঐ-কথা শুনে অমনি তাড়াতাড়ি পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'না না, আমার পাপনেত্র, এমন ক'রে লুকিয়ে মাকে দেখব না।' এই ব'লে নীচে নেমে গিছিল।"[৪] "প্রকৃতপক্ষে তখনো গিরিশের মাতৃদর্শনের দৃষ্টি জাগেনি—শ্রীমা তখনো তাঁর কাছে "পরমহংসদেবের স্ত্রী" অর্থাৎ গুরুপত্নী মাত্র। এর পরে দ্বিতীয় দর্শনকালে শ্রীমাকে গুরুপত্নী হিসাবে প্রণাম করেছেন। এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক শিশুর ভূমিকা। গিরিশের এই পুত্রটি জন্মাবার পরই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী মারা যান। স্বাভাবিক কারণেই এই শিশুটি গিরিশের চোখের মণি। এর একটা অন্য কারণও ছিল। এক সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, গিরিশকে সেবা করবার সুযোগ দানের জন্যে তিনি যেন গিরিশের পুত্র হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সে প্রার্থনায় সম্মত হননি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের অল্পকাল পরেই শিশুটির জন্ম হ'লে গিরিশের ধারণা জন্মায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। শ্রীমা ও রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীদের প্রতি ছেলেটির আকর্ষণ ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্রীমা যখন গিরিশভবনে যেতেন, তখন সে তাঁর কোলে ওঠার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠত। তিন বছর পর্যন্ত ছেলেটি কথা বলতে পারত না—হাবভাবে সব বুঝিয়ে দিত।

সেবার শ্রীমা এসে উঠেছেন বরানগর কুঠীঘাটে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়া-বাড়িতে (১৮৯০)। তিনি তখনো ভক্তজননীরূপে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হননি—অন্তরালবর্তিনী সারদাদেবীকে ভক্তেরা প্রণাম জানিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'রত। গিরিশচন্দ্র শিশুপুত্রকে নিয়ে সেইভাবে প্রণাম জানাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাদ সাধল সেই শিশুটি। সেদিনের কথা সারদাদেবীর মুখ থেকেই শোনা যাক:

"আমাকে দেখবার জন্যে এমন অস্থির হ'ল যে, আমি উপরে যেখানে ছিলুম— সকলকে টেনে টেনে সেই দিকে 'উ-উ' ক'রে দেখিয়ে দিতে লাগল। প্রথমে কেউ বোঝেনি। শেষে বুঝতে পেরে আমার কাছে নিয়ে গেল, তখন ঐটুকু ছেলে, আমার পায়ের তলায় প'ড়ে প্রণাম করলে! তারপর নীচে নেমে গিরিশকে ধ'রে টানাটানি— আমার কাছে নিয়ে আসবে ব'লে। সে তো হাউ হাউ ক'রে কাঁদে আর বলে, 'ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি—আমি যে মহাপাপী। ছেলে কিন্তু কিছুতেই ছাড়ে না। তখন ছেলে কোলে ক'রে কাঁপতে কাঁপতে, দুচক্ষে জলধারা, এসে একেবারে আমার পায়ের তলায় সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প'ড়ে বললে, 'মা, এ হতেই তোমার শ্রীচরণদর্শন হ'ল আমার।' " (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১৩৮৩, পৃ: ১৬)

কিন্তু এ দর্শনও মাতৃদর্শন নয়—গুরুপত্নী দর্শন মাত্র, কারণ তখনো পর্যন্ত সারদাদেবীর প্রকৃত

৪। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, (১৩৮৩), পৃ: ১৭

পরিচয় তার কাছে উদ্ঘাটিত নয় এবং সেই স্বরূপ দর্শনের জন্য গিরিশচন্দ্র নিজেই ঋণ স্বীকার করছেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাছে।

এই সাক্ষাতের অল্প কিছুদিন পরেই সেই শিশু-পুত্রটি মারা গেল। গিরিশ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ছেলেটিকে বাঁচাতে। নানারকম চিকিৎসাতেও যখন কোন স্থায়ী ফল হ'ল না, তখন ডাক্তারদের পরামর্শে পুত্রকে নিয়ে তিনি গেছেন মধুপুর, যদি বায়ু পরিবর্তনে কিছু ফল হয়। কিন্তু রোগ-নিরাময়ের কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। শেষ চেষ্টা। গিরিশ স্বামীজীকে বললেন, "আমি এর পিতৃস্বত্ব ত্যাগ করছি, তুমি একে গ্রহণ ক'রে সন্ন্যাস মন্ত্র দাও।" গিরিশের আগ্রহে তার অনুরোধ রক্ষা করলেন স্বামীজী, কিন্তু সব চেষ্টা নিষ্ফল ক'রে তিনটি বছর উত্তীর্ণ হবার আগেই পিতৃস্নেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে শিশুটি চলে গেল। এদিকে গিরিশচন্দ্র যখন মধুপুরে পুত্রের পরিচর্যায় রত তখন পৌঁছল তাঁর কর্মচ্যুতির সংবাদ। যে স্টার থিয়েটারে তিনি বোনাসের ১৬০০০৲ হাজার টাকা এককথায় দান করে-ছিলেন, অন্যত্র চুক্তিবদ্ধ থাকায় ছদ্মনামে নাটক লিখে দিয়েছিলেন, সেইখান থেকেই বরখাস্ত হলেন, অপরাধ—থিয়েটারে অনিয়মিত উপস্থিতি।[৫]

আবার তাঁর জীবনে ঘনিয়ে এল বিপুল অন্ধকার। গুরু লোকান্তরিত, যে স্ত্রীর সৌভাগ্যে তিনি গুরুকে পেয়েছিলেন, তিনি আজ পাশে নেই, যে সন্তানটিকে পেয়ে স্ত্রীর শোক ভুলেছিলেন —গুরুর আশীর্বাদরূপে যাকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বেঁধে রাখতে পারলেন না, অনেক আশা নিয়ে আত্মবিক্রয় ক'রে অর্থ সংগ্রহ ক'রে যে স্টার থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন, অদৃষ্টের পরিহাস, সেখান থেকেই এল তাঁর কর্মচ্যুতির পত্র। স্টার থিয়েটারের একদল অভিনেতা এই সময় স্টার পরিত্যাগ ক'রে 'সিটি থিয়েটার' খুললেন—সেখানে গিরিশচন্দ্রেরই নাটক অভিনীত হ'তে শুরু হ'ল। 'স্টার' কর্তৃপক্ষ গিরিশের নামে হাইকোর্টে মামলা রুজু করলেন—নাটকের স্বত্ব দাবী ক'রে। মৃত্যু, নৈরাশ্য, ষড়যন্ত্র—সব দিক দিয়ে গিরিশ একবারে নিঃস্ব হ'য়ে গেলেন।

সেই অন্ধকার দিনে গিরিশের সামনে আলোর সংকেত এনে দিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ—শুধু পরামর্শ নয়, তিনিই তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চললেন জয়রামবাটী—মাতৃসমীপে। গিরিশ ভেবেছিলেন, সব বন্ধন যখন ক্ষয় হ'য়ে গেছে, তখন মুক্তির কাল এসে গেছে। গুরুপত্নীর কাছ থেকে শুধু অনুমতি নেবার যেটুকু বিলম্ব।—গিরিশ বলেছেন, "আমরাই কি আগে মাকে মানতুম? পরে নিরঞ্জনই আমাদের চোখ খুলে দিলে।" নিরঞ্জনানন্দকে নিয়ে জয়রামবাটী পৌঁছলেন গিরিশচন্দ্র। পৌঁছেই চলে গেলেন স্নান করতে—শুচি হ'য়ে তবে মাতৃপ্রণাম। স্নান সেরে আর্দ্রবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন মাকে এবং তারপরই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। "শ্রীমায়ের চরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া তিনি যেমন উপরের দিকে চাহিয়াছেন, অমনি মায়ের মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন 'এঁ্যা, মা তুমি!'"[৬] গিরিশের দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল রহস্যের যবনিকা। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯১—দীর্ঘ পনের বছর ধরে সেই একটি মুখ সঙ্গোপনে অন্তরের মধ্যে লালন ক'রে এসেছেন, রহস্য উন্মোচনের কত নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন। তাঁর সেই জীবনদাত্রী, প্রেরণাদাত্রী, গুরুপত্নী থেকে অকস্মাৎ জগজ্জননীরূপে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

৫। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, দে'জ সং (১৯৭৭), পৃঃ ২৫৩-৫৪।
৬। শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, (১৯৭৭), পৃঃ ২৩৬।

গিরিশ নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মায়ের কাছে প্রশ্ন ক'রে পাঠালেন, "সে কি তুমি?" উত্তর এলো মায়ের কাছ থেকে "হ্যাঁ, বাবা আমিই।"

গিরিশের জিজ্ঞাসার তখনো নিবৃত্তি হয়নি—সরাসরি একদিন প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি রকম মা?"

মায়ের দ্বিধাহীন উত্তর, "আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।"[৭]

২

"আমি যে তোমার সত্যি মা। তোমার চোখ ঢাকা রয়েছে, আমি তোমার চোখ খুলে দিতে এসেছি।"[৮]

'শঙ্করাচার্য' (১৯০৯) নাটকে গণপতির প্রতি মহামায়ার আশ্বাস-বাণী—গিরিশের অভিজ্ঞতারই অকৃত্রিম অভিব্যক্তি। পনের বছর আগে এক স্বপ্নাচ্ছন্ন মুহূর্তে গিরিশের চোখ খুলে দিতেই এসেছিলেন মহামায়া। তারপর তিনি চিনেছেন গুরুকে—ইষ্টকে, কিন্তু মহামায়াকে চিনতে কেটে গেল দীর্ঘকাল। গিরিশ আবার তাঁর অবসিতপ্রায় শক্তিকে খুঁজে পেলেন, কিন্তু সংসারে আর নয়। সারদাদেবীর কাছে তাঁর প্রার্থনা—এবার মুক্তি চাই।

—না, সে সম্ভব নয়। ঠাকুর যাকে যা কাজের ভার দিয়ে গেছেন, সেই কাজই তাকে ক'রে যেতে হবে আমৃত্যু—সেই কাজের মধ্যে দিয়েই ঠাকুরের সেবা। তা থেকে সরিয়ে নেবার শক্তি কারও নেই—সেই তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র।

অবগুণ্ঠিত কোমলতার মধ্যে কী আশ্চর্য দৃঢ়তা! বহুক্ষণ ধরে গিরিশের সঙ্গে মায়ের বিতর্ক চ'লল। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, "বুদ্ধিমান্ ও শব্দপ্রয়োগনিপুণ মহাকবি আধঘণ্টা ধরিয়া নানাভাবে শ্রীমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই প্রখর বুদ্ধিমত্তার সম্মুখে অতি অল্প লোকই স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীমা স্বীয় সিদ্ধান্ত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।"[৯]

গিরিশচন্দ্র পরাজিত, কিন্তু সেই পরাজয়ই তাঁর শক্তির উৎস। "এখন হইতে সম্পূর্ণ এক অন্যব্যক্তি হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পুস্তক-সকলের প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।"[১০] সেই উপলব্ধিই ভাষা পেয়েছে তাঁর রচনায়:

মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার
দেবকার্য করিব উদ্ধার
ইথে বিঘ্ন কদাচ না হবে।
স্নেহময়ী জননী যেমতি
রাখেন সন্তানে বক্ষে করিয়া ধারণ,
সেইমত জগন্মাতা এ দীন সন্তানে
মহাশক্তি আবরণে রক্ষেন সতত।
দেবকার্যে বিঘ্ন অসম্ভব।

(শঙ্করাচার্য, ৩ অঙ্ক, ৪ গর্ভাঙ্ক)

কয়েকমাস জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে পরম শান্তিতে কাটিয়ে গিরিশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন। সারদাদেবী এখন গিরিশের দৃষ্টিতে নতুন পরিচয়ে উদ্ভাসিত। গিরিশ মায়ের সেবার জন্যে তৎপর হ'য়ে উঠলেন। শ্রীমা বলেছেন, "[গিরিশ] আমাকে দেড় বছর রেখেছিল বেলুড়ে

৭। তদেব।
৮। শঙ্করাচার্য—৫ম অঙ্ক, ১১শ গর্ভাঙ্ক
৯। শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৩৯।
১০। ভক্ত গিরিশচন্দ্র—শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, উদ্বোধন, আষাঢ় ১৩২০।

নীলাম্বরের বাড়ি।"[১১] স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী শ্রীমা ১৩০০ সালের (ইং ১৮৯৩) আষাঢ় মাস থেকে কয়েকমাস বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে ছিলেন—জগদ্ধাত্রী পূজার সময় দেশে ফিরে যান। মনে হয়, নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে থাকাকালে এবং পরবর্তী সময়ে মোট দেড় বছর মায়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র; কারণ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ শিবানন্দ-স্বামীর কাছে এক পত্রে লিখছেন, "গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য।"[১২]

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হ'ল গিরিশের 'জনা'—মাতৃস্নেহ ও বাৎসল্য রসের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। জনৈক সমালোচক 'জনা'র পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন: "পাঠক ও দর্শক বীররমণীর অপূর্ব প্রতিমূর্তি দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে, পুত্র-বাৎসল্যের প্রখরতা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছে, আবার মাতৃস্নেহের অমৃতস্পর্শে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে।"[১৩]

'জনা'-র মূলকাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে, বীররমণী রূপে জনার পরিকল্পনা মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যান্তর্গত "নীলধ্বজের প্রতি জনা" পত্রিকার ওপর নির্ভর ক'রে। মহাভারতে জনার ভূমিকা পুত্র প্রবীরের মৃত্যুর পর থেকে—তখনই তার স্বামী নীলধ্বজের প্রতি প্রশ্ন:

কি বা কথা কহ নরপতি।
শত্রুসঙ্গে কেমনেতে হইবে পীরিতি॥

জনা স্বামীকে ধিক্কার দিয়েছে—স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ ক'রে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ভ্রাতার শরণাপন্ন হয়েছে—সর্বত্র নিরাশ হ'য়ে অবশেষে তার গঙ্গাবক্ষে আত্মনিমজ্জন। মধুসূদনের জনা পাশ্চাত্য-কাব্য-প্রভাবে বীরাঙ্গনারূপেই পরিকল্পিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জনার প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ছাড়াও আর এক রূপ আছে—সে রূপ মাতৃত্বের। সমালোচক এই মাতৃরূপের এবং বাৎসল্যরস সৃষ্টিতে নাট্যকারের স্বকীয়তার কথাই উল্লেখ করেছেন। 'জনা' নাটক রচনার পূর্বে গিরিশ-জীবনের দুটি বিশেষ ঘটনা স্মরণ রাখা দরকার (১) সন্তান-বিয়োগের নিদারুণ যন্ত্রণা লাভ। এর আগেও গিরিশের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু সে-মৃত্যু এত দুঃসহ হ'য়ে ওঠেনি। (২) মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ ও পবিত্র ধারায় অবগাহন। আজন্ম মাতৃস্নেহবঞ্চিত গিরিশের কাছে জয়রামবাটীর দিনগুলির অভিজ্ঞতা এর পটভূমিকা।

'জনা' নাটকে বাৎসল্যরসের গানগুলি বাংলা-সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। গিরিশচন্দ্র ঘরোয়া জীবনকে অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই তুলে এনেছেন বিশেষ ক'রে একটি গানে:

হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়
রানী পাছে তোলে কোলে।
রানী কুতূহলে ধর ধর বলে
হামা টেনে তত গোপাল চলে॥
প'ড়ে প'ড়ে যায়, ধূলা লাগে গায়,
আবার উঠে আবার পলায়।
মুছায়ে আঁচলে, রানী কোলে তোলে
ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়।···

(৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

শেষ পঙ্‌ক্তিতে পদকর্তার আহ্বান "প্রেমের ডোরে, কিশোর চোরে, / বাঁধবি যদি আয় গো তোরা"—প্রেমের শত গ্রন্থি দিয়েও যাকে বাঁধতে পারেননি এ যেন সেই মন-চোর গোপালের

১১। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১১শ সং, পৃঃ ৭৫।
১২। বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪৬।
১৩। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে মা—জিতেন্দ্রলাল বসু—মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

উদ্দেশে গিরিশের অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য।

ঘরে কি নাইক নবনী ?

কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস্ নীলমণি ?

রাখাল মিলি, ঘন করতালি

কাননে চলিল কানু।…(২ অঙ্ক, ৪ গর্ভাঙ্ক)

গানদুটিতেও পিতৃহৃদয়ের বেদনারই নীরব অভিব্যক্তি। এই চিত্রের পাশাপাশি প্রবীরের মাতৃবন্দনায় গিরিশের সমকালীন মানসিকতা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আরাধ্যা দেবী গঙ্গার প্রতি জনার উক্তি :

বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি

মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।…

(১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

যেন গিরিশেরই স্বগতোক্তি।

জনার প্রতি প্রবীরের উক্তি :

তব পদধূলি মাতা করিলে গ্রহণ,

মহাশক্তি জাগে হৃদি-মাঝে।

ত্রিপুরারি হন যদি অরি,

তাঁরে নাহি ডরি,

মার নাম কবচ আমার। (২ অঙ্ক, ৪ গর্ভাঙ্ক)

নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত নাট্যকারের মর্মের প্রতিধ্বনি।

সেই জয়রামবাটীর মাতৃস্নেহসিক্ত অবিস্মরণীয় দিনগুলি গিরিশচন্দ্র ধরে রেখেছেন সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রে, একটি ছোট গল্পে। গল্পটির নাম 'বাঙ্গাল'। ধনীপুত্র সহুরে হরেন্দ্র এবং গ্রাম্য বালক রাধাকান্ত স্কুলের সহপাঠী। সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের জন্য স্কুল জীবনে তাদের মধ্যে কোন সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। গ্রাম্যতার দরুন রাধাকান্ত সহপাঠীদের কাছে 'বাঙ্গাল' নামেই পরিচিত। স্কুল পরিত্যাগের দীর্ঘদিন পরে থিয়েটারে দেখা। উচ্ছ্বসিত হরেন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে রাধাকান্তকে থিয়েটার দেখায় এবং নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় নিয়ে যায়। হরেন্দ্রের ইচ্ছায় রাধাকান্ত ২৫৲ টাকার বিল-সরকারী পরিত্যাগ ক'রে মোটা বেতনে হরেন্দ্রের কর্মচারীর কাজ গ্রহণ ক'রে সস্তা হোটেল ছেড়ে হরেন্দ্রের গৃহে আশ্রয় নেয়। অবশেষে একদিন হরেন্দ্রের প্রবল আগ্রহে তাকে রাধাকান্ত নিজের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রাধাকান্তের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

"কিন্তু হরেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে যখন মাদুরে বসিয়া দা-কাটা তামাক পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে লাগিল, রাধাকান্তের কতক চিন্তা দূর হইল। রাধাকান্তের মা ছেলের বন্ধুকে ছেলের মতো যত্ন করিয়া চিঁড়ে ভাজা, চাল ভাজা, তেল নুন মাখিয়া জল খাইতে দিল।…হরেন্দ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভাজাভুজি, পাটালী খাইল, অতি উপাদেয় দ্রব্য তাহাকে ঐরূপভাবে খাইতে রাধাকান্ত দেখে নাই। তাহার পর অন্ন, কলাইয়ের ডাল, সজিনা খাড়া চচ্চড়ি, আধপোড়া পোনামাছ ভাজা, উত্তম ঘৃত, দুগ্ধ পুত্রবৎ যত্নের সহিত রাধাকান্তের মা হরেন্দ্রকে খাইতে দিল। হরেন্দ্র বাটীতে যাহা খাইত, তাহার দ্বিগুণ খাইল। তথাপি মা…ঘোমটা টানিয়া কথা কহিয়া বলিল, 'বাবা আর দুটি ভাত ভাঙিয়া নাও। আহা বাবা—এ খেয়ে জোয়ান বয়সে কি ক'রে থাকবে।' এই সকল স্নেহবাক্যে হরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। রাধাকান্ত সাবান লইয়া ছিল। বালিসের ওড় বিছানা প্রভৃতি কাচিয়া রাখিয়াছিল।…পরদিন প্রাতে রাধাকান্তের চাকর মাহিন্দর ও অন্যান্য কৃষি-চাকরেরা হাতে কলিকা টানিতে টানিতে হরেন্দ্রকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ গা বাবু, তোমার বাড়ী কি নিজ কলকাতায় ?'…মাঠে জলখাবার লইয়া যাইতে লোকের অভাব হইতেছিল। রাধাকান্ত সভয়ে শুনিল, হরেন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়া বলিতেছে, 'মা আমাকে দাও, আমি জলখাবার লইয়া যাই।'

…একদিনেই হরেন্দ্র ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ হইয়াছিল।…হরেন্দ্র প্রায়ই কৃষকদিগকে খাওয়ায় ও তাহাদের সহিত খায়। সন্ধ্যার পর তাহাদের সহিত নৃত্যগীত করে। সাঁতার দেয়—এক-সঙ্গে ছোটে—কখনো বা তামাক সাজিয়া খাওয়ায়।"

দীর্ঘকাল পরে হরেন্দ্র নিজের জীবনের শূন্যতার কথা বলেছে রাধাকান্তের কাছে, "মা আমার নয় জানিস্,—স্ত্রী আমার নয় জানিস্,—…যে সকল পথের ভিখারীরা আমার ধনে অট্টালিকায় 'বাবু' হইয়া বসিয়াছে,—তাহারা আমায় উপহাস করে জানিস্,—পারিষদেরা যাহারা আমার অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারা পশ্চাতে আমাকে গালি দেয়, তাহাও জানিস্,—দাসদাসীরা অর্থের উপাসনা করে—আমার নয়।…আমার জীবন দুঃখময়। কবে সুখী হইয়াছি জানিস্?—যে কয়দিন তোদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তোর মাকে 'মা' বলিয়া, তোর বাপের চরণ-বন্দনা করিয়া, তোর চাকরদের সঙ্গে খেলিয়া…মরুময় উত্তপ্ত জীবনে, কয়েকদিন শীতলবারি পড়িয়াছিল।"[১৪]

জয়রামবাটী কামারপুকুরে নবশক্তি লাভ ক'রে গিরিশচন্দ্র নতুন ক'রে মঞ্চসেবায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। একমাত্র ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রহসন সমেত তাঁর ছখানি নাটক মঞ্চস্থ হ'ল। তার মধ্যে তিনখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক—'জনা', 'আবু হোসেন'[১৫] এবং 'মুকুল-মুঞ্জরা', একখানি পূর্ণাঙ্গ দুরূহ নাটকের অনুবাদ 'ম্যাকবেথ'। 'মুকুল-মুঞ্জরা' বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায়, কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেনের মতে "গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মিলনান্ত নাটক"। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একমাত্র নাটকের চরম দুর্ভিক্ষের দিন—১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ ভিন্ন আর কখনো গিরিশচন্দ্রের এক বছরে এত নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়নি এবং এরই মধ্যে আছে, গিরিশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'জনা', জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ 'আবু হোসেন', সমালোচকের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ 'মুকুল-মুঞ্জরা', এবং সেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথের মতো দুরূহ নাটকের অনুবাদ—যা এখনো পর্যন্ত 'ম্যাকবেথ' অনুবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৩

কেহ নাহি আর, এ জীবন ভার,
কত মা সহিতে পারি ॥
অকূল পাথার, না হেরি নিস্তার,
এ দীন শরণাগত।
রাখ মা আশ্রিতে, জুড়াও তাপিতে
পূর্ণ কর মনোরথ ॥

মিনার্ভা থিয়েটারে নাটক দেখতে এসেছেন শ্রীমা। একাগ্র হ'য়ে শুনছেন দণ্ডীরাজার কণ্ঠে গিরিশেরই প্রার্থনা।

গিরিশই বিশেষ উদ্যোগী হ'য়ে এনেছেন শ্রীমাকে থিয়েটার দেখাতে। শ্রীমা তখন 'উদ্বোধনে'। একদিন গিরিশচন্দ্র মাকে প্রণাম ক'রে বললেন, "মা, অনেকদিন হ'ল থিয়েটারে আছি। আর ও-সব ভাল লাগে না, ছেড়ে দেব মনে করছি। তবে আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে একদিন আপনাকে আমার অভিনয়

১৪। বাঙ্গাল—গিরিশ-রচনাবলী (সংসদ-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫০-৫৩।

১৫। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মুকুল-মুঞ্জরা' ও 'আবু হোসেন' স্টার থিয়েটারের জন্য আগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে গৃহীত হয়নি। ম্যাকবেথ দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় 'আবু হোসেন'-এর অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। পূর্বের দুখানি নাটক ঠিক কোন্ সময় গিরিশচন্দ্র রচনা করেন জানা যায় না। অনুমান করি, 'আবু হোসেন' ও 'মুকুল-মুঞ্জরা'র খসড়া পূর্বে রচিত হলেও পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ জয়রামবাটী থেকে ফেরার পরই গিরিশচন্দ্র দিয়েছিলেন।

দেখাই, আর ঐ হবে আমার শেষ অভিনয়।”[১৬]

সেই অনুরোধ রক্ষা করতেই মা এসেছেন অভিনয় দেখতে—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর, রবিবার। সেদিনের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী শান্তানন্দের মুখ থেকেই শোনা যাক :

“শ্রীশ্রীমায়ের আগমন উপলক্ষে থিয়েটার সকাল সকাল আরম্ভ হবে বলেই আমরা তাড়াতাড়ি বেরুবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলাম। ডাঃ কাঞ্জিলাল ও ললিত চাটুজ্যে শ্রীশ্রীমায়ের যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা মাকু ও মেয়েভক্তদল ললিত চাটুজ্যের গাড়িতে আর আমি, ললিত চাটুজ্যে, ডাঃ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অন্য গাড়িতে ক’রে একটু আগেই রওনা হলাম কারণ আজ সন্ধ্যে ৬টায় হবে থিয়েটার আরম্ভ।

“…একটি বক্সে শ্রীশ্রীমা ও অন্যপাশে আমরা সব বসেছিলাম ঠিক শ্রীশ্রীমার কাছের বক্সেই। সেদিন হচ্ছিল ‘পাণ্ডব গৌরব’ ও ‘রঙ্গরাজ’। প্রথমেই পাণ্ডব গৌরব আরম্ভ হ’ল।

“…দৃশ্যপটে নারদের সঙ্গে কঞ্চুকীকে [গিরিশচন্দ্র] কথা বলতে দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন, ‘ও, এই বুঝি গিরিশ, তা বেশ সেজেছে তো। মোটেই চেনা যাচ্ছে না কিন্তু।’

“…দেবীর সহচরী যোগিনীগণ তখন গান ধরেছেন, ‘হের হর-মনমোহিনী কে বলে রে কাল মেয়ে’ ইত্যাদি। এতক্ষণ শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে দেখছিলেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক এই সময়টিতে তিনি গভীরভাবে মগ্ন হ’য়ে স্থির হ’য়ে গেলেন। এইভাবে সমাধিতে অনেকক্ষণ ছিলেন।”[১৭]

রাত হ’য়ে যাওয়ায় সেদিন দ্বিতীয় নাটকখানি না দেখেই ফিরে এসেছিলেন সকলে। সমাধি-ভঙ্গের পরে হয়তো শ্রীমায়ের অন্তরে বেজে চলেছিল সেই সঙ্গীতের সুরধ্বনি—গিরিশের মাতৃবন্দনা, আপন স্বরূপ উপলব্ধির আলম্বন :

হের হর-মনমোহিনী
কে বলে রে কাল মেয়ে।
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো,
চোখ থাকে তো দেখ্‌না চেয়ে ॥

এর আগেও গিরিশের ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটক দেখতে এসে শ্রীমায়ের ভাবসমাধি হয়েছিল—এ-কথা জানাচ্ছেন ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য। ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটকের কিছু অংশ যে মাতৃপ্রেরণায় রচিত গিরিশচন্দ্র স্বয়ং সে-কথা বলেছেন, আগেই তা উল্লেখ করেছি।

‘বিল্বমঙ্গল’ নাটক দেখেও (১৯০৪-০৫) মা অভিভূত। এ-প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, “শ্রীমা গিরিশবাবুর অনুরোধে একরাত্রে ‘বিল্বমঙ্গল’ অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। বিল্ব-মঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেমদর্শনে তিনি ‘আহা’ ‘আহা’ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।”[১৮]

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ‘জনা’ নাটক দেখার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সঠিক সাল তারিখ জানাননি। “গিরিশ একদিন মাকে ‘জনা’ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। গিরিশ নিজে হইতেন বিদূষক। বিদূষক দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মা হাসছেন যে, কেমন দেখছেন?’ মা উত্তর করিলেন, ‘যা দেখছি, তাতো ওরই চরিত্র। আমি তো জানি ওর ঐরকমই বিশ্বাস, ঠাকুরকে ডাকলেই ত্রাণ

১৬। গিরিশচন্দ্রের শেষ মঞ্চাবতরণ ১৩১৮, ৩০ আষাঢ়, বলিদান নাটকে। তবে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বরের পরে আর কখন ‘পাণ্ডব গৌরবে’ অভিনয় করেছিলেন ব’লে উল্লেখ পাইনি।

১৭। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-সঞ্চয়ন—স্বামী শান্তানন্দ, উদ্বোধন ১৩৬৫, পৌষ।

১৮। শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, (১৩৭৫) পৃঃ ২৬০।

পাওয়া যায়। আবার বকেও।"[১৯] ১৩১৯ সালে বেলুড়ে দুর্গোৎসবে মহাষ্টমীর রাত্রে 'জনা'র অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। সে অভিনয়ও দেখেছিলেন সারদাদেবী।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য সারদাদেবীর 'কালা-পাহাড়' নাটক দেখার সময় মনোমোহন-রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধনের দিন ব'লে উল্লেখ করেছেন। মনোমোহন-রঙ্গমঞ্চ উদ্বোধিত হয় ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৫। স্বামী গম্ভীরানন্দ ও ব্রহ্মচারী অক্ষয়-চৈতন্য—উভয়েরই বিবরণ অনুযায়ী সারদাদেবী তখন কোয়ালপাড়ায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি কলকাতায় আসেন। সুতরাং মনোমোহন থিয়েটারে ১৯১৬ বা পরবর্তী কোন সময় 'কালাপাহাড়' নাটকও তিনি দেখেছিলেন। অবশ্য সে সময় গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত।

শুধু অভিনয় নয়, গিরিশের সঙ্গীতেও মা তৃপ্ত। রামকৃষ্ণ গিরিশের গান শুনেছিলেন—অভিভূত হ'য়ে ভাবাবেশে কখন সেই গানের সঙ্গে নৃত্য করেছেন, কখন বা সমাধিস্থ হয়েছেন, কিন্তু সঙ্গীতের স্পষ্ট সমালোচনা করেছিলেন ব'লে জানা যায় না। শ্রীমা কিন্তু স্পষ্ট প্রশংসা করেছেন, "গিরিশবাবু এই সেদিনও[২০] গান শুনিয়ে গেলেন। সুন্দর গাইতেন।" জয়রামবাটীতে অবস্থান কালে গিরিশ গান গেয়েছেন—অন্তরালে থেকে শ্রীমা সে গান লিখে নিয়েছেন—পরে ভক্তদের অনুরোধে সেই গান শুনিয়েছেন, এ-কথা জানিয়েছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ।[২১]

৪

"মা তোমার কাছে যখন আসি, তখন আমার মনে হয় আমি যেন ছোট্ট শিশু, নিজ মায়ের কাছে যাচ্ছি।"

আজন্ম মাতৃস্নেহবঞ্চিত গিরিশচন্দ্রের এই উক্তিতে তাঁর স্নেহপিপাসিত মনেরই পরিচয় ফুটে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জয় করেছিলেন অহেতুক স্নেহে—সেখানেও যখন তিনি গৃহীত হয়েছেন, তাঁর মাতৃস্নেহের কথাই মনে পড়েছে। একদিনের কথা লিখেছেন গিরিশচন্দ্র: "দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে, আমায় বলিলেন—'পায়েস খাও।' আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন—'তোমায় খাওয়াইয়া দি।' আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম, তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচে-পুঁছে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচে-পুঁছে খাওয়াইয়া দিলেন। ...আমি মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন!—এই মনে হইল।"[২২]

১৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৭৭-৭৮।

২০। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২; কথাগুলি সারদাদেবী বলেছিলেন ৺সরযূবালাকে, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ মাসে, তখন গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত। স্পষ্টই বোঝা যায় মৃত্যুর কিছুকাল আগে পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝেই শ্রীমাকে গান শুনিয়েছেন।

২১। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য আশুতোষ মিত্রের বিবৃতি অবলম্বন ক'রে জয়রামবাটীতে গিরিশের 'হামা দে পলায়' গান গাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। গানটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'জনা' নাটকের। গিরিশচন্দ্র ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জয়রামবাটী গিয়েছিলেন। সুতরাং ঐ সময় তাঁর পক্ষে গানটি গাওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। শ্রীমা গানটি কোনও ভক্তসন্তানের পীড়াপীড়িতে গেয়ে শুনিয়েছিলেন ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ নেই। মনে হয়, জয়রামবাটীতে নয়, পরবর্তী কোন কালে গিরিশের মুখ থেকে অথবা নাটকের অভিনয় দেখার সময় শ্রীমা গানটি তুলে নেন এবং ভক্তকে শোনান। স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থেও জয়রামবাটীতে গানটি গাওয়ার কথা আছে।

২২। পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ—গিরিশ-রচনাবলী (সংসদ- ১৯৭৫), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪।

মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে সেইদিনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, "কি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি গিরিশ ঘোষ, বুড়ো মিন্সে, কলকাতার বদমাস্ গুণ্ডার সর্দার, থিয়েটারে ভাঁড়ামো করি,···কিন্তু তিনি যখন বাঁ হাত আমার কাঁধে দিয়ে ডান হাত দিয়ে আমার মুখে পায়স দিতে লাগিলেন, তখন আমি যেন সমস্ত ভুলে গিয়ে সাত-আট বৎসরের শিশুবালক হ'য়ে গেলুম।"[২৩]

গিরিশচন্দ্রের সেই বালকমনই এতদিনে মা খুঁজে পেয়েছে—"সত্যিকার মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়।" শৈশবের সঙ্গে দৌরাত্ম্যেরও কিছু সম্পর্ক আছে—সে দৌরাত্ম্যও কখন কখন সহ্য করতে হয়েছে সর্বংসহা শ্রীমাকে। সেবার দেশ থেকে সারদাদেবী ফিরেছেন দীর্ঘদিন বাদে। ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী সন্তানেরা হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন—অভ্যর্থনা ও মাতৃপ্রণামই উদ্দেশ্য। কিন্তু গাড়ি এলো তিনঘণ্টা 'লেটে'। অপেক্ষমান সন্ন্যাসীরা অগ্রসর হতেই গোলাপ-মার ঝাঁঝাল উক্তি, "হ্যাঁ মহারাজ, তোমাদের কি একটু আক্কেল নাই? এই রোদে মা তেতে পুড়ে এলেন, আর তোমরাই যদি পেন্নাম করবার জন্যে এখানে এসে বিভ্রাট কর, তো অপরের আর কথা কি?" অপরাধীর মতো মুখ ক'রে সঙ্কুচিত মহারাজেরা সরে গেলেন, অন্য ভক্তেরাও। বাগবাজারে পৌঁছলেন মা, তার ঠিক পরমুহূর্তেই ঘর্মাক্ত কলেবরে, গায়ে সামান্য একটা জামা চড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিরিশের আবির্ভাব। মাকে দেখতে এসেছেন। গোলাপ-মার কানে খবরটা পৌঁছতেই তাঁর সেই অম্লমধুর শ্লেষ, "বলিহারি যাই, ঘোষজার এই অপূর্ব ভক্তি দেখে। বলি, গিরিশবাবু, মাকে তো দেখতে এসেছ! মা তেতে পুড়ে এলেন—কোথায় একটু জিরোবেন, না এখানেও এলে কি না জ্বালাতন করতে!" কিন্তু গিরিশের শুধু ভক্তি তো নয়, সন্তানের অধিকার—সেই সন্তানের মন নিয়েই মায়ের মনের বিচার। তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে মহারাজদের সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে জবাব দিলেন, "ঝাঁঝা মেয়ে বলে কি না মাকে জ্বালাতন করতে এসেছি! কোথায় এতদিন পরে এসে ছেলের মুখ দেখে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, আর ইনি মাতৃস্নেহ শেখাচ্ছেন।" যাঁরা এতক্ষণ ভয়ে এগোতে পারছিলেন না, তাঁদের সকলকে নিয়ে গিরিশ প্রণাম ক'রে মাতৃ-আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারদাদেবীর কাছে গোলাপ-মার সজল অভিযোগ, "শেষে কি না গিরিশবাবু আমাকে এ-রকম বললে!" মা কিন্তু প্রশ্রয় দিলেন অবাধ্য ছেলেকেই, "তোমাকে না অনেকবার বলেছি, আমার ছেলেদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে যেও না?"[২৪]

মায়ের ওপর গিরিশেরই দাবী যেন সবচেয়ে বেশী সেবার নানাতীর্থ পর্যটন ক'রে দীর্ঘদিন পরে কলকাতায় ফিরে এসেছেন শ্রীমা (১৩১৭)। বেলুড় মঠে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন। তাঁর গাড়ি এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে নটি বোমা ছুঁড়ে প্রথম আগমন-সঙ্কেত। শতাধিক ভক্তের দুটি-সারির সম্মিলিত কণ্ঠের স্তোত্র গানের মধ্যে দিয়ে সারদাদেবী পৌঁছলেন মঠে। দোতলার ঘরে তাঁর বিশ্রাম স্থান—নীচে কালীকীর্তনের আসর। অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন:

"ঠাকুরের বাল্যভোগ হইল। শ্রীশ্রীমা উহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া বাকী সমস্তই নীচে পাঠাইয়া দিলেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী সেই প্রসাদের থালা হাতে করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভক্তবর গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'ঠাকুরের প্রসাদ মার স্পর্শে

২৩। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (৩য় খণ্ড)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩য় মুদ্রণ), পৃঃ ২৭। ২৪। শ্রীমা সারদা দেবী, (১৯৭৭), পৃঃ ২৪২।

মহাপ্রসাদ হয়েছে ; আমি থাকতে এ মহাপ্রসাদ আর কাউকে বিতরণ করতে দেব না। তিনি কতিপয় ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থালাটি শরৎবাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন।' "[২৫]

শুধু সন্তানের অধিকার-বোধেই নয়—ভক্তি-বিশ্বাসেও গিরিশ সকলকে যেন অতিক্রম ক'রে যেতে চায়। সূত্রপাত সেই জয়রামবাটী থেকেই। গিরিশের এই ভক্তি-বিশ্বাস দেখে একদিন কালীমামাই কথাটা তুললেন, "তোমরা দিদিকে 'মা জগদম্বা', 'জগজ্জননী' ইত্যাদি কতই বলো। কই, আমরা এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি—আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।" অবিচলিত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন গিরিশ, "কি ব'লছ ? তুমি এক পাড়াগেঁয়ে সাধারণ ব্রাহ্মণের ছেলে ; যজন-যাজন, পঠন-পাঠন ব্রাহ্মণের কাজ ছেড়ে চাষ-বাস নিয়ে জীবন কাটাচ্ছ। তোমাকে যদি একটা চাসের বলদ দেবে বলে তো তুমি তার পেছনে পেছনে অন্ততঃ ছ-মাস ঘুরতে থাক। আর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া তোমাকে দিদিরূপে সমস্ত জীবন ভুলিয়ে রাখতে পারেন না ? যাও, যদি ইহ ও পরজন্মে মুক্তি চাও তো এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও। আমি বলছি, যাও !"[২৬]

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সারদাদেবী যখন সরকারবাড়ি লেনের গুদামবাড়িতে এলেন, তখন সেখানে প্রায় দিনই গিরিশচন্দ্র গেছেন প্রণাম করতে। সেখান থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছেন শ্রীমা। গিরিশ এসে স্বামী যোগানন্দকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন মাতৃসমীপে। তাঁকে অনুসরণ করলেন অন্য ভক্তরাও—গিরিশই যেন ছাড়পত্র। গিরিশচন্দ্র ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন সারদাদেবীকে—সকলের দিকে তাকিয়ে ধীর গম্ভীরস্বরে বললেন, "ভগবান্ ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হ'য়ে জন্মান—এটা মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন ? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও আর সব রকম কাজকর্ম করছেন ? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য ও মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য অবির্ভূত হয়েছেন।"[২৭]

সেই শ্রীমাকেই জগদম্বারূপে পূজা করলেন গিরিশচন্দ্র। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র দুর্গাপূজা করবেন বাড়িতে। নামে মাত্র দুর্গাপূজা—গিরিশের আসল লক্ষ্য 'জ্যান্ত দুর্গা'-পূজা। মা তখন জয়রামবাটীতে—বেশ কিছুকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগে শরীর জীর্ণ। কিন্তু গিরিশের আবদার—সে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, মা না এলে পূজা অর্থহীন। গিরিশের দিদি দক্ষিণাকালীর গভীর সঙ্কট, মা না এলে কী হবে! অগত্যা সারদাদেবী সেই অসুস্থ শরীরেই কলকাতায় এলেন—দক্ষিণাকালী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, মার অনুপস্থিতিতে পূজা বন্ধ হ'য়ে যেত—ভাইয়ের জিদ সে তো ভালই জানে। শ্রীমা এসে উঠলেন বলরাম বসুর বাড়ি—সেখান থেকেই দৈনিক গিরিশের বাড়ির পূজায় উপস্থিত হন। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী নির্বিঘ্নে কেটে গেল—প্রতিদিনই যথাসময়ে উপস্থিত হ'য়ে পূজা গ্রহণ করলেন শ্রীমা। গিরিশ পাড়া প্রতিবেশী, মঠের সন্ন্যাসীদের যেমন নিমন্ত্রণ করেছেন, তেমনি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাদর আহ্বান জানিয়েছেন, সবাই আসুক, মায়ের চরণ স্পর্শে পুণ্য সঞ্চয় করুক। তিনদিন সকলেই মাতৃপদে অঞ্জলি দিলেন, কিন্তু গোল বাধল

২৫। শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ২২৯।
২৬। শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৩৮।　　২৭। তদেব, পৃঃ ২৪০।

সন্ধিপূজার সময়। গিরিশ বিশেষ ক'রে সন্ধিপূজাতে উপস্থিত হবার জন্যে অনুরোধ করেছেন, শ্রীমাও স্বীকৃতি জানিয়েছেন, কিন্তু "সন্ধ্যার সময় স্বামী সারদানন্দ খবর পাঠাইলেন, মার শরীর অসুস্থ, তিনি সন্ধিপূজার সময় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। গিরিশ উদ্বিগ্ন হইলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 'মা আসিবেন না? তবে কি আমার পূজা সমাপন হবে না?'

"গিরিশ বিষণ্নভাবে মাতৃনাম ধ্যান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ পশ্চাৎ দিকের দরজায় আঘাত শুনা গেল। শব্দ হইল 'দক্ষিণা, দক্ষিণা, আমি এসেছি।'

"দক্ষিণাকালী গিরিশচন্দ্রের ন'দিদি। দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। খবর আসিল 'মা আসিয়াছেন'।

"গিরিশ অমনি উঠিয়া মায়ের পায়ের উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতে লাগিলেন, 'মা, সত্যিই এসেছ মা, আমার পূজা সার্থক হ'ল।' "[২৮]

"শ্রীমা প্রতিমার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। নবমীপূজাও এইভাবেই কাটিয়া গেল—তিনদিনই শ্রীমা সকলের অর্ঘ্য লইলেন; গিরিশের আত্মীয়-স্বজন, এমন কি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচিত-অপরিচিত, কেহই বঞ্চিত হইল না।"[২৯]

এই ভক্তির টানেই সেবার সারদাদেবী সকলের স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন গ্রহণ করেছেন—যা তাঁর আচরণ-বিরুদ্ধ। "মা অষ্টমীর দিন ভাবাবেশে মিষ্টান্নাদি খেলেন, পরদিন অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে কিছু খাওয়ানো গেল না। আগের দিন খেয়েছেন, আজ কেন খাবেন না জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, সেদিন আমি 'আমি' ছিলুম না।"[৩০]

১৩১৮ সাল। ৩০শে আসাঢ়, শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের শেষ অভিনয় রজনী। সেই সময়ই তাঁর শেষ মাতৃবন্দনা।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন রোগশয্যায়—তিরোভাবের আর সামান্য কিছুদিন বাকী। দেহত্যাগের পূর্বে রামকৃষ্ণানন্দের একটি প্রার্থনা—মায়ের দর্শন, কিন্তু শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। ভক্তের প্রার্থনা তবু অপূর্ণ থাকেনি—সশরীরে উপস্থিত না হয়েও শ্রীমা তাঁকে দর্শন দিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ তখন আনন্দে আত্মহারা—পৃথিবীর বন্ধনদশা ঘুচল—দুঃখের রাত শেষ হ'ল। সেবাদাস লিখেছেন:

"নিশিপ্রভাতে স্বামীজী কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলে জনৈক ভক্তকে (সুগায়ক পুলিনকৃষ্ণ মিত্র) একটি গীত রচনা করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে গীতের প্রথম চরণটি বলিয়া দিলেন: 'পোহাল দুখ রজনী।' তিনি স্বয়ং গীতরচনা না করিয়া ভক্তবীর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দ্বারা গীতটি পূর্ণ করিয়া আনিলেন, যথা—

পোহাল দুখ রজনী।
গেছে 'আমি আমি' ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী।
বরাভয়-করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান, গাও জয় জয়,

২৮। ভক্তভৈরব, পৃঃ ১০৪-০৫; হেমেন্দ্রনাথ এই ঘটনা ১৩১৮ সালের ব'লে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মায়ের একটি পত্রে স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থ এবং অন্যান্য আকর গ্রন্থেও ১৩১৪ সালের উল্লেখ আছে।

২৯। শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৪৪-৪৫।

৩০। শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ১১০।

বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী॥
কহিছে জননী 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণ পদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা।'
হের মম পাশে করুণায় দুটি আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ গুণমণি॥"[৩১]

গানে স্বরারোপ করলেন পুলিনকৃষ্ণ মিত্র। রামকৃষ্ণানন্দকে শোনালেন গানখানি—ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৪ ভাদ্র ১৩১৮।[৩২]

৫

পাদপ্রদীপের আলো স্তিমিত হ'য়ে আসছে—ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার।

"মার কাছে সংবাদ পাঠাব কি?" শুশ্রূষারত দেবেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন।

স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন নাট্যকার—ভাবলেশহীন দৃষ্টি, আচ্ছন্নকণ্ঠে বললেন, "দেখ সব ভাল বুঝতে পাচ্ছিনি, কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।"

আচ্ছন্নভাব ক্রমেই বেড়ে চ'লল—মাঝে মাঝে অস্পষ্টকণ্ঠ সরব হ'য়ে ওঠে 'চলো', 'নেশা কাটিয়ে দাও' 'রামকৃষ্ণ'।

সেই অন্ধকারের অস্পষ্টতার মধ্যেই নেমে এল যবনিকা—তখন রাত ১টা ২০ মিনিট, ২৫ মাঘ ১৩১৮।[৩৩]

পরদিন সকালে মায়ের কাছে পৌঁছল গিরিশের মৃত্যুসংবাদ। অরূপানন্দ বললেন, "গিরিশবাবুও সন্ধ্যা ছটার একটু পরে যে 'জয় রামকৃষ্ণ, চল' ব'লে শুলেন, তারপর আর তেমন চৈতন্য হয় নাই।"

"যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হ'ল, যেন ঐ চিন্তাটিতে ডুবে রইল। সব তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁর কাছে চলে যাবে।" সেই পরম-প্রাপ্তিতেও বিষাদে আচ্ছন্ন মায়ের অন্তর।[৩৪]

চতুর্থীর দিন গিরিশের বাড়ি থেকে লোক এল মাকে নিয়ে যাবার জন্যে। গিরিশহীন গিরিশ-ভবনে যেতে পারেননি সারদাদেবী। কেমন ক'রে যাবেন সেই অশান্ত, চঞ্চল, মাতৃনির্ভর সন্তানের শ্রাদ্ধবাসরে! "সে নেই—আর কি সেখানে যেতে ইচ্ছে করে? আহা, একটা ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেল! কি ভক্তি-বিশ্বাসই ছিল! গিরিশ ঘোষের সে-কথা শুনেছ?" মাতৃকণ্ঠে একে একে অতীতের স্মৃতিচারণ।[৩৫]

মায়ের কাছে গিরিশ এখন স্মৃতি—ভক্তি-বিশ্বাসের মহৎ আদর্শের স্মৃতি!

বিষ্ণুপুরে গড়দরজায় সুরেশ্বর সেনের বাড়ি এসেছেন শ্রীমা। সুরেশ্বর সম্প্রতি চলে গেছে রামকৃষ্ণ-লোকে।

বাড়িতে ঢুকেই শ্রীমা বললেন, "আমি এখানে এলে সুরেশ আমার সর্বদা জোড়হাত ক'রে ঐখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকত। কখন বারাণ্ডাটিতে পর্যন্ত উঠতে চাইত নি। কি ভক্তিই ছিল তার! সুরেশ যেন দ্বিতীয় গিরিশবাবু।"

সুরেশ্বর দ্বিতীয়—মায়ের দৃষ্টিতে গিরিশই প্রথম, অনতিক্রমনীয়। তাঁর কাছে গিরিশচন্দ্র ভক্তি-বিশ্বাসের প্রতীক।

৩১। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—সেবাদাস, তত্ত্বমঞ্জরী, ভাদ্র ১৩১৮।
৩২। সংগীত সংগ্রহ, পৃঃ ৩২৬।
৩৩। গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৪০৮-০৯।
৩৪। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৭৭।
৩৫। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫।
৩৬। মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৯০।

দৈবজ্ঞ

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী তিনি—চারিদিকে কত নামডাক,
অতি সূক্ষ্ম গণনায় কেউ কোথা পায় নাই ফাঁক!
গ্রহ-অবস্থান সঙ্গে রাশিচক্র কোষ্ঠীর বিচার—
কোথা কোন লগ্ন ঘিরে নক্ষত্রের ঝাঁকি অভিসার,
—তাঁর মতো গণনা বিচার? নেই—নেই কেহ আর!
তাই লোকে বসে রয় ঘণ্টা ঘণ্টা দুয়ারে তাঁহার।

* * *

হাত গোনাইতে চাও? কররেখা—কপাল তোমার?
কি লিখন আছে ভালে—গুপ্তমন্ত্রে করি পক্কোদ্ধার
শুনাইছে সে জ্যোতিষী। শুনে সেই ভাগ্যের জরিপ—
কেউ দেয় তাড়া নোট—সেই সাথে করে ঢিপ ঢিপ
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। কারে কহে 'ধন', কারে বলে 'জয়'—
কারে দেয় কামধেনু মনোরমা ভার্যাটি সদয়—
কারো ভাগ্যে প্রমোশন, কারো জোটে ব্যবসার ঘাঁটি—
নক্ষত্রের চুলোচুলি মিটিয়াছে অতি পরিপাটি।
সকলেই দেয় জয়ধ্বনি! দৈবজ্ঞের মিষ্টি হাসি
ছড়াইছে প্রসন্ন প্রসাদ। মৃদুহাসে কে উদাসী
বাড়াইল হাত তার—কহিল সে—বলো, হে মহান্
এ জীবনে ভাগ্যগুণে দেখা কিগো পাব ভগবান্?
দৈবজ্ঞের হাসিটি উধাও! চমকিল আর সবে!
এমন উদ্ভট প্রশ্নে পণ্ড করে মত্ত মহোৎসবে!
জ্যোতিষীর ক্ষিপ্ত কণ্ঠ শোনা যায়—মূঢ় এ পাগল
কোথা হোতে এসে দেখো—করে দিল সব গণ্ডগোল!
উৎকট, উদ্ভট প্রশ্ন, কোনকালে কুত্র শুনি নাই—
ধন, মান, নারী ফেলি, এ পাগল ভগবান্ চায়!

অদ্বৈতবেদান্তমতে সৎপদার্থের স্বরূপ

অধ্যাপক ভট্টাচার্য

যাহা বিদ্যমান, তাহাই সৎ—এই লৌকিক অনুভবকে ভিত্তি করিয়াই দার্শনিক সম্প্রদায় সৎপদার্থের আলোচনা করিয়াছেন। যাহা অস্তিত্বশীল, তাহা কালভেদে অস্তিত্ববিহীন হইলেও সময়ান্তরে তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়—এইপ্রকার মতবাদ কোন কোন দর্শনে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অপর দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করেন—যাহা স্বরূপতঃ অস্তিত্বশীল অর্থাৎ অস্তিত্বই যাহার স্বভাব, তাহা কখনও অনস্তিত্বস্বরূপ হইতে পারে না। বস্তুর স্বভাব বস্তুর স্বরূপের অনতিরিক্ত। সুতরাং বস্তুটি থাকিবে, অথচ তাহার স্বভাব থাকিবে না—ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে যে-সমস্ত দার্শনিক অস্তিত্ব বা সৎপদার্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে অস্তিত্ব বা সত্তা চিরন্তন। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান—ইহার কোন কালেই অস্তিত্ব বা সৎপদার্থের স্বরূপ বিলুপ্ত হয় না। যাহা বিলুপ্ত হয় বা নষ্ট হয়, তাহা কখনও সৎ বা অস্তি হইতেই পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন—অস্তিত্ব বা সৎপদার্থ চিরন্তন বা নিত্য হইলেও তাহার অবস্থান্তর ঘটিতে পারে। যেমন—একই সুবর্ণের হার, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থান্তর ঘটিলেও তাহার মৌলস্বরূপ অর্থাৎ সুবর্ণস্বরূপ বিনষ্ট হয় না। জাগতিক প্রত্যেকটি পদার্থের মৌলস্বরূপ তাত্ত্বিক বিচারে ভিন্নস্বভাব না হইলেও বিভিন্ন অবস্থান্তর বাস্তব বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। যেমন সাংখ্যদর্শনের মতে যাবতীয় জড়পদার্থের মৌলস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক হইলেও এই গুণত্রয় স্বরূপতঃ অবিনষ্ট থাকিয়াই বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। অথচ এই রূপান্তরের ফলে মৌলস্বরূপ গুণত্রয় নষ্ট হয় না। এইরূপ মূলস্বরূপের বিনাশ না হইলেও সেই স্বরূপকে ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন অবস্থান্তর ঘটিতে পারে। এই অবস্থান্তর-প্রাপ্তির নাম 'পরিণাম'। ('অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ'—ব্যাসভাষ্য, পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ১৩ নং সূত্র)। সুতরাং সাংখ্যদর্শনের মতে যাহা কালত্রয়ে অস্তিত্বশীল, তাহার অস্তিত্বের বিলুপ্তি না ঘটিলেও অবস্থান্তর ঘটিতে পারে। ইহা ভিন্ন সাংখ্যদর্শনে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ সৎপদার্থরূপেই স্বীকৃত। কিন্তু এই সৎপদার্থের কোন অবস্থাতেই রূপান্তর ঘটে না। এইজন্যই ইহাকে 'অপরিণামী' বলা হয়। সুতরাং সাংখ্যদর্শনের মতে যাহা কালত্রয়ে সৎ বা অস্তিত্বশীল, তাহার দুইটি ভাগ রহিয়াছে। একটি সৎপদার্থ পরিণামশীল, সাংখ্যমতে ইহাকেই 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি' বলা হয়। ইহাই জড়জগতের মূল উপাদান। আরও একটি সৎপদার্থ 'পুরুষ' নামে অভিহিত। তাহার কখনও কোনও অবস্থান্তর হয় না। অতএব ইহা অপরিণামী সৎপদার্থ। সাংখ্যদর্শনের এই পটভূমিকায় অদ্বৈত-বেদান্তসম্মত সৎপদার্থের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যাহা কালত্রয়ে অবাধিত তাহাই সৎ, সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবেদান্তমতেও স্বীকৃত। যাহা সৎ, তাহা অস্তিত্বস্বরূপ, তাহার কখনও বিলুপ্তি সম্ভব নহে। অদ্বৈতবেদান্তে শ্রুতির সাহায্যেই এই তথ্য নির্ধারিত হইয়াছে। দৃশ্যমান জগতের মৌলিক স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬।২।১) বলা হইয়াছে—'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।' নামরূপাত্মক এই বিচিত্র জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল—ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সুতরাং এই জগৎ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সৎ বা চিরন্তন নহে। ইহা বুঝাইবার জন্য এখানে বলা হইয়াছে যে—নামরূপাত্মক দৃশ্যমান এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বেও সৎ ছিল। জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বেও যাহা ছিল, তাহার উৎপত্তি নাই। আর যেই ভাব-পদার্থের

উৎপত্তি নাই, তাহার বিনাশও নাই—ইহাও যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে সৎ ছিল—এই উক্তির দ্বারাই জগতের বিনাশের পরেও সৎ থাকে—ইহা সহজেই বুঝা যায়। এই অংশে সাংখ্যসিদ্ধান্তের সহিত অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তগত পার্থক্য নাই। কিন্তু অন্য যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সৎপদার্থের একত্ব এবং দ্বিত্ব সম্বন্ধে। সাংখ্যমতে সৎপদার্থ দুইপ্রকার। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতির মধ্যে সৎপদার্থরূপে অভিহিত বস্তুটিকে এক এবং অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে। ইহাতেই পরিষ্কার বুঝা যায়—যাহা সৎপদার্থ, তাহা যেমন কালত্রয়ে অবিনাশীরূপে থাকে, তেমনই অপরিণামীরূপেই থাকে। সুতরাং 'সৎ' পরিণামী এবং অপরিণামী—এই দ্বিবিধ হইতে পারে না। পরিণামী পদার্থকে সৎ বলিলে অপরিণামী পদার্থ সৎ হইবে না। পক্ষান্তরে অপরিণামী পদার্থকেই 'সৎ' বলিলে পরিণামী পদার্থ 'সৎ' হইতে পারে না। এই তত্ত্ব নির্ধারণ করিবার জন্যই উল্লিখিত শ্রুতিতে সৎপদার্থকে এক এবং অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তের এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে পরিণামী পদার্থকে 'সৎ' বলা যায় না কেন—তাহা নির্ধারণ করা আবশ্যক। সৎপদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, 'সৎ ইতি অস্তিতামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্বিশেষং সর্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানং, যৎ অবগম্যতে সর্ববেদান্তেভ্যঃ' (শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।২।১)। অর্থাৎ সৎশব্দের অর্থ অস্তিতামাত্র—বিদ্যমানতা বা সত্তামাত্র। এই সৎপদার্থ নির্বিশেষ অর্থাৎ কোনরূপ অবস্থা বা বিশেষণরহিত, সর্বগত এক এবং নির্দোষ, নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু। সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে ইহাই অবগত হওয়া যায়। আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যাহা 'সৎ' বা অস্তিত্বস্বরূপ—তাহা নির্বিশেষ—কোনও ধর্ম অবস্থা বা বিশেষণ তাহার নাই। এইজন্যই তাহাকে এক এবং অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে। বস্তুর ভেদটি ধর্ম বা অবস্থাদ্বারাই সম্পন্ন হয়। যেমন প্রাণী হিসাবে সমস্ত প্রাণী এক হইলেও তাহা বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা ব্যাবর্তক ধর্মের দ্বারাই প্রাণীর বৈচিত্র্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং যেই পদার্থের কোনও ধর্ম অবস্থা বা বিশেষণ থাকে না, তাহাকে এক বলিতেই হইবে। অর্থাৎ সেই পদার্থের অখণ্ডত্বের ব্যাবর্তক অর্থাৎ ভেদ-নির্ধারক কোন ধর্মই নাই।

কিন্তু আচার্য শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা—বিচারের সাহায্যে তাহা নির্ধারিত না হইলে সুধীজনগ্রাহ্য হইতে পারে না।

এখানে বুঝিতে হইবে যে, যাহা সৎ তাহার কোনও অবস্থান্তর বা পরিণাম সম্ভব কিনা। বিচারের দ্বারা যদি বুঝা যায় যে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও 'সৎ'পদার্থ স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিতে পারে, তাহা হইলে সাংখ্যসম্মত পরিণামবাদ অস্বীকার করা যাইবে না। পক্ষান্তরে সৎপদার্থের কোনও অবস্থান্তর ঘটিতে পারে না—ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইলে সৎপদার্থকে অপরিণামী, কূটস্থ, নির্বিশেষ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যাইবে। সুতরাং সৎপদার্থের অবস্থান্তর সম্ভব কিনা—সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

একটি বস্তু নিজে স্বস্বরূপে বিদ্যমান থাকিবে অথচ তাহার পূর্বাবস্থার নিবৃত্তি হইয়া অন্য-অবস্থার আবির্ভাব ঘটিবে, ইহারই নাম 'পরিণাম'। যেমন সুবর্ণের পিণ্ডাকারতার নিবৃত্তি হইয়া কুণ্ডলাকার অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। এখানে সুবর্ণপিণ্ড এবং কুণ্ডল—এই দুইটি অবস্থার মধ্যেই সুবর্ণ নিজের সত্তায় অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই সুবর্ণস্বরূপের ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং সৎপদার্থের যদি পরিণাম স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সৎপদার্থের বিভিন্ন অবস্থা পারমার্থিক

বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন এই যে, সৎপদার্থের যেই ধর্ম স্বীকার করা হইবে, স্বীকৃত সেই ধর্মটি সৎপদার্থের স্বাভাবিক কিনা। বস্তুটি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই যেই ধর্ম বস্তুতে থাকে, সেই ধর্মকেই বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম বলে। যেমন অগ্নির উষ্ণত্ব। অগ্নি থাকিবে, কিন্তু উষ্ণত্ব থাকিবে না—ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অগ্নির বিনাশ না হইলে উষ্ণত্বেরও বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং সৎপদার্থের যেই ধর্ম স্বাভাবিক হইবে, সেই ধর্মের নিবৃত্তি হইলে সৎপদার্থও থাকিবে না। অতএব সৎপদার্থের ধর্ম যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে ঐ সৎপদার্থের স্বাভাবিক ধর্মের নিবৃত্তি হইতেই পারে না। অর্থাৎ পরিণাম সিদ্ধ হয় না। আর যদি সৎপদার্থের আগন্তুক ধর্ম স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই ধর্মটি সৎপদার্থে কিভাবে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। যাহা অন্য কোন কারণের ফলে পদার্থে সংক্রমিত হয়, তাহাকেই 'আগন্তুক ধর্ম' বলে। কিন্তু পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, এই সৎপদার্থ এক এবং অদ্বিতীয়। ইহাই শ্রুতির নির্দেশ। সুতরাং সৎপদার্থ হইতে ভিন্ন কোন কারণ সৎ হইতে পারে না। অতএব যাহা সৎ নহে, এমন কোন কারণের ফলেই আগন্তুক ধর্মের সম্ভব হইতে পারে। কারণটি যদি সৎ না হয়, তাহা হইলে সেই কারণ হইতে উদ্‌ভূত ধর্মও 'সৎ' হইতে পারে না। সৎ না হইলে কারণটিকে অসৎও বলা যায় না, যেহেতু অসৎ শব্দের অর্থ একেবারেই অলীক বা তুচ্ছ পদার্থ। যেমন আকাশ-কুসুম। এইরূপ অলীক বা অসৎ কখনও কোন কার্যের জনক হইতে পারে না। সুতরাং যাহা সৎ নহে, এমন কোন কারণ যদি কার্যের জনক হয়, তাহা হইলে ঐ কারণকে আকাশ-কুসুমের মতো আকাশ বা অলীকও বলা যাইবে না। অতএব দেখা যায় যে, এক অখণ্ড সৎপদার্থে কোন আগন্তুক ধর্ম স্বীকার করিতে হইলে সেই আগন্তুক ধর্মের কারণকে যেমন সৎ বলা যাইবে না, তেমনই অসৎও বলা যাইবে না। অতএব ঐরূপ কারণ স্বীকার করিতে হইলে তাহা অর্থাৎ সেই কারণটি সৎও হইবে না, আবার একেবারে অসৎও হইবে না। তাহাকে সৎ এবং অসৎ-এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞার বহির্ভূত একটি কল্পিত কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ কারণ অদ্বৈতবেদান্ত-মতেও স্বীকৃত হইয়াছে। ইহারই নাম অদ্বৈতমত-প্রসিদ্ধ 'অবিদ্যা' বা 'মায়া'। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে, কিন্তু অনির্বাচ্য। এই অনির্বাচ্য অবিদ্যার প্রভাবে একটি বস্তুতে অপর ধর্মের প্রতীতি হইতে পারে। কিন্তু প্রতীয়মান সেই ধর্মটি বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম হইবে না। প্রকৃত-পক্ষে এইরূপ অবিদ্যা-সমুদ্‌ভূত ধর্মকে যথার্থ-ধর্ম বলাই চলে না। উহা অযথার্থ বা কল্পিত মাত্র। ইহাই মিথ্যাজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ। শুক্তি-রজত বা রজ্জু-সর্প ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত।

পূর্বে যে-সমস্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সেই ধর্ম স্বাভাবিক নহে, কিন্তু আগন্তুক। সুবর্ণের পিণ্ডাকারতা এবং কুণ্ডলাকারতা এই দুইটি অবস্থা বা ধর্ম—সুবর্ণের স্বাভাবিক ধর্ম নহে, কিন্তু ইহা আগন্তুক ধর্ম। উহা যদি সুবর্ণের স্বাভাবিক ধর্ম হইত, তাহা হইলে যেখানেই সুবর্ণ থাকিবে, সেখানেই ঐ ধর্মও থাকিত। স্বাভাবিক ধর্ম বস্তু-সত্তার সমনিয়ত—অর্থাৎ বস্তুটি যতক্ষণ থাকে, তাহার স্বাভাবিক ধর্মও ততক্ষণ থাকিবেই। কিন্তু সুবর্ণ থাকিলেই তাহার পিণ্ডাকারতা বা কুণ্ডলাকারতা থাকে—ইহা বলাই যায় না। যাঁহারা পরিণাম স্বীকার করেন—তাঁহারাও পরিণত-ধর্মকে স্বাভাবিক বলিতে পারেন না একটি ধর্মের নিবৃত্তি এবং অন্যধর্মের আবির্ভাবকেই পরিণাম বলা হইয়াছে। অতএব পরিণাম স্বীকার করিয়াই

পরিণাম-সঞ্জাত ধর্মকে স্বাভাবিক বলা হয় নাই। আগন্তুক ধর্ম যথার্থ নহে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা বস্তু-সমন্বিত ধর্ম—একমাত্র তাহাই যথার্থ-ধর্ম হইতে পারে। অতএব পরিণামের দ্বারা বস্তুস্বরূপের যথার্থ-ধর্ম কল্পনা করা যায় না।

অদ্বৈতবেদান্তের এই সিদ্ধান্ত শ্রুতির সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—'যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ—বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্' (ছান্দোগ্যো-পনিষদ্, ৬।১।৪)। ইহার অর্থ এই যে, হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃত্তিকার কার্যসমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, যেহেতু সমস্ত বিকার বা কার্যবস্তু বাগালম্বনমাত্র, মৃত্তিকা—ইহাই একমাত্র সত্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, মৃত্তিকা-নির্মিত ঘট, শরাব প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যবস্তুর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকানির্মিত সেইসমস্ত কার্যবস্তুর মৌলিক সত্তা একমাত্র মৃত্তিকা। অর্থাৎ সেখানে মৃত্তিকার অতিরিক্ত অন্য কোন মৌলিক বস্তু নাই—যাহা কার্য বা ঘট প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, তাহা বাগালম্বন অর্থাৎ প্রয়োজনানুসারে মৃত্তিকা-নামক মূলবস্তুর কার্যনির্বাহক একটি আকৃতি এবং তাহার ব্যাবহারিক নাম—ইহাই রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে মৌলিক বস্তু একমাত্র মৃত্তিকা। এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যাহা সমগ্র বস্তুর মূল উপাদান, তাহা কখনও এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। যাহাকে আমরা কার্য বলিয়া মনে করি, তাহার অবস্থাগত ভেদ এবং ঐ ভেদবোধক বিভিন্ন নাম ব্যাবহারিক প্রয়োজনে প্রচলিত থাকিলেও তাত্ত্বিক বিচারে সমস্ত কার্যের যাহা মূল উপাদান, সেই বস্তুর অতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তা কার্যরূপে সিদ্ধ হয় না। ইহাতেই বুঝা যায়, যাহাকে 'কার্য' বলা হয়, তাহা মূলবস্তু নহে। মূলবস্তু একমাত্র উপাদান-কারণ। সেই উপাদান-কারণের সাংগঠনিক একটি আকৃতি এবং তাহার ব্যাবহারিক নাম—ইহাই 'কার্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব কার্য এবং কারণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে ইহাই পাওয়া যায় যে, যাহা মূল-কারণ, একমাত্র তাহাই তাত্ত্বিক বস্তু। ঐ কারণের যাহা কার্য, তাহা অস্থায়ী একটি আকৃতি এবং নাম মাত্র। সুতরাং কারণসত্তার অতিরিক্ত কার্যের সত্তা নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

সমগ্র বিশ্বের মূল উপাদান কি—তাহা বুঝিতে পারিলে সদ্‌বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাইবে। সদ্‌বস্তুর যথার্থস্বরূপ নিরবয়ব এবং নির্বিশেষ বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং অনুমান প্রভৃতি প্রমাণগম্যও নহে। কার্যের সাহায্যেই সেই সদ্‌বস্তুর বিশ্লেষণ করিতে হয়। বিশ্লেষণের যাহা ফল, তাহা এক অখণ্ড সদ্‌বস্তুরূপেই সিদ্ধ। বিশ্লেষণের পদ্ধতি সংক্ষেপে এইরূপ—প্রত্যেকটি কার্যবস্তু একটি মূল-কারণকে অপেক্ষা করে। যেই কারণের অস্তিত্ব ব্যতীত কার্যটি থাকিতেই পারে না, এবং প্রত্যেকটি কার্যের সঙ্গে যেই কারণের অস্তিত্ব অনুস্যূত হইয়া থাকে, এইরূপ কারণকেই মূল উপাদান-কারণ বলে। যেমন মৃত্তিকানির্মিত ঘট প্রভৃতি কার্যবস্তু মৃত্তিকার অস্তিত্ব ভিন্ন থাকিতেই পারে না, এবং ঘট প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যের সাথে মৃত্তিকা অনুস্যূত বলিয়াই মৃত্তিকাই ঘটাদির উপাদান-কারণ। এইভাবে বিশ্বের যাবতীয় কার্যবস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অস্তিত্ব বা সৎই সমস্ত কার্যের মূল উপাদান-কারণ। অস্তিত্ববিহীন কোন কার্য হইতেই পারে না এবং প্রত্যেক কার্যের সঙ্গেই অস্তিত্ব অনুস্যূত হয়। সুতরাং অস্তিত্ব বা সৎই একমাত্র উপাদান-কারণ। উপাদান-কারণের অতিরিক্ত কার্যের পৃথক্ কোন সত্তা নাই—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং যাহা সৎ বা অস্তিত্ব, তাহার অতিরিক্ত কোন মৌলিক সত্তা কার্য-নামে পরিচিত এই বিশ্ব-জগতের নাই। অতএব সৎ একমাত্র অখণ্ড অদ্বিতীয় বস্তু—ইহাই সর্বব্যাপী নিত্য এবং ইহাই 'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম' নামে বেদান্তে প্রসিদ্ধ। এ-বিষয়ে শ্রুতি—'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা'।

স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম

অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন

বিশ্ববাসীর নিকট স্বামী বিবেকানন্দ নামটি অবিস্মরণীয় মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে এক তরুণ সন্ন্যাসীর চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত অপূর্ব প্রতিভাদীপ্ত ভাষণের মাধ্যমে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে স্বামীজীর ভাষণাবলী শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে, পণ্ডিত সমাজে এবং সংবাদপত্রের জগতে এক বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের অন্যতম চিকাগো ধর্মমহাসভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি অধ্যাপক মারউইন মেরী স্নেল স্বামীজীর বক্তৃতার অভূতপূর্ব প্রভাবের সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন: "হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই ধর্মমহাসভায় এবং আমেরিকার জনগণের উপর অনুরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।... হিন্দুধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং 'নিজস্ব' প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি কোন সন্দেহ না রেখেই ধর্মমহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।...প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি খ্রীষ্টান বা 'প্যাগান'—যে কোন প্রতিনিধি অপেক্ষা অধিকতর উদ্দীপনার সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯-২০)।

নিউইয়র্ক হেরাল্ডের ন্যায় প্রখ্যাত সংবাদপত্র স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছিল: "বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভার সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর কথা শোনার পরে আমরা অনুভব করেছি—তাঁর জ্ঞানী দেশের মানুষদের কাছে মিশনারি পাঠানো কী মূর্খতা!" (ঐ, পৃঃ ১২৩)।

নিউইয়র্ক ক্রিটিক পত্রিকা লিখিয়াছিল: "বিবেকানন্দের সংস্কৃতি, বাগ্মিতা, মোহকর ব্যক্তিত্ব হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের নূতন চেতনা দিয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ১২৩)।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়: "তাঁহার সে ভাষণ ছিল যেন লেলিহান অগ্নিশিখা। নিষ্প্রাণ তত্ত্বালোচনার ধূসর প্রান্তরে তাহা সমবেত মানুষের অগণিত আত্মায় আগুন ধরাইয়াছিল।" (বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—রোমাঁ রোলাঁ, ঋষি দাস অনূদিত, পৃঃ ৩২)।

কেবলমাত্র চিকাগো ধর্মমহাসভায় নয়, এই মহাসভা অনুষ্ঠিত হইবার পরে তিনি আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের অগণিত বক্তৃতা মঞ্চে উপনিষদ, বেদান্ত ও গীতার উপর অবিশ্রান্তভাবে উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ ও রামায়ণ, মহাভারতের উপরও তিনি বহুবার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতাবলীর জন্যই তিনি Orator by Divine Right বা ঈশ্বরদত্ত অধিকারপ্রাপ্ত বাগ্মীরূপে কীর্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম ছিল Cyclonic Hindu।

হিন্দুধর্মের ভাষ্যকারের ঐতিহাসিক ভূমিকায় স্বামীজী হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নব-ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, কবীর, নানক প্রভৃতি ভক্তিবাদের প্রচারক ধর্মাচার্যগণের ধর্মজগতে সৃষ্টিধর্মী আন্দোলনের শেষ তরঙ্গ ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রামদাস ও তাঁহার সমসাময়িক মারাঠি সন্তদের কাল পর্যন্ত আসিয়া স্তিমিত হইয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাণবন্ত ধর্মান্দোলনের ধারা বিশেষ লক্ষিত হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আধিপত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় একদিকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও অপর-দিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাজনিত

ধর্মবিমুখতা ভারতবর্ষের ধর্মজীবনকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল ॥ এইকালে হিন্দুধর্ম এই উভয় ধারার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। খ্রীষ্টান প্রচারক ও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ হিন্দুধর্মকে প্রধানতম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছিলেন।

আলেক্জাণ্ডার ডাফ্ (Alexander Duff) প্রমুখ খ্রীষ্টান প্রচারকগণের হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র আক্রমণ এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি প্রচণ্ড বৈরিতা সর্বজন পরিজ্ঞাত তথ্য। তাহার দৃষ্টান্ত উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

খ্রীষ্টান প্রচারকগণের সুরে সুর মিলাইয়া রামমোহনও হিন্দুধর্মের কুৎসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। প্রথমে সাকারপূজাকে নিম্নাধিকারীর পক্ষে গ্রহণীয় বলিলেও পরে ইহাকে তিনি ধর্মজগতের সর্বাপেক্ষা প্রধান পাপ বলিয়া উল্লেখ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুর সামাজিক আচারের অনেক অংশকে গ্রহণ করেন বলিয়া হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতির প্রতি খ্রীষ্টানী আক্রমণের বিরোধিতাও করেন। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে রামমোহনের নিকট হইতে সাকারোপাসনার প্রতি যে ঘৃণা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পর্যন্ত প্রবল স্রোতেই প্রবাহিত হইয়াছিল। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ব্রাহ্ম নেতাই সাকারোপাসনার প্রতি খড়্গহস্ত। কেবল কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া সাকার পূজা সম্বন্ধে বিদ্বেষ-ভাবকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, আর বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলে শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজই ত্যাগ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রথমে সাকারপূজা ও অদ্বৈতবাদের বিরোধী ছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে যখন বিবেকানন্দে পরিণত করিলেন (যদিও বিবেকানন্দ নামটি তিনি ঠাকুরের তিরোধানের পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন), তখন হিন্দুধর্মের সমগ্র রূপের মধ্যে যে অতুলনীয় মহিমা প্রকাশিত আধুনিক যুগে তাহার শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা-রূপে বিবেকানন্দ ইতিহাসে অমরতার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্মকেই হিন্দু-ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ উপাসনা এই দাবীতে ব্রাহ্মধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাজনারায়ণের এই প্রচেষ্টার ত্রুটি অভ্রান্তভাবে প্রদর্শন করিয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন: "তিনি যে ধর্মের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহার মূল হিন্দু শাস্ত্রে আছে, ইহা যথার্থ। কিন্তু উহা হিন্দুধর্মের একাংশমাত্র—অতি অল্পাংশ।…যেমন অঙ্গুরীয়মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দুধর্ম বলা যায় না।" (বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭৪)।

হিন্দুধর্ম সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে কোন বিরোধ অনুভব করে নাই। সংস্কারমূলক ব্রাহ্মধর্ম কখনও এই বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। তাই হিন্দুধর্মের কথা বলিবার কোন অধিকার ব্রাহ্মধর্ম কোন দিন লাভ করিতে পারে নাই। তাই বহির্বিশ্বে হিন্দুধর্মের সর্বপ্রথম এবং একই সঙ্গে সর্বপ্রধান প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ।

বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দুধর্মের মহিমা আবিষ্কারের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ স্বামীজীর পূর্বে হিন্দুধর্মের বহুমুখী অভিব্যক্তিকে বঙ্কিমই লক্ষ্য করিতে বহু পরিমাণে সফল হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের সামগ্রিক রূপটি তিনিও সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই।

এইজন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন : "আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্মপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।" (ধর্মতত্ত্ব—বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯)।

গৃহী না হইলে কেহ আদর্শ পুরুষ হইতে পারে না, বঙ্কিমের এই উক্তি প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের উত্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীর প্রতি অবিচারের অভিযোগের সুরেই যেন উচ্চারিত বলিয়া মনে হয়। প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম ও ইহলোকসর্বস্ব পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে বঙ্কিম-চন্দ্রকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে বোধহয় ভুল হইবে না। যাজ্ঞবল্ক্য হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষগণকে ভারতবর্ষ চিরকাল আদর্শ পুরুষ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে।

বঙ্কিম অপেক্ষা বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্মের পূর্ণ মহিমাকে অধিকতররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অন্যতম কারণ এই যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে হিন্দুধর্মের জীবন্ত ও পূর্ণ রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রচনা 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন : "...সর্বথা-প্রতিযোগী, আচার-সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" (ভাববার কথা, ৯ম সং, পৃঃ ৪-৫)। শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ বিবেকানন্দই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বদেশীর ভ্রান্তি ও বিদেশীর ঘৃণা দূর করিতে সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্মের যে বিচার-বিশ্লেষণ স্বামীজী করিয়াছিলেন, তাহা যেমন হিন্দুধর্মের চিরন্তন মহিমাকে উজ্জ্বলতমভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তেমনি তাহা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নূতন আলোকপাতও করিয়াছে। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদের ন্যায় কোন একজন প্রবর্তক হিন্দুধর্মের প্রবর্তন করেন নাই।

হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে যে সকল ধর্মই সত্যলাভের পথ—এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন : "...হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য-স্বরূপ—দেবত্ব বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা।" (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬)।

হিন্দুধর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের পক্ষে ঈশ্বর-উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে অনুমোদন করে—এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়া তিনি বলেন : "বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ—বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা এক মাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ঐ এক মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে না লাগে, তবে তাহাকে জামা না পরিয়া খালি গায়েই

থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন: আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব; এবং প্রতিমা, ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ।" (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫)।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার অলীক অভিযোগ খণ্ডন করিয়া স্বামীজী সাকারোপাসনার মূলতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন: "ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে যাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন সব মানুষ আছেন, যাঁহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়: পাপ হইতে কি কখনও পবিত্রতা জন্মিতে পারে? ···হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তা-কালে মনোময় রূপ-বিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। ভাবানুষঙ্গ-নিয়মানুসারে জড়মূর্তি দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাববিশেষের উদ্দীপন হইলে তদনুরূপ মূর্তিবিশেষও মনে উদিত হয়।" (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৪)। হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক বলিয়া খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত ব্যক্তিগণ যে কুৎসা রটনা করিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত উত্তর স্বামী বিবেকানন্দই দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন: "আজকাল একটি কথা চালু হইয়া গিয়াছে, এবং সকলেই বিনা আপত্তিতে এটি স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা অন্যায়। আমিও এক সময়ে ঐরূপ ভাবিতাম, এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন একজনের পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতে সব পাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলিতেছি। হিন্দুগণ, যদি পুতুলপূজা করিয়া এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব হয়, তবে তোমরা কি চাও? সংস্কারকগণের ধর্ম চাও, না পুতুলপূজা চাও? আমি ইহার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপূজা দ্বারা এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস সৃষ্টি করিতে পারো, তবে আরও হাজার পুতুলের পূজা কর।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০১)।

হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ বেদান্তকে বিশেষ প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-শব্দের পরিবর্তে 'বৈদান্তিক' শব্দটি ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজী বেদান্তকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তাহা একান্ত-ভাবে তাঁহার নিজস্ব এবং বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি যথার্থই অভিনব। বেদান্তকে তিনি সর্ব ধর্মের উৎস বলিয়া গণ্য করিতেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে তিনি প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি পত্রে লিখিতেছেন: "এখন তোমাদের কাছে আমার নূতন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা কিছু, সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি স্তরে আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হ'ল ধর্মের সার কথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার, মত ও বিশ্বাসে প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম; এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ—ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে

আর সেমেটিক জাতিদের ভেতর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম; অদ্বৈতবাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন 'ধর্ম' বলতে বুঝায় বেদান্ত।" (পত্রাবলী, ৪র্থ সং,

পৃঃ ৩৩২-৩৩)। একই সঙ্গে স্বামীজী হিন্দুধর্মের চিরন্তন মহিমার ব্যাখ্যাতা এবং তাহার নবীন রূপের স্রষ্টা। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এ উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণীয়: "ধর্মসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাব সমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে।" (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, 'নিবেদিতা-লিখিত ভূমিকা', পৃঃ ৮০)। নিবেদিতা ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই প্রথম হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিক রূপটি শ্রেষ্ঠতম হিন্দুমনের বিচারের বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া স্বামীজী যখন বলিলেন: "…হিন্দুধর্ম যতটা আমার, ততটা তোমাদেরও।…আমরা মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, পার্শীদিগের অগ্নির পূজা করি এবং খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হই।" (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, 'নিবেদিতা-লিখিত ভূমিকা', পৃঃ ৮০) তখন আমরা হিন্দুধর্মের নূতন পরিচয় পেলাম। কেবল তত্ত্ব হিসাবে নয়, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মের সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের দৃষ্টান্তরূপে স্বামীজী জরথুস্ত্রের ধর্মাবলম্বীদের শেস প্রতিনিধি পার্শীগণের হিন্দুদের নিকট আশ্রয় লাভের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহাব্রত প্রবর্তন করিয়া তিনি হিন্দুধর্মকে লোকসেবার ক্ষেত্রে একটি নব ভূমিকায় কার্যকরী রূপ দিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক বিবেকানন্দ কিন্তু হিন্দুধর্মের বিকৃতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। হিন্দুরা যে বহু কুপ্রথা ও লোকাচারকে হিন্দুধর্মের সহিত একীভূত করিয়া লইয়া গর্হিত আচরণ করিয়াছে, এ-কথা বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার সুবিখ্যাত উক্তি: "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ—সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা।… এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে।" (পত্রাবলী, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৪০)।

হিন্দুর অধঃপতনের কথা বারবার তীব্র ভাষায় তিনি উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য তিনি রামমোহন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাগণের ন্যায় হিন্দুধর্মকে দোষারোপ করেন নাই। হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বিস্মৃত হইয়া কয়েকটি প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানকে ধর্মের আসনে স্থাপন করার ভ্রান্তিই এই অধঃপতনের হেতু, ইহাই তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। যে হিন্দুর শাস্ত্রে সর্বভূতে ব্রহ্ম-দর্শন ধর্মের সার কথা, সেই হিন্দুর কার্যে মহাভেদ-বুদ্ধির প্রকাশকে তিনি কঠিন তিরস্কার করিয়াছিলেন।

অতএব হিন্দুধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা কি তাহা পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আধুনিক যুগে তিনি হিন্দুধর্মকে প্রথম বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, তিনিই প্রথম হিন্দুধর্মের সম্পর্কে কেবল বিদেশীর ঘৃণাকে নয়, স্বদেশীর ভ্রান্তিকেও দূর করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের সামগ্রিক রূপের ঘোষণায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীপ্রচারকরূপে তিনিই প্রথম প্রবক্তা। পৃথিবীর ইতিহাসে হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীকে সাদরে স্থান দিয়া যে রক্ষা করিয়াছে, এই ঐতিহাসিক কীর্তির প্রতি তিনি প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করেন পার্শীদের উল্লেখের মাধ্যমে। হিন্দু-ধর্মের মহিমা যে কেবল প্রস্থানত্রয়ে অর্থাৎ উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির মধ্যেও

প্রকাশিত—এ-বিষয়েও তিনি সকলকে সচেতন করেন। হিন্দুধর্মের মর্ম-কথা ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজী স্বয়ং আপনার কঠোর দায়িত্ব সম্পর্কে এই উক্তি করিয়াছেন : "তারপর ভাব দেখি—হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, আর শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য হ'তে এমন ধর্ম বের করা যা একদিকে সহজ, সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্যদিকে বড় বড় মনীষিগণের উপযোগী হবে—এ যারা চেষ্টা করেছে, তারাই বলতে পারে, কি কঠিন ব্যাপার। সূক্ষ্ম অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী, জীবন্ত ও কবিত্বময় করতে হবে ; অসম্ভবরূপ জটিল পৌরাণিক তত্ত্বসকলের মধ্য হ'তে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্তসকল বের করতে হবে ; আর বুদ্ধি-বিভ্রমকারী যোগশাস্ত্রের মধ্য হ'তে বৈজ্ঞানিক ও কার্যে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বের করতে হবে—আর এগুলিকে এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যে, একটি শিশুও তা বুঝতে পারে। এই আমার জীবন ব্রত। প্রভুই কেবল জানেন, আমি কত দূর কৃতকার্য হবো।" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৬৬-৬৭)। স্বামীজীর মধ্যে আত্মগরিমার লেশমাত্র ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার সাফল্যের প্রতি সামান্যতম ইঙ্গিতও করেন নাই। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, তিনি আপনার সম্মুখে যে অসাধ্য সাধনের দায়িত্ব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সে অগ্নিপরীক্ষায় তিনি মনোমুগ্ধকররূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার পূর্ণ চিত্র অর্ধ ঘণ্টার পরিমিত সময়সীমায় পঠিতব্য প্রবন্ধে সম্ভব নহে। উক্ত বিষয়ে তাই কয়েকটি মূলকথা উপস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছি।

হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে যে কোন একটি মাত্র ধর্ম নয়, সকল ধর্মই সত্য—এ তত্ত্বও তিনিই বিশ্বসভায় প্রথম প্রচার করেন। তিনি কেবল হিন্দুধর্মের চিরন্তন মহিমার প্রচারকই ছিলেন না। হিন্দুধর্মকে তিনি নবরূপেও রূপায়িত করিয়াছিলেন। বেদান্তের অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত—এই তিনটি স্তর যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মসমূহের উৎসস্বরূপ—এই তত্ত্ব তাঁহার নিজস্ব আবিষ্কার এবং এ আবিষ্কার বেদান্তের নব মহিমার সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপন করিয়াছে। শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহাব্রতের প্রবর্তন করিয়া হিন্দুধর্মের কর্মযোগের মধ্যে তিনি একটি নব দিগন্তের উন্মোচন করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্তদৃষ্টির ফলে হিন্দুসমাজে যে সকল কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, ধর্মের সেই বিকৃতি-সাধনের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর আঘাত হানিয়াছিলেন। তাহা হিন্দুধর্মকে মলিনতার ধূম্রজাল হইতে মুক্ত হইতে বিশেষ সহায়তা দান করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুধর্ম হৃত মর্যাদা ফিরিয়া পাইয়াছে ও নব বলে বলীয়ান্ হইয়া পরম গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে নিঃসংশয় ও অবিচলিত পদক্ষেপে যাত্রা শুরু করিয়াছে।*

* ৯ই এপ্রিল ১৯৮২, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।—সঃ

ওড়িয়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

রামায়ণের কালবিচার ক'রে পণ্ডিতেরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, খ্রীষ্ট-জন্মের আনুমানিক তিনশ' বছর আগে মহাকবি বাল্মীকি এই মহাকাব্যটি রচনা করেছিলেন। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনার এই কালবিচার যুক্তিসহ কিনা বা এই মহাকাব্যটির কতখানি অংশ প্রক্ষিপ্ত সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অবান্তর। কিন্তু এই সত্য অনস্বীকার্য যে, প্রায় দু-হাজার বছর ধরে রামায়ণ এই দেশের সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্য-গুলিকে প্রভাবিত ক'রে এসেছে।

'রামকাহিনী' পরবর্তীকালে 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' 'অদ্ভুত রামায়ণ' প্রভৃতি নানা নামে নানা ভাষ্যে প্রচারিত হয়। প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিভাধর কবিরা আপন আপন রুচি অনুযায়ী রামকাহিনী সংগ্রহ ক'রে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে প্রাদেশিক ভাষা-গুলিতে 'রামকাব্য' রচনা করেছেন। কাহিনীর রূপান্তর ঘটেছে মূলতঃ সমাজরুচির প্রয়োজনে। বলাবাহুল্য এই রুচি সর্বতোভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস-নির্ভর। এর ফলে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত রাম-কাব্যগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের জনজীবনের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতিধারার উপর রামায়ণের প্রভাব এত গভীর যে, শুধু শিল্প-সাহিত্যেই নয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও রামায়ণ অঙ্গীকৃত।

রামায়ণ-অনুসারী কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কিছু কবি যেমন স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, তেমনি কিছু কবি মূলরচনার প্রতি অনুগত থেকে তার আক্ষরিক অনুবাদও করেছেন বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়। মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে রামকাব্য এবং রামায়ণের অনুবাদ একটি মূল্যবান্ শাখা। আধুনিক যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতক থেকে রামায়ণ-নির্ভর কাব্যরচনার ধারা স্তিমিত হ'য়ে আসে, কিন্তু রামায়ণ-বর্ণিত কাহিনীগুলি কাব্য-কবিতা এবং বিচার-বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হ'য়ে পড়ে। সেই সঙ্গে রামায়ণের কয়েকটি চরিত্র রূপকের পর্যায়ে উন্নীত হ'য়ে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত হ'তে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ থেকে রামায়ণের নবমূল্যায়ন ও আন্তর্জাতিক স্তরে রামায়ণ নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণা শুরু হয়। রামায়ণাশ্রয়ী এই বিচার-বিশ্লেষণ এখন যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যধারার মধ্যে অভারতীয় ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটলেও দেশজ সুপ্রাচীন ধারার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কখনই হ্রাস পায়নি। প্রকৃতপক্ষে এই উভয় ধারার সার্থক সমন্বয়ের পথেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে ইলিয়াড অডিসিরও স্বাঙ্গীকরণ ঘটেছে।

উড়িষ্যার শিল্প-সাহিত্যের জগৎ এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও রামায়ণের সমান্তরাল ক্ষেত্রে রয়েছে ভারতীয় প্রাগার্য সংস্কৃতি এবং অভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব। ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, লোকাচার সমস্ত ক্ষেত্রেই এই ত্রিবিধ ধারার সমন্বয় উড়িষ্যার বৈশিষ্ট্য।

উড়িষ্যার নদনদী ও পর্বতমালা এবং সেই সঙ্গে কিছু স্থান-নামের সঙ্গে রামায়ণের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে আরও আছে মঠ-মন্দিরগুলিতে নিত্য আরাধনার জন্যে বিগ্রহ। সব মিলিয়ে উড়িষ্যার সংস্কৃতিচেতনায় রামায়ণ যে প্রাচীন কাল থেকেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার

প্রমাণ সুস্পষ্ট।

এই প্রদেশের আঞ্চলিক সাহিত্য স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই প্রদেশবাসী সংস্কৃত পণ্ডিতদের রচনায়ও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম শতকে মুরারি মিশ্র-রচিত 'অনর্ঘ রাঘব' নাটক, একাদশ শতকে পণ্ডিত নারায়ণ সৎকবির 'রামকাব্য' ও বিশ্বনাথ কবিরাজের 'রাঘব-বিলাস' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ওড়িয়া সাহিত্যের আদিযুগে পরম শক্তি ও ভক্তিমান্ লেখক সারলা দাসের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। ওড়িয়া ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা ক'রে এই প্রতিভাধর লেখক ভাষাকে শুধু যে সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা নয়, ওড়িয়া ভাষার মধ্যে অভাবনীয় প্রাণ ও গতি সঞ্চার করেছেন। পঞ্চদশ শতকের পূর্বার্ধে সারলা দাস একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথাসিদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় কোন সুযোগই তাঁর ছিল না, তবুও তাঁর উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় তাঁর সম্পর্কে নানা-প্রকার জনশ্রুতি সৃষ্টি করেছে। প্রথম জীবনে ইনি গজপতি কপিলেন্দ্র দেবের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই সৈন্যজীবনের স্মৃতি এবং উড়িষ্যার ভৌগোলিক ও জনজীবন সংক্রান্ত ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা সারলা দাসের মহাভারত ও অন্যান্য রচনাকে উড়িষ্যার জাতীয় সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে। বলাবাহুল্য যে, ইনি সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করেননি। মহাভারতীয় কথাবস্তুকে উড়িষ্যার জনমানসের উপযোগী ক'রে তোলার অভিনব প্রচেষ্টায় মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে উড়িষ্যার সংস্কৃতি-চেতনাকে অঙ্গীভূত করেছেন। মূলতঃ এই কারণেই পঞ্চদশ শতকে রচিত সারলা দাসের মহাভারত যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

সারলা দাসের মহাভারতের মধ্যে বনপর্বে জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি রামচন্দ্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করান। সেখানে মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন—

এহি পঞ্চবটী বন মার্কণ্ড বইলে।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এথি যজ্ঞ করিগিলে॥
বাবু দশরথ রজা অপুত্রক থিলা।
ঋষ্যশৃঙ্গ যোগু চারিপুত্র সে পাইলা॥

(মার্কণ্ড বললেন, এ হ'ল সেই পঞ্চবটী বন। এখানেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা দশরথ ছিলেন অপুত্রক। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সহায়তায় তিনি চারজন পুত্রের পিতা হন।)

কিছু দূর বর্ণনার পর স্বয়ং রামচন্দ্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন—

যাগ রখি তাড়কাকু করিঅছ হত।
চরণ লগাই নারী কল যে মুকত॥
শিবধনু ভাঙ্গিবারু জানকীর তাত।
নিজ কন্যা সমর্পিলে হই আনন্দিত॥

(তুমি অর্থাৎ রামচন্দ্র তাড়কাকে হত্যা ক'রে যজ্ঞ রক্ষা করেছ এবং তোমার চরণস্পর্শে একটি নারীকে মুক্ত করেছ। শিবধনু ভঙ্গ করার পুরস্কার স্বরূপ জানকীর পিতা আনন্দিত হ'য়ে আপন কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।)

সারলা দাস-রচিত 'বিলঙ্কা রামায়ণ' একটি অপূর্ব রচনা। বনবাস-জীবন শেষ ক'রে অযোধ্যা-প্রত্যাগত রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ অহমিকার সঙ্গে রাবণ-বধের বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন সমাগত মুনি-ঋষিদের কাছে। সীতা রামচন্দ্রকে সবিনয়ে জানান যে, রাবণ নিহত হওয়ার পটভূমিতে তাঁর ভূমিকাটিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজের গৌরব-হানিকর এই উক্তি রামচন্দ্র স্বীকার করতে অসম্মত হ'লে সীতা বিলঙ্কার রাজা সহস্রবাহু রাবণকে

হত্যা ক'রে আপন শৌর্যের প্রমাণ দিতে অনুরোধ জানান। বিলঙ্কার রাবণের কাছে রাম পরাজিত হন এবং পরে সীতার সহায়তা নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে সীতাদেবীর গৌরবময় ভূমিকার ও অলোকসামান্য শক্তির মাহাত্ম্য প্রচারই এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রামায়ণ-রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কবি সারলা দাসের ভণিতায় একখানি 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'ও দেখা যায়; কিন্তু তার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত দুর্বল। ওড়িয়া সাহিত্যের সমালোচকেরা এটিকে সারলা দাসের রচনা ব'লে স্বীকার করেন না।

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে কবি মার্কণ্ড দাস 'মহাভাব' নামক একখানি রামায়ণ রচনা করেন। ইনি কেশব কোইলী প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যের রচয়িতা হিসেবেও পরিচিত। এই শতকের শেষার্ধের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বলরাম দাস সর্ব-স্বীকৃত। প্রায় সমকালীন যে পাঁচজন কবি 'পঞ্চসখা' নামে শ্রদ্ধার স্থান অধিকার ক'রে আছেন, তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেন বলরাম দাস। উল্লিখিত আছে যে, ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করেন। দাণ্ডী-বৃত্তে* রচিত এঁর 'জগমোহন রামায়ণ' উড়িষ্যায় 'দাণ্ডী রামায়ণ' নামেই সুপরিচিত। অবশ্য বলরাম দাসের ব্যবহৃত ছন্দে মাত্রাবিভাগ তাঁর পূর্বসূরী সারলা দাসের মতো অনিয়মিত নয়।

বলরাম দাসকৃত 'জগমোহন রামায়ণে'র ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি এই রচনাটি সমাপ্ত করেন। এ যে যথেষ্ট শক্তির পরিচায়ক সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। বলরাম দাসের ভণিতায় 'দক্ষিণী রামায়ণ' নামে আর একখানি রামায়ণ পাওয়া যায়, কিন্তু এখানি 'জগমোহন রামায়ণে'রই অনুলিপি। অনুলেখক বইটির নামকরণ ভিন্ন-ভাবে করেছেন, কিন্তু কোথাও বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন করেননি।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বলরাম দাসের ছন্দোবিভাগ বহুল পরিমাণে সুসংহত। কিন্তু বিরাট আয়তনের এই রামায়ণখানির সূত্রপাত থেকে সমাপ্তির মধ্যে কোথাও কোন অধ্যায় বা

* একটি বাক্যের অর্থ সমাপ্তির জন্য যতখানি দৈর্ঘ্য এসে পড়ে অবিকৃতভাবে সেইটিকে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে 'দাণ্ডী-বৃত্ত' বলা হয়েছে। সারলা দাসের মহাভারতে তার অপূর্ব উদাহরণ দেখা যায়। 'বনপর্বে' এক জায়গায় অর্জুন বলছেন—

অর্জুন বোইলে দেব মোহর সত্যবাণী
সুরলোক নাগলোক নরলোক অসুরলোক মু সমস্ত পারই জিনি।
সর্বদা ভগতি মোর শ্রীজগন্নাথঙ্ক পাদগতে
কেশবর নিন্দা মু ন সহই কদাশ্চিতে।
গাণ্ডীব ধনু মোহর করে থাই যেতে বেলে
য়েকাদশ রুদ্র জিনি পারই মুই অবহেলে।
কেশবর নামকু গাণ্ডীব ধনুকু অক্ষয় যে তূণকু ভো দেব পাশুপত শরকু
যেহ নিন্দা করই অবশ্য মুহি নাশ করই য়েহাঙ্কু।

(অর্জুন বললেন, এ আমি সত্য কথাই বলছি যে, আমি চতুর্লোক অনায়াসে জয় করতে পারি। আমি শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্ম ভক্তিভাবে স্মরণ করি এবং শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কদাচ সহ্য করি না। হাতে গাণ্ডীব ধনু থাকলে আমি একাদশ রুদ্রকে জয় করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ, গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীর বা পাশুপত অস্ত্র যে নিন্দা করে, আমি তাকে অবশ্যই ধ্বংস করি।)

'কাণ্ড'-বিভাগ নেই। পরবর্তী কালে মুদ্রণের সময় সম্পাদকেরা রচনাটিকে বিষয়বস্তুর বিচারে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছেন।

রামচন্দ্র বালীরাজাকে মারাত্মকভাবে আঘাত করার পর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বালী বলছেন—

ছাল হাড় মাঁউস ঘিনিলে কিস কর্ম।
অবিচার পণ তোর জানিলুই আজ ॥
পুরাণ বেদ আগম শাস্ত্র শুনি নাহি।
মোতে তুহি অকারণে বিন্ধুলুটি যহুঁ ॥
পঞ্চনখিয়া যে পুন পাঞ্চজন্তু খাই।
আবর যে পাঞ্চজীব ভক্ষিনা যোগাই ॥
গজ ব্যাঘ্র মর্কট যে মনুষ্য কুম্ভীর।
এই পাঞ্চজন্তু পুন ন ভক্ষন্তি নর ॥
গধি নকুল শশা যে গণ্ডা ঝিঙ্ক খাই।
মোতে যে বধিলু কেবন গুণ পাই ॥

(হাড় মাংস আর চামড়া গায়ে থাকলেই কেউ মানুষ হয় না, তুই যে বিচারবুদ্ধিহীন আজ তার প্রমাণ পেলাম, অকারণে আমাকে তীরবিদ্ধ করা থেকেই বুঝতে পারছি, বেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র তুই কিছুই পড়িসনি। পাঁচটি নখ-বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে পাঁচটি ভক্ষ্য, পাঁচটি অভক্ষ্য। হাতী, বাঘ, বানর, মানুষ আর কুমীর এই পাঁচটি প্রাণী মানুষের খাদ্য নয়। গোসাপ, নেউল, খরগোশ, গণ্ডার আর সজারু এই পাঁচটি প্রাণী অবশ্যই তাদের খাদ্য। তুই আমাকে হত্যা করলি কোন কারণে?)

'জগমোহন রামায়ণে'রই প্রায় হুবহু অনুকরণে রচিত ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন কবির ভণিতায় একটি রচনা পাওয়া যায়। এটির নাম 'বিলঙ্কা রামায়ণ' এবং ভণিতায় পাওয়া যায় জনৈক বারানিধি দাসের নাম। ভাষা ও ছন্দোরীতিতে 'জগমোহন রামায়ণ' ও 'বিলঙ্কা রামায়ণে'র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যেটুকু পার্থক্য আছে তা একান্তই কথাবস্তুর দু-একটি ক্ষেত্রে। এই রামকাব্যটির কাহিনীতে দেখা যায়, লঙ্কায় রাবণকে হত্যা ক'রে সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র যখন অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, ঠিক তখনই বন্ধুবর বিভীষণ তাঁকে বিলঙ্কাবাসী প্রবল প্রতাপান্বিত সহস্রশির রাবণকেও হত্যা করবার অনুরোধ জানান। রামচন্দ্র এই রাবণকে বশ্যতা স্বীকার করবার জন্যে অনুরোধ জানান, কিন্তু সহস্রশীর্ষ রাবণ আপন পুত্র গুমনি শূরকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যেই পাঠান। যুদ্ধে গুমনি শূর নিহত হন এবং পরে সহস্রশীর্ষ রাবণও নিহত হন। উড়িষ্যার রাজ্যপ্রদর্শশালার পুঁথি-বিভাগে একখানি পুঁথিতে বলরাম দাস ও বারানিধি দাসের ভণিতা পাওয়া যায়। অতএব বারানিধি দাস নামে কোন কবি যে ছিলেন সে প্রশ্নের অবকাশ আছে।

'পঞ্চসখা'র অন্যতম কবি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আশিসপুষ্ট ভাগবতবৃত্তের মধ্যমণি 'অতিবড়' জগন্নাথ দাস তাঁর ভাগবতের নবম, দশম এবং একাদশ অধ্যায়ে হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ এবং রামচন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণনা ক'রে উৎকলীয় সাহিত্যচর্চায় রামায়ণের প্রভাবটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভাষা, অলঙ্কার-প্রয়োগ এবং ছন্দোবিচারে জগন্নাথ দাসের রচনা মনোরম। সমকালীন অন্য একজন কবি হলেন অর্জুন দাস। প্রখ্যাত গবেষক ডঃ আর্তবল্লভ মহান্তীর* মতে অর্জুন দাস সারলা দাসের অর্ধ-শতক পরে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 'কল্পলতা' অর্জুন দাসের প্রখ্যাত রচনা। রামায়ণ-অনুসারী যে কাব্য ইনি রচনা করেন, তার নাম 'রাম-বিভা'। অর্জুন দাস কোন রচনার মধ্যে

---

*ডঃ মহান্তী কটক শহরে প্রাচী সমিতি নামে সাহিত্য-গবেষণার জন্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং স্বয়ং অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা ক'রে গবেষণামূলক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

আত্মজীবনীমূলক কোন তথ্য রেখে যাননি, তাই তাঁর কালবিচার নির্ভুলভাবে করা কঠিন।

সপ্তদশ শতকের যে-সব উৎকলবাসী কবি রামায়ণের কাব্যিক ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে ওড়িয়া কাব্যধারায় পূর্বসূরীদের ভাষা, ছন্দ ও কাহিনীবৈশিষ্ট্য অঙ্গীকার করেছেন, তাঁরা হলেন ধনঞ্জয় ভঞ্জ, মহেশ্বর দাস, হলধর দাস এবং কাহ্নু দাস প্রভৃতি কবি।

'রঘুনাথ-বিলাস' শীর্ষক রামকাব্যরচয়িতা ধনঞ্জয় ভঞ্জের আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিশেষ কথাটি উল্লেখযোগ্য তা এই যে, ওড়িয়া সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিধানে এই প্রদেশের রাজবংশগুলির অবদান অসামান্য। ধনঞ্জয় ছিলেন ঘুমসর রাজ্যের অধিপতি। বর্তমান প্রবন্ধে ধনঞ্জয়ের পৌত্র কবি-সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জের আলোচনা ছাড়াও অন্যান্য কয়েকজন নৃপতিবংশীয়ের উল্লেখ এবং আলোচনা পাওয়া যাবে।

ধনঞ্জয়ের কবিপ্রতিভা ছিল উন্নত শ্রেণীর। অলঙ্কারবহুল এঁর রচনা একদিকে অত্যন্ত সুখপাঠ্য অন্যদিকে শৃঙ্গার প্রভৃতি বিভিন্ন রসের পরিবেশনায় এ রচনা হৃদয়সংবেদ্য। সীতার বেণী বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

ধন্য রমণী কুটিল বেণী নিন্দে ভ্রমরশ্রেণী।
কি অবা কামদেবর রম্য নীলকেতন জিনি॥
কি অবা মুখচন্দ্রকু গ্রাসি রহিছি ঘোর তম।
রোষেণ পুচ্ছ লগাই অছি দিশই অনুপম॥
কি অবা নিজ অতি আশারে অছি রজনী রহিঁ।
তারকা সপতনীর পাশে ন যিব নিশা সাঁই॥
কি অবা যুবা নেত্র চাতক অমৃতদানী সেহু
কি অবা যুবা-জননয়ন কামতিমির এহু॥
কি অবা রতিনাথ রথর নীল চামর শোভা।
দেখিলে হর হারিব ধৃতি জগতজনলোভা॥
কি সে কালন্দী তরঙ্গশ্রেণী প্রায়েক মনোহর।
সীমন্তে শোভা সিন্দুর রবিসুতা কিপাশে তার॥

(ভাগ্যবতী এই রমণীর অপূর্ব সুন্দর বঙ্কিম এবং কৃষ্ণবর্ণ বেণী ভ্রমরশ্রেণী বা কামদেবের রমণীয় নীলকেতন অপেক্ষাও সুন্দরতর। মনে হয় যেন কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ এই রমণীর মুখচন্দ্রকে গ্রাস করবার জন্যে সপুচ্ছ রাহুর মতো ক্রোধান্বিত কলেবরে শীর্ষদেশ ঘিরে রয়েছে। যেন ঘনান্ধকার রাত্রি সপত্নী তারকাদের এড়িয়ে এখানেই স্থির হ'য়ে রয়েছে। যেন এই কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম যুবকদের মনোহারী এবং কামনা-উদ্রেককারী শোভা ধারণ করেছে। এর দর্শনে মনের মধ্যে কামদেবের রথশোভাকর ঘননীলবর্ণের চামরের কথাই উদিত হয়। প্রতিটি মানুষের মনোহরণ-কারী এই দৃশ্য স্বয়ং মহাদেবেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে। কালিন্দী নদীর তরঙ্গের মতো ভঙ্গীযুক্ত কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যবর্তী সিঁথিতে সিন্দুরবিন্দু অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।)

কবি মহেশ্বর দাসের রচনায় বলরাম দাসের অনুকৃতি সুস্পষ্ট। মধ্য-সপ্তদশ শতকের এই কবি সপ্তকাণ্ড রামায়ণকে সংক্ষেপে 'টীকা রামায়ণ'-নামে একটি কাব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন। 'অধ্যাত্ম রামায়ণে'র ওড়িয়া ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদে উৎসাহী হয়েছিলেন সর্বপ্রথমে হলধর দাস। সমালোচকদের মতে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে এঁর অনুবাদ-কর্ম সমাপ্ত হয়। কাহ্নু দাসের 'রামরসামৃতসিন্ধু' সরল ওড়িয়া ভাষায় রচিত রামকাব্য। ভাষার প্রসাদগুণই এই কাব্যটির জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যটির রচনা সমাপ্ত হয়।

অষ্টাদশ শতকে যে-সব উৎকলবাসী কবি রামায়ণ অবলম্বন ক'রে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহাদেব দাস, কবিসম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ, বিশ্বনাথ খুঁটিয়া, শিশু ঈশ্বর দাস, অরক্ষিত গোবর্ধন দাস, নরেন্দ্র মঙ্গরাজ, গোপীনাথ পাত্র কবিভূষণ, গোপাল তেলঙ্গা, বালক রামদাস,

নরহরি কবিচন্দ্র, বিপ্র জনার্দন দাস, বিপ্র লক্ষ্মীধর দাস, দ্বিজ ঈশ্বর দাস, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বহু কবির নামই উল্লেখযোগ্য।

মধ্য ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত উড়িষ্যায় সাহিত্য সৃষ্টির যুগকে 'রীতিযুগ' ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই যুগের প্রধান লক্ষণ ব্যাপকভাবে শৃঙ্গার-রসের বর্ণনা। সেই সঙ্গে এই কালসীমার অন্তর্বর্তী কবিরা অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগে আপন আপন কাব্যগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছেন। স্মরণীয় যে আলোচ্য রামকাব্য-গুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। যেগুলি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, সেখানেই কবিরা যুগধর্মের প্রতি তাঁদের প্রবণতা দেখিয়েছেন।

রামায়ণ-অনুসারী কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ 'বৈদেহীশ-বিলাস', 'রামলীলামৃত', 'অবনারসতরঙ্গ' ও 'ষোল পোঈ' নামে চারটি রামকাব্য রচনা করেন। এ চারটির মধ্যে 'বৈদেহীশ-বিলাস' সম্পর্কে অনেক সমালোচকের মতে—এই রচনাটির মধ্যে পিতামহ ধনঞ্জয় ভঞ্জ-রচিত 'রঘুনাথ-বিলাস' কাব্যখানির ছায়া সুস্পষ্ট। 'ষোল পোঈ' কাব্যখানির রচনা-রীতি নিম্নরূপ—

শুন সুজনে বিচিত্র কৌতুক শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ
রামায়ণ।
কলে রাম রামায়ণ নাম রামায়ণ শিব কহন্তি
পার্বতী॥
শাস্ত্র আগে বালমিক সিদ্ধ বালমিক পুরাণ-
পরসিদ্ধি।
নাম অটে ষোল পোঈ পদ ষোল পোঈ ষোল
পোঈরে সমস্ত বিধি॥
কবি বীরবর পদবীরবর বীরবর পদে বীরবর।
ভঞ্জ ভঞ্জ উপইন্দ্র ভঞ্জ উপইন্দ্র উপইন্দ্র ইন্দ্র
ইন্দ্রসার॥

কবিতাংশটির টীকা নিষ্প্রয়োজন। একই শব্দকে বারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ ক'রে কবি যে রচনাচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, উৎকল সাহিত্যের কাব্যশাখায় তার দোসর দুর্লভ। শুধু-মাত্র যমক অলঙ্কারের ব্যবহার ব'লে একে চিহ্নিত করলে এই রচনার যথোচিত মূল্যায়ন হয় না।

অষ্টাদশ শতকের বিশ্বনাথ খুঁটিয়া-রচিত 'বিচিত্র রামায়ণ' বা 'বিশী রামায়ণ', শিশু ঈশ্বর দাসের 'নল-রামচরিত', অরক্ষিত গোবর্ধন দাসের 'পচিশ পোঈ', নরেন্দ্র মঙ্গরাজের 'সীতামুচিন্তা চৌতিশা', গোপী-নাথ পাত্র কবিভূষণের 'রামচন্দ্র-বিহার', গোপাল তেলঙ্গার 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', বিপ্র জনার্দন দাসের 'রাঘব-চরিতামৃত', বিপ্র লক্ষ্মীধর দাসের 'অঙ্গদ চিটাউ', রঘুনাথ দাসের 'রামলীলা', সাধুচরণ দাসের 'রামগীতা', মাগুণী পট্টনায়কের 'রামচন্দ্র বিহার', বৈশ্য সদাশিবের 'রামলীলা', অনুগুল রাজ-বংশীয় কবি ব্রজবন্ধু সামন্ত সিংহারের 'রামলীলামৃত', চৈতন্যগুরুর 'বিলঙ্কা-রসামৃত' ও চিন্তামণি দাস-রচিত 'সীতাবিবাহ' প্রভৃতি রামকাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা উড়িষ্যার কোন কোন সমালোচকের প্রবন্ধে পাওয়া যায়। রাজ্য-প্রদর্শশালার পুঁথি-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত নীলমণি মিশ্র-রচিত 'ওড়িয়া রামকাব্য' শীর্ষক পুস্তিকাটি এই বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা দূর করার পক্ষে একটি মূল্যবান্ রচনা।

সংস্কৃতে রচিত অন্য কবির রামচরিতমূলক রচনার ওড়িয়া অনুবাদ যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের উল্লেখযোগ্য অনুবাদক হলেন বালক রামদাস এবং বনমালী দাস। এঁদের মধ্যে রামদাস আপন গুরু ভক্তরাম দাসের 'রামভক্তি রত্নাবলীর' এবং বনমালী দাস ভোজরাজ ও লক্ষ্মণ শূরী-রচিত 'রামায়ণ চম্পূ'র ওড়িয়া অনুবাদ করেন। অবশ্য বনমালী দাস আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, রচনার বহু জায়গায় আপন বর্ণনাশক্তির পরিচয় রেখেছেন।

গোপীনাথ পাত্র কবিভূষণের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ইনি পার্লাকিমেদীর রাজা গজপতি জগন্নাথ নারায়ণ দেবের সভাকবি ছিলেন। গোপীনাথ তাঁর 'রামচন্দ্র-বিহার' কাব্যখানির রচনাশৈলীতে কবিসম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর রচনার অংশ বিশেষ—

কেতে বেলে চারু অরুণ হরি দিগরে দিশে।
কুরুবক কুসুমমাল ঘেনি অছি কি কেশে॥
কান্ত আগম আশরে কি প্রাচী সুন্দরী তোষে।
কুঙ্কুম কি অঙ্গে বলিছি রসে সুবেশ বশে॥

(এক সময় কৃষ্ণদিগন্তে উদিত হন সূর্য। মনে হয় তিনি কুরুবক ফুলের মালা আপন কেশে জড়িয়ে নিয়েছেন। পূর্বাকাশ-সুন্দরী কান্তের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় সুসজ্জিত হ'য়ে আপনার সর্বদেহে কুঙ্কুম লেপন করেছে বলেই অনুমিত হয়।)

গোপাল তেলঙ্গা অন্যপ্রদেশবাসী মানুষ, কিন্তু সম্বলপুরের রাজা অজিতসিংহের রাজদরবারে চাকরী গ্রহণ করার পর ওড়িয়া ভাষায় অভূতপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন এবং অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদ করেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদক হিসেবে অষ্টাদশ শতকের কবি সূর্যমণি চ্যাউ পট্টনায়ক (১৭৭৩-১৮২৮) এবং নরহরি কবিচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। এই শতকের কবি দ্বিজ ঈশ্বর দাসের 'রামলীলামৃত' কাব্যখানির মধ্যে ওড়িয়া এবং বাংলাভাষার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণের প্রভাব উনিশ শতকের কাব্যধারার মধ্যে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। রাজবংশীয় কবি বালুঙ্কেশ শ্রীচন্দনের রামসীতার বিবাহকালীন মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনামূলক কাব্য 'মঙ্গল গীত', ভিখারী পট্টনায়কের 'লঙ্কাদলন নাটক', কৃষ্ণচরণ পট্টনায়কের বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ, বিক্রম নরেন্দ্রের 'রামলীলা', যদুমণি মহাপাত্রের 'রাঘব-বিলাস', রাধাচরণ নায়কের 'রসরামায়ণ-মঞ্জরী', কৃপাসিন্ধু দাসের 'সিন্ধু রামায়ণ', কেশব পট্টনায়কের 'নৃত্য রামায়ণ' বা 'রামলীলা', গঙ্গাপাণি মহাপাত্রের 'রামাশ্বমেধ যজ্ঞ', রাজবংশীয় কবি রঘুনাথ সিংহের 'রামলীলা', ভুবনেশ্বর কবিচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী 'রামচন্দ্র-বিলাপ', 'রামায়ণ-চূড়ামণি' ও 'সীতেশ-বিলাপ', মুকুন্দ পট্টনায়কের 'অশ্বমেধ যাগ', বিশ্বেম্ভর রাজেন্দ্রের দুখানি রামকাব্য 'রঘুনাথ-বিলাপ' এবং 'বীর রামচন্দ্র-বিলাস', কেশব ত্রিপাঠীর 'পূর্ণ রামায়ণ', সেবাদাসের 'রামরাহাস পদ্যাবলী', কপিলেশ্বর বিদ্যাভূষণকৃত বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ, সীতাচরণ দাসের কাব্যত্রয়ী 'ভক্তিরসার্ণব রামায়ণ', 'রামগুণসাগর' এবং 'রামরসামৃত রামায়ণ', গঙ্গাধর প্রধানের 'রামলীলা', গোপীনাথ কর-রচিত 'বিচিত্র বিলঙ্কা রামায়ণ', রামকৃষ্ণ রথের 'লবকুশ উপাখ্যান' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কবি মধুসূদন দাস ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 'রামচরিত-মানসে'র ওড়িয়া অনুবাদ করেন। এঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পরবর্তী কালে অন্য দু-এক কবি তুলসী রামায়ণের ওড়িয়া অনুবাদ করেছেন। সেবাদাসের 'রামরাহাস পদ্যাবলী' রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার অনুকরণে সরযূ নদীর কূলে রামসীতার লীলাবর্ণনা করেছেন। কবি কেশব ত্রিপাঠীর 'পূর্ণ রামায়ণে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি রামায়ণের কাহিনীকে দশটি কাণ্ডে বিভক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—

প্রারম্ভ, জন্মকাণ্ড, বিভা, শ্রীরাহাস।
আরম্ভ, সিন্ধুকাণ্ড, যুদ্ধ, অভিষেক॥
অশ্বমেধ যাগ, স্বর্গারোহণ।
এইরূপে দশকাণ্ড করিব শ্রবণ॥

ঊনবিংশ শতকের অন্ত্যভাগ থেকেই ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত। নবীন ভাবধারা স্বাঙ্গীকরণের পরেও উড়িষ্যার কবি ও সাহিত্যিকেরা রামায়ণের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা

বিস্মৃত হননি। এই যুগের যাত্রাগানে, কবিতায় এবং প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায় ঐ জাতীয় মহাকাব্যের কিছু প্রভাব থেকে গেছে। জগন্নাথ পাণি, বৈষ্ণবচরণ পাণি, বালকৃষ্ণ মহান্তী, রামচন্দ্র সোঁয়াই, কৃষ্ণপ্রসাদ বসু, ক্ষেত্রমোহন পাণিগ্রাহী, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, কবিচন্দ্র ডঃ কালীচরণ পট্টনায়ক, নাট্যাচার্য রঘুনাথ পণ্ডা প্রভৃতির নাটক রচনায় রামায়ণের প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশিত।

সাম্প্রতিক কালের ওড়িয়া কাব্যধারার আধুনিকতাপন্থী চিন্তার প্রায় সমান্তরাল ক্ষেত্রে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্যগুলির প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, বহির্ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাশ্রয়ী বিচিত্র ভাবসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার পরেও রামায়ণের প্রতি আকর্ষণ ক্ষুন্ন হয়নি। তাই বিশ শতকের কবি গোবিন্দ দাসের রচনায় 'অর্কবংশাবতংস', গোকুলানন্দ পট্টনায়কের 'জানকীবল্লভ-বিলাসে', কবি গঙ্গাধর মেহের রচিত 'তপস্বিনী' ও 'ইন্দুমতী'তে, কানাইলাল বসুর 'বৈদেহী-বিলাপে', নারায়ণচন্দ্র ত্রিপাঠীর 'বৈদেহী-বিলাসে', হরিহর মর্দরাজ-রচিত 'সীতাবিবাহ' কাব্যে, কবি নীলকণ্ঠ রথ-রচিত 'শ্রীরাম রাসোৎসব' এবং 'সীতাপ্রেম তরঙ্গিনী' কাব্যদ্বয়ে, মধুসূদন রাও-রচিত 'সীতাবনবাস' নামক কাব্যে, সোমনাথ ষড়ঙ্গী-রচিত 'শ্রীরামসীতা চম্পূ' নামক কাব্যে, কবি রাধানাথ রায়ের 'দশরথ-বিয়োগে' শীর্ষক কবিতায় রামায়ণ-পরম্পরা অনুস্যূত। প্রখ্যাত কবি নন্দকিশোর বলের 'সীতাবনবাস' এবং মাধবচন্দ্র মিশ্রের 'সতীচন্দ্রিকা' শীর্ষক রচনাগুলিও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কবি রাধামোহন গড়নায়ক এ-কালের অন্যতম প্রতিভাধর স্রষ্টা। তাঁর 'বিভীষণ উঠ', 'আগো পাষাণী', 'ঊর্মিলা', 'জটায়ু' প্রভৃতি কবিতা প্রাচীন রার প্রতি এঁর শ্রদ্ধাবোধেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রামায়ণের নবমূল্যায়ন শুরু হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীটিকে শুধুমাত্র ভক্তিবাদী দৃষ্টিতে না দেখে এ-কালে বৈজ্ঞানিকের যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে দেখা হচ্ছে। তার প্রমাণ রামায়ণ-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা ও বহু চিন্তামূলক প্রবন্ধাবলী। রামায়ণের পুনর্মূল্যায়নে উড়িষ্যাবাসী বিদগ্ধ সমাজের অবদান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অতএব এ-কথা অসঙ্কোচেই বলা যায় যে, জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণের প্রভাব উড়িষ্যার শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, শুধু শিল্পে বা সাহিত্যেই নয়—এই প্রদেশে রামায়ণের প্রভাব যে সুপ্রাচীন তার প্রমাণ নদ-নদী পর্বত আর অরণ্যানীর নামকরণের মধ্যে পাওয়া যায়। ফুলবানী জেলার 'রামগিরি' পর্বত, কেওঞ্ঝর জেলার 'সীতাপরী'-নদী এবং 'লক্ষ্মণাপা', 'সীতাবিঞ্জী' প্রভৃতি স্থাননাম এই প্রভাবস্মৃতিকে প্রাচীন কাল থেকেই বহন ক'রে চলেছে। এছাড়া আছে বহু মঠ-মন্দির যেখানে গুহা বা মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্রশিল্পে এবং বিগ্রহ-মূর্তিতে রামায়ণের বহু কাহিনী ও চরিত্র জীবন্ত হ'য়ে আছে। লক্ষ্মণেশ্বর, ভরতেশ্বর ও শত্রুঘ্নেশ্বর মন্দির (৬ষ্ঠ ও ৭ম শতক), স্বর্ণজলেশ্বর-মন্দির (৮ম শতক) এবং বারাহী-মন্দির (১০ম শতক) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভুবনেশ্বরের উপকণ্ঠে প্রসিদ্ধ গুহাগুলির প্রাচীর-গাত্রে রামায়ণ-কাহিনীর কিছু কিছু ভাস্কর্যের প্রতিরূপ দেখা যায়। বারাহী-মন্দিরের চিত্রকলাও অপূর্ব।

ওড়গাঁ ও কটকের রঘুনাথ-মন্দির, কালাহাণ্ডির রামস্বামী মঠ এবং পার্লাকিমেদীর রামস্বামী মঠে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার যে মূর্তি পূজিত হয় শিল্প-সৌষ্ঠবের বিচারে সেগুলি অত্যন্ত উচ্চমানের। পুরী ও অন্যান্য স্থানের বহু মঠে

এই ধরনের সুন্দর বিগ্রহমূর্তি দেখা যায়। অতি সম্প্রতি ভুবনেশ্বরে যে রাম-মন্দির স্থাপিত হয়েছে, তার বিগ্রহগুলিও উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলার পরিচয় দেয়।

রামায়ণের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।' প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গভীর। শান্তি ও শক্তির উৎস হিসেবেও রামায়ণের একটি পৃথক্ মর্যাদা আছে। মূলতঃ বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যে এই নিগূঢ় প্রভাবেরই পরিচয় সুস্পষ্ট।

পূজাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

এক

১৮৮২-র ২২শে অক্টোবর, রবিবার—বিজয়া দশমী তিথি। সকাল নটা।[১]

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করছেন। মাস্টার মশায় (শ্রীম—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) মেজেতে বসে আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বর্ণনায় তিনি 'মণি'-নামে আত্মগোপন করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমার পূজার ছুটি হয়েছে?'

'আজ্ঞা হাঁ।'—মাস্টার এই বলেই ক্ষান্ত হন-নি। জানিয়েছেন, 'আমি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়িতে প্রত্যহ গিছলাম।'

'বল কিগো!'

'দুর্গাপূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি।'

এই কথা জানাতেই মাস্টার আগ্রহী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'কি বল দেখি।'

মাস্টার বিবরণ দিয়েছেন।—'কেশব সেনের বাড়িতে রোজ সকালে উপাসনা হয়,—দশটা এগারটা পর্যন্ত। সেই উপাসনার সময়ে তিনি দুর্গাপূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বললেন, যদি মাকে পাওয়া যায়—যদি মা দুর্গাকে কেউ হৃদয়মন্দিরে আনতে পারে—তাহলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি—এ-সব আপনি হ'য়ে যায়,—মা যদি আসেন।'

এই বর্ণনার শেষাংশ কমলাকান্তের জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমায় জননী জন্মভূমিকে দর্শন করার কথা মনে করিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার কিছু অংশ[২]—

"রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, বীরজনকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভুজা, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।৩।১।
২ কমলাকান্তের দপ্তর, 'আমার দুর্গোৎসব'।

বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বেশির ভাগ অংশই ১২৮০-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৮৭৫ খ্রীঃ)। কেশবচন্দ্র ভিন্ন ভাবের ভাবুক, সুতরাং তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ সিদ্ধান্ত করা যায় না; এমন কি তাঁর পক্ষে 'আমার দুর্গোৎসব' না পড়াও অসম্ভব নয়। সাহিত্যানুরাগী মাস্টার মশায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়েছিলেন বলেই মনে হয়—হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাবেই তিনি উপাসনার সময় কেশবের দুর্গাপূজার ব্যাখ্যানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন।

অবশ্য এ আকর্ষণের মুখ্য কারণ উনিশ শতকের ইংরেজীশিক্ষিত সমাজের বিশিষ্ট মানসিকতা। বঙ্কিম আর কেশব দুজনেই দেবীর ঐশ্বর্যমূর্তি কল্পনা করেছেন—দেবীপ্রতিমা আর সহদেবতা-চতুষ্টয়কে প্রতীকরূপে কল্পনা ক'রে ভাবযোগে বর্ণনা করেছেন। কেশবের ভাবনায় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ আছে, বঙ্কিমের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আদর্শের শিল্পচেতনাই প্রধান। মাস্টার এই শিল্পরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন; তার উপর কয়েক মাস আগে (ফেব্রুআরি ১৮৮২) থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করায় তাঁর অন্তরে আধ্যাত্মিক আকূতিও জেগেছে। কেশবের উপাসনায় এই দুটিই থাকায় তা তাঁর কাছে উপাদেয় ব'লে মনে হয়েছে। তিনি সাগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেশবের ব্যাখ্যানের কথা বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু মাস্টার মশায়কে উৎসাহ দেননি। তিনি সব বিবরণ শুনেছেন, মাঝে মাঝে কেশবের উপাসনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। অবশেষে বলেছেন, 'তুমি এখানে ওখানে যেও না—এইখানেই আসবে।'

এর প্রায় দু-বছর পরের কথা (২১.৯.১৮৮৪)।[৩]—

মহেন্দ্র মুখুজ্যের ময়দার কলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'হাজরা আবার বলে, ভগবান্‌কে পেলে তাঁর মতো ষড়ৈশ্বর্যশালী হয়, ষড়ৈশ্বর্য থাকবে, ব্যবহার করুক আর নাই করুক।'

মাস্টার মশায় এদিন মন্তব্য করেছেন, 'ষড়ৈশ্বর্য হাতে থাকা চাই!'

সকলে শুনে হেসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলেছেন, 'হ্যাঁ, হাতে থাকা চাই! কী হীনবুদ্ধি! যে ঐশ্বর্য কখনও ভোগ করে নাই, সেই ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য ক'রে অধৈর্য হয়। যে শুদ্ধভক্ত সে কখনও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করে না।'

কেশব অবশ্যই হাজরার মতো ষড়ৈশ্বর্য হাতে রাখতে চাননি—তিনি মনে প্রাণে ঈশ্বরপ্রেমিক। কিন্তু তিনি সংসারের মধ্যে আছেন। মনে হয়, বাসনার সূক্ষ্ম ক্রিয়া তাঁর উপাসনার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ ক'রে মাস্টার মশায়ের মনে ধীরে ধীরে এই বোধটি জেগেছে যে, জগজ্জননীর কৃপার কাছে আর কিছুই কিছু নয়।

দুই

শ্রীরামকৃষ্ণকে মাস্টার মশায়ের দ্বিতীয় দর্শনের দিন (ফেব্রুআরি-মার্চ, ১৮৮২)।[৪]—

শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন নানা প্রশ্ন ক'রে তাঁর খোঁজ নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আচ্ছা, তোমার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে?'

মাস্টার বলেছেন, 'আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটি ভালো লাগে।'

'তা বেশ! একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল।

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৪।৪।

৪ তদেব, ১।১।৪।

নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালোই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটি ধ'রে থাকবে।'

মাস্টার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নে প্রথমেই ধাঁধায় পড়েছিলেন। ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার—সে কী ক'রে হয়! এখন বলেছেন, 'আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল; কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন!'

'মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।'

মাস্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' বুঝতে পারেননি। বিজ্ঞের মতো বলেছেন, 'আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করো; মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।'

মাস্টারের এই 'প্রজ্ঞাবাদ'-ভাষণ শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়েছেন। বলেছেন, 'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই।'

সার কথা বলেছেন—'তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন।'

'চিন্ময়ী প্রতিমা'—মাস্টার মশায়ের কাছে এটি নতুন ভাব ব'লে তিনি কথাটি বুঝতে পারেননি। অবশ্যই কথাটির তাৎপর্য জানলেও প্রতিমাকে চিন্ময়ী ব'লে অনুভব বা উপলব্ধি করা সহজ নয়। অনুভূতি না হ'লে, প্রতিমায় দেবতা যে জাগ্রত জীবন্ত এ চেতনা না হ'লে 'চিন্ময়ী প্রতিমা' কেবল কথার কথা!

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে পড়ে যায়।[৫]—

শ্রীশ্রীমা স্বামী অরূপানন্দকে জননী শ্যামাসুন্দরীর প্রথমবার জগদ্ধাত্রীপূজার বিবরণ দিয়ে শেষে বলেছেন—

"প্রতিমা-বিসর্জনের সময় মা জগদ্ধাত্রী-মূর্তির কানে কানে আবার ব'লে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি তোমার জন্য সমস্ত বছর ধ'রে সব যোগাড় ক'রে রাখব।' পরের বছর মা আমাকে বললেন, 'দেখ, তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পূজা হবে।'"

'মা জগাই!' 'আমার জগাই'!—কী সোহাগের ডাক!

দিদিমা তো আর মাটির মূর্তি দেখেননি! 'চিন্ময়ী প্রতিমা' বললেও বুঝি সব বলা হয় না। এ যে প্রাণে প্রাণে আত্মীয়তার অনুভূতি!

ঠাকুমার কথাও মনে পড়ে।[৬]—

শ্রীরামকৃষ্ণ গর্ভে এলে জননী চন্দ্রাদেবী প্রায়ই দেবদেবী দর্শন করেছেন। একদিন দেখেন একজন হাঁসের উপর চড়ে এসেছেন। রোদের তাপে তাঁর মুখখানি 'রক্তবর্ণ' হয়েছে দেখে চন্দ্রাদেবীর 'মন কেমন' করেছে।—লোহিতানন কমলযোনি সম্পর্কে কী অপূর্ব সিদ্ধান্ত!—তিনি তাঁকে ডেকে বলেছেন, 'ওরে বাপ্‌ হাঁসে-চড়া ঠাকুর, রৌদ্রে তোর মুখখানি যে শুকাইয়া গিয়াছে; ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যা।'

চন্দ্রাদেবীর প্রস্তাব শুনে হাঁসে-চড়া ঠাকুর হেসে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন।

দিদিমা বা ঠাকুমা দেবতা ব'লে সম্ভ্রম ক'রে দূরে সরিয়ে রাখেননি—একান্ত আপনার জনের মতো স্নেহসম্ভাষণ করেছেন। এই স্নেহ, এই

৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮৭।
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, ৪র্থ অধ্যায়।

ভালোবাসা, এই 'আপনার' বোধ দিয়েই বৃন্দাবনে মা যশোদা, রাখালরা, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে অত নিবিড় ক'রে পেয়েছিলেন।

তিন

শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভদ্রাসনে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা-উপলক্ষে গেছেন (১৫. ৪. ১৮৮৩)। কথামৃতের বর্ণনা[৭]—

'সুরেন্দ্রের বাড়ির উঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, অপরাহ্ণ বেলা ছয়টা হইল।

'উঠান হইতে পূর্বাস্য হইয়া ঠাকুরদালানে উঠিতে হয়। দালানের ভিতর সুন্দর ঠাকুর প্রতিমা। মার পাদপদ্মে জবা, বিল্ব, গলায় পুষ্প-মালা। মাও ঠাকুরদালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন।'

এই দালান আলো ক'রে বসে থাকা অনুভব করার প্রেরণা মাস্টার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই পেয়েছেন। মাটি নয়—চিন্ময়ী প্রতিমা!

এদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরদালানের সমুখের উঠানে কয়েকজন বৈষ্ণব প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা পরে বৃন্দাবনলীলা-সংকীর্তন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সে সংকীর্তনে যোগ দিয়েছেন—আখর দিতে দিতে নৃত্য করেছেন। সুরেন্দ্রের পূজাঙ্গন এক অপূর্ব আনন্দে ভরে গেছে।

রাত প্রায় সাড়ে নটা। ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রসাদ পেয়েছেন। সকলেই ঠাকুরদালানে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সমবেত হয়েছেন—এইবার যে যার ঘরে ফিরে যাবেন।

সুরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন, 'আজ কিন্তু মায়ের নাম একটিও হ'ল না!'

বিদায়ের ক্ষণে মাতৃভাবে ভাবিত ভক্ত এত আনন্দ সত্ত্বেও প্রাণের অতৃপ্তির কথা না ব'লে পারেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীর প্রতিমা দেখিয়ে সুরেন্দ্রকে বলেছেন, 'আহা, কেমন দালানের শোভা হয়েছে। মা যেন আলো ক'রে বসে আছেন! এরূপ দর্শন করলে কত আনন্দ হয়! ভোগের ইচ্ছা, শোক, এ-সব পালিয়ে যায়।'

মায়ের নাম নাই বা হ'ল, মা তো বিরাজ করছেন! শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিমায় দিব্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছেন, অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর অন্তরে সেই অনুভূতি সঞ্চারিত করেছেন। সুরেন্দ্র, মাস্টার, আর সকলে অনুভব করেছেন—মা সত্যসত্যই ঠাকুরদালান আলো ক'রে বসে আছেন!

মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী ব'লে বোধে বোধ করার জীবন্ত প্রেরণা!

শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য অনুরক্ত ভক্তের সাধটুকু মেটাবার জন্য নিজেই মায়ের নাম করেছেন।

কথামৃতের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে, অধরলাল সেনের বাড়ি শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনদিনই নিমন্ত্রণ—তিনি ভক্তসঙ্গে অধরের বাড়ি একাধিকবার গেছেন। ১৮৮৪-তে সপ্তমী আর অষ্টমীর দিন যাওয়ার উল্লেখ আছে; অষ্টমীর দিন অধরের বাড়ি যাবার পথে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িও গেছেন।[৮]—১৮৮৩-র নবমীপূজার দিন অধরের বাড়ি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা কিছুটা বিস্তারিত। বর্ণনার কিছু অংশ[৯]—

"শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুরদালানে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া মাকে গান শুনাইতেছেন।

অধর গৃহীভক্ত, আবার অনেক গৃহীভক্ত উপস্থিত, ত্রিতাপে তাপিত। তাই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতাকে স্তব করিতেছেন।

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।৪।১-৩ ৮ তদেব, ২।১৫।১, ২।১৬।১। ৯ তদেব, ৫।১০।১-২।

তার তারিণী। এবার তারো ত্বরিত করিয়ে,
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত, যায় মা প্রাণী ॥...

"শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ির দ্বিতল বৈঠকখানায় গিয়া বসিয়াছেন। ঘরে অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছেন।

"বলরামের পিতা ও সারদাবাবু প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন।

"ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'ও বাবুরা, আমি খেয়েছি ; এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও।'

"অধরের নৈবেদ্য পূজা মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার আবেশে বলিতেছেন, 'আমি খেয়েছি, এখন তোমরা প্রসাদ পাও ?'

"ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, 'মা, আমি খাব ? না, তুমি খাবে ? মা কারণানন্দরূপিণী।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ কি জগন্মাতাকে ও আপনাকে এক দেখিতেছেন ? যিনি মা তিনিই কি সন্তানরূপে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ? তাই কি ঠাকুর 'আমি খেয়েছি' বলছেন ?"

১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর—শ্রীশ্রীবিজয়াদশমী। শ্রীরামকৃষ্ণ চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের বাসাবাড়িতে আছেন। কথামৃতের বর্ণনা[১০]—

"সুরেন্দ্রের বাটীতে ৺দুর্গাপূজা হইয়াছিল ঠাকুর যাইতে পারেন নাই, ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া, তাই সুরেন্দ্রের মন খারাপ হইয়াছে।

"সুরেন্দ্র—বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে)—তা হলেই বা। মা হৃদয়ে থাকুন!

"সুরেন্দ্র মা মা করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে কত কথা কহিতে লাগিলেন

"ঠাকুর সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। মাস্টারের দিকে তাকাইয়া গদগদস্বরে বলিতেছেন, কী ভক্তি! আহা, এর যা ভক্তি আছে!

"শ্রীরামকৃষ্ণ—কাল ৭ টা ৭৷৷ টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে ওখানে এক হ'য়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু-জায়গার মাঝে বইছে!—এ বাড়ি আর তোমাদের সেই বাড়ি!

"সুরেন্দ্র—আমি তখন ঠাকুর দালানে 'মা, মা' ব'লে ডাকছি, দাদারা ত্যাগ ক'রে উপরে চলে গেছে। মনে উঠল, মা বললেন, 'আমি আবার আসবো।' "

চার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে মথুরানাথের জানবাজারের বাড়িতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজামহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ভাবাবেশ আর অফুরন্ত আনন্দের বর্ণনা আছে। কিছু অংশ[১১]—

"মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া নির্ভয়ে আবদার, অনুরোধ ও হেতুরহিত হাস্য-নৃত্যাদির চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরন্তর ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 'বাবার' সেইরূপ অপূর্ব আচরণে প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন! আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও অনুভূতি হইতেছে! দালান জমজম করিতেছে—

১০ তদেব, ৩।২০।১।

১১ ; গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আর বাটীর সর্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে!"

সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনদিন পরমানন্দে কাটবার পর দশমীর দিন 'মথুরবাবুর বাটীর সকলের মনেই যেন এক্‌টা বিষাদের ছায়া—কিসের যেন একটা অব্যক্ত অপরিস্ফুট অভাব—যেন একটা হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত অপরিহার্য আশু বিচ্ছেদাশঙ্কা।'

মথুরানাথ দেবীকে বিসর্জন দেবার কথা যেন ভাবতেই পারছেন না। প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্যোগের আগে পুরোহিত যখন তাঁকে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তখন মা-কে বিদায় দেবার কথা মনে করতেই তিনি কাতর হয়েছেন। পুরোহিত আর একবার তাঁকে সংবাদ দিয়ে ডেকে পাঠালে তিনি বিরক্ত হ'য়ে বলেছেন, 'আমি মা-কে বিসর্জন দিতে দিব না। যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হইবে—খুনোখুনি পর্যন্ত হইতে পারে।'

মথুরানাথ জেদীপুরুষ—তাঁর অমতে কিছু করা যুক্তিযুক্ত নয়। সকলে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি অনড়। বললেন, 'কেন? আমি মা-র নিত্যপূজা করিব। মা-র কৃপায় আমার যখন সে ক্ষমতা আছে, তখন কেন বিসর্জন দিব?'

রেগে গেলে মথুরানাথের দিক্-বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। এখন উপায়!

কজন ভয়ে ভয়ে মথুরানাথের পত্নী জগদম্বা দেবীকে খবর পাঠিয়েছেন। জগদম্বা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিয়ে একটা উপায় করতে বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরানাথের কাছে যেতেই তিনি বলেছেন, 'বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মা-কে প্রাণ থাকিতে বিসর্জন দিতে পারিব না। বলিয়া দিয়াছি, নিত্যপূজা করিব। মা-কে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?'

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরানাথের বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছেন, 'ওঃ—এই তোমার ভয়? তা মা-কে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখনো থাকতে পারে? এ তিনদিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে ব'সে তোমার পূজা নেবেন।'

এ প্রাণজুড়ানো কথায় অশান্ত ভক্তের মন শান্ত হয়েছে—মথুরানাথ হৃদয় ভরে জননীর দিব্য আবির্ভাব অনুভব করেছেন।

মা চিন্ময়ী! পূজার দালানে প্রতিমায় তিনি মূর্তিমতী প্রাণময়ী এ অনুভূতি হ'লে অশেষ আনন্দ হয়। পূজাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গে ভক্তরা সে অনুভূতির আনন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন, সুকৃতি বা আধার অনুসারে নিজেরাও তার কিছুটা স্বাদ পেয়েছেন। হৃদয়ে যে তিনি বিরাজ করছেন, এ বোধটি হ'লে জননীর নিত্যসঙ্গ পাওয়ার যে আনন্দ হয়, তা আরও গভীর, আরও নিবিড়। শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে বা উপদেশক্রমে সে পরম আনন্দের চেতনা ভক্ত আর অনুরাগীদের অন্তরে সঞ্চার ক'রে দিতে চেয়েছেন। তাঁরাও তাঁর মধ্যে সেই দিব্য আনন্দের প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে জীবন সার্থক করেছেন।

'আনন্দমঠ'-এর মাতৃমূর্তি

শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম একটি ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ মৃন্ময় দেশের মধ্যে চিন্ময়ী সত্তা আবিষ্কার ক'রে জগৎ-সমক্ষে দেশের মাতৃরূপ তুলে ধরেন এবং দেশকে হিন্দু দেবদেবী—জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রতিমূর্তি ব'লে ঘোষণা ক'রে দেশকে একটি আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করেন। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের কাছে দেশই হ'ল মা, দেশই তাঁদের একমাত্র উপাস্য, তাঁদের 'একমাত্র দেবতা' এবং তাঁরা হলেন দেশমাতৃকার 'সন্তান'। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-সংঘের পরিচয় হ'ল 'সন্তানদল'—দেশ-মাতৃকার মুক্তিই তাঁদের একমাত্র কামনা, বাসনা ও সাধনা। এজন্যই তাঁরা দৃঢ়তার সংগে বলতে পারেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—"। মঠাধীশ সত্যানন্দ তাই বলেন, "আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেন না, সেই সুজলা-সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্ভুক্ত 'আমার দুর্গোৎসব' (১২৮১, কার্ত্তিক) ও 'একটি গীত' (১২৮১, ফাল্গুন) নামক রচনায় যা বীজ, আনন্দ-মঠে তা মহীরূহ হ'য়ে জগতের সামনে দেদীপ্যমান। কমলাকান্তের ধ্যানে, 'বন্দে মাতরম্' গানে এবং সত্যানন্দের সাধনায় দেশের মাতৃরূপ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। কমলাকান্তের মা, 'বন্দে মাতরম্'-এর মা এবং আনন্দমঠে প্রতিষ্ঠিত মাতৃমূর্তি মূলতঃ এক ও অভিন্ন।[১] 'বন্দে মাতরম্' সূত্র, আনন্দমঠ তার ব্যাখ্যা। বলা বাহুল্য, আনন্দমঠে বর্ণিত মাতার ত্রিমূর্তি ও 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ওপর কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' গীতিনাট্য (১৮৭৩), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'দশমহাবিদ্যা' (বঙ্গদর্শন, ১৮৭৩/১২৮০, আশ্বিন) এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অধিভারতী' স্তোত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। পাশাপাশি ফেলে এই লেখাগুলি পড়লে তাদের সাদৃশ্য নজরে পড়বে।[২]

কমলাকান্তের মতোই মঠাধীশ সত্যানন্দ মাতৃ-মূর্তি দর্শন করেছেন। জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গার মধ্যে তিনি দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূর্তি দেখেছেন। ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে তিনি দেশের ওপর মাতৃত্ব ও দেবত্ব আরোপ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম জন্মভূমির ওপর দেবত্ব আরোপ করেন এবং জগন্মাতা ও দেশমাতাকে একীভূত ক'রে সর্বমঙ্গলা, সর্বার্থ-সাধিকা, শরণ্যা, ত্র্যম্বকা, গৌরী, নারায়ণী জগন্মাতার স্তবগানে দেশমাতার বন্দনা করেন। বঙ্কিম জানতেন যে, ভারতবাসী আকাশ, জল, সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ প্রভৃতিকে ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ মনে ক'রে আরাধনা করে—সুতরাং জন্মভূমি দেশকে দেবতারূপে আরাধনা করতে তারা আপত্তি করবে না। মূর্তিপূজায় যাঁরা আস্থাবান্ নন—তাঁরাও ঐ মূর্তিকে 'Symbolism'

---

১ বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান প্রবন্ধকারের ধারাবাহিক রচনা 'আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' দ্রষ্টব্য। নতুন ভারত—১ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা।

২ বিশদ বিবরণের জন্য 'নতুন ভারত', ১ম বর্ষ, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা দ্রঃ।

মাত্র মনে ক'রে দেশের প্রতীকরূপে গ্রহণ করবেন।[৩]

মঠাধীশ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মাতৃমূর্তি দেখাতে নিয়ে গেলেন। মহেন্দ্র দেখলেন—"এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী-মূর্তি।" মহেন্দ্রের প্রশ্ন—"ইনি কে?" সত্যানন্দের উত্তর—"ইনি কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।" ইনি হলেন অতীত ভারতের মাতৃরূপ—**মা যা ছিলেন।** অতীত ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শ্রী-সমৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, সামরিক বল—সবদিকেই ভারত ছিল সবার শ্রেষ্ঠ। জগদ্ধাত্রী হলেন সেই অতীত গৌরবোজ্জ্বল ভারতের প্রতীক। অরণ্যময় প্রদেশে ঔপনিবেশিকদের প্রথম বসতি স্থাপন এবং তৎসঙ্গে দেশের স্বাভাবিক শস্য-সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য দেশবাসীর আর্থিক উন্নতির চিহ্ন প্রতিফলিত হয়েছে জগদ্ধাত্রী-মূর্তির মধ্যে।[৪]

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস ও বিবর্তনের পশ্চাতে যে মহাশক্তি বিদ্যমান—জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা হলেন সেই শক্তিরই নানারূপ। বিপিনচন্দ্র পাল স্বদেশী যুগে লিখছেন যে, যুগের প্রভাবে "The so-called idolatry of Hinduism is passing through a mighty transformation. The process started really with Bankim Chandra, who interpreted the most popular of the Hindu goddesses as symbolic of the different stages of national evolution. Jagatdhatri—riding a lion which has the prostrate body of an elephant under its paw—represent the motherland in the early jungle-clearing stage. This is, says Bankim Chandra, the mother as she was."[৫] বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'Soul of India' গ্রন্থে বলছেন যে, বিশ্বের নিয়ামক মহাশক্তি পশ্চাতে থেকে জাতি ও সমাজের বিবর্তনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। সৃষ্টির প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রবল বিরূপতার যুগে বন্য পশুর আবাসস্থল গভীর অরণ্যসংকুল অঞ্চলাদি পরিষ্কার ক'রে বাসস্থান নির্মাণের জন্য মানুষ যখন পশুদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, মহাশক্তি তখনই প্রথম প্রকাশিতা হন। হিংসাপরায়ণ পশুশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত এই যুগে মহাশক্তি ভয়ঙ্করী পশুশক্তি হিসাবে আবির্ভূতা হ'য়ে বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করেছিলেন। হিন্দুরা মহাশক্তির এই প্রকাশকে জগদ্ধাত্রী-মূর্তিতে ধরে রেখেছে। জগদ্ধাত্রী সিংহারূঢ়া এবং এই সিংহ কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর পশুশক্তিরই প্রতীক নয়—ভয়ঙ্কর পশুশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সিংহের সম্মুখ-ভাগের থাবা রয়েছে পরাজিত হস্তীর ওপর এবং এই হস্তী হ'ল অধুনালুপ্ত ম্যামথ (বৃহদাকার হস্তী) এবং ম্যামথ-যুগের (Mammoth age) পরিচায়ক—যে যুগে মানুষ নয়, বন্য পশুরাই জগতের ওপর কর্তৃত্ব ক'রত। এই যুগে বনের পশু এবং মানুষের মধ্যেকার পশুশক্তির মধ্যে সংগ্রাম চ'লত নিরবচ্ছিন্নভাবে। এই যুগে ভূখণ্ডের আধিপত্য নিয়ে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোন লড়াই তখনও শুরু হয়নি। পশু ও মানবের এই সংগ্রামের দিনে মানুষের আবাসস্থলে দেবী জগদ্ধাত্রীর সিংহাসন স্থাপিত হয়নি—মানুষ

৩ বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, (১৩২৭), পৃঃ ৩২৫। ৪ ঐ, পৃঃ ৩১৯।

৫ 'The spirit of Indian Nationalism', B. C. Pal.

তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানুষের অনধিগম্য এমন একটি স্থানে, যেখানে প্রকৃতি স্বমহিমায় ভয়ঙ্করী ও বন্য পশুরা পূর্ণ স্বাধীন। এই যুগ প্রবল সংগ্রামের যুগ, কিন্তু সে-সংগ্রাম মানুষে মানুষে নয়—মানুষে এবং পশুতে।[৬]

এরপর এক অন্ধকার সুরঙ্গ পথ ধরে ব্রহ্মচারী এবং মহেন্দ্র "ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে" উপস্থিত হলেন। ক্ষীণালোকে দেখা গেল এক কালীমূর্তি—"**মা যা হইয়াছেন**।" "কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।"

স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেশের বুকে নেমে এসেছে অমাবস্যার ঘন অন্ধকার। সমগ্র দেশ অন্ধকার, হৃতসর্বস্বা এবং নগ্নিকা। দেশ জুড়ে চলছে দুর্ভিক্ষ—দেশমাতা শুধু কঙ্কালমালিনীই নন—কঙ্কালদেহিনী। আত্মরক্ষার কোন শক্তিই তাঁর নেই—অস্ত্র হিসাবে তাঁর সম্বল খেটক এবং খর্পর—ঢাল ও মৃৎপাত্র। এতো এক সীমাহীন দুর্দশারই চিত্র—ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হ'ল বঙ্কিম-কল্পিত এই কালীমূর্তি। ভারতের রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, বিদ্যাচর্চা—সর্বস্তরেই সেদিন এক সীমাহীন দুর্দশা ও প্রবঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠেছিল। নিজ বাসভূমে ভারতবাসী সেদিন পরবাসী। রাজনৈতিক অধিকার নেই, সামাজিক মর্যাদা নেই, সরকারী চাকরী মিলছে না—ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি—এমনকি ভারতবাসীর চরিত্র, সততা এবং ধর্ম সম্পর্কেও বিদেশী শাসকদের মনে তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা। ভারতবাসীর প্রাণের কোন মূল্য নেই—তাদের লাথি মেরে মেরে ফেললেও কোন বিচার হয় না। ইংরেজের স্বৈরাচারী অর্থনৈতিক নীতিতে স্বর্ণপ্রসূ ভারত নেমে এসেছিল দারিদ্র্যের শেষ সীমায়। ধ্বংস হয়েছিল গ্রামের স্বনির্ভর অর্থনীতি ও কুটির-শিল্প। ইংল্যাণ্ডে তখন শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির ওপর চাপানো হ'ল করের দুঃসহ বোঝা, আর ইংল্যাণ্ডজাত দ্রব্যাদি ভারতে প্রবেশ করতে লাগল বিনাশুল্কে। ভারত পরিণত হ'ল ইংল্যাণ্ডের খোলা বাজার ও কাঁচামাল সরবরাহের উৎসে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টগোমারী মার্টিন এক সাক্ষ্যে বলেন, "গত পঁচিশ বছর ধরে আমরা ভারতকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য করেছি। আমাদের পশমজাত দ্রব্য বিনাশুল্কে, তুলাজাত দ্রব্য শতকরা আড়াই ভাগ শুল্কে এবং অন্যান্য দ্রব্য এই অনুপাতে ভারতকে নিতে বাধ্য করেছি; অথচ ঠিক এই পঁচিশ বছর ধরে আমরা ব্রিটেনে রপ্তানীকৃত ভারতীয় পণ্যের ওপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছি, এই শুল্ক ১০% থেকে ২০%, ৩০%, ৫০%, ১০০%, ৫০০% এমনকি ১০০০% পর্যন্ত উঠেছে।"[৭] সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রিক শহরের দুর্দশা চরমে ওঠে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদকে লণ্ডনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীনে সেই শহর জনহীন শ্মশানে পরিণত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান পার্লামেণ্টারী তদন্ত কমিটির কাছে ঢাকা শহরের অবস্থা বর্ণনা ক'রে বলেন, "ব্রিটিশ আমলে ঢাকার লোকসংখ্যা ১৫০,০০০ থেকে ৩০,০০০-৪০,০০০-এ এসে ঠেকেছে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে ইংল্যাণ্ডে মসলিন চালান যেত ৩০ লক্ষ টাকার। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই চালান একেবারে বন্ধ হ'য়ে

৬ 'The Soul of India', B. C. Pal, (1958), pp. 120-21.
৭ 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা', নরহরি কবিরাজ, (১৯৬১), পৃঃ ৫৯।

যায়। যুগ যুগ ধরে তাঁত-শিল্পের ওপর নির্ভর ক'রে যে হাজার হাজার কারিগর বেঁচে থাকত তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এককালে যে-সব পরিবার সঙ্গতিপন্ন ছিল, তারা আজ শহর ছেড়ে গ্রামে জীবিকার খোঁজে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।··· এটা কেবল ঢাকা শহরের কথা নয়, সমস্ত জেলাতেই এই ধ্বংসের কাহিনী।"[৮] ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক বলছেন, "The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of India." ডিগবী সাহেব তাঁর 'Prosperous British India' গ্রন্থে বলছেন যে, বাংলা ও কর্নাটকের বিপুল ধনভাণ্ডার থেকেই ইংল্যাণ্ডের শিল্পসমৃদ্ধির সূচনা হয়েছে। কৃষকের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা ছিল না। অনাহারে, অর্ধাহারে ও করভারে পশুর মতো জীবন কাটত তাদের। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে এ-দুর্দশা আরও চরমে ওঠে—তার ওপরে আছে শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও বন্যা। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হ'ল—পুরানো জমিদারশ্রেণীর স্থলে এল ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট এক ভুঁইফোঁড় সম্প্রদায়। কৃষকের দুর্দশা বৃদ্ধি পেল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশ থেকে ৮০,০০,০০০ টাকা ভূমিকর হিসেবে আদায় হ'ত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তার পরিমাণ দাঁড়াল ১,৫০,০০,০০০ টাকা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তা হ'ল ২,০৩,০০০০০ টাকা।[৯] এত শোষণ, এত রাজস্ব—তবু বাংলার ছোটলাট চার্লস ইলিয়টের কথা শুনলে আশ্চর্য লাগে যে, ভারতের কৃষিজীবী প্রজার অর্ধেকও সারা বছরে একদিন পেটভরে খেতে পায় না—তারা জানে না পেটভরে খাওয়ার কি সুখ।[১০] এর ওপরে আছে দুর্ভিক্ষের ভয়াল রূপ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহতার পর ১৮০১ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দশ লক্ষ, ১৮২৫ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে পাঁচ লক্ষ এবং ১৮৫০ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ ব্রিটিশ ভারতে দুর্ভিক্ষে মারা যায়।[১১] ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষে ২ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৬৫-৬৬-তে উড়িষ্যা, বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে ২০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ১৮৬৮-৭০-এ পশ্চিম-উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের দুর্ভিক্ষে ১৪ লক্ষ প্রাণ নাশ হয়। ১৮৭৬-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম-উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলিত হয়। এতে মহারাষ্ট্রের ৮ লক্ষ, মাদ্রাজের ২৫ লক্ষ, উত্তর প্রদেশের ১২ লক্ষ এবং মহীশূরের প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।[১২] ডিগবী সাহেব জানাচ্ছেন যে, বিগত ১৭৯৩ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ একশ' সাত বছরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহে মোট ৫০ লক্ষের বেশী লোক নিহত হয়নি—কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গিয়েছিল।[১৩]

সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে দেশের এই শোচনীয় হৃতসর্বস্ব অবস্থা—শিক্ষা-সংস্কৃতি কৃষ্টি-সভ্যতা অবলুপ্ত, সীমাহীন বেকারত্ব, সরকারী

৮ ঐ, পৃঃ ৬০।

৯ দ্রঃ 'দেশের কথা', সখারাম গণেশ দেউস্কর, (১৩৭৭), পৃঃ ৬৩।

১০ ঐ, পৃঃ ১৪। ১১ ঐ, পৃঃ ১০।

১২ বিশদ বিবরণের জন্য 'British Paramountcy and Indian Renaissance', Vol I, Edi—R. C. Majumdar, pp. 828-37 দ্রষ্টব্য।

১৩ 'দেশের কথা', পৃঃ ১১।

পীড়ন, শোষণ, অপশাসন, দুঃসহ করভার, দুর্ভিক্ষ ও রোগ মহামারীতে দেশ স্থবির—সোনার দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে—দেশের মানসিক দীপ্তি নিষ্প্রভ—দেশমাতৃকা তাই হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা, অন্ধকার-সমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী ও কঙ্কাল-মালিনী—নিজের শিব তাই পদতলে দলিত করছেন। কিরণচন্দ্রের 'ভারতমাতা' এবং অক্ষয়-চন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'-র 'ধূমাবতী দশা'-র সংগে মায়ের এই বর্ণনা মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন—রুদ্রাণী অন্ধকার-সমাচ্ছন্না, নৃমুণ্ডমালিনী কালী—সেই মুণ্ডগুলি থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে—মা শিবের ওপর নৃত্যরতা। বঙ্কিমের মতে—মা যা হয়েছেন। তিনি কালিমাময়ী কারণ তিনি এখন নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁর গলার মুণ্ডমালা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মৃত সন্তানদের মুণ্ডের সমষ্টি। মায়ের পাশে দণ্ডায়মান শৃগাল সেই মুণ্ড-নির্ঝরিত রক্ত পান করছে এবং এটা হ'ল ভারতীয় সমাজজীবনের পতন ও ধ্বংসের প্রতীক। ভূপতিত শিবকে তিনি দলন করছেন অর্থাৎ ভারতের দেবতা আজ পদলুণ্ঠিত।[১৪] লালা লাজপৎ রায় রক্ত-পানরত শৃগালকে ব্রিটিশ স্বৈরাচারীদের সংগে তুলনা করেছেন।[১৫] বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'The Soul of India' গ্রন্থে বলছেন—পশু ও মানুষের সংগ্রামের যুগ অতিক্রম ক'রে মানুষ এখন বিবর্তনের নূতন স্তরে এসে হাজির হয়েছে। এটা হ'ল বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে লড়াইয়ের যুগ এবং কালী হলেন তারই প্রতিমূর্তি। ভারতীয়েরা কালীমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে রুদ্রাণী বেশে—তিনি ক্রোধে কালিমাময়ী কৃষ্ণবর্ণা এবং ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় মত্ত হ'য়ে জ্ঞানহারা ও অন্ধকার-সমাচ্ছন্না। এ সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর লক্ষ্য নিছক হত্যা করা নয়—রক্ষা করা, ধ্বংস করা নয়—গড়ে তোলা, পৃথিবীকে প্রেম, সুন্দর ও শ্রীতে পূর্ণ করা এবং এজন্যই তিনি মঙ্গলরূপী শিবের ওপর দণ্ডায়মান।[১৬]

ব্রহ্মচারী এরপর মহেন্দ্রকে নিয়ে "দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন।" আরোহণ—অবতরণ নয়—অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী ও দুর্গামূর্তি যে তলে আছেন কালীমূর্তি তারও নীচ তলে আছেন। সোপানশ্রেণী আরোহণ ক'রে ব্রহ্মচারী দুর্গামূর্তির কাছে যাচ্ছেন—এর দ্বারা জাতীয় জীবনের বাধা বিঘ্ন ও পতন-অভ্যুদয়ের কথাই ব্যক্ত হচ্ছে।[১৭] সহসা ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রের "চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভূজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন।"—এই বর্ণনাটিও লক্ষণীয়। জগদ্ধাত্রী-মন্দির অন্ধকার না আলোকোজ্জ্বল তার কোন উল্লেখ নেই—তবে মনে হয় অন্ধকার নয়। কালী-মন্দির "এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল।" আর দশভুজা মন্দির "নবারুণকিরণে" উজ্জ্বল। এও সেই জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি—উজ্জ্বল অতীত, অন্ধকার বর্তমান এবং আলোকদীপ্ত "প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত" অনাগত ভবিষ্যৎ-এর পরিচায়ক

ব্রহ্মচারী সেই মাতৃমূর্তিকে প্রণাম ক'রে

১৪ 'The Spirit of Indian Nationalism', Pal.
১৫ 'Young India, Lajpat Rai, (1968), pp. 161.
১৬ 'The Soul of India, Pal, pp. 122-23.
১৭ 'বন্দে মাতরম্', জগদীশ ভট্টাচার্য, (১৯৭৮), পৃঃ ১২০।

বললেন, "এই মা যা হইবেন। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শক্রবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।...দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী, শক্রবিমর্দ্দিনী— বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" সত্যানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে এই হ'ল আগামী দিনের ভারতবর্ষ। আফিংখোর কমলাকান্তও ধ্যান করছেন মায়ের এই গৌরবোজ্জ্বল মূর্তি। তাঁর মা হলেন—"রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত, বীরজনকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত ! ··· দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" সত্যানন্দ ও কমলাকান্ত উভয়েই এই মাতৃমূর্তিকে "সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে" ব'লে প্রণাম জানাচ্ছেন। বস্তুতঃ কমলাকান্ত ও সত্যানন্দের মাতৃমূর্তি ও সাধনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র লিখছেন, "কমলাকান্ত যে প্রতিমার পূজা করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সত্যানন্দ সেই প্রতিমার আবাহন গাহিয়াছিলেন। উভয়ের মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক। একজন ডাকিতেছেন 'মা' 'মা' রবে, আর একজন গাহিতেছেন 'বন্দে মাতরম্'। একজন ভক্তের প্রতিমা—'রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।' (কমলাকান্তের দপ্তর, একাদশ পরিচ্ছেদ)। আর একজন ভক্তের প্রতিমাও তাই—'দশ ভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত।' (আনন্দমঠ, প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ)। একজন বলিতেছেন, 'এ-মূর্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না, কাল দেখিব না,···কিন্তু একদিন. দেখিব।' আর একজন বলিতেছেন 'এই মা যা হইবেন।' একজন বলিতেছেন, 'এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা'—আর একজন গাহিতেছেন—'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।' একজন যে হৃদয় লইয়া গাহিতেছেন 'জয় জয় ভক্তি শক্তি-দায়িকে,' আর একজনের হৃদয়েও সেই সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া শব্দতরঙ্গ উঠিতেছে-

'বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।'

তাই বলিতেছিলাম—কমলাকান্ত ও সত্যানন্দের মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক।"[১৮]

বলা বাহুল্য, কমলাকান্ত হলেন সত্যানন্দের পূর্বসূরী। কমলাকান্তে বঙ্কিম জাতি-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিম দেখাচ্ছেন কোন্ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ ক'রে জাতি-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সত্যানন্দ বহুলাংশে কমলাকান্তের পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। জাতি-প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সৎ হ'তে হবে। ত্যাগ করতে হবে অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ও হিংসা (আমার দুর্গোৎসব) —জাতির ঐক্য চাই, বিদ্যা চাই, চাই গৌরববোধ (একটি গীত)। আনন্দমঠের সন্তানদের কাছে অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ছিল ধর্মবিচ্যুতির সামিল, তাঁরা কমলাকান্তের মতোই মাতৃহীন,

১৮ বঙ্কিম-জীবনী, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৩।

'মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?'—একটি চিরন্তন সত্য,—জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন তাঁরা—"যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে"—সেদিনই দেখা যাবে মায়ের সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি—অনাগত ভারতকে।

কমলাকান্ত ও সত্যানন্দের মধ্যে এত মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট অমিল বিদ্যমান। কমলাকান্ত দুর্গার মধ্যে দেখেছেন অতীতের দেশ-মাতৃকাকে—যিনি "এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।" সত্যানন্দের মা হলেন আগামী দিনের ভারতবর্ষ। সন্তানদলের ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে জন্ম নেবে নূতন ভারত—যা হবে ঐশ্বর্যে দীপ্ত, জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, শৌর্যে অপরাজেয়, এবং সেখানে ধনশক্তি (লক্ষ্মী), জ্ঞানশক্তি (সরস্বতী), ক্ষাত্রশক্তি (কার্ত্তিকেয়) ও গণশক্তির (গণ-দেবতার) এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হবে।[১৯] বিপিনচন্দ্র পালের রচনাতেও এই বক্তব্য ফুটে উঠেছে।[২০] তাঁর মতে দুর্গা হলেন উন্নত ও সুসংবদ্ধ জাতীয়তা ও সামাজিক চেতনার প্রতীক।[২১] তিনি লিখছেন, "Durga···has always symbolised the fully realised national life and consciousness in the religious imagination and symbolism of the Hindus. Durga is a form of *Prakriti*, like Jagaddhatree or Kalee. While these two represent, however, the spirit of national life and evolution at the first two stages, Durga represents the same spirit at the last and fully evolved stage of that life."[২২]

আনন্দমঠে মায়ের ত্রি-মূর্তি ব্যতীত আরেকটি মূর্তি আছে—বস্তুতঃ সেটিই প্রথম মূর্তি। "অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ" মধ্যে সেই মূর্তি স্থাপিত। "এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্তক মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ-রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।···

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে, দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'আমরা যার সন্তান।'

মহেন্দ্র। কে তিনি?"

সত্যিই তো এ মাতা কে? বহু জনে এ প্রশ্ন তুলেছেন—নানা অর্থও করেছেন তাঁরা। এ মাতা যে লক্ষ্মী বা সরস্বতী নন, তা আনন্দমঠের বর্ণনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এ মাতা 'বন্দে মাতরম্'-এর মাতা থেকেও পৃথক্, কারণ

১৯ শ্রীত্রিপুরারঞ্জন সেনশাস্ত্রী, 'বিদ্যার্থী রঞ্জন পত্রিকা', বন্দে মাতরম্ শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃঃ ২০; বিভিন্ন দেব-দেবীমূর্তির অর্থের জন্য Bhavan's Journal, Annual Number, 1971, pp. 189—203 দ্রষ্টব্য।

২০ 'The Soul of India', Pal, pp. 123-27.

২১ ঐ, পৃঃ ১২৪।

২২ ঐ, পৃঃ ১২৭।

বন্দে মাতরম্-এর মাতা দেশ ও সন্তানদের থেকে অভিন্ন, কিন্তু "বিষ্ণুর অঙ্কোপরি" মাতা সন্তানদের থেকে বহুদূরে অবস্থিতা। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলছেন যে, মা যখন কালাধীন, তখন তাঁর তিনমূর্তি—জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা—তিনি তখন বঙ্গমাতা বা ভারতমাতা; আর যখন তিনি কালাতীত তখন তাঁর এই শাশ্বত মূর্তি—"তিনি জগৎপালক বিষ্ণুর অঙ্কাশ্রিতা ধরণী"—'ধরণীং ভরণীং মাতরম্'। সন্তানেরা বিষ্ণুর উপাসক—ধরণীর শত্রু মধুকৈটভকে হত্যা ক'রে বিষ্ণু ধরণীকে রক্ষা করেছেন ও নিজের কোলে আশ্রয় দিয়েছেন।[২৩] বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন, "The first and primal form of the Mother is···in the very bosom of the Supreme. That is her eternal place and being. In Hindu symbolism, she is seated, in this form, on the lap of Narayana or Mahavishnu. Mahavishnu represents the first step, so to say, in the process of the eternal self-differentiation of the Absolute, —within his own being. Here the Mother is undifferentiated *Prakriti.* She is both Radha and Shakti. Here is it not our Mother as differentiated from your Mother, but the Mother of all that is to be. Here the Mother is the Mother of the unborn universe, the Spirit of Cosmic Evolution, both human and non-human."[২৪] তাহলে দেখা যাচ্ছে 'বন্দে মাতরম্'-এর মাতা, বিষ্ণুর অঙ্কোপরি মাতা এবং জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই—একই মা নানা রূপে নানা স্থানে বিদ্যমান। বিপিনচন্দ্র পাল বলছেন যে, বিষ্ণুর অঙ্কোপরি সেই মোহিনী মূর্তি হলেন দেশমাতা—সন্তান তো তাঁর ইচ্ছামত মাতৃরূপ কল্পনা ক'রে নেবেন, তাঁর আরাধ্যাকে বেছে নেবেন নিজ মানসিকতা অনুসারে। তিনি বলছেন যে, আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকে মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন ক'রে আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানব-প্রীতি ও বিশ্বমানবের সেবাদর্শের সংগে মিলিয়ে দিয়েছেন। মহাবিষ্ণু, নারায়ণ বা বিশ্বমানবকে বাদ দিয়ে দেশমাতৃকার পূজো হয় না—এটা আনন্দমঠের একটা প্রধান কথা। আনন্দমঠ আমাদের মনে প্রবল স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান জাগিয়ে দেয়, কিন্তু সেই স্বদেশপ্রীতি বা স্বাজাত্যাভিমান বিশ্বপ্রীতি ও বিশ্বকল্যাণ কামনা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে যে সফলতা আহরণ অসম্ভব সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পরিণামের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রচার করেছেন।[২৫] তাহলে দেখা গেল—আনন্দমঠের স্বদেশপ্রেমে কোন সংকীর্ণতার স্থান নেই এবং বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতির ওপরে লোকশ্রেয়কে স্থান দিয়েছেন।

বিষ্ণুর অঙ্কাশ্রিতা এই মাতৃমূর্তি সম্পর্কে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। বঙ্গদর্শন এবং আনন্দ-মঠের তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত সকল সংস্করণেই—"বিষ্ণুর অঙ্কোপরি" স্থলে ছিল—"সর্বোপরি, বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুল রত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্ত্তি···"—অর্থাৎ

২৩ বঙ্কিম-সরণী, প্রমথনাথ বিশী, (১৩৮৪), পৃঃ ১৯০।
২৪ The Soul of India, pp. 119-20.
২৫ নবযুগের বাংলা, পাল, (১৩৭৯), পৃঃ ১৮৫।

দেশমাতৃকা যে সবার ওপরে এবং দেশপ্রেমই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এটাই বঙ্কিম প্রথমে জানাতে চেয়েছিলেন। পরে দেশমাতৃকাকে বিষ্ণুর ক্রোড়ে স্থাপন ক'রে দেশপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, "আনন্দমঠের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা স্বদেশপ্রেম। বঙ্কিমবাবুর পূর্বে আর কেহ কখনও স্বদেশকে বিষ্ণুর অঙ্কস্থায়িনী মোহিনীমূর্তি মাতৃরূপে কল্পিত করিয়া স্বদেশ ভক্তিকে এত উচ্চাসনে উন্নীত করিয়াছিলেন কিনা জানি না।"[২৬]

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সেই বর্ণাঢ্য দিনগুলিতে বঙ্কিম-প্রদর্শিত এই মাতৃমূর্তি আপামর ভারতবাসীকে দেশপ্রেমের মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিপিন পাল, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র—সকলেই বঙ্কিম-কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের এক ক্রান্তিলগ্ন স্বদেশী যুগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা লিখছে, "বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম কেবল মাতৃভূমিকে দেবত্বে উন্নীত করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই; লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবীদের স্থানভ্রষ্ট করিয়া মাতার সিংহাসনমঞ্চ তদূর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছেন। বিধাতার কৃপায় আমাদের এই উদীয়মান 'ন্যাশান্যালিজম' (জাতীয়তা) শিক্ষিত সমাজে সেই ধর্ম্মে পরিণত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রের ঋষি নহেন, এই ধর্ম্মের apostle, এ-কথা আমাদের যেন স্মরণে থাকে।"[২৭]

২৬ বঙ্গদর্শন, ১৩১৫, বৈশাখ।

২৭ বীরেশ্বর গোস্বামী, 'সাহিত্য', ১৩১৪, অগ্রহায়ণ

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্

স্বামী জীবানন্দবিরচিতম্

সৃষ্টিসুপালননাশন-কারিণি শাশ্বতি মঙ্গলময়ি শক্তে
মামুদ্ধর দনুজহন্ত্রি প্রণমামি সদাম্ব দুর্গে ত্বাম্ ॥১॥
রম্যকান্তে সুখদাত্রি ভীষণদেবরিপুনিহন্ত্রি প্রশান্তে।
ত্রিনেত্রদিব্যাস্ত্রধরে শুচিভূষণাবৃতে সুপূজ্যে ॥২॥
দেশপালিনি কৃপাময়ি জনহৃদয়বাসিনি ভক্তিসন্তুষ্টে।
সর্বদেবসমন্বিতে মহেশ্বরি চরণং তে বন্দে ॥৩॥

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকণা

স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত

১৯২৭ খৃঃ জানুআরি মাসে সারগাছিতে সরসীলাল সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তদের অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবা কিছুদিন চা-পানের পর তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিতেন। একদিন বলিতেছেন: "রিলিফের কাজের শেষে অনাথ আশ্রমটি কিছুদিন মহুলায় থাকার পর, ১৪ বৎসর জমিদারের (মধুসূদন বর্মণীর) বাড়ি ছিল। এখন সে বাড়ির দোতলাটা পড়ে গেছে, একতলারও ভগ্নাবস্থা। ঐ বাড়ির একপাশে জমিদারের গোমস্তা একখানি ঘরে থাকত, আর সমস্ত বাড়িটাই আশ্রমের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। ১৯১২ খৃঃ আশ্রমটিকে ওখান থেকে এখানে আনা হয়।

"সারগাছি অঞ্চলে সাধারণ মানুষ আমাকে 'দণ্ডীঠাকুর', 'দণ্ডীবাবা' বা 'বাবা' ব'লত। শোনা যায়, আমার আগে মহুলা গ্রামে গঙ্গাতীরে এক সাধু থাকতেন। তাঁকে ঐ অঞ্চলের লোকেরা 'দণ্ডীবাবা' ব'লে ডাকত। ঐ সন্ন্যাসীর প্রতি স্থানীয় লোকেদের বড়ই প্রীতি ছিল। তিনি দেহরক্ষা করলে গ্রামবাসীরা বিশেষভাবে তাঁর অভাববোধ করেন। আমাকে পেয়ে তাদের সেই অভাব দূর হ'ল ও আমাকে সেই পুরানো নামেই ডাকতে থাকে।

"একবার, ১৮৯৮ খৃঃ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে, এই দণ্ডীবাবা নাম নিয়ে বড় মজার ঘটনা ঘটে। আমি তখন পুরানো আশ্রমে (শিবনগরে)। আশ্রমের জন্য সৈয়দাবাদ অঞ্চল থেকে তিনশ' মন কয়লা আনতে হবে। বহু গরুর গাড়ি দরকার, একসঙ্গে পাওয়া কঠিন। বর্তমান আশ্রমভূমির জমিদার হাজিশেখ আব্দুল আজিজের বাবা হাজিশেখ মহরম আলির সাহায্য চাইলাম। তিনি খান পঁচিশ গাড়ি যোগাড় ক'রে দিলেন বটে, কিন্তু গাড়োয়ানরা সহরে যেতে একেবারে নারাজ। শেষে রফা হ'ল দণ্ডীবাবাকে অর্থাৎ আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে, আর শেষরাত্রে রওনা হ'য়ে সকালেই সৈয়দাবাদ পোঁছতে হবে। রাত ২/২৷৷টা নাগাদ গাড়োয়ানরা গাড়ি যুতে এসে ডাকাডাকি করছে 'দণ্ডীবাবা' 'দণ্ডীঠাকুর'। আমি তখন জেগেই ছিলাম।

"সে-সময় আমি প্রায়ই সারা রাত জাগতাম। রাত্রে পড়াশুনা, প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতি কাজ চ'লত। দিনের বেলা আশ্রমের কাজকর্ম, অনাথ বালকদের দেখাশুনা—এতেই দিন কেটে যেত। স্থির হ'য়ে বসে লেখাপড়া করবার সময় কোথায়? কাজেই রাত্রে ছেলেরা ঘুমুলে দিনের ও সন্ধ্যার কাজকর্মের জের চুকে গেলে তবে ফুরসত মিলত। লিখতে লিখতে পড়তে পড়তে কত দিন সকাল হ'য়ে গেছে। এই-রকম কত রাত্রি উপরি উপরি জেগে কেটে গেছে। লেখবার সময় অন্তর থেকে কেবলই ভাব ও ভাষা জুগিয়ে আসত, অথচ এদিকে ফরসা হ'য়ে গেছে, বাতি টিমে হ'য়ে গেছে, ছেলেদের তুলতে হবে, এক-একবার ঘুমন্ত ছেলেদের দিকে চাইতাম, মন ব্যস্ত হ'য়ে উঠত—কাজে সব দেরী হ'য়ে যাবে। অথচ ভাব সব এসে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে না লিখে ফেললে, কাজ-কর্মে সমস্ত দিন ও সন্ধ্যার পর—১৬।১৭ ঘণ্টা পরে আবার কি সব মনে থাকবে? এমনটি কি তখন বেরুবে?—এই ভাবনা—আর তাড়াতাড়ি কলম চলছে। দিন গেছে, সন্ধ্যা গেছে, রাতও গেল, ২৪ ঘণ্টাতেও কুলোয় না—ঘুমবার ফুরসত কই? কাজেই ঘুম যেন নিজেই ঘুমিয়ে প'ড়ত।

"ঘুমের কথায় একটা কথা মনে পড়ছে। তখন স্বামীজীর সঙ্গে ঘুরছি। দুজনে একটা পাহাড়ের কাছে এসেছি। আমি তো পাহাড়ের পোকা—কথা হ'ল—আমি পাহাড় ডিঙিয়ে উপর

দিয়ে ওপারে যাবো, আর স্বামীজী তলা দিয়ে ঘুরে ওপারে যাবেন—দুজনে এক জায়গায় দেখা হবে। সেই মতো কাজ। দুজনে ছাড়াছাড়ি হবার পর যখন স্বামীজীর নিকট আবার এসে পৌঁছলাম, স্বামীজী তখন 'চোখ চেয়ে' দাঁড়িয়ে আছেন একটা ঝোপের কাছে ডাকতেই স্বামীজী চমকে উঠলেন আসলে চোখ চেয়ে ঘুমতেন।

"গাড়োয়ানরা ডাকতেই সাড়া দিলাম কাপড়-চোপড় পরে বেরুলাম। তখন গেরুয়া লম্বা আলখাল্লা গায়ে দিতাম, মাথায় বড় গেরুয়া-পাগড়ী, পায়ে কাশ্মীরী স্যাণ্ডাল। সকালেই সব সৈয়দাবাদে পৌঁছলাম। রাস্তার উপর এতগুলো গাড়ি গরু একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব, তাই গাড়োয়ানদের বললাম, গঙ্গার ধারে গিয়ে গাড়ি খুলে দাও, গরুদের খাওয়াও। আমি, কুমুদবাবু, ওভারসিয়ার প্রভৃতি কাশিমবাজার মহারাজের কর্মচারীদের কাছে গেলাম কয়লার মাপ-জোক আদি ব্যবস্থা করতে। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম, ২।৩ জন গাড়োয়ান রাস্তায় এদিক ওদিক ছট্ ফট্ করছে, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, 'আর বাবা, নতুন কালেকটার সাহেবের সব মাল গঙ্গার ঘাটে এসে লেগেছে। চাপরাশী পুলিশ সব গাড়ি ধরছে, একখানা গাড়িতে মাল বোঝাই ক'রে ফেলেছে। আমরা এ-সব দণ্ডীবাবার কয়লা নেবার গাড়ি বলায় তারা বললে, "লে তেরা দণ্ডী না ফণ্ডী এখন চল্"। বাবা রক্ষা কর, এই জন্যই তো আমরা সহরে বাজারে আসতে চাই না।' তাড়াতাড়ি গঙ্গার ধারে গেলাম—এত ক'রে শেষে বুঝি তীরে এসে তরী ডোবে। স্বয়ং কালেকটার সাহেবের মাল, যিনি জেলার সেরা, জেলার লাট্—তাঁর লোক গাড়ি ধরছে। আমি কি করি না করি, তা দেখবার জন্য আশপাশের লোক জমায়েত হ'য়ে গেছে। গাড়ির কাছে যেতেই সব পুলিশ-চাপরাশীরা ছুটে আমার কাছে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। সাহেবের বুড়ো আরদালি আতাপ-জানও ছিল, সে বললে, 'স্বামীজী আপনি? এ-সব আপনার গাড়ি? এরা বলছিল কে দণ্ডী-ফণ্ডীর গাড়ি। স্বামীজী আপনার গাড়ি আমরা নেব না, আপনার গাড়ি কেড়ে নিয়েছি শুনলে সাহেব আমাদের উপর চটে যাবেন।' যে গাড়িটিতে মাল বোঝাই হয়েছিল, সেই গাড়োয়ানকে বললাম, 'যা কুঠিতে মাল পৌঁছে দিয়ে আয়, ভাড়া পাবি ওখানে—এসে আবার কয়লা নিয়ে যাবি—ডবল লাভ হবে।' গাড়োয়ান বললে, 'না, দণ্ডীঠাকুর, না বাবা।' আবার বললাম, 'গাড়িতে মাল সাজিয়েছে, যা আমি তোকে আট আনা বক্শিস্ দেব। তিন গুণ রোজকার হবে।' গাড়োয়ান বললে, 'আমার গলায় ছুরি দিলেও যাব না—জবাই হবো, তবু সাহেবের কুঠিতে যাব না। বাঁচাও বাবা, দোহাই দণ্ডীঠাকুর।' শেষ-পর্যন্ত গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে নিতে হ'ল। গেঁয়োলোক কালেকটারকে এমনই ডরায়। যমের বাড়ি বহুত আচ্ছা, তবু সাহেবের কুঠি নয়।

"আশ্রমের ঠাকুর-ঘর ছিল না। ঠাকুরের ছবি তিথিপূজার দিন নামিয়ে তাতেই পূজা অর্চনা হ'ত। অন্যদিন ভজনাদি হ'ত। ঠাকুরকে বলেছিলাম, ঠাকুর এ অনাথ আশ্রমে বিধিপূর্বক তোমার সেবাপূজা করতে পারব না, তাতে আমার সেবা অপরাধ হবে। তাই তোমাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি—ওখানে রেখেই তোমার স্মরণমনন করি।

"১৮৯৮ খৃঃ আমি রিলিফের কাজে ব্যস্ত। আশ্রমের প্রথম পত্তন হয়েছে—তিনটি অনাথ বালকও এসে জুটেছে। এখনকার বেলুড় মঠ তখনও হয়নি। আলমবাজার থেকে মঠ সবে

বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানে উঠে এসেছে। স্বামীজীও সেখানে রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এদিকে ঠাকুরের জন্য বহরমপুরের ছানাবড়া পাঠাবার ইচ্ছা হরিবাবুর (বনবিহারী রায়)—তিনি ময়রাকে ডেকে এক মন ওজনের একখানা ছানাবড়া করতে বললেন। কিন্তু এত বড় কড়া না পাওয়ায় দুখানি ছানাবড়া হ'ল, মোট ওজন এক মন চৌদ্দ সের। নিয়ে যাবার অসুবিধার জন্য একটি টিনেই দুখানি ছানাবড়া পুরে নিয়ে মঠে রওনা দিলাম। ঠাকুরের উৎসবের দিনেই—বালি-স্টীমার জেটিতে নেমে সকাল দশটা নাগাদ মঠে পৌঁছলাম। সকলে শুনে অবাক। ঐ ছানাবড়া দুখানি ঠাকুর-ঘরে দেওয়া হ'ল। উপরি উপরি বসিয়ে আনা হয়েছিল, তাই টিন থেকে ঢালতেই ছানাবড়াদুখানি ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি আনন্দে বিভোর। দেখি তাঁর গায়ে-কপালে ছাইয়ের দাগ—শুনলাম, সেদিন তাঁকে শিব সাজানো হয়েছিল। সেবার উৎসবের আয়োজন হয়েছিল 'দাঁ-দের' বাগানে।

"মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম ঠাকুরের উৎসব হয় ১৮৯৯ খৃঃ। সেবার বৈকুণ্ঠবাবুর ছেলে ননী কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে। বৈকুণ্ঠবাবু সারা বহরমপুর সহরের লোকদের খাওয়ান। অবশ্য ভোজে আশ্রম নিমন্ত্রিত হয়নি। হরিবাবু আমাকে বললেন, 'ননী একদিন আশ্রমের ছেলেদের খাওয়াক না কেন?' ননী এইকথা শুনে আশ্রমের সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়। হরিবাবু আমাকে বললেন, 'আপনি বলবেন, আশ্রমের ছেলেদের আশ্রমে এসে খাইয়ে যাক্।' কাজেই কথা হ'ল—সামনেই ঠাকুরের তিথিপূজা, ঐদিন উৎসব হবে, আর ননীবাবু, হরিবাবু আর একজন আশ্রম-হিতৈষী ঐ দিনের খরচ বহন করবেন। হরিবাবুই সেই উৎসবের সব ব্যবস্থা করেন। তিনি বললেন, পাড়াগেঁয়ে ধরনে মুড়ি-নারকেল দিয়ে জলখাবার হবে, আর একটা সরবৎ। হলও তাই। জনৈক ভক্ত তেঁতুল দিয়ে এমন সরবৎ করেছিলেন যে, সকলেই তারিফ করেছিল। হরিবাবু তাঁর পাচক চোবে-ঠাকুরকে এনেছিলেন। ছোলার ডালের খিচুড়ি মোহাবা দিয়ে হবে হরিবাবু ঠিক করলেন। মহুলা গ্রামের একভক্ত একঘড়া ঘি ।—ঐ অঞ্চলে তখন ভাল গাওয়া ঘি টাকায় পাঁচপোয়া পাওয়া যেত। হরিবাবু চোবেকে ব'লে দিলেন, সব ঘিটা খিচুড়িতে ঢেলে দিতে—উৎসবের জন্য পাঠিয়েছে, এর শেষ রেখে কাজ নেই। প্রসাদ পাবার সময় কলাপাতায় ঘি আর আটকে রাখা যায় না—ঘি ছুটেছে ডাল-ভাতের বাঁধন ভেঙে। চিঁড়ে-দই খাবার সময়, দই যদি পাতলা হয়, তা হ'লে তাকে যেমন চিঁড়ের বেড়া দিয়ে আটক রাখা যায় না, খিচুড়িতে ঘিয়ের দশাও তাই হ'ল। পরের বছর উৎসবে যখন ফর্দ হয়, তখনও সকলে বলেছিল, হরিবাবু যদি গত বছরের মতো ঘি ছাড়েন, তা হ'লে আমরা পেরে উঠব না। ঐকতান-বাজনার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। পর বৎসরের উৎসবেও হরিবাবু ছিলেন প্রধান পাণ্ডা। এ বৎসর সকলে বললেন, ঠাকুর মাছ খেতেন, অতএব উৎসবে মাছ করতে হবে। সে বৎসর মাছের পোলাও-কালিয়া খুব হ'ল। হরিবাবুর পাচক সূর্য-ঠাকুর সব রান্না ক'রল। তখন রেল খোলেনি, মোটর হয়নি। ঘোড়ার গাড়িতেই হরিবাবুরা এসেছিলেন। আর সব সাইকেলে। এই দুই বৎসর যে উৎসব হ'ল, তা বাবুদের (Aristocratic)—'দরিদ্রনারায়ণ' প্রায় কিছুই ছিল না। তৃতীয় বৎসর (১৯০১) থেকে উৎসবে সাধারণের (দরিদ্রনারায়ণের) আবির্ভাব হ'ল।"

সমালোচনা

রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎ: অনিল কুমার মুখোপাধ্যায় সংগ্রথিত। প্রকাশক: ৮১।১বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪। (১৩৮২), পৃঃ ১২+৩৮৮, মূল্য: পঁচিশ টাকা।

'উপনিষদ্ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি'—এই উক্তি যিনি করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। উপনিষদের ভাব ও অনুভূতি রবীন্দ্র-রচনায় অভিনব লাবণ্য পরিগ্রহ করেছে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন, অতি-রঞ্জনের আশ্রয় না নিয়ে: 'উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে-বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব।' জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার তাঁর শেষ জীবনের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন উপনিষদে। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখেন: উপনিষদের 'সঙ্গে আমার নিরাসক্ত সম্বন্ধ প্রত্যহ নিবিড় হইয়া আসিতেছে।'

'নিরাসক্ত'-শব্দটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তার কারণ মুক্তমনা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল সংস্কারমুক্ত। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এই ধরনের কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌কে দেখেননি। তাঁর উপনিষদের নিরীক্ষণ অন্তরের আলোকে। তাই তাঁর উপনিষদের উপলব্ধি ও আলোচনার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আধ্যাত্মিক দীপ্তি, মহৎ মানবিক বোধ, এবং উদার বিশ্বজনীনতা। তাঁর গদ্য-রচনায় নানাভাবে উপনিষদের প্রসঙ্গ এসেছে; এখানে বিশেষভাবে 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কাব্যও স্মর্তব্য, বিশেষতঃ 'নৈবেদ্য'। শেষ লেখাগুলি থেকে 'রোগশয্যায়' কাব্যের অন্তর্গত ২৫-সংখ্যক কবিতাটির কথা মনে পড়ে:

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে,
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে
হয়েছে উজ্জ্বল,
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।

আলোচ্য গ্রন্থটিকে 'উপনিষদের রবীন্দ্রভাষ্য'-রূপে বর্ণনা করা যায়। কবির নানা রচনায় উপনিষদ্-সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি ও মন্তব্য বিক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে; সেইগুলি একত্র ক'রে তাদের সুন্দরভাবে সাজিয়ে সযত্নে মাল্যাকারে সংগ্রথিত করেছেন শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়। বঙ্গবাণীর পদতলে তাঁর অর্পিত এই মাল্য সারস্বত সাধকদের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ।

সংকলিত অংশগুলি সম্পাদনে অনিলবাবুর পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও দক্ষতা আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপনিষদের যে-মন্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে, সংকলক তাদের উপনিষদ্ অনুসারে ভাগ করেছেন। উপনিষদের উদ্ধৃতির পাশাপাশি কবির মন্তব্যগুলি কালানুক্রমে বিন্যস্ত। সেটা থেকে কবির চিন্তার ক্রমবিকাশও লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে বেশী স্থান জুড়ে রয়েছে 'ঈশোপনিষদ্'; এটা স্বাভাবিক, কারণ, রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, 'ঐ উপনিষদটি আমার সবচেয়ে প্রিয়—ওর মধ্যে তত্ত্বের গভীরতা আশ্চর্য গভীর।' (ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, ২৭ মে ১৯৩৮)।

সম্পাদকের 'অবতরণিকা'টি সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ। তিনি যথার্থই লিখেছেন, উপনিষদের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায় কোথাও অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন, কোথাও বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা ভাব-সম্প্রসারণ করিয়াছেন; আবার কোথাও কোন মন্ত্র অবলম্বনে তাঁহার নিজস্ব ভাবধারা ও অনুভূতিকে মূল মন্ত্রের সহিত সঙ্গত করিয়া রস-সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। শেষের ক্ষেত্রে উপনিষদের মন্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র হইয়াছে;

তাঁহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, বিচিত্র চিন্তাশক্তি ও গভীর রসোপলব্ধি অকুণ্ঠ প্রকাশ-গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে।'

উপনিষদের বাইরে ঋগ্বেদ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে এক-জাতীয় যে-সব উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন, সেগুলি পরিশিষ্টে সংযোজিত হ'লে ভাল হ'ত। উদাহরণ-স্বরূপ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধৃত উক্তিটির উল্লেখ করা যেতে পারে :

অন্তি সন্তং ন জহাতি
অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার ন জীর্যতি॥

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলির উৎস-প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র খণ্ড ও পৃষ্ঠার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্লোকের অনুক্রমণিকাও আরো বিশদ করা যায়। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সংগ্রথক এগুলি ভেবে দেখতে পারেন।

—অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অবতার-ঘরনীর প্রেম ও সাধনা—দেবার্চন গোকুল বিশ্বাস। প্রকাশিকা : মায়া ভক্ত, তপোবন প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯। (১৩৮৮), পৃঃ ৯+১৬০, মূল্য : বার টাকা।

অবতারপুরুষেরা যখন যুগে যুগে ধর্মসংস্থাপন এবং দুষ্টের দমনের জন্য আবির্ভূত হন, তখন তাঁরা লীলাপুষ্টির জন্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন শক্তিকে। যুগে যুগে তাই দেখা যায়—শ্রীরামাবতারে সীতা, শ্রীকৃষ্ণাবতারে রুক্মিণী, বুদ্ধাবতারে যশোধরা প্রভৃতি ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অবতার-লীলাপুষ্টির জন্য তাঁদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় অংশ নিতে হয়েছিল। কিন্তু অবতারপুরুষদের জীবনীকারেরা যেভাবে শ্রদ্ধা-সহকারে আবেগ-মথিত হৃদয়ে ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে অবতারপুরুষদের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সহধর্মিণীদের বেলায় সে-রকমভাবে করেননি। ফলে অবতার-সহধর্মিণীদের জীবনধারা থেকে গেছে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই গ্রন্থের 'শুভাশংসনে' ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন : 'সীতা, রুক্মিণী, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া, খদিজা, সারদা—এই মহাশক্তিরা লোকলোচনের অন্তরালে অবতারপুরুষদের বিশ্বকল্যাণযজ্ঞে ধূপের মতো নীরবে নিজেদের পুড়িয়ে, বিলিয়ে দিয়েছেন। কাব্যে উপেক্ষিতার ন্যায় পুরাণেতিহাসেও তাঁরা অনেকটা অনাদৃতা।' তবু অবতারপুরুষদের জীবনচরিত বর্ণনার সময় তাঁদের জীবনচরিত রচয়িতাদের বর্ণনায় যেটুকু স্থান পেয়েছে, তাতে তাঁদের চরিত্রমাধুর্যের যে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে, তার আলো আমাদের চক্ষুকে ধাঁধিয়ে দেয়। সেই ক্ষণিকের আলো-বিকিরণে অবতার-সহধর্মিণীদের যে-চরিত্র প্রকাশিত—তাতে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে অতি সম্ভ্রমে অবনতমস্তকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা করে।

বর্তমান লেখক অবতারপুরুষদের যে-সব প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে, তা থেকে প্রচুর পরিশ্রম ক'রে অতি যত্নসহকারে উপাদান সংগ্রহ ক'রে অবতার-সহধর্মিণীদের জীবনচরিত অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন। লেখকের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থের তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'লেখক অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত গৃহচারিণী সহধর্মিণী নারীর সেই বিচিত্র ইতিহাস অতিশয় মনোরমভাবে আলোচনা করেছেন।' গ্রন্থে যে-সব অবতার-সহধর্মিণীর বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে, তা হ'ল : 'অনুরাগিণী সীতা', 'প্রণয়িনী গৃহলক্ষ্মী রুক্মিণী', 'সহধর্মিণী যশোধরা', 'প্রেরণাময়ী খদিজা', 'বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া' এবং 'অমৃতময়ী সারদা'।

'অমৃতময়ী সারদা' অধ্যায়ে দু-একটি তথ্যের

ভুল আছে। যেমন (১) লেখকের মতে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আসার পর শাস্ত্রমতে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ 'গভীর ধ্যানযোগে পেলেন ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ—লাভ করলেন সবিকল্প সমাধি।' (পৃঃ ১১৫)। কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসার অনেক আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ এবং সবিকল্প সমাধি ভূয়োভূয়ঃ লাভ করেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গের প্রথম ভাগে 'ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন' এবং 'সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা' অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা রয়েছে। (২) শ্রীশ্রীমা 'একটানা পাঁচ দিনের কঠোর পঞ্চতপা সাধনা করেছেন।' (পৃঃ ১৩৯)। বেলুড় নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে শ্রীশ্রীমা পঞ্চতপা করেন। কতদিন করেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। লেখক সম্ভবতঃ শ্রীযুত আশুতোষ মিত্র এবং ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের গ্রন্থানুসারে পাঁচদিন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন। কিন্তু 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় (২য় ভাগ, ৭ম সং, পৃঃ ২৮০) আছে—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী নিজেই বলছেন যে, 'সাতদিন' পঞ্চতপানুষ্ঠান করেছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদাদেবী' (৫ম সং, পৃঃ ২০৬-০৭) এবং শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের 'শ্রীমা সারদামণি দেবী' (১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৪৮) গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে—সাতদিন ধরে শ্রীশ্রীমা পঞ্চতপানুষ্ঠান করেছিলেন।

গ্রন্থশেষে শুদ্ধিপত্রের উল্লিখিত ভুল ছাড়াও কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেছে। আর একটি শব্দের বানান দু-রকম হলেও সঙ্গতি রেখে লেখা বাঞ্ছনীয় সামান্য কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না ক'রে থাকা যায় না। পড়তে পড়তে দুঃখে কখন চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে, আবার কখন আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আশা করি, সকল বাংলাভাষী নরনারীর কাছে গ্রন্থটি আদরণীয় হবে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

(১) **অন্ধ্রপ্রদেশ** শ্রীকাকুলাম জেলায় ১৯৮০ খৃঃ বংশধারা নদীর ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২০০ পরিবারের জন্য ২০০টি পাকা বাড়ি তৈরির কাজ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে।

(২) **উড়িষ্যায়** কোরাপুট জিলায় গুনুপুরে ১৯৮০ খৃঃ বংশধারা নদীর প্রবল বন্যায় গৃহহারা ২৫০টি নিঃস্ব আদিবাসী পরিবারের জন্য ২৫০টি পাকা বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

(৩) **পশ্চিমবঙ্গে** (ক) মালদা জেলার কালিয়াচক অঞ্চলে ১৯৮০ খৃঃ বন্যায় ১৮০০ গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ১০০০ পরিবারকে গৃহনির্মাণের উপকরণ বিতরণ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

(খ) মালদা জেলায় খরাপীড়িত হবিবপুর ও বামনগোলা অঞ্চলে ৩০শে অগস্ট পর্যন্ত ১০,০০০ লোককে চাউল ও লবণ বিতরণ করা হইয়াছে।

(গ) হুগলী জেলায় দামোদরপুর হাইস্কুল (আরামবাগ) নবনির্মিত বিবেকানন্দ ভবনের জন্য কিছু অর্থ এবং গৃহনির্মাণের উপকরণ মিশনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং গত ২৫শে অগস্ট রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক উক্ত বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করেন।

(ঘ) বাঁকুড়া জেলায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মীভূত গিধুরিয়ার ৮৯টি গৃহের গৃহনির্মাণের উপকরণ বিতরণের পর গত ১লা অগস্ট উহার কার্য বন্ধ হইয়াছে।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র ১৯৮২ খ্রী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাক্রমে ...ম, ১৬শ ও ১২শ স্থান অধিকার করিয়াছে।

উদ্বোধন সংবাদ

গত ৪ঠা অগস্ট স্বামী [illegible]ানন্দজী মহারাজ এবং ১৮ই অগস্ট স্বামী [illegible]ানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। ১২ই অগস্ট শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী [illegible] পদাবলী ও ভজন [illegible] আলোচনার মাধ্যমে [illegible]।

সন্ধ্যার [illegible] স্বামী নিবামযানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

প্রকাশন সংবাদ

এই মাসে নূতন গ্রন্থ :

ভারতের পুনর্গঠন—স্বামী বিবেকানন্দ, [illegible] পৃঃ ৫৬, মূল্য ২.০০ টাকা।

এই মাসে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের বিবরণ

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ, ৪র্থ স[illegible] পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৮.০০ টাকা।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ, [illegible] পৃঃ [illegible]৪, মূল্য ৩.৭৫ টাকা।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

কৈলাসহরে (ত্রিপুরা) বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও স্থানীয় [illegible] উৎসব [illegible]টি যৌথ উদ্যোগে গত [illegible], ২[illegible] [illegible] ২, তিনদিনব্যাপী [illegible] উৎসব [illegible] ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে স্থানে [illegible] পূজা, পাঠ, আলোচনা [illegible], ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত [illegible] হয়।

পরলোকে

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত একনাথ রাণাডে [illegible] ২২শে অগস্ট ১৯৮২, বেলা ২.৩০ মিনিটে [illegible] বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মাদ্রাজে পরলোকগমন করেন।

একনাথজীর জন্ম ১৯১৪ খ্রী মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলার [illegible] গ্রামে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাশ করিয়া [illegible] হইতে [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। [illegible] তিনি সমাজসেবায় অনুপ্রাণিত হন। তাহার পর ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবন উৎসর্গ করেন মানবসেবায়। স্বামীজীর [illegible] প্রচারের জন্য তিনি [illegible] স্থাপন [illegible]।

তাঁহার [illegible] কন্যাকুমারীর [illegible] [illegible] স্মারক সমস্ত [illegible] ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে [illegible] সমুদ্রের [illegible] শিলাখণ্ডের উপর বিশাল স্বামী বিবেকানন্দ [illegible] হইয়া সমস্যা জর্জরিত ভারতবর্ষে [illegible] খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, সেই [illegible] উপর [illegible] বিবেকানন্দ মন্দির তাঁ[illegible] স্মারক এবং বিবেকানন্দ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া কন্যাকুমারীতে এই কেন্দ্রটি বিশ্ববাসীর নিকট এক পরম তীর্থস্থান। তাঁহার স্বভাবসুলভ অমায়িক ব্যবহার এবং আদর্শনিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের প্রীতি এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

* * *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের [illegible] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রণেতা অক্ষয়কুমার সেনের পুত্রবধূ কালীতারা সেন গত ২৬ [illegible] ময়নাপুরস্থিত (বাঁকুড়া) ভবনে বিকাল ৩.১০ [illegible] ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। —শ্রীরামকৃষ্ণদেব

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Rs. 0.85

MY MASTER
Price : Re. 0.60

THOUGHTS ON VEDANTA
(Seventeenth Edition)
Price : Rs. 2.25

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3.80

CHRIST THE MESSENGER
(Eighth Edition)
Price : Rs. 1.25

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4.25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 8.00

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 1.80

VEDANTA PHILOSOPHY (9th Ed.)
Page 63, Price : Rs. 3.00

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
Price : Rs. 2.50 (Ordinary)
Rs. 3.50 (Cloth)

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial) (Fourth Edition)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 6.50

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 1.00

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—২০৲ টাকা সম্পূর্ণ সেট ১৯৫৲ টাকা

বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৬৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জলযোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫·০০

ভক্তিযোগ— পৃঃ ৯৬, মূল্য ৩·০০

ভক্তি-রহস্য— পৃঃ ৯৮, মূল্য ৩·৪৫

জ্ঞানযোগ— পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০·৫০

রাজযোগ— পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬·৫০

সন্ন্যাসীর গীতি— পৃঃ ২৩, মূল্য ০·৬৫

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃঃ ২৯, মূল্য ০·৮০

সরল রাজযোগ— পৃঃ ৩৬, মূল্য ১·৫০

পত্রাবলী : প্রথমার্ধ— পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০·০০

শেষার্ধ— পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০·৫০

রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)— মূল্য ২৭·০০

পওহারী বাবা— পৃঃ ১৮, মূল্য ১·২৫

স্বামীজীর আহ্বান— পৃঃ ৮০, মূল্য ১·২৫

ধর্ম-সমীক্ষা— পৃঃ ১৩০, মূল্য ৫·০০

ধর্মবিজ্ঞান— পৃঃ ১০২, মূল্য ৫·৫০

ভারতে বিবেকানন্দ—(১৭শ সংস্করণ) পৃঃ ৪২৫, মূল্য ২০·০০

বেদান্তের আলোকে—পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫·০০

দেববাণী— পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬·৫০

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—(৭ম সং) পৃঃ ১৮০, মূল্য ৫·০০

মদীয় আচার্যদেব— পৃঃ ৬২, মূল্য ২·২৫

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে— পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২·০০

চিকাগো বক্তৃতা— পৃঃ ৫২, মূল্য ১·৭৫

মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬·০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩·০০

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃঃ ১৩৬, মূল্য ৩·৫০

ভাববার কথা— পৃঃ ৬৪, মূল্য ২·৩০

বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০

বর্তমান ভারত— পৃঃ ৪০, মূল্য ২·৫০

ভারতীয় নারী—(১৮শ সং) পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। ৩য় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২·৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২·৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩·০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫·০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩·২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫·০০

গোপালের মা— স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১·৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬·০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭·৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫·৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫·০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪·০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬·৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, ৭ম সং, মূল্য ১·০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩·০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭·৫০

অতীতের স্মৃতি—(৪র্থ সং), পৃঃ ৪৫৫, মূল্য ২০·০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪·৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৯, মূল্য ২·০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পুনর্মুদ্রণ (১৩৮৮), পৃঃ ৭০, মূল্য ২·৫০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩·৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। ৮ম সং, পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৬·০০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫·০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪·০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬·২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০·০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১·২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী— স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০·৭২

বিবিধ-প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩·৫০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে — স্বামী অখণ্ডানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫·০০



॥ মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি—'হে ভগবান্, তুমি আমার সর্বস্ব ধন', এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে ব'সে রয়েছি; এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয় ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

যা কিছু দেখ্‌ছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। যোগমায়া, শিবকালী, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তার যোগে প্রকৃতি কাজ করছেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তির মানেও ঐ।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

সংসার ধর্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে কাজকর্ম করবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

বাসনার লেশমাত্র থাকলে ভগবান লাভ হয় না। মন যখন বাসনারহিত হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল, তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন। ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

* * *

"তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে শক্তির সহায়তা চাও তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে।"

"আমাদের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক, ইহা আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়া যদি তাহা করিতে হয়, তবে নয়।"

"সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া এবং অপরের কল্যাণ সাধন করা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপ, ধ্যান—এ সব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘসতে ঘসতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

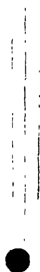
—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

* *

* *

তোমরা আহারের দ্বারা শরীরের পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার?

—স্বামী বিবেকানন্দ



"অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে—তোমরা সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কখনও সাহায্য পাও নাই ; যেটুকু সাহায্য পাইয়াছ, সব নিজের ভিতর হইতে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

* *

• •

"এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞানলাভ করি, তাহারা কোথা হইতে আসে? উহারা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন জ্ঞান কি বাহিরে আছে?—আমাকে এক বিন্দু দেখাও তো। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল।"

—স্বামী বিবেকানন্দ





Udbodhan—Phone : 55-2447 SEPTEMBER 1982 Regd. No. WB/NC-19

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত"



উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮৯

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী	...	...	৪৮১
২।	কথাপ্রসঙ্গে : শুভ ৺বিজয়া	...	...	৪৮২
	'লোকে বলে কালী'		...	৪৮২
৩।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র	...	...	৪৮৮
৪।	স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকণা	...	স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত ...	৪৮৯
৫।	পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন	...	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ...	৪৯৩
৬।	কথামৃত-প্রবেশ	...	স্বামী চেতনানন্দ ...	৪৯৮
৭।	'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'	...	ডক্টর রমা চৌধুরী ...	৫০৫
৮।	ভ্রম-সংশোধন	...	...	৫০৮

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; **বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে সি-মেল-এ ৫০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১২৫ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

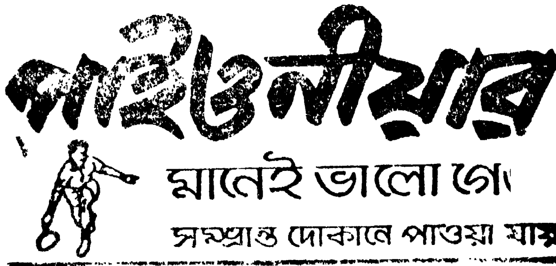
বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

৯।	ব্যক্তিত্বের প্রভায় সারদামণি ...	ডক্টর জলধিকুমার সরকার ...	৫০৯
১০।	মনসৈবেদমাপ্তব্যম্ ...	ব্রহ্মচারী জগদীশচৈতন্য ...	৫১২
১১।	ভক্ত বরদাসুন্দর ...	শ্রীমতী মুক্তি কর ...	৫১৪
১২।	'শ্রীম' (কবিতা) ...	শ্রীমতী হিমানী রায় ...	৫১৮
১৩।	নন্দাদেবী (কবিতা) ...	স্বামী পূর্ণানন্দ ...	৫১৯
১৪।	সমন্বয় সাধনে কবীর ...	রেজাউল করীম ...	৫২২
১৫।	যুবকদের প্রতি ...	শ্রীজৈল সিং ...	৫২৯
১৬।	ভারতে শক্তি-উপাসনার ধারা এবং তাৎপর্য ...	স্বামী কেদারানন্দ ...	৫৩০
১৭।	আবেদন ...	...	৫৩৬
১৮।	রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন ...	...	৫৩৭
১৯।	আত্মসমর্পণ (কবিতা) ...	শ্রীগণপতি পাঠক ...	৫৪১
২০।	সমালোচনা ...	ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য ...	৫৪১
২১।	রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ...	...	৫৪২
২২।	বিবিধ সংবাদ ...	...	৫৪৪







পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জি
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়



৮৪তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা কার্তিক, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

…বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি, অগ্নি বললেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়; দাহিকা শক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়।

তাঁকেই 'মা' বলে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কিনা।

*

যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ।

…যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিব-কালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন! রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তির মানেও ঐ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিম ভাব।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১।৬ এবং ১।৬।৩]

কথাপ্রসঙ্গে

শুভ ৺বিজয়া

শারদীয়া মহাপূজা পরিসমাপ্ত। বিজয়ান্তে আমরা উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, অনুরাগী, পৃষ্ঠপোষক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশেই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগদম্বার কল্যাণ-দৃষ্টি সকলকেই রক্ষা করুক—সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক, সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক, ইহাই তাঁহার কাছে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

'লোকে বলে কালী'

দৃশ্যপট দিগন্তব্যাপী মাঠ।

সময়—গোধূলি।

সূর্যদেব তখন পাটে বসিয়াছেন। পশ্চিম আকাশে তাঁহার শেষ রশ্মিজাল যেন এক আশ্চর্য মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে—দিঙ্‌মণ্ডল রাগ-রক্তিম। গোধূলির সোনালী-ধূসর ধূলিজালকে মনে হইতেছিল যেন কোন্ ঊর্ধ্বলোক হইতে ভাসিয়া আসা রাশি রাশি পুষ্পরেণু। ঠিক বোধ হইতেছিল সর্বগুণান্বিত এই পরম শোভনীয় কালে, মর্ত্যভূমিতে বুঝি বা এমন কাহারও আগমন হইয়াছে, যাহার জন্য প্রকৃতির সর্বত্রই বিরাজমান প্রসন্নতা!···অন্ধকার আসি আসি করিয়াও আসিতে পারিতেছে না—যেন ধরিত্রীকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইতেছে না,—দূরদিগন্তে গাছের মাথায় মাথায় আসিয়া জড় হইতেছে মাত্র, কিন্তু নামিতে পারিতেছে না।···আসন্ন সন্ধ্যার ঐ অস্পষ্ট আলোতে জনহীন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝখান দিয়া দ্রুত পায়ে আগাইয়া চলিয়াছেন জনৈকা নারী—আর তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল, কাপড়ের পুঁটলিবাহী একটি বালক।···চলিতে চলিতে নারীমূর্তি সহসা পিছনে ফিরিলেন। দেখিলেন,—অনুগামী বালকটি মাঝপথে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে,—যেন আর সে চলিতে নারাজ। পথচারিণী তাই ডাকিতেছেন,—'ও কিরে, দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? এগিয়ে আয়।'

বালক নাছোড়বান্দা! প্রখর জবাব: 'তুমি কে বলতে পারো?' উত্তর না মিলিলে আর এক পদও অগ্রসর হইবে না—এই বুঝি তাহার জিদ্!

'আমি আবার কে! আমি মানুষ···।' বেশ সহজ সামান্য ছেলে-ভুলানো উত্তর। জিজ্ঞাসা-ব্যাকুল ছেলেটি তবুও নিশ্চল,—স্থির দাঁড়াইয়া। প্রত্যয়-তীক্ষ্ণ জবাব দিয়াছিল সে—'তবে যাও, এই তো বাড়ীর কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।'

'···আয় বাছা আয়।'

না। বালক এক পদও নড়ে নাই। সে স্থাণুর মতোই অটল ছিল। 'বলো, তুমি কে?'

*

ঘটনাটি নাটকের মতো—কিন্তু নাটক নহে। এই মাটির পৃথিবীতে, প্রতিনিয়ত ঘটিয়া যাওয়া অজস্র ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ইহাও একটি। তবুও অন্য আরও দশটি ঘটনার মতো, ইহাও ঘটিবার পরেই শেষ হইয়া যায় নাই,—অথবা নিছক স্মৃতিমাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই। উপমা,—যেন সন্ধ্যাবেলার দূরশ্রুত শঙ্খধ্বনি! শঙ্খের ঐ ধ্বনি তো একটি ধ্বনিমাত্রই নয়,—উহাতে যে ব্যঞ্জনা থাকে অনাহতের। শঙ্খনিনাদ নিতান্ত শব্দরূপে উত্থিত হইয়াই শূন্যে বিলীন হইয়া যায়

না, অনন্ত গগনময় ওঙ্কারেরই স্পন্দন জাগাইয়া তোলে সকল হৃদয়াকাশে। শতাব্দী কাল পূর্বে, অখ্যাত এক পল্লী-প্রান্তরের পটভূমিতে সংঘটিত সেদিনের ঐ ঘটনাটির মধ্যেও অনুরণন রহিয়াছে, মর্ত্য মানুষের জন্য এক মহতী অমর্ত্য বার্তার,—মানব-মনের চিরন্তন এক জিজ্ঞাসার সহজ সত্য উত্তর।

*

শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরে, মা-সারদা একবার মাঠের পথ ধরিয়া কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটীতে আসিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার কাপড়ের পুঁটলি লইয়া চলিতেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শিবরাম। জয়রামবাটীর প্রায় কাছাকাছি মাঠের মধ্যে আসিয়া, শিবু হঠাৎ কি মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। পিছনে ফিরিয়া, মা শিবুর এই কাণ্ড দেখিয়া বার বার ডাকিতে থাকেন;—কিন্তু অদ্ভুত জিদি বালক একটি মাত্র শর্তেই চলিতে চাহিয়াছিল,—মা যদি তাঁহার স্বরূপের পরিচয় নিজ মুখে প্রকাশ করেন, তবেই সে পথ চলিবে। মা কতই মিনতি করিয়া সাধারণ কথায় অবুঝ বালককে বুঝাইতে চেষ্টা করেন! 'আমি কে? আমি মানুষ,—তোর খুড়ী।' এদিকে বেলা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। মাঠের পথে এমনভাবে অসহায়া নারীকে দাঁড় করাইয়া, বালকেরও অদ্ভুত ছল: 'তবে যাও, এই তো বাড়ীর কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।' অবশেষে মা কিন্তু না বলিয়া পারেন নাই: 'লোকে বলে কালী।' শিবরামের মুখে তখন বিজয়ের হাসি ফুটিয়াছিল, 'তবে চল' বলিয়া সগর্বে আবার পুঁটলিটি কাঁধে তুলিয়া লইয়া পথ চলিতে থাকে।

*

'লোকে বলে কালী।'

জয়রামবাটী-গ্রাম-সংলগ্ন সেই মাঠ আজও প্রায় তেমনই রহিয়াছে। এখনও ধূ-ধূ করে,—এখনও সেথায় তেমনই গোধূলি নামে। জনবিরল আজও। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রবহমান বাতাসের স্পর্শে এখনও পথিককে রোমাঞ্চ জাগাইয়া দেয়। বাতাসের শন্ শন্ শব্দে, বহু-দূরাগত কেমন যেন এক মিষ্ট স্বর শুনিতে পাওয়া যায়। যে-কোন সজাগ সচেতন উৎকর্ণ পথচারী আজও সেই অশরীরী স্বর অবশ্যই শুনিতে পান। মায়া-মিষ্ট সেই কথা:

'লোকে বলে কালী।'

*

আর একদিন সন্ধ্যার পরে। জয়রামবাটীর সেই কুটিরে মা খাটে শুইয়া আছেন—পাশে ঘুমন্ত রাধু। পিলসুজের উপর প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। সমীপে আসীন জনৈক সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া মা সহসা বলিলেন—'এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ।'

বিস্মিত জিজ্ঞাসা: 'তুমি কি সকলেরই মা?'

সরল উত্তর: 'হাঁ'

'এই সব জীবজন্তুরও?'

'হাঁ, ওদেরও।'

সকলেরই মা—ইতর জীবজন্তুরও মা। তাই বুঝি খুব সহজ ভাবেই সেদিন বলিয়াছিলেন—'এই যে এখানে এসেছ,--একটা ভাব নিয়েই এসেছ। হয়তো "জগন্মাতা" ভেবে এসেছ।' কথার মাঝখানে কেবল ছোট একটি 'হয়তো' পদ বসাইয়া কি অদ্ভুত কৌশলে একখানি মায়ার পর্দা টাঙাইয়া দিয়াছেন! আগেও সেই একদিন যেমন বলিয়াছিলেন—'লোকে বলে কালী'! খুব সরল স্বীকৃতি,—তথাপি কিঞ্চিৎ মায়ার কুহেলিকা—'লোকে বলে'! আশ্চর্যরূপিণী মায়া!

*

'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ এনম্'। ব্রহ্ম আশ্চর্য, তাঁহার শক্তিও তাই আশ্চর্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি সারদাও পরমাশ্চর্য। কখনও তাঁহাকে আশ্চর্যময়ী দেবী মনে হয়, জগন্মাতা কালী মহামায়া জ্ঞান হয়,—কখনও বা তাঁহার লোকাতীত ব্যবহার, কথা, কর্ম ও আচরণ দেখিয়া পরম বিস্ময়ে স্তব্ধ থাকিতে হয়—অলৌকিক অমর্ত্য বোধ হয়। আবার সেই তাঁহারই অতি সহজ মানবীসুলভ স্নেহময়ী জননী মূর্তিখানি দেখিয়া, অবিকল আমাদের ঘরের মা—গর্ভধারিণী মা বলিয়াই অনুভব হইয়া থাকে। বিচিত্র তাঁহার দিব্য লীলা-কর্ম দেখিয়া শুনিয়া শুধু রহস্যময় উৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি পায়,—স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝা যায় না। এত সব জানিয়াও, এমন কি তাঁহার স্ব-মুখের নানা স্বীকৃতি-বাক্য শ্রবণের পরেও তাঁহার দুর্দর্শ স্বরূপটিকে যেন কোনমতেই সঠিক ধারণায় আনা যায় না। মায়ার আবরণখানিকে—ঐ রহস্যময় অবগুণ্ঠনকে উন্মোচন না করিলে, শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য, বিচার বা সাহিত্যকর্ম দ্বারাই শ্রীশ্রীমা সারদার কালীরূপকে অবধারণ করা দুঃসাধ্য, তাঁহার জগন্মাতৃত্বের কিঞ্চিৎ আভাস উপলব্ধি করাও অসম্ভব। মনে পড়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশের সেই উক্তি :

'ভগবান্ ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হ'য়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি চিন্তা করতে পার যে তোমাদের সামনে গ্রাম্যবধূ বেশে জগতের মা দাঁড়িয়ে আছেন! তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, যিনি আজ সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও সংসারের আর সব কাজকর্ম করছেন, তিনিই জগজ্জননী মহামায়া ও মহাশক্তি। সর্বজীবের মুক্তির জন্য তিনি মাতৃত্বের পরমাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মর্ত্যে আবির্ভূত হয়েছেন।'

বিশ্বাস করা শক্তই বটে! প্রান্তরচারিণী সেই গ্রাম্যবধূটির মুখে 'লোকে বলে কালী'; ঘরকন্না-রতা এক স্ত্রীলোকের 'জগন্মাতা' বলিয়া নিজের স্বরূপ খ্যাপন; 'সকলের মা, ইতর জীবজন্তুরও মা' ইত্যাকার পরিচয় জ্ঞাপন শুনিতে যতই মধুর লাগুক, যতো কাব্যরসই ইহাতে থাকুক, আমাদের বুদ্ধিতে কিন্তু কিছুই ধরা দেয় না। তাই বলিতেছিলাম, উল্লিখিত ঘটনা-চিত্র—নির্জন সন্ধ্যায় সংঘটিত সেই মাঠের মাঝের নাটকটি শুধুমাত্র বাস্তব তথ্যই নয়,—একটি গভীর তত্ত্বও বটে!

পল্লীপ্রান্তে বিস্তীর্ণ সেই মাঠের মাঝখানটি ধরিয়া চলিতে চলিতে দূরের ঐ বটবৃক্ষমূলে আমরাও কিছুক্ষণ শান্তচিত্তে বসিতে ইচ্ছা করি,—অতীতের অতলে প্রায় বিলীয়মান সেই ঘটনা-চিত্রের যথার্থ পটভূমিকার বিষয় একটু ভাবিবার জন্য। প্রবহমান বাতাস এখনও যেন কানে কানে বলিয়া যায়,—'লোকে বলে কালী।' অদূরেই বহিয়া চলিয়াছে ধ্বনিমুখর আমোদর নদ—তাহারও কল কল স্বরে গুঞ্জরন শোনা যায় 'কালী কালী'।

*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আমরা পড়িয়াছি : 'আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহ-বুদ্ধি, দু'টো বলে বোধ হয়। বলতে গেলেই দু'টো। কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল।'

একান্তে বসিয়া মাতৃ-স্বরূপ চিন্তনের, তথা তাঁহার কালী-রূপ ভাবনার ফলশ্রুতি মোটামুটি এইরূপ বোধ হয় : অদ্বৈত বেদান্তের পথরেখা ধরিয়া অগ্রসর হইলে বুঝা যায় যে, নির্গুণ ব্রহ্মই নিজ মায়াতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হন। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কিন্তু নির্গুণ—তাই নিষ্ক্রিয়ও। শক্তির সাহায্য ছাড়া ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবেন কি ভাবে? এই ব্রহ্ম-শক্তিকেই শাস্ত্রে আদ্যাশক্তি, মহামায়া, প্রকৃতি

ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় শক্তি সমন্বিত ব্রহ্মকেই আমরা বলি ঈশ্বর বা ভগবান্। আচার্য শঙ্কর তাঁহার সৌন্দর্য-লহরীতে বেশ বলিয়াছেন—

'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
ন চেৎ এবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥'

শিব অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম যদি শক্তির সঙ্গে যুক্ত হন, তবেই না এই সৃষ্টি-লীলা সম্ভব! নচেৎ তাঁহাতে সামান্য একটু স্পন্দনও সম্ভবপর নহে।

এই শক্তিই প্রকৃতি। প্রকৃতিযুক্ত হইলেই ব্রহ্ম ঈশ্বর হন। ঈশ্বরের এই শক্তির আবার দুই রূপ —পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। পরা ও অপরা পরস্পরের সম্পূরক। পরা প্রকৃতি সহায়েই ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরস্থিত জ্ঞাতা, সাক্ষী, চৈতন্যরূপে প্রকাশিত;—আর অপরা প্রকৃতির সাহায্যে তিনি অনন্ত ক্রিয়া-শক্তিরূপে ব্যক্ত। এককথায়, এই জগৎ ব্রহ্মের ক্রিয়া-শক্তিরই বিকাশ। এই ক্রিয়া-শক্তিই নানা নামে ও রূপে পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় অহর্নিশ সৃজন করিয়া চলিয়াছে এবং নিরন্তর উহাদের পরিবর্তনও সাধিতেছে। ঈশ্বরের এই দ্বিবিধ ভাব যেন তাঁহাকেও দুইরূপে—দুইটি সত্তায় বা পৃথক মূর্তিতে প্রকট করাইতেছে। আশ্চর্য তত্ত্ব। এই তত্ত্বেরই প্রতীক—শিব আর শক্তি। এক ও অভিন্ন হইয়াও যেন দুই— পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। শিব প্রকৃতির সাক্ষী, দ্রষ্টা এবং আশ্রয়। আর শক্তি সদা ক্রিয়া-নিরতা। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের আশ্রয় ছাড়া শক্তিকে চিন্তা করাও চলে না। অগ্নি হইতে আলাদা করিয়া যেমন তাহার দাহিকা শক্তিকে ভাবা চলে না। প্রকৃতি বা মায়াকে তাই ঈশ্বর-শক্তি বা ব্রহ্মশক্তি বলিয়া মানিতেই হয়। শক্তিকে বাদ দিয়া শক্তিমান্‌কে আলাদা দেখা সম্ভবপর নহে;— শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ কিন্তু উভয়ে কোন ভেদ নাই সূর্যালোককে স্বীকার না করিয়া, সূর্যকে জানিবার উপায় নাই। ঠিক তেমনই শক্তিকে ছাড়িয়া শক্তিমান্ শিবকে বা ব্রহ্মকে জানিবার কোন পথ নাই। শক্তির বা প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া, তাই জাগতিক অথবা আধ্যাত্মিক কোন দিকেই উন্নতির আশা করা বৃথা। আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি, ভাবি, বা বিচার করি, সবই শক্তির সাহায্যে। শক্তি যখন শক্তিমানে লীন থাকে —যেমন বীজের মধ্যে পত্র-পুষ্প-ফল-মণ্ডিত বিশাল বৃক্ষ প্রলীন থাকে, তখন সৃষ্টিও নাই। চেতন ঈশ্বরের ঈক্ষণে বা ইচ্ছায়, তাঁহারই সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতির মাঝে চঞ্চলতা আসে— নর্তন দেখা যায়, এবং উহারই ফলে, ঐ তিন-গুণের তারতম্য ভেদে অসংখ্য নাম ও রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাকেই বলা হয়, ঈশ্বরের সৃষ্টি-লীলা। সৃষ্টি মানেই শিব-শক্তির খেলা। ধ্যান সমাহিত শিব, শান্ত নিস্পন্দভাবে বিরাজমান, —আর তাঁহারই শক্তি বা প্রকৃতি সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অবিরাম অনুক্ষণ সৃজন-পালন-সংহাররূপ অপূর্ব লীলা-নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন।

আবার অন্য আর এক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে এই একই তত্ত্বকে নারায়ণ ও লক্ষ্মীরূপে প্রতিভাত হইবে। অবতার-লীলার মধ্যেও এই ব্রহ্ম-শক্তিরই আর একপ্রকার বিলসন,—কিন্তু তত্ত্ব সেই একই। রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রাধা, চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি সশক্তিক অবতার-বিগ্রহের রহস্যও এই একই তত্ত্বে নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাও এই ব্রহ্ম-শক্তির আধুনিকতম প্রকাশ,— শিব-শক্তির অতি সাম্প্রতিক অবতরণ। যুগে যুগে শ্রীভগবানের নরদেহে অবতীর্ণ হইবার পশ্চাতে এই সত্যই বার বার সমর্থিত হইয়া আসিতেছে।

গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—'অজো-অব্যয়ঃ ভূতানাম্ ঈশ্বরো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া

দেহবান্ ইব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্ ইব লক্ষ্যতে …।' জন্মরহিত অব্যয়, সর্বভূতের ঈশ্বর স্বয়ং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবের হইয়াও, নিজ মায়া সহায়ে অবিকল দেহধারী মানুষের মতোই যেন জন্মগ্রহণ করেন,—লোকানুগ্রহই এই আবির্ভাবের হেতু বলিয়া লক্ষিত হয়। সৃষ্টির প্রয়োজনে যুগে যুগে এইভাবেই ঈশ্বর পৃথিবীর মাটিতে আসিয়া ধরা দিয়া থাকেন—তাঁহারই কার্যনির্বাহিকা শক্তিকে বা মায়াকেও মূর্তিধারিণী হইয়া সঙ্গে আসিতে হয়। এই মায়া-মূর্তিই পরমা প্রকৃতি—পরম পুরুষের অবতার-লীলায় সহায়িকা —অথবা সংসাধিকাও বলিতে পারা যায়।

সমগ্র সৃষ্টিটা শিব-শক্তির দিব্য ক্রীড়া। তন্ত্রের ভাষায় 'শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ'। এই বিশ্বচরাচর শিব ও শক্তিরই মহামহিমময় লীলা-বিলাস মাত্র! তন্ত্রে এই পরমা শক্তিকেই কালী বলা হইয়াছে। যিনি নির্বিকার সদাশিব বা মহাকাল,—সেই তিনিই লীলা-চঞ্চলা কালী। নিত্যে তিনি ব্রহ্ম—নির্গুণ ও নির্বিশেষ—ঠিক যেন শবপ্রায়—শবরূপে শিব। তখন তিনি স্বানন্দে স্বমহিমাতেই বিভোর। আবার যেই ক্ষণে তিনি লীলার প্রয়োজনে শক্তি-রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তিনি সদা নৃত্যচঞ্চলা ত্রিলোক-প্রসবিনী মহাশক্তি কালী। তন্ত্র দৃষ্টিতেও মহাকাল এবং মহাকালী এক ও অদ্বয় তত্ত্বেরই দুইটি রূপ বা নাম ভেদ মাত্র। এই কারণে, শিবকে শক্তির বা কালীরই লীলাস্তব্ধ শান্ত মূর্তি; এবং কালীকে শিবেরই লীলা-বিক্ষুব্ধ অশান্ত বিগ্রহ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ লীলায় তিনি অশান্ত নর্তন-নিরতা। আবার নিত্যে সেই তিনিই শান্ত সমাহিত। লীলায় মহাশক্তি কালী শিবেরই বুকে নৃত্যচঞ্চলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যদি পরম শিব, তাহা হইলে শ্রীসারদাও যে পরমা প্রকৃতি কালী—ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? একই তত্ত্বের—এক পরম সত্যের দুই রূপ। তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও—তত্ত্বতঃ কিন্তু অভিন্নই। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। 'যথাগ্নের্দাহিকা শক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা'—ইত্যাদি ভাষায় শ্রীশ্রীমা সারদার স্তুতি করিয়াছেন স্বয়ং স্বামী সারদানন্দজী।

শ্রীসারদা-কালী! অপরূপ এই কালী—কালো নয় মোটেই। 'লোকে বলে কালী।' অথচ কালো নয় কমলাকান্ত তাই বুঝি গাহিয়াছেন:

'লোকে বলে কালী কালো
আমার মন তো বলে না কালো রে!'

যদি তিনি সত্যই কালী—তবে কেন তাঁহাকে চিনিতে এত কষ্ট!! কালো রঙটিও এবারে নাই—তাই ধরা দিবার মতো বাহ্যিক যে সঙ্গে রাখেন নাই। এমন অধরাকে ধরা, এই জন্যই তো এমন দুঃসাধ্য সাধন। মানিতেই হইবে—সেই বেচারা বালক শিবু অবশ্যই মহা সুকৃতিমান। কালীর কালো রূপটিকে না দেখিয়াও সে কালীকে ধরিতে পারিয়াছিল।

শ্রীসারদার কালীরূপ তাঁহারই যোগমায়ার আবরণে সমাবৃতা, আবার আমাদের দৃষ্টিও তো অবিদ্যা মায়ার ঘন আস্তরণে সমাকীর্ণ! তাই তিনি কালী হইলেও, আমাদের চক্ষে তাঁহার সেই স্বরূপটি চিরতরে আচ্ছন্নই থাকিয়া যাইতেছে। আমরা কখন তাঁহাকে দেখি নিরাভরণা সহজ-সরল গ্রাম্য বালিকামূর্তিতে, আবার কখন বা তিনি অতি সাধারণ এক গৃহস্থ বধূ,—অথবা, শুদ্ধাচারিণী একজন ব্রাহ্মণ-বিধবা মাত্র! তথাপি ইহাও সত্য যে, যে-কোন রূপেই তাঁহাকে দেখিনা কেন,—স্নেহ-করুণার ফল্গুধারাটি তাঁহার সকল বেশের আড়ালে ঠিকই প্রকট। অনন্ত ভালবাসায় গড়া তাঁহার শাশ্বত মাতৃমূর্তিখানি

কিন্তু সর্বাবস্থায়, সকল চক্ষেই সমানভাবে ধরা পড়িয়া যায়। কোনপ্রকার পরিচ্ছিন্ন চিন্তা, বাক্য বা কলমের আঁচড় দিয়া কি সেই লোকাতীত মা-রূপটিকেও ব্যক্ত করা সম্ভব? তাঁহার স্ব-স্বরূপের,—পরমা প্রকৃতিভাবময়ী কালীরূপের ইয়ত্তা কে করিবে?

*

মা-কালী এখন কুলবধূ সাজিয়া, বালক সঙ্গী শিবুর উপর ভরসা রাখিয়া, ভয়ে ভয়ে গ্রামের মাঠ ভাঙিয়া বাপের বাড়ী চলিয়াছেন! অভয়ার এত ভয় যে, শিবুকে না লইয়া ঐ পড়ন্ত বেলায় মাঠের পথে এক পদও চলিতে সাহস পাইতেছেন না! কিন্তু বালক শিবুর কচি দুইটি চক্ষুতে নিশ্চয়ই সেদিন বালকত্ব ছিল না,—ছিল শুভ্রশির ঋষির দর্শনশক্তি। তাই তো নিজের খুড়ীকে—কাকীমা-রূপী কালীকে চিনিয়া লইতে সে একটুও ভুল করে নাই। ধন্য শিবরাম—ভক্তকুলের শিবুদা!

'লোকে বলে কালী'—শ্রীসারদার মুখে আত্মপরিচয়। কেন তিনি কালী,—কী সেই কালীতত্ত্ব, চিন্তনীয় এখন ইহাই। কালী হইতেছেন কলনাত্মিকা। কলন শব্দের অর্থ গণনা বা গ্রহণ। অনাদি অনন্ত স্থিতির—নিত্যের ধারণা জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। জীবের গণনার বা হিসাবের মধ্যে যখন তিনি আসেন, তখনই তিনি লীলায়িত হন—তখনই তাঁহাকে আমরা বলি কালী। 'অগ্রাহ্য' ব্রহ্মবস্তু যখন আমাদের গ্রহণের বা ধারণার গম্য হন তখনই তিনি কলনাত্মিকা কালী। গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন — 'কালঃ কলয়তামহম্' — আমিই গণনাযোগ্য কাল। ব্রহ্ম বা অগুণ অবিশেষ শিব যেহেতু অদ্বন্দ্বিত, তাই তাঁহাতে কোন রকম আপেক্ষিকত্ব নাই। তিনি নিত্য অনপেক্ষ অদ্বিতীয় 'একঃ'। তাঁহাকে তাই শুধু বোধমাত্র করা যায়,—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবার জন্য,—তিনি দেশ-কালের পটভূমিতে প্রকট হন, ইহাও সত্য। এই দেশ-কালের পটভূমিকাটি মায়াতে সৃষ্ট—ইহাই আপেক্ষিকত্বের রাজ্য,—দ্বন্দ্বিত জগৎ। গণনার শুরু এখানেই, এখান হইতেই কালের এলাকা। নির্গুণ এখানেই গুণময় সাজিয়া থাকেন, গুণময়ী মহাকালীকে বক্ষে ধারণ করিয়া। শিবের বুকে নৃত্যময়ী কালী,—অচঞ্চল অনপেক্ষ ব্রহ্মেরই বক্ষে দেশ-কালরূপী মায়ার নর্তন ছাড়া কিছু নহে। মহামায়ার এই নৃত্যও অত্যন্ত ছন্দোবদ্ধ,—তালে তালে সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মেই চলিতেছে। শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম নাই কোথাও। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বা শিবের উপরেই নৃত্যরতা কালী প্রকট হইয়া থাকেন। তাই জ্ঞানশূন্য—শিবহীন কালী অসম্ভব। ব্রহ্মকে বাদ দিয়া শক্তিকে যেমন ভাবা যায় না, শক্তিকে ছাড়িয়া দিলেও তেমনই ব্রহ্ম অগুণ অরূপ,—আমাদের ধ্যান-ধারণার অগম্য। 'নির্গুণ গুণময়' মানেই চৈতন্যময়ী কালীপ্রতিমা, সারদা-সমন্বিত রামকৃষ্ণ বিগ্রহ,—যাঁহার অপর যাদুকরী নাম 'ভবতারিণী'! শ্রীরামকৃষ্ণ তাই শুধু ভবতারিণীর পূজাই করেন নাই,—পূজার সর্বশেষ অর্ঘটি শ্রীসারদার পদেই স্থাপনা করিয়াছিলেন। যে-কালী ভবতারিণী, সেই তিনিই যে জগত্তারিণী সারদা! তাঁহাকেই আমরা 'মা' বলিয়া ডাকি,—সেই তিনিই স্বমুখে নিজ পরিচয় বলিয়াছেন, 'লোকে বলে কালী।'

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র শেঠকে লিখিত]

(১)

পুরী

প্রিয় পূর্ণবাবু— ১৩।১০।০২

বোধহয় আপনারা ভুলে জাননি। আপনাদের দয়া ও ভালবাসা আমি তো বোধহয় কখনও ভুলতে পারব না। শ্রীশ্রীবিজয়া উপলক্ষে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবেন। সুরেনবাবু, সতীশবাবু, গোষ্ঠবাবু, ননীবাবু প্রভৃতি সকলকেই দিবেন। জগন্নাথক্ষেত্রে দুর্গোৎসব উপলক্ষে এখানে আটকা পড়িয়া গিয়াছিলাম। ১৫ই পরশু দিনেই লাঙ্গুল তুলিয়া দৌড় লাগাইব। করুপমের (?) রাজা Waltair-এ তারযোগে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেইখানে কেবল একদিন মাত্র বিলম্ব হবে। তারপরেই আবার দৌড়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী ত্রিগুণাতীত

(২)

Madras

প্রিয় পূর্ণবাবু— 22. 10. 02

গত ১৫ই অক্টোবর তারিখের আপনার পত্র পাইয়া বড়ই খুশী হইলাম। মকরকুম্ভু কি চিঠিতেও লিখতে হয়! আর বাকী কি রেখেছেন?—নিজেকে অধম বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে; আমার কটাক্ষে সব হয় বলেছেন; আবার আমাকে কৃপাদৃষ্টি করিতেও অনুরোধ করেছেন ইত্যাদি ২; মকরকুম্ভুর আর বাকী কি বলুন? বেশ বেশ! কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—আমি সাদা কথার সাদা খাই বটে, কিন্তু মশাই যখন আবার মকরকুম্ভু আমিই ধরব, তখন আপনারা যে খাই পাবেন না, সেটা যেন মনে থাকে। আর অধিক বলব না, যাক্।

আমি অবশ্য আপনাদিগকে কখন ভুলিব বলিয়া বোধহয় না। আপনারা যখন তখন সর্বদাই আমাকে পত্র লিখবেন—আমার তাতে মূল্যবান্ সময় নষ্ট হবে না, ভয় নেই। সত্যিই, আপনারা লিখবেন। আপনাদের মানসিক ও পারমার্থিক অবস্থা সব খুলিয়া লিখতে পারেন। আমি অবশ্য কথায় সাধ্যমত সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না। এ সকল বিষয়ে কাযে সাহায্য বড় একটা কেহ করিতে পারে না। নিজেদের খেটে খুটে ক'রে কম্মে নিতে হয়; নইলে শেষকালে পচতাতে হয়।

এই পত্র পাইয়া যদি আমাকে লেখেন ত—

C/o. R. S. Subramanium Esq.

Secy. Vivekananda Society,

P. W. D. Colombo (Ceylon)

এই ঠিকানায় লিখবেন। আমার ভালবাসা ও অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিবেন। কে কেমন আছেন লিখবেন। আমি অমনি একরকম মন্দ নেই। ইতি—

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ত্রিগুণাতীত

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকণা

স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত

সারগাছিতে ১৯২৮ খৃঃ একদিন দিনাজপুরের বিশিষ্ট ভক্ত গোপালকৃষ্ণ ঘোষকে 'শ্রীশ্রীবাবা' বলেন, "দেখ, রাস্তায় ধুলোবালি নিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কত রকম খেলা করে। ধুলো দিয়ে ঘর বানাচ্ছে—তা দিয়েই রান্না করছে, ধুলোর ভাত, ডাল, তরকারি, অম্বল—আবার তারা ধুলোর ঠাকুর-ঘরে ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজাচ্ছে। তখন সেগুলিকেই তারা সত্য মনে করে। তারপর তারা বড় হ'য়ে যখন সত্যিকারের ঘরকন্না করে, তখন তাদের কাছে আবার তখনকার সবকিছুই সত্য, জীবন্ত, বাস্তব হ'য়ে ওঠে।—বাহ্যপূজাও সেইরকম জানবে। প্রথম প্রবর্তক অবস্থা। তারপর যত তুমি সাধনায় এগিয়ে যাবে—ততই ভগবান্‌কে মনের মন, ।প্রাণের প্রাণ জেনে তোমাকে ভাবের পূজা, প্রাণের পূজা করতে শিখতে হবে।"

তখন সারগাছি আশ্রমে খুব ছোট ঠাকুর-ঘর ছিল চালাঘরে। ঐ ঘরটি ছিল আশ্রমের পুরানো পাকা বাড়ীর দক্ষিণ দিকের খোলা বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। একদিন জনৈক সেবক পুষ্পপাত্র ইত্যাদি সাজাইয়া পূজা করিতে বসিয়াছে, এমন সময়ে শ্রীশ্রীবাবা ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেবকটি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি আসনে বসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে বাবার চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিয়া উঠিল, যেন ঠাকুর জীবন্ত বসিয়া আছেন। কাঁদ কাঁদ হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি সচন্দন ফুল লইয়া ঠাকুরের পায়ে দিলেন। কোন মন্ত্র নাই, কেবল বলিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি এই সব নাও, দয়া কর।" প্রার্থনারত হইয়া খানিকক্ষণ বসিলেন। আধঘণ্টার মধ্যে পূজা শেষ হইয়া গেল। সেবকের মনে সেদিন ভাবের পূজা, প্রাণের পূজার অক্ষয়স্মৃতি সঞ্চিত হইল।

একদিন সকালে একটি সেবক ঠাকুর-পূজার জন্য উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছিল। বাবা দেখিলেন—সেবকটি গাছ শূন্য করিয়া সব ফুল তুলিতেছে। তিনি সেবককে বলিলেন, "ও হে, একেবারে গাছ শূন্য ক'রে ফুল তুলো না, কিছু কিছু ফুল সব গাছেই যেন থাকে। দেখছ না বিরাটের পূজা নিত্য চলেছে।" গাছশুদ্ধ ফুল তিনি ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া থাকেন—তাহাই বিরাটের পূজা।

সারগাছি আশ্রম শ্রীশ্রীবাবার কাছে একটা নিরন্তর তপস্যার স্থান। প্রথম হইতে শেষদিন পর্যন্ত এখানে মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য যে সেবা, তা তিনি ভগবানের পূজার ভাবে করিয়াছিলেন। ফুল ফল সব কিছু উপচার দিয়া নিত্য এইভাবে জীবন্ত ঠাকুরের পূজা করিতেন। নূতন গোলাপ ফুলের চারা লাগানো হইয়াছে। চারা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা আগতপ্রায়। তিনি বলিলেন, "মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, 'মা, যদি ফুল হয় তো তোমায় সাজাবো।' ব'লব কি! তিথিপূজার কদিন আগে কুঁড়ি দেখা দিল। ধীরে ধীরে ঠিক তিথিপূজার দিন ভোরে পাঁচটি ফুল গাছ আলো ক'রে ফুটল, আর মনের আনন্দে মাকে নিবেদন করলাম। মাসখানেক পরে স্বামীজীর তিথি-পূজা। আবার ঐরকম ভাবলাম। এবার সাতটি ফুল। ভাবলাম ঠাকুরের তিথিপূজায় আবার হবে কি? কি আশ্চর্য! বড় বড় বারটি ফুল। সে বছরের মতো ঐ শেষ—।" ফুলগাছও কথা শোনে—হৃদয়ের ভাষা বোঝে।

১৯২৯ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে এক অশান্তিকর পরিস্থিতির

উদ্ভব হয়। শ্রীশ্রীবাবা তখন মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ। তিনি ঐ সময় ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেন. যাহাতে মঠ ও মিশনের প্রত্যেক সভ্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর সদা সত্য পথে চালিত করেন, যেন এ বিপদ শীঘ্র কাটিয়া যায়। ২১শে জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন মঠ হইতে সংবাদ আসিল সব বিপদ কাটিয়া গিয়াছে—সত্যেরই জয় হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা পাঁচ সিকার বাতাসা আনাইলেন—হরির লুট হইবে। সন্ধ্যারতির পর তিনি মন্দিরে আসিলেন। একটি ধূপকাঠি জ্বালিয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া ঠাকুরের একটি স্তোত্র পাঠ করিলেন। তাহার পর ঠাকুরের মন্দিরের বাহিরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় আসিয়া নিজেই ভজন আরম্ভ করিলেন, 'ওয়া গুরুজী, সবে বল ওয়া গুরু, ওয়া গুরু, ওয়া গুরুজী।' এই কীর্তনটির পর 'জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল, কেশব মাধব দীন দয়াল'—এই ভজনটি জমিয়া গেল। সকলেই সমস্বরে গাহিতেছে। শ্রীশ্রীবাবা ভাবাবেশে নীরব হইয়া গেলেন।—কিছুক্ষণ পরে শুধু 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া আখর দিতে লাগিলেন। কীর্তন চলিতে লাগিল—

"এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই নাই নাই রে !
এমন দয়াল ঠাকুর আর হবে না, হবে না,
দয়ালের শিরোমণি, এমন দয়াল দেখি নাই।"

এইরূপ কীর্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবার সারা শরীর কাঁপিতেছে। তাহার পর কীর্তন সমাপ্তির বোল ধরিলেন,—

"বোল্ হরিবোল্, রামকৃষ্ণ বোল্
বোল্ হরিবোল্, রামকৃষ্ণ বোল্।"

এই সময়ে কিছুক্ষণ তিনি দিব্য ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জয় দেওয়া হইল,—'জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কি জয়! জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব কি জয়! জয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কি জয়!'

ঠাকুরের প্রসাদী বাতাসার থালা তাঁহার সম্মুখে ধরা হইলে তিনি সকলের মধ্যে বাতাসা হরির লুঠ দিলেন। শেষে বলিলেন: 'মঠেও আজ আনন্দের ধুম লেগে গেছে।'

সারগাছিতে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা একদিন বলিলেন, "মনে মনে ভাবছি—ঠাকুরের মঙ্গলারতি কি ক'রে হবে। খুব চিন্তিত আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বপ্নে সাধারণতঃ কমই দেখি। কিন্তু এই সময়ে একদিন স্বপ্নে দেখলাম—তিনি বলছেন, 'বেশীকিছু করতে হবে না; একটি ধূপকাঠি জেলে দিলেই হবে।' স্পষ্ট দেখলাম সেই মূর্তি, সেই দক্ষিণেশ্বরের ঘর, সেই খাট, সব—। তাঁর জিনিস তিনিই জোগাড় ক'রে নেন।"

তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময় থেকে একটি আশ্রম-বালক হিন্দুস্থানী সাধুদের মতো গাঁথি দিয়া কাপড় পরিয়া সাধুদের মতোই ভাব ও নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, সন্ধ্যারতি ইত্যাদি করিয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীবাবা ইহা লক্ষ্য করিয়াও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন। এবার সেবকগণের আগ্রহে আশ্রমে মহোৎসব হইবে। ভারপ্রাপ্ত সেবকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ২রা চৈত্র ১৩৩১ সাল, মহোৎসবের দিন স্থির করিলেন। আয়োজন চলিতেছে কিন্তু এখনও আশানুরূপ কিছুই হয় নাই। অনেককে পত্র দ্বারা জানানো সত্ত্বেও ভারপ্রাপ্ত সেবকের অনুরোধে ২রা চৈত্রের পরিবর্তে ৮ই চৈত্র মহোৎসবের দিন স্থির করিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রও ছাপানো হইল। ২৯শে ফাল্গুন বেলা বারোটার সময় পূজক শ্রীশ্রীবাবাকে জানাইল, "বাবা, ঠাকুরের ভোগের বাতাসা ফুরিয়ে গেছে, আনিয়ে দেন, ভোগ দিব।" তিনি খুব বিরক্ত হইয়া পূজককে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোর তো আচ্ছা আক্কেল! এই ভর দুপুরবেলা বাতাসার কথা

বলতে এলি ? যা, এখন অন্য কিছু দিয়ে ভোগ সেরে ফেল্।" পূজারী ছেলেটি চলিয়া গেল এবং বাবার নির্দেশ মতো কাজ সমাধা করিল।

শ্রীশ্রীবাবা কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তর্যামী ঠাকুরকে প্রার্থনা জানাইলেন, "ঠাকুর, তোমার যদি ঠিক ঠিক মিষ্টি খাবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে তুমি তার ব্যবস্থা কর।" ঐ দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে বলরাম-মন্দির হইতে স্বামী ধীরানন্দ (কৃষ্ণলাল মহারাজ) ঠাকুরের ভোগের জন্য 'আবার খাবো', নবীনের রসগোল্লা, কড়াপাকের সন্দেশ প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া সারগাছি পৌঁছিলেন। ধীরানন্দ স্বামী বেলুড় মঠের মহোৎসবের একজন প্রধান পাণ্ডা। তিনি পূর্ব পত্রানুযায়ী ২রা চৈত্র মহোৎসবে যোগদান করিতে এই প্রথম সারগাছি আসিলেন। শ্রীবাবা তাঁহাকে পাইয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের কারণ প্রসঙ্গে আশ্রম-বালকের ঠাকুরপূজার কথা বলিলেন। তখন বাবা কৃষ্ণলাল মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুক কৃপার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন, "ঠাকুর আমার সব প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন, আমি এক গুণ চেয়েছি তো ঠাকুর বিশগুণ দিয়েছেন। আজ সত্যই এই আশ্রমের বালকদের ঠাকুর-ঘরের বেদীতে ঠাকুর বসেছেন, আর সত্যই তাঁর ভোগ নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তিনি নিজেই এইভাবে সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ করেন।" ৮ই চৈত্র মহোৎসব সুসম্পন্ন দেখিয়া স্বামী ধীরানন্দ কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন।

একবার আমের সময় (১৯২৪ খৃঃ জুন) শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমবাসীদের উৎকৃষ্ট আম পরিতোষ-পূর্বক খাওয়াইয়া আনন্দ করিলেন। সকলকে তাঁহার সম্মুখে বসাইয়া নিজে ছুরি দিয়া আম ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। এই কাজ তিনি খুব দ্রুত ও কৌশল করিয়া করিতে পারিতেন, যাহাতে সমগ্র আমের খোসাটি একটি মাত্র চক্রাকারে খসিয়া পড়িত। এইভাবে দিনের পর দিন আশ্রমবাসীরা অন্নগ্রহণ না করিয়া আমই খাইত। শ্রীশ্রীবাবার সেই মাতৃবৎ সেবা যে পাইয়াছে, সে জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না।

শিবরাত্রির ব্রত উদ্‌যাপনে নিজে উপবাসী থাকিয়া সকলকে উপবাস করিতে উৎসাহিত করিতেন। তাহার ফলে আশ্রমবাসীরা শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া ধ্যান ভজন করিত। আবার গঙ্গাস্নান করিয়া ভস্ম মাখিয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দিয়া, যখন শিবের স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন, তখন মনে হইত সাক্ষাৎ শিব। ছেলেদেরও ভস্ম মাখাইতেন। সমস্ত দিন উপবাসের পর রাত্রে ঠাকুর-ঘরে গিয়া সকলের সঙ্গে 'হর হর ব্যোম, হর হর ব্যোম' বলিয়া নৃত্য করিতেন। সকালে নিজে উপবাসীদের সম্মুখে বসাইয়া প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিয়া পরম তৃপ্তিবোধ করিতেন। সকলের শেষে তিনি নিজে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। দোলপূর্ণিমাতেও আবির দিয়া সকলের সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে বরাহনগর মঠে তাঁহাদের শিবরাত্রির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "একদিন আমরা গিরিশবাবুর—

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
ববম্ ববম্ বাজে গালে।
(কিবা) রজত ভূধর নিন্দি কলেবর,
শশাঙ্ক সুন্দর শোভে ভালে॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফন্ন ফণা জাহ্নবী কল কল,
জটা মাঝে জলদজলে॥ (সিন্ধু মিশ্র—একতাল)

—এই গান গাইতে গাইতে ভাবোন্মত্ত হ'য়ে আমরা নাচতে লাগলাম। পরে স্বামীজী বললেন, 'কি রকম দেখলি ?' আমি বললাম, 'শিবের নৃত্য দেখলাম।' স্বামীজী, 'ঠিক দেখেছিস' ব'লে সমর্থন করলেন।"

বেলুড় মঠে প্রথম মহাসম্মেলন হয় ১৯২৬ খৃঃ

এপ্রিল মাসে। এর পর বেলুড় মঠে একদিন 'যাজ্ঞবল্ক্য' অভিনীত হয়। পরে, ২৯শে মে, শ্রীবাবা দুইটি পিতৃমাতৃহীন ৫।৬ বৎসরের বালককে লইয়া সারগাছি আশ্রমে ফেরেন। সে সময়ে রেঙ্গুন সেবাশ্রমের জনৈক ভূতপূর্ব কর্মী সারগাছি আশ্রমে সেবকরূপে আসেন। আশ্রমের কার্যাবলী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আশ্রমের গোয়ালঘরের পূর্বভাগে অবস্থিত একটি বড় চালা-ঘরে দাতব্য চিকিৎসালয় সাজাইয়া আর্ত নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হন। এদিকে শ্রীশ্রীবাবাও আসিবার সময় কাশীপুরস্থ জনৈকা আশ্রম-হিতৈষিণী প্রদত্ত এক দুগ্ধবতী গাভী ও একটি ভাল জাতের 'বৃষ' সঙ্গে আনেন ও এই লইয়া পল্লী অঞ্চলে গোজাতির উন্নতি সাধনে লাগিয়া যান। তিনি গবাদির জন্য তৎপর হইয়া যান। যথা নেপিয়ার ঘাস, জাপানী মিলেট্ ঘাস ইত্যাদি চাষের প্রবর্তন তিনি করেন; বৃষ পরিপালনের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা সরকারী অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা করেন ও কৃষি সংস্থা হইতে বীজ সার ইত্যাদি সংগ্রহও তিনিই করিতেন।

১৯২৬ খৃঃ নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীবাবা একবার সর্দি-কাশিতে পীড়িত হইলে, আয়োডাইড্ মিক্শ্চার সেবনে চোখ-মুখ ফুলিয়া যায়, কোনরূপ পথ্য গ্রহণ ও কথা বলাও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ভক্ত ও সেবকেরা ভীত হইয়া পড়েন, তিনি কিন্তু নির্বিকার। একটি শ্লেটে লিখিয়া ভাব প্রকাশ করিলেন: "আমার শরীর গেলে 'দণ্ডী যম জিন্‌তে যায়, দণ্ডী যম জিন্‌তে যায়' এই কীর্তনটি গাইতে গাইতে যেন মহুলার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়।" অবশ্য দুই-তিন দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হইয়া ওঠেন।

আমেরিকার বেদান্ত কেন্দ্রের বোহেমিয়া দেশীয় এক সন্ন্যাসী, স্বামী যোগেশানন্দ, ১৯২৮ খৃঃ মে জুন মাসে বেলুড় মঠে আসিলে একবার শ্রীশ্রীবাবাকে দর্শন করিতে সারগাছি আসিয়াছিলেন। বিদেশী হইলেও বাংলার আহার ও জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের বেশ অনুকূল হইয়াছিল। বাংলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতও বেশ পড়িতে পারিতেন। শ্রীশ্রীবাবার আদর আপ্যায়ন ও অপার্থিব স্নেহ ভালবাসা তাঁহাকে মুগ্ধ করে। তিনি আশ্রমের কৃষিকার্যে সুবিধার জন্য কলিকাতা হইতে একটি পাম্প ও কতকগুলি পাইপ কিনিয়া আনিয়া নিজেই বাগানের কাজ কিছু কিছু করিতেন। মাসাধিক কাল পরে ফিরিবার সময় তাঁহার কোডাক্ ক্যামেরাটি শ্রীশ্রীবাবার কাছে রাখিয়া যান। শ্রীশ্রীবাবা খুব যত্ন করিয়া উহা ঘরের দেওয়াল-আলমারীতে স্বামীজীর চিঠিপত্রের বাক্সের উপর রাখিয়া দেন। কিছুদিন পরে ফিরিয়া একদিন ফটো তুলিবার ইচ্ছা হওয়ায় ঐ ক্যামেরাটি শ্রীশ্রীবাবার নিকট হইতে আনিতে যান। ঘটনাটি ঘটে বিকাল বেলায়। শ্রীশ্রীবাবা সন্তর্পণে উহা বাহির করিয়া নতজানু স্বামী যোগেশানন্দের হাতে দিতে উদ্যত, এমন সময় দেখিলেন ক্যামেরাটিতে উই পোকা লাগিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা শিশুর মতো কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন: "দেখ, বাবা, আমি খুব অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি।" বিদেশী সন্ন্যাসী করজোড়ে, সানন্দে, বাবার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন: "মহারাজ, আমার জীবনের একটা বড় বাধা আজ দূর হ'য়ে গেল। ছবি তোলার প্রতি আমার আসক্তি এত প্রবল ছিল যে, অনেক চেষ্টা করেও তা আমি ত্যাগ করতে পারছিলাম না। এই বন্ধন থেকে আজ আমি মুক্ত হলাম।" স্বামী যোগেশানন্দ আরও কয়েক দিন শ্রীশ্রীবাবার পূতসঙ্গে বাস করিয়া তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় ৺উত্তরকাশীতে তপস্যায় যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীশ্রীবাবা অনুমতি দেন। কয়েক বৎসর ৺উত্তরকাশীতে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিয়া বৈরাগ্যবান্ পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[ভাদ্র, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

ফ্রান্স

এরপর ফ্রান্স। ৬ই নভেম্বর অক্সফোর্ড থেকে আমি গেলাম ফ্রান্সে। প্যারিসের কাছে গ্রেত্‌স্ (Gretz)-এ আমাদের একটা বেদান্ত-কেন্দ্র আছে। প্যারিসের উপকণ্ঠে নতুন এক এয়্যারোড্রোম হয়েছে প্রেসিডেণ্ট ডিগলের নামে। প্রকাণ্ড এয়্যারোড্রোম। এই এয়্যারোড্রোমে এসে নামলাম। কথা ছিল, ডঃ বিকাশ সান্ন্যাল আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবেন। ডঃ সান্ন্যাল এখন ইউনেস্‌কো-র সঙ্গে যুক্ত। 'ইউনেস্‌কো'র এখন একটা নতুন প্রতিষ্ঠান হয়েছে—ইনটারন্যাশন্যাল ইন্সটিট্যুট ফর এডুকেশন্যাল প্ল্যানিং (International Institute for Educational Planning)। তিনি তার উপ-প্রধান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আরও উন্নতি কি ক'রে করা যায়, সেই নিয়ে এই বিভাগ গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁকে প্রায়ই ঘোরাফেরা করতে হয়। সব দেশের সমস্যা একরকমের নয়। যে-দেশের যেমন সমস্যা, তেমন সে-দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত—এই নীতি এখন সর্বজনস্বীকৃত। ডঃ সান্ন্যাল এ-বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন এবং কয়েকখানি বেশ সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ বইও লিখেছেন। ডঃ সান্ন্যাল নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তন ছাত্র। কিছুদিন ওখানকার কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। কলেজটি গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর অনেক অবদান। এখনও নরেন্দ্রপুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমি প্লেন থেকে নেমে একটু এগুতেই দেখি সামনে ডঃ সান্ন্যাল। যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা, সেখানে সাধারণ নাগরিক আসতে পারে না—নিষিদ্ধ এলাকা। কিন্তু ডঃ সান্ন্যাল ইউনেস্‌কোর লোক ব'লে তাঁর অবাধ গতি! যাহোক এতে আমার সুবিধাই হ'ল। তিনি আমার জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর গাড়ীতে তুললেন। বললেন : 'এখন আমার বাড়ীতে চলুন, সেখানে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক'রে বিকেলের দিকে গ্রেত্‌স্-এ যাবেন। আমিই আপনাকে নিয়ে যাব।"

বিকাশ সান্ন্যাল প্যারিসের উপকণ্ঠে একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। বেশ বড় ফ্ল্যাট। খুব সাজানো-গোছানো। তাঁর স্ত্রী প্রীতি শুধু খুব করিৎকর্মা মেয়েই নয়, বিদুষীও। ধর্ম সম্বন্ধে তার যে-সব প্রশ্ন, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, সে এ-বিষয়েও অনেক পড়াশোনা করেছে, চিন্তা করেছে। তাদের একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। তাদেরও সুমির মতো ভাষা নিয়ে সমস্যা। মেয়েটি বড়, তের-চৌদ্দ বছরের, সে ইংরেজী ভাল জানে, ফরাসী সামান্য, বাংলা আরও কম। ইংরেজী ভাল জানে, কারণ একটা আমেরিকান আন্ত-র্জাতিক স্কুলে পড়ে। বাবা-মার সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলে; কিন্তু ভাই-এর সঙ্গে ফরাসী ভাষায়। কারণ ভাই ফরাসী ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না। এই বাড়ীতে একসঙ্গে ইংরেজী, ফরাসী ও বাংলা ভাষা চলে। যেন একটা আন্তর্জাতিক কর্মকেন্দ্র! ডঃ সান্ন্যালের মেয়েটির ভারতপ্রীতির কথা শুনলাম। সে দেশে ফিরে আসতে চায়; পাশ্চাত্যদেশ তার ভাল লাগে না। ছুটিতে ভারতে এসে নাচ শেখে। স্কুল থেকে একবার তাকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ

লিখতে বলে। সে অনেক খেটেখুটে একটা প্রবন্ধ তৈরী করে। এই প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে সে নিজে অনেক বই পড়ে, আবার বাবা-মাকেও প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। কিন্তু লেখার সময় কারও সাহায্য নেয়নি। সমস্ত মতামতও তার নিজের। শুনলাম, স্কুলে তার প্রবন্ধের খুব প্রশংসা হয়েছিল।

ডঃ সান্ন্যাল যে-পাড়াতে থাকেন, শুনলাম খুব ধনী ও সম্ভ্রান্ত যারা, কেবল তারাই সেই পাড়াতে থাকে। ডঃ সান্ন্যাল বললেন: 'এখানেও এক-রকমের জাতিভেদ আছে। আপনি কোন্ পাড়াতে থাকেন, তা থেকেই এখানকার লোকেরা আপনাকে কতটা সম্মান দিতে হবে, তা ঠিক ক'রে ফেলে। আগে আমি যে-পাড়ায় ছিলাম, তা একটা সাধারণ পাড়া। তখন আমার ততটা খাতির ছিল না। এই পাড়ায় আসার পর থেকে আমার খাতির বেড়ে গেছে।'

একটা কথা এখানে না ব'লে পারছি না। এতদিন পর্যন্ত কোথাও ভাত খাইনি। বিকাশ সান্ন্যালের বাড়ীতে খেতে বসে দেখি যে, ভাত! আমার তখন মনে প'ড়ল: কতদিন ভাত খাইনি! বহুদিন পরে একেবারে বাঙালী খাবার খেলাম। ভাত, মুগের ডাল, কপির তরকারী, বেগুনভাজা, নতুন গুড়ের পায়েস ইত্যাদি। অনেকদিন পরে বাঙালী-খাওয়া খেয়ে খুব ভাল লাগল। বিকাশ সান্ন্যালের বাড়ীতে সত্যজিৎ রায়ও গেছেন।

ডঃ সান্ন্যাল আমাকে তাঁর গাড়ীতে ক'রে গ্রেত্স্-এ আমাদের একটা বেদান্তকেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। প্যারিস থেকে ২৯ কি. মি. দূরে ভারি সুন্দর একটা জায়গায় এই আশ্রমটি গড়ে তুলে-ছিলেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ। সেই জায়গার অনেকটাই অবশ্য এখন হাতছাড়া হ'য়ে গেছে। কিন্তু যতটুকু আছে সেও বেশ বড় জায়গা। আর বাড়ীঘরও খুব সুন্দর। উনি কেরলের ত্রিবাঙ্কুর-এর লোক ছিলেন। ফরাসী ভাষা খুব ভাল জানতেন। ফরাসী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। তাঁর কথা এখনও ওখানকার লোকে মনে রেখেছে। তাঁর খুব প্রভাব ছিল ওখানকার সর্বসাধারণের মধ্যে। তাঁর মৃত্যুতে ওখানকার রেডিও থেকে সরকারী-ভাবে শোকপ্রকাশ করা হয়েছিল। এতটা তাঁর প্রভাব ছিল ফ্রান্সের বিভিন্ন মহলে।

স্বামী ঋতজানন্দ এখন এই আশ্রমের প্রধান। তিনিও দক্ষিণ ভারতীয়। অনেকদিন ওখানে আছেন। ভাল ফরাসী ভাষা শিখেছেন। বাংলাও বেশ বলতে পারেন। এক সময়ে আমরা দেওঘর বিদ্যাপীঠে একসঙ্গে ছিলাম। বস্তুতঃ আমাদের সাধুজীবনের হাতে-খড়ি ঐখানেই। বহুদিন এক ঘরেও ছিলাম। তখন তিনি আমার কাছে বাংলা শিখতেন। দেখলাম এখনও বাংলা বেশ মনে আছে তাঁর। অবশ্য উচ্চারণের দোষ আছে। এতদিন ওদেশে আছেন। তা তো থাকা স্বাভাবিক। এই উচ্চারণ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। যখন আমরা একসঙ্গে দেওঘরে ছিলাম, তখন হঠাৎ একদিন তিনি আমাকে বললেন: 'Can I have a "stou" ?' ('আমাকে একটা "স্টাউ" দিতে পার?') আমি বুঝতে পারি না 'stou' আবার কি? তিনি তখন বানান ক'রে বললেন: 's-t-o-v-e' (স্টোভ)!

স্বামী ঋতজানন্দের সহকারী যিনি আছেন তাঁর নাম বিদ্যাত্মানন্দ। বিদ্যাত্মানন্দ আমেরিকার লোক। আগে তাঁর নাম ছিল জন ইয়েল (John Yale)। বিদ্বান্ সাধু। বেদান্তকেশরী, প্রবুদ্ধ ভারত বা আমাদের অন্যান্য বিদেশের পত্রিকায় মাঝে মাঝে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে থাকেন। তিনি বাইরের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। ফরাসী ভাষা বেশ আয়ত্ত করেছেন, কিন্তু বক্তৃতা লিখে পড়েন। তিনি কখনও গেরুয়া

পরেন, কখনও কোট-প্যাণ্ট-টাই কোট-প্যাণ্ট-টাই পরলে তাঁকে সাধু ব'লে চেনা যায় না। আমি যখন প্রথম আশ্রমে বিদ্যাত্মানন্দকে দেখলাম, তখন সে আমাদের মতোই গেরুয়াপরা ছিল। কিন্তু রবিবার মীটিং-এর আগে দেখছি একজন সাহেব বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসছেন। দেখে মনে হ'ল কোথায় যেন ওঁকে দেখেছি, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না। পরে জানলাম সে বিদ্যাত্মানন্দ। কোট-প্যাণ্ট-টাই পরার জন্যে আর চেনা যাচ্ছিল না। ঋতজানন্দজীকে দেখলাম প্যাণ্ট আর একটা গেরুয়া গাউন অথবা একটা গেরুয়া ওভারকোট পরতে। ওখানে এত শীত যে এদেশী পোশাক ব্যবহার করা খুবই অসুবিধাজনক। তাই সাহেবী পোশাক পরতেই হয় ওঁদের। আর তাতে কাজেরও সুবিধা। পোশাক-সম্বন্ধে একটা কথা—খ্রীষ্টান সাধু এবং পাদ্রীরাও দেখলাম আজকাল গৃহস্থদের মতন পোশাক পরে বেড়ান। তাঁরা বলেন, এতে কাজের সুবিধে। তাছাড়া, সমাজকে বোঝা যায়, জানা যায়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্যা, তাদের সুখদুঃখ বুঝতে হবে। তবেই তো ঠিক-ঠিক তাদের সেবা করা যাবে! তাদের মতন হ'য়ে যেতে হবে, তবেই তারা মন খুলে কথা বলবে, নচেৎ একটু দূরত্ব থাকবেই।

আশ্রমটি দেখলাম খুব জমজমাট। সব সময় লোকের ভিড়। বিশেষ ক'রে রবিবার। আশ্রমটি স্বয়ংসম্পূর্ণও। বাইরের কোন সাহায্য না নিলেও চলে। নিজেদের গরু আছে—ভাল ভাল সব গরু—প্রচুর দুধ হয়। একটা খুব বুড়ো গরু আছে। বছর দুই হ'ল দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে। কিন্তু কী সেবাযত্ন তার! এখন যত গরু আছে, সবই তার নাতি-নাতনী। তাই তার এত খাতির। শুনলাম যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন তার এই আদর-যত্ন চলবে। সাধুরা আশ্রমের জমিতে চাষবাস করেন। জমিতে যা হয় তাতেই তাঁদের চলে যায়। শীতকালে জমিতে এত বরফ জমে যে, তখন তরিতরকারি কিছু হবার জো নেই। যা হবার গরমকালে হয়। সে-সব তরিতরকারি তুলে জমা রাখা হয় 'ঠাণ্ডা ঘরে' (cold storage-এ)। এ আশ্রমের প্রধান বাড়ীটির সমস্ত তলদেশ (basement) জুড়ে এই ঠাণ্ডা ঘর। যত রকমের খাবার আশ্রমের দরকার হ'তে পারে সব সাজানো আছে সেখানে। কে জানে কখন কী দরকার হয়! এ সবকিছুর পেছনে আছে একটি মানুষের চিন্তা ও পরিশ্রম—কৃষ্টা গোল্ডা। এই ভক্ত মহিলাটি সুইজারল্যাণ্ডের লোক। তাঁর কথা আমি ওখানে যাবার আগেই শুনেছিলাম। এত ভাল এবং করিৎকর্মা মহিলা বাস্তবিক খুব কমই দেখা যায়। আমি ঋতজানন্দজীকে বললাম: 'আপনি কোথা থেকে পেলেন এঁকে?' উনি বললেন: 'ঠাকুর জুটিয়ে দিয়েছেন।' এত কাজ তিনি জানেন, আর এত কাজ তিনি করেন, ভাবা যায় না। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত গোল্ডা সব সময়েই ব্যস্ত। ভোরে উঠেই দেখা যাবে গোল্ডা সাইকেলে ক'রে গোয়ালের দিকে যাচ্ছেন। দুধ আনতে হবে। সেখান থেকে হয়তো বাগানে। তরিতরকারি আনতে হবে। এত ব্যস্ত, কিন্তু সব সময়ই হাসিমুখ। সত্যিই, গোল্ডা গ্রেত্‌স্‌-এর প্রাণ।

আশ্রমের রুটিন বড় কঠিন। ভোরে উঠে ঠাকুরঘরে যেতে হবে। ওখানে যা শীত—আমরা এখানে কল্পনাও করতে পারি না। সেই শীতে ভোরে উঠে ঠাকুরঘরে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তখন আবার বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। ওখানকার যাঁরা বাসিন্দা—সাধু-ব্রহ্মচারী, কিছু ভক্ত, অতিথি—তাঁদের প্রত্যেককে ঐ ভোরে ঠাকুরঘরে যেতেই হবে। ভোর ছ-টায়

প্রার্থনা, সাড়ে সাতটায় প্রাতরাশ। ছ-টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সবাই ওখানে ধ্যান করে। তারপরে সাড়ে সাতটায় একসঙ্গে সব জলখাবার খায়। আশ্রমের অধ্যক্ষ এসে টেবিলে বসবেন—তবে খাওয়া শুরু হবে, তার আগে কেউ খাবেন না। অতি সাদাসিধে খাওয়া। আশ্রমে সবাই নিরামিষ খান। অবশ্য ডিমটা চলে। কয়েকটা মুরগি রেখেছেন—সেই মুরগির ডিম তাঁরা খান। কিন্তু মুরগি খাওয়া চলবে না। চীজটা থাকে। এই চীজটাই একমাত্র পুষ্টিকর জিনিস। ফরাসীরা দেখলাম 'চীজ' খুব খায়। ফরাসীদের সম্বন্ধে অনেকে বলেন: 'ওরা বেঁচে আছে চীজ খেয়ে।' কত রকমের চীজ যে ওখানে পাওয়া যায় তার হিসেব নেই। প্রাতরাশের পর প্রত্যেকে কাজে লেগে যায়। বসে থাকলে চলবে না। অতিথিকেও কাজ করতে হবে। তবে অবশ্য আমার বেলাতে একটুখানি ব্যতিক্রম করেছিলেন ওঁরা। কাজের পর একটা শাস্ত্রের ক্লাস হয়। ক্লাসের পর যার যা ব্যক্তিগত প্রশ্ন থাকে তার উত্তর দেন স্বামীজীরা। স্বামীজীরা অর্থাৎ স্বামী ঋতজানন্দ ও স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ। তারপর দুপুরের খাওয়া। খাওয়া শুরুর আগে 'ব্রহ্মার্পণম্' হয়। দুপুরের খাওয়ার পর এক-দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম। বিশ্রামের পর আবার ক্লাস। তারপরে আবার কাজ। বিকেলে সামান্য চা-জলখাবার। এরপর একটুখানি সময় ওঁরা পায়চারি করে বেড়ান। তারপরে সন্ধ্যেবেলা আবার প্রার্থনা। প্রার্থনার পর রাত্রের খাওয়া। খাওয়ার পরে একসঙ্গে সব সমবেত হন। তখন কিছু ভারতীয় গান টেপে চালানো হয়। গানের পর একটা বই থেকে একটু পড়া হয়। তারপর প্রশ্নোত্তর। মাঝে মাঝে উচ্চ মানের ভারতীয় ছায়াছবিও দেখানো হয়।

গ্রেত্স্-এ আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল দেখে যে, ভক্তেরা এসে ওখানে অনেক কাজ করেন। আমার মাথায় বেশ বড় চুল হয়েছে—আমাকে বিদ্যাত্মানন্দ এসে বললেন: 'আপনার যদি চুল কাটার দরকার হয়, আমাদের একজন ভক্ত আছে, সে এসে আপনার চুল কেটে দিয়ে যাবে।' একটু পরে দেখি, একটি সাহেব এসে বলছে: "Swamiji, I am at your service. Can I do anything for you? I am your barbar.' (স্বামীজী, আমি আপনার সেবক। কিছু কি সাহায্য করতে পারি? আমি আপনার ক্ষৌরকার)। আমি টুপি খুলে বললাম: 'দেখ তো, আমার চুল কি খুব বড় হয়েছে?' ও দেখে একটু হেসে ব'লল: 'না, এমন কিছু হয়নি। কাটবার দরকার নেই। কাটলে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' এখন মনে হচ্ছে, কাটলে ভাল হ'ত। ওরা কিভাবে চুল কাটে দেখতাম। ওখানকার ভক্তরাও দেখলাম আশ্রমকে নিজেদের ব'লে মনে করেন। ওখানে হয়তো ছুটি কাটাতে এসেছেন। কিন্তু কেউ বসে থাকেন না। যতদিন থাকবেন আশ্রমের কিছু সেবা ক'রে যাবেন। আর সাধুদের জন্য যা রুটিন তা-ই তাঁরা অনুসরণ করবেন। একদিন একজন আমাকে বললেন: 'আপনার কাছ থেকে মহাপুরুষ মহারাজের কথা কিছু শুনতে চাই।' তাঁরা শুনেছেন যে, আমি মহাপুরুষ মহারাজকে দেখেছি। তাঁদের কাছে মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে দু-চার কথা বললাম ইংরেজীতে। একজন ফরাসী ভাষায় সেটা অনুবাদ ক'রে দিলেন। আর একদিন আমাকে ওঁরা বেদান্তের উপরে বলতে বললেন। সেদিন ছিল রবিবার। বহু ভারতীয় এসেছেন, আবার বেশ কিছু ওদেশীয় ভক্তও এসেছেন। বক্তৃতার পরে প্রশ্নোত্তর। ভারতীয়দের মধ্যে দু-চারজন যা প্রশ্ন করলেন, তা শুনে খুব খারাপ লাগল। 'ভারতে কেন এত

দারিদ্র্য ? কেন এত বৈষম্য ?'—ইত্যাদি সব প্রশ্ন। এদেশের ভাবমূর্তিটাকে এভাবে একেবারে নষ্ট ক'রে দেন তাঁরা। পশ্চিম জার্মানিতে এটা দেখেছিলাম, এখানেও সেই একই অভিজ্ঞতা হ'ল। খুব দুঃখের বিষয় এটা।

বেদান্ত সম্বন্ধে বলবার পর শ্রোতাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক আমাকে বললেন : 'সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি যদি ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলেন খুব ভাল হয়।' ভদ্রলোক সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক—ইণ্ডোলজি' বিভাগের সহকারী প্রধান। পাশ্চাত্যের প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই আজকাল 'ইণ্ডোলজি' বা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা বিভাগ আছে। সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে। সরবোর্ন শুধু ফ্রান্সেরই নয়, সারা ইউরোপের এক সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। এবার আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দিয়েছে। সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় এখন চৌদ্দটা ভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে। কয়েক বছর আগে ওখানে খুব গোলমাল হয়। তারপরে বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়কে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ তার একটা অংশে ভারতীয় বিভাগ। যাই হোক, ঐ অধ্যাপক ভদ্রলোকের ব্যবস্থাপনায় সেখানে 'ভারতীয় সভ্যতা' সম্বন্ধে আমি একদিন বললাম। সকলেই ইংরেজী জানেন—অনুবাদের কোন দরকার হ'ল না। তারপর যথারীতি প্রশ্নোত্তর হ'ল। বেশ ভাল প্রশ্ন করলেন সবাই। এখানে শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় চারশো। সেদিন আমার বক্তৃতা দিয়েই ওখানকার 'ইণ্ডোলজি' বিভাগের পরবর্তী পাঠক্রম উদ্বোধন করা হ'ল।

এরপরে প্যারিসের নানা জায়গা ঘুরে দেখলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্যারিসের খুব একটা ক্ষতি হয়েছে ব'লে মনে হ'ল না। প্যারিসের 'নটরড্যাম' দেখলাম। কিছুক্ষণ সেখানে বসে প্রার্থনাও করলাম। 'ইউনেসকো'র 'ইনটার-ন্যাশন্যাল ইন্সটিট্যুট ফর এডুকেশন্যাল প্ল্যানিং' একটা সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে সেমিনার। ভারত, বাংলাদেশ, চীন, কোরিয়া, জাপান এবং আরও নানা দেশের প্রতিনিধিরা সেই সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। বহুদিন শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে আমিও ছিলাম সেই সেমিনারে একজন আমন্ত্রিত প্রতিনিধি। আমি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ ক'রে উপকৃত হয়েছি। কিছু সুনির্দিষ্ট বক্তব্যও সেখানে রেখেছিলাম।

আর একটা কথা এখানে বলি। ধর্মজীবন সম্পর্কে আমরা কি করি ? গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিই। তারপর মাঝে মাঝে ঠেকে গেলে গুরুর কাছে যাই বা কোন সাধুর কাছে যাই। কিন্তু ওদের দেখলাম প্রতি পদক্ষেপে ব'লে দিতে হবে—'তুমি এই করবে, এই করবে না। তুমি এইভাবে ধ্যান করবে, এইভাবে জপ করবে, এতক্ষণ করবে, এই-এই বই পড়বে, এই-এই খাবে।' যদি বিধিনিষেধ না থাকে তাহলে ওরা খুশী হবে না। বস্তুতঃ সমস্ত খ্রীষ্টান ট্র্যাডিশনটাই এই বিধিনিষেধের উপরে দাঁড়িয়ে আছে।—'এটা করবে, আর এটা করবে না।' ছোট শিশুকে যেমন বলতে হয়। আমরা ভারতীয়রা বরং স্বাধীনতা চাই। ধর্মজীবনেও স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে চাই। ওদেশে কিন্তু সেরকম নয়। ওদেশে গিয়ে এই ধারণাটা আবার খুব দৃঢ় হ'ল। [ক্রমশঃ]

কথামৃত-প্রবেশ

স্বামী চেতনানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিষ্ণুঘর—মায়ের মন্দিরের উত্তরে রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ; পশ্চিমাস্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে প্রথম পূজারীর কার্যে ব্রতী হন ১৮৫৫-৫৬ মন্দিরের গোবিন্দ-বিগ্রহের ভগ্ন পা ঠাকুর জোড়া লাগান। এই মন্দিরের বারান্দায় ভাগবত শোনার কালে ঠাকুরের "ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান্ এক"—এই দিব্য অনুভূতি হয়। কেশব সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে থাকলে, ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরের সর্বনিম্ন সিঁড়ির মধ্যস্থলে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম করতেন, লোকশিক্ষার জন্য। (শ্রীম-দর্শন, ৪।৬৭)।

ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দা—শ্রীম ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন করেন এই বারান্দায়। এখানে ঠাকুরের সময় কীর্তনাদি হ'ত। এই বারান্দা ছিল হাজরার আড্ডাখানা। একটি ঘটনা: "একদিন ঠাকুর ছোট খাটে রাত্রে শয়ন করিয়াছেন; বাবুরাম মহারাজ পাখা করিতেছেন। স্বামীজী হাজরা মহাশয়ের নিকট পূর্বের বারান্দায় তামাক খাইতেছিলেন। হাজরা মহাশয় স্বামীজীকে বলিতেছেন—'তোরা ছেলেমানুষ ওঁর কাছে যাওয়া আসা করিস, আর উনি তোদের সন্দেশটা আমটা খাইয়ে ভুলিয়ে দেন। ওঁকে ধর। চেপে ধরে কিছু আদায় ক'রে নে।' ঠাকুরের কানে এইসব কথা পৌঁছান মাত্র তিনি ধড়মড় ক'রে উঠে উলঙ্গ অবস্থায় এক পাটি চটি ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে সজোরে বললেন—'নরেন, চলে আয়, ওখান থেকে চলে আয়। ওসব পাটোয়ারী বুদ্ধি শুনিস্নি। যারা ভিকিরি তারা 'বাবু একটা পয়সা দাও, বাবু একটা পয়সা দাও' ব'লে কানের পোকা বার করে। বাবুও 'দে—একটা পয়সা দিয়ে বিদেয় ক'রে দে' ব'লে, একটা পয়সা ফেলে বিদেয় ক'রে দেয়। তোরা যে আপনার লোক, তোদের কি চাইতে হবে! আমার যা কিছু আছে সবই যে তোদের।" (ঘটনাটি স্বামী শঙ্করানন্দজী পূঃ বাবুরাম মহারাজের কাছে শুনেছিলেন এবং অখিলানন্দজীকে ১৫।৪।১৯৩০ এর পত্রে লেখেন)।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর—এখানে ঠাকুর দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন (আনুমানিক ১৮৬৯-৮৫)। ঠাকুরের ঘরের সে পুরানো মেজে আর নেই। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের শতবার্ষিকী উৎসবকালে লাল সিমেণ্টের পরিবর্তে মোজাইকের মেজে করা হয়েছে। 'কথামৃতে'র অধিকাংশ কথোপকথন এই ঘরে হয়েছে। এই ঘরের সঙ্গে জড়িত আছে অজস্র ঘটনা।

শ্রীম'র আত্মকথা: "সিঁথু বললে, চল যাই আর একটি বাগান আছে রাসমণির। ওখানে একটি সাধু থাকেন। আসা গেল মেইন গেট দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হবার আধ ঘণ্টা বাকী। বাগান দেখে মুগ্ধ হলুম। ফুল দেখছি, ফুল তুলছি, ফুল শুঁকছি। আর ফুলের সৌন্দর্যের কথা ভাবছি। (সহাস্যে) আমি একটু poet (কাব্যরসিক) ছিলাম কিনা! শেষে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ। ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট—ভক্তরা সব নিচে বসে। আমি কাউকে চিনি না। প্রথম কথা শুনলুম ঠাকুর বলছেন, যখন ঈশ্বরের নামে দুনয়নে ধারা বইবে, অঙ্গে পুলক হবে, তখন বোঝা যাবে কর্ম ত্যাগ হয়েছে।" (শ্রীম-দর্শন, ১।৩৪০)।

সিঁদু শ্রীমকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যায়, কিন্তু সে আর কোনদিন ঠাকুরের কাছে গেছে ব'লে উল্লেখ নেই। ভগবানের বিচিত্র লীলা!

পরবর্তীকালে শ্রীম যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে ঢুকতেন, তখন কী করতেন এবং কী বলতেন তা সব প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় রয়েছে :

"ছোট খাটের মধ্যস্থলে শ্রীম পুনরায় প্রণাম করিলেন, পশ্চিমাস্য। এই স্থলে ঠাকুরের পাপোশ থাকিত। শ্রীম শীতকালে ঠাকুরের আদেশে এই পাপোশের উপর বসিতেন। এই পাপোশের উপর শ্রীম বসিয়াছিলেন একদিন। রাত্রি তখন আটটা। ঘরে আর কেহ নাই। ঠাকুর ভাবসমাধি হইতে ব্যুত্থিত। তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসেন নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হইবে যেন মাতাল। শ্রীমকে জড়িত কণ্ঠে বলিয়াছেন, 'কেউ যেন মনে না করে, মায়ের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। মা এক টুকরো খড়কুটো থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করতে পারেন।'" (শ্রীম-দর্শন, ১০।১৯১-৯২)। শ্রীম সংসার ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন গৃহে থেকে লোকশিক্ষা দিতে, সংসারসন্তপ্ত মানুষকে 'ভাগবত' শোনাতে।

শ্রীম বলেছেন, "দক্ষিণেশ্বরের সব দেখতে হয়।...আর ঠাকুরের ঘরের সব—দুটি খাট, বিছানা, গঙ্গাজলের জালা, দেবদেবীর ছবি—কালী, কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য সংকীর্তন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, যীশুর ছবি—পিটার জলে ডুবে যাচ্ছে। এসবই দেখা উচিত। শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি—এটি লালাবাবুর স্ত্রী রানী কাত্যায়নী ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। আর একটি ছবি আছে ঠাকুরের বিছানার পাশে পশ্চিমের দেয়ালে টাঙান, বাগ্‌দেবীর ছবি। নূতন কেউ এলে ঠাকুর ঐ ছবিখানার দিকে একবার চেয়ে নিতেন আর প্রার্থনা করতেন, 'মা, আমি মুখ্যু; তুমি এসে আমার কণ্ঠে বস।' তারপর কথা কইতেন।

"অতি সামান্য জিনিসটিও মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়। ভাল ক'রে দেখা থাকলে ধ্যানের সময় ঐসব মনে উঠবে। আপনার বাড়ীতে মশারীর নিচে বসেও একজন সারারাত দক্ষিণেশ্বরে কাটাতে পারে, ভাল ক'রে দেখা থাকলে। ইচ্ছে করলে এও ভাবা যায়, আমি মায়ের সামনে বসে ধ্যান করছি।" (শ্রীম-দর্শন, ৩।২-৩)।

কত দর্শন, কত সমাধির তরঙ্গ বয়ে গেছে এই ঘরে। এখানকার আধ্যাত্মিক আবহাওয়া তুলনাহীন, অনুভবসিদ্ধ।

পশ্চিমের গোলবারান্দা — এখানে ঠাকুর প্রায়ই বসে থাকতেন। কখনও দাঁড়িয়ে মা-গঙ্গাকে দর্শন ও প্রণাম করতেন।

উত্তরের বারান্দা—একদিন এই বারান্দায় স্বামী বিবেকানন্দ "চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন" গানটি গেয়েছিলেন। গানটি শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হ'য়ে যান। বারান্দার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ নির্দেশ ক'রে শ্রীম বলেন, "এইখানে ঠাকুর দাঁড়ান। পিছনে দেয়াল। সব স্থির—নয়ন পল্লবহীন। এক দিব্য আনন্দের ছটা মুখমণ্ডলে। শান্তি আর প্রেম যেন জমাট বেঁধে আছে।" (শ্রীম-দর্শন, ৩।২৪০)।

ঐ বারান্দার বাইরে রোয়াকের উত্তর-পূর্ব কোণ নির্দেশ ক'রে শ্রীম বলেন, "ঠাকুর এখানে দাঁড়িয়ে ভক্তদের বিদায় দিতেন।" (শ্রীম-দর্শন, ৩।২৪০)।

উত্তরের বারান্দার উত্তরের রাস্তা—শ্রীম বলেন, "একদিন গিয়ে দেখি, ঠাকুর ঝাড়ু দিচ্ছেন তাঁর ঘরের উত্তর দিকের রাস্তায়। আমায় দেখে বললেন, মা এখানে বেড়ান। তাই রাস্তাটা সাফ করছি।" (শ্রীম-দর্শন, ৯।১১৯)।

নহবত—"এই ন'বতপীঠ নবীন শক্তিপীঠ। মায়ের তপোভূমি। শ্রীশ্রীমা সুদীর্ঘকাল এখানে বাস করেন। বারান্দার চারিদিকে দরমার বেড়া ছিল। প্রকোষ্ঠটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে হাত ছয়েক হইবে। এখানে মা থাকিতেন যেন খাঁচায় পাখী।" (শ্রীম-দর্শন, ১০।১৮৫)। দোতলায় উঠবার সিঁড়ি নির্দেশ ক'রে শ্রীম বলেন, "মাঠাকরুন সারাদিন এই সিঁড়িতে বসে জপ করতেন। বসে বসে বাত হ'ল। তা আর সারাজীবন গেল না। এইটুকুন ঘর, সব জিনিসে পূর্ণ। স্ত্রীভক্তরাও কেহ কেহ থাকতেন। আবার মাছ জিয়ান—কল কল শব্দ হচ্ছে। ঠাকুরের জন্য ঝোল হবে। উঃ, কী অমানুষিক ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, কী সংযম, কী ত্যাগ আর সেবা!" (শ্রীম-দর্শন, ৩।২৩৬)।

'কথামৃতে'র একটি ছবি: "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের পার্শ্বে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন নহবতের বারান্দার এক পার্শ্বে বসিয়া, বেড়ার আড়ালে মণি গভীর চিন্তামগ্ন। তিনি কি ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন? ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়াছিলেন, মুখ ধুইয়া ঐখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'কিগো, এইখানে ব'সে! তোমার শীঘ্র হবে। একটু করলেই কেউ বলবে, এই এই!'" (২।১১।২)।

পোস্তা—শ্রীম বলেন, "ঠাকুর মাঝে মাঝে পোস্তার উপর বেড়াতেন—রাত দুটো তিনটের সময়। তখন অনাহত শব্দ শুনতে পাওয়া যায় বলতেন। যোগীরা শুনতে পান।" (শ্রীম-দর্শন, ১।২৫২)।

পুষ্পোদ্যান—"উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ।" (কথামৃত, ১।১)। শ্রীম'র বর্ণনায় আছে কুঠীর পার্শ্বে, গাজীতলায়, হাঁসপুকুরের পূর্বপার্শ্বে ফুলবাগিচার উল্লেখ আছে। শ্রীম'র পুষ্পোদ্যানের বর্ণনা পড়লে মনে হয় যেন নন্দনকাননে প্রবেশ করেছি: "অতি প্রত্যূষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়।" (কথামৃত, ১।১)। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে ঠাকুরের সময় কি কি ফুল ফুটত? শ্রীম তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন: মল্লিকা, মাধবী, গুলচী, চাঁপা, ঝুমকাজবা, গোলাপ, কাঞ্চনপুষ্প, অপরাজিতা, জুঁই, শেফালিকা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, বেল, ধুতুরা, গন্ধরাজ, পদ্মকরবী, কোকিলাক্ষ, কৃষ্ণচূড়া, জবা, পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।

শ্রীম লিখেছেন, "মল্লিকা, মাধবী ও গুলচী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন।…শ্রীরামকৃষ্ণ এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল। অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ্ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক-একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশি পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।" (কথামৃত, ১।১)।

বকুলতলা—নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করতেন এবং শ্রীশ্রীমাও রোজ ভোর তিনটার সময় স্নান করতেন।

শ্রীম বলেন, "এইখানে ঠাকুরের মায়ের অন্তর্জলী হয়। এইখানেই ঠাকুর গর্ভধারিণীর চরণ ধরিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'মা, তুমি কে গো আমায় গর্ভে ধারণ করেছো!' নিজেকে নিজে জানতেন কিনা—অবতার। তাই বিস্ময়ানন্দে বলতেন, 'তুমি সাধারণ মা নও।' " (শ্রীম-দর্শন, ৪।৬৪)। "এই ঘাটের দক্ষিণের পোস্তায় বসিয়া নরেন্দ্র একটি আগমনী গান ঠাকুরকে শুনাইয়াছিলেন, গানটি নূতন শিখিয়াছিলেন।" (শ্রীম-দর্শন, ১০।১৮৪)।

বকুলতলার অদূরে অল্প উত্তরে গঙ্গাতীরে একটি ইটের বেদিকা আছে। শ্রীম বলেন, "এই আসনে একদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হ'য়ে বসেছিলেন।" "শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই উহাতে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন।" (শ্রীম-দর্শন, ৫।১১২, ৪।৮১)।

পঞ্চবটী—বকুলতলার কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সাধনা করেছিলেন এবং রাত্রে কখন কখন উঠে যেতেন। অস্তগামী সূর্য দেখে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বলতেন, "মা, আর একটি দিন চলে গেল, তবু দেখা দিলিনি।" বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী ও বিল্ব—এই পঞ্চবৃক্ষের সমাহারে পঞ্চবটী। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করেছিলেন, বেড়া দিয়েছিলেন, বৃন্দাবনের রজঃ ছড়িয়েছিলেন।

শ্রীম বলেন, "পূর্বে এইস্থানে নীলকর সাহেবরা থাকিত। এই বটবৃক্ষ ও বেদী তখনকার। এই বেদীই ঠাকুরের আদি সাধনপীঠ।" (শ্রীম-দর্শন, ৩।২৩৭)। "পঞ্চবটী ও পুরাতন বটবৃক্ষবেদিকার মধ্যস্থলে মাধবীলতা বিদ্যমান। ইহা বেশ মোটা হইয়াছে। শ্রীম ইহা দেখাইয়া বলিলেন, 'এই মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবন হ'তে আনিয়ে নিজ হাতে ঠাকুর রোপণ করেছিলেন। এইস্থানেই খোলা জায়গায় তোতাপুরী থাকতেন।' " (শ্রীম-দর্শন, ৫।১১৩)।

স্বামী সুবোধানন্দ একদিন শ্রীমকে এই ঘটনাটি বলেন, "ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। পঞ্চবটীতে বসে বসে একদিন তৃণ বাচছি। একটি মেয়ে মানুষ পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শেষে বলছে অভিমানে—কি সাধু, আমি অতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তোমার পেছনে। আর তুমি একবারও ফিরে চাইলে না, না একটি কথা বললে! আমি যে আখড়ায় গেছি সেখানে এমন একটি লোকও দেখি নাই যে আমার সঙ্গে কথা কয় নাই, আর আমায় ওখানে থাকতে বলে নাই! আহা, এই সাধুটি ভাল। একবারও ফিরে চাইলে না।" (শ্রীম-দর্শন, ৬।২৯২)।

শ্রীম ঠাকুরের এই অপরূপ দর্শনটির কথা বার বার বলতেন: "ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন। মাস্টার ও লাটু পঞ্চবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাস্য হইয়া দেখিতেছেন।

"ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়া জাহ্নবী-জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—তাহাতে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে।

"ঠাকুর আসিতেছেন—যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ দেহ ধারণ করিয়া মর্তলোকে ভক্তের জন্য কলুষবিনাশিনী হরিপাদাম্বুজসম্ভূতা সুরধুনীর তীরে বিচরণ করিতেছেন! সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত।—তাই কি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, উদ্যানপথ, দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা, সেবকগণ, দৌবারিকগণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর হইতেছে!" (কথামৃত, ৪।১৬।২)।

ধ্যানঘর বা সাধনকুটীর—পঞ্চবটীর পূর্ব গায়ে সাধনকুটীর। এখানেই শ্রীতোতাপুরী ঠাকুরকে বেদান্তের চূড়ান্ত সাধন ফল নির্বিকল্প-সমাধিলাভে সহায়তা করেন। শ্রীম বলেন, "পূর্বে এই কুটীরটি ছিল মৃন্ময়, তখনই এই ঘরে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হয়। পরে হয় এই ইটের ঘর;

ঐ ঘরে তখন কিছুই ছিল না। এখন এই শিব-মূর্তি স্থাপন করেছে। কালে কত হবে আর ঠাকুরের নামে চালাবে সর্বত্রই এইরূপ হয়।" (শ্রীম-দর্শন, ৮।২২)।

ঝাউতলা—পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়ে লোহার তারের রেলিং আছে। এতে পা আটকে গিয়ে ঠাকুর পড়ে যান ও হাত ভাঙেন। ভাবে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিলেন। তার ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারটি ঝাউ গাছ। শ্রীম অনেকবার বলেছেন, ঠাকুর এই ঝাউতলায় দাঁড়িয়ে নিজের অবতারত্ব সম্পর্কে বহু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। (শ্রীম-দর্শন, ৬।২২৪)।

বিল্ববৃক্ষ—"ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম মহা সাধনপীঠ! তন্ত্রের প্রায় যাবতীয় সাধন এইখানেই হইয়াছে। এইস্থানেই সেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। বিল্ববৃক্ষের চার দিকে একটি গোলাকার বেদী, দুই ফুট উচ্চ। শ্রীম পশ্চিম-উত্তর দিকে আসিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। এইস্থানে একদিন ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে সশরীরে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন! শ্রীম বেদীর উপর বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। হৃদয়ে যাঁর ধ্যান করিতেছিলেন, নয়ন মেলিয়া তাঁহাকেই সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। আহা মনুষ্য জীবনে এই দৃশ্য কী সুদুর্লভ!" (শ্রীম-দর্শন, ৩।২৩৮)।

হাঁসপুকুর, আস্তাবল ও গোশালা—পঞ্চবটীর পূর্বদিকের পুষ্করিণীর নাম হাঁসপুকুর। ঐ পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা। বর্তমানে আস্তাবল ও গোশালা আর নেই। গোশালার পূর্বদিকে খিড়কী ফটক! এই ফটক দিয়ে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাওয়া যায়।

হাঁসপুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর দাঁড়িয়ে ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, "'দ্যাখ, আর একটু বেশী বেশী আস্‌বি। সবে নূতন আসছিস্ কিনা! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন-পতি (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য)। কেমন আসবি তো?' নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'হাঁ চেষ্টা করবো'।" (কথামৃত, ১।১০)।

কুঠী—ঠাকুরবাড়ীতে আসলে রানী রাসমণি, মথুরবাবু প্রভৃতি এই দ্বিতল কুঠীতে থাকতেন। তাঁদের জীবদ্দশায় ঠাকুর এই কুঠীর নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকতেন। শ্রীম বলেন, "এখানে ষোল বছর ছিলেন ঠাকুর।* অক্ষয়ের মৃত্যুর পর ঐখানে গেলেন, এখন সেটি ঠাকুর-ঘর। ঠাকুরের মা শোকে আর এই ঘরে থাকতে চাইলেন না।" (শ্রীম-দর্শন, ৪।৬৭)।

এই কুঠী থেকে মথুরবাবু ঠাকুরের পূর্ব-উত্তরের বারান্দায় ভ্রমণরত ঠাকুরের মধ্যে শিব ও কালী দর্শন করেছিলেন।

বাসন-মাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক—উঠানের দেউড়ী ও কুঠীর মধ্যবর্তী যে পথ সেই পথ ধরে কিছু পূর্বদিকে গেলে ডান হাতে একটা বাঁধা ঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটি বাসন-মাজার ঘাট এবং পথের অনতিদূরে অর্থাৎ পুকুরের উত্তর পার্শ্বে ঘাটের কাছে গাজীতলা। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে ইসলাম সাধনা করেছিলেন। ঐ পথ ধরে একটু এগোলেই সদর ফটক। কলকাতার লোক এই ফটক দিয়ে কালীবাড়ী প্রবেশ করেন। শ্রীম লিখেছেন, "কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ির দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য আকর গ্রন্থ অনুযায়ী কুঠীবাড়ীতে ঠাকুর ১৪ বৎসর (১৮৫৫-৬৯) ছিলেন।—সঃ

পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচি মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।" (কথামৃত, ১।১)।

যদু মল্লিকের বাগানবাড়ী—কালীবাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই বাগানবাড়ী। ঠাকুর সেখানে কখন কখন বেড়াতে যেতেন এবং ঐ বাড়ীর বৈঠকখানার ঘরে তাঁর খ্রীষ্টের দর্শন হয়।

'কথামৃত' যে কেবল দক্ষিণেশ্বরেই সংগৃহীত তা নয়; এটা রূপ নিয়েছে বিভিন্ন পরিবেশে, যেমন কলকাতার বিভিন্ন ভক্তগৃহে, উৎসব ক্ষেত্রে, চলতি ঘোড়ার গাড়ীতে, স্টীমারে, সার্কাসে, ময়দানে, থিয়েটারে, শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে। লোকে সাধারণতঃ ধর্ম-উপদেশকে নীরস ও কঠিন মনে করে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রসঙ্গগুলি সরস ও সহজ। তার উপর শ্রীম 'কথামৃত'কে কাব্যিক ও গতিশীল পরিবেশের মধ্যে ফেলে আরও মধুময় ক'রে তুলেছেন।

৪। কথামৃতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' সম্বন্ধে অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে' (২য় খণ্ড) একটি সুবিস্তৃত গবেষণা-মূলক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করেছেন যে, এ গ্রন্থ 'সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য ও জীবনীসাহিত্য'। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীর প্রশস্তি ও সমালোচনা উল্লেখ ক'রে 'কথামৃতে'র অনন্যত্ব দেখিয়ে কতিপয় বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। যেমন 'কথামৃতে'র প্রাণবান্ ভাষা সম্পদ, তুলনাহীন উপমা, অনবদ্য কাব্যিক বর্ণনা, নিরপেক্ষ বস্তু দর্শন, নিখুঁত চিত্র, উচ্চাঙ্গের নাটকীয়তা, সরস রসিকতা, শিক্ষাপ্রদ নীতিকাহিনী, তদানীন্তন সমাজচিত্র, নিরাকার অদ্বৈততত্ত্ব থেকে সাকার উপধর্ম, সমন্বয়ের বার্তা। 'কথামৃতে'র মুখ্য লক্ষণ প্রসঙ্গে শংকরীবাবু লিখেছেন, "কথামৃতের মুখ্য লক্ষণ 'রামকৃষ্ণ'—ক্ষণে-ক্ষণে বিকিরিত রামকৃষ্ণ। হাস্যে-পরিহাসে, গভীরতায় গহনতায়, অবস্থানে প্রস্থানে প্রত্যাবর্তনে—রামকৃষ্ণ। সম্মোহক রামকৃষ্ণ।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৯৯)।

'কথামৃতে'র প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রামাণিকতা। শ্রীম এর উপকরণ সংগ্রহপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি "নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবা ভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।...বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।" (কথামৃত, ১ম ভাগ, 'শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত')।

দ্বিতীয়, 'কথামৃতে'র গভীরতা ও হৃদয়গ্রাহিতা। শ্রীম এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ঠাকুর সর্বত্রই দেখতেন নারায়ণ। মানুষ দেখে কেবল বাইরের ছবিটা। ঠাকুর দেখতেন ভিতর বাইর দুই-ই। সকল ভিতর বাইর নারায়ণ, সকল জীবের ভিতর বাইর নারায়ণ—নারায়ণময় জীবজগৎ। ঠাকুরের দৃষ্টি সর্বদা ঐ depth-এ (গভীরে), ঐ মূলে। সমাধির পর হয় এই অবস্থা। মন একেবারে বিলীন সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে। তারপর যখন নীচে নামতে থাকে নাম-রূপে, তখন দেখে ঐ সচ্চিদানন্দই এই নাম-রূপ ধারণ ক'রে রয়েছেন। একে ঠাকুর বলতেন বিজ্ঞানীর অবস্থা। তাই ঠাকুরের ভাষা, তাঁর কথা অত attractive (হৃদয়গ্রাহী)। কথামৃতের charm (সৌন্দর্য) এইখানে। তিনি যা বলেছেন সব গোড়ায় বসে বলেছেন, সকল ভাবের প্রান্তদেশে বসে বলেছেন।...যে শোনে তার প্রাণে গিয়ে প্রবেশ করে। এ শক্তি অবতারাদির হয়।" (শ্রীম-দর্শন, ৬।১৯৯)।

তৃতীয়, 'কথামৃতে'র জীবন্ত বর্ণনা ও রচনাশৈলী। শ্রীম বলেন, "এমন অনেক রিপোর্টার আছে তারা একটা ঘটনাকে একেবারে

Visualise (প্রত্যক্ষ) করিয়ে দিতে পারে। তদের art (কৌশল) এমনই জীবন্ত। এটা একটা খুব উচ্চ স্তরের শক্তি।…ঠাকুরের এ শক্তি ছিল অতি অসাধারণ। একজন নিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু তিনি এমনি বর্ণনা করতেন যে বাধ্য হ'য়ে তাকে মনে ঐ ছবিকে আসন দিতে হ'ত। যেমন একজন বলছে, খাবে না, কিন্তু তরকারীর অমনি সুগন্ধ যে সামনে ধরতেই সে এক থালা ভাত খেয়ে ফেলে।…পেইন্টিং আবার দু'রকম আছে—তুলি দিয়ে আর ভাষা দিয়ে। কারো কারো realistic faculty (রূপায়ণ শক্তি) এমন strong (প্রবল) যে, সমস্ত ঘটনা যেমন দেখছে ঠিক তেমনি পেইন্ট ক'রে দিতে পারে তুলি দিয়ে, আবার ভাষাতেও তাই হয়। ভগবান্ দর্শন হয়েছে যাঁদের তাঁদের এই faculty (শক্তি) জীবন্ত, মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। ঠাকুরের ঐ শক্তি ছিল।" (শ্রীম-দর্শন, ৬।১৯৮-৯৯)।

চতুর্থ—'কথামৃতে'র মৌলিকতা ও অপূর্বতা। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমকে লিখেছিলেন, "বইটি সত্যই অপূর্ব। আপনার প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতিপূর্বে আর কোন জীবনচরিতকার কোন মহাপুরুষের জীবন ঠিক এইভাবে নিজের কল্পনায় কিছুমাত্র অনুরঞ্জিত না ক'রে প্রকাশ করেনি।" (বাণী ও রচনা, ৮।১৭-১৮)।

পঞ্চম, 'কথামৃত' সৎসঙ্গের প্রতিভূ। এ গ্রন্থের পাঠক স্থান কাল ভুলে অনুভব করেন দিব্যমানবের সান্নিধ্য। 'কথামৃতে'র বর্ণনা পড়লে মনে হয়, উৎসব চলছে—গান, বাজনা, নৃত্য, যাত্রা, থিয়েটার, হাস্যকৌতুক, বনভোজন, পূজা, ধ্যান, সমাধি। এতে বিন্দুমাত্র একঘেয়েমি নেই

'কথামৃত' শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবীলীলানাট্য। এতে রয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ—জ্ঞানী, গুণী, সাধু, যোগী, পণ্ডিত, খেপা, ভণ্ড, লম্পট, মাতাল। এরা কেউ কম নয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে মূল নট শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ষষ্ঠ, 'কথামৃতে'র বাণী—সব ছেড়ে ঈশ্বরকে ধর। কারণ এই পথই শান্তির পথ, আনন্দের পথ। শ্রীম বলেন, "ঠাকুরের উপদেশ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোকের জন্য—সর্বত্যাগী অর্থাৎ যোগী-সন্ন্যাসী, আর যোগী-ভোগী অর্থাৎ গৃহস্থ ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। এক শ্রেণী সিধে চলেছে আদর্শের দিকে। অপর শ্রেণী চলেছে একটু ঘুরে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদের বলেছেন সর্বদা প্রথম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গ করতে। নইলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। (শ্রীম-দর্শন, ১০।১৫০)।

১৯৮২ একটি শুভ বৎসর। এ বছরে চলছে 'কথামৃতে'র শতবর্ষপূর্তি উৎসব। শ্রীম'র জীবদ্দশায় 'কথামৃতে'র বার্ষিক জন্মোৎসব পালনের প্রসঙ্গ উঠেছিল। যদু মল্লিকের বাড়ীতে মহেন্দ্র গোস্বামী ভাগবতের উৎসব করতেন। ঠাকুর সেই উৎসবে যেতেন। শ্রীম বলেন, "ঠাকুরের কথা সব দেব-বাক্য। নিজে বলেছেন, "ভক্ত-ভাগবত-ভগবান্ এক।' ভগবানের কথা ভাগবত, 'কথামৃত' তাঁরই কথা, তাই ভাগবত। এই কথায় আর একটি কথা মনে হ'ল। ছোট খাটটিতে বসে আছেন ঠাকুর। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'দেখ, এই মুখ দিয়ে তিনি কথা কন।'" (শ্রীম-দর্শন, ২।১৩৪)।

জনৈক ব্যক্তি শ্রীমকে বলেন, "'কথামৃত' পড়ে মনে হয়, আপনি সর্বদা ঠাকুরের সঙ্গে থাকতেন।' এর উত্তরে শ্রীম বলেন, "না। তবে তিনি বলতেন 'অমৃত সাগরের এক কণা খেলেও অমর হয়, আ[illegible] কলসী কলসী খেলেও অমর হয়,' এই ভরসা আমরা তাঁর এক কণা মাত্র রাখতে চেষ্টা করেছি তাঁর কথা লিখে শেষ করা যায় না (শ্রীম-দর্শ[illegible] ২।১৮৭)।

'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'

ডক্টর রমা চৌধুরী

সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন ঈশোপনিষদে (শ্লোক, ৮) পরব্রহ্মকে একটি অতি সুন্দর, অতি যোগ্য, অতি মধুর বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে একটি মর্মস্পর্শী মন্ত্রের মাধ্যমে :—

'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।'

'তিনি শুদ্ধ এবং পাপের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, অথবা পাপরহিত।'

এস্থলে সেই একই কথাকে দুভাবে বলা হচ্ছে—সদর্থক বা 'পজিটিভ' ভাবে এবং নঞর্থক বা 'নেগেটিভ' ভাবে। অর্থাৎ সদর্থক দিক থেকে তিনি 'শুদ্ধ' এবং নঞর্থক দিক থেকে তিনি পাপহীন।

এস্থলে সাধারণ দিক থেকে আমরা 'শুদ্ধ' বলতে কি বুঝি? বুঝি আমাদের সমগ্র সত্তার যে তিনটি অংশ অর্থাৎ দেহ মন ও আত্মার শুদ্ধতা।

(১) দৈহিক শুদ্ধতা

প্রথমতঃ দেহের শুদ্ধতা লাভ হয় প্রাত্যহিক স্নান, আচমনাদি; শুদ্ধ পানাহারাদি প্রভৃতি থেকে। সেজন্য শুদ্ধ দেহের মধ্যেই শুদ্ধ মনের অস্তিত্ব সম্ভবপর ব'লে সকল সাধনের মধ্যেই দৈহিক শুদ্ধতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক রামানুজ তাঁর প্রারম্ভিক সপ্ত সাধনের মধ্যে সর্বপ্রথমেই নির্ভয়ে উল্লেখ করেছেন 'বিবেকে'র। এস্থলে 'বিবেক' শব্দটির কোন নৈতিক অর্থ নেই—এর অর্থ হ'ল এই :

"বিবেকাদীনং স্বরূপঞ্চ আহ—'জাত্যাশ্রয়-নিমিত্ত-দুষ্টাদন্নাৎ কায় শুদ্ধির্বিবেকঃ' ইতি। অত্র নির্বচনং—'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ'।" (রামানুজের বেদান্তভাষ্য 'শ্রীভাষ্য—লঘুসিদ্ধান্তঃ' ১।১।২৬)

অর্থাৎ 'বিবেক' প্রভৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : জাতি, আশ্রয় ও নিমিত্ত দ্বারা দূষিত আহার্য দ্রব্য থেকে শরীরকে রক্ষা করা; অথবা ঐ প্রকার ভোজ্য বস্তু গ্রহণ না করার নামই হ'ল 'বিবেক'। এ বিষয়ে প্রমাণ হ'ল সেই শ্রুতিবাক্য (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৭।২৬।২)

'আহারশুদ্ধি হলে, তবেই সত্ত্বশুদ্ধি হতে পারে। সত্ত্বশুদ্ধি হ'লে তবেই ধ্রুবাস্মৃতির উদয় সম্ভব॥'

এস্থলে বলা হয়েছে যে, জাতিদুষ্ট, আশ্রয়দুষ্ট এবং নিমিত্তদুষ্ট ভোজ্যবস্তু থেকে শরীরকে রক্ষা করতে হবে—এরূপে, এরই নাম 'আহারশুদ্ধি'

প্রথমতঃ 'জাতিদুষ্ট' ভোজ্যবস্তুকে বলা হয় বিষাক্ত বাণ দ্বারা নিহত পশুপক্ষীর মাংস এবং শুষ্ক মাংসকে বলা হয় 'কলঞ্জ'। বলাই বাহুল্য যে, এরূপ মাংসাদিভক্ষণ দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক।

দ্বিতীয়তঃ, 'আশ্রয়দুষ্ট' ভোজ্য বস্তু হ'ল সেই সকল ভোজ্য বস্তু যা আশ্রয়ের দোষে দূষিত হ'য়ে যায়। যথা, পাপীর অন্ন প্রভৃতি।

তৃতীয়তঃ, 'নিমিত্তদুষ্ট' ভোজ্য বস্তু হ'ল আগন্তুক কারণে দূষিত ভোজ্য বস্তু। যথা, কেশ-নখাদিমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতি।

অদ্বৈতবেদান্তবাদী শঙ্করাচার্য অবশ্য উপরে উদ্ধৃত 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, 'আহার' শব্দের অর্থ এস্থলে 'আহার্য' বস্তু একেবারেই নয়—'আহার' হ'ল যা 'আহরণ' করা

যায়। মানব শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করেন ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে। অতএব বিষয়োপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানও 'আহার'। রাগদ্বেষাদি এরূপ বিজ্ঞানের মলস্বরূপ। সেজন্য, জ্ঞান বা বিজ্ঞান যদি রাগদ্বেষাদিরূপ মলবিরহিত হয়, তাহলেই তাকে বলা যায় নির্মল, অথবা শুদ্ধ। শঙ্করের মতে, এই হল 'আহারশুদ্ধি'। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৭।২৬।২, শঙ্করের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

রামানুজীয় এই 'সপ্তসাধন' হ'ল—বিবেকঃ (উপরে দেখুন); "বিমোকঃ—কামানভিষ্বঙ্গ ইতি। আরম্ভণ-সংশীলনংপুনঃ-পুনরভ্যাস ইতি।" "'পঞ্চমহাযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়া' ইতি।... 'সত্যার্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ কল্যাণানি' ইতি।...'দেশ-কাল-বৈগুণ্যাৎ শোকবস্ত্বাদ্যনুস্মৃতেশ্চ তজ্জন্যং দৈন্যমভাস্বরত্বং মনসোঽবসাদঃ' ইতি তদ্বিপর্যয়োঽনবসাদ ইতি। 'তদ্বিপর্যয়জা তুষ্টিরুদ্ধর্ষঃ' ইতি। তদ্বিপর্যয়োঽনুদ্ধর্ষঃ। অতি-সন্তোষশ্চ বিরোধীত্যর্থঃ॥" (শ্রীভাষ্য—লঘুসিদ্ধান্তঃ, ১।১।২৬-২৭)।

অর্থাৎ 'বিবেক' হ'ল অশুদ্ধ পানাহারবর্জন। 'বিমোক' হ'ল কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে আসক্তি না থাকা। 'অভ্যাস' হ'ল কোন শুভ বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ শিক্ষা। 'ক্রিয়া' হ'ল যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান—যথা: নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। 'কল্যাণ' হ'ল সত্য, আর্জব বা সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা বা পরদ্রব্যে নির্লোভতা। 'অনবসাদ' হ'ল এরূপ: দেশকালাদির বৈপরীত্য হেতু শোকবস্তু অথবা শোকের কারণীভূত পুত্রপৌত্রাদিমরণজনিত মনের যে দৈন্য অথবা দৌর্বল্য—তার নাম 'অবসাদ' এবং এরূপ অবসাদের অভাবই হ'ল 'অনবসাদ'—অর্থাৎ মানসিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহ। উক্ত তুষ্টিজনিত যে সন্তোষ তার নাম 'উদ্ধর্ষ', এবং এরূপ উদ্ধর্ষের অভাবই 'অনুদ্ধর্ষ' অথবা মানসিক বিষাদ ও অসন্তোষ। এরও আছে প্রয়োজন, যেহেতু অতিসন্তোষও উপাসনার অনুকূল নয় বরং প্রতিকূল বা বিরোধী। অর্থাৎ দেশ-কাল প্রমুখ সহায় আমার অত্যন্ত অনুকূল; এবং প্রিয়জনের অভাবজনিত, অথবা অন্য কোন কারণোদ্ভূত দুঃখশোকও আমার একেবারেই নেই—এই ভেবে মুমুক্ষু সাধক যদি অত্যন্ত অধিক আহ্লাদিত হন, তাহলে বিষয়ে অত্যন্ত গাঢ় প্রীতির ন্যায়, সেই অত্যধিক আহ্লাদও সাধকের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর, নিঃসন্দেহে।

এরূপে আমরা দেখে আশ্চর্যান্বিত হই যে, আমাদের ব্রহ্মবাদী ঋষিরাও কিরূপ বাস্তববাদী ছিলেন; এবং সেজন্য তাঁরা দৈহিক উৎকর্ষ ও পুষ্টিকে সাধনপথেও প্রারম্ভিক অগ্রগণ্য স্থান দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হননি, বা দ্বিধা বোধ করেননি।

সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন তৈত্তিরীয়োপনিষদেও এরূপ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখে আমরা মুগ্ধ হই। যথা—ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডে উদ্দালক আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে নির্দেশ দিলেন-

হে সৌম্য! পুরুষ ষোড়শকলাযুক্ত। পঞ্চদশ দিন ভোজন করো না। কিন্তু যথেচ্ছ জল পান করো। প্রাণ জলময়। সেজন্য অন্নাদি ভোজন না ক'রে কেবল জলপান করলেও প্রাণ বিয়োগ হবে না।

তদনুসারে শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন করলেন না। অনন্তর পিতার নিকট গমন করলেন। তখন পিতা তাঁকে বললেন—হে সৌম্য! ঋক্, যজু ও সাম মন্ত্র বলো। শ্বেতকেতু বললেন—এখন এ-সব কিছুই আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে না।

এই শুনে পিতা তাঁকে বললেন—এখন তুমি

ভোজন করো। অনন্তর আমার কথা বিশেষভাবে বুঝতে পারবে!

তদনুসারে শ্বেতকেতু ভোজন ক'রে পুনরায় পিতার নিকট আগমন করলেন। তখন পিতা তাঁকে যা যা জিজ্ঞাসা করলেন, সে-সব বিষয়েই তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি দেখাতে সমর্থ হলেন।

উচ্চতম আধ্যাত্মিক স্তরগত সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষিদের কি অপূর্ব এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী!

আরেকটি সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন উপনিষদের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা চলে। সেই উপনিষদটি হ'ল 'তৈত্তিরীয়োপনিষদ্'। এই উপনিষদের বিশ্ববিশ্রুত 'পঞ্চকোষতত্ত্বে' ক্রমান্বয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর, উচ্চতর থেকে উচ্চতম উপলব্ধির কথা অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। যথা—

"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (৩৷২)

"প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (৩৷৩)

"মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (৩৷৪)

"বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (৩৷৫)

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (৩৷৬)

তিনি জানতে পারলেন যে, অন্নই (অথবা অন্নপুষ্ট দেহই) ব্রহ্ম।"

"তিনি জানতে পারলেন যে, মনই ব্রহ্ম।"

"তিনি জানতে পারলেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম।"

"তিনি জানতে পারলেন যে, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।"

তিনি জানতে পারলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম॥"

সেজন্য এই উপনিষদে প্রারম্ভে ও পরিশেষে রয়েছে অনুপম অন্নবন্দনা :

"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ । যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং · শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে। অদ্য তেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে॥ ইতি।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২৷২)

অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করছে, তা সবই অন্ন থেকেই জাত হয়। তৎপরে অন্ন দ্বারাই জীবনধারণ করে। তৎপরে অন্তকালে পুনরায় অন্নেই গমন করে। অন্নই সকল ভূতসমূহের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, অথবা প্রথমজাত। সেজন্য অন্নকে বলা হয় 'সর্বৌষধি', অথবা সকল প্রাণীর দেহের অসুখের ঔষধস্বরূপ। যাঁরা অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁরা সমুদায় অন্ন লাভ করেন। অন্নই সকল ভূতসমূহের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অথবা প্রথমজাত। সেজন্য অন্নকে বলা হয় 'সর্বৌষধি', অথবা সকল প্রাণীর দেহের অসুখের ঔষধস্বরূপ। অন্ন থেকে ভূতসমূহ জাত হয়। জাত হ'য়ে তারা অন্নের দ্বারাই বর্ধিত হয়। সকল প্রাণী অন্ন ভক্ষণ করে। অন্নও সকল প্রাণীকে ভক্ষণ করে। সেজন্যই অন্নকে 'অন্ন' বলা হয়।

"অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" (ঐ, ৩৷২)

অন্ন থেকেই এই সকল ভূত জাত হয়। জাত হ'য়ে তারা অন্নের দ্বারাই জীবিত থাকে। পরিশেষে জীবনাবসানে তারা অন্নেই প্রতিগমন করে।

সর্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাধক যখন 'আনন্দ ব্রহ্মে'র উচ্চতম স্তরে উন্নীত হয়েছেন, ঠিক তারপরেই তিনি সানন্দে নেমে আসছেন 'অন্নে'র স্তরে পুনরায়। বস্তুতঃ এরূপ আনন্দ ব্রহ্মোপলব্ধির একেবারে ঠিক পরেই গ্রন্থশেষে যে অত্যাশ্চর্য 'অন্নবন্দনাটি' আমরা পাই তা সর্বদিক থেকেই অতুলনীয়।

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতম্।" "অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ব্রতম্।" "অন্নং বহু কুর্বীত।

তদ্‌ব্রতম্।” “ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ॥” (ঐ, ৩।৭-৯)

“অন্নকে নিন্দা করবে না। তা ব্রত। অন্নকে পরিত্যাগ করবে না। তা ব্রত। অন্নকে বহু করবে। তা ব্রত। বাসের জন্য কাউকে ফিরিয়ে দেবে না। তা ব্রত। অতএব যে কোন উপায়ে বহু অন্ন সংগ্রহ করবে।”

কি অত্যাধুনিক এই সুপ্রাচীন মতবাদ! এতে দুটি অতি আধুনিক তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে— 'Refugee Rehabilitation' বা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন; এবং 'Grow More Food Campaign' “অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন।”

সাধারণ ধারণা এই যে, ভারতীয় মতে আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপেই পরস্পরবিরোধী। সেই ভ্রান্ত ধারণা ক্ষালনের জন্যই দৈহিক শুদ্ধির বিষয়ে এত কথা বলা হ'ল।

(২) মানসিক শুদ্ধতা

আমাদের নিজেদের মনের মধ্যেই রয়েছে আমাদের মনের অশুদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ। তা হ'ল সেই কুখ্যাত 'ষড়্‌রিপু' অথবা আমাদের ছয়টি দুর্ধর্ষ আন্তর 'রিপু' বা শত্রু। যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এদের অর্থ আমরা সকলেই জানি, এবং এদের মূল হ'ল নিজেদেরই 'অজ্ঞান' বা অবিদ্যা যা ক'রে রাখে আমাদের ব্রহ্মপ্রতিম জীবনকে আবৃত, অশুদ্ধ, অসুখী। এরূপ অজ্ঞান-অবিদ্যা এবং তৎ সহচর কাম-ক্রোধাদির প্রচণ্ড প্রকোপে আমরা না পারি ব্রহ্মকে জানতে, না পারি জানতে নিজেদের ব্রহ্ম-স্বরূপ ব'লে। সেজন্য, অজ্ঞান-অবিদ্যা ও কাম-ক্রোধাদিকে জয় ক'রে তবেই আমরা পাই মানসিক শুদ্ধতা।

(৩) আত্মিক শুদ্ধতা

আত্মিক শুদ্ধতার কোনরূপ অবকাশই নেই, যেহেতু আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, আত্মা নিত্যশুদ্ধ, নিত্য-বুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যানন্দস্বরূপ। কেবল দেহ-মনের পরিপূর্ণ কল্যাণসাধনা ক'রে অথচ দেহ-মনের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে, আত্মা স্বীয় শাশ্বত উপলব্ধি ক'রে ধন্যাতিধন্য হয়।

ব্রহ্ম 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'

বলাই বাহুল্য যে, উপরের উদ্ধৃত দেহ-মনের শুদ্ধতার প্রশ্ন ব্রহ্মের ক্ষেত্রে একেবারেই নেই— তিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দস্বরূপ, নিত্যামৃত নির্ঝর।

তা সত্ত্বেও শ্রুতিতে তাঁকে এরূপ যত্নের সঙ্গে 'শুদ্ধ' ও 'অপাপবিদ্ধ' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে কেন? তার কারণ হ'ল এই যে, পরব্রহ্মের সর্ব-প্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি সকল সাংসারিক সকল অপবিত্রতা এবং পাপতাপের বহু ঊর্ধ্বে—এ-কথা সর্বজনবিদিত হলেও, তাঁর শুদ্ধতা ও পাপবিহীনতা সাংসারিক শুদ্ধতা ও পাপবিহীনতা থেকে স্বরূপগতভাবে বিভিন্ন—এই মহাতত্ত্ব সুপ্রকট করার জন্যই এই শুভ প্রয়াস।

ভ্রম-সংশোধন

ভাদ্র, ১৩৮৯ সংখ্যায় পৃঃ ৩৫৪, প্রথমার্ধের নিম্ন হইতে ৭ম পঙ্‌ক্তিতে 'নারদকে' স্থলে 'বিদুরকে' হইবে।

ব্যক্তিত্বের প্রভায় সারদামণি

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, স্কুলকলেজে পড়েননি—শুধু তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো নানা গুণীর কাছে শুনেও তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার সুযোগ হয়নি। যিনি কলকাতায় বহু দিন বাস করেও কোন মহিলার পক্ষে ঘড়িতে দম দিতে পারাকে বিস্ময়কর কৃতিত্ব ব'লে মনে করতেন, যিনি ধান ভানা, বাসন মাজা, ঘর নিকানোর মধ্য দিয়েই শুধু মানুষ হয়েছেন তা নয়, জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত এই ধরনের কাজের মধ্যেই মগ্ন হ'য়ে থেকেছেন, তাঁকেই যখন 'সংঘজননী' ব'লে অভিহিত হ'তে শোনা যায়, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দকে যখন তাঁর অভিমতের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে দেখা যায়, এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যেও যখন 'ও'র সম্বন্ধে সসম্ভ্রম উল্লেখ লক্ষিত হয়, তখন এই নারীর ব্যক্তিত্বের কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে—'ব্যক্তিত্ব' ব্যাপারটি কি? কি এর পরিমাপ? কোথায় এর মূল সূত্র নিহিত?

'ভারতকোষ'-এ 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'দৈহিক ও মানসিক কতকগুলি অন্তর্নিহিত গুণবিশেষের সমন্বয়, এবং তাহার সহিত পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তা সৃষ্ট হয়, তাহাকেই ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে। চালচলন, কথাবার্তা, মতামত, প্রবণতা, বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির যে আচরণ প্রকাশ পায়, তাহাই তাহার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।··· শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ খাপ খাওয়ানোর কার্যে সীমিত থাকে না, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও যথেষ্ট কার্যকরী হইতে দেখা যায়। ইংরেজী অভিধান 'ব্রিট্যানিকা ওয়ার্ল্ড ল্যাংগোয়েজ ডিক্‌শন্যারি (Britannicca World Language Dictionary)-তে ব্যক্তিত্ব (personality) সম্বন্ধে ইংরেজীতে যা বলা হয়েছে তার বাংলা অর্থ—'যা দিয়ে ব্যক্তি তৈরী, যা তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য।' অথবা 'অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি।' এই-সব সহজ কথায় মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায় যে, ব্যক্তিত্ব এমন জিনিস (ক) যা সেই ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে, তার ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং পারিপার্শ্বিক জনসাধারণের কাছে অভিনব মনে হওরায়, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিস্ময় সৃষ্টি করে। (খ) অনেকদিন পরেও যখন তারা দেখে যে, তাদের প্রাথমিক ধারণা মিথ্যা নয়, তখন তার কথা মেনে নিতে আরম্ভ করে, তাকে অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। নেতৃত্বের (leadership) সৃষ্টি এইভাবেই হয়।

ব্যক্তি মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক। তবে আমরা তাদেরই ব্যক্তিত্বের কথা বলি যারা নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হ'তে সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সারদামণির ব্যক্তিত্ব ওরূপ চোখ-ঝলসান দীপ্তি-পূর্ণ নয়, সবাইকে হাঁকডাক ক'রে বলে না—'আমার দিকে তাকাও।' সে ব্যক্তিত্ব স্থির, ধীর, স্নিগ্ধ, কিন্তু বিরাট; তাঁর সেই ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হ'লে তাতে অজান্তে মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে মিলিয়ে গেলেও ডুবে যাওয়ার হাঁসফাঁস তাতে নেই, থাকে আনন্দের আমেজ। সে মিলিয়ে যাওয়া যেন আনন্দসাগরে ডুবে যাওয়া।

সচরাচর সারদামণির ব্যক্তিত্বের কথা আমাদের মনেই জাগে না। আমরা ভাবি-ই না যে, কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তির বলে তিনি দিনরাত

ভক্তদের মুখে 'মহামায়া', 'জগদ্ধাত্রী' ইত্যাদি শুনে শুনে কখনও আত্মহারা হননি, নিজেকে ঘর-নিকানো কুটনো কোটার মধ্যেই সাধারণ নারী ক'রে রেখেছিলেন! তাঁর দিনরাতের সহচরী গোলাপ-মা, যোগীন-মা, যাঁরা কখন সেবিকা, কখন গৃহকর্ত্রী বা পরামর্শদাত্রী, যাঁরা তাঁর জীবনের 'সব অবস্থাই জানেন', তাঁরাও কিন্তু সারদামণিকে একটা বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন; যে কোন কারণেই হোক তাঁকে মনে মনে দেবী-মানবী ব'লে ধরে নিয়েছিলেন। ঠাকুরের সন্তানরা কি তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন যার জন্য নবজাত মঠ কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লে তাঁর অভিমতকেই 'হাইকোর্ট' ব'লে ধরে নিতেন? এটা তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের গুরু-পত্নী ব'লে করেননি ও শ্রীরামকৃষ্ণ এ ধরনের কোন আদেশ রেখে গিয়েছিলেন ব'লে জানা নেই। এটি চিন্তা করার বিষয় যে, কোন্ আত্মবিশ্বাসের বলে সর্বাঙ্গ ঢাকা, ঘোমটা-দেওয়া বিধবা পল্লীরমণী কলকাতায় এসে অল্প বয়সের শিষ্যদের সঙ্গে থাকার বিষয় নিজেই মনস্থির করেছেন (কেবল 'সমাজ কি বলে একবার শুনতে হয় ব'লে অনেককে জিজ্ঞাসা' করেছিলেন)। ঠাকুরের অনুরূপ অভিমত জেনেও উকিলকে ওকালতি 'ব্যবসা বই তো নয়' ব'লে অভয় দিয়েছেন, ঠাকুরকে বেশী ক'রে দুধ খাওয়ানোর জন্য বলেছেন, 'খাওয়ার জন্য মিথ্যা বললে দোষ নেই', দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণা স্ত্রীলোককেও গলদেশ বেষ্টন ক'রে 'এস, মা, ঘরে এস' ব'লে আহ্বান করেছেন, রাধুকে ব্রাহ্মণকন্যা হ'য়েও বয়োজ্যেষ্ঠা কায়স্থ মহিলাকে প্রণাম করতে বলেছেন, শরণাগতকে রক্ষা না করলে ঈশ্বরেরই 'মহাপাপ' হবে বলতে পেরেছেন, 'আদর্শ হিসাবে যা করতে হয়, তার ঢের বাড়া করেছি' বলেছেন, জয়রামবাটী যাত্রাকালে পথের ধারে রান্নার হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া ভাত হ'তে ভাত তুলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছেন! কোন্ মানসিকতার জোরে স্বামীর সঙ্গে রাতের পর রাত এক বিছানায় শুয়েও নিজেকে দেহসম্পর্কের ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন? এগুলি ভাববার কথা।

আবার সাধারণ অর্থে 'ব্যক্তিত্ব' বলতে যা বুঝায়, তারও নিদর্শন পাই নানা ক্ষেত্রে। কোয়ালপাড়ার মঠে মতবিরোধ হওয়ায় শ্রীমা এমন মনোভাব দেখিয়েছিলেন যে, মঠাধ্যক্ষ পায়ে ধরে মার্জনা চেয়েছিলেন; পুলিস গর্ভবতী স্ত্রীলোককে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়ায় তিনি অগ্নিময়ী মূর্তি ধরেছিলেন; স্ত্রীকে প্রহার করায় স্বামীকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন; সর্বসমক্ষে নৃশংসভাবে গোহত্যায় সকলকে তীব্র প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন; হরিশের পাগলামিতে ভয়ংকরী 'নিজ মূর্তি' ধরে তার 'বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে' চড় মেরেছেন। দেখা গেছে যে, কোন একটা শক্তির বলে বলীয়ান হ'য়ে তিনি সব সময়েই নিজেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হ'তে ঊর্ধ্বে রেখেছেন। সংসারের সব রকম জ্বালা-যন্ত্রণা অসুখ-বিসুখের মধ্যে এবং রাধি ও তার মায়ের শত পাগলামির মধ্যে থেকেও বলছেন, 'অশান্তি ব'লে তো কখনো কিছু দেখলুম না।'

প্রশ্ন জাগে, এই শিক্ষাবিহীন পল্লীবালার অসামান্য ব্যক্তিত্বের উৎস কোথায়? অলৌকিকত্ব না দেখেও এঁর মধ্যে দেবত্ব থাকা সম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস হ'ল কোন্ গুণে? তাঁর চরিত্রের এই-সব গুণাবলীর ভিত্তি কি? এই প্রশ্নের সমাধানে প্রথমেই মনে আসে তাঁর মাতৃত্ব। এ মাতৃত্ব গর্ভজাত সন্তানের প্রতি গণ্ডিবদ্ধ মাতৃত্ব নয়, যা প্রত্যাশা রাখে, যা নিজের গর্ভজাত সন্তান ছাড়া অন্য সকলকে একটা গণ্ডির বাইরে রাখে—এ সীমাহীন বিশ্বমাতৃত্ব। তিনি সকলের মা, 'ইতর জীবজন্তুরও', 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই

আমজাদও', 'বিলেতের লোকেরাও তো আমার ছেলে', 'ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান'। তিনি ভক্ত শিশুকন্যার ময়লা-করা কম্বল নিজ হাতে ধুচ্ছেন! এ পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা; এ মাতৃত্বের সীমানায় শুধু ডাকাত ও ইতর জন্তুই আসে না, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও পড়েন! সাধারণতঃ আমরা ব্যক্তিত্ব বলতে যা বুঝি, তা অন্যকে আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু সারদামণির ব্যক্তিত্ব তাঁর মাতৃত্বের আওতায় প'ড়ে যেন নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে, লবণ যেন সমুদ্রে লীন হ'য়ে গেছে। সারদামণির সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন শ্রীমার মাতৃস্নেহের মধ্যে। মাতৃত্বের আকর্ষণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের চেয়ে আরও গভীর, আরও ব্যাপক। কিন্তু দুটির সংমিশ্রণ হ'লে, তা হয় অতুলনীয়।

ব্যক্তিত্বের ভিত্তি নির্ণয়ে এর পরেই আসে সারদামণির চারিত্রিক পবিত্রতা, যেটি সাধারণভাবে ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। ওরই সীমানার মধ্যে পড়ে তাঁর সরলতা, সত্যে নিষ্ঠা, ত্যাগ, নির্লোভ ও ও নির্বাসনা। 'চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে', 'জন্মাবধি কোন পাপ করেছি ব'লে মনে পড়ে না', 'এ-সব নিয়ে আছি, কই, আমার তো কোন বাসনা হয় না।' শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারির দশ হাজার টাকা ফেরত দিতে বললেন; রামেশ্বর মন্দিরের ধনভাণ্ডারের মণিমুক্তা নেবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েও স্পর্শ করলেন না। সকলেই জানেন, স্বামীর দেহত্যাগের পরে কামারপুকুরে কী নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে ('এমন কি ভাতে লবণও জোটে নাই'), থেকেও কোন সন্তানের কাছে তিনি অর্থসাহায্য চাননি—ধীর স্থির ভাবে সহ্য করেছিলেন। চরিত্রের এই পবিত্রতা থাকার জন্যই তিনি বলতে পেরেছেন, 'এর ভিতরে যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কারও সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে', 'তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায়?' এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর মনোভাব, যেন তাঁর নিজস্ব কোন সত্তা নেই, ঠাকুরই সব। দীক্ষাদানের পর বা অন্য সময় দীক্ষিতদের বলতেন, 'ঠাকুরই গুরু', 'ঠাকুরই' পার করেন, তিনি নয়; 'ঠাকুর তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন', 'ঠাকুর তোমাকে রক্ষা করবেন'। সকল সন্তানকেই ঠাকুরের পায়ে ঠেলে দিয়েছেন—তিনি 'জগন্মাতা', 'তুমিই সব', এ-সব শুনেও। তাঁর এই ভাবটা নির্লোভ ও নিরহঙ্কারের মধ্যেই পড়ে। তিনি যেন কেউ নন। নিবেদিতা যথার্থই লিখেছেন, 'স্ত্রীভক্তেরা মায়ের সঙ্গে বসিয়া যখন কথাবার্তা বলিতেন, তাঁহারা কিছুতেই মনে করিতে পারিতেন না যে, ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ বা তাঁহার উপর মায়ের দাবি তাঁহাদের চেয়ে বেশী ছিল। মনে করিতেন যেন তিনি তাঁহাদের মতোই ঠাকুরের আশ্রিত ও কৃপা-প্রার্থীদের একজন।' এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাঁর প্রার্থনা—'আমার আমিত্ব যেন না আসে।' ব্যক্তিত্বের সাধারণ অর্থে দেখা যায় যে, আমিত্ব—ব্যক্তিত্বের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। কিন্তু সারদামণির ক্ষেত্রে, আমিত্বের বিলোপ যেন ব্যক্তিত্বকে মহিমান্বিত ও অন্তস্পর্শী ক'রে একটি নূতন রূপ দিয়েছে।

সারদামণির ব্যক্তিত্ব কারও নজরে পড়ে না, কারণ তাঁর বিরাট মাতৃত্বের আবরণে অন্য সবকিছু বৈশিষ্ট্য ঢাকা পড়ে গেছে, কিংবা তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, মাতৃত্বের স্নেহস্পর্শ পেলে, মায়ের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কে-ই বা খোঁজ করতে চায়!

মনসৈবেদমাপ্তব্যম্

ব্রহ্মচারী জগদীশচৈতন্য

সাধক-কবি গেয়েছেন,

"মনেরও ওপারে কোথা কোন দেশ।
শশীতপনের নাহি পরবেশ।"

এই যে দেশের কথা বলা হয়েছে যেখানে শশীতপনের প্রবেশাধিকার নেই সেই দেশই হ'ল জীবের পরম নিধান, পরম আশ্রয়। ঐ পরম আশ্রয় হ'ল 'মনের ওপারে'—অর্থাৎ মন-বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না। মন-বুদ্ধি ছাড়িয়ে সে দেশ বা সে রাজ্য। উপনিষদ্‌ও গাইছেন—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।"
"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।"

সেখানে চক্ষু, বাক্য বা মন কেউই যেতে পারে না, তিনি হলেন "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্"—বাক্য-মনের অগোচর। এখানে মন, বাক্য বা চক্ষুকে উপলক্ষ হিসাবে ধরাই সমীচীন। প্রকৃতপক্ষে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই সেই রাজ্যে পৌছানো যায় না; বা সেই পরমবস্তুকে পাওয়া যায় না। কিন্তু পেতেই হবে তাঁকে, যেতেই হবে মনেরও ওপারে। কারণ ঐ হ'ল জীবের গন্তব্যস্থল, লক্ষ্য।

সুতরাং একটি সমস্যা: কিভাবে যাওয়া যায় সেই রাজ্যে। এই শরীর—যা মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি—তা দিয়ে যদি পরমপ্রাপ্তি না ঘটে, তাহলে কিভাবে বা কোন্ উপায়ে তা সম্ভব? আবার বেদান্ত শাস্ত্র যাকে 'জীবন্মুক্তি' বলে তা লাভ করতে গেলে তো এই শরীরেই লাভ করতে হবে। যদি "অবাঙ্‌মনসোগোচর" হ'ন তিনি, মনেরও ওপারে যদি তাঁর দেশ হয়, তাহলে কেমন ক'রে সেই অবস্থালাভ করা যায়?

সমস্যাটি নিতান্ত অমূলক নয়। কিন্তু শাস্ত্র বা আচার্যেরা এই সন্দেহের অবকাশ রাখেননি। তাঁরা এর সমাধানও দিয়ে গেছেন। একটু নিবিষ্ট মনে শাস্ত্র খুঁজলে আমরা এ-সব দেখতে পাব।

যদিও উপনিষদে বলা হয়েছে, "নৈব বাচা ন মনসা" ইত্যাদি, কিন্তু একথাও বলা হয়েছে,

"মনসৈবেদমাপ্তব্যম্ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

অর্থাৎ, মনের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। এ যেন মনে হয় পরস্পরবিরোধী কথা। একবার বলছেন মনের দ্বারা পাওয়া যায় না। যুগ যুগ ধরে সাধকেরা ঐ কথাই বলে আসছেন। সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন গেয়েছেন, "মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে?" অথচ এখানে বলা হ'ল মনের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। তাহলে এখন অর্জুনের মতো আমাদেরও বলতে হয়,

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥"

—'আপনি বিমিশ্রিত বা অবিস্পষ্ট বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন বিভ্রান্ত করছেন। এই উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় ক'রে বলুন, যা দিয়ে আমি শ্রেয়োলাভ করতে পারি।'

কিন্তু 'ব্যামিশ্রের' কিছুই নেই। মনের দ্বারা পাওয়া যায় বলতে কোন্ মনের কথা বলা হয়েছে, এটাই বিচার্য। আর, কোন্ মনের দ্বারা পাওয়া যায় না, তাও দেখা দরকার।

কেনোপনিষদে আছে—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।"

অর্থাৎ, যাঁকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, কিন্তু মন যাঁর বিষয় হয়। এখানে মন বলতে ভাষ্যকার বলছেন, "কামাদিবৃত্তিমৎ মনঃ, তেন মনসা যচ্চৈতন্যজ্যোতির্মনসোঽবভাসকং ন মনুতে ন সঙ্কল্পয়তি", অর্থাৎ এ মন কামাদিবৃত্তিবিশিষ্ট মন, এই মন, মনেরও অবভাসক চৈতন্যজ্যোতিকে চিন্তা

করতে পারে না।

আবার কঠোপনিষদের "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্" প্রভৃতি মন্ত্রে 'মনে'র অর্থ ভাষ্যকারের ভাষায়—

"প্রাগেকত্ববিজ্ঞানাৎ আচার্যাগমসংস্কৃতেন মনসা এব ইদং ব্রহ্ম একরসমাপ্তব্যম্।" অর্থাৎ, ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানের পূর্বে আচার্য ও শাস্ত্র উপদেশে সংস্কৃত মনের দ্বারাই একরসব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

উপনিষদুক্ত দুই মনের পার্থক্য তুলে ধরা হ'ল আলোচনার সুবিধার জন্য। প্রথমোক্ত মন কামাদিবৃত্তিবিশিষ্ট অসংস্কৃত, সুতরাং ঐ অসংস্কৃত মন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব একরসব্রহ্মকে ধরতে অপারগ। যদি একটি কালি-মাখানো কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যকে দেখি, তবে সূর্যকে ভাল দেখা যাবে না। কালির আবরণ হ'ল সূর্যদর্শনের প্রতিবন্ধক। সেরূপ কামনা-বাসনার কালি-মাখানো মনের দর্পণে আত্মসূর্যও ভাল প্রতিবিম্বিত হয় না। সূর্যদর্শনের জন্য যেমন কাচের কালির অপসারণ প্রয়োজন, তেমনি আত্মদর্শনের জন্য প্রয়োজন অশুদ্ধ মনের শুদ্ধিকরণ, কামনা-বাসনার নিঃশেষে বিলুপ্তি।

অসংস্কৃত মনের সংস্কার পদ্ধতি দ্বিতীয়োক্ত মনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আচার্য ও শাস্ত্রের উপদেশ। প্রথম, আচার্য সমীপে উপস্থিত হ'তে হবে। জন্মজন্মান্তরের শুভাশুভ সংস্কারের পুঁটলি মনকে নিয়ে জিজ্ঞাসুরূপে উপস্থিত হ'তে হবে গুরুসমীপে। 'শান্ত দান্ত' গুরুসমীপে বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে হবে নিজ রোগের বিবরণ। 'বিনয়ের সঙ্গে', কারণ বিনীতভাবেই নিজের দোষ-ত্রুটি অপূর্ণতাকে স্বীকার করা সম্ভব। ঠিক ঠিক ভাবে রোগের বিবরণ নিবেদিত হ'লে উপযুক্ত চিকিৎসক যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থা দিতে সক্ষম হন এবং রোগীও সম্পূর্ণ সুস্থ হন। সুতরাং বিনীতভাবে গুরুসমীপে কামাদিবৃত্তিবিশিষ্ট মনের বিবরণ নিবেদন করতে হবে। শুধুমাত্র নিবেদন করলেই হবে না, সর্বান্তঃকরণে তাঁর উপদেশ সমুদয়—যেগুলি তাঁর নিজ উপলব্ধি ও শাস্ত্রসম্মত—গ্রহণ করতে হবে। কোনরূপে নিজমত প্রতিষ্ঠার তথা তর্কজালের বিস্তার করার অবকাশ থাকবে না। কারণ সেই পরমবস্তু হ'ল তর্কের অগম্য।

শুধু গুরুমুখে শুনলেই হবে না, শ্রবণান্তর মনন ও নিদিধ্যাসন প্রয়োজন। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে, "আত্মা বা অরে শ্রোতব্য, মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সহজ সরল ভাষায় বলেছেন, "শুধু শুনলেই হবে না, ধারণা চাই।" এই ধারণার জন্যই সাধন। সাধন বিনা সাধ্যতত্ত্ব বোধগম্য হয় না। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়: কোন বিজ্ঞানের ছাত্র নিত্য অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনে কিন্তু অনুশীলন করে না। যদি গবেষণাগারে গিয়ে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কি হয় না দেখে, তবে তার জ্ঞান যেমন অসম্পূর্ণ হয়, তেমনি শুধু শ্রবণ করলে শ্রেয়োবস্তুর উপলব্ধিই তার জীবনে আসবে না। তাই চাই একান্তে সাধন। জন্মজন্মান্তরের অশুভ সংস্কাররাশিকে বৈরাগ্যাগ্নিতে ভস্মীভূত করতে হবে। তখন সেই মন হবে স্বচ্ছ, শুদ্ধ, নির্মল। আর সেই নির্মল মনোদর্পণে আত্মার প্রতিবিম্ব হবে অতি স্পষ্ট। সেই শুদ্ধ, সংস্কৃত মনেরই হয় ওপারে যাবার অবাধ গতি। তখন "শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা" এক হ'য়ে যায়।

সুতরাং "মনের দ্বারা পাওয়া যায়" ও "পাওয়া যায় না" বলতে শাস্ত্র একই মনের সংস্কার-পূর্বাবস্থা ও সংস্কৃত অবস্থার কথাই বলেছেন—এ-কথা নিশ্চিত। একই মন যখন অসংস্কৃত তখন শাস্ত্র বলছেন, "নৈব বাচা ন মনসা", আর যখন সংস্কৃত, তখন বলছেন, "মনসৈবেদমাপ্তব্যম্"।

ভক্ত বরদাসুন্দর

শ্রীমতী মুক্তি কর

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকালে তাঁর দর্শন ও অনুগ্রহ যে ভাগ্যবানেরা লাভ করেছিলেন, আমার পিতা কুমিল্লার শ্রীবরদাসুন্দর পাল তাঁদের অন্যতম। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ) এবং শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) তাঁর কলেজের বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। এঁরা একই সঙ্গে শ্রীঠাকুরের কাছে যেতেন এবং সঙ্গলাভে ধন্য হতেন।

শ্রীবরদাসুন্দর কুমিল্লায় ১৮৬৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীরামসুন্দর পাল ত্রিপুরার মহারাজের কুমিল্লাস্থিত জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতেন। মাতার নাম চন্দ্রমালা দেবী। ইনি কুমিল্লার কাছাকাছি বিজয়পুর-জমিদারের কন্যা। সেইসূত্রে তিনি ওখানকার কিছু সম্পত্তিও লাভ করেছিলেন। শৈশবে ঠাকুরমাকে আহারে-বিহারে, আচারে-ব্যবহারে এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদেও জমিদারী মেজাজসম্পন্না দেখেছি। অবশ্য তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর শোকে তাপে শেষ বয়সে সম্পূর্ণ অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। বরদাসুন্দর ছিলেন মাতৃভক্ত। দিনের প্রথমে মাতৃদেবীকে প্রণাম না ক'রে তিনি কোন কাজ করতেন না।

শ্রীবরদাসুন্দর তাঁর পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছোটবেলায় কুমিল্লা জেলাস্কুল থেকে সরকারী বৃত্তিলাভ ক'রে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তাঁকে কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো হ'ল। এবং তিনি সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ থেকে যথাক্রমে এফ. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। এই কলেজে পড়ার সময়েই শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এঁদের মধ্যে শ্রীহরিপ্রসন্ন বয়সে বছর তিনেকের ছোট ছিলেন। এই তিন বন্ধুর সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে অথবা অন্যান্য স্থানে শ্রীঠাকুরের সন্দর্শনে যাওয়া এবং তাঁর সাহচর্যলাভের বিবরণ আমরা স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' পাই।[1] তা থেকে জানতে পারি যে, স্বামী সারদানন্দ বরদাসুন্দরের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে কলিকাতার শ্রীমণিমোহন মল্লিকের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেটা ১৮৮৩ খৃঃ। এই তিন বন্ধু প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন—সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, ঠাকুর কলকাতার শ্রীমণিমোহন মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যাচ্ছেন। অতঃপর তাঁরাও সেখানে যান এবং ঠাকুরের অপূর্ব ভাবলীলা দর্শন করেন। তাঁদের সেদিনকার অভিজ্ঞতা স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ভাষায়: "অপূর্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐরূপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন…। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ১০ম সং, পৃঃ ২৭-৩৭

অপূর্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গ বিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই ; আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! তিনি যেন আনন্দের সাগর…।"

উপরি-উক্ত অভিজ্ঞতা এবং তার ভাব-প্রতিক্রিয়া যে শুধু স্বামী সারদানন্দেরই হয়েছিল তা নয়, বরদাসুন্দরেরও হয়েছিল, তা স্বামী সারদানন্দ মহারাজ উল্লেখ করেছেন: "সিঁদুরিয়াপটির মণিমোহনের বাটীতে ঠাকুরের কীর্তনানন্দ ও ভাবাবেশ দেখিয়া আমরাই যে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব নূতন আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা নহে, বন্ধুবর বরদাসুন্দরও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং আবার কবে কোথায় আসিয়া ঠাকুর ঐরূপে আনন্দ করিবেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ চেষ্টা ফলবতী হইতে বিলম্ব হয় নাই। কারণ, উহার দুই দিবস পরে ১৩ই অগ্রহায়ণ ইংরেজী ২৮শে নভেম্বর, বুধবার প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, 'আজ অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কমল-কুটীরে কেশববাবুকে দেখিতে আসিবেন এবং পরে সন্ধ্যাকালে মাথাঘষা পল্লীর জয়গোপাল সেনের বাটীতে আগমন করিবেন, দেখিতে যাইবে কী?' "[২]

সেইদিন আবার এই তিনবন্ধু সেখানে গিয়েছিলেন, অবশ্য সেদিন সেখানে সর্বসাধারণের জন্য ব্যবস্থা ছিল না—এটা তাঁরা জানতেন না। তা সত্ত্বেও ঠাকুর তাঁদের আগ্রহ দেখে প্রসন্ন হয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ভাষাই উদ্ধৃত করছি; "ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ইতিপূর্বে অল্পকালমাত্র লাভ করিলেও তাঁহার অমৃতময়ী বাণীর অপূর্ব আকর্ষণ আমরা প্রথম দিন হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। উহার কারণ তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও এখন বুঝিতে পারি, তাঁহার উপদেশ দিবার প্রণালী কতদূর স্বতন্ত্র ছিল।"[৩] এই তিন বন্ধু যে সেই সময় প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে অথবা অন্যত্র ঠাকুরের সঙ্গলাভের আকর্ষণে যেতেন সে-কথা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দও 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা'য় উল্লেখ করেছেন।[৪]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অতি সহজভাবেই ভক্তের মনের সব দ্বন্দ্ব, সব অবিশ্বাসকে স্বল্প ও সরল কথায় দূর ক'রে দিতেন, তাঁর সঙ্গ একবার যে পেয়েছে সে ধন্য হয়েছে। শ্রীবরদাসুন্দরের অতীব সৌভাগ্য যে, তিনি ঠাকুরের এত কাছে যেতে পেরেছিলেন এবং তাঁর কৃপা লাভ করেছিলেন। যদিও তিনি আর দুই বন্ধুর মতো সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করতে পারেননি, তবু সেই সঞ্চয়টুকুই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়েছিল।

বি. এ. পাশ করার অব্যবহিত পরেই বরদাসুন্দরের পিতার হঠাৎ অপঘাতে মৃত্যু ঘটে। ত্রিপুরার মহারাজের যে জমিদারী তিনি তত্ত্বাবধান করতেন, সেই জমিদারীর কিছু অশান্ত প্রজা কোন কারণে বিদ্রোহ করে এবং কাছারীতেই চড়াও হ'য়ে তাঁকে হত্যা করে। এই আকস্মিক বিপদে সমস্ত পরিবারটি বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, ফলে বরদাসুন্দরকে সংসারের ভার গ্রহণ করার জন্য কুমিল্লায় চলে আসতে হয়। তিনি এসে কাজের সন্ধান করতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ফেণী উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা উচ্চবিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন, কিন্তু তাঁকে বেশীদিন শিক্ষকতা করতে হয়নি। সেই সময় কুমিল্লার

২ তদেব, পৃঃ ৩৮

৩ তদেব, পৃঃ ৪০

৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত মালিকা, ২য় ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ৯৩

নবাব এস্টেট 'কোর্ট-অব-ওয়ার্ড্‌সে'র তত্ত্বাবধানে আসে। তাঁরা একজন উপযুক্ত ম্যানেজারের খোঁজ করছিলেন। বরদাসুন্দর এই কাজের জন্য আবেদন করেন এবং নির্বাচিত হন। এই কাজই তিনি শেষ পর্যন্ত ক'রে যান।

এই সময়ে তিনি নানাপ্রকার জনহিতকর কাজেও লিপ্ত হন। তিনি কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলায় কো-অপারেটিভ আন্দোলনে অংশ নেন এবং ঐ অঞ্চলে প্রথম কো-অপারেটিভ সোসাইটি সংগঠন করতে ওখানকার তদানীন্তন জেলা-শাসক কে. সি. দে মহাশয়কে বিশেষ সাহায্য করেন। স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা এবং রামমালা ছাত্রাবাস গঠন করতেও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এইরূপ বিবিধ প্রকার জনহিতকর কাজের জন্য সরকার থেকে তাঁকে 'কাইজার-ই-হিন্দ্‌' পদক দেওয়া হয়।

পিতার মৃত্যুর পর কলকাতা থেকে ফিরে আসার অব্যবহিতপর তিনি তাঁর মাতার আদেশে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম শ্রীমতী ষোড়শী-বালা। জানি না এই সময় তাঁর মনের অবস্থা কিরূপ ছিল। সতীর্থ এবং বন্ধু শরৎচন্দ্রের মতো তিনিও সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ না হ'য়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয় নেবার কথা ভেবে-ছিলেন কিনা বলতে পারি না। অবশ্য অনেক ভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই সংসারের দায়িত্ব স্বীকার করতে উপদেশ দিয়েছিলেন—বরদা-সুন্দরের বেলায় এইরকম কিছু হয়েছিল কিনা, তার প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। যাই হোক সংসারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য যে তিনি পরিপূর্ণ-ভাবে পালন করেছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য সংসারজীবনে তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করে-ছিলেন। বোনেদের বিবাহ দেওয়া এবং ছোট ভাই সারদাসুন্দরকে মানুষ করা তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল। এই সব কর্তব্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। সারদাসুন্দর ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ ক'রে সরকারী কাজে যোগদান করেন এবং পরে সুপারিন্‌টেনডিং ইঞ্জিনীয়ার হন।

আমি পিতার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। আমার শৈশব কালেই আমার পিতা বরদাসুন্দর সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হ'য়ে অচল হ'য়ে পড়েন, এমনকি তাঁর জিহ্বাও আড়ষ্ট হ'য়ে যায়, তাই তাঁর মুখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অথবা শ্রীশ্রীমায়ের কথা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। মা এবং দাদা-দিদিদের কাছে যতটা সম্ভব জেনেছি। আমার বাবা সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে না পারলেও এঁদের কার্যকলাপের খবর নিয়মিত রাখতেন। ধীরে ধীরে যখন মঠ ও মিশনের কাজের প্রসার ঘটল এবং পূর্ববঙ্গে কাজ আরম্ভ হ'ল, তখন সন্ন্যাসীদের কেউ ও অঞ্চলে গেলে আমাদের বাড়ীতে আসতেন এবং বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। বাবা বাড়ী তৈরীর সময় তিনতলার ছাতে সাধুদের থাকার জন্যে একটি ঘর তৈরী করেছিলেন। মঠের সন্ন্যাসীরা যখন আসতেন সেই ঘরে থাকতেন। অনেকেই এভাবে এসেছেন এবং থেকেছেন তাঁদের সকলের নাম আমার স্মরণে নেই। কয়েকজনের কথা মনে আছে—যেমন, নির্বেদানন্দ মহারাজ, জ্ঞান মহারাজ, ইন্দ্রদয়াল মহারাজ প্রভৃতি।

বাবা বরদাসুন্দর বেলুড় মঠের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁর হৃদয়ে ঠাকুরের আসন সব সময়ই পাতা ছিল, যদিও সংসারের চাপে পড়ে ঠাকুরের অন্তর্ধান হবার আগে তিনি কলকাতায় আর যেতে পারেননি, তবু পরবর্তী জীবনে যখনই কলকাতায় আসার সুযোগ হ'ত, অন্ততঃ একবার উদ্বোধনে মায়ের মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করতেন এবং বন্ধুবর স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে

দেখা করতেন। কোন কোন সময় আমার মেজদা শ্রীপ্রতিভাসুন্দর এবং ছোটদা শ্রীরণদাসুন্দর তাঁর সঙ্গে যেতেন। এইপ্রসঙ্গে আমার মেজদা প্রতিভাসুন্দর যা বলেছেন সেটা তাঁর ভাষাতেই লিখছি :

"আমি মা ও বাবার সঙ্গে একবার কলকাতায় উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তখন আমার ৮/৯ বৎসর বয়স। শ্রীমা বা শ্রীঠাকুরের গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য তখন বুঝতাম না। উদ্বোধনের একতলায় বাবার বন্ধু শরৎ মহারাজ ছিলেন। দুই বন্ধুতে দেখা হওয়ামাত্র উল্লাসে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন—দু'জনের কী আনন্দ! বাবা শরৎ মহারাজকে 'শরৎ তুই' বলেই সম্বোধন করছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গল্পে জমে গেলেন। শরৎ মহারাজ আমাদের ওপরে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন। মা ও আমি ওপরে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, একটা চৌকির ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি সাজানো রয়েছে। ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে শ্রীমাকে প্রণাম করলাম। শ্রীমা আমাকে নিজ হাতে তেলমুড়ি মেখে একটা বেতের চুপড়িতে ক'রে খেতে দিলেন। আমি বারান্দায় বসে তা আনন্দ ক'রে খেলাম। মা ও শ্রীমাতে কি কথাবার্তা হ'ল তা আর শুনিনি। শ্রীমাকে প্রণাম ক'রে যখন চলে আসি তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন। তাঁর পরনে কোরা কালপাড় শাড়ি, হাতে বালা—সেই করুণাময়ী মাতৃমূর্তি এখনও আমার মনে জ্বল্ জ্বল্ করছে।" আর একবার আমার ছোটদা শ্রীরণদাসুন্দরও বাবা ও মায়ের সঙ্গে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর মাত্র ৬/৭ বৎসর বয়েস। শ্রীশ্রীমা তাঁকে ঠাকুরের প্রসাদী একটি সন্দেশ খেতে দিয়েছিলেন—এটুকুই তাঁর মনে আছে।

আমাদের বাড়ীতে অনেক দুঃস্থ আত্মীয় থাকতেন। কেউ পড়াশুনার জন্য, কেউ চিকিৎসার জন্য, কেউ বা অন্য কাজ উপলক্ষে। বাবার গৃহদ্বার সকলের জন্য সদাসর্বদা উন্মুক্ত থাকত। বাবা বরদাসুন্দর ও মা ষোড়শীবালা সকলকে সমানভাবে দেখতেন।

ঠাকুর বলতেন, "পরের বাড়ীর দাসীর মতো সংসার করবি।" বাবাকে দেখেছি যতটা পারতেন সেই ভাবটা ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। আমার মায়ের ওপরে বাবার প্রভাব নানাভাবে পড়েছিল। ১২ বৎসর বয়সে মায়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বে গ্রামের পাঠশালায় খুব সামান্যই লেখপড়ার সুযোগ পান, কিন্তু পরবর্তী জীবনে বাবার ঐকান্তিক চেষ্টায় মা বহু ধর্মগ্রন্থ পড়তে ও বুঝতে সমর্থা হয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের বাবা তৃতীয়বার সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন এবং কুমিল্লায় দেহরক্ষা করেন।

শেষ করার আগে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি—এটি আমার ছোটদা শ্রীরণদাসুন্দরের কাছে শোনা। ঘটনাটি দাদার ভাষাতেই লিখছি : "বাবার মৃত্যুর পর আমি মাকে নিয়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি ও মা দক্ষিণেশ্বরের চত্বর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ একটি বিদেশী শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা এসে মাকে প্রণাম করেন। মা তো একেবারে হতভম্ব হ'য়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। অচেনা এই ভদ্রমহিলা হঠাৎ কেন তাঁকে প্রণাম করছেন, তা বুঝতে না পেরে খুব সঙ্কুচিতা হলেন। আমিও প্রথমটায় কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখি একটু দূরে স্বামী বিশ্বানন্দ সহাস্য-বদনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে স্বামীজী এগিয়ে এলেন। তাঁর কাছে জানলাম ইনি প্রসিদ্ধা ভগিনী ভক্তি,* যিনি

* মিস রুবেল

বেলুড় মন্দির তৈরীর জন্ম প্রচুর অর্থ দান করেছেন। স্বামী বিশ্বানন্দ আমাদের মাকে আগে দেখেছিলেন এবং চিনতেন; তাই সেদিন মাকে দেখতে পেয়ে ভগিনী ভক্তিকে বলেছিলেন, 'ঐ যে ভদ্রমহিলাকে দেখছ ওঁর স্বামী স্বয়ং শ্রীঠাকুরকে দেখেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্ম হয়েছিলেন।' সেই কথা শোনা মাত্র ভগিনী ভক্তি সোজা এসে মায়ের পায়ে প্রণাম করেছেন।"

এই বিদেশিনীর চোখে—ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেখার পরম সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে, তিনি তো ধন্ম ও প্রণম্য বটেই, এমন কি তাঁর পরিবার পরিজনও ধন্ম ও নমস্য! হায়! যদি আমারও এই বিশ্বাসের এক কণামাত্রও থাকত, তবে নিজেকে সত্যই কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করতাম।

'শ্রীম'

শ্রীমতী হিমানী রায়

শুনেছি পুরাণে,
উঠিল অমৃত ভাণ্ড সমুদ্র মন্থনে,
ছলে, বলে, করি অধিকার,
সে অমৃতপানে দেব হইল অমর ;
আর কেহ নাহি পেল কণামাত্র তার।
হে মহান!
সে অমৃতের স্বাদ, আনি দিলে ভিন্ন রূপে মানবের দ্বারে।
আপন তপস্যালব্ধ সাধনার ধন,
তিলে তিলে 'কথামৃত' করি সঞ্চয়ন,
অমিয় পীযূষ ধারা ঢালি দিলে সকলের তরে।
ভগীরথ তপস্যায়,
স্বর্গের জাহ্নবী-বারি আনিল ধরায়,
আজও তাহা বহে চলে।
তব সাধনায়,
শতাব্দীর পার হ'তে কার কণ্ঠস্বর
নিখিল মানব মনে জাগায় চেতনা
কতরূপে, কতভাবে, গৃহী, ভক্ত, সাধকের—
আনিল প্রেরণা,
তুমি সদা রহিলে আড়ালে।
হে কথামৃতকার!
তুমি শুধু নহ 'ছেলেধরা'
সার্থক লেখনী সূত্রে, ধরা পড়ে বারবার, কতশত জন,
অভয় আশ্রয়ে আসি, নতুন জনম লভে,
পায় নব পথের ইসারা।
ধন্ম তুমি, ধন্ম তব ভক্তির সাধনা,
জন্মজন্মান্তর ধরে, কণামাত্র মেলে যদি পুরিবে বাসনা।

নন্দাদেবী

স্বামী পূর্ণানন্দ

একদিন অপরাহ্ণ বেলা—
আমার এ শূন্য মন—কি যেন খুঁজিতেছিল—
কি যেন পাইতে চায়—
অনাবিল আনন্দের অতুল আস্বাদ—?
অথবা ধাইতেছিল কোন্ এক অমৃত
সন্ধানে—?

কিছু নাহি বুঝি।
তাই বসি গৃহকোণে উদাস হৃদয়ে
অপলক দৃষ্টি মেলি—
দেখিতেছিলাম বাতায়ন পথে—
লাবণ্যময়ী অপরূপা
অনুপমা—
মায়াময়ী মায়াবতী।
ভাবিতেছিলাম—
আহা! কিবা রূপ নয়নাভিরাম!
নাহি জানি—
কি যে মায়া অন্তরে তাহার—
কত শক্তি সেথা আছে লুকাইয়া—
সসীম—অসীম কিবা
তাহাও না জানি।
শুধু দেখি—
ক্ষণেক্ষণে ধরি ভিন্নরূপ
সাজিয়া বিবিধ সাজে
আকর্ষণ করি মুগ্ধ মানব অন্তর—
টানি লয়ে নিজ সন্নিধানে—
বাঁধে স্নেহ ডোরে।

হেনকালে অকস্মাৎ-
স্তব্ধ হ'ল সে চিন্তার স্রোত
ঘটিল প্রমাদ—
ঘোররূপা ঝঞ্ঝারাশি আসিল ধাইয়া
পৃথিবীর 'পরে,
গর্জে মেঘদল, মুহুর্মুহুঃ অশনি সংকেত—
ধাইছে পবন মত্ত হুহুঙ্কারে,
উপাড়িয়া মহীরুহ আছড়িছে মহীতলে—
প্রমত্ত মাতঙ্গ যথা, কদলীর বনে,
অথবা শার্দুল যথা ফেরুপাল মাঝে।
যেন মহাকাল রুদ্ররোষে
গ্রাসিছে ভূধরে,
হুঙ্কারিয়া ক্ষণে ক্ষণে
সংহারিছে বিশ্ব ভূমণ্ডল।
অট্টহাস্যে করি আস্ফালন—
তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরিছে
নাচিছে উদ্দাম তাণ্ডবে;
শূলপাণি যথা দক্ষ যজ্ঞভূমে;
হায়, সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে!
দিনমণি অস্তাচল চূড়ে—
ঘোর কৃষ্ণমেঘ রাহুসম গ্রাসিছে তাহারে
বহিতেছে হিম শীতল বিক্ষুব্ধ পবন—
তারি সাথে অবিরাম বারিপাত—
সুতীক্ষ্ণ সায়কসম হিমশিলা প্রহার
জর্জরিত করিছে ধরারে।
মৃত্যুরূপা ঘোর অমানিশা
ধীরে ধীরে আসিছে নামিয়া
প্রতীক্ষায় তাহারি—স্তব্ধ করি
নিশ্বাস-প্রশ্বাস

প্রহর গুণিছে যেন
ভীতা ত্রস্তা কম্পিতা মেদিনী।

সহসা পড়িল দৃষ্টি—
দূরে—দিক চক্রবালে—
যেথা নিত্যবিরাজিতা
নগরানী,—মহীয়সী নন্দাদেবী।
ধীর স্থির প্রশান্ত গম্ভীর
অভ্রভেদী চূড়া যার
স্পর্ধা ভরে স্পর্শে নভঃস্থল।
এতক্ষণ লুকায়ে আপনারে
নীল নীরদ পটলে
ছিল সে অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
ছিন্ন করি জলদজাল
সাজি অপরূপ সাজে
ত্যজি অন্তরাল—অন্তঃপুর হ'তে
প্রকাশিলা সভামাঝে আচম্বিতে।
আহা! মরি মরি কী রূপ মাধুরী!
ভাষার সাধ্য কিবা
বর্ণে সেই সুষমারে।
অত্যুজ্জ্বল হেমকান্তি
বিচ্ছুরিত দেহ জ্যোতিঃ
উদ্ভাসিত করে দশদিক্;
হেমকর-কিরণ-আভায়
হেমাঙ্গিনী সাজিয়াছে অবনীমণ্ডল।
অনুপম সেই রূপচ্ছটা,
নিরখিয়া বারে বারে—
মিটে নাকো আশ—অতৃপ্ত বাসনা
বারেক ফিরে না আঁখি ত্যজিয়া তাহারে
আহা! কোথা ছিল এত রূপ—
কে বা, তারে দিল এই রূপের সম্পদ্
নিঃশেষিয়া ভাণ্ডার কাহার?

স্বর্গীয় সুষমা,
দেবগণ মনোলোভা—
নন্দন কানন শোভা
কিবা ছার তার কাছে!
সানুদেশে গিরিদরী হ'তে
উঠে ধূমরাশি—যেন ধূপদীপ জ্বালা—
ঝিল্লিকা ঝিল্লিছে সদা
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিসম পশিছে কুহরে।
স্বর্ণপ্রভ প্রভাকর পাটে বসি
করিছেন আরতি তাহার।
নির্ঝরী ঝর্ণার ঝর ঝর ধ্বনি
বিহঙ্গের কলরব কলিত কাকলি
সমস্বরে ধরিয়াছে তান
পূরবীর সুরে,—
বন্দনা গাহিছে অবিরাম।
মেঘপুঞ্জ রাশি রাশি
প্রদক্ষিণ করি তারে চুম্বিছে শ্রীপদ কমল,
নিত্যস্তব করিছে তাহার।
একপার্শ্বে শিব অস্ত্র ত্রিশূল
শোভে কাল বজ্রবিশাল,
অন্যপার্শ্বে প্রিয় নন্দা সহচরী
ধরি ভাসমান শুভ্র মেঘখণ্ড এক—
দোলাইছে ধবল চামর—
যতনে, অতি স্নেহভরে।
শিরোপরি শোভে
চন্দ্রাতপ সম ধূসর সে মেঘরাশি,
পাদদেশে—শ্বেতকায় পুঞ্জমেঘ
স্তরে স্তরে জমিয়া জমিয়া
সবুজ আসনোপরি

রচিতেছে তারি লাগি
কোমল শয়ন—দুগ্ধ ফেনসম।
নিতম্বে বেষ্টিত কৃষ্ণ মেঘশ্রেণী
যেন কটিদেশে পরিহিত
কৃষ্ণকান্ত মণিময়
শোভিছে কিঙ্কিণী।
ধীরে ধীরে গেল চলি দেব মরীচিমালী,
সন্ধ্যা দেবী আসিল তথায়
মৌনমন্থরে, অতি সন্তর্পণে
টানি গোধূলি কিংখাবখানি
অতি সযতনে ঢাকি দিল তারে।
ভাবিল—
নিদ্রিতা হইলে দেবী—
জাগিবেন কাল প্রাতে
প্রভাত পাখীর সাথে।

ধ্যানমগ্না সেই মহাদেবী--
সৃষ্টির আদি কাল হ'তে
পশিয়াছে সমাধি মন্দিরে
ওঠে নাই আজো।
বজ্রনাদে, দিক্ নিনাদিত
পদতলে মূর্ছে জলধর,
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গে স্পর্ধিত পবন—
তবু নাহি ভাঙে ধ্যান—।
তারকার রাশি ভক্তিভরে আপনারে, দেয়
পুষ্পাঞ্জলি,
শশধর সসম্ভ্রমে করে প্রদক্ষিণ,
প্রভাত কিরণ আসি ধোয়ায় চরণ
মৃদুমন্দ মলয় পবন
স্পর্শে তারে শীতল পরশে,
হিমবারি ঢালি শিরে করে অভিষেক,
বিহঙ্গম গাহে সুমধুর সামগান,
গিরি হ'তে ওঠে মহা ওঁকারের ধ্বনি,
তবুও না জাগে সমাধিস্থা মাতা।
এইরূপে চলে পূজা অভিষেক—
অনাদি অনন্ত কাল, যুগযুগান্তর
পূজে সুর-নর, যক্ষ-রক্ষ, গন্ধর্ব-কিন্নর,
সুরেন্দ্র পূজিতা দেবী সুরধুনী মাতা—
চির বিরাজিতা—
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি এক
অচল, অটল, অবাক্, অচিন্ত্য, অব্যয়
—মহাসতী মগ্ন যেন মহাদেব ধ্যানে।

স্থাবর জঙ্গম আদি প্রপঞ্চ জগতে
জন্ম-মৃত্যু লীলাখেলা চলে অবিরাম ;
কীট পতঙ্গ হ'তে মানব দানব
দেব আদি যত
জন্মে ধরাতলে ক্ষণকাল তরে,
পরক্ষণে মহাকাল অবহেলে
নিমেষে নিক্ষেপে পুনঃ শমন সদনে,—
কিছুতে নাহিকো ভ্রূক্ষেপ তাহার
দ্রষ্টা—সাক্ষীরূপে রহে মাত্র শুধু।
সুখ-দুঃখ, জনম-মরণ—দ্বন্দ্ব আদি যত
নাহি পারে পরশিতে তারে।
দুঃখে কভু উদ্বিগ্ন না হয়,
সুখস্পর্শ নাহি আনে আনন্দ উচ্ছ্বাস—
শীতগ্রীষ্মে সমভাব, রহি নির্বিকার
নিন্দুকে নাহি দেয় অভিশাপ
স্তাবকে করে না কভু ধন্য বরদানে।
ভূকম্পন, উল্কাপতন, অশনি সম্পাত
সাধ্য কিবা টলায় তাহারে—

হতশক্তি হতোন্তম হ'য়ে শুধু
ফিরে যায় লজ্জা নম্র শিরে
ললাটে করিছে শুধু ব্যর্থ করাঘাত।
স্রোতস্বিনী হারায় স্রোত,
নদীতট পর্বত গহ্বর,
সমুদ্র আকুল
ভাঙে, গড়ে, ধরে নিত্য নব কলেবর;
জগতের নিত্য পরিবর্তন—নব নব
ঘটনাপ্রবাহ·—
শত আবর্তন, শত বিবর্তন—
বিশ্বের শত শত ঘাত-প্রতিঘাত—
সাধ্য নাহি—
ঘটাইতে তার ধ্যানের ব্যাঘাত।
ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্তমান—
তিনকাল ধরি আপন মহিমায়
সদা বিদ্যমান
শুভ্র সমুজ্জ্বল—তুষার ধবল—
উদ্ধত শিখর-শালিনী
চির তপস্বিনী
ধ্যান মৌন নন্দাদেবী।

সমন্বয় সাধনে কবীর

রেজাউল করীম

"বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় স্থাপন করতে হবে" ভারতবর্ষের মধ্যযুগের বহু সাধক, সাধুসন্ত ও মহাজনের এই ছিল একান্ত কামনার বস্তু। যাঁরা এই ঐক্য ও সমন্বয়ের জন্য সাধনা করেছেন তাঁরা আমাদের নমস্য। আজকের দিনে আমরা তাঁদের কথা বারবার স্মরণ করি। যাঁরা এইপ্রকার সমন্বয়ের সাধনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কবীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আজ এই প্রবন্ধে কবীরের কথা কিছু ব'লব।

মহাত্মা রামানন্দের শিষ্যের মধ্যে কবীর ছিলেন একজন উঁচুদরের সাধক। তিনি জীবনের রহস্যের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। এবং জীবনে এক স্বর্গীয় অপরিম্লান জ্যোতিঃ দেখেছিলেন। তিনি বাইরের জগৎ থেকে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য অপূর্ব বাণী এনেছিলেন। কুটিলতা, অসত্য, কদর্যতা, অসাম্য এইসব থেকে সমাজকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন এবং একটা উচ্চতর উন্নততর সমাজের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি এমন একটা ধর্মাদর্শের কথা প্রচার করলেন, যার ভিত্তি ছিল সত্য ও প্রেম—যার উপর মানুষ স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। এই মহান্ আদর্শ তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করেন।

তিনি কোনরূপ ইতস্ততঃ না ক'রে dogma বা অন্ধবিশ্বাস অথবা কোন গ্রন্থের বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নজিরের উপর জোর দেননি। তিনি কোন authority (প্রামাণিকতা)-র কথা বলেননি। তিনি বললেন, এইসব বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড আচার-অনুষ্ঠান মানুষকে সত্যবস্তু জানতে দেয় না। এ-সবকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তিনি আরও বললেন, ধর্মে ধর্মে এই যে বিরোধ, বাগ্‌বিতণ্ডা, তা কেবল ধর্মের বহিরঙ্গ নিয়ে। আর এই বহিরঙ্গ হ'ল ধর্মের খোসা—আসল জিনিস নয়। ধর্মের এইসব খোসাকে নিয়ে ঝগড়া ঝঞ্ঝাট হ'তে দেখে তাঁর আত্মা পীড়িত হ'য়ে উঠেছিল। ধর্মের নামে কোন ছলনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি আসল ঈশ্বরকে খুঁজতে লাগলেন। মনে রাখতে হবে যে, কবীর গৃহত্যাগী বনবাসী সাধু ছিলেন না। যারা সংসারের এইসব গণ্ডগোল দেখে হতাশায় গৃহত্যাগ

করে, অথবা গুহাবাসী হয় তিনি তাদের দলে ভিড়লেন না। অথবা তিনি সেই ধরনের আশাবাদী ও আদর্শবাদীও ছিলেন না, যাঁরা জগতের সবকিছুকেই ভাল মনে করেন। তিনি বাস্তব আদর্শ দিয়ে জগতে নৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। এবং প্রকৃত ধর্মের সার বস্তুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠলেন। এবং ধর্মের নামে যে-সব ছলনা চলছে তার উপর আঘাত হানতে প্রস্তুত হলেন। যারা যুক্তিসঙ্গত আচরণের বিরুদ্ধে যায়, এবং মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে চায়, তিনি তাদের কঠোর ভাষায় সাবধান বাণী শুনালেন। তিনি হ'য়ে উঠলেন অবিচলিত পথ-সন্ধানী—এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যপথের পথিক। তিনি ছিলেন মানবধর্মের সেই অগ্রগামী সাধক, যিনি এই শিক্ষা দিতে লাগলেন—ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত ক'রে আছেন।

সমন্বয়-সাধক এই মহাপুরুষের বাল্যজীবন রহস্যজালে আবৃত। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। কোন কোন লেখকের মতে তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবার অপর একজনের মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কবীরের জন্মতারিখ নিয়ে নানাজনের নানামত। তাঁর জন্ম-মৃত্যু যেদিনই হউক না কেন, এটা অনুমান করা যায় যে, তিনি দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন।

শৈশবে 'নিরু' নামক এক তন্তুবায় ও তাঁর স্ত্রী 'নিমা' তাঁকে পুত্রবৎ পালন করেন এবং মুসলিম পিতামাতার গৃহে কবীরের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। এই পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কবীরকে তাঁরা রীতিমত শিক্ষা দিতে পারেননি। তিনি প্রথম থেকেই এই পিতার ব্যবসায় শিক্ষা করেন। তবে তাঁর পিতামাতা কোন কিছুর জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেননি, কিন্তু তাঁরা ভরণপোষণের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব রুচি ও শক্তিসামর্থ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কবীর আর কি করবেন? কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর বারাণসীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি চতুর্দিকের পরিবেশের মধ্যে কাল যাপন করতে লাগলেন। কবীরের ছিল একটা তীব্র অনুসন্ধানী মন। বারাণসীতে আসবার পূর্ব থেকেই জীবনের প্রথম দিকে তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সর্বপ্রকার গোঁড়ামী থেকে মুক্ত ছিলেন। সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী থেকে তিনি এতই মুক্ত ছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ তাঁকে ঠিকভাবে বুঝতে পারত না। সেজন্য তারা তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন ক'রত। তিনি ঠিক করছেন কিনা তা বুঝবার জন্য একজন গুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তখন তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কতিপয় উৎকৃষ্ট লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু তিনি যা চাচ্ছিলেন তা পেলেন না। অবশেষে কোন কোন লোক তাঁকে একজন তীক্ষ্ণ প্রতিভাবান্ বৃদ্ধলোকের নিকট পরামর্শ নিতে ব'লল। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি হলেন রামানন্দ। তাই তিনি বলেন, কাশীতে আমি অনুপ্রেরণা লাভ করি এবং রামানন্দের দ্বারা জাগরিত হই ও পুনর্জীবন লাভ করি। বস্তুতঃ রামানন্দ তাঁকে হিন্দু মতানুযায়ী দীক্ষা দেন। তিনি তাঁর এই গুরুর সঙ্গে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দেন। এরপর তিনি দেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি তাঁদের সঙ্গে স্বাধীন ও মুক্ত মনে মেলামেশা করেছিলেন। কিছুসংখ্যক মুসলিম সুফীদের সঙ্গে তিনি কাটিয়ে ছিলেন। মানিকপুরে তিনি শেখ

তাকির সঙ্গে দীর্ঘকাল ছিলেন এবং তাঁর উপদেশাবলীও তিনি শিক্ষালাভ করেন। সেই একই ধরনের শিক্ষা তিনি জেউনপুরে এবং এলাহাবাদের নিকট ঝুসিতেও লাভ করেন। তিনি মুসলিম পীর ফকিরদের নাম শুনলেন। এইভাবে বহু গণ্যমান্য সাধক, পীর ও শিক্ষকের নিকট কবীর বিবিধ প্রকার শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি যা শিখেছিলেন, তা পুস্তক পড়ে নয়, বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট মুখে মুখে শিক্ষালাভ ক'রে। কারণ, তিনি বই পড়তে পারতেন না। তিনি ফারসী ভাষা অথবা সংস্কৃত ভাষা পড়তে পারতেন না, কিন্তু সুফী মতবাদ ও হিন্দু-দর্শনের পরিভাষাগুলি শিখেছিলেন ও তা ব্যবহার করতে পারতেন। যার মনে ঈশ্বরপ্রেম আছে, লেখাপড়া জানাটা তার নিকট প্রধান বিষয় নয়। তিনি লেখাপড়া ও কেতাবী বিদ্যাকে মুখ্য বিষয় ব'লে মনে করতেন না। তিনি পরাবিদ্যা ও উচ্চতর জ্ঞানের অনুসন্ধানী মানুষ ছিলেন। তিনি জ্ঞানের সারাৎসার জানতে চেয়েছিলেন। আর তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি সে-সব বিষয় সম্যক্‌ভাবে শিখেছিলেন।

কবীরের জীবনের বিভিন্ন অভিমতগুলি কিভাবে তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, তা জানবার কোন উপায় নেই। তাঁর শিক্ষানবীশের যুগ পার হ'লে তিনি অবশেষে শিক্ষক হিসাবে বাস্তব ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বারাণসীতেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। তিনি যা শিক্ষা দান করতেন, তা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, তা নানা বিষয় স্পর্শ করেছিল।

ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান formula বা কতকগুলি বাঁধা-ধরা বিধি ও ব্রতপালন, পূজা ইত্যাদি বাহ্যিক দিক সম্পর্কে তিনি স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশ করতেন। সেজন্য রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলিম সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাঁর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠল। এমন কি অনেকে তাঁকে দৈহিক যন্ত্রণা দিতে প্রস্তুত ছিল। নানাভাবে তারা তাঁকে দমন করতে চেষ্টা করেছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পৌরোহিত্য প্রথা, নূতন পথের ইঙ্গিত যাঁরা দিতে চান তাঁদেরকে দমন করতে চেয়েছিল। এই শ্রেণীর লোকরা তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু এইসব আলোচনার মধ্যে তারা নিজেরাই নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু তাতে তারা পরাজয় স্বীকার করল না। কবীরের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে তারা রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা ক'রল। রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষও কবীরকে কম নির্যাতন করেনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সে-যুগেও ভারতবর্ষে ধর্ম ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। ভারতবর্ষ তো মধ্যযুগের ইউরোপ নয় যে, ধর্ম ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ ও প্রচার করলেই কাউকে অগ্নিদগ্ধ করতে হবে। এই যুগে ইউরোপে কবীরের মতো বহু সাধককে ধর্ম ব্যাপারে ভিন্ন মতের জন্য পুড়িয়ে মেরে ফেলা হ'ত। সেইজন্য কবীর সমস্ত প্রকার নির্যাতন থেকে উদ্ধার পেলেন। তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট্ সিকেন্দার লোদী (১৪৮৮-১৫১৭) কবীরের সরলতা ও আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন পণ্ডিত ও মৌলবীদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করলেন। সেই যুগে যে সূফী মতবাদ প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে কবীরের মতের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। সেইজন্য সেকেন্দার লোদী স্থির করলেন যে, কবীরকে কোন দণ্ড দেওয়া হবে না। সুতরাং তিনি পুনরায় বারাণসীতে ফিরে এলেন। এরপর আর কেউ তাঁর উপর কোন অত্যাচার করেনি। উভয় সম্প্রদায়ের নিকট তিনি প্রচুর সম্মান শ্রদ্ধা লাভ করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, চতুর্দিকে তাঁর প্রভাব

ছড়িয়ে প'ড়ল। কবীরের ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সরল ও আড়ম্বরহীন। তিনি সাধারণ গৃহস্থের মতোই অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। জনৈক বৈরাগীর আশ্রমে একটি মেয়েকে দেখেন। 'লোই' (Loi) তার নাম। তিনি সেই মেয়েকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে তাঁর একটি পুত্র-সন্তান হয়েছিল। তার নাম কামাল। পরে একটি কন্যা-সন্তানও হয়েছিল—তার নাম রাখা হয়েছিল 'কামালী'। কবীর তাঁতের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন। কবীরের একটি ছবি আছে। তাতে দেখা যায় যে, তিনি তাঁতে বসে বসেই তাঁর শিষ্যদের জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন। কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ কিভাবে সৎকার হবে—এই নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হ'ল। এই ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ ছিলেন এবং তিনি সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।

কবীর কোন প্রকার জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করতেন না। হিন্দুদের ষড়দর্শনকে তিনি স্বীকার করতেন না। সে-যুগের ব্রাহ্মণগণ যেভাবে জীবনকে বিভক্ত ক'রে দেখতেন, তিনি সেভাবে জীবনকে দেখতেন না। তিনি বলতেন, ভক্তিহীন ধর্ম—ধর্মই নয়। ভক্তি-বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবনযাপন, উপবাস, দেহকে নির্যাতন—এ-সব তাঁর নিকট ধর্মের প্রধান অঙ্গ নয়। তাই তিনি এ-সবের উপর কোন মূল্য দিতেন না। যদি এ-সবের সঙ্গে ভক্তিপূর্ণ উপাসনা না করা হয়, তবে সে-সব বহিরঙ্গগুলির দ্বারা কোন ফল হয় না। হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই ধর্মের কোনটার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কিন্তু তিনি এমন সব শিক্ষা দিতেন, যা উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উপলব্ধি ক'রত ও গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হ'ত না। কবীর নির্ভীকভাবে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করতেন। শ্রোতা ও ভক্তদের খুশী করার জন্য তিনি কোন কথা বলতেন না। কবীরের বাণী ছিল প্রেমের বাণী, যা সমস্ত দল উপদল ও মতবাদকে একত্র করতে পারত। আর তা করেছিলও। হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন, যা মূল সত্যের ভাববিরোধী। প্রত্যেক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য যা প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী মনে করতেন, সেইসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দান করতেন। উভয় ধর্মের মধ্যে যে-সব সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তিনি সেইগুলিকে বেছে বেছে লোকের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি দেখিয়ে দিতেন যে, তাদের মধ্যে কিরূপ আশ্চর্য সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। উভয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও তিনি বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করতেন। এইভাবে তিনি দেখালেন যে, এইসব সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে, উভয় ধর্মের মর্মমূলে আছে একটা আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সমতা। তারই উপর তিনি গুরুত্ব দান করলেন এবং উভয় ধর্মের বহিরঙ্গ ও লৌকিকতাকে নিন্দা করলেন। বাহ্যিক দিক দিয়ে দুই ধর্মের মধ্যে যে বিভেদ দেখা যায়, তার তিনি নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করলেন এবং একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্য উপদেশ দান করলেন।

তাই কবীর বললেন, "হিন্দুরা মন্দিরের আশ্রয় লয়, এবং মুসলমানরা মসজিদের আশ্রয় লয়, কিন্তু কবীর সেইস্থানে যায়, যেখানে উভয়কে জানা হয়। দুটি ধর্ম একই বৃক্ষের দুটি শাখার মতো, যার মধ্যস্থানে আছে একটি মঞ্জরী—একটি 'কোরক'—যা উভয়কে অতিক্রম করে।" দুটি ধর্মের কতকগুলি প্রথাকে বর্জন ক'রে কবীর একটা

উচ্চতর পথ ধরলেন। তাই কবীর বললেন, "তুমি যদি বলো, আমি হিন্দু, তবে তা সত্য নয়। আর তুমি যদি বলো, আমি মুসলমান, তবে তাও সত্য নয়। আমার কাছে মক্কা নিশ্চয় কাশীতে পরিণত হয়েছে।" তিনি নির্ভীকভাবে এই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন, এ-সব কথা প্রচার করা—তাঁর জীবনের একটা ব্রত। তাঁর এই ব্রত সম্বন্ধে কবীর সচেতন ছিলেন। তিনি যে-সব শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক সেই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করেছিলেন। কবীর ঘোষণা করেন, "আমি সেই Absolute God বা পরম ব্রহ্মের ভৃত্য।" আমি আমার শিষ্যদের রক্ষা করার জন্য এসেছি। উপদেশ ছলে আমি মুখে মুখে জগতের লোককে সেইসব বিষয় শিক্ষা দিব, যার মধ্যে আছে সত্যের প্রতিচ্ছবি।

ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে তিনি এইসব উদার শিক্ষা দান করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁর পূর্বে ও সমসাময়িক কালে আরও বহু উদারচেতা সুফীসন্ত ও মহাপুরুষগণও এই ধরনের শিক্ষাই দিয়েছেন। এইসব উদার ও অপক্ষপাত আদর্শ তাঁদের জীবনকেও উজ্জীবিত করেছিল। কবি ফরিদুদ্দিন আত্তারের বহু কবিতার দ্বারা কবীর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কবীরের বিভিন্ন দোঁহাগুলি পাঠ করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি সুফী-সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবীর বিভিন্ন ছন্দে বহু দোঁহা রেখে গেছেন তিনি এইসব কবিতা বা দোঁহা মুখে মুখে রচনা করতেন—তিনি কালিকলম স্পর্শ করতেন না। তাঁর মুখে শুনে অনেকে তা মুখস্থ ক'রত। এইভাবে কবীরের বহু দোঁহা বা কবিতা সর্বত্র প্রচারিত হ'ত। তার ফলে আরও অনেকে কবীরের রচনা ব'লে নিজের রচিত কবিতাগুলিকে চালিয়ে দিত। এইসব কবিতা বা দোঁহার মধ্যে কতটা কবীরের আর কতটা অপরের তা নির্ণয় করা কঠিন হ'য়ে পড়েছে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যাকে বলে Systematic Philosophy বা রীতিমত দর্শন, কবীরের চিন্তা ও উপদেশাবলী সে ধরনের ছিল না। যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে, তখন তেমনি তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করেছেন। কবীর একদিকে কবি ও অন্যদিকে mystic বা মরমী সাধক। তাঁর ভাষা ও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট—সহজবোধ্য ছিল না। কোথাও কোথাও তাঁর চিন্তার বিশ্লেষণ করা কঠিন মনে হ'ত। তবুও তাঁর মূল বক্তব্যগুলি সুস্পষ্ট, সেখানে ভুল বুঝার স্থান ছিল না। তাঁর কেন্দ্রগত চিন্তা হচ্ছে ঈশ্বর—সেই ঈশ্বরকে তিনি নানাভাবে ও নানা নামে ব্যক্ত করেছেন।—রাম, হরি, গোবিন্দ, ব্রহ্ম, আল্লা, খালিক, খোদা ইত্যাদি। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর মতে ঈশ্বর Transcendent ও Immanent (জগতের অতীত ও জগতে অনুস্যূত) নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিক, অসীম ও সসীম, নির্গুণ ও গুণান্বিত, সত্তাহীন ও সত্তাযুক্ত, অচেতন ও সচেতন—তিনি প্রকাশ্য নন, আবার গুপ্তও নন। তিনি একও নন, আবার দুই বা বহু নন। তিনি অভ্যন্তরে আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তবুও তিনি পরস্পরবিরোধী সমস্ত ধারণার ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, তিনি সগুণ না নির্গুণ—এ-সব দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে কোন সুস্থির সিদ্ধান্তে কবীর উপনীত হ'তে পারেননি। তাই তিনি বলেছেন, "হায়, কেমন ক'রে সেই গুপ্ত কথাটি প্রকাশ ক'রব, হায়, কেমন ক'রে ব'লব, তিনি এটা নন, এবং তিনি ওর মতো। তিনি যে কি তা বলবার মতো ভাষা জানা নেই।" কবীর ভারতবাসীর দৃষ্টিকে এমন একটা ধর্মের দিকে নিবদ্ধ করতে বলেছেন,

যা সর্বজনীন পথ। তিনি এমন একটা পথ তুলে ধরলেন, যে পথে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় চলতে পারে। কোন হিন্দু অথবা কোন মুসলমান এই সর্বজনীন পথকে একেবারে বর্জন করতে পারে না। এটাই হ'ল কবীরের মৌল শিক্ষা। এই শিক্ষা হ'ল কবীরের গঠনমূলক প্রতিভার দিক। তিনি দেখলেন যে, আবহমান কাল থেকে ধর্মের নামে কতকগুলি প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান চলে আসছে। লোকে সেইসব আচারাদিকেই ধর্ম মনে করে। এবং তাই নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করে ও মারামারি করে

তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন, তিনি যে উদার ধর্মের কথা বলেছেন, তা ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন কাজ। প্রাচীন পথে আবহমান কাল ধরে ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যে-সব জঞ্জাল জমেছিল, তিনি সেগুলিকে দূর করতে বললেন। সেইজন্য তিনি নির্ভীকভাবে বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রাণহীন আচারকে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর মতে এই-সব বাহ্যিক দিকগুলি সত্যকে আবৃত ক'রে রেখেছিল। এই আচারসর্বস্ব ধর্ম ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পৃথক ক'রে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি হিন্দু-মুসলমান কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি—দেশ-প্রচলিত কোন ধর্মকে নিন্দা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি প্রত্যেককে বলতেন, নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে চলতে। তবে ধর্মের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল, তিনি সেইসব কুসংস্কারগুলির নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন —পরবর্তী যুগের তথাকথিত ধর্মসংস্কারকগণ যা প্রচার করেছেন, সে-সবের অনেক অংশকে ত্যাগ করা যেতে পারে। কারণ সে সব শিক্ষার অনেকগুলি এ-যুগে অপ্রয়োজনীয় ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। সে-সবের মধ্যে ধর্মের সার নেই, লোক-দেখানো চটকদার কতকগুলি অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নয়। অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস করা, তীর্থযাত্রা, ঈশ্বরের উপর ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতীত ভজনালয়ে পূজা, দান, জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাস, ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের একচেটিয়া অধিকার, অস্পৃশ্যতা—এইসব সংস্কারকে কবীর কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। ঠিক সেইরূপ ভাবে তিনি মুসলমানদের বহু সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাদের তীর্থযাত্রা, অপর ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাব, অপর সম্প্রদায় হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকার প্রবণতা, ভক্তিহীন অনুষ্ঠানাদিকেও সেইরূপ কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। আউলিয়া পূজা ও পীর পূজারও তিনি নিন্দা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছেন, সমস্ত জীবিত প্রাণীকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সর্বপ্রকার রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে হবে। উচ্চ বংশের ও সামাজিক মর্যাদার অহঙ্কার ত্যাগ করতে হবে। পার্থিব বস্তুর মোহে, বিলাস আড়ম্বর মাত্রাধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লালসাকেও তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের জীবন হবে উৎসর্গীকৃত জীবন এবং জীবের কল্যাণবোধ দ্বারা জীবনকে করতে হবে পবিত্র। কবীর বলেন, আমি আমার চোখ বন্ধ করি না, আমার কান বন্ধ করি না, আমার দেহকে পীড়ন করি না—আমি চোখ খুলে দেখি ও হাসি এবং এইভাবে আমি তাঁর সৌন্দর্য সর্বত্র দেখতে পাই। আমি যাই করি, তা-ই সেই লীলাময় ঈশ্বরের পূজা হ'য়ে পড়ে।

কবীর এই কথাটা পুনঃপুনঃ বলেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান একই। তারা একই ঈশ্বরের পূজা করে। তারা একই পিতার সন্তান। তারা একই রক্ত থেকে তৈরি হয়েছে। হে ঈশ্বর! সমস্ত নর-নারী যারা সৃষ্ট হয়েছে, তারা তোমারই হাতের তৈরি। কবীর আল্লাহ ও

রামের সন্তান। সেই আল্লাহ ও রাম তাঁর গুরু ও পীর। হিন্দু ও তুর্কীর একই পথ, যা সত্য ও খাঁটি—গুরু দেখিয়ে দিয়েছেন। হে সাধু সন্তগণ! শোন, আমার কথা শোন! রামই বলো আর খোদাই বলো, যারা বুঝে তাদের ধর্ম একই—তারা পণ্ডিত হোন অথবা শেখ হোন, তাতে কিছু যায় আসে না। তাই কবীরের এই দেখে ব্যথা লাগে যে, হিন্দুরা রামকে আর মুসলমানরা রহিমকে ডাকে অথচ উভয়ে পরস্পরে যুদ্ধ করে, মারামারি ক'রে, পরস্পরকে হত্যা করে—কেউই সত্য কি জিনিস জানে না। হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুভাবাপন্ন ক'রে তুলবার জন্য সক্রিয়ভাবে তিনি কাজ করেন। ধর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা যাতে পরস্পর বন্ধুভাবে থাকতে পারে, সেই বিষয়ে তাঁর চেষ্টা অবশেষে স্মরণীয়। তিনি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, "একটা কেন্দ্রগত মূল আদর্শ থাকা দরকার—তা হ'ল সকলকে একটা মধ্য-পন্থার ধর্ম অবলম্বন করতে হবে।" তাঁর এই আওয়াজে ভারতের নানাস্থানের মানুষ প্রচুর সাড়া দিল। বহুলোক সাগ্রহে তাঁর এই আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। আজ সারা ভারতে কবীরপন্থী লোকের সংখ্যা বহু। ইংরেজ আগমনের বহু পূর্বে কবীরের মতো মহান্ সাধকেরও উদ্ভব হয়েছিল ব'লে সে-যুগে সাম্প্রদায়িকতা প্রসার লাভ করেনি।

আজও বারাণসীতে কবীরপন্থী সাধকগণ প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হন এবং কবীরের স্তবস্তুতি করেন। কবীরের শিষ্যদের সংখ্যা কত, এটা প্রধান বিষয় নয়। তাঁর শিক্ষার প্রভাব পাঞ্জাব, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই যে একজন অর্ধশিক্ষিত মানুষ সর্বপ্রকার ভেদ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐক্য ভ্রাতৃত্ব ও সর্বধর্মের প্রতি সমদর্শী মনোভাব সাফল্যের সঙ্গে প্রচার করেছেন—সেটাই কবীরের জীবনের মূলকথা। সেটাই তাঁকে অমর ক'রে রাখবে।

পরে সম্রাট্ আকবর তাঁর 'দীন-ই-ইলাহী'র আদর্শের দ্বারা হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করতে চেয়েছিলেন। আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী'র উপর কবীরেরও প্রভাব কিছু যে ছিল, তা অনুমান করা চলে। তার পেছনে ছিল আরও বহু সাধকের সাধনার ফল। ভারতের বুকে নানাপ্রকার সমন্বয়ের নানাপ্রকার ভাবধারা প্রচারিত হয়েছিল। সেগুলি ভারতের প্রাণের ভিতর একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। আকবরের প্রচেষ্টা তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং পরবর্তী যুগের নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে যা প্রভাবিত করেছে। আজ কবীর প্রমুখ মহাজনদের আদর্শকে ও শিক্ষাকে লোকসমাজে নূতন উদ্যমে প্রচার করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সেইজন্য বলি যে, কবীরের জীবনদর্শন সকলের জানা উচিত।

রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে সকলে একমত ছিলেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

যুবকদের প্রতি*

শ্রীজৈল সিং

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনের উদ্বোধনী সভায় আজ আপনাদের সকলের সঙ্গে এখানে মিলিত হ'তে পেরে আমি আনন্দিত। এই সম্মেলনের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, যেহেতু এতে সূচিত হচ্ছে—মিশনের ত্যাগ ও সেবা এই যুগ্ম আদর্শের প্রতি যুবসম্প্রদায়ের আত্মনিবেদন।

যুগে যুগে মহান্ সাধু-সন্তদের আশীর্বাদে ধন্য এই ভারতবর্ষ। রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় পুনরুত্থানের বীজ বপন করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি সংস্কৃতির মধ্যে এক মহান্ সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ-চালিত নিঃস্বার্থ ত্যাগী শিষ্যদের দ্বারা সুসংগঠিত এই সংঘের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী-প্রচার ভারতবর্ষের মৌলিক ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়িত হ'তে প্রভূত সাহায্য ক'রে আসছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বাণীকে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম-প্রচারে ঐকান্তিকতা, তাঁর গভীর দেশপ্রেম এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনার ফলশ্রুতি রূপে স্থাপিত এই রামকৃষ্ণ মিশন, যা দেশের অগণিত তরুণকে ধর্ম-প্রচার এবং আর্ত জনগণের সেবাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিল। স্বামীজীর যে-বাণী এখানে বিশেষ-ভাবে স্মরণীয় তা হচ্ছে: "সবার জন্য জ্ঞানের দ্বার খুলে দাও এবং নিপীড়িত জনগণকে পুনরায় তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দাও।" স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যকে দৃঢ় ক'রে তুলতে আধ্যাত্মিক ভাবসমূহকে জনপ্রিয় ক'রে তোলা বিশেষ দরকার।

গত শতাব্দীর মহান্ জাতীয় পুনরভ্যুত্থানের প্রারম্ভে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতি-গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের সর্ব প্রদেশের বহু উৎসর্গীকৃত যুবককে অনুপ্রাণিত করেছিল। সংগঠিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর কর্মসূচির সম্মুখে যে সমাজসেবার আদর্শকে স্থাপন করেছেন, তা কেবল নিছক পরোপকার কার্য নয়, পরন্তু মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেরই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্দেশ্যে একটি অত্যাবশ্যক শিক্ষাপ্রণালী। মিশনের সমাজসেবাকার্য বহুবিধ—যেমন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় পরিচালনা প্রভৃতি এবং এইরকম আরও বহু কার্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিপন্ন মানুষের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন যে অদ্ভুত সেবাকার্য ক'রে থাকেন, তা আমাদের সকলের গর্বের সঙ্গে স্মরণীয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে যুবসম্মেলন-সংগঠন অতিশয় প্রাসঙ্গিক হয়েছে। যুবসম্প্রদায়কে পথ দেখাতে হবে। যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সমগ্র জাতিকে ধরে রেখেছে, জাতি ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব হিসাবেই তাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত যুবকদের দিকে। যুবকদের প্রতি কর্তব্য-সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মিশন সচেতন রয়েছেন এবং তাঁরা যুবকদের গঠনমূলক কাজে সংগঠিত করতে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, দেখে আমি আনন্দবোধ করছি। স্বাধীনতার

* ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২, নিউদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনের উদ্বোধনী সভায় ভারতের রাষ্ট্রপতির ভাষণ। বঙ্গানুবাদ: ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য।—সঃ

পর থেকে ভারতবর্ষের লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। আজ ভারতবর্ষ জাতিসংঘের এক বিশিষ্ট সদস্য, কিন্তু এখনো তার অনেক সমস্যা আছে সমাধান করার। ভারত-সরকার অনেক রকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির জন্য। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংঘকে, বিশেষ ক'রে তাঁদের যুব বিভাগগুলিকে সরকারের এই প্রচেষ্টার পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর দ্বারা দেশের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি অনুপ্রেরণা পাবে।

দেশের যুবকদের কাছে আমার আবেদন, তারা যেন দলে দলে সমাজসেবা-ব্রত গ্রহণ করে এবং দেশের যুবকদের লক্ষ্য ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ যা উপদেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে যেন অনুপ্রেরণা লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের বাণী দেওয়ার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। আমরা আজ বিদেশী শাসন হ'তে মুক্ত হয়েছি। যাই হোক, এখনো আমাদের দেশে জাতিভেদ-প্রথা ও পণ-প্রথার মতো অনেক সামাজিক ব্যাধি আছে, যা আমাদের সমাজকে দুর্বল করছে। এখানে কাজ করার বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে—দেশের যুবকদের কাছে এটা একটা চ্যালেন্‌জ্‌। যুবকদের কাছে আমার আবেদন, তারা যেন স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয় :

"আমরা চাই এমন কিছু যুবক, যারা দেশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করবে এবং জীবন উৎসর্গ করবে।"

যুবসম্মেলন উদ্বোধন করতে আমাকে আহ্বান করার জন্য আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, এই সম্মেলন ফলপ্রসূ হবে এবং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে চিহ্নিত করবে। জয় হিন্দ্‌!

ভারতে শক্তি-উপাসনার ধারা এবং তাৎপর্য

স্বামী কেদারানন্দ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে শক্তিপূজা বিশেষতঃ মাতৃভাবে শক্তিপূজা প্রচলিত। সনাতনী পরমশক্তিরূপী জগৎ-কারণকে 'মা' বা জগদম্বা বা দেবী ব'লে ডাকার মধ্যে এবং সেইভাবে পূজা করার মধ্যে ভারতের নিজস্ব অবদান রয়েছে। যদিও এই মাতৃভাব ভিন্ন অন্য ভাবের শক্তিপূজা অন্যান্য দেশে কিছু কিছু দেখা যায়। সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই শক্তি-উপাসনার ধারাটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে। এই ধারার উৎস এবং ক্রমবিকাশ, বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সিন্ধুসভ্যতার যুগে শক্তি-উপাসনা

পাঁচ হাজার বছরের পূর্বে সিন্ধু নদের তীরে পাঞ্জাবের (বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত) হরপ্পা এবং সিন্ধু দেশের মহেঞ্জোদারো শহরে যে দেবীপূজার প্রচলন ছিল, তার নিদর্শন ঐ শহর দুইটির ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়া মাটির মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি থেকে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, সিন্ধু-সভ্যতার সমকালীন দক্ষিণ-ভারতেও ঐ ধরনের দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। ঐ মূর্তিগুলি প্রকৃতি-দেবী বা মাতৃদেবী বলেই পরিচিত ছিল ব'লে মনে হয়। কারণ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাব এবং স্বর্গীয় প্রকৃতির ধারণা বদ্ধমূল ছিল। সেজন্য দেখা যায় সিন্ধুসভ্যতার যুগে অধিবাসীদের মধ্যে মাতৃদেবী বা প্রকৃতিদেবীর উপাসনার প্রচলন। এই মাতৃদেবী বা প্রকৃতিদেবীই ছিলেন সিন্ধুনদের তীরবর্তী মানুষের প্রধান উপাস্য দেবতা। তবে এই দেবী কুমারী না কোন পুরুষদেবতার শক্তি-রূপে গণ্য হতেন, তার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা হোক, এ থেকে আমরা সিন্ধু-সভ্যতার যুগের শক্তি-উপাসনার একটা আভাস পেতে পারি।

বৈদিকযুগে শক্তিবাদ

সিন্ধুসভ্যতার যুগে যে মাতৃদেবী বা প্রকৃতি-দেবীর উপাসনার অস্পষ্ট ছবি আমরা দেখি, তারই ব্যাপক এবং শক্তিশালী রূপটি বৈদিক যুগে স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে, সামবেদীয় রাত্রিসূক্তে এবং কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদ্ অন্তর্গত দুর্গাসূক্তে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।

দেবীসূক্তে রয়েছে মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা বাক্-এর কথা, যিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদুষী। জগৎ-কারণ ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মশক্তিকে বাক্ স্বীয় আত্মরূপে উপলব্ধি ক'রে ঘোষণা করেন, "আমি রুদ্রগণরূপে ও বসুগণরূপে বিচরণ করি, আমি আদিত্যসমূহরূপে এবং সকল দেবরূপে বিচরণ করি ;···আমি ঈশ্বরী, ধন-ধান্য প্রদাত্রী, পরব্রহ্ম-জ্ঞানবতী ও যজ্ঞার্হগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ; ঈদৃশগুণ-বিশিষ্টা, প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা এবং বহু-ভূতমধ্যে প্রবিষ্টা আমাকেই দেবতারা বহুদেশে (কর্মরূপে সম্পাদন) করিয়া থাকেন।···ঈদৃশ স্বরূপা আমি যাহাকে যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, সেই সেই পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি ;·· অসুরকে নাশ করিবার জন্য আমি রুদ্রের (মহাদেবের) ধনুতে জ্যা সংযুক্ত করি, আমি সজ্জনের রক্ষার জন্য সংগ্রাম করি এবং আমিই স্বর্গ ও মর্ত্যে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছি। যে অন্ন ভক্ষণ করে সে আমার দ্বারাই করে ; যে দর্শন করে, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি করে, কথিত বিষয় শ্রবণ করে, সেও আমার দ্বারাই করে ; যাহারা ঈদৃশী আমার বিষয়ে জ্ঞানহীন, তাহারা সংসারে হীন হইয়া থাকে।···বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্যই আমার কারণ, সুতরাং সমস্ত প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া আমিই, বিবিধরূপে বর্তমান আছি ; অধিকন্তু ঐ স্বর্গাদিগকেও আমি নিজ মায়াত্মক দেহের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়াছি।"[১]

ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি যে অভেদ—এই তন্ত্র বা শাক্ত সিদ্ধান্তটির নির্দেশ আমরা পাই সামবেদীয় কেনোপনিষদের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা থেকে :

দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই জয়লাভ ক'রে ইন্দ্রাদি দেবতারা মিথ্যা আত্মাভিমান করেন যে, তাঁরা নিজশক্তি দ্বারাই জয়ী। দেবতাদের এই অভিমান দূর করবার জন্য ব্রহ্ম বিস্ময়কর 'যক্ষ' মূর্তিতে দেবগণের সামনে আবির্ভূত হলেন। সেই 'যক্ষ'-কে জানবার জন্য দেবগণ প্রথমে অগ্নিকে প্রেরণ করলে পর যক্ষরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে তার পরিচয় ও শক্তি জানাতে বললেন। নিজের এই পরিচয় দিলেন যে, তিনি পৃথিবীর সকল জিনিসকে দগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখেন। ব্রহ্ম তাঁকে একটি তৃণ দগ্ধ করতে দিলে অগ্নি সর্বশক্তি দিয়েও সেই তৃণটি দগ্ধ করতে না পেরে অবনত-মস্তকে ফিরে গেলেন। এরপর দেবগণ কর্তৃক

১. দেবীসূক্তোক্ত কয়েকটি মন্ত্রের অনুবাদ উদ্ধৃতি। স্তবকুসুমাঞ্জলি, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। পৃঃ ৩৪-৩৫

আদিষ্ট হ'য়ে বায়ু 'যক্ষ'রূপী ব্রহ্মের কাছে গিয়ে নিজেদের শক্তি ও পরিচয় দিলে, ব্রহ্ম তাকে সেই তৃণটি উড়াতে বললে, বায়ু তার সর্বশক্তি প্রয়োগের পরও অসমর্থ হলেন এবং লজ্জিত মুখে ফিরে এলেন। অনন্তর ইন্দ্র স্বয়ং ছদ্মবেশী ব্রহ্মের নিকট গেলে ব্রহ্ম আকাশে মিলিয়ে গেলেন এবং তার পরিবর্তে সেইস্থানে সুশোভনা উমা বা হৈমবতী দেবীকে ইন্দ্র দর্শন করলেন। তখন সেই দেবী ইন্দ্রকে জানালেন যে, ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই দেবতাগণ শক্তিশালী হ'য়ে অসুরগণের সহিত সংগ্রামে বিজয়ী। সুতরাং দেবতাদের অভিমান করবার মতো স্বশক্তি কিছু নেই। 'যক্ষ'রূপী ব্রহ্ম এবং উমা বা হৈমবতী যে একই তত্ত্ব, তা এই কেনোপনিষদ্ প্রতিপাদ্য এই আখ্যায়িকা থেকে জানা যায়। কারণ এই অংশের শাঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে, "হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্তত" অর্থাৎ সেই হৈমবতী বা উমা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্তা যিনি উমারূপ তত্ত্ববিদ্যা দেবীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে দেবী অম্বিকা রুদ্রের (শিবের অপর নাম) স্ত্রী অর্থাৎ শক্তি। এই আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদ্ সেই অম্বিকা বা দুর্গাকে বলছেন—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং
কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি
তরসে নমঃ॥[২]

—আমি সেই অগ্নিবর্ণা বা জ্যোতীরূপা দুর্গাদেবীর শরণাগত হই, যিনি উদ্দীপনা শক্তিদ্বারা আনন্দোজ্জ্বল, যিনি চরাচর বিশ্বরূপে স্পষ্ট পরমাত্মার শক্তি এবং যিনি জীবের কর্মফলদাত্রী। হে সুতারিণি, হে সংসারত্রাণকুশলে, তুমি আমাদের ঘোর সংসারসাগর থেকে উদ্ধার কর, তোমাকে প্রণাম করি।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখি বৈদিক যুগে দেবী দুর্গা বা উমা ব্রহ্মশক্তি বা আদ্যাশক্তিরূপে পরিগণিত, যিনি শরণাগত ভক্তকে সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত ক'রে তাকে চরম ও পরম তত্ত্বের অধিকারী করেছেন। বৈদিক যুগের এই দেবীশক্তির ভুক্তিমুক্তিদায়িনী বিশ্বজনীন ভাবটির পূর্ণপ্রকাশ আমরা পরবর্তীকালে পৌরাণিক যুগে আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে দেখি। এমনকি পৌরাণিক যুগের আগে মহাভারতেও দেবীস্তুতি বা উপাসনার কথা আছে। কৃত্তিবাসকৃত বাংলা রামায়ণেও দেবী-উপাসনার কথা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও শক্তিবাদ এবং তার উপাসনা প্রাধান্যলাভ করে।

তন্ত্রশাস্ত্র এবং শক্তিবাদ

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূক ভট্ট প্রভৃতির মতানুসারে শ্রুতি দু-প্রকার—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। বৈদিকযুগের শক্তিবাদ আলোচনার পর তাই স্বাভাবিকভাবেই তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিবাদ আলোচনা এসে পড়ে; তাছাড়া শাক্তদর্শন এবং সিদ্ধান্ত ও সাধনাই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিবাদ আলোচনার আগে জানা প্রয়োজন তন্ত্রশাস্ত্র বলতে কি বুঝায়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—বেদান্ত ও যোগের সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সমন্বয় ক'রে যে গ্রন্থগুলি রচিত, সেগুলিই তন্ত্রশাস্ত্র।

প্রাচীন ভারত বিন্ধ্যাচল থেকে চট্টলভূমি, বিন্ধ্যাচল থেকে কন্যাকুমারিকা এবং বিন্ধ্যাচল থেকে নেপাল ও মহাচীন পর্যন্ত প্রদেশ যথাক্রমে বিষ্ণুক্রান্তা, অশ্বক্রান্তা এবং রথক্রান্তা ব'লে পরিচিত ছিল। প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ খানি ক'রে মোট ১৯২ খানি তন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে হিন্দুধর্মের শক্তিবাদ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা

২. দুর্গাসূক্ত, শ্লোক ২, মহানারায়ণোপনিষদ্, দ্বিতীয় অনুবাদ।

করা হয়েছে। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সার এবং পূর্ণ পরিণতি আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যে দেখি, যার বিস্তারিত আলোচনা পুরাণে শক্তিবাদ আলোচনা কালে করা হবে।

সংক্ষেপে তন্ত্র বা শাক্ত সিদ্ধান্তটি এই—এক অদ্বিতীয় নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদি সিদ্ধ মায়া আবরণ দ্বারা ধর্ম এবং ধর্মিরূপে প্রতিভাত হন। অদ্বৈতাবস্থায় (দ্বিতীয়বিহীন অবস্থা) পরম ব্রহ্ম বা তন্ত্রের ভাষায় পরম শিব একা, তিনি ইচ্ছা করলেন, 'একোঽহং বহুস্যাম্' (আমি একা—বহু হবো)। তাঁর এই ইচ্ছা বা স্পন্দন নিত্য-জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াযুক্ত—ইহা তাঁর ব্রহ্মধর্ম এই ব্রহ্মধর্মের অপর নাম 'শক্তি' যা ধর্মী বা ব্রহ্ম থেকে অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির ন্যায় অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায়, "যেমন জল ও তাহার তরলতা, দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব, মণি ও তাহার জ্যোতি, সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তি তেমনি অভেদ। যিনি কালী, তিনিই ব্রহ্ম।" গতিহীন এবং গতিশীল সাপ যেমন একই, নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় ব্রহ্মও তেমনই এক। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে এই ব্রহ্মরূপ ধর্মীর ধর্ম বা শক্তি যাকে আমরা আদ্যাশক্তি কালী বা দুর্গা বলি—জড় নয়, জীবও নয়। পরন্তু তা চিৎশক্তিসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্ররূপে জগৎসৃষ্টির কারণ। এইপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, বেদান্তের মায়া ও তন্ত্রের মহামায়া এক তত্ত্ব নয়। বেদান্তের মায়ার পারমার্থিক সত্তা নেই, কিন্তু ব্যাবহারিক সত্তা আছে। বেদান্ত মতে মায়াশক্তি অবলম্বনে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তন্ত্রের মহামায়া ত্রিকালাবাধিত চিৎশক্তিরূপিণী ব্রহ্মময়ী। শাক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ধর্মী ও ধর্ম, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন ও এক; ধর্ম চিদ্রূপা এবং পারমার্থিক—বেদান্তের ন্যায় ব্যাবহারিক বা মায়িক নয়। এই মহাশক্তি ব্রহ্মধর্মরূপা এবং ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন বলে চিদ্রূপিণী, সদ্রূপিণী এবং আনন্দরূপিণী অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দময়ী'। এই জগৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণাম। যাঁকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম ব'লে বোধে বোধ করেন, তান্ত্রিকগণ তাঁকেই চৈতন্যরূপিণী জগজ্জননী মহামায়ারূপে পূজা করেন। অবশ্য বেদান্ত ও তন্ত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ বেদান্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্র এবং তন্ত্র সাধনশাস্ত্র ব'লে পরিচিত।

পুরাণে শক্তিবাদ

বৈদিক যুগে উপনিষদ্, সূক্তাদি প্রভৃতিতে যে শক্তিবাদ সীমিতভাবে উল্লিখিত হয়, তারই ব্যাপক ও বিরাট নিজস্ব রূপটি বিভিন্ন পুরাণের মাধ্যমে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এই সমস্ত পুরাণে সেই শক্তিতত্ত্ব পরাশক্তি, আদ্যাশক্তি, মহামায়া বা দেবী ব'লে পরিচিত। দেবী ভাগবত সেই শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলছেন—

সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥

—সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া আদ্যাশক্তি অরূপা হয়েও করুণাবশতঃ শরণাগত ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য রূপ ধারণ করেন।

বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুরাণসমূহে শক্তিতত্ত্ব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং আদ্যাশক্তি মহামায়ার লীলা এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সর্বশক্তিরূপিণী চৈতন্যময়ী বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরাসত্তা মূলা প্রকৃতি দেবীকে বৃহন্নারদীয়পুরাণে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে; যেমন উমা, লক্ষ্মী, ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী প্রভৃতি। কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণে দুর্গাপূজার বিস্তৃত ক্রম,

পদ্ধতি ও ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত আছে। বিশেষ ক'রে শেষের পুরাণটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হলেও এই পুরাণের পূজাপদ্ধতিই বর্তমানে বহুলাংশে প্রচলিত। উপরের পুরাণসমূহ ছাড়াও অন্যান্য মহাপুরাণ এবং উপপুরাণে দেবী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীঃ আদ্যাশক্তি মাহামায়ার প্রসঙ্গে চরম ও পরম তত্ত্বটি আমরা পাই মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত "শ্রীশ্রীচণ্ডী" অংশে। শাক্তগ্রন্থসমূহের মধ্যে দেবীমাহাত্ম্যরূপ এই চণ্ডী শক্তিসাধকদের কাছে খুবই সমাদৃত। গীতার ন্যায় এই গ্রন্থও হিন্দুদের নিত্য পাঠ্য এবং দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত এই ১৩টি অধ্যায় 'চণ্ডী' ব'লে খ্যাত। চণ্ডীতে মোট ৫৭৮ শ্লোক আছে; এই গ্রন্থ আবার ৭০০ মন্ত্রে বিভক্ত যা দুর্গার হোমে আহুতি প্রদানে নিয়োজিত হ'য়ে থাকে। সে কারণে চণ্ডীর অপর নাম 'সপ্তশতী'। চণ্ডীর রচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চণ্ডীর উৎপত্তি নর্মদা বা উজ্জয়িনীতে। কিন্তু অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত যে, বাংলাদেশেই চণ্ডীর উৎপত্তি স্থান। কারণ কেরলীয়, কাশ্মীরী প্রভৃতি থেকে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় তন্ত্র-সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুতরাং চণ্ডীগ্রন্থ পুরাণের অন্তর্গত হলেও তন্ত্রশাস্ত্রের সারতত্ত্ব এর মধ্যে রয়েছে ব'লে এর উদ্ভব বঙ্গদেশ—এরূপ নির্ণয় করা ভুল হবে না। তাছাড়া তন্ত্রে আছে—'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা' অর্থাৎ তন্ত্রবিদ্যার উদ্ভব এবং প্রচার গৌড় বা বঙ্গদেশ থেকেই। তন্ত্র এবং চণ্ডী পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে ব'লে চণ্ডীর উদ্ভব এই বঙ্গদেশেই মনে হয়

গীতার মতো চণ্ডীরও প্রায় ত্রিশটি টীকা রয়েছে এবং এগুলির মধ্যে শৈবনীলকণ্ঠ, ভাস্কর রায় মখী প্রভৃতি টীকাকারগণের চণ্ডীব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শক্তিবাদ আলোচনায় শৈবনীলকণ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত দেন। তাঁর মতে আদ্যাশক্তি দেবী ব্রহ্মস্বরূপ এবং সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তের তাৎপর্যভূমি। সেই দেবী ব্রহ্মবিদ্যা-ধিষ্ঠাত্রী, জীবভাব নাশই ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য। মানুষের অন্তর্নিহিত পশুভাবকে দেবীর চরণে বলি প্রদান ক'রে দিব্যভাব স্থাপনই শক্তি-সাধনার চরম উদ্দেশ্য ও পরিণতি।

চণ্ডী প্রথম চরিত্র (১ম অধ্যায়), মধ্যম চরিত্র (২য় হইতে ৪র্থ অধ্যায়) এবং উত্তর চরিত্র (৫ম হইতে ১৩শ অধ্যায়)—এই তিন চরিত্রে বিভক্ত এবং তিন চরিত্রে যথাক্রমে ঋগ্বেদরূপা মহাকালী, যজুর্বেদরূপা মহালক্ষ্মী ও সামবেদরূপা মহাসরস্বতীতত্ত্ব আলোচিত।

চণ্ডীতে কথিত আছে যে, পুরাকালে সমগ্র পৃথিবীপতি রাজা সুরথ যবনকর্তৃক পরাজিত ও স্বীয় রাজ্যের অমাত্যগণ দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই অরণ্যে মেধা-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেই সময় সমাধি নামে এক বৈশ্য তাঁর অসাধু স্ত্রী-পুত্রগণ দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে সেখানে উপস্থিত হন। রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েও তাদের প্রতি মমতা বশতঃ দুঃখিত ছিলেন। (রাজ্য, সম্পদ ও আত্মীয়-পরিজন দ্বারা পরিত্যক্ত) তাদের প্রতি কেন এই মমতা, তা জানবার জন্য তাঁরা মেধা-মুনির নিকট গিয়ে প্রশ্ন করলে মুনি বললেন, সংসারের স্থিতিকারণের জন্য দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকী ও অবিবেকী জীবগণের চিত্তসমূহকে বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহরূপগর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে নিক্ষেপ করেন। তখন রাজা সুরথ মেধা-মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'সেই মহামায়া কে?

তাঁর উৎপত্তি ও কার্য কি?' উত্তরে মেধা-মুনি বললেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রুয়তাং মম॥

(চণ্ডী ১।৬৪-৬৫)

—অর্থাৎ সেই মহামায়া নিত্যা (জন্মমৃত্যু-রহিতা) আবার এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মূর্তি (জগদাশ্রয়ভূতা শক্তি)। তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্যা হলেও তাঁর বহুপ্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন। অতঃপর মেধা-মুনি রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধিকে মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যদের দেবী মহামায়া বিভিন্ন রূপ ধারণ ক'রে কিভাবে বধ করেন তার বর্ণনা করলেন। চণ্ডীতে আছে দেবী ভগবতী স্বীয় কপাল থেকে আবির্ভূতা শক্তি দ্বারা অসুর শুম্ভের প্রধান সেনাপতিদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ ক'রে 'চণ্ডী' বা চামুণ্ডা নামে পরিচিত হন।

এই দেবী মহামায়া অসুরদের দমন ক'রে দেবতা ও মানুষকে পুরাকালে রক্ষা ও পালন করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাসও দিয়েছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

(চণ্ডী ১১।৫৪-৫৫)

—অর্থাৎ এইপ্রকারে যখনই দানবকুলের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি আবির্ভূতা হ'য়ে দেবশত্রু অসুরগণকে বিনাশ ক'রব। বস্তুতঃ বহির্জগতের এই দেবাসুরের সংগ্রাম আমাদের অন্তর্জগতেরই সংগ্রাম, যেখানে দেবতারূপী সুবৃত্তির সঙ্গে অসুররূপী কুবৃত্তির অবিরাম সংগ্রাম চলছে। মানুষ যদি কাম, ক্রোধ, লোভ আদি কুবৃত্তিগুলিকে দমন ক'রে শম, দমাদি সুবৃত্তি সহায়ে পরাশক্তি স্বরূপিণী, জ্ঞান-ভক্তিপ্রদায়িনী আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরণাপন্ন হয়, তাহলে দেবীর কৃপায় সে দেবত্বের পরে সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মত্বেরও অধিকারী হয়। চণ্ডী বলছেন—

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥

(চণ্ডী, ১।৫৬-৫৭)

—অর্থাৎ সেই মহামায়া এই সব চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং তিনি প্রসন্ন হলেই তাঁর শরণাগত মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর দেন। কারণ তিনি সংসারমুক্তির হেতুভূতা পরমা মোক্ষসাধিকা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসারবন্ধনের কারণ-স্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সকলেরই ঈশ্বরী বা নিয়ন্ত্রী। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই পরমাশক্তিরূপা জননী ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই—অন্তরে বাইরে জীব-জগতে একমাত্র তিনিই ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজিতা। তিনি বিরাজিতা তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও বীর্য (শক্তি) নিয়ে এবং তাঁর অপরিসীম জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াশক্তি নিয়ে —এই মহাতত্ত্বটিই চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

[ক্রমশঃ]

রামকৃষ্ণ মিশন

আবেদন

উড়িষ্যায় সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়, খরা ও বন্যার প্রকোপে উপদ্রুত জনগণের মর্মান্তিক দুর্দশা অবর্ণনীয়। সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি অবিলম্বে পাঠানো প্রয়োজন। তাই রামকৃষ্ণ মিশন কটক ও পুরী জেলান্তর্গত যথাক্রমে বাঁকী ও কাকটপুর অঞ্চলে দুর্গতদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি, বাসনপত্র, দেশলাই প্রভৃতি এবং বস্ত্রাদি বিতরণের কার্য শুরু করিয়াছে। হাজার হাজার নরনারী ও শিশু ঐ সাহায্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। এই অত্যাবশ্যক ত্রাণকার্য প্রসারিত করার জন্য 'রামকৃষ্ণ মিশন' এই নামে, বেলুড় মঠ, হাওড়া ঠিকানায় একাউণ্ট পেয়ী চেক, ব্যাংক ড্রাফট বা মানি অর্ডারযোগে অনুদান পাঠাইয়া বাধিত করুন।

স্বামী বন্দনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
বেলুড় মঠ, হাওড়া

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

(তৃতীয় বার্ষিক—১৯৮২)

বিগত দু-বছরের মতো এবারও প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য-সম্মেলন তিনদিন (৯ই, ১০ই ও ১১ই এপ্রিল) ধরে হ'ল। গত ৯ই এপ্রিল ১৯৮২, শুক্রবার সকাল ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির নীচে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। অন্যান্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী, বক্তা-আলোচক ও শ্রোতৃমণ্ডলীতে হলঘর পরিপূর্ণ।

'পূর্বগগনভাগে দীপ্ত হইল সুপ্রভাত তরুণারুণরাগে' উদ্বোধন সঙ্গীতটি পরিবেশ করেন ডঃ তপনকান্তি ঘোষ। স্বাগত ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দজী স্বামী গহনানন্দজীকে উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন। ভাষণে স্বামী গহনানন্দজী বলেন: অবতারপুরুষরা যখন যুগ প্রয়োজনে আসেন, তখন সবদিক থেকে একটা জাগরণের লক্ষণ দেখা যায়—কি ধর্ম, কি শিল্পকলা সব দিকে। তাই অবতারপুরুষদের জীবন ও বাণী নিয়ে বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারেও এই জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে—তাঁকে ঘিরে সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আজ বর্তমান যুগে হালকা সাহিত্যের পরিবর্তে সৎ সাহিত্য প্রচারের দরকার। কারণ, উচ্চ আদর্শ অবলম্বনে সৎ সাহিত্যই পারে সমাজকে ধরে রাখতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও জীবন নিয়ে যে-সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সেই সাহিত্য ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক, প্রত্যেকের জীবনে নব ভাব, নব উন্মাদনা জাগিয়ে তুলুক—এই প্রার্থনা ক'রে আজকের এই সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রারম্ভিক ভাষণে এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের লোক-শিক্ষার ভাষার ওপর গুরুত্ব দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম যুগের পর বিবেকানন্দের সাহিত্য বিরাট পদক্ষেপের সূচনা করেছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে, বিবেকানন্দের সাহিত্যধারা বর্তমান সাহিত্যিকেরা মেনে চললে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হ'ত। ডঃ সেনের বক্তৃতার পর বিশিষ্ট গায়ক শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষের 'আনন্দঘন শ্যাম, লহ ভক্তের কোটি প্রণাম' ও আরও একটি সঙ্গীতের পর উদ্বোধনী সভার সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম অধিবেশন ঐ দিন সকাল ১০টায়। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত' উদাহরণ-সহযোগে আলোচনা করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। তাঁকে সহযোগিতা করেন 'ছন্দম্-গোষ্ঠী'। তিনি আলোচনা শুরু করার প্রারম্ভে বলেন: সমাজের সকল অনুষ্ঠানে আমরা সঙ্গীতের অনুশীলন করি। সঙ্গীতের লক্ষ্য ও আদর্শ অক্ষুন্ন থাকে, যদি সঙ্গীত মানুষের জীবনে আনে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রেরণা এবং সমস্যাময় জীবনে আনে শাশ্বত শান্তি, সান্ত্বনা ও আনন্দময় অনুভূতি।

সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও রাজা রাম-কৃষ্ণের মতো সঙ্গীতকে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করলেন তাঁর জীবনের সকল অবস্থায় এবং অধ্যাত্মসাধনায়

অপার্থিব রস-ভাব-সঞ্চারের সহায়ক রূপে। স্বামী বিবেকানন্দ এই ধারারই আর এক মহৎ শিল্পী—যিনি স্বয়ং সঙ্গীতরচয়িতা এবং সুরকারও বটে। উদাহরণ হিসাবে বিবেকানন্দ-রচিত ধ্রুপদ গান-গুলির মধ্যে 'এক, রূপ-অরূপ নাম-বরণ অতীত আগামী-কাল-হীন' ও আরও অনেকগুলি সঙ্গীত তিনি ছন্দম-গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গেয়ে শেষ করেন।

প্রথম অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম' প্রবন্ধটি পাঠ করেন শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত। তিনি তাঁর তথ্যপূর্ণ ভাষণে বলেন, শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাস-জীবনে না গিয়ে আদর্শ গৃহীর জীবনযাপন করেন। যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে নিত্যানন্দ অবধূত লোকশিক্ষার জন্য গৃহী হয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, শ্রীম 'কথামৃত' লেখার শক্তি পেয়েছিলেন স্বয়ং জগন্মাতার কাছ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জন্য মায়ের কাছে শক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। তাই এই গ্রন্থের শক্তি প্রভূত—তাই সকলের কাছে গ্রন্থটি এত আদরণীয়। শ্রীসেনগুপ্তের ভাষণের উপর আলোচনা করেন ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী, ডঃ তারকনাথ ঘোষ, শ্রীতাপস ভট্টাচার্য ও শ্রীবিপ্রদাস ভট্টাচার্য।

দ্বিপ্রহরের বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় বিকাল ৩টায় এই অধিবেশনের মূল প্রবন্ধ-পাঠক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম'। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতিসহ তিনি বলেন: হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্তদৃষ্টির ফলে হিন্দুসমাজের যে সকল কুপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মের সেই বিকৃতি-সাধনের উপর তিনি কঠোর আঘাত হেনেছিলেন। তা হিন্দুধর্মকে মলিনতার ধূম্রজাল থেকে মুক্ত হ'তে বিশেষ সহায়তা দান করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুধর্ম হৃত মর্যাদা ফিরে পেয়েছে ও নববলে বলীয়ান্ হ'য়ে পরম গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে নিঃসংশয় ও অবিচলিত পদক্ষেপে যাত্রা শুরু করেছে। এই পঠিত প্রবন্ধটির উপর ভিত্তি ক'রে আলোচনা করেন ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিপদ আচার্য।

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভা'। ডঃ ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কাব্যসাহিত্যের সামগ্রিক সমীক্ষাপ্রসঙ্গে তাঁর কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের প্রধান কয়েকটি দিক রূপায়িত করেন। ব্রহ্মোপলব্ধি, কালীচেতনা, ব্যক্তিগত জীবনদর্শন, শান্তরস ও বীররসের সমন্বয়, দুঃখ-দৈন্য-মৃত্যুর অভিঘাতে জীবনসত্যের মহত্তর উপলব্ধিতে স্বামীজীর ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতার স্বল্প রচনা সুসমৃদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণময় স্বামীজীর জীবন-চেতনার বিশেষ প্রকাশও তাঁর কবিতায় বিশেষ সম্পদ। ঋষি, কবি এবং মন্ত্রদ্রষ্টা বিবেকানন্দ সীমিত রচনার মাধ্যমেই কবিতার জগতে বিশেষ আসনের অধিকারী। এই প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুধাংশু মণ্ডল ও অধ্যাপক পার্বতী চক্রবর্তী। সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দজীর ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের দুটি অধিবেশনের সমাপ্তি হয় সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে।

শনিবার ১০ই এপ্রিল, বিকাল ৩টায় তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। শ্রীসুপ্রকাশ সাহার 'জয়রামবাটীতে কে আসিল' সঙ্গীতটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা। এই অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপিকা চামেলী বসু। তিনি 'শ্রীশ্রীমা : গুরুভাব' প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে বলতে চান



রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন (১৯৮২)
উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন স্বামী গহনানন্দজী



প্রারম্ভিক ভাষণ দিচ্ছেন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন



সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন স্বামী নিরাময়ানন্দজী



সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সমবেত বক্তা, আলোচক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকে পূর্ণতা দান ক'রে ধর্ম ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সূচনা করলেন শ্রীশ্রীমা। কারণ, ঠাকুরের ভাবপ্রকাশ করতেই শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব ও গুরুভাবের প্রকাশ। ঠাকুর যেখানে ভাবের উৎস, মা সেখানে ভাবের ধারা। আসলে মা দীর্ঘকাল ঠাকুরের সাহচর্যে থেকে শ্রীঠাকুরের দিব্যভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাকে সংসার-জীবন, ভজন-পূজন ইত্যাদিও শিখিয়েছিলেন। মায়ের গুরুভাবের প্রকাশ ঠাকুরের মাধ্যমেই। ঠাকুর মাকে যোগীন মহারাজকে দীক্ষা দিতে নির্দেশ দেন। আবার মায়ের মাতৃভাবের প্রকাশের জন্যই ঠাকুর তাঁকে রেখে গেছেন। সত্যিকারের মায়ের মতো স্নেহ-মমতায় শ্রীশ্রীমা সন্তানদের পালন করেছেন—দীক্ষা দিয়েছেন, এমন কি দীক্ষাদানের ব্যাপারে মা গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ভক্তের রুচি বুঝে ভিন্ন ভিন্ন জপ-তপ ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছেন। মা সন্তানদের কল্যাণ-কামনা যেমন করতেন, তেমনি সকল জীবের ওপর তাঁর স্নেহধারা বর্ষিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ডঃ জলধি-কুমার সরকার, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দজী বলেন: নাস্তি মাতৃ-সমো গুরুঃ। অর্থাৎ জীবনের প্রথম গুরু হচ্ছেন মা। মা জন্ম-গত ভাবেই গুরু। বস্তুতঃ বর্তমান জগতে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্য দিয়ে ঠাকুর মাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য যেমন বিষ্ণুপ্রিয়াকে রেখে গিয়েছিলেন কঠিন ত্যাগের আদর্শ দেখাবেন ব'লে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবও শ্রীশ্রীমাকে সন্তানদের আদর্শবান্ ক'রে তোলার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। ঠাকুর ও মায়ের সম্পর্ক হ'ল পরস্পর পরস্পরের ইষ্ট ভাব। প্রকৃতপক্ষে সন্তানকে সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্য ভার পড়েছিল মায়ের ওপর—একটু ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়, বর্তমান মাতৃহারা যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃশক্তিকে প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছেন।

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে বিকাল ৫টায় শ্রীসুপ্রকাশ সাহার 'প্রেম ভরে মনরে গাহ রামকৃষ্ণ নাম' সঙ্গীতের পর মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। তাঁর বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর'। তিনি তাঁর ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে বলেন: প্রচলিত অর্থে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও একজন নাস্তিক হলেও দুজনেই কিন্তু জীব-সেবার মনোভাব পোষণ করতেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর যেখানে মানবকল্যাণ প্রয়াসী, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরবিশ্বাসী ও মানবপ্রেমী। দুজনেই নারীজাতির সম্মান রক্ষার্থে উদ্যোগী। অবশ্য বিদ্যাসাগরের মতো নারীজাতির সম্মান রক্ষার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করলেও মাতৃরূপই যে নারীজাতির পরম পরিণতি এ-কথা ব'লে গিয়েছেন। দুজনেরই প্রখর আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল। বস্তুতঃ, এই আত্ম-সম্ভ্রমবোধ থেকেই দুজনের চরিত্রে স্পষ্টবাদিতা গুণটি জাগ্রত হয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর যেমন প্রতিবাদে মুখর ছিলেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও ছিলেন স্পষ্টবাদী—সত্য উন্মোচনে নির্মম। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার যেমন তাঁদের হাস্য-পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে, তেমনি এর মধ্য দিয়েই জীবন-রস ও -রসিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের তফাত অনেক। যেমন বিদ্যাসাগর যেখানে পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত ভারতবর্ষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বস্তুতঃ, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও আন্তরিকতার দিক থেকে দুজনেই সমান, এখানেই দুজনের যোগ। এই আলোচনায়

অংশগ্রহণ করেছিলেন ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন ও ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দজী বলেন: বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বর মানতেন না ব'লে কথা উঠেছে, তা ঠিক নয়। যিনি মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ হর-গৌরী জ্ঞানে পূজা করতেন, তাতেই তাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়েছিল। মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালবাসার যে মানবতা. তার উদাহরণ বিদ্যাসাগর। তিনি আরও বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার বাংলাসাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার।

এই অধিবেশনের শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'প্রেমের ঠাকুর' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীধ্রুব চৌধুরী, শ্রীতপন সিংহ ও সম্প্রদায়।

১১ই এপ্রিল রবিবার, বিকাল ৩টায় চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডঃ তপনকান্তি ঘোষের 'আর রেখো না আঁধারে' উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর ডঃ জলধিকুমার সরকার প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'সৃষ্টিতত্ত্বপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ'। তিনি বলেন, সৃষ্টি কোথা থেকে হ'ল—এ প্রশ্ন চিরদিনের। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। স্বামীজী সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংখ্যদর্শনকে ভিত্তি ক'রে কিভাবে বেদান্তদর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব একটি যুক্তিসঙ্গত রূপ নিয়েছিল, তা স্পষ্ট ক'রে বলেন। ডঃ সরকারের প্রবন্ধের পর আধুনিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ দেবীদাস বসু, ডঃ ধ্রুব মার্জিত ও ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দজী বলেন: অনেকে মনে করেন, যা দেখা যায় তাই সত্য—এ-কথা সবসময় ঠিক নয়। যেমন রামধনু সকলের চোখে প্রতীয়মান হয় ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। সুতরাং, যা চোখে দেখছি, তা-ই নিরপেক্ষ সত্য—এমন নয়। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই—যেমন সূর্যের উদয়াস্ত যথার্থতঃ নেই, কিন্তু প্রতীয়মান হচ্ছে। তেমনি শরীরের জন্য জন্ম-মৃত্যু প্রতীয়মান হ'য়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃত সত্য নয়। সৃষ্টিকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ তার ব্যাবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে পৃথক সৃষ্টি ব'লে কিছু নেই।

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। ডঃ মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর সমাজচিন্তার একটি তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন: স্বামীজী মনে করতেন সেই সমাজই সত্য যেখানে উচ্চতর সত্য প্রতিষ্ঠিত এবং এটাই সমাজচিন্তার মূল কথা। আসলে স্বামীজীর সমাজচিন্তার ভিত্তি হ'ল বেদান্ত। তাই স্বামীজী বারবার বলেছেন, জীব থেকে মানুষ গড়ো, মানুষ থেকে দেবতা গড়ো—তবেই সার্থক পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে উঠবে। মানুষের সমাজ গঠনের যে উদ্দেশ্য সত্যলাভ, সেই সত্যে পৌঁছানো যাবে। এই প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দজী সমাজবাদের ওপর জোর না দিয়ে সমাজবোধের উপর জোর দেন। তিনি বলেন: সমতানুভূতির কথাই স্বামীজী বলেছেন। বিবেকানন্দ যে ধ্যানমগ্ন তা সমষ্টির জন্যই। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য তাঁর চিন্তাসূত্রগুলি প্রচার করা। তাঁর চিন্তানুযায়ী সমাজ গঠন করলে তবেই মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব।

তাঁর ভাষণের পর 'গীতাতত্ত্বের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ' সঙ্গীতানুষ্ঠানটি শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সম্প্রদায় পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানের পর তৃতীয় দিনের তথা এই তৃতীয় বর্ষের সাহিত্য সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

আত্মসমর্পণ

শ্রীগণপতি পাঠক

[গান]

মায়ের পায়ে সব সঁপেছি
আমার আবার ভাবনা কিসে।
অহংটারে মাকে দিয়ে—
মহানন্দে আছি বসে।
হাত ধরে মা চলায়, চলি
বলালে মা তবেই বলি,
ক্ষুধা পেলে মা যে খাওয়ায়—
(কত) আদর ক'রে হেসে হেসে।

ভয়-ভাবনা কারে বলে—
জানি না তো কোন কালে,
ডাকি যখন 'মা, মা' ব'লে—
অমনি মা যে দাঁড়ায় এসে
মা আছেন আর আমি আছি,
বাঁচালে মা তবেই বাঁচি,
থাকি মায়ের কাছাকাছি
আনন্দেতে বেড়াই ভেসে।

সমালোচনা

সেই জীবন্ত বিশ্বকোষ আচার্য করুণাময়—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য। প্রকাশক : শ্রীরাজশেখর সাহু, সাগ্নিক প্রকাশন, ২৩ বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৩। (১৯৭৯), পৃঃ ১৬৮, মূল্য : দশ টাকা।

আচার্য করুণাময় সরস্বতী জীবদ্দশাতেই একটি প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। বাস্তবিক, এক আশ্চর্য মনীষার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে বলা হ'ত : 'জীবন্ত বিশ্বকোষ'। বর্তমান গ্রন্থটি পড়লে বোঝা যায় যে, আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন একটি 'বিশ্বকোষ'। সেই মহা-মনীষার অন্তরঙ্গ এবং তথ্যবহুল একটি জীবনচিত্র উপহার দিয়ে গ্রন্থকার শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য একটি মহান্ দায়িত্ব পালন করেছেন। সেজন্য সর্বশ্রেণীর বাঙালীর সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। এ-ধরনের বই যত বেশী প্রকাশিত হয়, ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল।

শুধু অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অদ্ভুত মেধা ও পাণ্ডিত্যই নয়, চারিত্রিক তেজস্বিতা, নীতি-পরায়ণতা ও নির্লোভতায়ও আচার্য করুণাময় ছিলেন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং স্পষ্টবক্তা। যশঃপ্রতিষ্ঠাকে তিনি সারাজীবন উপেক্ষা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও রসবোধ তাঁর কম ছিল না। সব মিলিয়ে একটি নিখুঁত মানুষ ছিলেন আচার্য করুণাময়। আলোচ্য গ্রন্থটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রাঁচী ধর্মসম্মেলনে আচার্য করুণাময় অন্যতম বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন। গ্রন্থকার লিখেছেন : "একটা বিশেষ ব্যাপার উল্লেখযোগ্য, আচার্যদেব এই ভাষণের সারাংশটি নিজের হাতে লিখে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি জীবনে অসংখ্য ভাষণ প্রদান করেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে লেখা আর কোন বক্তৃতার সারাংশ এইভাবে পাওয়া যায়নি।" (পৃঃ ৫৫)। ভাষণের সূচনায় আচার্য করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঈশ্বরাবতার তা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন : "আমরা সকলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

শতবার্ষিকোৎসবে তাঁহারই শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার শুভাশীর্বাদ সকল বিষয় মঙ্গলময় করুক। কলিকলুষনাশন জগৎপাবন পতিতোদ্ধারকারণ নররূপী নারায়ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামগুণ কীর্তনের জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি।

"পরমহংসদেবকে ভগবদবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। না বলিলেই বরং সত্যের অপলাপ করা হয়।" (পৃঃ ৫৫)।

সেকালের বঙ্গীয় রক্ষণশীল সংস্কৃতজ্ঞ (!) পণ্ডিতসমাজ এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একাংশ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার ব'লে স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারের সঙ্গে আচার্য করুণাময়ের ছিল অন্তরজীবনের গভীরতা। তাই সত্যের আবরণ তাঁর কাছে অপাবৃত হয়েছিল।

বাঙলা জীবনীসাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নেই। বহু পরিশ্রম ক'রে গ্রন্থকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন এক মহাজীবনের বিচিত্র জীবনালেখ্য, যা আজকের বাঙালী সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। তবে জীবনীকারের ভাষা মাঝে মাঝে করুণাময় সম্পর্কে অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত ও আবেগময়, যা সংযত হলেই শোভন হ'ত। গ্রন্থটিতে মুদ্রণ-প্রমাদ বিশেষ চোখে পড়েনি। তবে পরবর্তী সংস্করণে কাগজ এবং ছাপা আরো ভাল করার দিকে দৃষ্টি দিলে প্রকাশক ভাল করবেন। বইটিতে আচার্য করুণাময়ের বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি ছবি আছে। তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে বইটি নিঃসন্দেহে। পরিশিষ্টে করুণাময় সম্পর্কে ইদানীং কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উদ্ধৃতি গ্রন্থটির একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি

—ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

(১) অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীকাকুলাম জেলায় ১৯৮০-র বন্যাত্রাণকার্য গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বন্ধ হইয়াছে। গৃহনির্মাণকার্য চলিতেছে।

(২) উড়িষ্যায় (ক) কোরাপুট জেলায় গুনুপুরের ১৯৮০-র বন্যাত্রাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছে। ২৪৬টি গৃহের তিনটি কলোনি নির্মিত হইয়াছে। দুইটি চকথাম্বা ও একটি অন্তর্ঝুলি অঞ্চলে। আশা করা যাইতেছে, তিনটি কলোনি চলতি মাসে উদ্বোধন করা যাইবে।

(খ) ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ই হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮টি গ্রামের ৪০৪ পরিবারের ২,২৭৩ জনকে রান্না-করা খাবার বিতরণ করা হয়। ভুবনেশ্বর কেন্দ্র বাঁকি অঞ্চলের কুসুপ্তা গ্রাম হইতে এই খাবার বিলি করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এক সপ্তাহ যাবৎ বিমান হইতে ফেলিবার জন্য খাবারের প্যাকেট তৈরী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) পুরী মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪ই হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুরী জেলার কাকাতপুর অঞ্চলের ১২টি গ্রামে ৪০০টি শাড়ি ও ৪০০টি ধুতি বিতরণ করা হইয়াছে।

(৩) উত্তরপ্রদেশের বন্যায় এলাহাবাদ কেন্দ্র সেপ্টেম্বর মাসে ১০ দিন ধরিয়া শুষ্ক খাবার বিতরণ করিয়াছেন।

(৪) পশ্চিমবঙ্গ (ক) মালদহ জেলার পুনর্বাসনকার্য যথারীতি চলিতেছে।

(খ) মালদহ জেলায় খরাপীড়িত হবিবপুর

ও বামনগোলা অঞ্চলে ত্রাণকার্য ১২ই জুন হইতে আরম্ভ হইয়া ৫১৩টি গ্রামের ৩৫,৩৯৭টি পরিবারের মধ্যে ৪৮১.৪ টন চাউল ও ২২.০৫ টন লবণ বিতরণের পর ৩০শে অগস্ট বন্ধ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এই বৎসরও যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অষ্টমীর দিন অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ছাড়া পূজার বাকী কয়েকদিনই ভাল আবহাওয়া ছিল এবং প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। অষ্টমীর দিন কয়েক লক্ষ নরনারী প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছিল এবং প্রায় ৪০,০০০ হাজার ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত ২৪টি শাখাকেন্দ্রেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়: আসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখ্নৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জী), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

সারদাপীঠের শিল্পায়তন (বেলুড় মঠ) জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুলের তিনটি ছাত্র সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৯৮২-র শেষপরীক্ষায় ২য়, ৫ম ও ৯ম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং **নরেন্দ্রপুরের** জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুলের চারিটি ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছে।

উদ্বোধন

গত ৩১শে অগস্ট ১৯৮২, **গৌহাটি** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় উদ্বোধন করেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ মেহরোত্র।

সুবর্ণজয়ন্তী

চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় গত ১৫ই হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২। ১৫ই শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি আশ্রমের চিকিৎসালয়, লাইব্রেরিসহ পড়ার ঘর ও একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথিরূপে মেঘালয়ের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ মেহরোত্র উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনায় গত ২৯শে অগস্ট যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৩০০ তরুণ-তরুণী যোগদান করে।

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় গত ৯ই হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৫৪১ তরুণ-তরুণী যোগদান করে এবং শেষের দিনে ২৩৪ জন বয়স্ক সদস্য যোগদান করেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ১২ই সেপ্টেম্বর স্বামী অভেদানন্দজী এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর স্বামী অখণ্ডানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর মহালয়া উপলক্ষে এবং ২৪, ২৫ ও ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ হয়। মহাষ্টমীতে (২৫শে সেপ্টেম্বর) শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের যোড়শোপচারে পূজা হয়।

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি:

স্বামী রাকানন্দ (রাজারাম মহারাজ)

গত ২৯শে অগস্ট ১৯৮২, বিকাল ৪টায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাগপুর কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। যোগদানের সময় হইতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নাগপুর কেন্দ্রে ছিলেন। তিনি পণ্ডিত, লেখক, বক্তা এবং মারাঠী মাসিক পত্রিকা 'জীবন বিকাশে'র সম্পাদক ছিলেন।

স্বামী আত্মেশ্বরানন্দ (গৌর মহারাজ) গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২, রাত্রি ১১-৩৫ মিনিটে ডায়াবেটিস ও মস্তিষ্কে রক্ত-চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৭২ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি নানা উপসর্গে ভুগিতেছিলেন এবং গত ৭ই জুলাই তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জয়রামবাটীতে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জয়রামবাটী ছাড়া তিনি বাগেরহাট (অধুনা বাংলাদেশ) ও রাঁচী আশ্রমের কর্মী ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

শ্যামপুকুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংসদে গত ১৫ই অগস্ট, আয়োজিত 'শ্রীশ্রীমায়ের আগমনী মেলা'য় ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া মন্দির পরিক্রমা এবং পাচালিপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। ৩৫০ জন ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

অশীতি বর্ষপূর্তি উৎসব

বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে গত ২২শে ও ২৩শে অগস্ট ১৯৮২, দুইদিনব্যাপী ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের বৈদিক মঙ্গলাচরণ আবৃত্তির পর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী 'স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ রূপায়ণে' বিষয়ক একটি আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় দিনে 'স্বামীজী ও বিবেকানন্দ সোসাইটি' বিষয়ক আলোচনায় প্রধান অতিথি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও বিশেষ অতিথি অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ভাষণ দেন। এই দুইদিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। স্বামীজীর বিভিন্ন চিন্তাধারার উপর বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। সোসাইটি-সম্পাদক ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সোসাইটির বর্তমান কর্মধারা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন সকালে ১৯১৭ খৃঃ স্বামী প্রেমানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিটি পুরাতন বাড়ি (২১ বৃন্দাবন বোস লেন) হইতে নূতন বাড়িতে আনা হয়। পূজা, পাঠ, ভজন, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে অশীতি বর্ষপূর্তি উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তমতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সংবাদ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে আসিয়াছে:

হাজারিবাগ (বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তি আশ্রম।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মাল বোঝাই গাড়ী টেনে নিয়ে যায়; অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যান।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বর কে ? 'যাঁর দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে।' তিনি ঈশ্বর—'অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পরমকারণিক, গুরুর গুরু।' আর সকলের উপর 'তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Re. 0.85

MY MASTER
Price : Re. 0.60

THOUGHTS ON VEDANTA
(Seventeenth Edition)
Price : Rs. 2.25

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3.80

CHRIST THE MESSENGER
(Eighth Edition)
Price : Rs. 1.25

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4.25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 8.00

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 1.80

VEDANTA PHILOSOPHY (9th Ed.)
Page 63, Price : Rs. 3.00

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
Price : Rs. 2.50 (Ordinary)
Rs. 3.50 (Cloth)

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial) (Fourth Edition)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 6.50

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 1.00

UDBODHAN OFFICE, 1. Udbodhan Lane, Calcutta-700003

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—২০্ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৯৫্ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৬্ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫্ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জলযোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ভক্তিযোগ—	পৃঃ ৯৬,	মূল্য ৩·০০
ভক্তি-রহস্য—	পৃঃ ৯৮,	মূল্য ৩·৪৫
জ্ঞানযোগ—	পৃঃ ২৯০,	মূল্য ১০·৫০
রাজযোগ—	পৃঃ ২১৪,	মূল্য ৬·৫০
সন্ন্যাসীর গীতি—	পৃঃ ২৩,	মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—	পৃঃ ২৯,	মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ—	পৃঃ ৩৬,	মূল্য ১·৫০
পত্রাবলী : প্রথমার্ধ—	পৃঃ ৪০২,	মূল্য ১০·০০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)—		মূল্য ২৭·০০
পওহারী বাবা—	পৃঃ ১৮,	মূল্য ১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান—	পৃঃ ৮০,	মূল্য ১·২৫
ধর্ম-সমীক্ষা—	পৃঃ ১৩০,	মূল্য ৫·০০
ধর্মবিজ্ঞান—	পৃঃ ১০২,	মূল্য ৫·৫০

ভারতে বিবেকানন্দ—(১৭শ সংস্করণ)	পৃঃ ৪২৫,	মূল্য ২০·০০
বেদান্তের আলোকে—	পৃঃ ৮৫,	মূল্য ৫·০০
দেববাণী—	পৃঃ ১৬০,	মূল্য ৬·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ—(৭ম সং)	পৃঃ ১৮০,	মূল্য ৫·০০
মদীয় আচার্যদেব—	পৃঃ ৬২,	মূল্য ২·২৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—	পৃঃ ১৪৩,	মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা—	পৃঃ ৫২,	মূল্য ১·৭৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ১৩৪,	মূল্য ৬·০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক—	পৃঃ ১৩২,	মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—	পৃঃ ১৩৬,	মূল্য ৩·৫০
ভাববার কথা—	পৃঃ ৬৪,	মূল্য ২·৩০
বাণী-সঞ্চয়ন—	পৃঃ ৩১৬,	মূল্য ৭·০০
বর্তমান ভারত—	পৃঃ ৪০,	মূল্য ২·৫০
ভারতীয় নারী—(১৮শ সং)	পৃঃ ৯৩,	মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। ৩য় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২.৫০

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪.০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২.৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৫৭, মূল্য ২.৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩.০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫.০০

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩.২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫.০০

গোপালের মা— স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১.৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ (৪র্থ সং) পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৮.০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র — পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭.৮০

শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত।
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫.৫০
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫.০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, মূল্য ৪.০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬.৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, ৭ম সং, মূল্য ১.০০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩.০০

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭.৫০

অতীতের স্মৃতি— (৪র্থ সং), পৃঃ ৪৫৫, মূল্য ২০.০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪.৫০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৯, মূল্য ২.০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পুনর্মুদ্রণ (১৩৮৮), পৃঃ ৭০, মূল্য ২.৫০

দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ৩.৭৫

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ। ৮ম সং, পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৬.০০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫.০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪.০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৬.২৫

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০.০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১.২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী— স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০.৭২

বিবিধ-প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩.৫০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে — স্বামী অখণ্ডানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫.০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪.০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১.৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪.৫০

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়—পৃঃ ৪৪, মূল্য ০.২৫

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণা—স্বামী দেবানন্দ। ২য় সং, পৃঃ ৭৬, মূল্য ১.২৫

শিক্ষা (মূল গ্রন্থ—হার্বার্ট স্পেন্সার-লিখিত) অনুবাদ : স্বামী বিবেকানন্দ (১ম সং), পৃঃ ১১২, মূল্য ৩.৫০

ভারতের পুনর্গঠন—স্বামী বিবেকানন্দ। (১ম সং), পৃঃ ৫৬, মূল্য ২.০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩.৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬.০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২.৫০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪.০০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১৪শ সং, পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪.০০

ধ্যান—স্বামী ধ্যানানন্দ। (২য় সং), পৃঃ ১০২, মূল্য ৩.৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। (২য় সং), পৃঃ ৮২, মূল্য ৩.৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। (৫ম সং), পৃঃ ১১৪, মূল্য ১৩.৭৫

সংস্কৃত

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২.৫০

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮.০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত :

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫.০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১.০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ২.২৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত। ১৫শ সং, পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১০.৫০

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। ১৫শ সং, পৃঃ ৫১৯, মূল্য ১২.৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত মূল্য : প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড ৩.০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩.০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯.০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২.০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ—(স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-লিখিত ভূমিকাসহ), পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২.০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০.০০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ৩.০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮.০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩.০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য (সাধারণ বাঁধাই) ৩.৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪.০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন

অগ্রহায়ণ ১৩৮১
৮৪তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা



উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী		৫৪৫
২।	কথাপ্রসঙ্গে : ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব		৫৪৬
৩।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র		৫৫০
৪।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন		৫৫৩
৫।	জীব মাঝে শিব (কবিতা)	শ্রীকার্তিকচন্দ্র ঘোষ	৫৫৫
৬।	পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	৫৫৬
৭।	আলোর পথে আমায় টানো (কবিতা)	শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	৫৬২

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; **আগামী বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে সি-মেল-এ ৫৪৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১২৯৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা। নমুনার জন্য ২·২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক **দায়ী নহেন।** প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে** উপযুক্ত **ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে **পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের** মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত **ঠিকানা** জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও **অবশ্যই** উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা **মনিঅর্ডারযোগে** পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় : সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥টা **হইতে ৫টা।** রবিবার **অফিস** বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

৮। দেবী দুর্গা : শক্তির উৎস ... স্বামী আত্মস্থানন্দ ... ৫৬৩

৯। ভারতে শক্তি-উপাসনার ধারা এবং তাৎপর্য ... স্বামী কেদারানন্দ ... ৫৬৫

১০। 'জাপানিজ এনকেফালাইটিস' : পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের সমস্যা ... ডক্টর জলধিকুমার সরকার ... ৫৬৯

১১। বাংলার বাস্তু-শিল্পে পোড়ামাটির কাজ ... শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ... ৫৭২

১২। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম .. শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত ... ৫৭৫

১৩। নানাপ্রসঙ্গে : ৫৮০

চিরন্তন কাহিনী : শ্রদ্ধা ও সত্যই ব্রাহ্মণত্ব ... ৫৮০

স্মৃতি সঞ্চয়ন : 'সব কাজই সাধন' ... ৫৮২

জ্ঞান-বিজ্ঞান : এসেন্স-অগুরু ... ৫৮২

দেশ-বিদেশ : দুই মহাদেশ জুড়ে একটি দেশ ... ৫৮৩

১৪। সমালোচনা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৮৬

১৫। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ... ৫৮৮

১৬। বিবিধ সংবাদ ... ৫৮৯

১৭। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা (আষাঢ়, ১৩০৭ ; পৃঃ ১৬৯-১৭৬) ... ৫৯১






পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়



৮৪তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

·····ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখনও ইহা পরিবর্তন করিতে পার না, একটা জিনিস নষ্ট করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিস বসাইতে পার না। একটি বৃহৎ বৃক্ষকে এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অন্য স্থানে পুঁতিয়া দিলে উহা যে সেখানে জীবিত থাকিবে, তাহা কখনই আশা করিতে পার না। ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে; ভালই হউক আর মন্দই হউক—শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান্ আদর্শে পূর্ণ রহিয়াছে; ভালই হউক আর মন্দই হউক—ধর্মের এই সকল আদর্শের মধ্যেই আমরা পরিবর্ধিত হইয়াছি; এখন ঐ ধর্মভাব আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, আমাদের জীবনীশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ···তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার নূতন খাতে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫।৬৭]

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব

চলিতে চলিতে পথের ধারে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম। না,—দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ দুর্বার জনস্রোত নিশ্চিন্তে চলিতে দিতেছিল না। বিপুল সেই স্রোতের গতিও ছিল বিচিত্র,—পূজোৎসবের আনন্দ-বন্যায় জনসমুদ্র যেন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি শারদীয়া মহাপূজার সমারোহ নানা ভাবে ও রূপে, বহুধা বিক্ষিপ্ত এবং সমস্যাক্লিষ্ট জনমানসকে চমক লাগাইয়া গেল। পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাই বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছিলাম,—মিছিল-পুরী মহানগরীর ইহাও এক অভিনব দৃশ্য! ভাবিতেছিলাম, এই তো গতকালও যেখানে দেখিয়াছিলাম পথ-অবরোধকারী জনতার দোর্দণ্ড তাণ্ডব,—শুনিয়াছিলাম বিক্ষোভ-রুষ্ট বহু কণ্ঠের বিভিন্ন বাদ-প্রতিবাদের আওয়াজ, সেখানে সেই জনগণই আজ অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ,—যেন একই কুশীলবদের ভিন্নতর দৃশ্যে অভিনয়। কেবল পথে জনস্রোতের গতিতেই নহে, জানিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম যে ঐ গতি মাঝে মাঝে যে-সব স্থলে স্থিতিলাভ করিতেছিল, সেই মঠে-মন্দিরে ও পূজামণ্ডপগুলিতেও নাকি অভূতপূর্ব জনসমাবেশ ঘটিয়াছিল সদ্যোবিগত এবারকার শারদোৎসবে।

প্রচলিত ও সংশোধিত উভয় মতানুসারেই পূজাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। অস্বাভাবিক এমন পরিস্থিতিতেও কিন্তু মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে এক চুলও দ্বিধা হইতে দেখা গেল না—বরং বহুগুণিত বোধ হইয়াছে। কোন্ টানে মানুষ এমন ভাবে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল—জনমানসে কেনই বা এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত উদ্বেলতা? কোথায় ইহার রহস্যমূল? কোথায় সরাইয়া রাখিল, মানুষ তাহার অজস্র সমস্যার বোঝাগুলিকে? খাদ্যাভাব, জলকষ্ট, খরার দহন, পণ্যের অগ্নিমূল্য, যান-জট, বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, চিকিৎসার অব্যবস্থা, শিক্ষা-সঙ্কট আরও শত সহস্র দৈনন্দিন জটিলতাকে কোন্ কৌশলে ঢাকিয়া, মানুষগুলি এমন উচ্ছল প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল? জিজ্ঞাসা ইহাই।

*

সহসা একটি অতীত স্মৃতি চলচ্চিত্রের মতো মনের পটে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের দুই বিশিষ্ট সন্ন্যাসি-শিষ্য একদা তীর্থপর্যটন প্রসঙ্গে অরণ্য-সমাকীর্ণ পার্বত্য পথে চলিতেছিলেন। বদরিকাশ্রম দর্শনান্তে তুষারময় এক দুর্গম বন্ধুর উৎরাই বাহিয়া অতি সন্তর্পণে নামিতে নামিতে, একদল মহিলা যাত্রীকেও এমন বিপৎসঙ্কুল পথে আরোহণ করিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। মহিলাগণ কাতর কণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, তাঁহাদের এক সঙ্গিনী পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি সন্ন্যাসী যাত্রিদ্বয় ঐ পথহারা নারীকে কোথাও দেখিতে পান, তবে যেন তাঁহারা আশ্বাস দিয়া বলেন যে, তাহার সহযাত্রিণীরা তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মহিলাগণ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, ঐ নারীর ক্রোড়ে থাকিবে একটি শিশু সন্তান, সুতরাং দূর হইতে দেখিলেও তাহাকে চেনা যাইবে। সত্য সত্যই কিছু দূরে নামিয়া আসিয়া দিশাহারা সেই যাত্রিণীকে ঠিক দেখা গিয়াছিল;—নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত একটি তিন-চার মাসের শিশুকে কোলে লইয়া, ঐ মাতা খুবই ধীরে ধীরে পিচ্ছিল বরফ ঢাকা পথ ধরিয়া তীর্থাভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদ্বয় অবাক্ হইয়া

ভাবিতেছিলেন,—দুঃসাহসিকা ঐ তীর্থাভিলাষিণীর কি নিজ সন্তানের প্রতিও এতটুকু মমতা নাই? দুস্তর এই পথে প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝাকেও উপেক্ষা করিয়া এমন একটি শিশু-সন্তানকে বক্ষে লইয়া কিসের জন্য তিনি গৃহের বাহিরে যাত্রা করিয়াছেন? কী সেই দুর্বার আকর্ষণ?

পরিব্রাজক সাধুদ্বয়ের সেদিনকার দৃষ্টিতে যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা আমরা শুনিয়াছি। তাঁহারা অবলোকন করিয়াছিলেন—ভারতের একখানি সনাতন আদর্শ-চিত্র! তাঁহারা আরও একবার অনুভব করিয়াছিলেন,—ভারতে ধর্ম প্রথমে,—পুত্র-পরিজন জগৎ-সংসার সব পরে। আদর্শ-বিস্মৃত ইহ-সর্বস্ব বর্তমান যুগেও এইরূপ চিত্র এখনও বিরল হইয়া যায় নাই, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে সনাতন ভারত এখনও মরে নাই,—তাহার মৃত্যু নাই। সেই অমর আদর্শই যেন মূর্তিধারিণী হইয়া ঐ তীর্থযাত্রিণীর বেশে, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল।

*

ভারতের জনমানসের অতি সহজ স্বাভাবিক চিত্রপট বুঝি ইহাই। রূপকথার সেই রাক্ষসীর প্রাণ-পেটিকাটি যেমন আকাশে সঞ্চরণশীল পাখীর গর্ভে লুক্কায়িত ছিল,—বিশাল এই জাতির প্রাণ-সম্পুটও তেমনই সুরক্ষিত রহিয়াছে উহার হৃদয়াকাশে নিহিত ধর্ম-বিশ্বাসে। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তপ্রচারের পরে ভারত-ভূখণ্ডে প্রত্যাগমনান্তে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন পাম্বানে—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুআরি। সেখানেই সেদিন ভারতবাসীকে স্বামীজী স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন: 'আমার বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই এক একটি মুখ্য আদর্শ আছে। সেই আদর্শ যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; ধর্ম—কেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল।'

ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই 'ধর্ম' বলিতে কিন্তু আমরা অবশ্যই উহার প্রচলিত ইংরেজী প্রতিশব্দ 'রিলিজিয়ন' (Religion) বুঝি না। 'রিলিজিয়ন' অপেক্ষা 'ধর্ম' শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। 'ধর্ম' শব্দের আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক গভীর তাৎপর্যার্থে প্রবেশ না করিয়াও অতিশয় সহজভাবে বলিতে পারি, 'ধর্ম' কথায় আমরা এমন কিছু বুঝি, যাহা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অবশ্য পালনীয় নীতি বা সদাচার,—যাহা না থাকিলে মানুষকে 'মানুষ' বলাই চলে না। সদাচার সচ্চরিত্রতা রূপ 'ধর্ম' মনুষ্যমাত্রেরই সর্বপ্রকার সমাজবদ্ধ জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক,—এই ব্যাপারে কোন বিবাদের অবকাশ কোথাও নাই। মানুষের ব্যক্তিজীবন,—তাহার সমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্র, এই সদাচার বা সুনীতির উপরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। সত্য, অহিংসা, অচৌর্য, সংযম, ত্যাগ, মৈত্রী, করুণা ইত্যাদি সুনীতি বা ধর্মলক্ষণগুলিই যুগে যুগে সর্বত্র মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে,—তাহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, উক্ত ধর্মগুণগুলির বিকাশ ও পরিপুষ্টি কখনও বাহিরের জড় বিষয়রাশির ভজনা সহায়ে সাধিত হইতে পারে না। জড়ের সেবায় জড়ত্ব প্রাপ্তিই সম্ভব,—জড়কে অতিক্রম করিবার উপযুক্ত সামর্থ্যলাভ উহা দ্বারা হয় না। ধর্মের প্রেরণা ও প্রকাশ তাই জড় বস্তুর ধ্যান ধারণায় নহে;—চৈতন্যের ভাবনায় বা নিত্য বস্তুর চর্চায়,—সত্যের অনুশীলনে বা ঈশ্বরমুখী জীবনচর্যায়। ভারতের চির পুরাতন আদর্শ ইহাই। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে বলা হইত—'ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে' (মহাভারত, শান্তি পর্ব, ১৫।৩)। দণ্ড মানে রাজশাসন,

সমাজ-নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ, রাজ-শাসনের নীতিতে তিনটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত—ধর্ম (সদাচার বা সচ্চরিত্রতা), অর্থ (ধনোপার্জন) ও কাম (ভোগ-ব্যবস্থা)। চতুর্থ বর্গ বা পুরুষার্থ—মোক্ষ। মোক্ষ কখনও রাজ-নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় ছিল না,—থাকা উচিতও নহে। উল্লিখিত ত্রিবর্গের মধ্যে আবার ধর্মই প্রধান। কারণ ধর্মানুসারেই (অর্থাৎ নৈতিক উপায়েই) অর্থোপার্জন এবং ভোগ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও বণ্টন করা উচিত। ইহাই ছিল ভারতের রাজনীতির মূল কথা। এই নীতির ব্যতিক্রম যাহাতে কোথাও না ঘটে, এই সকল ব্যাপারে দুর্নীতি-নিবারণই ছিল রাজার কর্তব্য বা রাজধর্ম।

ভারতীয় জনগণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত 'মহাভারত'। সেখানে স্বর্গারোহণ পর্বে, স্বয়ং ব্যাস-কণ্ঠের সোচ্চার আক্ষেপ-ধ্বনি আমরা শুনিতে পাই :

'ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদ্ অর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥'

(মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব, ৫।৬২)

বাহু তুলিয়া চিৎকার করিয়া, এই এত যে আমি ডাকিয়া বলিতেছি, তোমরা কি তাহা শুনিতেছ না? ধর্মপথে অর্থও হয়, বিষয়-ভোগও হয়। হায়, তবু কেন লোক ধর্মবিমুখ ?

ভারতের জনগণের কর্ণে, বহু দূরাগত সেই ধ্বনি বুঝিবা সময়ে সময়ে এখনও শ্রুত হয়,—তাই জানিয়া বা না-জানিয়া, ধর্মের নামে জনসমুদ্রকে অমন উদ্বেল আবেগে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে দেখা যায় কখনও কখনও।

মানুষ কেবল একটি জীবই নহে,—রক্ত-মাংসময় নিছক একটি প্রাণী ছাড়াও তাহার দ্বিতীয় আর একটি গৌরবময় সত্তা রহিয়াছে—উহা তাহার মনুষ্যত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মানুষের এই দ্বিতীয়, অর্থাৎ তাহার মহিমান্বিত সত্তার দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে ফিরাইতে চাহিয়াছেন। বলিয়াছেন—"মানুষ ; মান হুঁশ। যার 'হুঁশ' আছে, চৈতন্য আছে ; যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য,—সেই 'মান হুঁশ'।" (কথামৃত, ৩।২০।৩)।

মানুষ যখন জীব—তখন তাহার সর্বসিদ্ধি বৈষয়িকচেষ্টায়, সংসার-চর্চায়। কিন্তু মানুষ যখন তাহার স্বীয় মনুষ্যত্ব-গরিমায় সচেতন, তখনই সে প্রকৃত অর্থে 'মানুষ'। এই 'মানুষ' তখন সকল বৈষয়িকতার ঊর্ধ্বে ;—সেখানে সে সাময়িক অপেক্ষা চিরন্তনের অধিক প্রয়াসী, অনিত্য অপেক্ষা নিত্যের প্রিয়,—জড়কে ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের অনুসন্ধানী। এই মানুষই সঠিক অর্থে ধার্মিক। মানুষের জৈবিক সত্তা হইতে স্বতন্ত্র এই আত্মিক সত্তায়, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথরেখা বা আদর্শও ভিন্নতর হইতে বাধ্য। সাধারণ লোকচক্ষে হয়তো বা লাভজনক বলিয়া প্রতীত না হইতে পারে, কিন্তু উহাই মানুষের শ্রেয়ঃ। উহাই তাহার পরমার্থ-সম্পাদক। 'আপাত' অপেক্ষা 'চিরন্তন'ই তখন তাহার ঈপ্সিত। মরণ তখন নিছক অভিনয়,—অমরত্বই তখন তাহার স্বাধিকার। মাত্র বাঁচার জন্য সংগ্রামের নামই তখন 'জীবন' বলিয়া স্বীকৃতি পায় না,—জীবন তখন হইয়া দাঁড়ায় মরণ-জয়ের সাধনা,—অমৃতত্ব লাভের সোপান,—সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা। মানুষ-জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই ইহারই অপর নাম 'ধর্ম'

'ধর্ম' কোন অলস মানসিকতা নহে,—নিছক ভাব-বিলাসের সুরেলা কথাও নহে। মানব-জীবনের উৎকর্ষ-সাধনে ধর্ম হইতেছে একান্ত অপরিহার্য স্বাভাবিক উপায়,—আধুনিক বিজ্ঞান-স্বীকৃত পথ ও প্রেরণা। তাহা না হইলে, বর্তমান

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মুখে আমরা নিশ্চয়ই শুনিতাম না: "যে আদর্শবাদের প্রজ্বলিত বর্তিকা আমার যাত্রাপথকে আলোকিত করিয়াছে এবং প্রতিনিয়ত যাহা আমাকে সহর্ষে জীবনের সম্মুখীন হইবার সাহস জোগাইয়াছে, তাহা হইতেছে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'।" বিজ্ঞান-জগতের যুগ-বরেণ্য পথিকৃতের লেখনী হইতে আরও পাইতাম না: 'মনুষ্য-জীবন বা যাবতীয় জৈব জীবনের অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ধর্মের কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। আপনারা তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ-জাতীয় প্রশ্নের কোন তাৎপর্য আছে কিনা। আমার জবাব হইতেছে এই, যে-ব্যক্তি নিজের এবং স্বজাতীয় অন্যের জীবনকে অর্থহীন মনে করে, সে শুধু দুর্ভাগা নহে, সে জীবন-ধারণের অযোগ্যও বটে!' আমরা অ্যালবার্ট আইন-ষ্টাইনের কথাই উল্লেখ করিলাম।

কেবল বিজ্ঞান কেন? ভোগনিষ্ঠ জড়বাদীরাও আজ পুনর্বিবেচনা শুরু করিয়াছেন শুনিতেছি। মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে হইলে শুধু তাহার রক্ত-মাংসের পুষ্টিসাধন ও পরিতোষ বিধানের পথেই সফলতা আসিবে না,—মানুষের আন্তর-রাজ্যের আলো-বাতাসের পথগুলিকেও উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। এ যুগের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরেও তাই আবার নূতন চিন্তা স্রোতের আভাস মিলিতেছে। ইদানীং কালের ধর্ম-বিনাশন-যজ্ঞের এক অবিসম্বাদী নায়কের কণ্ঠেও তাহার জীবনের শেষাঙ্কে অস্ফুটস্বরে শোনা গিয়াছিল: 'ধর্মকে থামানো যাইবে না, যেমন যাইবে না মানুষের বিবেককে স্তব্ধ করা। ধর্ম হইতেছে বিবেকের ব্যাপার,—বিবেক চির-স্বাধীন। উপাসনা এবং ধর্মও তাই স্বাধীন।'

*

যাহা হউক, ধর্মের লক্ষ্য ও তাৎপর্য যত মহৎ-ই হউক,—মানুষের সমাজ, শিক্ষা ও পরিবেশ অনুযায়ী উহার প্রয়োগে বা অভিব্যক্তিতে কিছু বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিছক কুসংস্কার ও ভয় হইতে কল্পিত যে তথাকথিত ধর্ম, তাহাকেও মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লওয়া মানব-কল্যাণের অঙ্গ নহে। কিন্তু যে-ধর্ম মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে, অভয় করে, শান্তি প্রদান করে,—শুধু প্রতিবেশী মানুষ কেন, জীবজন্তু-কীট-পতঙ্গটিকেও পর্যন্ত আপনবোধ করিতে শিক্ষা দেয়—ভাল-বাসিতে প্রেরণা দেয়, তাহাকেও জলাঞ্জলি দিবার মতো আধুনিকতাকে কেন আমরা স্বীকার করিব? উহা যুক্তিবাদিতা নহে,—উহার নাম আত্মহনন। ঐরূপ আত্মঘাতী শিক্ষা বা ধর্মদ্বেষী আন্দোলনের উদ্দাম তাণ্ডবে সমাজ-জীবনের মাধুর্যের ধারাকে শুকাইয়া ফেলিবার,—মানুষের মনুষ্যত্বদিকটিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার চেষ্টাই হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল এই প্রকার চলিলে, উহার প্রতিক্রিয়াও মারাত্মক আকারে দেখা দিতে বাধ্য,—ইতিহাসে যাহার সাক্ষ্য ভূরি ভূরি মিলিবে।

সমাজের সাধারণ নরনারী ধর্ম মানে, কিন্তু জানে না। তাহারা অন্তরের আবেগ ও অনুভূতিকে সঠিক পথে প্রকাশ করিতে পারে না, —কী চায়, তাহাও বুঝে না। ইহার কারণ শিক্ষার অভাব। অসহিষ্ণু ও উন্নাসিক হইয়া বৃহত্তর এই জনসমাজকে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলিয়া দেওয়া, অথবা তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগমুখর ধর্মাচরণগুলিকে নেহাতই কুরুচি জ্ঞানে দমিত করার উদ্যোগ বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। সহানুভূতি ও ধৈর্য সহকারে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে, তাহার চিন্তা, ভাব ও কর্মকে—তাহার ধর্মচেতনাকে যথার্থ পথে সঞ্চালিত করিতে সহায়তা করাই হইবে, প্রকৃত অর্থে মানুষের সেবা, সমাজ-কল্যাণ।

এই সেবা ও কল্যাণের পথে নিন্দা, সমালোচনা, ঘৃণা ও দ্বন্দ্বের আদৌ কোন স্থান নাই;—এই পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা 'প্রেম ও সত্যানুরাগ'।

*

ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের তাৎপর্য ধর্মে,—ধর্মই ভারতবাসীর মজ্জাগত প্রকৃতি,—উহা যে নামে বা প্রণালীতেই ব্যক্ত হউক না কেন। ভারতীয় জনগণের সেবায় যাঁহারা আকুল হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের আজ ভারতীয় জন-চিত্তের এই অনন্যসাধারণ গতি-প্রকৃতিকে সর্বাগ্রে সম্যক্ বুঝা আবশ্যক। এদেশের জাতীয়তার এই বৈশিষ্ট্যকে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়, তথা আধুনিক সমাজবিদ্‌গণ যদি যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তবে আর তাঁহাদের দ্বারা এই জাতির সেবা কোন্ উপায়ে সফল হইবে?

পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেদিনের ঐ জনপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে যখন নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম, তখন প্রতিধ্বনির মতো কাহার কণ্ঠস্বরে আবার চমক ভাঙিয়াছিল। দূরাগত সেই প্রতিধ্বনি স্পষ্টই জানাইয়া গেল: '…দেখতে পাবে যে জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক ধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার।'

জিজ্ঞাসার জবাব সেদিন এই ভাবেই মিলিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম,—ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র শেঠকে লিখিত]

কলম্বো

৯।১১।০২

প্রিয় পূর্ণবাবু—

২৭শে অক্টোবর তারিখে লিখিত আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। এবারকার পত্রে যথার্থ ই মনের কথা লিখেছেন সন্দেহ নাই। বয়েস বাড়িয়াছে, কন্যা পুত্রাদির বন্ধন বাড়িতেছে, এবং সেরকম প্রবল ইচ্ছা নাই বলিয়া কি হাল ছেড়ে দেবেন? তাহা কখনই উচিৎ নয়। সেই শেষশ্বাস পর্য্যন্ত, যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই আশা-ভরসা ছেড়ে দেবেন না, খবরদার। সমুদ্রে নৌকা ডুবিতেছে, তখনও কি মাঝি হাল ছেড়ে দিয়ে থাকে! জানি কি, যদি এক ঘায়ে তুফান হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি! ভগবানকে এক ডাকেই পাওয়া যায়; জানি কি যদি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ডাকতে২ যদি একটা ডাকও হঠাৎ সেই রকম ডাকের মতন ডাক হয়ে পড়ে; তা হলেই তো আর কি, কেল্লা ফতে! তাই বলি, খবরদার ঢেউ দেখে, সংসারের হাজার তুফান দেখেও, মনের হাজার দৌর্বল্য হলেও কখনই হালটী ছাড়বেন না ও কখনও তাঁকে ডাকতে

ছাড়বেন না—তা তোতাপাখীর মতন মুখের বাহ্যিক ডাকাই হউক, আর সরল ভক্তের মতন আন্তরিক ডাকই হউক, ডাকতে ছাড়বেন না। একটা নিয়ম ক'রে, যে রোজ এত ক'রে নিশ্চয়ই জপ করিব, এতটা জপ না ক'রে ভাত খাবই না। এই রকমের কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া মনকে তোয়ের করিয়া লউন। অনেকে তো অনেক বিদ্যা শেখে, অনেক রকমের কাণ্ড বা কৌশল শেখে, আপনি না হয় একটা সখের জন্য বা খাতিরে পড়ে একটা নতুন যা হউক কিছু (মনের সঙ্গে লড়াই করা বিদ্যা) শিখলেন। এই রকম বাহ্যিক নিয়ম বেঁধে কাজ করতে করতেই অন্তরে প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে থাকে। আপনি এক বৎসর, যে রকম বলি, ঠিক ২ সেই রকম নিয়ম বেঁধে জপ-ধ্যান করতে থাকুন দিকিন, দেখি কেমন আপনার ভিতর প্রবল ইচ্ছা না আসে!

আপনার পূর্বজন্মের সুকৃতি অল্প স্বল্প আছে বেশ জানিবেন; একেবারে কিছু নাই তা আদৌ মনে করিবেন না। আর মহাত্মাদের কৃপার কথা লিখেছেন; মহাত্মাদের কৃপার [দোহাই] দেইনি, স্বয়ং ভগবানের কৃপা আসবে, আমি যা বলি তাই করুন দেখি!

এ সকল দেশে স্বামীজির নামে সব উন্মত্ত হয়ে ওঠে। স্বামীজিকে এত ভক্তি করে। আমার তো প্রায় আহার নিদ্রা একরকম বন্ধ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না; এত হুদো ২ লোক আসছে। আগামী ১৫ই নভেম্বর জাহাজে উঠিব। জাহাজের নাম Beyern—তাহাতে ক'রে জাপান পৌছিব ৫ই ডিসেম্বরে। পরে সেখান থেকে American Maru নামক জাহাজে ১৭ই ডিসেম্বর চোড়ে ৩রা জানুয়ারীতে সানফ্রানসিসকোতে পৌছিব। তা হলেই এ যাত্রার নিশ্চিন্তি। তারপর সেখানে নেমে আবার আর একরকম পালা জুড়তে হবে। সে পালা যে এখন কেমন ধারা লইতে পারিব তা জানি না; বোধ হয় সে পালা যে একবার শুনিবে, সে অমনি কানে আঙুল না দিয়ে দে টেনে দৌড় দেবে আর কি, দেখছি।

আপনি নাকি উদ্বোধনে মাসিক ১০৲ টাকা ক'রে ঘুস দিতে ইচ্ছে করেছেন? ভাল! এ ভূত আবার ঘাড়ে চাপল কেন? কে চাপালে?

আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ আপনারা সকলেই জানিবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

ত্রিগুণাতীত

(২)

40, Steiner Street
San Francisco, California U.S.A.
The 4th March, 1903

প্রিয়তম পূর্ণবাবু—

নাঃ আর চুপ করে থাকতে পারিনে। আমারই হার হয়েছে। আমিই না হয় আগেই পত্র লিখছি। আপনি বোধ হয় আমার সম্বন্ধে মনে করেছেন যে এখানে এসে আমি বড়লোক হয়েছি—আর বড় একটা পত্র টত্র লিখবো না কারুকে; তাই মনে করে বুঝি পত্র টত্র আজও আমাকে লিখছেন না?

আপনাদের ফটোগ্রাফদিগকে খুব কোসে আমেরিকা দেখাইতেছি। সমুদ্র খুব কোসে দেখাইয়াছিলাম। জাপানও দেখাইয়াছিলাম।

এখানে আমাকে যার পর নাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইণ্ডিয়াতে আমি কিই বা খাটতুম; তার চেয়ে ঢের বেশী এখানে খাটতে হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে ৫।৭টা করিয়া বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। তাছাড়া এখানকার রাজ্যির লোকের পত্রাদির জবাব দিতে হয়; এবং লোকজনের সঙ্গে ফেরৎ দেখাশোনা করতে হয়; ও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে দেখা দিবার জন্য ঘরে হাজির থাকতে হয় ও তাদের সঙ্গে দুদো ২ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাছাড়া আঠারবার আঠার রকমের পোষাক বদলাও।

যা হক, লোকজন সকলেই খুব সন্তুষ্ট হচ্ছে। কার্য্য মন্দ হচ্ছে না।। আমি সেই রকমই নিরামিষ আহারী আছি। মাছ মাংস ডিম বা চর্ব্বি আদৌ স্পর্শ পর্য্যন্তও করি না। চেহারা আধখানা হয়ে গেছে। তার উপর জ্বর মহাশয় প্রত্যহই পূর্ব্বেকার মতই আসতে আজও ভোলেন নি।

আপনারা বোধ হয় মহোৎসবে খুব আনন্দ করেছিলেন। এখানে আমি তিথিপূজার দিনরাত্রি ও তার পূর্ব্বদিনে দুপুরবেলা হতে নির্জ্জলা উপবাস করেছিলাম। এখানে আরও অনেকে ঐরূপ করেছিল। সেই উপবাসের উপর ৩টা বড় বক্তৃতা ও ৪টা ছোট বক্তৃতা দিয়াছিলাম। দিনরাত্রিই ঠাকুরের কথা ও চর্চ্চা হইয়াছিল। গুটি দুই বক্তৃতা এত ভাল হইয়াছিল যে সকলেই প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। বক্তৃতা শুনিতে জনকতক ২০ মাইল দূর হইতে আসিয়া এই শহরে অন্য বন্ধুদের বাটীতে ছিল। সকলই ঠাকুরের ইচ্ছা।

আপনারা কে কেমন আছেন লিখবেন। এবং আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা সকলে জানিবেন।

সতীশবাবু ও সুরেনবাবু বোধ হয় এতদিনে আমাকে ভুলে গেছেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

ত্রিগুণাতীত

পুঃ আমার ঠিকানা বদলাইয়াছে। উল্লিখিত নূতন ঠিকানায় লিখিবেন। ইতি—

ত্রিঃ

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আবির্ভাবতিথি:

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী, ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৮৯

(৭ ডিসেম্বর, ১৯৮২)।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন*

কেবলমাত্র সন্তোষ মন্ত্রটিই প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের নিশ্চিতভাবে, নিরাপদে নিয়ে যায়। ভগবান্ মঙ্গলময়—তিনিই সব কিছু করেন। কাজেই তিনি ভাল ছাড়া মন্দ করতে পারেন না। সব ধর্ম এই শিক্ষাই দেয়। এই শিক্ষা মেনে চল—মনের শান্তি আপনিই আসবে। আমরা কারো মনে বৈরাগ্য জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারি না। সকলের উদ্দেশ্য সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসিনী হওয়া নয়। প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রভু তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ ক'রে যাও। যারা শান্তি দিতে পারে, তারা ধন্য, কারণ তারাই তো ঈশ্বরের সন্তান ব'লে অভিহিত হবে।

*

বিপদে ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে প'ড়ো না। পাণ্ডবজননী কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাকে দুঃখ দিয়েই ঘিরে রাখেন, কেন না দুঃখেই তো তাঁকে বেশী স্মরণ হয়।··· যৌবনে ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই প্রবল হ'য়ে ওঠে। তার জন্য তোমাকে অবশ্যই শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে—সেগুলি যাতে তোমার উপর আধিপত্য করতে না পারে। কামাসক্তি যুবকদের প্রধান শত্রু। সব নারীকেই জগন্মাতার বিভিন্ন রূপ ব'লে মনে করবে। নিজেকে কায়িক ও মানসিক কর্মে নিবিষ্ট রেখো এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তোমার মন সর্বদা স্থির রেখো। মনকে নিরন্তর ভগবানে নিমগ্ন রাখা যদি সম্ভব নাও হয়, তবু তাকে কোন একটা বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা সব সময়েই বুদ্ধিমানের কাজ। মন এইভাবে তৈরী হ'য়ে উঠলে তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে স্থির হ'য়ে থাকাটা তেমন কঠিন হবে না। জানবে যে, তুমি ঈশ্বর-স্বরূপ এবং তাই ইন্দ্রিয়গুলিরও প্রভু। তুমি কেন ইন্দ্রিয়গুলিকে তোমার উপর প্রভুত্ব করতে দেবে? দুর্বল লোক কুলোকের পাল্লায় যেমন পড়ে, তেমনি কুপ্রবৃত্তির ফাঁদেও পড়ে। মানসিক দুর্বলতাও শারীরিক দুর্বলতার মতো একই রকম ক্ষতিকর।

* * *

গীতার কয়েকটি শ্লোক তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—যা অত্যন্ত বিষাদক্লিষ্ট মানুষের মনেও সান্ত্বনা এনে দেয়, তাকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে, আর তার হতাশা দূর ক'রে দেয়। অর্জুন যখন শ্রীভগবানের কাছে জানতে চাইলেন যে, কোন লোক যদি সাধনমার্গে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে, তাহলে তার ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় কূলই নষ্ট হয় কিনা; তখন ভগবান্ তার উত্তরে বললেন, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'—হে প্রিয় সখা! যে সামান্যতম শুভানুষ্ঠান করে, পরের জীবনে তার কোন দুর্গতি হয় না। ধার্মিক সদাচার-সম্পন্ন কারও গৃহে সে জন্মগ্রহণ করে এবং পবিত্র ভাগবত-জীবন শুরু করে। সুতরাং মুহূর্তের জন্যও যদি তোমার মনে কোন সদ্ভাবের উদয় হয়, বা তুমি কোন সচ্চিন্তা কর, তা হ'লে সেটা অবশ্যই তোমার পক্ষে মহতী লাভ। কখনও হতাশায় ভেঙে পড়ো না। কারণ স্বয়ং ভগবান্ই প্রতিটি মানব-সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' হে অর্জুন! সর্বসমক্ষে প্রচার কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিপন্ন বা বিনষ্ট হয় না।

* মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠ হইতে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'Consolation' নামক পুস্তিকা হইতে অনূদিত।—সঃ

সংসারে মানুষ স্বভাবতঃ যে-সমস্ত প্রতিকূলতায় পড়ে ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, তেমনি অবস্থায় আমরাও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হাজির হতাম, তখন তিনি এই ব'লে আমাদের সান্ত্বনা দিতেন, 'কামারশালার নাই-এর মতন হবি। সারাদিন তার উপর হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু সে ধীর, শান্ত ও নির্বিকার। সংসারে যখন তখন তোদের উপর আঘাত আসতে পারে, কিন্তু কামারশালার নাই-এর মতোই তোরা নির্বিকার থাকবি। তোদের ধর্মবিশ্বাসে তোরা থাকবি অটল এবং সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দয়া ও করুণার উপর দৃঢ় প্রত্যয় রাখবি। তাহলে সংসারের দুঃখ-বিপদ ঝড়-ঝঞ্ঝা তোদের আর বিচলিত করতে পারবে না। তোদের হয়রান করতে গিয়ে নিজেরাই হয়রান হবে।' গীতাকে তোমার নিত্যসঙ্গী ক'রো এবং সর্বদা আনন্দে থেকো। তোমার আত্মা নিত্য মুক্ত ও আনন্দময়। দুঃখ অথবা হতাশাকে যেন কখনও তোমার আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দিও না।

* * *

তোমার চেষ্টায় সফল হচ্ছ না, এজন্য অনুযোগের প্রয়োজন নেই। প্রায় সকলেরই এইরকম হয়। যাঁরা ইতিমধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছেন, এমন কয়েকজন মহাত্মাই শুধু নিশ্চয় ক'রে বলতে পারেন, তাঁরা কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ শুদ্ধ। মানুষ মাত্রেই ভুল ক'রে থাকে। মাত্র একটি বিষয়ে আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে,—কখনও তাঁকে—জগৎ-প্রভুকে ভালবাসতে যেন ভুল না হয়। তাই বলছি, উৎসাহে বুক বাঁধো। যদি মাঝে মাঝে পড়েও যাও, আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। হাঁটতে শেখার আগে সব শিশুই শত-সহস্রবার পড়ে যায়। আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, যারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, ভগবান্ তাদেরই সাহায্য করেন।

এটা স্থির জেনে রেখো, একজন যত মন্দই হোক্ না কেন, সারা পৃথিবীর লোকও যদি তাকে পরিত্যাগ করে, তবুও ভগবানের ভালবাসা একজন ধার্মিক ব্যক্তির উপর যতটা গভীর, ঠিক ততটা তার উপরও থাকে। সন্তান যদি একজন খুনী হয়েও ওঠে, মায়ের ভালবাসা কিন্তু তার জন্য কিছুমাত্র কমে না। ভগবানের ভালবাসা ও করুণা, সমষ্টি মাতৃহৃদয় অপেক্ষাও অনেক বেশী। তাঁর স্নেহ-করুণায় কখনও বিশ্বাস হারিও না। নিকৃষ্ট পাপীদের প্রতিও তিনি অনুক্ষণ কৃপাদৃষ্টি রাখছেন। এই কথা জেনে তুমি আনন্দে থেকো।

তুমি নিজের উপর অসন্তুষ্ট হ'য়ো না। তুমি তো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি; তাই তোমার নিজের উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া। এটা কি খারাপ নয়? তাই নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। কারণ তুমি ঈশ্বরের সন্তান, এবং তিনি তোমাকে সৃষ্টি ক'রে কোন ভুল করেননি, যেহেতু তিনি সকল ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে। সুতরাং, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দিয়ে এমন কোন কাজ করিয়ে নেবেন, যার জন্য তিনি তোমাকে এই সংসারে নিয়ে এসেছেন। ভগবানের প্রতি তোমার ভালবাসা যত বৃদ্ধি পাবে, ততই তোমার কামাসক্তি হ্রাস পাবে। সর্বদা ন্যায় পথে চলার চেষ্টা কর। সত্যনিষ্ঠ ও সদ্ভাবাপন্ন হও এবং ভোগ-সুখের বাসনা মনের মধ্যে রেখো না। এই যেন তোমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়। কঠোর সংগ্রাম কর। এই সংগ্রাম চলাকালে যদি তোমার পদ-স্খলন হয় এবং তোমাকে বার বার পড়েও যেতে হয়, তাতেও বা কি এসে যায়? আবার উঠে

দাঁড়িয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। নিশ্চিত জেনো, শেষে তোমার জয় হবেই। যে পর্যন্ত না তুমি পূর্ণতা লাভ ক'রছ, অর্থাৎ নিজে যা হ'তে চাও তা না হচ্ছ, সে পর্যন্ত তুমি কখনও সংগ্রাম থামিও না। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন এবং তোমাকে নিরাপদে ও সুস্থ রাখুন।

জীব মাঝে শিব

শ্রীকার্তিকচন্দ্র ঘোষ

মঠ-মন্দির-গীর্জা-মসজিদ খুঁজে খুঁজে হয়রান,
অপার মহিমা করুণাসিন্ধু কোথা তুমি ভগবান্?
মঠে-মন্দিরে মাথা কুটে কুটে কেঁদেছি কত যে প্রভু,
পূজা যে দিয়েছি পেতে যে তোমারে পাইনি তবু যে কভু!
পাথর-প্রতিমা পাষাণ রয়েছ দেখনি তো তুমি চেয়ে,
কান্না শুধু যে বৃথাই হয়েছে কোথা পাব তবে যেয়ে?
দাও বলে দাও ত্রিতাপ সিন্ধু অপার করুণাময়,
মানুষ ভুলেছি শুধুই খুঁজেছি তোমায় জ্যোতির্ময়।

কে যেন কহিল মনে দিয়ে নাড়া হঠাৎ কখন এসে,
ভুলে ভুলে ভরা তুমি যা করেছ মানুষ ভুলেছ শেষে?
মঠ-মন্দির সব ছেড়ে দাও পাথর-প্রতিমা সব,
মানুষের মাঝে মর মাথা কুটে জীব মাঝে তোল রব।
জীব যত আছে যাও তার কাছে তার তরে কিছু করো,
প্রাণ যায় যাক্ প্রাণের প্রতিমা তারে নিয়ে তুমি গড়ো।
'যেথা আছে জীব তার মাঝে শিব' সেবো তুমি সেইখানে,
প্রাণের ঠাকুরে পরশ পাবে তো সেই সে প্রেমের টানে।

মঠ-মন্দির গেল সব মুছে মানুষের পাশে আসি,
করুণ কাতরে কহিল সবারে এসো সবে ভালবাসি।
হিংসা ও দ্বেষ ছেড়ে দিয়ে শেষ মানুষের পাশে আসা,
বুঝিল যে খাঁটি সেইতো সঠিক ভগবানে ভালবাসা।

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[ ]

সুইট্‌জারল্যাণ্ড

এবার সুইট্‌জারল্যাণ্ড। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জেনিভাতে আমাদের একটা কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিত্যবোধানন্দ তিনি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সেখানে আছেন তিনিও দক্ষিণ-ভারতীয়, কিন্তু খুব ভাল ফরাসী ভাষা জানেন। 'অস্তিত্ববাদ' (Existentialism) সম্বন্ধে তিনি অনেক পড়াশোনা করেছেন, ঐ বিষয়ে বইও লিখেছেন। ভাল লেখেন, ভাল বক্তৃতাও করেন। ফ্রান্স ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের' পণ্ডিতমহলে তাঁর খুব যাতায়াত আছে। তাঁর কোন সাধু-সহকর্মী নেই। একা আছেন ওখানে। আমি বিদেশ যাবার আগে ভারতবর্ষ থেকেই তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম: 'আমি ১লা ডিসেম্বর তোমার ওখানে যাব।' উনি উত্তর দিলেন: 'আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি এয়ারপোর্টে আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রব ॥ মাঝখানে নানা ব্যস্ততায় আমি আর কোন যোগাযোগ তাঁর সঙ্গে করতে পারিনি। ওদেশে গিয়ে আমি তো ঘুরছি—তাই তাঁর কাছেও আর চিঠি লিখতে পারিনি। কিন্তু হঠাৎ একজন জুটে গেলেন, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে একটা খবর পাঠাতে পারলাম। এই ভদ্রলোকের নাম অনিল ঝা—মৈথিলী। বহু বছর তিনি বিলেতে আছেন, টেলিফোনে কাজ করেন। আমার সঙ্গে তাঁর আগে কোন পরিচয় ছিল না। বার্লিনে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ টেলিফোনে যোগাযোগ হয়। তিনিই নিত্যবোধানন্দের কাছে আমার যাওয়ার খবর পাঠান।

বার্লিন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট হ'য়ে আমি জেনিভায় পৌঁছলাম ১লা ডিসেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ। খুব শীত চারদিকে বরফ পড়ছে। সমস্ত জেনিভা যেন একটা সাদা চাদরে ঢাকা। প্লেন ঘুরে ঘুরে যখন নীচে নামছিল—উপর থেকে শ্রীনগরের মতো লাগছিল। সেই ছোট-ছোট পাহাড় আর বড় বড় হ্রদ। আমার তো পরনে সেই গেরুয়া জাব্বাজোব্বা। সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মালপত্র নিয়ে ট্রলিতে ক'রে ঠেলতে ঠেলতে যাচ্ছি আর চারদিকে তাকাচ্ছি—আমাদের স্বামীজী আছেন কিনা। কিন্তু চারদিকে সবই দেখছি সাহেব সুবো, ঐ-দেশী পোশাক পরা। গেরুয়া-পরা কাউকে আর দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ সাহেবী পোশাক-পরাই একজন এসে মাথার টুপী খুলে টিপ্ ক'রে আমাকে একটা প্রণাম। আমি তো চমকে গেছি। তাকিয়ে দেখি নিত্যবোধানন্দ। তিনি বলছেন: 'মহারাজ, আপনাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। আর আমি এমন হতভাগ্য যে, কোট-প্যাণ্ট পরে আছি। শীতের জন্য বাধ্য হ'য়ে আমাকে এই পোশাক পরে থাকতে হয়। সাধু হয়েও আমি গেরুয়া পরতে পারি না।'—ইত্যাদি ব'লে খুব আফসোস করছেন। আমি বললাম: 'তাতে কি হয়েছে? যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।' আগে আমার ভাবতে ভাল লাগতো না যে, আমাদের স্বামীজীরা গেরুয়া না পরে সাহেবী পোশাক পরে পাশ্চাত্য দেশে কাজ করবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে বুঝলাম, সাহেবী পোশাক ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রথম কথা হচ্ছে, ওসব দেশে এত শীত যে, আমাদের দেশের পোশাক একেবারে অচল। ঢিলে-ঢালা পোশাক চলবে না, আঁটোসাঁটো পোশাক পরতে হবে।

আমাদের দেশেও যে-সব অংশে শীত বেশী সেখানকার লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে। তাছাড়া আমরা পোশাক সম্বন্ধে যতটা উদার, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা কিন্তু ততটা নয়। তারা পোশাক দেখে মানুষকে বিচার করে। আমাদের পোশাক তাদের কাছে একেবারে অগ্রাহ্য। আমি লক্ষ্য করেছি—আমার পোশাক দেখে ওদেশে অনেকে মুচকি-মুচকি হাসত। ভাল সমাজে মিশতে গেলে সুরুচিসম্মত পোশাক পরতে হবে। 'সুরুচিসম্মত' মানে তাদের মতে যা সুরুচিসম্মত। এখন তবু পোশাকের বৈচিত্র্য দেখে পাশ্চাত্যবাসী অনেকটা অভ্যস্ত, কিন্তু স্বামীজীর সময় তারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিল। এজন্য স্বামীজীকে কত হেনস্থা হ'তে হয়েছে।

তিনি (স্বামী নিত্যবোধানন্দ) একটা গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। 'জেনিভা-আশ্রমের কোন গাড়ী নেই, এক ভক্তের গাড়ী। তাতে ক'রে তিনি আমাকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। শহর থেকে বেশ কিছুটা বাইরে আমাদের আশ্রম। একটা বড় সুন্দর লেকের ধারে সুন্দর একটা কাঠের বাড়ী। এ-ধরনের বাড়ীকে ওদেশে 'শ্যালে' (Chalet) বলে। অনেকটা আমাদের বাংলো ধরনের বাড়ী। যেমন নির্জন, তেমন শান্ত। খুব মনোরম পরিবেশ। আর অপূর্ব দৃশ্য! সবচেয়ে ভাল লাগত রাত্রিতে। আমাকে যে-ঘরে থাকতে দিয়েছিল, তাতে বিরাট বিরাট কাঁচের জানলা। জানলা বন্ধ থাকলেও বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যায়। জানলা দিয়ে রাত্রে দেখতাম, হ্রদের ওপারের শহরটা আলোয় ঝলমল করছে আর হ্রদের জলে তার ছায়া পড়েছে। সে দৃশ্য দেখে চোখ ফেরাতে পারতাম না।

আশ্রমে পৌঁছেই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। আশ্রমে স্বামী নিত্যবোধানন্দ ছাড়া অন্য কোন সাধু নেই, তবে দুজন বয়স্কা মহিলা আশ্রমের দেখাশোনা করেন। একজনের নাম শ্রদ্ধা (Miss Goote), অন্যজনের নাম আমার মনে নেই। তাঁর নাম মনে নেই, কারণ তাঁর সঙ্গে একবার মাত্র অল্প সময়ের জন্যে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি যেন কোথায় গেলেন কয়েকদিনের জন্যে—বোধহয় অফিসের কাজে। উভয় মহিলাই বাইরে কাজ করেন। বাইরে কাজ করলেও আশ্রমের সমস্ত কাজ তাঁরা দুজনে ভাগ ক'রে করেন। বাজার-হাট, রান্নাবান্না, ধোয়া-মোছা, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন ইত্যাদি কাজ কম নয়। অন্য মহিলাটির কথা বলতে পারব না, শ্রদ্ধাকে দেখতাম সব সময়ই ব্যস্ত। ব্যস্ত কিন্তু হাসিমুখ। সবচেয়ে ভাল লাগত—চলাফেরা করছে, কিন্তু পায়ের কোন শব্দ নেই। কাঠের বাড়ী, একটু শব্দ হবারই কথা, কিন্তু এত সাবধানে চলাফেরা ক'রত যে, আমি আদৌ টের পেতাম না। তাকে বলেছিলাম: 'ভোর ছটায় আমাকে একটু চা দিও।' ঠিক ছটায় চা এনে দিত। নিঃশব্দে চা রেখে যেত, আমি টেরও পেতাম না। সকাল ও দুপুরের খাওয়ার সময় সে থাকত না, সে তখন থাকত তার অফিসে। ঐ সময়টায় সে সমস্ত তৈরী ক'রে গুছিয়ে রেখে যেত, আমাদের বেড়ে নিতে হ'ত। স্বামী নিত্যবোধানন্দই সব করতেন। আমি করতে চাইতাম, কিন্তু তিনি দিতেন না। সকাল ও দুপুরের খাওয়া একটু সাদাসিধে হ'ত, কিন্তু রাত্রে শ্রদ্ধা নানারকমের রান্না ক'রে খাওয়াত। অফিস থেকে ফেরবার সময় সে বাজার ক'রে আনত। এক-একদিন এক-এক রকমের রান্না। প্রত্যেক দেশেরই রান্নার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আমার ধারণা ছিল, পাশ্চাত্য দেশের সর্বত্র বুঝি

'স্যুপ্' দিয়ে খাওয়া আরম্ভ হয়। দেখলাম, একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া আর কোথাও স্যুপ্ নেই। আমাদের দেশে যেমন স্যুপ জলবৎ তরলং, ইংলণ্ডে তা নয়। বেশ ঘন, নানারকমের সব্জি থাকে। সুইট্জারল্যাণ্ডে মাছ বা মাংসের দুটো জিনিস, আর তার সঙ্গে কিছু সব্জি। স্যালাডও নয়, সব্জি দিয়ে তৈরী কোন জিনিস। মিষ্টিও (Sweet dish) কিছু থাকত না। রুটি থাকত, জ্যাম-জেলি থাকত, ফলও থাকত। চিজ্ অবশ্যই থাকত। সব শেষে কফি। ইউরোপের অনেক দেশের খাওয়া খেলাম। ওসব দেশের খাওয়া পুষ্টিকর নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বাদের দিকে বৈচিত্র্য যেমন বাঙালীর খাওয়ায়, তার তুলনা কোথাও নেই। সাধারণ শাক-পাতা দিয়ে যে-রান্না আমাদের বাঙালী মায়েরা করেন, তার ধারে-কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। একবার একজন ছাত্র আমাকে বলেছিল: 'ইউরোপের খাওয়া বড় একঘেয়ে। প্রথম ছ-মাস বড় কষ্ট হয়, পরে অবশ্য গা-সওয়া হ'য়ে যায়।'

জেনিভা আশ্রমের ঠাকুরঘরটি আমার বেশ ভাল লাগল। এর তদারকি করার ভারও শ্রদ্ধার ওপর। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় সে-ই ঝাড়-পোঁছ করে, ধূপ জ্বালায়। সন্ধ্যায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে আবার 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' গায়—আর কেউ থাকুক, আর না থাকুক। যেন ঠাকুরকেই শোনাচ্ছে—এই ভাব। শ্রদ্ধা আবার এই আশ্রমের সম্পাদিকাও। বোধহয় সে হিসেবেও তার কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। যেমন হিসেব রাখা, চিঠিপত্র লেখা, অতিথি-অভ্যাগত এলে আপ্যায়ন করা ইত্যাদি। বড় চৌকস মেয়ে।

যে-কয়েকদিন জেনিভাতে ছিলাম, পশ্চিম জার্মানি থেকে কেউ না কেউ প্রতিদিনই ফোন ক'রত: 'স্বামীজী, তুমি কেমন আছ? রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছে তো? কি কি জায়গা দেখলে?'—ইত্যাদি। আমার তো ধারণা ছিল, আমরা বাঙালীরাই চটপট অন্যের মায়ায় পড়ে যাই, খুব তাড়াতাড়ি সবাইকে ভালবেসে ফেলি। এখন দেখলাম, মানুষ সব জায়গাতেই একরকম। মানুষকে ভালবাসতে মানুষ ভালবাসে।

জেনিভা খুব বড় শহর নয়। শহরের দুটি ভাগ। নতুন জেনিভা আর পুরানো জেনিভা। নতুন জেনিভা সুন্দর—সাজানো গোছানো। পুরানো জেনিভা ঠাসা—সাজানো না। আমাকে স্বামী নিত্যবোধানন্দ কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন, আবার একজন বাঙালী ভদ্রলোকও কিছু দেখিয়েছেন। সমস্ত জেনিভা শহরটা আমি প্রায় বার তিনেক ঘুরে দেখেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীতে যাতে আর যুদ্ধ না হয়, তার জন্য 'লীগ অব নেশন্স্' করা হয়েছিল। তার প্রধান কার্যালয় ছিল এই জেনিভাতে। সে-সব বাড়ীঘর রয়েছে। এখনও 'ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অরগ্যানাইজেশন'-এর অফিস ওখানেই রয়ে গেছে বিরাট বিরাট সব বাড়ী। জেনিভা একটা 'ইণ্টারন্যাশন্যাল সিটি'। স্থানীয় লোক এখানে কম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এখানে আছে। প্রচুর ভারতীয়ও দেখতে পেলাম। কেউ কেউ আমাকে দেখে একটু মুচ্কি হাসল, আমিও হাসলাম। ঐ পর্যন্তই, আলাপ করতে কেউ এগিয়ে এল না। প্রকাণ্ড লেক—মাইলের পর মাইল চলে গেছে। তার ধার বরাবর রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ী ক'রে ওঁরা আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। বড় ভাল লাগত। রাস্তার দু-ধারে সারি সারি গাছ। শীতকাল, তাই পাতা নেই কোন। তাও কত সুন্দর! আমি ভাবছিলাম: যখন পাতা থাকে, ফুল থাকে, তখন আরও কত সুন্দর দৃশ্য হয় ঐ রাস্তার!

জেনিভাতে 'স্কীইং' একটা দেখবার জিনিস। আমি একদিন গিয়েছিলাম 'স্কীইং' দেখতে।

শীতকালে পাহাড়গুলি সব বরফে ঢেকে যায়। তখন পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লোক আসে বরফের উপরে 'স্কীইং' খেলতে। বরফের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে তারা এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে চলে যায়। যতদূর চোখ যায় বরফ পড়ে সাদা হ'য়ে রয়েছে। তার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে যেন তারা যাচ্ছে। আমি যখন ছিলাম তখন সবেমাত্র স্কীইং সীজ্‌ন্ শুরু হচ্ছে। নানা দেশ থেকে লোক আসতে শুরু করেছে। চারদিকে বন আর পাহাড়। বনের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী—সে-সব বাড়ীতে তারা ভাড়া দিয়ে থাকে। হোটেলে হোটেলে ভীড়। ফলে মানুষকে খুব কষ্ট ক'রে থাকতে হয়। কিন্তু তবুও তারা আসে 'স্কীইং' করতে। এই সময়টা গাড়ীতে বরফ সরানোর যন্ত্রপাতি রাখতে হয়। কেন না, অনেক সময় গাড়ী বরফে প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। তখন ঐ যন্ত্রপাতি দিয়ে বরফ সরাতে হয়। স্কীইং দেখতে যাবার সময় দেখলাম, কয়েকটা গাড়ী বরফে একেবারে বসে গেছে। আমার একটু ভয় করছিল। কারণ, কোন জায়গায় হয়তো গর্ত আছে, কিন্তু তার উপর বরফ পড়ায় বোঝার উপায় নেই যে, সেখানে গর্ত আছে। সেই জায়গা দিয়ে যদি গাড়ী যায়, তাহলে তো দুর্ঘটনা হবে। এবং এই ধরনের দুর্ঘটনা হয়ও কিছু কিছু। চারপাশে বনজঙ্গল দেখে আমি নিত্যবোধানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এখানে বন্য-জন্তু কি কি আছে?' উনি বললেন: 'বন্য-জন্তু এখনও পর্যন্ত প্রায় কিছুই নেই। শীত আর একটু পড়লে ধীরে ধীরে ভালুক আব নেকড়ে বাঘ আসতে শুরু করবে।'

যেখানটায় স্কীইং করতে দেশ-বিদেশের লোক আসে, তার কিছুদূরে ফ্রান্সের সীমানা। ঐ পথ দিয়েই নেপোলিয়ন তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসেছিলেন। তখন ঐ পথ খুব দুর্গম ছিল, এখন অবশ্য ভাল পথ, গাড়ী চলাচল করতে পারে। অনেকে ঐ পথ দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত ক'রে থাকেন। বিপদও আছে অনেক। রাস্তায় গাড়ী খারাপ হ'লে সহজে সাহায্য মিলবে না। এই রাস্তা প্রায়ই বরফে ঢাকা থাকে, আর তার ফলে দুর্ঘটনাও অনেক ঘটে। বরফের জন্যে নেপোলিয়নকে অনেক ভুগতে হয়েছে, তাঁর পরাজয়ের বড় কারণ এই বরফ বলা যেতে পারে। রাস্তাঘাট এমন বরফে ঢাকা ছিল যে, সৈন্য বা যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ ক'রে নিতে হ'ল নেপোলিয়নকে। তাই লোকে ঠাট্টা ক'রে বলে 'জেনারেল উইণ্টার'-এর (General Winter) কাছে নেপোলিয়ন হেরে গিয়েছিলেন। ঠিক একই কারণে হিটলারও হেরে গেলেন রাশিয়ার কাছে। জেনিভা শহরে অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে ব'লে শহরটাও আন্তর্জাতিক হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ বহু দেশের মানুষ এদেশে কাজ করতে আসে। কেউ কেউ কাজ করতে এসে শেষ পর্যন্ত এদেশের মমতায় জড়িয়ে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এরকম একটি দক্ষিণ-ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি কর্ণাটকের লোক, প্রায় ত্রিশ বছর ঐদেশে আছেন। একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দেশে আর ফেরেননি, ফেরবার ইচ্ছেও নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে দেশে বেড়াতে আসেন। অবিবাহিতা সঙ্গে এক বোন আছেন, তিনিও বিয়ে করেননি। দুজনে একটা ফ্ল্যাট কিনে বাস করছেন। বেশ সুখে ও আরামে আছেন, মনে হ'ল। আমাকে ও স্বামী নিত্যবোধানন্দকে নিয়ে গেলেন কফির নেমন্তন্ন ক'রে। বললেন: 'সুইট্‌জারল্যাণ্ড এমন দেশ যে, যে-কোন দেশের মানুষ এসে এখানে বাস করতে পারে, তার

কোন অসুবিধে হবে না।' মনে প'ড়ল, অনেক রাজনৈতিক নেতা দেশ থেকে পালিয়ে এসে এখানে বসবাস করেছেন অতীতে। অনেক ইংরেজ কবিও এসে এখানে বাস ক'রে গেছেন। যাঁরাই অজ্ঞাতবাস করতে বা শান্তিতে থাকতে চান, এদেশই তাঁদের উপযুক্ত স্থান। বিখ্যাত সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ জীবনের শেষ কয়-বছর এখানেই এক ভিলাতে কাটিয়েছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে যে অনবদ্য বই লিখেছেন, তা দিয়ে আমাদের চিরঋণী ক'রে রেখেছেন। স্বামী নিত্যবোধানন্দের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। সম্প্রতি রোমাঁ রোলাঁর 'ভারতবর্ষ' নামে যে-ডায়েরি ছাপা হয়েছে, তাতে দেখা যায়—আমাদের দুজন সাধু সম্বন্ধে তাঁর কিছু বক্রোক্তি রয়েছে। তার কি কারণ হ'তে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করলাম। বিশেষ ক'রে একজনের সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করা আছে, তা আদৌ খাটে না। তাই আমাদের উভয়েরই ধারণা, বার্ধক্যের জন্যে বোধহয় রোমাঁ রোলাঁ শেষের দিকে সন্দিগ্ধ ও অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়েছিলেন।

নিত্যবোধানন্দ কথায়-কথায় পাশ্চাত্য সমাজের অনেক সমস্যার কথা বললেন। পাশ্চাত্য দেশে প্রাণপ্রাচুর্য আছে, কিন্তু সব কিছু যেন উদ্দেশ্যহীন। একটা স্থিতিস্থাপকতার অভাব। কিছু একটা ধরবার চেষ্টা করছে, পারছে না। প্রত্যেক মানুষকে আলাদা ক'রে দেখলে দেখা যাবে, তার অন্তরটা ক্ষত-বিক্ষত। অথচ আপাত-দৃষ্টিতে তার কোন অভাব নেই, যা হ'লে মানুষ সুখী হ'তে পারে, তার তা আছে।

নিত্যবোধানন্দ ইউরোপের বহু বিদ্বৎসমাজে যাতায়াত করেন। বস্তুতঃ জেনিভাতে তাঁর কাজ-কর্ম খুব কম। কথায়-কথায় বললেন: 'আশ্রমে ভারতীয়রাও আসে না। আসে বিয়ে অথবা সন্তানের জন্মের পরে। তখন এসে বলে 'মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ ক'রে দিন'—আমি যেন তাদের পুরুত-ঠাকুর।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 'তখন তুমি কি কর?' 'আমি আর কি ক'রব? শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে বলি তাদের একটু আশীর্বাদ করো। তাদের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক এইটুকু।' একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমি জেনিভা-আশ্রমে পৌঁছে দেখি, আমার জন্যে একটা নিমন্ত্রণ-পত্র অপেক্ষা করছে। নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ করেছেন জেনিভাস্থিত এয়ার ইণ্ডিয়ার প্রধান। এঁর নাম যতদূর মনে পড়ছে শ্রীযুত শান্তনু মুখোপাধ্যায়। ইনি এবং এঁর স্ত্রী উভয়েই মঠের দীক্ষিত ভক্ত, ভারি হাসিখুশি। স্বামী নিত্যবোধানন্দ ও আমি ছাড়া আরও দশ-বারো জন অতিথি ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ও ছিলেন। তাঁরা যখন শুনলেন আমি নানা জায়গায় বক্তৃতা ক'রে বেড়াচ্ছি, তখন তাঁরা স্বামী নিত্যবোধানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন জেনিভাতে কেন কোন বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়নি। ব্যবস্থা করা হয়নি ব'লে যেন তিনি অন্যায় করেছেন! আমি তখন বললাম: 'আমি মাত্র তিন-চার দিনের জন্যে এসেছিলাম, বক্তৃতা না থাকাতে বেশ আরাম বোধ করছি।' এক ভদ্রলোক যেন কিছুতেই আর সন্তুষ্ট হ'তে চান না। কেবলই এক কথা: 'একটা সভার আয়োজন করা উচিত ছিল, আমরা কিছু শুনতে পেলাম না।' শোনার যেন কত আগ্রহ! নিত্যবোধানন্দ পথে আসতে আসতে বলছিলেন: 'এই ভদ্রলোকেরই অনুরোধে আমি এক সময়ে আশ্রমে নিয়মিত ক্লাস শুরু করেছিলাম, কিন্তু তিনি একদিনও আসেননি!' কিন্তু মুখার্জি-দম্পতি খুব আদর-যত্ন করলেন। তাঁদের ছেলে দুটিকে দেখেও খুব ভাল লাগল। ফুটফুটে চেহারা, আর চটপটে। পাশ্চাত্য দেশে—এবং তার দেখাদেখি আমাদের

দেশেও—নৈশভোজন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলে। এর পরের দিন আমাকে রোমে যেতে হবে। এই অজুহাতে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে এলাম।

আমার সঙ্গে অনেক জিনিস বেশি হ'য়ে গিয়েছিল। উপহার! সঙ্গে আনতে গেলে প্রচুর টাকা লাগত। তাই নিত্যবোধানন্দ পরামর্শ দিলেন জাহাজে একটা বাক্স পাঠাতে। কিন্তু আবার কে গোছায়? শ্রদ্ধা ভার নিল, বললে: 'আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি। শুধু বলো কি কি জিনিস তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে।' আমি বললাম। তারপর সে লেগে গেল গোছাতে। আমার উচিত ছিল তাকে সাহায্য করা, কিন্তু ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছিল। কুণ্ঠার সঙ্গে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি ঘুমুতে গেলাম। মনটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল, কিন্তু কি ক'রব, আর বসে থাকতে পারছিলাম না। শ্রদ্ধার কিন্তু আমার চেয়েও ক্লান্ত হবার কথা। সে অফিস করেছে, রান্নাবান্না এবং আশ্রমের নানাবিধ কাজও করেছে, রাত্রে তার ঘুমের খুব প্রয়োজন ছিল, কারণ পরদিন তাকে আবার অফিস ও আশ্রমের কাজ করতে হবে।

৪ঠা ডিসেম্বর আমার জেনিভা ছেড়ে রোমে পৌঁছবার কথা। রোমে গিয়ে কোথায় উঠব, এ নিয়ে খুব দুর্ভাবনা ছিল। ভেবেছিলাম স্বামী নিত্যবোধানন্দ হয়তো কোন পরিচিত ব্যক্তিকে ব'লে দেবেন এয়ারপোর্টে এসে আমাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি তাঁর চেনাশোনা কারও নাম মনে করতে পারলেন না। ফ্রান্সের ঋতজানন্দজীও কারও নাম মনে করতে পারেননি। অথচ রোম সম্বন্ধে নানান কাহিনী দেশে থাকতেই শুনে আসছিলাম। শুনেছিলাম, রোমে চোর-বদমায়েসের উৎপাত অত্যন্ত বেশী। বিদেশী কাউকে পেলে নানাভাবে তাকে ঠকাবার চেষ্টা করে। তাই মনে বেশ একটু চিন্তা হচ্ছিল রোমে আমার এক সপ্তাহ থাকার কথা। হোটেলে উঠতে হবে ব'লে দুঃখ নেই, তবে যদি একজনও পরিচিত লোক না পাই, তাহলে কেমন খারাপ লাগে। এইসব ভাবনা মাথায় আসছিল। জেনিভাতে একদিন সকালে প্রাতরাশ খাচ্ছি, হঠাৎ স্বামী নিত্যবোধানন্দ বললেন: 'আমার কাছে কিছু ইটালির লিরা (Lira) আছে, আপনি নিয়ে যান, আপনার কাজে লাগতে পারে।' 'লিরা' ইটালির মুদ্রা। প্লেন থেকে নেমেই আমার ইটালির মুদ্রার প্রয়োজন হবে কিছু কেনাকাটা করতে, ট্যাক্সিভাড়া দিতে, টেলিফোন করতে ইত্যাদি। আমার সঙ্গে ডলার ছিল, তা এয়ারপোর্টে নেমেই ভাঙিয়ে নেব ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু যদি কিছু লিরা হাতে থাকে, তাহলে ডলার ভাঙানোর অত তাড়া থাকবে না। তাই মনে-মনে বেশ খুশী হলাম, যখন নিত্যবোধানন্দ বললেন, তিনি কিছু লিরা আমাকে দেবেন। কিন্তু তিনি দিলেন আমাকে প্রায় আশি হাজার লিরা! আমি বললাম: 'এতগুলি লিরা নিয়ে আমি কি ক'রব, এ আমার কি কাজে লাগবে?' তিনি হেসে বললেন: 'ভারতীয় মুদ্রায় এ লিরার কত দাম জানেন? বোধহয় শ-চারেক টাকা। থাক এগুলি আপনার কাছে, আপনার কাজে লাগতে পারে। আমার কাছে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।' বস্তুতঃ আশি হাজার লিরার দাম পাঁচশ টাকার কিছু কম-বেশী। এটা অবশ্য সরকারি হিসেবে, কিন্তু বাজারে এর মূল্য আরও কম।

৪ঠা ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় আমার রোমে যাবার প্লেন। নিত্যবোধানন্দ তুলে দিতে এলেন। প্লেন ছাড়তে দেরী আছে দেখে আমাকে কফি খেতে নিয়ে গেলেন। খুব ভাল কফি খেলাম। ইউরোপের সর্বত্র কফি, চা প্রায়

নেই বললেই চলে। আর কফি মানে দুধ-চিনি বিহীন কফি। দুজনে অনেক কথাই হ'ল। নিত্যবোধানন্দ একা থাকেন ব'লে বোধহয় একটু ভাবপ্রবণ হ'য়ে পড়েছিলেন। আমাকে ছাড়তেই চান না। হঠাৎ কি যেন ঘোষণা হ'ল। নিত্যবোধানন্দ বললেন: 'আপনার প্লেন ছাড়বার জন্ম প্রস্তুত, আপনাকে আর আটকিয়ে রাখতে পারব না। সাবধানে যাবেন।' প্রথমে হ্যাণ্ডশেক করলেন, তারপর জড়িয়ে ধরলেন, সর্বশেষে প্রণাম করলেন। আমি গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে অনেক পথ হেঁটে শেষে চলমান সিঁড়ি বেয়ে যেখানে প্লেন অপেক্ষা করছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্লেনে চড়বার আহ্বান এল। প্লেনে চড়লাম কিন্তু রোমে কোথায় উঠব, এয়ারপোর্টে কেউ থাকবে কিনা, এ-সব চিন্তা ছাপিয়ে স্বামী নিত্যবোধানন্দের সাদর ব্যবহারের কথা বার বার মনে হ'তে লাগল।

[ক্রমশঃ]

আলোর পথে আমায় টানো

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

[গান]

পরপারের ডাক এসেছে
পারের কড়ি গুছিয়ে নে না,
কাঁধের ঝুলি হাতড়ে দেখি
নেইকো কিছুই—শুধুই দেনা।
এতদিন কি করলি ভবে,
কাটালি দিন কিসের পিছে,
একবারও তুই ভাবলি না রে
এখানের যা সবই মিছে।
কত সুখের এই দেহটা—
কত যত্ন পরিপাটি,
এও হেথায় থাকবে পড়ে,
মাটির দেহ হবে মাটি।
নকল পেয়ে আসল ভুলে
করলি কি এ-জীবন ভোরে,
দাসখত্‌টা দিলি যাদের
যাচ্ছে তারা ফেলে তোরে।
বাঁধন কাট্‌রে পরাণ-পাখি,
ভুলিস নে আর ক্ষণিক সুখে
স্মরণ কর্‌রে তাঁরই চরণ
বল পাবি রে ভগ্ন বুকে।
ষড়রিপুর করলি সেবা—
ভাবলি না তো একটি বারও
দহন ছাড়া আর কিছু নাই—
জয় মা ব'লে যাত্রা কর।
অন্তর্যামী জগন্মাতা
(আমার) ভাল মন্দ সবই জানো,
মনের আঁধার ঘুচিয়ে দিয়ে
আলোর পথে আমায় টানো।

দেবী দুর্গাঃ শক্তির উৎস

স্বামী আত্মস্থানন্দ

সমগ্র বিশ্ব, সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান, যা কিছু জ্ঞানগম্য বা বোধগম্য সে সবেরই একমাত্র আধার ব্রহ্মশক্তি। অদৃশ্য এই অনাদি, অনন্ত, অফুরন্ত শক্তির উৎস 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' ; কিন্তু অনস্বীকার্য। এই মহাশক্তিই মূর্ত হয়েছিল দেবীরূপে, দুর্গতিনাশিনী অজ্ঞাননাশিনী দেবীরূপে, অসুর সংহারে, মধুকৈটভ-চণ্ডমুণ্ড-শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধনে—"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। / নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" তাই দেবী দুর্গা শক্তি-রূপিণী। বিশ্বপ্রপঞ্চ নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যশক্তির সদা পরিবর্তনশীল প্রকাশ-বৈচিত্র্য—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥

—"আমি সমগ্র বিশ্বের রাজ্ঞী ও ধনদাত্রী। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরূপিণী এবং যজ্ঞার্হ দেবতা-দিগের মধ্যে প্রথমা। আমি বহুভাবে অবস্থিত প্রাণীদিগের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করিয়া আছি। বহুদেশে যজমানগণ আমার পূজা করেন।"

শক্তি যখন সুন্দর হ'য়ে প্রকাশ পায় তখন আমরা দেখি কল্যাণী মাতৃমূর্তি। আর এই শক্তির অভিব্যক্তিতে যখন হয় ছন্দপতন, ভারসাম্য যায় হারিয়ে, তখন অশুভের নামে শুভের প্রতিষ্ঠায় ঐ শক্তিকেই রুদ্রাণীরূপে দীর্ঘদংষ্ট্রা চামুণ্ডারূপে অকল্যাণকে কল্যাণে রূপান্তরিত করতে হয়।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ।

—"ত্রিপুর-বিজয় সময়ে আমিই রুদ্রের ধনুতে জ্যা বিস্তার করিয়া ব্রহ্মদ্বেষ্টা ত্রিপুরবাসী অসুরদিগকে সংহার করিয়াছি। লোকদিগের কল্যাণের জন্য শত্রুদিগের সহিত আমি সংগ্রাম করি। আমিই সমগ্র পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আছি।"

সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী মাতৃশক্তি জগজ্জননী স্বয়ং যদি এমন ক'রে আত্মপরিচয় না দিতেন, তাহলে আবৃতবুদ্ধি মানুষ কখনই এই শক্তিরূপিণী 'ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্ষণো-পস্পৃশামি' মহামায়ীর সন্ধান পেতো না। শক্তির আদি উৎস, ঘনীভূত প্রকাশ মাতৃমূর্তিতে তাই আজ দুর্গাপূজার মহালগ্নে আমরা সকলে মাতৃ প্রণাম করি—

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

শারদীয়া দুর্গাপূজা শক্তির আরাধনা। এই পূজাতে শক্তির সামগ্রিক সত্তা তার সব বৈচিত্র্য নিয়ে সপরিবারে দেবীরূপে আবির্ভূত—শক্তির বিশেষ প্রকাশ নিয়ত প্রবহমান প্রাণধারায়। প্রাণপ্রাচুর্যের উৎস তরুলতার সবুজে যা কি না সূর্যের তেজের রূপান্তর। কাজেই শক্তির আবাহনে বর্ষা-শেষের তাজা সবুজকে নবপত্রিকায় মাতৃমূর্তিতে বরণ ক'রে নেওয়া। "সৌম্যাসৌম্যত-রাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী। / পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥"—'আপনি দেবগণের প্রতি সৌম্য এবং দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা। আপনি সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ব্রহ্মাদিরও শ্রেষ্ঠ। আপনি সর্বপ্রধানা দেবী এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি।"

মা শুধু মানব সন্তানের মা নন, মা শুধু

---

* ২৩শে অক্টোবর ১৯৮২, কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত বেতার ভাষণ—আকাশবাণীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।—স:

প্রাণিজগতের নন, মা যে ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী। তাই জগজ্জননী আমাদের পূজা গ্রহণ করছেন ধাতব সিংহাসনে বসে নয়, তাঁর বাহন আজ তেজ ও বলের প্রতীক অরণ্যের পশুরাজ। বিষধর আজ মাতৃকরালংকৃত, মায়ের পরিবারের সকলের বাহন বিচিত্র বন্যপ্রাণী।

মাতৃ আরাধনায় গভীর প্রার্থনা উৎসারিত হচ্ছে অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়সের জন্য। প্রার্থনার উৎস পরিবেশের সংঘাত আর মানসিক আর্তি। সুরাসুরের দ্বন্দ্ব একই শক্তির বিভিন্ন ধারায় পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত আর এই শক্তি দ্বন্দ্বের ফলে যে মূর্ত শক্তির প্রকাশ তাই মাতৃমূর্তি দুর্গা।

মানুষের ভাবনায় শক্তির যত রকম বিচিত্র প্রকাশ, দুর্গাপূজাতে তাঁদের সকলেরই পূজার ব্যবস্থা। কাজেই মায়ের সঙ্গে শক্তির দ্বন্দ্বের আবির্ভূত অসুর আজ আমাদের কাছে পূজা পেয়ে বিশিষ্ট।

ষষ্ঠীর বোধনে শক্তির আবাহন। সপ্তমীতে বনের সবুজকে বেঁধে মায়ের আবাহন, নিজের অন্তরের শক্তিকে প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে মাতৃ-শক্তির পূজার শুরু। মায়ের মহাস্নান সর্বদেশের সকল জলরাশি, সর্বক্ষেত্রের মৃত্তিকাখণ্ড, ক্ষিতিজ সকল গন্ধ, তৈলাদি সকল দ্রব্যই মার অভিষেকের সামগ্রী। সেখানে বিচার নেই। আছে নির্বিচারে সকলকে স্বীকার করা, সকলকে গ্রহণ করা, সকলকে আশ্রয় দিয়ে পরমা-তৃপ্তির প্রকাশ। কি অপূর্ব এই মহাস্নান! জগৎ-কারণ জগদম্বা নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্ট সকলের একীকরণে করেন মহাস্নান।

মহাষ্টমী বীরাষ্টমী। অভ্যুদয়ের সঙ্গে নিঃশ্রেয়সে পৌঁছুতে সর্বতোভাবে বীরত্বের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। মহাশক্তি মা-দুর্গা মহিষাসুরবধে ব্যস্ত—কিন্তু ত্রিনয়নীর দৃষ্টিতে নেই দ্বেষ, নেই ক্রোধ, নেই হিংসা—আছে শুধু করুণা, চিরকল্যাণময়ী স্নেহশীতল প্রসন্ন দৃষ্টি, দেবীপুণ্যপাদস্পর্শে মুক্ত তমসাবৃত অসুর। তাই মা-দুর্গা 'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥' আজ যখন মণ্ডপে মধ্যাহ্ন পূজাতে কোটী-যোগিনীর পূজা, সন্ধ্যায় তখন আরতি-নৃত্যের সমাপ্তিতে তারুণ্যের, বীরত্বের খেলা বীরাষ্টমী ব্রত। একই শক্তির মানবী মূর্তিতে পূজা প্রাতেই হ'য়ে গেছে দুর্গাপূজার বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে কুমারী পূজাতে।

নবমীতে আনুষ্ঠানিক পূজা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, আজ তাই পূর্ণাহুতির আগে শক্তির ভৌতিক প্রকাশ অগ্নি দেবতার সঙ্গে একীভূত, পূজারীর সত্তায় মন্ত্রিত। হোমাগ্নিতে শক্তিপূজার পরিসমাপ্তি। এই সমাপ্তি আসলে আহরণ।

দশমীতে তাই মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে সম্বৎসরান্তে আবার আসবার আহ্বান জানিয়ে প্রতিমা থেকে শক্তিকে সংহার-মুদ্রায় নিজ হৃদয়ে আহৃত ক'রে নেওয়া হয়। যে দিব্য শক্তিকে নানা অনুষ্ঠানে আচারে উপাচারে প্রতিমার প্রতীকে পূজারী এবং সকলে মিলে জাগ্রত ক'রে তুলেছিলাম, সেই শক্তিকেই ধারণ ক'রে নিলাম যাতে জীবনে শক্তির বিকাশ ঘটে, সমাজে শক্তির সার্বিক স্ফুরণ হয়, শক্তির শতধারায় পরস্পর ক্রিয়া-বিক্রিয়া-সাম্যের স্থিতিলাভ হয়। মায়ের কল্যাণ আশীর্বাদ শান্তিজলরূপে তাই সকলে মাথায় গ্রহণ করি প্রতীক প্রতিমাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দিই বিসর্জন—কিন্তু শক্তিকে আপন ক'রে রাখি বুদ্ধির দীপ্তিতে, আবেগের প্লাবনে, কর্মের উচ্ছলতায়। একমাত্র শক্তির স্পর্শই শুধু আমাদের শুদ্ধ ক'রে তোলে না, পরস্পরের আত্মীয়তাকে উদ্ভাসিত করে। তাই শক্তিপূজার, দুর্গাপূজার পরে আলিঙ্গনে-প্রণামে আশীর্বাদে-উপহারে প্রচণ্ড শক্তির প্রশান্ত প্রকাশে আমরা অবগাহন করি আবার

নতুন ক'রে, সুন্দর একটি জীবনযাত্রা আরম্ভ করি আর গাই—

দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্‌॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবী বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

ভারতে শক্তি-উপাসনার ধারা এবং তাৎপর্য

স্বামী কেদারানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাংলার শক্তিসাধনা

আগেই বলা হয়েছে, স্মরণাতীতকাল থেকে ভারতবর্ষে শক্তিসাধনা প্রচলিত এবং এই শক্তি-সাধনার মূল উৎস হ'ল তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ প্রধানতঃ চার প্রকার তন্ত্রসম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে—গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মীরী এবং বিলাসী। এও বলা হয়েছে যে, এদের মধ্যে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় মতই প্রধান এবং সবচেয়ে প্রাচীন। বাংলাদেশে এই শক্তিসাধনা এক সময়ে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল, ফলে হালিশহরের রামপ্রসাদ, বর্ধমানের কমলাকান্ত, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি শক্তিসাধকগণের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবে তন্ত্র বা শক্তিসাধনাও অভূতপূর্ব এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই শক্তিসাধনায় তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে স্ত্রীগুরু হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর নির্দেশে বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪ খানা তন্ত্রের সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

শক্তিসাধনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের শক্তি-সাধকগণ গভীর ভাবোদ্দীপক শাক্তসাহিত্য রচনা ক'রে, ঐ ভাবধারা প্রচার করেন। ফলে প্রাচীন কাল থেকেই গঙ্গাধারার ন্যায় শক্তিবাদ বাংলা-দেশের সর্বত্র প্রসারলাভ ক'রে ঐ তত্ত্ব ও উপাসনায় প্লাবন এনেছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণের শাক্তসঙ্গীত বাংলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। মোটামুটি বলা যায় যে, এই শাক্তসাহিত্য রচনার কাল পনেরো শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে। বর্তমান শতাব্দীতেও কাজী নজরুল ইসলাম, হাওড়া আন্দুল অঞ্চলের 'প্রেমিক' প্রভৃতি কবি ও সাধকদের শাক্তসঙ্গীতও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পনেরো থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে চণ্ডী, দুর্গা, অম্বিকা প্রভৃতি দেবীর বিভিন্ন রূপের মাহাত্ম্য নিয়ে বহু শাক্তকাব্য রচনা হয়েছে। এদের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল, দেবীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসামঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল প্রভৃতি শাক্তকাব্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাক্ত-কবি। তাঁর রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ কালকেতু এবং বণিক ধনপতির উপাখ্যান বাংলার নিজস্ব গঠনশৈলীতে এবং ভাবে রচিত। এই কাব্য বাংলাদেশে বহুদিন থেকেই প্রচলিত, কোন সংস্কৃতসাহিত্যে এই উপাখ্যানের কোন উল্লেখ নেই।

দুর্গাপূজা : ভারতে শক্তিসাধনার ধারা ও তাৎপর্যপ্রসঙ্গ আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রতিমায় দুর্গাপূজা কি, কবে তার উদ্ভব, তার তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন জাগে, সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সমগ্র ভারতে যত দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনীমূর্তি

পূজিতা হন, তার মধ্যে চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা, দ্বাদশভুজা প্রভৃতি মূর্তিই প্রসিদ্ধ এবং এই সকল মূর্তি মিশ্রধাতুময়ী, পাষাণময়ী, দারুময়ী, মৃন্ময়ী প্রভৃতি হ'য়ে থাকে। তবে প্রাচীনকালে বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল না, অবশ্য বর্তমান কালে দুর্গাপূজা বা নবরাত্রি উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র বাংলাদেশের ন্যায় মৃন্ময়ী প্রতিমাতে পূজা হ'য়ে থাকে। পশ্চিম-ভারতে প্রধানতঃ ব্যাঘ্র-বাহিনী অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি পূজার প্রচলন আছে, তবে সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা দুর্গামূর্তির পূজা সমগ্র ভারতে বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে প্রচলিত।

সাধারণের বিশ্বাস বাংলাদেশে প্রতিমায় দুর্গা-পূজার প্রচলন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু অধ্যাপক অশোকশাস্ত্রীর মতে বাংলাদেশের দুর্গাপ্রতিমা পূজা এক হাজার বছরেরও অধিক পুরানো। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙালী স্মৃতি-নিবন্ধকার এবং 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামক মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা রঘুনন্দনও (১৫০০-১৫৭৫ খ্রীঃ) স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর পূর্বেকার পণ্ডিতগণ এবং প্রবাদসমূহ থেকে দুর্গাপূজার অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অন্যান্য আরও বহু প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, বাংলাদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা দশম বা একাদশ শতাব্দী থেকেই প্রচলিত।

চণ্ডীতে আছে মেধা-মুনির নিকট দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতত্ত্ব শোনার পর রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি নদীতীরে মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তি প্রস্তুত ক'রে তিন বছর দেবীর আরাধনা করেন। শরৎ ও বসন্ত—এই দুই ঋতুতেই দুর্গাপূজা হয়। কথিত আছে ত্রেতাযুগে রাবণ চৈত্রমাসে বসন্তকালে এই পূজা করতেন, তাই এই পূজা বাসন্তী পূজা ব'লে পরিচিত। শরৎকালের বা শারদীয়া পূজা অকাল পূজা, রাবণকে বধ করবার জন্য রামচন্দ্র এই পূজা করেন। শরৎ ঋতু দেবতাদের রাত্রি এবং নিদ্রার সময় ব'লে, শরৎকালে দেবীর বোধন ক'রে পূজা করতে হয়। কিন্তু বসন্তকালে দেবতারা জেগে থাকেন ব'লে বসন্তকালীন পূজায় দেবীর দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে—

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি তে।
ধর্মার্থকামমোক্ষায় বরদাভব শোভনে॥*

—অর্থাৎ হে দেবী, পুরাকালে ব্রহ্মা কর্তৃক রামকে অনুগ্রহ করবার জন্য এবং রাবণকে বধ করবার জন্য অকালে তোমার বোধন করা হয়েছিল। আমিও ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সর্বোপরি মোক্ষলাভের জন্য ষষ্ঠীতিথির সন্ধ্যাকালে তোমার এই বোধনরূপ পূজা করছি। হে শোভনা দেবী, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে আমাকে বর প্রদান কর।

দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির সঙ্গে আমরা গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি দেখি, তাঁরা যথাক্রমে সিদ্ধি বা জ্ঞান, শৌর্য ও বীর্য, ধন-সম্পত্তি এবং বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবী মহিষাসুরকে বধ ক'রে দেব ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন এবং ঐহিক সুখপ্রার্থী শরণাগত ভক্তকে সিদ্ধি, বল, বিদ্যা, সমৃদ্ধি প্রভৃতিও দান করেন; সেইজন্য এইসব ঐহিক সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গণেশ, কার্তিক প্রভৃতির পূজার

* আজকাল অনেক পূজামণ্ডপে দেখা যায় দেবীর বোধন সকালে হয়। কিন্তু এটা অশাস্ত্রীয়। কারণ দুর্গাপূজার বোধন মন্ত্রেই বলা হয়েছে, 'ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি তে' অর্থাৎ সায়াহ্ন শব্দ দ্বারা দেবীর বোধন সন্ধ্যাকালেই করা কর্তব্য এই প্রমাণিত হয়।

ব্যবস্থা দেবীর সঙ্গে। এছাড়া প্রতিমাস্থ দেবতার মধ্যে আমরা পাই গণেশ মূর্তির ডানপাশে বস্ত্রাবৃত 'নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গা'কে (সাধারণের মধ্যে ইনি 'কলাবৌ' নামে গণেশের স্ত্রী ব'লে পরিচিত, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইনি গণেশের জননী দুর্গা)। দেবী এখানে নবপত্রিকা বা নয়টি গাছ-গাছড়াতে অধিষ্ঠিত। এই নবপত্রিকার নাম রম্ভা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান এই সকল পত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, কালিকা, দুর্গা, কার্তিকী, শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরোহিতা, চামুণ্ডা এবং লক্ষ্মী। এঁরা সকলেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার বিভিন্ন শক্তি। এই এক এক রূপ পরিগ্রহ ক'রে আদ্যা-শক্তি দেবী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দৈত্যদের বিনাশ এবং শরণাগত ভক্তদের রক্ষা ক'রে তাদের প্রাণধারণ করবার শক্তি ও সেই সঙ্গে শান্তিদান করেছেন এবং করেন। তাই এঁদের সমবেত নাম 'নব-পত্রিকাবাসিনী দুর্গা' বা গণেশ-জননী দেবী আদ্যা-শক্তি। অন্যভাবে বলা যায়—সেই আদ্যাশক্তি দেবী তাঁর সৃষ্ট জগতের সকল ওষধি বনস্পতির মধ্যে থেকে সকল প্রাণীর খাদ্য ও ঔষধরূপে রক্ষা করছেন—নবপত্রিকা তাঁরই স্থূল এবং সংক্ষিপ্ত প্রতীক।

দুর্গাপূজার আর একটি বিশেষ অঙ্গ হ'ল কুমারী পূজা যা অষ্টমী বা নবমী তিথিতে হ'য়ে থাকে। এই পূজায় একটি ছোট মেয়েকে দেবী-ভাবে সুসজ্জিতা ক'রে, পরে এই কুমারীর মধ্যে দেবীর সাক্ষাৎ আবির্ভাব এই চিন্তা ক'রে তন্ত্রশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ষোড়শোপচারে কুমারীকে পূজা করা হয়।

সন্ধিপূজাও দুর্গাপূজার আর একটি বিশেষ অঙ্গ। মহাষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট (১ দণ্ড) এবং মহানবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট (১ দণ্ড) মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে এই পূজা সমাপন করা হয়। শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যের সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড দৈত্যদ্বয়কে বধ করার জন্য দেবীর স্বশক্তি তাঁর কপাল থেকে আবির্ভূত হন; চণ্ড-মুণ্ডকে বিনাশ ক'রে 'চামুণ্ডা' নাম ধারণ করেন। এই পূজাতে দেবী চামুণ্ডা বা কালীরূপে পূজিতা।

দেবী দুর্গা সর্বশক্তিময়ী জগজ্জননীরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে পূজিতা, তবে বাঙালীর কাছে তিনি শুধু বিশ্বজননী পরাশক্তি-রূপেই পূজিতা নন—এই পূজায় বা আবাহনে বাঙালীর একটা নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র ভাব আছে, যা আর অন্য কোথাও দেখা যায় না এবং তা হ'ল কন্যারূপে তাঁর আবাহন। প্রতিটি বাঙালীর কাছে তিনি যে কন্যারূপে স্নেহ, ভালবাসা ও প্রেমের দ্বারা বদ্ধ। বিবাহের পর কন্যা স্বামীগৃহে চলে গেলে বছরে একবার তাকে ঘরে আনবার জন্য বাপমায়ের মন যেমন উতলা হয়, তেমনি ভাবেই শরৎকালের প্রারম্ভে দেবীকে স্বীয় কন্যারূপে আপন ঘরে আপন ক'রে পাবার জন্য প্রতিটি বাঙালী কামনা করে এবং সেই উপলক্ষেই বাংলাদেশে দেবীর আগমনীগানের সৃষ্টি। কথিত আছে, গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী মেনকা কন্যা উমা বা পার্বতীকে বিবাহের পর শিবের ঘরে পাঠিয়েছিলেন। বৎসরান্তে সেই কন্যাকে দেখবার জন্য মেনকার প্রাণ আকুল হ'লে তিনি তাঁর স্বামী হিমালয়কে অনুরোধ করেন উমাকে ঘরে আনবার জন্য। উমাকে আনবার এই আকুলতা—প্রার্থনা; উমা এলে পর মেনকার তাকে গ্রহণ, মেনকার প্রতি উমার অভিমান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বহু আগমনীগান বাঙালী কবিরা রচনা করেছেন। এইসব গান প্রতি বছর দুর্গাপূজার আগে গেয়ে লোকের মনে উদ্দীপনা জাগানো হয়।

শক্তিসাধনা ও বর্তমান যুগ

আদ্যাশক্তি মহামায়া বিশ্বসারা বিশ্বাধারা সর্বব্যাপিনী হলেও স্ত্রীমূর্তিতে তাঁর বিশেষ প্রকাশ

—এ-কথা চণ্ডীর নারায়ণি স্তুতিতে আছে (স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু—হে দেবী তুমিই যাবতীয় স্ত্রীমূর্তিরূপে আপনি প্রকাশিত হ'য়ে রয়েছ)। তাই দেবী-স্বরূপ সমস্ত নারীকে মাতৃবুদ্ধিতে শ্রদ্ধা করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠপূজা, সেজন্যই দুর্গাপূজাতে আমরা কুমারী পূজার বিধি দেখি। শক্তিসাধনায় একদিকে যেমন প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব চিন্তা করা দরকার, অন্যদিকে সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী দেবীর প্রকাশ নারীমূর্তিতে এই ধারণা করাও কর্তব্য। সেজন্য দেখা যায়—যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে শুদ্ধমাতৃভাব স্থাপনের জন্য প্রত্যেক নারীকে জগন্মাতার সাক্ষাৎ চিন্ময়ীরূপ হিসাবে সম্মান ও পূজা ক'রে গেছেন। সে কারণে একদিকে তাঁর সাধক জীবনের প্রথম অবস্থায় যেমন দেখি স্ত্রীগুরু গ্রহণ, অন্যদিকে তেমনি দেখি সাধকজীবনের পর্যবসানে স্বীয় সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবীকে জগজ্জননী ত্রিপুরাসুন্দরী বা যোড়শীরূপে পূজা ক'রে নিজ সাধনলব্ধ সমস্ত ফল শ্রীসারদাদেবীর শ্রীচরণে সমর্পণ। শক্তিরূপিণী নারী তথা স্বীয় পত্নীকে এই পূজা ও সম্মান দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন আধ্যাত্মিক ভাবের কার্যপরিণত-রূপ দিয়ে গেলেন, যার কোন নজির পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে নেই। এর দ্বারা যে শুধু নারীকে জগজ্জননীর সাক্ষাৎ মূর্তিরূপে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হ'ল তা নয়, সেই সঙ্গে আবহমান কাল সর্বত্র নির্যাতিত ও পতিত নারীশক্তিকে উন্নীত ক'রে তার অভীষ্ট আসনে স্থাপন করা হ'ল। বর্তমান যুগে এই শক্তিসাধনাপ্রসঙ্গে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে।...আমেরিকা, ইউরোপে কি দেখছি—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু ওরা অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে!" অর্থাৎ নারীশক্তি উন্নয়নের ভাব ভারতে রয়েছেই বহুকাল থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভাবের কার্যকরী রূপ দিয়ে সকলকে সেই পথ অবলম্বনে আহ্বান জানিয়েছেন!

চণ্ডী বলেছেন—

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

(চণ্ডী ৫।৩৪)

অর্থাৎ জড়, চেতন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—এই তিন শক্তিরূপে কিংবা নারীশক্তিরূপে সকলের মধ্যে কোথাও গুপ্ত, কোথাও ব্যক্তভাবে অবস্থিত শক্তিরূপিণী দেবী আদ্যাশক্তিকে আমরা প্রণাম এবং আরাধনা করি। বর্তমান যুগে সেই আদ্যাশক্তির আবির্ভাব প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, "...নবযুগে নবোদ্যমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা ও নিরন্তর সপ্রেমাহ্বানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের গুরুগতপ্রাণতায় প্রসন্না হইয়া পরমকল্যাণে নিযুক্তা হইয়াছেন। অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইঁহার পবিত্র স্পর্শে নবভাবে পূর্ণা হইয়া একদিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।" (ভারতে শক্তিপূজা, পৃঃ ১)। তাই এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-উপাসনায় সন্তুষ্টা সেই পরমাশক্তি-দেবীকে আবার মানবকল্যাণে নিরতা দেখে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, "যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা, দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর।" (ভাববার কথা, পৃঃ ৭)।

'জাপানিজ এনকেফালাইটিস': পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের সমস্যা

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

প্রায় নয় বৎসর আগে উদ্বোধন[১] পত্রিকাতে শিরোনামায় উল্লিখিত রোগটি সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল—"আমাদের দেশে এই নূতন অসুখটি কি একটি স্থায়ী আসন ক'রে নিল?"—তা এখন সত্যে পরিণত হয়েছে। এই ভাইরাস (Virus—জীবপরমাণু)-ঘটিত রোগটি, যেটি বিরাট মরক আকারে ভারতবর্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলায় ও পরে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, তারই তাণ্ডবলীলা এই বৎসরেও অর্থাৎ ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দেও চলছে ঠিক ঐ কয়েকটি জেলায়। কিন্তু মধ্যের এই কয়েক বৎসরে, বিশেষতঃ ১৯৭৬, ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এর লেলিহান অগ্নিশিখা ছড়িয়েছে উত্তরপ্রদেশ, আসাম, মাদ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আরও নানা প্রদেশে। শত শত লোক প্রাণ হারিয়েছে এর ফলে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবাংলায় খুব কম জেলাই এর কবল হ'তে রক্ষা পেয়েছে। 'জাপানিজ এনকেফালাইটিস' (Japanese encephalitis) নামটি এখন আর চিকিৎসা-পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আক্রান্ত প্রদেশগুলির অনেক পল্লীবাসীও এই বিভীষিকা নামটির সঙ্গে পরিচিত।

এই রোগের ভাইরাস মশার কামড়ের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে মস্তিষ্কে প্রদাহ সৃষ্টি করে। তার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথমে জ্বর হয় এবং পরে সে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। এতে মৃত্যুর হার শতকরা চল্লিশ হ'তে পঞ্চাশ এবং এর প্রতিষেধক কোন বিশেষ চিকিৎসা এখনও জানা যায়নি (যেমন টাইফয়েডে ক্লোরোমাইসেটিন আছে)। মশারা এই ভাইরাস পায় আক্রান্ত বন্য বা গৃহপালিত পশুপক্ষী হ'তে। মজার ব্যাপার যে, ঐ সব জন্তুদের রক্তে ভাইরাস থাকলেও তারা বিশেষ অসুস্থ হয় না। জাপানে প্রায় একশত বৎসর আগে এই রোগটি প্রথম ধরা পড়েছিল এবং রোগের কারণ যে ভাইরাস, তাও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে সেখানেই আবিষ্কৃত হয়েছিল ব'লে এর নামকরণে 'জাপানিজ' কথাটির যোগ হয়েছে। গত একশত বৎসরে এই রোগ ছড়িয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে। সব দেশেই এর ভাইরাস বহন করে নানা শ্রেণীর 'কিউলেক্স' (Culex) মশা (ফাইলেরিয়া অসুখের জীবাণুবহনকারী কিউলেক্স মশা নয়), যেগুলি প্রধানতঃ ধান ক্ষেতে জমা জলে বা মাঠের অল্প জমা জলে বংশ বৃদ্ধি করে। কিন্তু ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মরকের সময় কলিকাতা 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে'র গবেষণার ফলে আসানসোলের নিকট খনিজ অঞ্চলে দুই শ্রেণীর অ্যানোফিলিস (ম্যালেরিয়া জীবাণুবহনকারী অ্যানোফিলিস নয়) মশার দেহ হতেও এই ভাইরাস পাওয়া যাওয়ায়—এখন এই প্রশ্ন এসে গেছে যে, এদেশে অন্য ধরনের মশা ভাইরাস বাহক হ'তে পারে কিনা। ভাইরাসবহনকারী মশকশ্রেণীর জন্মস্থান মাঠ ও জলাজায়গা হওয়ায়, এটি প্রধানতঃ গ্রামীণ রোগ, এবং কলিকাতা বা তদনুরূপ বড় সহরে মরক আকারে এই রোগ হওয়া সম্ভব নয়, তবে ছোট ছোট সহর যাদের ঘিরে আছে গ্রামীণ পরিবেশ, সেখানে এই মরক হ'তে পারে। এক

১ উদ্বোধন, মাঘ ১৩৮০

রোগী হ'তে অন্যের দেহে সরাসরি এই রোগ ছড়ায় না, ছড়াবার আগে মশার শরীরের মধ্যে এর ভাইরাসের বংশ বৃদ্ধি দরকার। এই অসুখের বিস্তারে তিনটি অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন: (ক) যথেষ্ট পরিমাণে পশুপক্ষীর শরীরে এই ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি, যার ফলে দংশনের মাধ্যমে শত শত মশা এই ভাইরাস পেতে পারে। এই ব্যাপারে প্রায় সব দেশেই (এ দেশেও) শুয়োরকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে দেখা গেছে, তবে ভারতবর্ষে শুয়োর ছাড়া গরু, মোষ, হাঁস প্রভৃতিকেও সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। (খ) যথেষ্ট সংখ্যায় উপরি-উল্লিখিত মশকশ্রেণীর বংশবৃদ্ধি, এবং এই কারণেই বর্ষা বা শরৎ ঋতুই এই রোগের পক্ষে অনুকূল। (ভাইরাসবহনকারী) এই শ্রেণীর স্ত্রী-মশারা সাধারণতঃ পশুপক্ষীর রক্তই ভালবাসে, তবে মানুষ সামনে এসে পড়লে অথবা মশার পছন্দ মতো পশুপক্ষী না পেলে, তারা মানুষকে কামড়ায়। (গ) যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে এই রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। মনে রাখা দরকার যে, যত লোকের শরীরে এই ভাইরাস ঢোকে তার সামান্য অংশের (হয়তো পাঁচ-সাতশ'র মধ্যে একজনের) এনকেফালাইটিস হয়। অন্যদের সামান্য জ্বর অথবা কোন অসুখ না করেও তাদের শরীরে রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে। দেখা গেছে যে, মরকের ঋতু ছাড়াও অন্য সময়ে কিছু কিছু মশা ও জন্তুর মধ্যে ভাইরাসের বিবর্তন চলতে থাকে। উপরি-উ তিনটি অবস্থার সংযোগ হ'লে মরকের আবির্ভাব হয়।

এইসব তথ্যগুলি হ'তে সমস্যার গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে। এটি এমন একটি রোগ যার সুস্পষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও জানা নেই, যাতে মৃত্যুর হার—কলেরা বসন্তের মৃত্যুর হারের চেয়েও বেশী এবং যার নির্মূলীকরণ এখনও দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের মতো বিরাট কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে এই রোগের মশকশ্রেণী ধানক্ষেতে বা জলাজায়গায় জন্ম নেয়, যেখানে জানা ও অজানা অসংখ্য পশুপক্ষী ও মশার শরীরে এর ভাইরাস থাকতে পারে এবং যেক্ষেত্রে ভাইরাস ধ্বংসকারী কোন ওষুধ জানা নেই, সেখানে রোগ নির্মূল করা কি সম্ভাব্য ব্যাপার? রোগের প্রতিষেধক টিকা অবশ্য জাপান হ'তে উচ্চ বিদেশী মুদ্রায় কেনা যায়, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, দুই বা তিনবার টিকা দেওয়ার পরে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে ব'লে মরকের সময়ে টিকা দেওয়ায় বিশেষ কোন লাভ হয় না। মরক আরম্ভ হবার আগের ঋতুতে দু'বার এবং মরকের ঋতু শুরুতে একবার টিকা দেওয়া হয় জাপানে। ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশে কি নিয়মিতভাবে এরূপ করা সম্ভব?

অর্থাৎ এই সমস্যাটি আমাদের দেশে এখন থাকবে এবং এখানে-ওখানে মরক হ'য়ে দেখা দেবে। অন্য ভাষায় এই রোগটির সঙ্গে আমাদের 'ঘর করতে' হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাপানের মতো সমৃদ্ধিশালী ক্ষুদ্র দেশ নিয়মিত টিকা ও মশক নিবারণী পন্থা নিয়েও এত বৎসরে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হ'তে পারেনি। কোন কোন বৎসরে দু-চারজনের এখনও এই অসুখ হয়। তা ব'লে কি আমাদের কিছুই করণীয় নেই? অবশ্যই আছে। সেগুলি:

(১) সংশ্লিষ্ট সকলকেই বুঝতে হবে যে, সমস্যাটি গুরুতর, এর আশু সমাধান বা নির্মূলীকরণ সম্ভব নয়, এবং রোগটিকে কেবলমাত্র যথাসম্ভব দমিয়ে রাখা যেতে পারে।

(২) রোগটির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের একটি অংশ স্থায়ীভাবে এই কাজে লেগে থাকবে (যেমন ম্যালেরিয়ার জন্য আছে), কেবলমাত্র

মরকের সময়ে তৎপর হ'লে হবে না। এই দপ্তর সারা বৎসর প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেবেন, গবেষণা চালিয়ে যাবেন—কোন্ মশা বা কোন্ পশুপক্ষী এই ভাইরাস বহন করে, সেই মশার জন্ম, জীবনী-প্রণালী ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি হ'তে পারে, টিকা কিভাবে দিলে সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। এইসব বিষয়ে বিদেশী, বিশেষতঃ জাপানি অনেক তথ্য আছে, কিন্তু সব দেশে (এমনকি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও) তথ্যগুলি সমভাবে প্রযোজ্য না হতেও পারে। এই দপ্তরের হাতে থাকবে এমন একটি দল, যারা মরকের আরম্ভেই আক্রান্ত অঞ্চলে গিয়ে প্রতিরোধক কাজ আরম্ভ করতে পারে।

(৩) রোগ বিস্তার কি ক'রে হয়, কি ক'রে মশার জন্ম বন্ধ করা যায়, কি ক'রে মশার কামড় হ'তে উদ্ধার পাওয়া যায়, টিকা এই রোগে কিভাবে কাজ করে, রোগের নির্মূলীকরণে কি কি অসুবিধা—এইসব তথ্য দিয়ে প্রচুর সংখ্যক প্যাম্পলেট বা পুস্তিকা বিতরণ করতে হবে গ্রামে গ্রামে। এর ফলে লোকের কর্তৃপক্ষের কাছ হ'তে অযৌক্তিক প্রত্যাশার পরিমাণ কমবে।

(৪) দেশে টিকা তৈরীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিতে হবে। তাতে টিকার দাম কমবে। অবশ্য এদেশে টিকার মাত্রা, কতবার দিতে হবে এ-সব বিষয়ে নূতন মূল্যায়ন করার দরকার হবে। কারণ ভারতে এই ভাইরাসের সগোত্র আরও কয়েকটি মশকবাহিত ভাইরাস রোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু জাপানের অবস্থা সেরূপ নয়।

(৫) জাপানিজ এনকেফালাইটিস সম্বন্ধে একটি বড় অসুবিধা এই যে, ভারতের মতো বিরাট দেশের কোন্ অঞ্চলে কোন্ বৎসর যে মরক সৃষ্টি হবে—অনুমান করা সহজ নয়। এ-সম্বন্ধে অগ্রিম আভাস পেলে, সেখানে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। পছন্দমতো কয়েকটি কেন্দ্রে সারা বৎসর কিউলেক্স মশার প্রাদুর্ভাব দেখলে এবং শুয়োর বা অন্য জন্তুর রক্তে ভাইরাস পরীক্ষা করলে আগামী মরক সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায় কিনা, সে-সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

সুখের বিষয় যে, উপরি-উক্ত করণীয়গুলির কিছু কিছু রূপায়ণ হ'তে চলেছে।*

* লেখক কলিকাতা 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে' ১৯৭৩-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। বর্তমানে তিনি বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার (W. H. O.) ভাইরাসজনিত অসুখের বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শ-দাতাদের একজন।—সঃ

বাংলার বাস্তু-শিল্পে পোড়ামাটির কাজ

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সহজলভ্য ও অনায়াস-নমনীয় মৃত্তিকাকে তার শিল্পচর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার ক'রে এসেছে। নদীবহুল পলিমাটির দেশ বাংলাতে এই মাধ্যম বরাবরই জনপ্রিয় ও বহুব্যবহৃত। এখানে পাথর দুষ্প্রাপ্য, তার ব্যবহারও সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঘর-বাড়ি থেকে শুরু ক'রে মূর্তি খেলনা পুতুল ইত্যাদি তৈরি করার উপযোগী মাটির অভাব হয়নি কখনও। ফলে মাটি পুড়িয়ে ইট বানিয়ে একদিকে বসতবাটি মন্দির বিহার ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে, অন্যদিকে সেইসব গৃহসৌধের সজ্জার জন্য কলাকুশল শিল্পীর হাতে পোড়ামাটির টালিতে ফুটে উঠেছে দেবলোক ও মানবসংসারের অনশ্বর চিত্রমালা। এখানে বলা দরকার, বন্যা বৃষ্টিপাত আর নিয়ত গতি পরিবর্তনশীল নদনদীর দেশ বাংলায় সুপ্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি বলতে বিশেষ কিছু নেই। বস্তুতঃ মুসলমান-পূর্ব যুগের স্থাপত্য নিদর্শনের সংখ্যা খুবই অল্প। মুসলমান-যুগ বা মধ্যযুগের যে-সব বাস্তুকর্ম ধ্বংসের হাত এড়াতে পেরেছে, বাংলার শিল্পেতিহাস রচনায় তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থাপত্য নিদর্শনগুলির বেশির ভাগই মন্দির বা দেবালয়, যেগুলির অলংকরণে পোড়ামাটির বা টেরাকোটার ব্যবহার বাহুল্যে শুধু নয়, নান্দনিক বিচারেও বিশেষ মনোযোগের যোগ্য। তা ছাড়া এইসব মন্দির ও মন্দির-টেরাকোটার ভাস্কর্যে বাঙালী তার শিল্পমানসের নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলার দেবালয়গুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; 'চালা', 'রত্ন' ও 'দালান'। উড়িষ্যায় ও অন্যত্র এই দেবালয়গুলির নির্মাণশৈলী 'বাংলারীতি' বা 'গৌড়ীরীতি' নামে পরিচিত। গ্রাম-বাংলার চালা-ঘরের আদলে তৈরি মন্দির 'চালা-মন্দির', চালার সংখ্যা অনুযায়ী দোচালা, চারচালা ও আটচালা মন্দির; দোচালা মন্দির 'এক-বাংলা' নামেও পরিচিত, এ ধরনের মন্দির দুটি-একটি ছাড়া দেখা যায় না; চন্দননগরের নন্দদুলালের মন্দিরটি দোচালা। দুটি দোচালাকে পাশাপাশি যুক্ত ক'রে শীর্ষে কখন কখন চূড়া বসিয়ে যে-মন্দির তৈরি হ'ত তার নাম জোড়-বাংলা; বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত জোড়-বাংলা মন্দিরটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। চারচালা আটচালা মন্দিরের উদাহরণ পর্যাপ্ত, সংখ্যায় আটচালা মন্দিরই সর্বাধিক। রত্নমন্দিরের 'রত্নে'র অর্থ 'শিখর', মন্দিরের ছাদের মাঝখানে একটি শিখর থাকলে সেটি হবে 'একরত্ন', চার কোণে ছোট চারটি শিখর থাকলে সেটি হবে 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। মন্দিরের তলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিখরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং সেই অনুসারে মন্দির হয় 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন', 'সপ্তদশরত্ন', 'পঞ্চবিংশরত্ন'। 'দালানরীতির' মন্দিরের ছাদ সমতল, এর সামনে থাকে ত্রিখিলানযুক্ত বারান্দা। এ ছাড়া বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাসমঞ্চটিতে এক অভিনব স্থাপত্যরীতির পরিচয় মেলে, পিরামিডাকৃতি এই সৌধটি প্রথাগত অর্থে দেবালয় নয়।

বাংলার মন্দিরগুলির বেশির ভাগই সাধারণ বাঙালীর কুঁড়েঘরের আদর্শে তৈরি; ফলে এগুলি হ্রস্বাকৃতি। কিন্তু আয়তনে ছোট হলেও এই ইঁটের ইমারতগুলিকে বাঙালী শিল্পী পোড়ামাটির সুচারু কারুকর্মের অলংকরণে নান্দনিক গুণে বৃহৎ ক'রে তুলেছেন। সংখ্যায় অজস্র এইসব পোড়ামাটির কাজ দেখতে দেখতে মনে হয়, পোড়ামাটির

বা টেরাকোটা শিল্পেই বুঝি বাঙালীর শিল্প-প্রতিভা সবচেয়ে সহজ ও স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি লাভ করেছে।

বাংলার মন্দির-টেরাকোটাগুলি প্রধানতঃ পোড়ামাটির ছাঁচে তৈরি। ছাঁচ থেকে টালিগুলি বেরিয়ে আসার পর টালির মূর্তিগুলির চোখ, ভ্রূ, অলংকার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি এঁকে নেওয়া হ'ত; আঁকার উপকরণ নরুন বা বাঁশের পাতলা চাঁচাড়ি। এই নকাশি কাজ শেষ ক'রে শিল্পীরা টালিগুলিকে মসৃণ ক'রে নিয়ে প্রথমে রোদে শুকিয়ে এবং পরে ভাটিতে পুড়িয়ে নিতেন। তারপরে ঐ টালিগুলি বসিয়ে দিতেন মন্দিরের গায়ে, প্রধানতঃ কার্নিস বরাবর কার্নিসের ঠিক নিচে দুই বা ততোধিক সারিতে। সেরা জাতের টালিগুলি লাগানো হ'ত প্রবেশ-খিলানের উপরে ও দু-পাশে। খিলানের ভারবহনকারী দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধস্তম্ভও শিল্পীর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হ'ত না। প্রবেশ-তোরণের দু-পাশের দেওয়াল-গুলিও অনেক সময় পোড়ামাটির অলংকরণে সুশোভিত হ'ত। একটি টালিতে একটি মূর্তি বা একটি চিত্র সম্পূর্ণ না হ'লে একাধিক টালিতে সেই মূর্তি বা চিত্রের বাকি অংশ রূপায়িত হ'ত। স্বভাবতই এ ধরনের টালিগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে উদ্দিষ্ট মূর্তি বা চিত্রের রূপায়নের কাজ সম্পূর্ণ করতে শিল্পীরা যথেষ্ট শ্রম ও মনোযোগ নিয়োগ করতেন।

মধ্যযুগীয় বাংলার বহুমন্দিরই পোড়ামাটির কাজের উৎকর্ষে প্রশংসনীয়। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে এতগুলি টেরাকোটা-মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। পুনরুক্তির সুরে বলতে হয়, বাঙালী তার প্রিয় দেব-দেবীর জন্য মন্দিরনির্মাণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই দেবালয়গুলিকে পোড়ামাটির আর পদ্মের কাজে সাজিয়ে সুন্দর ক'রে তুলতেও চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সময়ের বিচারে, বাংলারীতির পুরানো টেরাকোটা-মন্দিরগুলির বেশির ভাগই চৈতন্য-পরবর্তী যুগের। সতেরো শতকের অনুরূপ মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপুরের শ্যাম রায় ও জোড়-বাংলা মন্দির, নদীয়ার মাটিয়ারী, শ্রীনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে রাঘব রায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি, বীরভূমের ঘুরিষার রঘুনাথজীর মন্দির। আঠারো ও উনিশ শতকের দেবালয়গুলির মধ্যে উল্লেখ করা যায় বাঁকুড়ার সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির, হুগলীর আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের মন্দির, হাওড়ার অমরাগড়ির গজলক্ষ্মী ও দধিমাধবের মন্দির দুটি, কোচবিহারের ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির। ওপার বাংলার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত: দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীর মন্দির; এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত।

এইসব বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ দর্শকদের চোখ টানে, মন ভরায়। অতীত বাংলার অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত শিল্পীদের কলা-কুশলতার নিদর্শন এই কাজগুলি এখনও যেন তাদের পূর্ণ মূল্য পায়নি! সামগ্রিকভাবে এই মন্দির-টেরাকোটাগুলি বাংলার সম্পদ, বাঙালীর গৌরব। এদের বিষয়-বৈচিত্র্য ব্যাপক, দেবলোক ও মানবসংসারের এমন কোন বিষয় নেই, যা এই-সব টেরাকোটাতে চিত্রিত হয়নি। টেরাকোটা-গুলি দেখতে দেখতে দর্শক একসময় অনুভব করেন—দেবলোক ও মানবসংসার একাকার হ'য়ে গেছে, কাহিনী-কিংবদন্তীর মানুষগুলি রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তাঁর সামনে সঞ্চরণশীল, স্বকর্ণেই যেন শুনতে পান, অরূপ বীণা রূপের আড়ালে নয়, রূপের সামনেই বেজে চলেছে। পরিচিত প্রিয় দেব-দেবীর মধ্যে দেখা মেলে শিব, বিষ্ণু, নানা লীলায় প্রকটিত বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, মহিষমর্দিনী এবং গৌর-নিতাইয়ের; রামায়ণ-

মহাভারতের বহু গল্পের : বহু কাহিনী-দৃশ্যের, যেমন লঙ্কাকাণ্ডের ; প্রতিদিনের চেনাজানা মানুষের সংখ্যাও কম নয়—জমিদারবাবু ও তাঁর পারিষদবর্গ, ইউরোপীয় নাবিক, গোরা-পল্টন, সাহেব-মেমসাহেব, কলসী-কাঁখে বাঙালী বধূ, বাজারের মেছুনী, বেদে-বেদেনী, কীর্তনীয়া, বাদক-বাদিকা, শিকারী, নাপিত, কামার। পশু-পাখি, ফুল-লতা-পাতা ? তা-ও আছে। সিংহ, গরু, ঘোড়া, হরিণ, হনুমান, সাপ, ময়ূর, মায়, রাজস্থানের উট পর্যন্ত ; শালবৃক্ষ, পদ্ম, হংসলতা। নানা ধরনের আকর্ষণীয় জ্যামিতিক নকশারও ঘাটতি নেই। এককথায় স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের সুন্দর মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত হিসাবে অধিকাংশ টেরাকোটা-মন্দির শিল্প-রসিকদের প্রশংসা দাবি করতে পারে।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু উপকরণ এইসব পোড়ামাটির কাজে বিদ্যমান। সে-কালের অভিজাত ও জমিদারদের সঙ্গে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের জীবনযাত্রার ছবি বহু টেরাকোটা প্যানেলে সজীবতায় মূর্ত। অভিজাত ও জমিদারদের পালকি, নৌকা ইত্যাদিতে প্রমোদ ভ্রমণ, অনেক সময় পাত্রমিত্রপারিষদ্ সহ ফরসিসেবন, ভৃত্যভৃত্যাদের সেবাগ্রহণ ইত্যাদি রূপ চিত্রের সঙ্গে সহাবস্থান ঘটেছে গৃহস্থবধূর ঢেঁকিতে ধানভানা, কামারের হাপর চালানো ও গরম লোহা পেটানো, তাঁতি-মেয়ের চরকায় সুতো কাটা প্রভৃতি দৃশ্যের। আঠারো-উনিশ দশকের নিদর্শনগুলিতে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের সাক্ষাৎ মেলে, তাঁদের কেউ জাহাজের নাবিক, কেউ সৈন্য, কেউ বা বিলাসপ্রিয় সাহেব-মেম। সমকালীন মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, আচার-অনুষ্ঠানেরও খবর পাওয়া যায় এইসব টেরাকোটা থেকে। মেয়েদের ঘাঘরা-চেলি-ওড়না-শাড়ি, পৈঁছা-বাজু-বেশর-চন্দ্রহার-নথ-নোলক, পুরুষদের শ্যামলা - কোট - পাদুকা - ধুতি - চাদর—এ-সবই রূপায়িত হয়েছে টেরাকোটায় নারী ও পুরুষ মূর্তিতে। আর দেখা যায়—কন্যা-সম্প্রদান, বধূ-বরণ, সিঁদুর-দান, পাশাখেলার মতো সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ক ভাস্কর্য চিত্র। ধর্মীয় ঔদার্য যে সাধারণভাবে বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তারও পরিচয় আভাসিত কিছু কিছু পোড়ামাটির কাজে। দৃষ্টান্ত : সোনামুখীর শ্রীধর-মন্দিরের বিগ্রহ শালগ্রামশিলারূপী বিষ্ণু, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রবেশ-খিলানটির দু-পাশে কালী-মূর্তি, মন্দিরের সামনের দিকে শিব-বিবাহের একাধিক ভাস্কর্য ও দক্ষিণের দেওয়ালে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ সমেত এক মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি উৎকীর্ণ। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা যে সে-কালের বাঙালীকে বিশেষ আচ্ছন্ন করেনি এটি তার একটি নির্ভুল প্রমাণ।

সামগ্রিকভাবে বাংলার টেরাকোটা-শিল্প কারিগরী কুশলতায়, শিল্পসুষমায় এবং শিল্পীদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সমাজ-সচেতনতার বৈভবে কলা-রসিক মাত্রেরই অভিনন্দনের যোগ্য। সারল্য-শোভন বিনীতদর্শন মন্দিরগুলির গায়ে এদের অবস্থান। বাংলার গৌরব, বাঙালীর সম্পদ এই টেরাকোটাগুলির মধ্যে সূর্যালোকের দীপ্তি নেই, কিন্তু সন্ধ্যাদীপের স্নিগ্ধ প্রশান্তি আছে। আর এই প্রশান্ত মাধুর্যে বাংলার রূপ-প্রকৃতি বাঙালী মানসতাও সহজ বাঙ্ময়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম

শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত

প্রার্থনা দিয়ে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার রীতি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম'র মহামিলনের এই শতবর্ষে আমাদের প্রার্থনা, শ্রীম সম্বন্ধে দুটি ধারণার পুনর্মূল্যায়ন হোক।

একটি ধারণা, শ্রীম ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তদের মধ্যে একজন মাত্র। তাও দ্বিতীয় পৈঠেতে বসবার উপযুক্ত, প্রথম পৈঠেতে বসতে পারেন শুধু একজন গৃহীভক্ত, দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়। আর একটি ধারণা হ'ল, শ্রীম-কথিত কথামৃতে কেবল গৃহস্থদের অনুধ্যেয় ও অনুসরণীয় উপদেশাবলী রয়েছে। ত্যাগীভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সব নিগূঢ় তত্ত্বের কথা বলতেন, শ্রীম তো গৃহস্থ, তাই তাঁর সামনে ঠাকুর তা বলতেন না, কাজেই কথামৃতে তা নেই।

প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছেন প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী তপস্যানন্দ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'The Condensed Gospel of Sri Ramakrishna' গ্রন্থের ভূমিকায়।[১] তিনি সেখানে বেশ সুস্পষ্ট করেই বলেছেন যে, অনেকে নিছক গোঁড়ামির বশেই এমন ধারণা ক'রে বসেন, যেন কথামৃত হচ্ছে শ্রীম'র রবিবারের ডায়েরী মাত্র তাঁদের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক উচ্চতর তত্ত্বোপদেশ রয়েছে, যা তিনি শ্রীম'র সম্মুখে প্রকাশ করেননি। কিন্তু হায়, এমন ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা কিন্তু মোটেই খেয়াল রাখেন না যে, কথামৃত সম্পর্কে স্বামিজী ও শ্রীশ্রীমার প্রশস্তিবাক্যগুলিকে তাহলে মিথ্যা পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শ্রীম গৃহস্থ ছিলেন, সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চভাবের উপদেশগুলিকে ধরে রাখার উপযোগী সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি—এ-হেন কথার প্রত্যুত্তরে স্বামী তপস্যানন্দ বেশ লিখেছেন,—পৃথিবীতে যদি এমন কোনও শাস্ত্র থাকে, যা ঐ দেব-মানবের ঠিক ঠিক উপদেশ-বাণীর একেবারে কাছাকাছি, তা হচ্ছে এই শ্রীম'র ডায়েরী এবং তা একমাত্র শ্রীম'রই।

তারপরে ওই কথা, দ্বিতীয় ধারণাটি। শ্রীম ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় সারির গৃহীভক্তদের অন্যতম। কিন্তু তা কেন? এই যে কথামৃত চতুর্থ ভাগের ১০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

"শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো, হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ও কথা বলে না। তাদের দুটি জিনিস জানলেই হ'ল; প্রথম, আমি কে? তারপর তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? তুমি এই শেষ থাকের।"

আবার আছে ২০৬ পৃষ্ঠায় : ১৮৮৪-র ৫ই অক্টোবর দক্ষিণেশ্বরে মাষ্টারকে বলছেন বড়কালী ও রামলালের উপস্থিতিতে। "শ্রীরামকৃষ্ণ—শুদ্ধা-ভক্তিতে কোন কামনা থাকবে না। তুমি এখানে কিছু চাও না অথচ ভালবাস—এর নাম অহৈতুকী ভক্তি, শুদ্ধাভক্তি। প্রহ্লাদের এটি ছিল; রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, কেবল হরিকে চায়।"

এই যা বললেন শ্রীম সম্বন্ধে তা কিন্তু চূড়ান্ত বলা। কেননা ওই বৈঠকেই একটু আগে তিনি হাজরা সম্পর্কে বলেছেন :

"আমি বলি, কামনাশূন্য ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি—এর বাড়া আর কিছুই নাই। ওকথা সে কাটিয়ে দেয়।"

তাহলে দাঁড়ালো, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীম'র

---

[১] মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত (১৯৭৮)। পৃঃ xiv-xv দ্রষ্টব্য।—সঃ

অহেতুকী ভক্তি প্রাপ্তি হয়েছিল, যার বাড়া আর কিছুই নেই।

তারপর কথামৃত পঞ্চম ভাগে ৭০ পৃষ্ঠায় দেখি, রাখাল মাষ্টার প্রভৃতির সঙ্গে বলরাম-মন্দিরে উপবিষ্ট হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন :

"দেখ আন্তরিক ডাকলে স্ব-স্বরূপকে দেখা যায়। কিন্তু যতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা থাকে ততটুকু কম পড়ে যায়।

মাষ্টার—আপনি যা বলেন, ঝাঁপ দিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দিত হইয়া)—হঁয়া।

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—দেখ, সকলেরই আত্মদর্শন হ'তে পারে।"

কথাটা যে শ্রীমকেই সোজাসুজি বলা হচ্ছে, মানে তোমারও আত্মদর্শন হবার বাধা নেই—এইটে শ্রীম বুঝতে চাইছেন না। সংসারে আছেন ব'লে সর্বক্ষণ এমন মরমে মরে থাকতেন যে, তাঁরও যে আত্মসংক্ষাৎকার সম্ভব তা বুঝতে চাইতেন না।

মাষ্টার বললেন,"আজ্ঞা তবে ঈশ্বর কর্তা, তিনি যে ঘরে যেমন করাচ্ছেন। কারুকে চৈতন্য করছেন ; কারুকে অজ্ঞান ক'রে রেখেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বললেন—"না। তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হ'লে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অঙ্গীকারের পর আবার তাঁর আশ্বাস-বাক্য শুনতে পাই কথামৃত প্রথম ভাগ ৬২ পৃষ্ঠায় :

"যদি বলো, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাত আছে কিনা ?"

এই প্রশ্নই তো আমাদেরও মনে উঠেছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "তার উত্তর এই যে, দুই-ই এক জিনিস। এটিও জ্ঞানী উটিও জ্ঞানী—এক জিনিস। তবে সংসারী জ্ঞানীরও ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।…যাই হোক, যদিও সংসারী জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।"

এ-বিষয়ে শ্রীম কী বলেন ? তাতো আর কথামৃতে পাওয়া যাবে না। যেতে হয় আমাদের শ্রীম-দর্শন গ্রন্থাবলীতে। শ্রীম-দর্শন নবম ভাগ ১৬৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

"শ্রীম—আমরা বলেছিলাম, একাধারে দুটি হয় না কি, জ্ঞান ও ভক্তি ? ঠাকুর উত্তর করলেন, হবে না কেন ? একই আকাশে চন্দ্র সূর্য দেখা যায়। প্রহ্লাদের নাম করলেন। তাঁর দুটিই ছিল। তাঁর কৃপায় আমাদেরও এইটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।…ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই।"

আবার যাই কথমৃতের ৪র্থ ভাগে, ২২৯ পৃষ্ঠাতে : ব্যথিত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলছেন, "কি দেখছিলাম! ব্রহ্মাণ্ড একটি শালগ্রাম।—তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু দেখছিলাম।" ভক্তরা সব অবাক।

বলে কী হবে, ঠাকুরের যতো কথা ! ব্রহ্মাণ্ড কিছু শালগ্রাম নয়, আর তাতে শ্রীম'র দুটো চোখ থাকাও সম্ভব নয়। এতে তো সন্দেহ নেই যে অন্ততঃ সেই তারিখে,—১৮৮৫-র ১৪ই জুলাই শ্রীম এমন শুদ্ধ হয়েছেন যে, তাঁকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের ওরকম দর্শনের উদ্দীপন হয় ? তিনি যদি বাড়ীতে লুকিয়ে গুড়ের নাগরি খেতেন, তাহলে তা সম্ভব হ'ত না ?

তার দেড় বৎসর আগে ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩, (কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১০৩-০৫) শ্রীম যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে সাধন করছেন, তখন তিনি শ্রীমকে দেখে বলছেন, 'তোমার শীঘ্র হবে।' আবার 'তোমার সময়

হয়েছে। যে ঘর বলেছি তোমার সেই ঘরই বটে। সকলেরই যে বেশী তপস্যা করতে হয়, তা নয়। আমার কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল।' আবার বলছেন: "তোমরা আপনার লোক আত্মীয়।... যারা যারা আত্মীয় কেউ অংশ, কেউ কলা।"

তার পরের দিন বলছেন: "আচ্ছা, এত যে তোমরা আসো, এর মানে কি?"

মণি অবাক। ঠাকুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—অন্তরঙ্গ না হ'লে কি আসো? অন্তরঙ্গ মানে আত্মীয়, আপনার লোক—যেমন বাপ, ছেলে।"

চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠা ২৪৯—একঘর লোকের সামনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন:

"কিরূপ লোক—ভক্ত এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম—না হ'লে মিছরি এ-সব দেবে কে? আর এঁকে (অর্থাৎ মাষ্টারকে) দেখেছিলাম।"

আচ্ছা একটা প্রশ্ন। এই যে চৈতন্য অবতারে যাঁরা পার্ষদ ছিলেন, তাঁরা যে রামকৃষ্ণ অবতারেও পার্ষদ ছিলেন, তবে কি বলরাম আর মহেন্দ্র ঈশ্বরের নিত্যপার্ষদ?

তৃতীয় ভাগ, ১৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে বলরাম মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে আসীন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "অহংকার কি যায় গা! দুই একজনের দেখতে পাওয়া যায় না। বলরামের অহংকার নাই। আর এঁর নাই—অন্য লোক হ'লে কত টেরী, তমো হ'ত—বিদ্যার অহঙ্কার হ'ত।"

বস্তুতঃ সন্ন্যাস নিলেও যে এই অহঙ্কারের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া যাবে এমন নয়। আর কিছু না হোক, গেরুয়ার অহঙ্কার বড় সর্বনাশা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, শ্রীম'র অহঙ্কার ছিল না। ছিল না মানে কী, ভাবতে পারেন, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে বসতেন কোথায়? পাপোষের উপর। বসবার ভঙ্গী বীরাসনে। সারা-জীবন ওই ভাবেই বসে গেলেন, যেন শ্রীরামকৃষ্ণকে সামনে দেখছেন, অন্যভাবে বসবার উপায় নেই।

কথামৃত ৩য় ভাগ, ১৪৭ পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম'কে বলছেন:

"ভাগবত পণ্ডিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন,—তা না হ'লে 'ভাগবত কে শুনাবে?' —রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য সংসারে রেখেছেন।" তবু শ্রীম সন্ন্যাসের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ধমক দিয়ে বললেন: "কেউ না মনে করে মায়ের কাজ আটকে থাকবে। মা ইচ্ছা করলে খড়কুটো থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করেন।"

এরপর আর তিনি সন্ন্যাস প্রার্থনা করেননি। গুরুর আদেশে গুরুর কাজ করবার জন্য সংসারের অগ্নিকুণ্ডে থেকে আজীবন জ্বলতে পুড়তে অঙ্গীকৃত হলেন। "কাব্যে উপেক্ষিতা"-য় রবীন্দ্রনাথ উর্মিলার প্রতি অবিচার করার জন্য তীব্র অনুযোগ জানিয়েছেন আদি কবিকে। বলেছেন, লক্ষ্মণের ত্যাগটাই তুমি বড়ো ক'রে দেখলে! লক্ষ্মণ রামের জন্য নিজেকে মাত্র উৎসর্গ করেছিলেন, কিন্তু উর্মিলা যে নিজের চেয়ে অধিক নিজের পতিকে দিয়ে দিয়েছিলেন, তা তুমি দেখলে না? উর্মিলার ত্যাগ যে অনেক বড়ো ছিল। আমাদেরও বলতে সাধ যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানরা ত্যাগ করেছিলেন কী? ঘৃণ্য সংসারজীবন। আর শ্রীম চিরদিনের জন্য ত্যাগ ক'রে দিলেন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত সন্ন্যাসজীবনে তাঁর উত্তরাধিকার। গুরুর প্রতি কতখানি প্রেম থাকলে এটা সম্ভব? অমনি প্রেম ছিল নিতাইয়ের। কুড়ি বৎসরের সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্যের আদেশে

সংসারে প্রবিষ্ট হলেন। কেন? না, তুমি গৃহে থেকে নির্লিপ্ত সংসারজীবন যাপনের আদর্শ হও। শ্রীমও হলেন তাই, মডেল গৃহস্থ-সন্ন্যাসী—নিজেরই বাড়ীতে নিজের কাছে ওঁর পরিচয়, এ বাড়ীর দাসী। শুধু কথায় নয়, কাজে-কর্মে, ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনযাপনে। ফিরতে রাত হ'ল বাড়ীতে। সঙ্গের ব্রহ্মচারী ছুটে যাচ্ছিলেন ওঁর আহার দুধ রুটি বাড়ী থেকে আনতে। 'না-না' নিরস্ত করলেন ব্রহ্মচারীকে। দাসী হ'লে কী ক'রত, সে কি ডাকাডাকি ক'রে বাড়ীর লোকদের জাগাতে পারতো? 'না।' 'তবে আমি ওদের বিরক্ত ক'রব কী ক'রে? যাও, পাঞ্জাবী রুটি কিনে আন দুটো।' সেই রুটির মাঝখানটা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে শুয়ে রইলেন। ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত।

'মহেন্দ্র আমা বই কিছু জানে না।' বলেছিলেন কে? সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যিনি মনুষ্যশরীরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আহা, কী কথা! 'ও আমা বই কিছু জানে না'। শ্রীম-দর্শন, ১৩শ ভাগ, পৃঃ ২০০—এই রামকৃষ্ণময়তা দেখতে ও শিখতে সাধুরাও আসতেন শ্রীম'র সঙ্গ করতে। 'চলো ভাই আজ জগৎ ভুলে আসি', বলতেন অনেক বেলুড়মঠের সাধু শ্রীম'র কাছে আসবার পূর্বে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই শ্রীম'র একটু hero-worship-এর ঝোঁক ছিল। সেকেণ্ড ক্লাশে যখন পড়েন, তখনই কেশব সেন তাঁর মন হরণ করেছিলেন। অ্যালবার্ট হলের উঁচু পিলার বেয়ে উঠে তিনি কেশব সেনকে দেখতেন। শ্রীম বলছেন:

"একবার একটা কলেজ রিইউনিয়ানে বঙ্কিমবাবুকে দেখতে গেছি। উনি যেখানে যাচ্ছেন পিছু পিছু, যাচ্ছি সেখানে।

"ভাগ্যিস্ আমাদের এ hero-worship-টি ছিল। তাই ঠাকুরকে যেদিন দেখেছি সেদিন থেকেই ধরে ফেলেছিলাম।" (শ্রীম-দর্শন, ৫ম ভাগ, পৃঃ ২২৮)।

আর ধরাও কি যে-সে ধরা? অন্য যাঁরা আসতেন সকলেই কি প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত অনুক্ষণ ধরে রাখতে পেরেছিলেন? তাঁদের বিশ্বাসেও জোয়ার-ভাটা খেলেছে, একবার বিশ্বাস হ'ল খুব, আবার হয়তো ঢেকে গেল অবিশ্বাসের মেঘে। আলো-আঁধারের মতো ওঠাপড়া।

কিন্তু শ্রীম'র বিশ্বাস যেন বড় সায়রের জল, ওঠা-পড়া নেই, কলোচ্ছ্বাস নেই, স্থির নিশ্চল কিন্তু অথৈ গভীর।

অথচ তা হবার কথা ছিল না। বঙ্গদেশের বায়ুতে তখনো ইয়ংবেঙ্গলের কালাপাহাড়ী জীবাণু ভাসছে। শ্রীম ছিলেন হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। ছাত্র মানে কী, সে যুগের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় হওয়া ছাত্র। ইংরেজীতে যাকে বলে gigantic scholar।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রকে প্রথম থেকেই চিহ্নিত ক'রে রাখলেন। মানুষ চিনতেন তিনি। তা চিনবেন না, তিনি যে ছিলেন মানুষগড়ার ভাস্কর। উত্তম রত্ন দেখলে যেমন মণিকারের, প্রথম শ্রেণীর মাটি বা পাথর দেখলে যেমন মৃৎ বা প্রস্তরশিল্পীর যেমনটি মনের অবস্থা হয়, অনেকটা যেন সেই রকম হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। অবশ্য নরেন্দ্রকে প্রথম দেখা মাত্রই যা হয়েছিল তা নজীরহীন। নরেন্দ্রও ভাবছিলেন, লোকটা পাগল নাকি? উপায়ান্তর ছিল না তো! নরেন্দ্র ছিলেন আকাশের মতো বৃহৎ, হিমালয়ের মতো গম্ভীর, সমুদ্রের মতো অতল আবার সমুদ্রেরই মতো উত্তাল-উচ্ছল। কেশবের মাত্র একটা গুণ আর নরেন্দ্রের আঠারটা। নরেন্দ্রকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের তাই উথাল পাথাল। না-না, সে তুলনা আনব না। নরেন্দ্রের সঙ্গে আর কারোর তুলনাও বাতুলতা, কিন্তু শ্রীম'র দ্বিতীয় দর্শনে তিনি বিবাহিত শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের সোচ্চার খেদোক্তি স্মরণ করুন, শিউড়ে

উঠে রামলালকে ডেকে বললেন, ওরে রামলাল! যাঃ বিয়ে ক'রে ফেলেছে। দেখলেন যে, শুধু বিয়েই নয়, ছেলেপুলের বাপও হয়েছে, একে আর সংসার ছাড়িয়ে আনা চলবে না। ঘরে রেখেই একে দিয়ে তাঁর কাজ করিয়ে নিতে হবে। লেগে গেলেন তৈরী ক'রে নিতে। মানুষগড়ার ভাস্কর লেগে গেলেন প্রাকৃত মানুষকে দেবমানুষে পরিণত করতে। কর্তন, কুঁদন শুরু হ'য়ে গেল। লিওনার্দো বা রোদ্যাঁর তৈরী প্রস্তর মূর্তিকে কি তাঁরা প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যে চৈতন্য সঞ্চার ক'রে দিতেন। 'কথামৃতে'র সাবধানী পাঠকের সোৎসুক চোখে শ্রীম'র এই ক্রম-রূপান্তর বিস্ময় জাগায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য। ঈশ্বরই বলুন আর ব্রহ্মই বলুন, ব্রহ্ম বলাই ভাল, কারণ কথাটা বেদান্তের, তিনি তো অস্তি,—অস্তি ভাতি প্রিয়। লক্ষ বছর আগেও তিনি অস্তি, লক্ষ বছর পরেও তিনি অস্তি। অর্থাৎ তিনি চিরকালের বর্তমান। ঈশারউড বলেন, রামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকা মানে এই চিরকালের বর্তমানের উপস্থিতিতে আসা। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কত লোকই তো যেত, তাদের মধ্যে কজনই বা তা বুঝতো, জানতো। কিন্তু শ্রীম জানতেন; জানতেন প্রথম থেকেই। এই কথাটি আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব'লে মনে হয়। এই সত্য ঘটনাটি দু-প্রান্ত থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমে শ্রীম'র দিক থেকে। শ্রীম'র প্রান্ত থেকে দেখলে বলতে হয় যে, প্রথম থেকেই যে তিনি ধরতে পেরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মনুষ্যশরীরে ঈশ্বর। তাতে বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসবার আগেই তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব কী দীর্ঘদেহী ছিল, যেন অন্য অনেককে ছাড়িয়ে মাথায় উঁচু। এই হ'ল একটি; দ্বিতীয়, (মনে আছে, দ্বিতীয় দর্শনেই শ্রীম'র সব তর্ক, সব সংশয় নিঃশেষে মিটে গিয়েছিল?) তার মানে দাঁড়ালো, শ্রীম'র বিশ্বাস ছিল স্বতঃসিদ্ধ। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রান্ত থেকে দেখা যাক ঈশারউডের কথাটাকে। 'কে তোমাকে জানতে পারে তুমি না জানালে পরে?' 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' এই শ্রুতিবচন অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে নিজে না চিনিয়ে দিলে শ্রীম'র সাধ্য ছিল না তাঁকে চেনেন। অর্থাৎ শ্রীমকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রীম'র মনে স্বীয় স্বরূপ প্রকট ক'রে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে দিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, আসল হ'ল নরেন্দ্র আর মহেন্দ্র। এই দুজন গোড়া থেকেই চিহ্নিত হ'য়ে রইলেন। একজন 'ঘরে বাইরে হাঁক দিবে' অর্থাৎ দেশে ও বিদেশে প্রচারের জয়রথ চালাবে, আর একজন এক জায়গায় বসে 'ভাগবত শোনাবে' অর্থাৎ তাঁর অমৃত জীবনলীলা যথাযথ বর্ণনা করবে কলমের মুখে এবং স্বীয় কণ্ঠে। যে রেকর্ড রাখবে সে যাতে প্রথম দিন থেকেই লিখে রাখতে পারে, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দিনেই নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। যীশু পিটারকে দেখিয়ে বলেছিলেন: 'upon this rock I will build my church. (এই পাথরের উপর আমি আমার মণ্ডলী গাঁথব—ম্যাথু ১৬ : ১৮) এতে কি কোন সন্দেহ আছে যে, এ যুগের যীশু শ্রীরামকৃষ্ণ যদি এ ভাষায় কথা বলতেন, তাহলে বলতেন নরেন্দ্র আর মহেন্দ্রকে দেখিয়ে, upon these two rocks I will build my church? রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন গসপেল সম্বন্ধে 'almost Stenographic exactitude' (প্রায় লিপি-লিখনের মতোই খাঁটি)। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি একটা Phenomenon অর্থাৎ বাস্তবে অদৃষ্টপূর্ব একটা ঘটনা হন, তবে সেই Phenomenon-কে বাস্তবে একটা ভিত্তি যোগাতে পারে একমাত্র

শ্রীম'র রচিত কথামৃত। এই সংশয়ভরা যুগে পাশ্চাত্যে যখন accuracy-র প্রমাণ নিয়ে এত খুঁতখুঁতি, কেবল ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ কোন গ্রন্থ বিচারশীল বহির্বিশ্বের চোখে গ্রাহ্য হবার নয়। সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের পক্ষে শ্রীম-রচিত কথামৃতের অপরিহার্যতা। সাধে কি আর ঈশারউড বলেছেন: "শ্রীম-আমাদের এবং সমস্ত ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের যে উপকার ক'রে গেছেন, তা প্রকাশ করতে এমন কিছু বলা সম্ভব নয়, যাতে মনে হবে বড় বাড়িয়ে বলা হ'ল।" (Ramakrishna and his disciples, পৃঃ ২৮২)।

[ক্রমশঃ]

নানাপ্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

শ্রদ্ধা ও সত্যই ব্রাহ্মণত্ব

অনেক কাল আগের কথা। দুঃখিনী বিধবা জবালা—তাঁর একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটির নাম সত্যকাম। একদিন সত্যকামের ইচ্ছা হ'ল, উপযুক্ত কোন আচার্যের কাছ থেকে উপবীত গ্রহণ ক'রে, তাঁর আশ্রমে থেকে বেদ পড়বে। সত্যকাম মায়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা ক'রল। মা তো শুনেই চমকে উঠলেন। তিনি অতি গরীব—অন্যের বাড়িতে কাজ ক'রে, বনের কাঠ কুড়িয়ে কোনমতে ঐ একটি মাত্র ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছেন। অঞ্চলের ধন—অন্ধের হাতের যষ্টি, ঐ পুত্রকে কেমন ক'রে কাছ ছাড়া করবেন? তখনকার দিনে নিয়ম ছিল—উপনীত না হ'য়ে কেউ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারত না। অধ্যয়ন করতে গেলে তাকে গুরুগৃহে যেতে হ'ত। তাকে শিষ্যত্বে বরণ করার আগে প্রশ্নাদি ক'রে গুরু জেনে নিতেন—বেদাধিকার আছে কি না—তার কি গোত্র, বংশের কি পরিচয়—ইত্যাদি। সত্যকাম অনেক ক'রে অনুনয় এবং আবদার জানিয়ে জননীর অনুমতি পেয়েছিল। তাই আচার্যের কাছে যাওয়ার আগে মাকে জিজ্ঞাসা ক'রল: 'মা, আমাদের কি গোত্র, ব'লে দাও।' উত্তরে জননী জবালা বলেছিলেন: 'বাবা, আমি তো তা জানি না।' অতি বালিকা বয়সেই তিনি পতিহারা হয়েছিলেন। তখন স্বামীর কুল-গোত্রাদির বিষয় জানার মতো বুদ্ধি বা অবকাশ তাঁর ছিল না। জবালা তাই বলেছিলেন: 'বাবা, পতিগৃহে থাকার সময় অতিথি ও অভ্যাগতদের পরিচর্যায় আমি সর্বদা ব্যস্ত থাকতাম। তোমাকে কোলে নিয়েই আমি অনাথা হয়েছি। তাই তোমাদের গোত্র-পরিচয়, তা তোমার বাবার কাছ থেকে আমি জেনে নিতে পারিনি।' সত্যকাম জিজ্ঞাসা ক'রল: 'মা, তবে আচার্যদেব যখন প্রশ্ন করবেন, তখন আমি কি ব'লব?' জননী জবালা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন: 'তুমি বলবে,—আমার মায়ের নাম জবালা।' সত্যকাম মাতৃমুখে এই কথা শুনে বুঝল—সে জবালার তনয়, অতএব তার নাম সত্যকাম জাবাল। এই তার একমাত্র পরিচয়। জননীর পদধূলি মাথায় নিয়ে সত্যকাম ঋষি গৌতমের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ঋষিকে প্রণাম নিবেদন ক'রে করজোড়ে সত্যকাম ব'লল: 'হে ভগবন্! ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে আপনার কাছে বেদাধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক। কৃপা ক'রে আমাকে উপনীত করুন—এই প্রার্থনা।' বালক সত্যকামের সৌম্য মূর্তি দেখে ঋষি গৌতম প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'হে সৌম্য! তোমার পরিচয় বলো, তোমার গোত্র কি?' সত্যকাম নিঃশঙ্কচিত্তে সরল উত্তর দিল:

'আমি জবালার পুত্র,—আমার নাম সত্যকাম জাবাল।' আচার্য বালকের এই সরল সত্যবাদিতায় ভারী খুশি হলেন। তিনি প্রশান্ত বদনে বললেন: 'তুমি সত্য হ'তে বিচ্যুত হও নি, তুমি অকপটে সত্য কথা বলেছ। তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি তোমাকে উপনীত ক'রব। যাও, তুমি সমিধ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস।'

সত্যকাম সমিধ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলে, আচার্য গৌতম তাকে ব্রহ্মচর্য দিয়ে শিষ্যত্বে বরণ ক'রে নিলেন। নব উপনীত সত্যকামকে গুরু তখন বললেন: 'বৎস, আজ থেকে তোমার নতুন জন্ম হ'ল। জ্ঞানার্জনরূপ মহৎ ব্রত তুমি গ্রহণ করলে। কিন্তু মনে রেখো, আচার্য বা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং গুরু-আজ্ঞা-পালন এই জ্ঞানলাভের পথে অপরিহার্য উপায়। সত্যকাম সবিনয়ে জানালো—গুরুর আদেশ সে আজীবনের জন্য মাথা পেতে স্বীকার ক'রল। ঋষি গৌতম স্মিত হেসে বললেন—বেশ তবে পরীক্ষা দাও। আচার্য তখন শিষ্যকে নিয়ে চললেন তপোবনের গোশালায়। সেখানে যে-সব গরু ছিল তার মধ্য থেকে বেছে বেছে চারশত দুর্বল শীর্ণ গরু সত্যকামকে দিয়ে ঋষি বললেন: 'এই গরুগুলিকে নিয়ে দূরে কোথাও শ্যামল বনভূমিতে যাও এবং এদের প্রতিপালন ক'র।' আরো ব'লে দিলেন—'গরুগুলি যখন সংখ্যায় সহস্র হবে, তখন ফিরে আসবে।' আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার সময় সত্যকাম প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লল: 'হে ভগবন্! সহস্র গরু না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরে আসব না।'

তৃণজলাদিপূর্ণ একটা অরণ্যের মাঝে গরুগুলিকে নিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বাস করতে লাগল দুঃখিনী জবালার নয়নমণি সত্যকাম! অনেক বছর ধরে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গরুগুলিকে সে প্রতিপালন ক'রল। একদিন দিক্-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু সত্যকামের এই শ্রদ্ধা ও কঠোর তপস্যা দেখে তার উপর খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি একটা বৃষের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, তাকে সম্বোধন ক'রে বললেন: 'সত্যকাম! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে, আমরা সহস্র হয়েছি, এবার আমাদের আচার্যের আশ্রমে নিয়ে চল।' এই বায়ু দেবতা তাকে পরব্রহ্মের চারটি পাদের মধ্যে একটি পাদ বা অংশ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিলেন এবং বললেন: 'অগ্নি দেবতা তোমাকে পরব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদের বিষয়ে কিছু বলবেন।' এইভাবে সত্যকামের আচার্য-গৃহে ফিরে আসার পথে হংস অর্থাৎ আদিত্য দেবতা ও মদ্গু অর্থাৎ পানকৌড়ি নামক জলচর পাখি তাকে পরব্রহ্মের অপর দুটি পাদের বিষয়ে উপদেশ দেন। সত্যকাম যখন মহর্ষির তপোবনে ফিরে এল, তখন তার সহাস্যবদন, প্রশান্তদৃষ্টি। এই দেখে আচার্য তাকে বললেন: 'হে সৌম্য! ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল দীপ্তি পাচ্ছে, তোমাকে কে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমি জানতে ইচ্ছা করি।' উত্তরে সত্যকাম বললেন: 'হে ভগবন্! কোন মানুষ আমাকে উপদেশ দেয়নি, দেবতাগণই আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু হে ভগবন্, আপনার ন্যায় মহাত্মাগণের কাছে শুনেছি যে, আচার্যগণের কাছে শ্রুতবিদ্যাই উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। অতএব, আমি যে-উদ্দেশ্যে আপনার কাছে এসেছিলাম, এখন সে-বিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন।' পথে সত্যকাম পরমাত্মা বিষয়ক যে-সব উপদেশ লাভ করেছিল গৌতম ঋষি তাকে আবার সেই বিদ্যারই সবিস্তার উপদেশ দিলেন।

এইভাবে গোত্র-গরিমাহীন দরিদ্র জবালা-নন্দন সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ ক'রে, তাঁর জীবনের পরম উচ্চাশাকে সফল করেছিলেন। উত্তরকালে এই সত্যকাম জাবাল একজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্রূপে জগৎপূজ্য হয়েছিলেন। সত্যকামের জীবনের পশ্চাতে কিছুই ছিল না, কিন্তু ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, সরলতা আর সত্যানুরাগ।

[কাহিনীটি সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের।]

স্মৃতি সঞ্চয়ন

'সব কাজই সাধন'

সারগাছি আশ্রম। সন্ধ্যায় আরতির পর আশ্রমবাসী সকলেই 'বাবা'র (স্বামী অখণ্ডানন্দজীর) চরণপ্রান্তে গিয়ে বসতেন। গম্ভীর মিষ্টি দুটি চারটি কথায় জিজ্ঞাসু মনের সব সংশয় কী সুন্দরভাবে মিটিয়ে দিতেন তিনি! একদিন প্রশ্ন উঠেছিল, সাধন কাকে বলে! উত্তরও খুব সহজ ছিল: 'যা কর তাই সাধন মনে ক'রে কর। কোথাও যাচ্ছ, মনে কর তাঁকে পাবার উপায় ব'লে যাচ্ছি। যখন খাচ্ছ, মনে কর খাওয়া থেকে শরীর ধারণ, শরীর শক্ত সবল হ'লে সাধন-উপযোগী হবে, সাধনভজন করতে পারবে।'

সহসা বুঝি কারও মনে সংশয়ের গুঞ্জন উঠেছিল—'যা ক'রব তাই সাধন মনে ক'রে ক'রব—!! ভাল কথা। কিন্তু খাওয়াটাও সাধন ?' চকিতের মধ্যে অনুচ্চারিত এই সন্দেহেরও ভঞ্জন হ'য়ে গেল ;—'বাবা' ব'লে চললেন: 'খাচ্ছি—বাঁচব ব'লে, বাঁচছি—তাঁকে পাব ব'লে। সব কাজই সাধন। যে কাজে তাঁকে পাব না ব'লে মনে হবে, সে কাজ—সে ভাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবে। সব কিছুর ভেতর দিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টাই সাধন।'

আর একদিন কথা হচ্ছিল ধ্যান নিয়ে। গভীর আবেগভরে বাবা সেদিনও বলেছিলেন: 'আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সব বহির্মুখী। বাইরের অবলম্বন দিয়ে দিয়েই তাদের অন্তর্মুখী করতে হবে। ওই জন্যই পূজা-আরতি-ভোগরাগ, ধূপ-দীপ, ফল ফুল, এত কাণ্ড! মনটাকে engaged (নিযুক্ত) রাখবার জন্য—তাঁর কাজে, তাঁর কাছে।...ধ্যান করবে একটা বিষয় নিয়ে—যেন অনেকক্ষণ ধরে আরতি ক'রছ; ধূপ কর্পূর দিয়ে হ'য়ে গেল—দীপ দিয়ে কর, চামর দিয়ে কর—যেন শেষ হ'তে না চায়। অনেকক্ষণ পরে যদি তাতে আর ভাল না লাগে, মনে কর যেন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছ—নানারকম ফুলের, নানা রঙের। মালা পরাচ্ছ, নানারকম খাবার জিনিস নিবেদন ক'রছ—এই রকম অবিচ্ছিন্ন ভাবনার ধারা—এই তো ধ্যান।...আর সর্বদা একটা প্রার্থনার ভাব—একটা উচ্চ চিন্তার স্রোত থাকা চাই যে, আমাকে এই জীবনেই তাঁর দেখা পেতে হবে—তাঁকে ডেকে ডেকে ডাকার পালা শেষ করতে হবে।'

জ্ঞান-বিজ্ঞান

এসেন্স-অগুরু

অগুরু এসেন্স (essence) অনেকে পূজার্চাদিতে ব্যবহার ক'রে থাকেন, কিন্তু এটা কি থেকে তৈরি হয়, তা কি জানেন? এটা তৈরি হয় অগুরু কাঠ হ'তে। এই কাঠ পাওয়া যায় আসাম রাজ্যের চারটি জেলায় (জোড়হাট প্রভৃতি)।

অগুরু গাছ প্রায় ২০ মিটার লম্বা হয়। এই গাছ চেনা খুবই শক্ত—সামান্য কিছু অভিজ্ঞ লোক এই গাছ চেনে। গ্রামের ঐ অভিজ্ঞরা বিষয়টিকে নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখে। ২০ মিটার এই গাছের সবটা হ'তে তেল পাওয়া যায় না। গাছের একটা অংশে এক ধরনের বিচিত্র রোগ সংক্রামিত হয়। ঐ অংশ থেকে একটা সুগন্ধ ভেসে আসে। ডালের ভিতরে সংক্রমণ শুরু হ'লে বাইরে কালো

রঙ ফুটে ওঠে। এই সংক্রামিত অংশটা সাধারণতঃ এক মিটার লম্বা হয়। এই অংশটা ছাড়া অগুরু গাছের বাকী অংশের মূল্য সাধারণ কাঠের মতো। সংক্রামিত অংশটি কেটে জলে ভিজিয়ে নিয়ে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা তেল পাওয়া যায়।

এই সংক্রামিত এক কিলো কাঠের মূল্য বর্তমানে ৪০ হাজার টাকা। এক কিলো ঐ তেল হ'তে কয়েক কিলো এসেন্স তৈরি করা যায়। আর ঐ কাঠের ছিবড়ে চলে যায় হায়দরাবাদে ও মহীশূরে, যেখানে তা থেকে সুগন্ধি ধূপ তৈরি হয়। ছিবড়ের বাজার দর প্রতি কিলো ৭০ পয়সার মতো।

জানা গেছে—আসামের ঐ অঞ্চলের নাগরানী গ্রামেই বছরে দু-শত কেজি তেল তৈরি হ'য়ে থাকে, যার সাম্প্রতিক মূল্য প্রায় আট কোটি টাকা। শোনা যায়—জোড়হাটে চারটি ঘাঁটিতে এ-রকম তেল তৈরি হয়।

দেশ-বিদেশ

দুই মহাদেশ জুড়ে একটি দেশ

ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে যে-দেশ,—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আয়তন যার সবচেয়ে বেশী (২২০ লক্ষ বর্গ কি. মি.)—সে-দেশের নাম রাশিয়া। জনসংখ্যা ২৬ কোটি ৪৫ লক্ষ (১৯৮০)। এখানে শুধু রাশিয়ানরা বাস করে না, তাদের সঙ্গে বাস করে পোল, তাতার, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতির মতো ১০০টি জাতি। এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার যে-অংশ আছে, তাকে বলে সাইবিরিয়া। এখানে সারা বছরই শীত থাকে, শীতকালে সবটা দেশ বরফে ঢেকে যায়। সাইবিরিয়ার বৈকাল হ্রদটি পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম হ্রদ (৪,৫০০ ফুট গভীর)। ইউরোপে রাশিয়ার যে-অংশ, সেখানেও প্রচণ্ড শীত পড়ে।

রাশিয়া বহু শতাব্দী পর্যন্ত অনুন্নত, অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ দেশ ছিল। ইউরোপের সভ্য দেশগুলির সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ ছিল না।

বলা হয় যে, ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরদেশীয় সুইডেনবাসী রুরিক-নামে এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রিদল ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের নিকট রাশিয়া রাজ্যের পত্তন করেন। স্কানডিনেভিয় ঔপনিবেশিকদের 'রুস' নাম থেকে রাশিয়া নাম হয়। উত্তরদেশের এই বিজেতারা ক্রমে বিজিত স্লাভজাতিদের সঙ্গে সভ্যতায় ও রীতিনীতিতে এক হ'য়ে যায়। রুরিক-বংশধরগণ আশপাশের বহু দেশ জয় ক'রে রাজ্য বিস্তার করেন। রুরিক-বংশের একজন বিখ্যাত রাজা ভ্লাডিমির। ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই রাশিয়া গ্রীক-খ্রীষ্টধর্মের প্রধান সাহায্যকারী হ'য়ে ওঠে।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে দুর্ধর্ষ মঙ্গোলিয়ান চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁর বংশধরগণ দলবল নিয়ে বার বার হানা দিতে থাকেন এবং শীঘ্রই রাশিয়া তাঁরা অধিকার ক'রে নেন। প্রায় ২৫০ বছর তাঁদের অধীনে রাশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণকে থাকতে হয়। ফলে, স্লাভজাতিদের জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে বহু দেরী হয়।

মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলে, ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর এক শক্তিশালী সামন্ত-জমিদার আইভান দি গ্রেট মঙ্গোল-রাজাদের কর দিতে অস্বীকার করেন। তাঁকেই রাশিয়ার প্রথম রাজা বলা হয়। তাঁর পৌত্র নিষ্ঠুর আইভান দি টেরিবল্ প্রথম 'জার' বা সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। রাজশক্তি স্বাধীন হলেও ১৭শ শতাব্দী

পর্যন্ত রাশিয়ায় পুরাতন প্রথা চালু ছিল এবং তার প্রতিপত্তি বা নাম ইউরোপে আদৌ ছিল না।

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার হন রোমানফ্-রাজবংশের পিটার দি গ্রেট (রাজত্বকাল—১৬৮২-১৭২৫ খ্রীঃ)। তিনিই প্রথম রাশিয়ায় যে-সব কুপ্রথা ছিল তা দূর করার এবং জনগণকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে, দেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থাদি ক'রে ইউরোপীয় সভ্যতায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর সময়ে পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর জার্মান মহিলা ক্যাথারিন দি গ্রেট রাশিয়ায় সম্রাজ্ঞী হন। তিনি যেমন সুদক্ষ, শক্তিশালী শাসক, তেমনি নিষ্ঠুর ও ক্রূর স্বভাবের ছিলেন। পিটার দি গ্রেটের আমল থেকেই রাশিয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। কারণ রাশিয়ার কৃষকেরা ছিল জমিদারদের দাস। তাঁর এবং ক্যাথারিনের সময় কৃষকদের কোন উন্নতিই হয়নি। ক্যাথারিনের পরবর্তী জারদের আমলেও কৃষকদের কোন উন্নতি হয়নি, পরন্তু জনসাধারণের দাসত্ব কঠোরভাবে চ'লত। ক্যাথারিনের পর ১ম আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার জার হন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাশিয়া ক্রিমিয়া যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয়। ফলে, রাশিয়ার জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তখন তাদের শান্ত করতে ২য় আলেকজাণ্ডার (রাজত্বকাল—১৮৫৫-৮১ খ্রীঃ) কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য দাসপ্রথা তুলে দেন। তাঁর সময়ে প্রজাদের আর্থিক কিছু উন্নতি হলেও দেশ-শাসনের ব্যাপারে তাদের হাতে তিনি ক্ষমতা দেননি। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইভাবে চলেছিল।

দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত হ'তে হ'তে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। ফলে, নিহিলিস্ট দল নামে রাশিয়ায় একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জারের রাজত্ব উচ্ছেদ ক'রে দেশের প্রজাদের হাতে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া। এই দলের বোমার আঘাতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২য় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ২য় নিকোলাস (রাজত্বকাল—১৮৯৪-১৯১৭) জার পদ লাভ করেন। পূর্বের জারদের আমল থেকে তাঁর রাজত্বকাল পর্যন্ত কিভাবে জারেরা দেশের জনগণকে শোষণ ক'রে চরম দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিয়েছিল, তা একটি ঘটনায় সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। ২য় নিকোলাসের অভিষেক-উৎসবে এক টুকরো রুটি আর একটি এনামেল-গ্লাসের জন্য মস্কোয় লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল প্রচণ্ড ভিড়ে জনতা বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়লে পুলিশ কী নির্মমভাবে গুলি ক'রে শত-শত মানুষকে মেরে ফেলেছিল! স্বামী বিবেকানন্দ তখন (১৮৯৬) লণ্ডনে ছিলেন। গুডউইন খবরের কাগজে প্রকাশিত এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি পড়ে শুনালে, তিনি ভীষণ-ভাবে বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। বেদনাহত হৃদয়ে ছট্‌ফট্ ক'রে পায়চারি করতে করতে স্বামীজী বলেছিলেন : 'কি দুঃখ! কি কষ্ট! একটা এনামেল-গ্লাস পাবার জন্য শত-শত লোক গাঁ ছেড়ে শহরে এল, আর গুলিতে মরল! একী গরীব দেশ! লোকেরা খেতে পায় না। নিজেদের এত হীন মনে করে যে, দু-গণ্ডা পয়সার জন্য, একটা গ্লাসের জন্য প্রাণ দিল! এই জারের অভিষেক-উৎসব! বীভৎস হত্যাকাণ্ডের এই স্মৃতি! অভিষেকের কথা উঠলেই তো নরহত্যার স্মৃতি মনে ভেসে আসবে। জারের সামনে এ-জিনিস ঘটল। কি দুঃখ! কি দুঃখ! লোকগুলো এমন অবস্থায় রয়েছে।'

রাশিয়ার যখন এই রকম অবস্থা, তখন চীন দেশেও উনবিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চু-রাজাদের দুর্বল শাসনে এবং বিদেশীদের অত্যাচারে দেশের

জনগণের অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে পড়েছিল। আর সেই সঙ্গে ছিল দীর্ঘদিনব্যাপী ধ্বংসকারী 'তেইপিং বিদ্রোহ'। ফলে, চীনের অবস্থা শোচনীয় ভাবে খারাপ হ'য়ে প'ড়েছিল। এ-হেন দুটি দেশের পুনরভ্যুত্থানের বহু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: 'এরপর যে বিরাট অভ্যুত্থানের ফলে নবযুগের সূত্রপাত হবে, তা আসবে রাশিয়া বা চীন দেশ থেকে। ঠিক যে কোন্ দেশ তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্চি না—তবে তা রাশিয়া বা চীনই হবে।' বস্তুতঃ রাশিয়ায় আগে এবং পরে চীনে এই নবযুগের অভ্যুত্থান হয়েছিল।

উপরি-উক্ত অবস্থায় রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দল নামে আরও একটি বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল—পৃথিবীর সব দেশের ধনীদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া। ২য় নিকোলাস কঠোরভাবে এই মতবাদ প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু গোপনে প্রচার চলতে থাকে। এই সমাজতান্ত্রিক দলের সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ (ছদ্মনাম লেনিন)। তাঁর দুজন প্রধান সহকারী ছিলেন ইওসিফ ভিসারিয়োনোভিচ যুগাশভিলি (ছদ্মনাম স্টালিন, যার অর্থ 'ইস্পাতের তৈরি মানুষ') ও লিওন ডেভিডোভিচ ব্রনস্টিন (ছদ্মনাম ট্রটস্কী)। এঁদের নেতৃত্বে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বড় রকমের একটি বিপ্লব হয়, কিন্তু এই বিপ্লব ব্যর্থ হ'য়ে যায়। এই বিপ্লবকে 'প্রথম বলশেভিক বিপ্লব' বলে। এই বিপ্লবের দু-বছর পূর্বে সমাজ-তান্ত্রিক দলটি 'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক'—দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। 'বলশেভিকে'র অর্থ যে-দলে অনেক লোক আছে, আর 'মেনশেভিকে'র অর্থ যে-দলে অল্পসংখ্যক লোক আছে। বলশেভিক দলের নেতা ছিলেন লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রীঃ)।

'বলশেভিক বিপ্লব'কে ব্যর্থ করার জন্য ২য় নিকোলাস কঠোর হাতে দমন করলেও, তিনি দেখেন যে, বিপ্লব শান্ত ও জনগণের অসন্তোষ ভাব দূর করতে হ'লে প্রজাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দিতে হবে। ১৯০৫ তাই তিনি একটি রাশিয়ান পার্লামেণ্ট গঠন করেন। তাকে ডুমা বলে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া জার্মানদের কাছে হেরে যাওয়ার উপক্রম হ'লে রাশিয়ানদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গে (বর্তমানে লেনিনগ্রাড) একটি বিরাট ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটীদের সায়েস্তা করার জন্য রাশিয়ার দুর্ধর্ষ কশাক-সৈন্য পাঠালেন ২য় নিকোলাস। সৈন্যরা তাঁর উপর নানা ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল। তারা ধর্মঘটীদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারা একত্র হ'য়ে দেশের থানাগুলি অধিকার ক'রে নেয়। এত বড় বিপ্লব নেতারা সামলাতে পারছিলেন না। এই সময় লেনিন সুইট্জার-ল্যাণ্ডের জুরিক শহরে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন। তিনি খবর পেয়ে রাশিয়ায় এসে নেতৃত্বের ভার নেন। তিনি ধর্মঘটীদের সুসংহত ক'রে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লব প্রচণ্ড আকারে আরম্ভ করেন। একদিনেই রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গ তাঁরা দখল ক'রে নিলেন। জার-বংশের কোন লোক যাতে ভবিষ্যতে রাশিয়ার সিংহাসন অধিকার করতে না পারে তার জন্য ২য় নিকোলাসকে সপরিবারে ও সবংশে গুলি ক'রে তাঁরা হত্যা করেন।

লেনিন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেন দেশের সমস্ত জমি কৃষকদের। কৃষকরা জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয়। কিন্তু শ্রমিকদের বেলায় তা হ'ল না। বিপ্লবীরা চেষ্টা ক'রে শ্রমিকদের খাবার জিনিস, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯১৭-তে বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেশের সমস্ত গোলোযোগের অবসান হ'য়ে সমাজতন্ত্রী বলশেভিকদল সম্পূর্ণরূপে জয়ী হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট নামে এক নতুন গভর্নমেণ্ট তৈরি হয়। কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে শহরে শহরে এক-একটি সমিতি গঠিত হয়—তারই নাম সোভিয়েত।

২১শে জানুআরি ১৯২৪, লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন (১৮৭৯-১৯৫৩) দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী-বন্ধনের উপর ভিত্তি ক'রে প্রথমে রাশিয়ায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় মন দেন। তাঁর মৃত্যুর পর ম্যালেনকভ ঐ পদ লাভ করেন। তিনি বেশীদিন ঐ পদে ছিলেন না। রাশিয়ার মন্ত্রী-পরিষদের সভাপতি হন বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত কম্যুনিস্ট দলের সম্পাদক হন। তাঁরা দুজন ক্ষমতাচ্যুত হ'লে সম্প্রতি প্রয়াত (১০. ১১. ৮২) লিওনিদ্ ইলিচ ব্রেজনেভ সোভিয়েত কম্যুনিস্ট দলের সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পাদক ও সভাপতি হয়েছিলেন।

রাশিয়ার নাম হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া। ১৬টি স্বাধীন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র এখন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত রাষ্ট্রসমূহ: সোভিয়েত রাশিয়া (মস্কো), ইউক্রেইন (কিয়েফ), শ্বেতরুশিয়া (মিন্‌সিক), উজবেকিস্তান (তাশকেন্ত), কাজাকস্তান (আলম-আতা), জর্জিয়া (ত্‌বিলিসি), আজারবাইজান (বাকু), লিথুয়ানিয়া (বিলনিউস), মলদাভিয়া, (কিশিনেফ), লাতবিয়া (রিগা), কিরঘিজিয়া (ফ্রুন্‌জে), তাজিকিস্তান (স্টালিনাবাদ), আর্মেনিয়া (এরিবান), তুর্কমানিস্তান (আশখাবাদ), এসতোনিয়া (তালিন), কারেলো-ফিনিস (পেত্রোজাবোদ্)। দুটি কক্ষে বিভক্ত রাশিয়ার সর্বোচ্চ আইনসভার নাম সুপ্রীম সোভিয়েত।

সমালোচনা

শপ-লিফটার: দিগন্ত রায়। **প্রকাশক:** এস. কে. দত্ত। ১৮০ টেগোর পার্ক, দিল্লী ১১০ ০০৯। পরিবেশক: দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭৩। (১৩৮৮), পৃঃ ২০৮। মূল্য: ১০ টাকা।

সাহিত্যের গতিশীলতাই সাহিত্যের প্রাণ। যে-সাহিত্য গতানুগতিক কিংবা কোন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির—অচঞ্চল—বলা বাহুল্য, সে-সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটেছে! বর্তমান বাংলা-সাহিত্যকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তার উজ্জ্বল সম্ভাবনাই প্রতীয়মান হয়।

রম্যরচনার পর্যায়ভুক্ত আলোচ্য গ্রন্থটি সমাজের —বিশেষ ক'রে উপরতলার বিদগ্ধ মানুষের—যাঁরা জ্ঞানে-গুণে-পরিচয়ে বা অর্থকৌলীন্যে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদেরই চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের সার্থক দ্যোতনা। প্রসঙ্গ একটিই। তা হ'ল শপ-লিফটারদের জীবনকাহিনীর একটি দিক—যারা বিপণনকেন্দ্রে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে বা দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত চুরির দায়ে ধরা পড়ে।

আইনের দৃষ্টিতে শপ-লিফটার মাত্রই অপরাধী, হলেও মনোবিজ্ঞানীদের বিচারে এদের মধ্যে বেশ কিছু *Kleptomaniac* বা *Schizopherenic*-ও আছে। লেখক এমন কিছু মানুষকেও তাঁর এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকারূপে উপস্থাপিত করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হ'ল। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে সেদিক দিয়ে গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত হবে। লেখকের রচনাভঙ্গি সরস ও প্রাঞ্জল। রম্যরচনার রসাস্বাদের ক্ষেত্রে

পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জনে গ্রন্থকারের শিল্পী-সম্মিত পরিবৃত্তি-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। লেখকের এই সাহিত্যসৃষ্টি—বেগবতী উত্তাল বাংলাসাহিত্য-সমুদ্রে যেন একটি উচ্ছল স্রোতস্বিনীর সার্থক সঙ্গম !...ছাপা, বাঁধাই আশানুরূপ। প্রচ্ছদ হৃদয়গ্রাহী—মনোরম। মূল্যও মাত্রাধিক নয়।

—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করা হইতেছে :

আনন্দরূপম্—শ্রীসুধীরেন্দু রায়। প্রকাশক : শ্রীপ্রমথনাথ পাল, ২সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯। (১৩৮৭), পৃঃ ৫২, মূল্য : ছয় টাকা।

মা সারদা—স্বামী অমৃতত্বানন্দ। প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ। (১৯৭৮), পৃঃ ৫০, মূল্য : চার টাকা।

লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীশচীন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীগুরু পুস্তকালয়, স্টেশন রোড, খড়দহ, ২৪ পরগনা। (১৩৮৫), পৃঃ ৪৮, মূল্য : এক টাকা।

জগদ্বন্ধু সুন্দরের ছোটবাবু নকুলেশ্বর—সত্যবন্ধু ব্রহ্মচারী (ভাগবত শাস্ত্রী)। প্রকাশক : শ্রীমাখন লাল ধর (বন্ধুসুন্দরানন্দ), জয় জগদ্বন্ধু আন্তর্জাতিক মিশন, বন্ধুসুন্দর কানন, নিবাধুই গভর্নমেণ্ট কলোনি, পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগনা। (১৩৮৫), পৃঃ ৫৮, মূল্য : তিন টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাঁচালি—অপর্ণা রায়। প্রকাশক : শ্রীমতী বকুল রায়, ১০নং রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃঃ ৯০, মূল্য : ২'৭৫ টাকা।

মার্কণ্ডেয়-সূত্র—শ্রীচিন্তাহরণ বিশ্বাস। প্রকাশক : গ্রাঃ চেচাখাতা, পোঃ আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা—জলপাইগুড়ি। (১৩৮৩), পৃঃ ৬৩, মূল্য : তিন টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম ও লৌকিক শিক্ষাদর্শ—শ্রীঅজিত ঘোষ। প্রকাশক : শ্রীঅসীমকুমার দে, মহুয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২০-এ গৌর লাহা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃঃ ৩০, মূল্য : এক টাকা।

শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী—শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : শ্রীমৎ অনন্ত-প্রকাশ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ, ২-বি, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা-৯। (১৩৮৫), পৃঃ ১৪৩, মূল্য : দুই টাকা।

শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন—ডক্টর শ্রীসুকুমার রঞ্জন দত্ত। প্রকাশিকা : শ্রীমতী রাণু দত্ত, 'বসু ভবন', ৪, বৈকুণ্ঠ সাহা রোড, কলিকাতা-৩২। (১৩৮০), পৃঃ ৮২, মূল্য : তিন টাকা।

ত্রমিতি (প্রথম খণ্ড)—শ্রীপরেশচন্দ্র পাল। প্রকাশিকা : শ্রীমতী হিরণবালা পাল, ৬-এ, ঈশ্বর মিত্র লেন, কলিকতা-৬। (১৩৮৬), পৃঃ ৬০, মূল্য : সাত টাকা।

মাদার টেরিজা—হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার। প্রকাশক : শ্রীশান্তনু দাস, চরৈবেতি সাহিত্যতীর্থ, পোঃ জগাছা, হাওড়া-৪। (১৩৮৭), পৃঃ ৪৩, মূল্য : দুই টাকা।

The Message of Dr. Radhakrishnan (Part-III)—Bhupendranath Roy. Published by Sraban Mahato, Golamara High School, P.O. Golamara, Dt. Purulia. (1980), p. 145, price : Not mentioned.

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে :

(১) **অন্ধ্রপ্রদেশে** শ্রীকাকুলাম জেলায় ১৯৮০-র বন্যায় বিধ্বস্ত গৃহগুলির নির্মাণকার্যের সহিত একটি ছোট মন্দিরের নির্মাণকার্যও চলিতেছে।

চলকম্বা ও অন্তর্ঝুলির নবনির্মিত কলোনিগুলি শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যাপীড়িতদের হস্তে অর্পিত হইবে।

(২) **পশ্চিমবঙ্গে** মালদহ জেলার পুনর্বাসন-কার্য চলিতেছে।

(৩) **উড়িষ্যায়** বন্যাত্রাণ: (ক) পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ১৪ সেপ্টেম্বর হইতে ২১ অক্টোবরের মধ্যে পুরী জেলার কাকাৎপুর অঞ্চলে ১১৪টি গ্রামে ৬০০ খানা কম্বল, ১০০০ খানা তোয়ালে, ১০০০ খানা ধুতি, ১৪০০ খানা শাড়ি ও ১৯১৬টি জামা বিতরিত হয়। এছাড়া প্রতিদিন ২৭ সেপ্টেম্বর হইতে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ২৫,২০০ ব্যক্তিকে পায়েস রান্না করিয়া খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ৩৮০ কিলো চিঁড়া; ৩৭৫ কিলো গুঁড়া দুধ, ১০০ কিলো গুড়, ৪০০ কিলো চিনি, ১৩০০ কিলো জ্বালানি কাঠ।

(খ) ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন কটক জেলার কুযুণ্ডা গ্রামের শিবির হইতে রান্না-করা খাবার ১০ সেপ্টেম্বর হইতে দুই সপ্তাহ যাবৎ ১৫টি গ্রামের ২৪,০০০ ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। এছাড়াও ১৭৬০ খানা শাড়ি, ১৩০ খানা ধুতি, ২০০টি ফতুয়া জামা, ১০০টি শার্ট ও ৬০০টি জামা বিতরণ করিয়াছেন।

বাংলাদেশে :

দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র ও চিকিৎসাকেন্দ্র যথারীতি পরিচালিত হইতেছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শে অনুরাগী তরুণ-তরুণীদের গত ৯ ও ১০ অক্টোবর, ১৯৮২ যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুল-কলেজের প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে।

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ৩০ ও ৩১ অক্টোবর যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে প্রায় ২৫০ যুবক।

দিনাজপুর

দিনাজপুর (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ আশ্রম তিনটি গ্রামে গত জানুআরিতে দুইটি ও সেপ্টেম্বরে একটি হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় আরম্ভ করিয়াছেন।

উৎসব

চিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে গত ২২ ও ২৩ মে, ১৯৮২ মিচিগানের গ্যাঞ্জেস টাউনে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০০ ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে এই দুই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী চেতনানন্দ ও মিঃ জন ডবসন।

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ২৯ আশ্বিন, শনিবার (১৬ অক্টোবর, ১৯৮২) রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা যথারীতি ভজন কীর্তনসহ মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। পূজকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বামী সুলভানন্দ।

গত ২৯ অক্টোবর স্বামী সুবোধানন্দজী এবং ৩১ অক্টোবর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়।

গত ৩১ অক্টোবর স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী অভজানন্দ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের সম্বন্ধে এবং স্বামী চেতনানন্দ 'ঠাকুরের বাউল' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং স্বামী অভজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা একজন সন্ন্যাসী ভ্রাতার দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী শ্রীকান্তানন্দ (সতীশ মহারাজ) গত ২৫ অক্টোবর ১৯৮২, রাত্রি ১০-১০ মিনিটে ফুসফুসে যক্ষ্মা এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি নানা পীড়ায় ভুগিতেছিলেন এবং ২৪ অক্টোবর চিকিৎসার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন।

তিনি শ্রীমৎ শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়া তিনি কিষেনপুর, বৃন্দাবন এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বেলুড় মঠ ডিস্পেন্সারির কর্মী ছিলেন।

ইঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন

আশ্বিন, ১৩৮৯ সংখ্যা পৃঃ ৪০৩ প্রথমার্ধের নিম্ন হইতে ১১ পঙ্‌ক্তিতে 'মহেন্দ্র শ্রীমানী রোড' স্থলে 'কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট' এবং কার্তিক, ১৩৮৯ সংখ্যায় পৃঃ ৫৪৪ দ্বিতীয়ার্ধের ঊর্ধ্ব হইতে ৯ম পঙ্‌ক্তিতে 'শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর' স্থলে 'শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী' হইবে।

বিবিধ সংবাদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

গত ২৮ ও ২৯ অগস্ট ১৯৮২, শনি ও রবিবার হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে ও বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের সহযোগিতায় দুইদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অনেকগুলি বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ জন যুবক যোগদান করে। দুইদিনের সম্মেলনে ভাষণ দান করেন স্বামী গহনানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী গীতানন্দ, স্বামী রুদ্রানন্দ, স্বামী সর্বাত্মানন্দ, স্বামী সর্বদেবানন্দ, শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্ল রায়, শ্রীঅলয় মজুমদার প্রভৃতি। 'বিবেকানন্দ রোভার্স ক্রু'র সদস্যগণ অনুষ্ঠান-ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেন।

হুগলী ঘুঁটিয়াবাজারস্থিত অশোক পাঠচক্র কর্তৃক গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্মেলন চুঁচুড়া 'রবীন্দ্রভবনে' স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ও রাজ্যপালের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ; এবং বক্তৃতা, সংগীত ও নাটকাদি অভিনয়ান্তে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বার্ষিক অধিবেশন

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল কর্তৃক স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে স্বামী বিকাশানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে গত ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ বার্ষিক অধিবেশন (১৯৮২) বক্তৃতা, ব্যায়াম, যোগাসনে ক্রীড়া-প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়

'বরাভয় লীলা' স্মরণোৎসব

শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানধন্য পুণ্যলীলাভূমি 'শ্যামপুকুর বাটী'তে গত ২৯ আশ্বিন, শনিবার কালীপূজার দিন স্বামী ভূতেশানন্দজীর উদ্বোধনী ভাষণের দ্বারা 'বরাভয় লীলা' স্মরণোৎসব-এর সূচনা হয়। রাত্রে স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ পূজা করেন। স্বামী গহনানন্দজী প্রমুখ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ পূজানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

'চিকাগো-দিবস' স্মরণোৎসব

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা) কর্তৃক গত ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ স্বামী অজজানন্দজীর সভাপতিত্বে 'চিকাগো-দিবস' স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রারম্ভিক ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সংস্কৃতিকে জগৎসমক্ষে যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তারই স্মরণে এই সভানুষ্ঠান। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত।

ভগিনী নিবেদিতা-আবির্ভাব উৎসব

গান্ধী কলোনী (টালীগঞ্জ) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রমে গত ৩১ অক্টোবর, ১৯৮২ ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাব-উৎসবে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শিবশম্ভু সরকার ও অধ্যাপক সমর চৌধুরী। উভয়েই 'ভারতের নারীজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে' নিবেদিতার বহুমুখী কর্মধারার উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভাশেষে সেবাশ্রমের সংগীতবিভাগ কর্তৃক "নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস" শীর্ষক একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

পরলোকে

শ্রদ্ধেয় বিনোবাজী (বিনায়ক নরহরি ভাবে) গত ১৫ নভেম্বর সকাল ৯-৩০ মিনিটে পাটনার পরমধাম আশ্রমে ৮৭ বৎসর বয়সে প্রয়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন। ৫ নভেম্বর হইতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জল স্পর্শ করেন নাই।

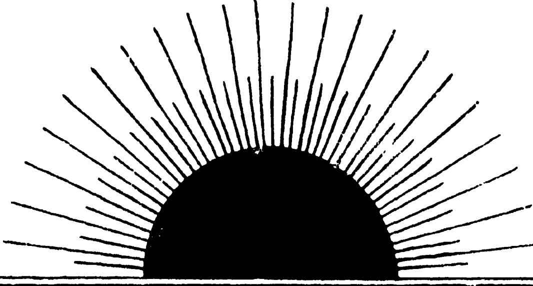
মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার পেন তালুকের ছোট্ট গ্রাম গাগোদায় ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫, তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সুপণ্ডিত, বহুভাষাবিদ্ এবং ছাত্রজীবনে মেধাবী ছিলেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে রওনা হইয়া পরীক্ষার হলে প্রবেশ না করিয়া তিনি ঈশ্বরানুসন্ধানে বারাণসীর পথে যাত্রা করেন। সেখানেই মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা খবরের কাগজে পড়িয়া অনুপ্রাণিত হইয়া দেশসেবায় পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করেন এবং জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আদর্শের অনুগামী ছিলেন। সরল মারাঠী ভাষায় তিনি গীতা ও উপনিষদ্ অনুবাদ করেন।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ গত ২২ অক্টোবর ১৯৮২, রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। উদ্বোধন পত্রিকায় তাঁহার বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ দীর্ঘকালের।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।



উদ্বোধন

২য় বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা ● আষাঢ়, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ২৭৮-২৯৬)

পুনর্মুদ্রণ

সূচী : ভাবদা অনাথাশ্রম (পূর্বানুবৃত্তি), রামকৃষ্ণ মিশনের নূতন দুর্ভিক্ষ মোচনাশ্রম, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার, সমালোচনা,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত),

হীরক-তত্ত্ব—(অনুকূলচন্দ্র ঘোষ লিখিত)

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উক্ত মাসিক সাহায্যের মধ্যে ১০৭৸০ টাকা কলিকাতা ইটালীর সদয় হৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ দেব মহাশয় কর্ত্তৃক, ইটালীর কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে, সংগৃহীত হইয়াছিল। উপেন্দ্র বাবুর সদুদ্যম ও ইটালীবাসী সহৃদয় সাহায্যকারীগণের অনুগ্রহে এই অনাথ আশ্রমের জীবনী-শক্তি বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যদি এই আশ্রমের দ্বারা লোকসমাজের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয়, ও উক্ত মহাশয়গণ যে সেই তৎকার্য্যানুষ্ঠান জনিত অমৃতের ভাগী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? স্থানীয় ইয়োরোপীয় রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ী মহোদয়গণ এবং দেশীয় জমীদার, উকিল ও মোক্তার মহোদয়গণের নিকট আমরা মাসিক সাহায্য স্বরূপ সর্ব্বশুদ্ধ ২৭১৷৷০ দুই শত সাড়ে একাত্তর টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। (ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ মিশনের

নূতন দুর্ভিক্ষ-মোচনাশ্রম।

দেশীয় ও বিদেশীয় দাতাগণের সহৃদয় সাহায্যে বোম্বাই অঞ্চলের খাণ্ডোয়া নামক স্থানে, গত ১লা মে তারিখে, রামকৃষ্ণ মিশন একটী দুর্ভিক্ষ-মোচনাশ্রম খুলিয়াছেন। অধ্যক্ষ—স্বামী সুরেশ্বরানন্দ। বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে দিব।

রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে

প্রাপ্তি স্বীকার।

উদ্বোধন গ্রাহক—মান্যবর বাবু রামলাল শেঠ, বড়বাজার, কলিঃ	...	১০০৲
" " —ডাক্তার নিতাই চরণ হালদার, পাথুরিয়াঘাটা, ঐ	...	১০৲
" " —উক্ত ডাক্তার বাবুর বাটী হইতে প্রাপ্ত	...	১৫৲

সমালোচনা।

"HINDUISM ANCIENT AND MODERN"

রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথ বি, এ, প্রণীত।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহা একখানি সময়োপযোগী পুস্তক। পুস্তকে গ্রন্থকারের হিন্দুশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, সমালোচনার শক্তি এবং অতি সমীচীনভাবে প্রাচীন ও বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের তুলনা দেখিয়া গ্রন্থকারের উপর অতিশয় শ্রদ্ধা স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় রচিত। আমরা আশা করি, এইরূপ গ্রন্থ ক্রমশঃ সমস্ত দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া সাধারণের শিক্ষার সহায়তা করিবে।

(অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৫৯৩)

হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্যসমাজের সংঘর্ষে আসিবার পর হইতে হিন্দুসমাজে এক মহা আন্দোলন তরঙ্গ উঠিয়াছে। এক দল বলিতেছেন, আমাদের প্রাচীন রীতি যাহা কিছু ছিল, সবই ভাল। সুতরাং তাঁহারা প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকে —অধিকাংশ দেশবাসী—দেশের প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। যাঁহারা প্রাচীন তত্ত্ব অনেকটা জানেন, তাঁহাদেরও অনেকে লোকরঞ্জনের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়া লোকপ্রিয় অর্থ ব্যাখ্যা করেন। আবার, কেহ কেহ বা কুসংস্কারাবরণে আবৃত হইয়া প্রকৃত সত্য দেখিতে পান না, সুতরাং অপরকে কি বুঝাইবেন! কোন স্থানে ভাবগত পাঠ হইত। পাঠক মহাশয় বেশ শান্তশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। ভাগবত অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন, আমরা অনেকবার তাঁহার পাঠ শুনিয়াছিলাম। একটী কথা তিনি প্রত্যহই বলিতেন, দেখিতাম, "মানুষ শত শত অপকর্ম্ম করিয়াও পরিবারের ভরণপোষণ করিবে।" তাঁহার সহিত একদিন নির্জ্জনে তর্ক করাতে, তিনি বলিলেন, "আমরা যাহা বাহিরে বলি, তাহা লোকরঞ্জনার্থ, আমাদের অন্তরের ভাব ইহা নহে।" যাহা বলিলাম, সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির এই দশা।

আর এক দল আছেন,—তাঁহারা প্রখর পাশ্চাত্য আলোকে আত্মহারা হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে বা হিন্দুসমাজে ভাল কিছু দেখেন না। তাঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক কুসংস্কার পূর্ণ—হিন্দুসমাজে যাহা কিছু আছে, সবই খারাপ। বলা বাহুল্য, এ ভাবটী পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রতিক্রিয়া মাত্র। উভয়টীই অন্ধতাদোষে দূষিত। প্রকৃত বিচার কাহারই নাই।

এই পুস্তকখানিতে নিরপেক্ষ আলোচনা দেখিয়া, আমরা সুখী হইলাম। গ্রন্থকার জাতিভেদ, চতুরাশ্রম, দশ সংস্কার, হিন্দুদর্শন ইত্যাদি বিষয় লইয়া, প্রকৃত শাস্ত্রের মত কি, তাহা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিবার জন্য কবীর, তুলসীদাস, নানক প্রভৃতি হইতেও অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সকলে গ্রন্থকারের সকল মতের সহিত না মিলিতে পারেন, কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহার ভাবের সহিত সকলকে মিলিতেই হইবে। তিনি বলিলেন, আমাদের প্রাচীন আদর্শ এবং প্রথা সকল বাস্তবিকই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির বিশেষ সহায়ক ছিল, সুতরাং সেগুলিকে রক্ষা ব্যতীত উন্নতিই অসম্ভব। তবে বর্ত্তমানকালে হিন্দুধর্ম্মের নামে এমন সকল অনাচার আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা না উঠিয়া গেলে উন্নতি অসম্ভব। আর প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান আশ্রমগুলিকে কাযে লাগাইতে হইলে, আমাদের বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। আমরা এ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ও সকলকে এই গ্রন্থ এক একবার পাঠ করিয়া দেখিতে বলি।

বেদান্ত-সূত্রের

রামানুজভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

[সানুবাদ মূলভাষ্যের কিয়দংশ—বর্তমান সম্পাদক]

(৮৪তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৫৯৪)

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১৫ই আষাঢ়। (১৩০৭ সাল) [১০ম সংখ্যা।]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব্বকারুকার্য্য-মণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্ম্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভগ্নমৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশ-কঙ্কাল, কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন, যুগযুগান্তের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালক, বালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্ম্মী সমশরীর গো, মহিষ, বলীবর্দ্দ; চারিদিকে আবর্জ্জনারাশি, এই আমাদের বর্ত্তমান ভারত।

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জ্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীন-ধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দ্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতির্হীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি; আমাদের জন্মভূমি।

বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জাচর্ব্বণ, অনশন-অর্দ্ধাশন সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগ শোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লুত মহা শ্মশান, তন্মধ্যে ধ্যাননিমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী,—ইউরোপী পর্য্যটক এই দেখে।

ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব—বহু শতাব্দী যাবৎ স্বজাতি, বিজাতি, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মীর পদভরে নিষ্পীড়িতপ্রাণ, দাসসুলভপরিশ্রমসহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, যেন তেন প্রকারেণ বর্ত্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচচাতুরী প্রতারণাসহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের অনুচিত কদর্য্যবিভীষণকুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ড-হীন,—পূতিগন্ধপূর্ণমাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারত শরীরে পরিব্যাপ্ত;—ইংরাজ রাজপুরুষের পক্ষে আমাদের ছবি।

নববলমধুপানমত্ত, হিতাহিতবোধহীন হিংস্র পশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদ-মস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে বলে কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণ-পরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন;—ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।

এই ত গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি লোকের কথা। ইউরোপী বিদেশী সুশীতল সুপরিষ্কৃত সৌধশোভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের "নেটিভ" পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করেন, ভারতবাসীদের যা সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল একদলের লোক, যারা সাহেবের চাকরী করে। আর, দুঃখ দারিদ্র্য ত বাস্তবিক ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ময়লা আবর্জ্জনা চারদিকে ত পড়েই রয়েছে। ইউরোপী চক্ষে এ ময়লা, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে, যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।

আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা তা খায়, বাছবিছার নাই, মদ খেয়ে মেয়ের বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু।

দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না: বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, ম্লেচ্ছ বলি, —ওরাও কালা দাস বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখেনি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ-মাত্র,—ভাষা মাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য্য কর্ছে, সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সে দিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপীদের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চল্বে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নির্ব্বল হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র; একেবারে নির্ব্বল নিকম্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে? হাজার বৎসরের নানা রকম হাঙ্গামায় জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতিনীতি যদি এত খারাপ, ত আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি কি হয়েছে? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল না কেন? অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না? বিদেশীরা তখুনিই ত এসে চাষ বাস করে বাস কর্তো, যেমন আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে? তবে বিদেশী তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা; ভারতেও বল আছে, বস্তু আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ, যাঁরা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং "আমরা নরপশু", "তোমরা, হে উয়োরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর", বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর, যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে, হাঁসেন হোঁসেন ক'রছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহেবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড় শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড়ে চড়ে, ভারতবর্ষ থেকে, একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, আর অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্য্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে, তিব্বত, চীন, জাপান, সিবেরিয়া পর্য্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী, উনি চীন, জাপান, পর্য্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর মা মেরি করে কৃশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখ্‌ছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো-

(৮৪তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৫৯৬)

শিবের প্রধান আড্ডা ! ও কৈলাস দশমুণ্ড কুড়ি হাত রাবণ নাড়াতে পারে নি, ও কি এখন পাদ্রী ফাদ্রীর কর্ম্ম !! ঐ বুড়োশিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন ? তোমাদের দু চার জনের জন্য দেশ-শুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন হতে হবে বুঝি ? চরে খাওগে না কেন ? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে ত রয়েছে। তা নয়। মুরদ্ কোথায় ? ঐ বুড়োশিবের অন্ন খাবেন, আর নেমকহারামি কর্ব্বেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি !! ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি কান্না ধর যে, "আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ", এ কথা ঠিক হতে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী ; তবে, ঐ "আমরা"র ভেতর দেশশুদ্ধকে জড়াও কেন ? ওটা কোন্‌দিশি ভদ্রতা, হে বাপু ?

প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও জাতি বিশেষের একাধিকার। তবে, কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেম্‌নি কোনও জাতিতে কোনও কোনও গুণের আধিক্যপ্রাধান্য।

আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে "ধর্ম্মের"। আমরা চাই কি—"মুক্তি"। ওরা চায় কি—"ধর্ম্ম"। ধর্ম্ম-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম্ম কি ? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়, ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি ? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোণার শিকল। তার পর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে সুখ থাক্‌বে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীরবন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হ'লে চল্‌বে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এই জন্য, এ যে কথা শুনেছ যে, মুক্ত পুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নয়, তা ঠিক। তবে, পরে অন্যত্রও হবে। সে ত আনন্দের বিষয়। এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে, গয়াসুর (বুদ্ধ) সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের মত শান্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সেত ভালই ; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে, খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এ দিক, না ও দিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে, এক এক মঠে এক এক লাখ্ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কৃশ্চান, মুসলমান, জৈন, ওদের একটা ভ্রম, যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল ; জাতি, ব্যক্তি, প্রকৃতিভেদে শিক্ষা, ব্যবহার, নিয়ম, সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্ত্তে গেলে কি হবে ? বৌদ্ধরা বল্লে, "মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়া শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল",—বলি, তা কখনও হয় ? "তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ও সব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম

(অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৫৭৭)

কর", এ কথা বল্‌ছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পারে না, লঙ্কা পার হবে। কাজের কথা ? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে, একটা সাধারণ হিতকর কাজ কর্ত্তে পার না,—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ !! হিঁদু শাস্ত্র বলছেন যে, "ধর্ম্মের" চেয়ে "মোক্ষটা" অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে, যত উৎপাত করে ফেল্‌লে আর কি ? অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা, কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। "আততায়িনং উত্থন্তং" ইত্যাদি, হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বল্‌ছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্য প্রকাশ কর, শাম, দান, ভেদ, দণ্ড নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক ; আর, ঝাঁটা লাথি খেয়ে, চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে, ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য,—স্বধর্ম্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু, অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে ; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জ্জন করে, স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ ? গৃহস্থই নও—আবার "মোক্ষ" !!

পূর্ব্বেই বলেছি যে, "ধর্ম্ম" হচ্ছে কার্য্যমূলক। ধার্ম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্য্যশীলতা। এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে "বেদে" যে স্থলে কার্য্য করতে বল্‌ছে না, সে স্থলগুলি বেদই নয়। —"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাং" জৈমিনিসূত্র।—"ওঁকার ধ্যানে সর্ব্বার্থসিদ্ধি", "হরিনামে সর্ব্ব পাপনাশ", "শরণাগতের সর্ব্বাপ্তি", এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য ; কিন্তু, দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মচ্ছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিন রাত "প্রভু যা করেন্" বল্‌ছে এবং পাচ্ছে—কিছুই না। তার মানে বুঝতে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয় ? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে ? যার কর্ম্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে "ধার্ম্মিক"।

প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক একটি কেন্দ্র। পূর্ব্বের কর্ম্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, আমরা তাই নিয়ে জন্মেছি। যতক্ষণ সে শক্তি কার্য্যরূপে প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির থাকবে বল ? ততক্ষণ, কে ভোগ ঘোচায় বল ? তবে দুঃখভোগের চেয়ে, সুখ ভোগটা ভাল নয় ? কুকর্ম্মের চেয়ে, সুকর্ম্মটা ভাল নয় ? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন, "ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল।"

এখন ভালটা কি ? "মুক্তিকামের ভাল" অন্যরূপ, ধর্ম্মকামের ভাল আর এক প্রকার। এই গীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহা সত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম ইত্যাদি।

"নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য আর, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" ইত্যাদি, "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব" ইত্যাদি ধর্ম্ম লাভের উপায় ভগবান

দেখিয়েছেন। অবশ্য, কর্ম্ম করতে গেলেই, কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলেই বা; উপোষের চেয়ে, আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভালমন্দমিশ্র কর্ম্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবে তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভাল মন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছ, কি তমঃপ্রধান হয়েছ, কি করে বুঝি বল! সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন, জড়প্রায়, শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন, মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও,—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়,—"ফলেন পরিচীয়তে"। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়; কিন্তু, সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি মহাবীর্য্যের পিতা। সে মহাপুরুষের, আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছা মাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ, সর্ব্বলোকপূজ্য; তাঁকে কি আর "পূজা কর" বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর, আর জগৎ অবনত মস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই "নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ" ইত্যাদি। আর ঐ যে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেড়াল্যাতা সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ও গুলো হচ্ছে তমোগুণ, ও গুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জ্জুন ঐ দলে প'ড়ছিলেন বলেই ত, ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়। প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ," —শেষ, "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব।" ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে, আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি,—দেশশুদ্ধ পড়ে কতই হরি বল্‌ছি, ভগবানকে ডাক্‌ছি, ভগবান শুনছেনই না, আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না,—তা ভগবান। এখন উপায় হচ্ছে, ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব।" (ক্রমশঃ)।

হীরক-তত্ত্ব।

(বাবু অনুকূলচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)।

ঐতিহাসিক হীরক

১।—কোহিনুর।

কোহিনুরের পুরাবৃত্ত গভীর তিমিরে সমাচ্ছন্ন। অনুমান পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, গোদাবরী তীরে, ইহা কোন অজানিত মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তৎপরে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ জীবনের এক সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ ইতিহাসের অন্তরালে রাখিয়া, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সম্রাট সাজাহানের শাসনকালে চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত ও মরকত মণির লাবণ্য প্রভায়

উদ্দীপ্তপুচ্ছ ময়ূরাসনের ময়ূরের অন্যতর চক্ষুরূপে আবির্ভূত হইয়া, স্বীয় আধুনিক ইতিহাসের সূত্রপাত করে।

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির কারণ আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কোহিনুর কতকগুলি ক্ষীণবল সম্রাটের হস্তে পতিত হয়। অবশেষে যখন নাদির সাহ সুরম্য দিল্লিনগর শোণিত সাগরে ভাসাইয়া, স্বীয় শোণিত পিপাসা মিটাইয়া ধনরাশি ও রত্নরাজি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সম্রাট মহম্মদ সাহ অমূল্য রত্ন কোহিনুরকে স্বীয় উষ্ণীষ মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু কোন অন্তঃপুরচারিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় এই ব্যাপার নাদির সাহের কর্ণগোচর হইল। যে নাদির সাহ অতি হীন অবস্থা হইতে স্বীয় বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে এশিয়ার সম্রাটের পদে আরোহণ করেন, সে ব্যক্তিকে প্রতারিত করা সহজ নহে। নাদির সাহ দিল্লিসম্রাটকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক মহাসভা আহুত করিলেন ও সম্রাটকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া তৎকালীন প্রথানুসারে শিরস্ত্রাণ পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহম্মদ সাহ কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া এরূপ স্থিরচিত্তে উষ্ণীষ প্রদান করিলেন যে, নাদির সাহ ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইয়াছেন। নাদির সাহ শিবিরে গমন করিয়া যখন উষ্ণীষ খুলিলেন, তখন তাহার ভিতর এক জ্যোতির্ম্ময় রত্ন দেখিতে পাইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "কহিনুর" (জ্যোতির পর্ব্বত)।

এই ঘটনার পর হইতে কোহিনুরের ইতিহাস অনুসরণ স্বল্পায়াসসাধ্য। কোহিনুরের জীবনের সহিত কত কত ঐশ্বর্য্যলোলুপ ও কত কত শোণিত পিপাসু দিগ্বিজয়ীর ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে, ইহা নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণার চরমসীমার কত দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। নাদিরের পুত্র সারোখ যখন আগামহম্মদ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার বিজয়ীকে কোহিনুর প্রদান করিতে অসম্মত হন। এই জন্য তাঁহাকে কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা বলা যায় না। তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইল ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার উপর অত্যুষ্ণ তৈল রাখা হইল। এরূপ ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তিনি কোহিনুর কোথায় রাখিয়াছিলেন প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমেদ সাহ দুরাণিকে কোহিনুর প্রদান করিলেন। আমেদ সাহের পর তৎপুত্র টাইমুর ইহার অধিকারী হন।

দুরাণি রাজ্যের অবনতির চরমসীমায় কোহিনুর জনৈক বেগমের হস্তে পতিত হয়। সাহ সুজার জন্য ঐ বেগম কর্ত্তৃক কোহিনুর রক্ষিত হইতেছিল। বহুযন্ত্রণা সহ্য করিয়া অধিকারিণীকে কারাগারে অনাহারে থাকিতে হয়। অবশেষে সাহ সুজা পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহকে মহা সমারোহের সহিত কোহিনুর প্রদান করিলেন। গ্রহণকালে রণজিৎ সিংহ কোহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে, সাহ সুজা কহিলেন, "সৌভাগ্যই ইহার মূল্য, কারণ, বিজয়িগণের হস্তেই ইহা চিরবর্ত্তমান।" কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে এরূপ বলিলে সত্যের অপলাপ হইত না যে, "দুর্ভাগ্যই ইহার মূল্য, কারণ, দুঃখ ও কষ্টের সহিত ইহার সম্বন্ধ কম নহে।" রণজিতের মৃত্যুর পর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথের মন্দিরে কোহিনুর প্রদানের কথা উঠে; কিন্তু কোষাধ্যক্ষ রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। রণজিতের পর দিলিপসিংহ কোহিনুরের অধিকার প্রাপ্ত হন।



(৪৩তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৬০০)

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Re. 0.8[illegible]

MY MASTER
Price : Re. 0.60

THOUGHTS ON VEDANTA
(Seventeenth Edition)
Price : Rs. [illegible].25

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3.80

RELIGION OF LOVE (12th. Ed.)
Page 111, Price : Rs. 5.00

CHRIST THE MESSENGER
(Eighth Edition)
Price : Rs. 1.[illegible]

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4.25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. [illegible].00

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 1.[illegible]

VEDANTA PHILOSOPHY (9th Ed.)
Page 63, Price : Rs. 3.00

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
Price : Rs. 2.50 (Ordinary)
Rs. 3.50 (Cloth)

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial) (Fourth Edition)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 6.50

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 1.00

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—২০৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৯৫৲ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৬৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জলযোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ— পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫·০০
ভক্তিযোগ— পৃঃ ৯৬, মূল্য ৩·০০
ভক্তি-রহস্য— পৃঃ ৯৫, মূল্য ৫·০০
জ্ঞানযোগ— পৃঃ ২৯৮, মূল্য ১৪·০০
রাজযোগ— পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬·৫০
সন্ন্যাসীর গীতি— পৃঃ ২৩, মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট— পৃঃ ২৯, মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ— পৃঃ ৩৬, মূল্য ১·৫০
পত্রাবলী : প্রথমার্ধ— পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০·০০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)— মূল্য ২৭·০০
পওহারী বাবা— পৃঃ ১৮, মূল্য ১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান— পৃঃ ৮০, মূল্য ১·২৫
ধর্ম-সমীক্ষা— পৃঃ ১৩০, মূল্য ৫·০০
ধর্মবিজ্ঞান— পৃঃ ১০২, মূল্য ৫·৫০

ভারতে বিবেকানন্দ—(১৭শ সংস্করণ) পৃঃ ৪২৫, মূল্য ২০·০০
বেদান্তের আলোকে—পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫·০০
দেববাণী— পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ—(৭ম সং) পৃঃ ১৮০, মূল্য ৫·০০
মদীয় আচার্যদেব— পৃঃ ৬২, মূল্য ২·২৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে— পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা— পৃঃ ৫২, মূল্য ১·৭৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ— পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬·০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক— পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— পৃঃ ১৩৬, মূল্য ৩·৫০
ভাববার কথা— পৃঃ ৬৪, মূল্য ২·৩০
বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০
বর্তমান ভারত— পৃঃ ৪০, মূল্য ২·৫০
ভারতীয় নারী—(১৮শ সং) পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

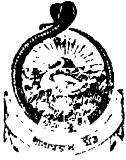
Udbodhan - Phone : 55-2447 NOVEMBER 1982 Regd. No. WB/NC-19

[illegible] প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে [illegible]
[illegible] কর্তৃক প্রকাশিত।

৮৪তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার

কলিকাতা-৩

ফোন : ৫৫-২৪৪৭

[illegible] অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

সবিনয় নিবেদন,

সকলেই অবহিত আছেন যে, কাগজ, মুদ্রণ ও পরিবহণের ব্যয় এবং ডাক-মাশুল ক্রমবর্ধমান। বর্তমান পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, পত্রিকার চাঁদার হার বর্ধিত না করিয়া কোন উপায়ান্তর নাই। আমরা অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উদ্বোধনের আগামী ৮৫তম বর্ষ (মাঘ, ১৩৮৯) হইতে বার্ষিক চাঁদা ১৮ টাকা, ষান্মাসিক ১২ টাকা এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ [illegible] ধার্য করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা উদ্বোধনের [illegible]-গ্রাহিকাগণ পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা [illegible] অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

উদ্বোধন পত্রিকা[illegible] সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পাঠাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শের সকল অনুরাগীকে আমরা সানন্দে জানাইতেছি যে, বর্তমান বর্ষের যে-কোন মাস হইতে 'উদ্বোধন' পত্রিকার আজীবন গ্রাহক (অনধিক ৩০ বৎসরের জন্য) হওয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্যে পত্রিকার চাঁদা বাবদ মোট তিন শত (৩০০'০০) টাকা পাঠাইতে হইবে।

সকলের সুবিধার্থে স্থির হইয়াছে যে, প্রদেয় ঐ টাকা একাধিক কিস্তিতেও গৃহীত হইবে,—কিন্তু প্রথম কিস্তির তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে বাকী টাকার শেষ কিস্তি অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

আজীবন (৩০ বৎসরের জন্য) গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া 'উদ্বোধন'-এর ঐতিহ্য-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সহায়তা করিবার জন্য সকলের কাছেই আমাদের আবেদন।

বিনীত

কার্যাধ্যক্ষ

(অপর পৃষ্ঠা দেখুন

উদ্বোধন, ৮৫তম বর্ষ, ১৩৮৯-৯০

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮৪তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৮৯) মাসে পত্রিকা ৮৫তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৮২) মধ্যে তাঁহাদের পুরা নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক চাঁদা ১৮·০০ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৫৪·০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১২৯·০০ টাকা) মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে যত শীঘ্র সম্ভব অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া জানাইবেন—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে টা. ২২·৪০ পয়সা লাগিবে। চেকে টাকা পাঠাইবেন না।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৮·০০ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়; সেজন্য সংলগ্ন কার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

সুদীর্ঘ ৮৪ বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥—১১টা; বিকাল ২॥—৫টা।
[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।]

১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ — কার্যাধ্যক্ষ

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার — উদ্বোধন কার্যালয়

[illegible]

পিন: ৭০০ ০০৩ [illegible]

* * *

* * *

উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

১।	দিব্য বাণী : জগজ্জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন		৬০১
২।	কথাপ্রসঙ্গে : মায়ের মন্দির-দ্বারে		৬০২
	দেব-মানব, ঈশা স্মরণে		৬০৫
৩।	শ্রীশ্রীমা (কবিতা)	শ্রীমতী হিমানী রায়	৬০৭
৪।	শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত আশীর্বাদ-পত্র		৬০৮
৫।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন		৬০৯
৬।	স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি	স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ	৬১৩
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম	শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত	৬১৯
৮।	মাতৃ-বিভূতি (কবিতা)	শেখ সদরুদ্দিন	৬২২

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত যাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; **আগামী বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮৲ টাকা, যাণ্মাসিক ১২৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে সি-মেল-এ ৫৪৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১২৯৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা। নমুনার জন্য ২·২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

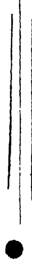
সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে **পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার।** পরিবর্তিত **ঠিকানা** জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময় : সকাল ৭৷৷টা হইতে ১১টা; বিকাল ২৷৷টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

৯।	শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি	শ্রীশচন্দ্র সান্যাল	৬২৩
১০।	স্বামী সারদানন্দ : মূর্ত বিবেকবাণী	ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য	৬২৯
১১।	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা	স্বামী বুধানন্দ	৬৩৭
১২।	চিনি না যে সব চিনি	শ্রীসলিলকুমার চক্রবর্তী	৬৪২
১৩।	নানাপ্রসঙ্গে :		
	চিরন্তন কাহিনী : 'শ্রদ্ধা আবিবেশ'		৬৪৬
	স্মৃতি-সঞ্চয়ন : 'ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে কিনা এটাই লক্ষণীয়'		৬৪৯
	জ্ঞান-বিজ্ঞান : আবহাওয়ার উপর নজর		৬৫০
	দেশ-বিদেশ : কিরাতদের দেশ		৬৫১
১৪।	সমালোচনা	শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়	৬৫৩
		শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়	৬৫৪
১৫।	রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ		৬৫৫
১৬।	বিবিধ সংবাদ		৬৫৬







৮৪তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পৌষ, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

জগজ্জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন

ধাত্রী যখন কোন শিশুকে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে থাকে, মা হয়তো তখন শিশুকে ঘরে ডেকে পাঠায়। শিশু তখন খেলায় মত্ত, সে বলে, 'যাব না; আমি খেতে চাই না।' খানিক বাদেই খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে শিশু বলে, 'আমি মার কাছে যাব।' ধাত্রী বলে, 'এই দেখ নতুন পুতুল', কিন্তু শিশুটি বলে, 'না, না, পুতুল চাই না, আমি মার কাছে যাব' এবং যতক্ষণ না যেতে পারে কাঁদতে থাকে। আমরা সবাই এক একটি শিশু। ঈশ্বর হলেন জননী। আমরা টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ইহজগতের এই সব জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছি; কিন্তু সময় আসবেই, যখন আমাদের ঘুম ভাঙবে; এবং তখন প্রকৃতিরূপ ধাত্রী আমাদের আরও পুতুল দিতে চাইবে, আর আমরা ব'লব, 'না, ঢের হয়েছে; এবার ঈশ্বরের কাছে যাব।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।২০৫]

কথাপ্রসঙ্গে

মায়ের মন্দির-দ্বারে

পৌষ মাস। বর্ষ শেষের কথাপ্রসঙ্গে তাই আমরা স্মরণ করিতেছি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে এবং তাঁহার সুযোগ্য 'দ্বারী' লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দকে,—যাঁহাদের পুণ্য আবির্ভাব বর্ষপঞ্জিতে মাসটিকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। মনে পড়িতেছে,—একদা স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা'-প্রসঙ্গের অনুরূপ শ্রীশ্রীমায়েরও লীলা-ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিতে। সারদানন্দজী ইহার উত্তরে আবেগজড়িত কণ্ঠে একটি গানের কলি গুন গুন করিয়া গাহিয়াছিলেন :

"রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক্ হয়েছি,
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।
এতকাল রইলাম কাছে, ফিরিলাম পাছে পাছে
কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন
দুই বেলা,
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি॥"

পরম রহস্যময়ী মা। সারদা-চরিত্র বাস্তবিক রঙ্গময়ীই বটে,—যাহা অন্তরের সকল অনুভূতি লইয়া কেবলমাত্র বোধ করা চলে, কিন্তু ভাষা দিয়া প্রকাশ করিয়া বুঝানো চলে না। সারদা-তত্ত্বদর্শী স্বয়ং সারদানন্দও তাই 'অবাক্' হইয়া যতটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন, উহাই শ্রীশ্রীমা সারদার সর্বোত্তম জীবন-গীতিকা। সুদুর্জ্ঞেয়া এই দ্বিভুজা দেবীর স্বরূপ ও তত্ত্বনির্ণয় তাই আমাদের ন্যায় ভক্তিহীনের পক্ষে অসাধ্য! তাঁহাকে জানা যায় না, বা জানিয়া ফেলা চলে না ঠিকই ; কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু বুঝিবার জন্যও বহুতর সাধনা,—অনেক অনিদ্র প্রহর-যাপনের অপেক্ষা রহিয়াছে। তবুও কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে,—সংসারের নানা ক্ষোভ ও অশান্তির বহু উর্ধ্বে স্থিত এই মাতৃরূপখানিকে কোনভাবে কিছুক্ষণের জন্যও আমাদের নয়ন-পথে আনিতে পারিলে, সংসার-পথে আমাদের যাত্রা বহুলাংশে সহজ ও সুখকর হইবে সুনিশ্চিত। তার জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ আন্তরিকতা এবং সরল হৃদয়ের ভক্তি-বিশ্বাস। এ-প্রসঙ্গে একখানি সুন্দর ঘটনালেখ্য স্মরণ হইতেছে :

কলিকাতার জনৈক কলেজের ছাত্র একদা নানা কারণে শারীরিক-মানসিক উভয় দিকেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়ায়, কথামৃতকার পূজনীয় মাস্টার মহাশয় তাহাকে ভক্তি সহকারে নিত্য চণ্ডীপাঠ করিতে শিক্ষাদান করেন। ছাত্রটি তদনুযায়ী প্রত্যহ গঙ্গাস্নানান্তে দেহ-মনের শান্তি ও নিরাময় আশায় বিশুদ্ধ সুললিত স্বরে চণ্ডীপাঠ করিত। বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া একদিন ঐ যুবক দেখেন—অদূরে শ্রীশ্রীমা চক্ষু মুদিয়া অত্যন্ত তন্ময়ভাবে ধ্যাননিরতা,—অথবা জপমগ্না রহিয়াছেন। যুবকও স্নান সারিয়া উঠিয়া, মায়ের পিছনের দিকে, বেশ কিছু দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অপূর্ব-সুন্দর ঐ নিশ্চলা দেবী-মূর্তিকে মনে মনে ধ্যান করিয়া, সুললিত স্বরে ও ছন্দে খুবই ধীরে ধীরে চণ্ডী আবৃত্তি করিতে শুরু করে। যুবকটি এতই নিম্ন কণ্ঠে উহা করিতেছিল যে, তাহার ঐ স্বর অতি নিকটের লোকও যেন শুনিতে না পায়। আবেগভরে প্রাণ ঢালিয়া স্তব করিতে করিতে সে উচ্চারণ করিয়াছিল—

"সৌম্যা অসৌম্যতরা অশেষ সৌম্যেভ্যঃ তু
অতি সুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥"
(চণ্ডী, ১।৮১)

বুঝিবা ঐ যুবকের অন্তরেও তখন মন্ত্রার্থের দ্যোতনা ফুটিয়া উঠিতেছিল—'ওগো মা, তুমিই দেবতাদের প্রতি সৌম্যা, আবার দৈত্যদের প্রতি কঠোরা অসৌম্যা। হে পরমা শোভনা জননী, তুমিই সকল সুন্দরের সৌন্দর্যরূপিণী—অতিশয় শোভিনী। ব্রহ্মাদি দেবতাদেরও আরাধ্যা—তুমিই পরমেশ্বরী।' চিত্রার্পিতার ন্যায় ধ্যানমূর্তিখানিকে কিন্তু সহসা নয়ন উন্মীলিত করিতে হইয়াছিল। অকস্মাৎ পিছনে ফিরিয়া তিনি স্তবকারী যুবকের দিকে স্নেহ-দীপ্ত নেত্রে এক ঝলক দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, করকমল উত্তোলন করিয়া জননী তাঁহার আর্ত সন্তানকে আশীর্বাদ ও অভয় প্রদানও না করিয়া পারেন নাই। ঘটনাটি চকিতের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। ভাগ্যবান যুবকের হৃদয়-উৎসারিত সেই স্তবকে মা এইভাবেই সার্থকতায় ভরিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের জানা নাই, উল্লিখিত অতিলৌকিক এই দৃশ্যটি, গঙ্গার ঘাটে তৎকালে আগত আরও শত শত নরনারীর মধ্যে আদৌ কাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কিনা,—অথবা, হইলেও উহা কতখানি বুদ্ধিগোচর হইয়াছিল। সকলেই দেখিয়াছিল এক নারী গঙ্গাস্নানান্তে নিবিষ্ট মনে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছেন! একটু বেশী কেহ হয় তো বা দেখিয়াছে, একটি অচেনা যুবক ঐ নারীর পিছন দিকে, বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়াইয়া আপন মনে কী যেন একটা কিছু আবৃত্তি করিতেছে! পরন্তু ইহাও অতি সত্য যে, ভক্তিমান সেই আর্ত যুবকটি ঐ কোলাহলমুখর গঙ্গা-ঘাটে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জীবনের পরম ঈপ্সীত বস্তুলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিল। আশ্চর্য মায়ার খেলা বৈকি! চিত্তের শুদ্ধতা আর ভক্তিই বড় ধন। শ্রীশ্রীমাতৃমহিমাকে ধারণা করা এই কারণেই বুঝি বা কঠিন। মায়ার কাণ্ডই এইরূপ। মহামায়া স্বয়ং দেহধারিণী হইলেও, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস অতীব কঠিন সাধন। এই মায়া সাধারণ জীবকে ভুলাইয়া রাখে—সত্যকে ঢাকিয়া রাখে তো বটেই,—আবার যোগমায়ারূপে কিন্তু উহাই জ্ঞানী ভক্তকেও মুগ্ধ ও হতবাক্ করিয়া দেয়। ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তি যেমন মায়ার আবরণশক্তিতে অন্ধদৃষ্টি হয়,—তচ্চিত্ত তদ্‌গতপ্রাণ ভক্তও যোগমায়া-প্রভাবে তদ্‌স্বরূপের ধারণা করিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া যান—'হাসিবেন' বা 'কাঁদিবেন' তাহা বুঝিয়া পান না। 'বিমুখ-মোহনকারিণী' যে মায়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে,—উহাই 'উন্মুখ-মোহনকারিণী' যোগমায়ারূপে জ্ঞানী-ভক্তকে বিস্ময়ে বাক্যহারা করিয়া তোলে। ক্ষেত্র ও কার্যের প্রভেদে মায়া ও যোগমায়ার বিশেষত্ব অবশ্যই মানিতে হইবে। ভগবদ্-উন্মুখ ভক্ত অবতার-মায়ায় বা যোগমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহার বিচিত্র ভাঙা-গড়ার খেলা দেখিতে দেখিতে তাঁহারই ভাবে রসে ও মাধুর্যে উত্তরোত্তর বিভোর হইয়া যান! রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখিয়া অবাক্ হওয়া ছাড়া, তখন তিনি আর মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না। শ্রীসারদা-রূপিণী যোগমায়ার একই দেহে দেবী-মানবী যুগ্মভাবের লীলা-লাস্যও তাই শ্রীমৎ সারদানন্দ হেন জ্ঞানিপ্রবরকে বাগ্‌রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে, উহাতে আর আশ্চর্য কি?

সারদানন্দ-প্রহর্ষিণী এই দেবী সারদাকে বর্ণনা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। ব্যাসকল্প সারদানন্দ জগন্মাতার স্ব-মনোনীত 'ভারী'—তাঁহারই ঐশ্বর্য-বিগ্রহ 'মাথার মণি'! সেই তিনিই কোন সাধারণ গৃহী ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া সাহ্লাদে বলিতে পারিতেন—"তুমি যাঁর (শ্রীশ্রীমার) কৃপা পেয়েছ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে এখনি তোমাকে আমার আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।"

ইহা কি নিছক নিরহঙ্কারত্বের অভিপ্রকাশ, অথবা বৃহত্তম 'অহং'-এ সুপ্রতিষ্ঠার একটি স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনা? এখানে কি শুধুই অপরিসীম মাতৃ-বৈভব প্রকাশিত, কিংবা অনন্যসাধারণ দাস্যভক্তিও সূচিত? শ্রীশ্রীমা সারদা এবং তাঁহার বরিষ্ঠ সেবক সারদানন্দের স্বরূপ-চিন্তনে আমরা উদ্যোগী হইলেও পরাভূত এখানে। আমরাও বলিতে বাধ্য: "কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-বৃত্তকে একখানি নিছক জীবনেতিহাসের পর্যায়ে ধরা চলে না,—আবার জীবনী-সাহিত্য মাত্রই বলিতে পারি না। উহার বৈশিষ্ট্য হৃদয়স্পর্শী ঘটনার সমাবেশে নহে,—উহাতে লক্ষণীয় হইতেছে, উচ্চতম আদর্শকে ব্যবহারিক জীবনে রূপায়ণ-কৌশল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সত্য বা আদর্শের দ্রষ্টা, সংস্থাপয়িতা, মা সারদা সেই আদর্শেরই একখানি প্রয়োগ-প্রতিমা বা বাস্তব-বিগ্রহ। আর আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দও ঐ একই সত্যের প্রবক্তা আচার্য। বুঝিবার বিষয় ইহাই। সুতরাং ঐ ত্রিমূর্তির সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় না হইলে, ইঁহাদের কোন একটি জীবন-চরিত্র স্বতন্ত্রভাবে ধরিবার চেষ্টা বড়ই নীরস সাধন হইবে। শ্রীশ্রীমা একটি আদর্শকে বা সত্যকে স্বীয় জীবনে যাপন করিয়া, প্রয়োগ-শিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনে তাঁহাকে আমরা একই কালে তিনটি সার্থক রূপে দর্শন করিতে পারি। তিন বেশেই কিন্তু তিনি অনন্যা অসামান্যা অনুপমা—মানবেতিহাসে অদ্বিতীয়া। একাধারে তাঁহার সেই ত্রিবেশধারিণী রূপ: সেবিকা, মাতা এবং আদ্যা-শক্তি জগদম্বা।

*

সেবিকা সারদাকে আমরা দেখিয়াছি সেই জয়রামবাটীর শৈশবাবস্থা হইতে,—গোরুর দলঘাস কাটিতে, ক্ষুধিত মানুষের জন্য প্রস্তুত উত্তপ্ত অন্নকে কচি হাতে বাতাস করিয়া জুড়াইয়া দিতে, খাঁচার পাখীটিকে জল-ছোলা খাওয়াইতে, রুগ্ণ বাছুরটিকে সারা রাত্রি ধরিয়া আপন হস্তে পরিচর্যা করিতে, মুটে-মজুর সাঁওতাল-বাগদী বাউল-বৈরাগী সকলের তৃপ্তি-বিধানে, পল্লীবাসী মেয়ে-পুরুষ সকল বয়সের সকলকেই আপন করিয়া কাছে টানিতে। পরেও তাঁহাকে এইরূপে দেখিয়াছি সর্বত্র—কামারপুকুরে, দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে, বাগবাজারে,—বৃন্দাবনে, পুরীতে, কাশীতে,—তীর্থযাত্রায়, পথচারণায়, রেল ষ্টেশনে;—এমনকি পবিত্র মন্দিরে, পূজাস্থলে এবং আরও কত বিচিত্র পরিবেশে! আজন্ম এই সেবিকাটি সর্বত্র সর্বাবস্থায় উচ্চ-নীচ, পরিচিত-অপরিচিত প্রত্যেকেরই সেবায় উৎসর্গীকৃতা। ভক্ত-অভক্ত, শিষ্য-সন্তান, দস্যু-তস্কর, সাধু-অসাধু,—পথের পথিক হইতে শুরু করিয়া জ্ঞানী-গুণী-মহাত্মা-মহর্ষি কেহই তাঁহার স্নেহ-পরিধির বাইরে থাকিতে পারে নাই। ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের সর্ববিধ জ্বালা জুড়াইয়া শান্তি বিধান করিতে সেবাময়ী সারদা সুমিষ্ট আশ্বাসে বলিতেন: "আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।"

মা সারদা। উজ্জ্বল এই জননী মূর্তিখানি সকল-হৃদয়বাসিনী—বিশ্ববন্দিতা। এই মা তো আমাদের সকলেরই ঘরের মা,—সকল মানুষের কাছেই সুপরিচিতা আদরিণী মা। জগৎ-জোড়া তাঁহার সন্তান-পরিবার। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের—এমনকি পতিত, অবহেলিত জনের প্রতিও মায়ের সমান স্নেহ-করুণা বর্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। পৃথিবীর সকল জীবেরই তিনি গর্ভধারিণী লালনকারিণী,—চিরকালের মা। তাঁহার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসও বুঝি অযুত কোটি সন্তানের মঙ্গল-চিন্তায় নিরত থাকিত। ব্রহ্মবিদ্-

বরিষ্ঠ স্বামী সারদানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া নৃশংস দস্যু আমজেদ পর্যন্ত সকলেই সমান মাতৃ-স্নেহের অধিকারী। সৎ ও অসৎ উভয়ই এক মায়ের সন্তান। সন্তানের সংসার-ভীতি দূর করিতে, কতবারই তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন: "আমি মা থাকতে ভয় কি ?"…"ভাববে তোমার একজন মা আছেন।"

পরমা প্রকৃতি বেদমাতা সারদার জ্যোতির্ময়ী ভাববিগ্রহখানিও সকল যুগের শুদ্ধচিত্ত নর-নারীর ধ্যানের আলম্বন হইয়া রহিয়াছে এবং চিরদিনই থাকিবে। মহাশক্তিস্বরূপিণী এই দেবী-সারদা জীব-জগতের—এমনকি ইতর জীব-জন্তু-কীট-পতঙ্গটিরও চৈতন্যবিধায়িনী। শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা, নরেন্দ্র-বন্দিতা এই মহামায়া জগদম্বাকেই আমাদের প্রয়োজন হয়, মোক্ষদ্বারের চাবি খুলিয়া দিবার জন্য। ইনিই তো বারবার বলিয়াছেন: "যারা আমার ছেলে তাদের মুক্তি হয়ে আছে।"

শ্রীশ্রীমা সারদার এই তিনখানি মূর্তিই আমাদের নয়নপথে সদা সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। এই সংসার-বিদেশে পথহারা পথিক আমরা,—অশান্ত চিত্তে ঘুরিয়া মরিতেছি, ভয়ে ত্রাসে দিন যাপন করিতেছি, আর সংসার-ক্লেশে ধৈর্যহারা হইয়া মুক্তির আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি! আমাদের এই ত্রিধা প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই জগতের মাটিতে মায়ের আবির্ভাব। সেবিকারূপে তিনি দিয়া থাকেন শান্তি, মাতৃরূপে তাঁহার নিকট হইতে পাই অভয়, আর চৈতন্যদায়িনী জগন্মাতা-রূপে তিনিই বিধান করেন ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি। শান্তি, অভয় ও মুক্তি—অকাতরে দিবার জন্য সন্তান-উন্মুখ শ্রীসারদা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন আমাদেরই জন্য। হায়, তবুও কি আমরা মাতৃ-বিমুখ হইয়া পথে-প্রান্তরেই অনিশ্চিত আশায় আশায় ঘুরিয়া মরিব ?

প্রসঙ্গের উপসংহার টানিবার কালে মনে পড়িয়া যাইতেছে—মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর একদিনের উক্তি। সেবারও দিনটি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি। সমীপবর্তী সাধু-ভক্তদের দিকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষজী সেদিন বলিতেছিলেন:

"মা, মা, মহামায়া! জয় মা, জয় মা! আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিবেক, অনুরাগ, ধ্যান, সমাধি দিন। ঠাকুরের এ সংঘের কল্যাণ করুন—সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন, জগতের শান্তিবিধান করুন। আমাদের ভক্তি নেই, তাই এ-সব দিনের ঠিক ঠিক মাহাত্ম্য বুঝতে পারিনে। আজ কী যে-সে দিন! মহামায়ার জন্মদিন! জীবজগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহামায়া আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষ-লীলা বোঝা বড় শক্ত। তিনি কৃপা করে না বোঝালে কে বুঝবে ?…আমরা তাঁকে কি বুঝব ? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন। আমাদের মায়ের নাম সারদা। ঐ মা-ই স্বয়ং সরস্বতী। তিনিই কৃপা করে জ্ঞান দেন—জ্ঞান অর্থাৎ ভগবান্‌কে জানা, ঐ জ্ঞান হলেই ঠিক ঠিক পাকা ভক্তি সম্ভব। জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক জিনিস—মায়ের কৃপা হলেই তা হওয়া সম্ভব। মা-ই জ্ঞান দেবার মালিক।"

মাতৃদর্শন-প্রত্যাশীকে সর্বাগ্রে 'মায়ের দ্বারী'র কাছে অনুমতি লইতে হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মনন-মন্দিরে প্রবেশের প্রাক্‌কালে, আমরাও তাই তাঁহার একনিষ্ঠ 'দ্বারী' স্বামী সারদানন্দজীর দ্বারস্থ হইতেছি—উপযুক্ত শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য।

দেব-মানব ঈশা স্মরণে

শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারী সারদানন্দজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিবামাত্রই চিনিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাকে ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি দেখিয়াছিলেন

'ঋষিকৃষ্ণের দলে'। শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে 'ঋষিকৃষ্ণ' অপরিচিত পুরুষ নহেন। যীশাস খ্রাইষ্ট্,—সচরাচর যাঁহাকে সহজ নামে ডাকা হয় যীশুখ্রীষ্ট,—তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে সুমিষ্ট আখ্যা পাইয়াছেন—ঋষিকৃষ্ণ। 'যীশাস্' শব্দের অর্থ পরিত্রাতা, আর 'খ্রাইষ্ট্' কথার মানে ঈশ্বর কর্তৃক চিহ্নিত নরাধিপতি। এই খ্রাইষ্ট্ বা খ্রীষ্ট দেবপুত্ররূপে এই মর্ত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে এমন পৌষেরই এক সন্ধ্যায়। খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ সহচরগণকেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'ঋষিকৃষ্ণের দল' বলিয়া ইঙ্গিত করিতেন। খ্রীষ্ট-পার্ষদ্ ঐ-সব সাধু-মহাত্মাগণই খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতের প্রাণপুরুষ। জানা যায়, তাঁহাদের মধ্যে আবার মহাত্মা পিটারই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টই তাঁহাকে তদীয় মণ্ডলীর নায়করূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—"পিটার, তোমার নামের অর্থ পাথর। এই পাথরের উপরই আমি আমার মণ্ডলী গড়ব।···স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলিও আমি তোমাকেই দিয়ে যাব।" প্রসঙ্গতঃ তুলনীয়,—এবারে শ্রীরামকৃষ্ণও একদিন সহসা শরতের (সারদানন্দের) কোলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন: "দেখলুম ও কত ভার সইতে পারে।" উভয় ঘটনার মধ্যে কোথায় যেন একটি সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে! অতীতের 'ঋষিকৃষ্ণের দলে' বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম নায়ক সারদানন্দের উপস্থিতির বাস্তবতাকেই ইহা ইঙ্গিত করিতেছে না কি? ভাবরাজ্যের কাহিনীগুলিকে আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করিতেছি মাত্র,—বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার দুঃসাহস রাখি না।

অবতারলীলা সকল যুগে প্রায় একই ধারায় প্রবাহিত দেখা যায়। ঈশামসি খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও সেই যুগপ্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সকল প্রয়াস, তাঁহার পরিকর-সংগঠন ইত্যাদি সবই সাধিত হইয়াছিল,—যেমন আমরা পূর্বে পূর্বে দেখিয়াছি, সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগেও যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। ধারা যে সেই একটিই, উহার আরও প্রমাণ আমরা সহজেই পাইতে পারি, যদি বিভিন্ন যুগে প্রকট ঐশ-পুরুষগণের দর্শন-অনুভূতিগুলিকেও একটু স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করি। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র হৃদয়াকাশে ধ্বনিত সেই বাণী, যাহা তিনি পরে স্বমুখে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে স্মরণযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের খ্রীষ্ট-সাক্ষাৎকারের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন:

"ঐ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখযাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি।' তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন···এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট ব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল।"

যে-কথা বলিতেছিলাম,—জীবের কল্যাণের জন্য এই অনিত্য জগৎ ও জগতের অতীত চরম সত্য বা নিত্য বস্তু সম্পর্কে যুগে যুগে অবতার ও অবতারকল্প পুরুষরা যাহা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা মূলতঃ অভিন্ন,—ভিন্নতা খুব অল্পই, যাহা কেবল প্রকাশ-ভঙ্গিতে বা ভাষায়। কোনও বিশেষ ধর্মগ্রন্থে ঐ-সকল বাণী সংরক্ষিত থাকিলেও তত্ত্বগুলি কিন্তু সার্বজনীন—মত-পথ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আন্তরিক ভগবৎ-জিজ্ঞাসুর জন্য ঐগুলি

পথনির্দেশিকা আলোকবর্তিকা স্বরূপ। শ্রীভগবান্ যুগে যুগে নানা দেশে অবতীর্ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ একই সত্যকে মানুষের কাছে শুনাইয়া যান। তাপ-দগ্ধ সংসারে তাঁহাদের জীবন ও বাণীর প্রয়োজন কোনদিনই শেষ হইবার নহে। বর্তমান সমস্যা-সঙ্কুল হিংসামত্ত মানবসমাজে বোধহয় সে-প্রয়োজন সর্বাধিক।

যীশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্টানগণেরই উপাস্য ও আদর্শ, এ-রকম মনোভাব অত্যন্ত ভ্রান্ত ও হাস্যকর। ঈশামসি খ্রীষ্ট সকল মানবজাতিরই পূজ্য। অখ্রীষ্টান-গণের দেবালয়ে বা উপাসনা-গৃহেও খ্রীষ্টের আসন অতি উচ্চেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের উত্তরকালে তো এই সত্য আমাদের কাছে আরও বেশী স্পষ্ট এখন। বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী এই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহের সহিত খ্রীষ্ট-জীবনের স্মৃতি-সংস্পর্শ অনেক ক্ষেত্রেই অনুভবনীয়।

খ্রীষ্ট ও তৎপ্রচারিত ধর্মের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সংযোগ-সূত্রটি খুঁজিতে গিয়া আমরা এক্ষণে যুগাচার্য বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তিটিকে উদ্ধৃত না করিয়া পারি না,—যাহা তিনি লণ্ডনে বলিয়াছিলেন:

"যীশুখ্রীষ্ট যে-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি খ্রীষ্টধর্ম ও বেদান্ত ধর্মে অতি অল্পই প্রভেদ। ...যীশু অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন আবার সাধারণের উপযোগী এবং উচ্চতম আদর্শ ধারণা করিবার সোপানরূপে দ্বৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' বলিয়া যিনি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই আবার প্রচার করিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক'; আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই এই বোধ আসিয়া থাকে যে, 'আমি ও আমার পিতা এক'। তখন ঐ ধর্মে ছিল কেবল প্রেম ও আশীর্বাদ...।"

মতবাদের ধূলিঝঞ্ঝায় অন্ধ ও অশান্ত সমাজে, হিংসা-প্রতিহিংসায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি—ঋষিকৃষ্ণ পুনরাবির্ভূত হউন, ইহাই আমাদের আজিকার প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী হিমানী রায়

গ্রামের নিভৃত কোণে,
পৌষের শিহরণে,
আসিলে পৃথিবী 'পরে, জননী আমার
আজি তিথিপূজা দিনে,
সে-কথা স্মরিয়া মনে,
আনন্দে উথলি উঠে, চিত্ত সবাকার।
'কুটা' বেঁধে যার তরে,
এসেছিলে ধরা 'পরে,
তারই সনে হ'ল তব শুভ পরিণয়।
এ-হেন দম্পতি সনে,
কোনদিন, কোনখানে
হয়েছে কি মানবের আগে পরিচয়!

শৈশবের কাল হ'তে,
স্নেহের অমিয় স্রোতে,
ভরে দিলে সকলের তৃষিত হৃদয়।
আজি তুমি সঙ্ঘ-মাতা,
সকলের পরিত্রাতা,
তোমা পাশে আসে সবে লইতে আশ্রয়।
রামকৃষ্ণজায়া তুমি, রামকৃষ্ণ-আরাধিতা,
আরাধ্যা জননী তুমি, তুমি বিশ্ববন্দিতা,
কৃপা করি দেহ মোরে, এই আশীর্বাদ
আমার আনন্দ যত, আমার বেদনা,
সকলি তোমারই দান, রেখ এ চেতনা
তোমার প্রসাদে মাগো, লভি যেন জীবনের
অমৃত আস্বাদ।

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত আশীর্বাদ-পত্র

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনকে লিখিত]

সন ১৩০২।১৩ই ফাল্গুন

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ—

পরে বাবাজীবন তোমার পত্র পাইলাম ও সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম [।] শ্রীশ্রী৺ভগবানদেবের[১] উৎসবে পরমাহ্লাদিত হইলাম, এখানে শ্রীশ্রীকামার পুষ্করিণীতে[২] শ্রীশ্রীভগবানদেবের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পুস্তক[৩] ছাপাইবার কথা লিখিয়াছ, বাবা তোমাকে ভগবান যেমন মতি দিবেন তাহাই করিবে। আমারও আজ্ঞা তুমি ছাপাইবে। তাঁহার প্রতি তোমার যেমন ভক্তি তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইবেক [।]*

আমি ভাল আছি [।] তোমার কুশল দানে সুখী করিবে। জয়রামবাটী—

তোমার মাতা

১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। ২ কামারপুকুরে। ৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির রচনা ও প্রকাশে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাশীর্বাদলাভ কবির অন্তরে প্রেরণার উৎসরূপে চিরজাগরূক ছিল। পুঁথির উপসংহারে কবি নিজেই লিখিয়াছেন—

'লীলা-গীতি বিরচনে যে শকতি ছাপা।
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা ॥'

উল্লেখ্য যে, এই পুঁথি রচনায় অক্ষয়কুমারের প্রধান উৎসাহদাতা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দই তাঁহাকে মাতৃসকাশে লইয়া গিয়া পুঁথির কিছু অংশ মাকে শুনাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজীর কৃপাতেই মায়ের শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়া তিনি পুঁথির সবিস্তার রচনায় আরও বেশী অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। পুঁথির বর্ণনা হইতেই ইহা জানা যায়।—সঃ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন*

হাঁ, তোমার কথাটা ঠিক্। ভিক্ষুকের মতোই হোক্, কিংবা রাজার হালেই হোক্—কোন না কোন ভাবে জীবন আমাদের কাটাতেই হবে। কিন্তু যে অবস্থাতেই থাকি না কেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা কখনও ভুলে থাকব না—এটাই হওয়া উচিত আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য। এটাও নিশ্চিত যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন ভগবান কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না। তিনিই আমাদের জীবনের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে যান। এটা জেনে আনন্দে থাক। আমি প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করি এবং তোমার জন্য আমার শ্রীগুরু মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানাই। তোমার কাছে তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো আছেই। তাঁকে তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার বলেই মনে করো। এই উপদেশটি তোমাকে আমি না দিয়ে পারি না। তাঁর ফটোর সামনে তুমি তোমার প্রার্থনা নিবেদন করো; তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবেই। তাঁর চেয়ে করুণাময় কেউ নেই। আহা! তাঁর মহিমা, তাঁর মহত্ত্বের কথা মনে পড়লেই আমি সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে পড়ি। তিনি তোমার সঙ্গে নেই—তা মনে করো না। যারা ভাল তিনি সর্বদাই তাদের পাশে থাকেন। আর যেহেতু তুমিও খুব ভাল ছেলেদেরই একজন, তোমাকে নানা প্রলোভন থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি অনুক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর আলোকচিত্র তাঁরই চৈতন্যময় সত্তা। এটিকে একটি ফটো মাত্র মনে করো না। তাঁর নিজের প্রাণময় সত্তা ওটি। যদি পাওয়া যায়, তাহলে ফুল ও ধূপ তাঁকে নিবেদন করো; আর তা না পাওয়া গেলে, অনুরাগ ও আর্তির ফুল ও ধূপের অর্ঘ্য তাঁকে দিও। পৃথিবীর রাশিকৃত পুষ্প ও ধূপের চেয়েও একটি বেদনার্ত হৃদয় তাঁর কাছে বেশী প্রিয়। আন্তরিক চাইলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন। তিনি যে প্রেম ও করুণার মূর্তরূপ।

*　　　*　　　*

আমার অনিয়মিত চিঠি-পত্র থেকে ধরে নিয়ো না যে, আমি তোমার বন্ধুদের ভালবাসি না। ভালবাসা বাইরের চেয়ে অন্তরেরই বস্তু। আমি সর্বদা প্রার্থনা করি যেন শ্রীগুরু মহারাজের আশীর্বাদ তোমার ও তোমাদের সকলের উপর বর্ষিত হয়।

*　　　*　　　*

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "জলের যেমন নির্দিষ্ট কোনও আকার নেই—যে পাত্রে তাকে রাখা যায় তারই আকার সে ধারণ করে"—তেমনি ভগবানেরও কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই। কিন্তু ভগবান সকল জীবেরই ভগবান; সুতরাং তাঁকে কেবল মাত্র মানুষের আকারের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। তোমার বাবা বিদেশী পোশাকে থাকলেও তাঁর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা-ভক্তি ঐজন্যই চলে যায় না। সুতরাং ভগবানের আকার যাই হোক্ না কেন, যেহেতু তিনি তোমার ভগবান, তাই তাঁকে সদা সর্বদা তোমার ভালবাসা উচিত। অবশ্য ইষ্ট-মূর্তিরূপে তাঁর কোনও রূপবিশেষকে কেউ পছন্দ করতে পারেন। বৈষ্ণব কৃষ্ণ-রূপ ভালবাসেন, শাক্ত শক্তি-রূপ—এই রকম সব। যে রূপটি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে সেই রূপেই তুমি তাঁর আরাধনা করো। হিন্দু গৃহস্থ-ঘরের

* মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠ হইতে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'Consolation' নামক পুস্তিকা হইতে অনুদিত।—সঃ

বধূ যেমন পরিবারের সকলকেই সম্মান করে, কিন্তু শয্যাগ্রহণ করে একমাত্র তার স্বামীর সঙ্গে, তেমনি যে সকল বিভিন্ন রূপে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতিই তোমার ভক্তি থাকবে, কিন্তু একমাত্র ইষ্টই হবেন তোমার জীবন-সর্বস্ব।

* * *

এটা খুবই শুভ যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি গভীর। তাঁর আরাধনাতেই তুমি আর মায়ের ভক্ত থাকবে না—তা নয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিরই বিগ্রহ। শক্তি অনন্ত, তাই দুরধিগম্যা। সকলের কাছে যাতে তিনি সুগম হতে পারেন, সেইজন্যই তিনি বর্তমানকালে করুণাঘন শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই যুগের আদিতে যখন তিনি (শক্তি) শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁর বারবার অবতার-রূপে আবির্ভাবের কারণ-স্বরূপ স্বয়ং বলেছিলেন :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

* * *

তিনি নর-দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়ার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাংশ সাক্ষাৎ শিষ্যই তাঁর দর্শন লাভ করেছেন। তাঁকে দর্শন করার জন্য তোমার যদি প্রকৃত ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমারও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন। ঈশ্বরের রূপ কিছু কাল্পনিক নয়। সেগুলি সত্যি। নির্বিকল্প সমাধিতে সৃষ্টি নেই, স্রষ্টা নেই,—পূজাও নেই। সে কথা এখন থাক—কারণ নুনের পুতুল সাগরে গিয়ে নিজেই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ ব্যক্তিবোধ থাকবে, ততক্ষণ ভগবানের সাকার (সগুণ) রূপও থাকবে। স্রষ্টা ঈশ্বর সকল সময়েই সাকার ও সগুণ, তাঁর প্রতিটি প্রকাশই তাঁর নিজের মতোই সত্য। ভগবানের পূজা করা কেবলমাত্র তাঁর সগুণরূপেই সম্ভব। এই পথ গ্রহণ করতেই তোমায় আমি বলছি। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই তোমার জীবন ও কর্ম হোক। সমস্ত অন্তর ঢেলে দাও তাঁর উপাসনায় এবং এই জীবনেই মুক্ত হয়ে যাও। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করবে। পিতা ও পুত্রের অথবা জননী ও সন্তানের মাঝে কোনও ভেদ নেই। পাথরে তৈরী ঈশ্বরের প্রতিমা পূজা করে লোকে যদি মোক্ষ লাভ করতে পারে, তবে তাঁর জীবন্ত মূর্তির আরাধনা করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছান তো আরও অনেক বেশী সম্ভব। সাক্ষাৎ ভগবানকে তুমি সরাসরি পূজা করতে পার না, কারণ এই রকম দেব-মানবদের মাধ্যম ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে কোনও ধারণাই তুমি করতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো দেব-মানবেরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করলে, ভগবানের সম্পর্কে কে আর কতটুকু জানতে পারত? তাঁরা যেন আধ্যাত্মিক জগতের কলম্বাস।

* * *

শিকড় ছাড়া গাছ হয় না; ভিতর বাদ দিয়ে বাহির হয় না। তোমার অন্তরে ও বাহিরে উভয় দেশেই তাঁর আরাধনা হওয়া উচিত, কারণ তিনি সর্বব্যাপী। তিনি প্রতিমায় যেমন, তেমনি আছেন তোমার অন্তরে। সুতরাং সর্বদা তাঁর সন্তান অথবা দাস ভাবে, নিজেকে স্বতন্ত্র রেখে, তাঁকেই সর্বত্র পূজা করো। দ্বৈতবাদী বলে, "আমি ব্রহ্মের"; অদ্বৈতবাদী বলে, "আমি ব্রহ্মের সহিত একাত্ম।" এই দুই কথার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই; কারণ যিনি ব্রহ্মের তিনি তাঁর

সঙ্গে একাত্মও তো বটে। অভেদ উপলব্ধি শুধু নির্বিকল্প সমাধিতেই হয়ে থাকে, এবং আগেই বলেছি যে তখন আর পূজা-অর্চা থাকে না। তাঁকে লাভ করার একমাত্র উপায় ঐকান্তিকী ভক্তি। এই-ই হচ্ছে উপদেশ—সাধারণ এবং বিশেষ উভয় অর্থে-ই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তোমার ভক্তি হোক্ পরিপূর্ণরূপে ঐকান্তিক। তুমি ঠিক বলেছ—কাঁচা আমিটি চূর্ণ হয়ে গেলে, তবে তিনি দেখা দেন। যে কাঁচা আমি নিজেকে দুর্বল ও পাপী মনে করে, নিজের ভিতরকার সেই পশুটিকে বিসর্জন দেওয়াই হচ্ছে নরবলি। এটি কেবলমাত্র প্রকৃত বীরের পক্ষেই করা সম্ভব; কারণ "জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন"—জগৎ জয় করতে পারে কে? না, যে নিজের মনকে জয় করেছে!

* * *

যে ধর্ম দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা নিতান্তই মিথ্যা এবং ক্ষতিকারক। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—শ্রুতি বলেছেন যে, দুর্বলের পক্ষে ভগবান লাভ কখনই সম্ভব নয়। আমি যদি ঈশ্বরের সন্তান হই, তাহলে আমি তাঁরই ছাঁচে তৈরী, এবং তিনি যদি পূর্ণ শুদ্ধ, আমিও অবশ্যই পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধ। তাই, তুমি যদি সত্যিই ভগবানকে ভালবাসতে চাও, তাহলে তোমাকে ভগবানই হতে হবে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।"—ভগবানের পূজা করতে হলে, তোমাকে ভগবান হতে হবে। নিজেকে পাপী মনে করার কি দরকার? তুমি অনন্ত; শুধু অজ্ঞান বশেই তুমি নিজেকে সান্ত ভাবছ। প্রত্যেকের আদিতে রয়েছে অসীমতা। তোমার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অনন্ত শক্তি। সুতরাং আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস হারিও না। যে পথই তুমি গ্রহণ কর না কেন, সফল তুমি নিশ্চয়ই হবে। ভক্তির পথই প্রকৃষ্ট, কারণ এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। তোমার মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তাঁর প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হও। তুমিই ভগবানের সবচেয়ে সত্যিকারের মন্দির। বাইরের মন্দিরগুলি শুধু অন্তরের সত্য মন্দিরকেই স্মরণ করায় মাত্র। দুর্বলতা-জনক ভাবগুলিকে যখন তুমি মন থেকে দূর করতেই চাইছ, তখন চিন্তাগুলোর উপর নজর রাখাটা কিছু অন্যায় নয়। নেই নেই করতে করতে দেখবে সাপে কামড়ালেও তোমার মধ্যে বিষ থাকবে না। "আমি পাপী নই। আমি স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান।"—যার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সে ক্রমে বুঝতে পারে যে সে ঈশ্বরেরই সন্তান।

* * *

একটা কদভ্যাসকে তাড়াতে হলে, তোমাকে আর একটা প্রতিযোগী সদভ্যাসকে অনুশীলন করতেই হবে। এর জন্য তোমার প্রবল রজোগুণের অথবা ক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

"আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া অতিক্রম করা সত্যিই দুরূহ। যারা শুধু আমার শরণাপন্ন, কেবলমাত্র তারাই পারে এই মায়াকে অতিক্রম করতে।" মায়া ঈশ্বরের শক্তি; ঈশ্বর ও তাঁর শক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মিষ্টত্ব ছাড়া চিনির, ধবলত্ব ব্যতীত দুধের যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি ঈশ্বরের শক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁকেও ধারণা করা যায় না। শক্তিহীন লোকের কাছে আমরা কোন প্রার্থনা জানাই না, কারণ আমরা জানি যে, সে প্রার্থনা নিষ্ফল হবে। ভগবান সর্বশক্তিমান এবং তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করি। সুতরাং

যে কেউ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, সে শক্তিরই উপাসনা করে। সংসারের প্রত্যেকেই এক একজন শাক্ত, কারণ এমন কে আছে যে শক্তির পূজা করে না ?

* * *

ভগবান মেঘের ওপারে কোথাও কোন ঊর্ধ্বলোকে বাস করেন না। তিনি আছেন সকল জীবের হৃদয়ে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি"—"হে অর্জুন! ভগবান সকল জীবের হৃদয়ে বাস করেন।" সাধারণ জীব একথাটা জানে না। ভগবান আমাদের সামনে আসেন মূর্খ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, নিঃস্ব, ক্ষুধার্তের রূপ ধরে—যাতে আমরা তাঁকে এই সব রূপে সেবা করে নিজেদের চিত্তশুদ্ধি করতে পারি। কর্মেই আমাদের অধিকার—তার ফলে নয়। ফল আমাদের হাতে নয়। অন্যদের উপকার করব—এই ভেবে কাজ করার চেয়ে নিজেদের কল্যাণের জন্যই বেশী করে কাজ করা উচিত, কারণ ভগবান তাদেরও প্রভু এবং ভগবানই তাদের বর্তমান অবস্থায় রেখেছেন। ভগবানকে তো আমরা সংশোধন করতে পারি না বা তাঁর কর্মপ্রণালীর খুঁতও ধরতে পারি না। সেটা ডাহা বোকামী হবে। অন্যের সেবা করে আমরা নিজেদেরই সেবা করি—কি ভাবে ? না, নিজেদের হৃদয়ের বিস্তার করে।

* * *

তার সব আবদার মিটবেই—এই পূর্ণ বিশ্বাসেই না শিশু তার যা কিছু প্রয়োজন তা বাবা-মাকে জানায় ? ঠিক এমনি ভাবেই আত্মোপলব্ধির জন্য যা কিছু আবশ্যক তার জন্য তোমার ইষ্টের কাছে প্রার্থনা জানানো উচিত। ঈশ্বরের সন্তান তুমি হতে চাও কেন ? জগজ্জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য—তাই না ? অতএব ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে তফাতটা কোথায় ?

* * *

এই কথাটা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, শান্তি হচ্ছে নিজের মানসিক সম্পদ। সুতরাং সাংসারিক বা সামাজিক কোনও বিষয়কে তোমার চিত্তের পবিত্র ত্রিসীমানার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। সেখানে একমাত্র পরমশিবই একচ্ছত্র ভাবে আধিপত্য করুন আর তোমার উপর শান্তি ও আনন্দ বর্ষণ করুন।

* * *

পূর্ণ আত্মসমর্পণ অবশ্য তখনই সম্ভব যখন মানুষ তার দুর্জয় শত্রু অহঙ্কার থেকে মুক্তি পায়। "আমি এই, আমি সেই"—এই মনোভাবই বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তোমার আত্ম-সত্তার আবরণকারী এই 'অহং' থেকে যতই মুক্ত হবে, ততই তুমি সক্ষম হবে আপন স্বরূপের উপলব্ধিতে। ব্যাকরণের এই উত্তম পুরুষ-সর্বনামটিই আমাদের যত দুঃখের মূল। সুতরাং আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত, যেন তেন প্রকারেণ এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। সেটা পারা যায় মহৎ-জনের সেবার জোরে, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন সৎ কর্ম দ্বারা এবং একনিষ্ঠ বিবেকের ফলে। প্রথমটিই সবচেয়ে সহজ ও সর্বোত্তম। যদি সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করতে পার, তাহলে তোমার ঐ দাস্য ভাবের জন্যই তোমার অহং ভাব ক্রমশঃ লোপ পাবে। যদি কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত পথানুসরণে ঠিক ঠিক নিজেকে নিয়োজিত করে, তবে তিনি নিশ্চয় তাকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করবেন। কিন্তু সে রকম লোক সংখ্যায় এত কম যে, তা প্রায় কেউই করতে পারে

না বললেই চলে। কারণ প্রত্যেক লোকই কম-বেশী অহং-অভিমানী। যদি অপরের পাপ গ্রহণকে আত্মাহুতি বলো—এবং আমার মনে হয় সেটাই এর ঠিক অর্থ—তাহলে তার জন্য যোগ্য অধিকারী সংসারে নেই বললেই চলে। যখন সংসারে আমি রয়েছি এবং যখন আমি এখানে সুখী হতেই চাই, তখন আমাকে এমন কিছু করতে হবে যা আমাকে সর্ব-ভয়-মুক্ত সুখ দিতে পারে। ভগবান সর্ব-শক্তিমান এবং অনন্ত করুণাময়। আমি তাঁরই সন্তান এবং তিনিই আমাকে দেখবেন। তাই আমার কোনও ভয় নেই। ভগবান তোমার পিতা ও মাতা দুইই।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥"

"হে আমার দেবাদিদেব, তুমি আমার জননী; তুমিই আমার পিতা; তুমি আমার বন্ধু; তুমিই আমার সখা; তুমি আমার বিদ্যা; তুমিই আমার সম্পদ; তুমি আমার সর্বস্ব।"

আর জানবে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন এই সবগুলিই।

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমি জয়রামবাটীতে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। আমি তখন বদনগঞ্জ স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ি। মহারাজের শুভাগমন সংবাদ আগেই জেনে-ছিলাম। যখন জয়রামবাটীতে পৌঁছলাম তখন তিনি একটি বাঁশের তৈরী বড় মোড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরের পশ্চিমদিকের বারান্দায় বসেছিলেন। তাঁর বিশালবপু দেখে কাছে যেতে ভয় হ'ল। তাই প্রথমে তাঁর দিকে একটিবার তাকিয়ে, সিধা শ্রীশ্রীমার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই মা খুব খুশী হ'য়ে বললেন, "শরৎ এসেছে দেখেছ?" আমি বললাম, "মা, রাস্তা থেকে দেখে এলাম—বারান্দায় বসে আছেন।" মা জিজ্ঞাসা করলেন, "শরৎকে প্রণাম করনি?" আমি বললাম, "না, ভয় করছে।" মা বললেন, "বোকা ছেলে! শরতের চেহারাই ঐ রকম। ভিতরটা প্রেমে ভরা। যাও—প্রণাম করগে। দেখবে শরৎ তোমাকে কত ভালবাসবে।" আমি ভয়ে ভয়ে মায়ের ঘর থেকে ভিতরের দিক দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার নাম, কোথায় কোন্ শ্রেণীতে পড়ি, বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। সব উত্তর দিলাম। পরে জয়রামবাটীতে আমার কোন বন্ধু আছে কিনা, অথবা কেউ আত্মীয় আছেন কিনা জানতে চাওয়ায়, "না" বললাম। তখন এদেশের ছেলে-মেয়ে কেউ সহজে মার কাছে আসত না জেনে আমি বললাম, "আমি শ্রীশ্রীমার কাছে সর্বদা আসি।" তার আগেই আমি শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে দীক্ষাও পেয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীমা আমাকে "রামময়" ব'লে ডাকলেন। কি মধুর স্বর! "যাচ্ছি মা" ব'লে মার কাছে যেতেই, মা আমায় মিষ্টি ও জল দিলেন! আমিও আনন্দে খেয়ে-দেয়ে আবার মহারাজের কাছে গিয়ে হাতপাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস করতে লাগলাম। তামাকও সেজে দিলাম। তাঁর সেবক হিসাবে স্বামী ভূমানন্দ ও ব্রহ্মচারী বিমল

(পরে স্বামী দয়ানন্দ) এসেছিলেন। তাঁরা মেজো মামার (কালীমামার) বৈঠকখানা ঘরে থাকতেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ, জ্ঞানদা (স্বামী জ্ঞানানন্দ) ও আমি থাকতাম। তখন মেঝেতে সিমেন্ট ছিল না। মাটির মেঝেতে খেজুর পাতায় তৈরী চ্যাটাই পেতে তার উপর বিছানা পেতে পূজনীয় মহারাজও শুতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহারাজ জপধ্যান করার সময় আমাকে বললেন, "দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বস্।" আমি মনে করলাম মহারাজ ভিজিয়ে দিতে বললেন। তাই তাঁরই কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে দরজায় একটু ছিটিয়ে দিয়ে আমিও জপ করতে বসলাম—দেখে মহারাজ বললেন, "কৈ, দরজাটা ভেজিয়ে দিলি না?" আমি বললাম, "মাটির মেঝে, বেশী ভিজালে য়ে কাদা হ'য়ে যাবে।" তখন সেই গম্ভীর মানুষ হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন ও আমাকে বললেন, "আমি কি তোকে দরজা ভিজিয়ে দিতে বলেছি? ভেজিয়ে দিতে বলেছি। মানে দরজায় খিল দিয়ে বন্ধ না ক'রে, কেবল বন্ধ ক'রে দিতে বলেছি। তোরা কি বলিস্?" আমি বললাম, "আমরা বেজিয়ে দেওয়া বলি।" তিনি বললেন, "তবে তাই কর আমি দরজা বেজিয়ে দিলাম।

তামাক সেজে তাড়াতাড়ি টিকেয় আগুন ধরবে ব'লে জোরে জোরে পাখার বাতাস করতে করতে কলকেতে পাখা লেগে কলকে উলটে পড়লে বকতেন। বলতেন, "তুই বড় ছটফটে! বাইরে রেখে দিয়ে আয়। হাওয়ায় আস্তে আস্তে ধরে যাবে।" তাই করতাম। আমার হেড-মাষ্টার মশায় শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম ক'রে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতেই মহারাজ বললেন, "প্রবোধ! তোমার ছাত্র স্কুল পালিয়ে এখানে আড্ডা দিচ্ছে।" মাষ্টার মশায় বিনীতভাবে বললেন, "আপনাদের একটু সেবা করলে ধন্য হ'য়ে যাবে। আমরা কি শিক্ষা দেব?" মহারাজ বললেন, "যা, তোর মাষ্টারও তোকে ছেড়ে দিলে।"

মাষ্টার মশায় মহারাজের জন্য বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ কিছু অম্বরী তামাক আশি টাকা সের দরে কিনে এনেছিলেন। ঐ তামাক তরল। কলকেতে সাধারণ তামাক সেজে, তার উপরে একটি গোল মাটির চাকতিতে আঙুল দিয়ে একটু তরল তামাক লাগিয়ে রেখে তার উপর আগুন দিতে হয়। আমি জানতাম না যে, ঐ চাকতিটি কলকের সঙ্গে একেবারে চারিদিকে লেগে গেলে চলবে না। একটু ফাঁক থাকবে। কলকে থেকে ধোঁয়া বেরোয় না। মহারাজ দুঃখ ক'রে বললেন, "রেখে দে তোর আশি টাকা দামের তামাক। আমরা গরীব লোক। আমাদের সাধারণ তামাকই ভাল। এমন সময়ে আমার মাষ্টার মশায়ের প্রাণের বন্ধু ও গুরুভাই (শ্রীশ্রীমার শিষ্য) ডাক্তার নলিনীকান্ত সরকার এলেন। তিনি আমাকে বললেন, "ওরে ভুল করেছিস্। ঐ তাওয়াটা একটু ঘষে ক্ষয় ক'রে নিয়ে আয়—যেন একটু ফাঁক থাকে।" আমি ঘষে ক্ষয় ক'রে এনে ঐ তাওয়ার পিঠে তামাক লাগিয়ে আগুন দিতেই খুব সহজে ধোঁওয়া বের হ'তে লাগল। সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। মহারাজও খুব খুশী হলেন। এইসঙ্গে ব'লে রাখি শ্রীশ্রীমার উনান থেকে আগুন আনতে গেলে তিনি কলকেতে আগুন দিতেন না। হাতায় ক'রে আগুন দিতেন ও চিমটে দিতেন—কলকেয় আগুন তুলে নেবার জন্য। আমি, "কলকেতেই দিন না" বললে, মা বলতেন, "বাবা, ছেলেকে আগুন দিতে নেই। তুমি নিজে তুলে নাও।"

একদিন মহারাজ বিকালে চা খেয়ে বেশ ঘেমেছেন দেখে, আমি তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছি দেখে মহারাজ বললেন, "আমি

একটু ঘেমে হালকা হব ব'লে গরম গরম চা খেলুম। আর তুই এলি চাষার মতো হুস্ হুস্ ক'রে হাওয়া করতে।" আমি বললাম, "ঘাম দেখে হাওয়া করছি—আবার চাষা বলছেন কেন ?" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "শোন্, একজন চাষা তার মেয়ের বিয়ের জন্য গুরুদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গিয়ে গুরুমার কাছে জানল, গুরুদেব তাঁর এক বড়লোক শিষ্যের বাড়ী কলকাতায় গেছেন। চাষা সেখানে গিয়ে দেখল—ঐ ধনী শিষ্য জলে পাখা ভিজিয়ে গুরুদেবকে হাওয়া করছে। সে নূতন জিনিস শিখল ও স্থির করল এবার গুরুদেব আমার বাড়ী এলে আমিও পাখা ভিজিয়ে বাতাস দিব। বেচারা গুরুদেব তার বাড়ীতে শীতকালের সন্ধ্যার পরে গিয়ে হাজির। শিষ্য গুরুদেবকে বসিয়ে প্রণাম করেই একখানা পাখা পুকুরের ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে এনে জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগল। গুরুদেবের প্রাণান্ত! বললেন, "তোর তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমি শীতে মরছি আর তুই এলি ভিজে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে !!" তখন শিষ্য বললে, "আপনার বড়লোক শিষ্য ভিজেপাখার হাওয়া দিচ্ছিল—তাকে আপনি কিছু বলেননি। আর আমি গরীব ব'লে আমাকে বকছেন ?" গুরুদেব বললেন, "বেটা, সে যে গরমের দিনে দুপুরে হাওয়া করেছিল। আর তুই শীতের দিনে রাত্রে হাওয়া দিচ্ছিস্!"

তখনকার দিনে জয়রামবাটী গ্রামে বা নিকটবর্তী গ্রামে কেউ চা খেতো না। মহারাজের জন্য কলকাতা থেকে চায়ের সরঞ্জাম আসত। বিমল মহারাজ চা তৈরী ক'রে দিতেন। তখন কিছু এক পয়সা দামের প্যাকেটের গুঁড়া চা আরামবাগ থেকে কিনে এনে রাখা হ'ত। যদি চা না খেলে চলবে না এমন কোনও ভক্ত আসতেন, তবে শ্রীশ্রীমা অনেক কষ্টে বাড়ী বাড়ী ঘুরে একটু দুধ কিনে আনতেন। একটি মাটির হাঁড়িতে জল, দুধ, চা ও চিনি বা গুড় দিয়ে বেশ ক'রে ফুটিয়ে, ন্যাকড়ায় ছেঁকে কাঁসার গেলাসে ক'রে দিতেন। চায়ের কাপ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ঐ সব বাসনকে তখন লোকে সান্‌কী ব'লত ও অপবিত্র মনে ক'রত। বিমল মহারাজ আমাকে চা খেতে বললে আমি খেতাম না। তিনি যখন স্টোভ (Stove) জ্বালিয়ে কেটলিতে জল গরম করতেন, তখন মহারাজ বলতেন,"আমি তানপুরায় এমন সুর বেঁধে দিতে পারি যে, তুই তানপুরা বাজালে স্টোভের শব্দ শোনা যাবে না। মেজো মামার (কালীমামার) বড় ছেলে ভূদেবের একটি ছোট তানপুরা মহারাজের ঘরে ছিল। মহারাজ বিস্কুট আনতেন। আমাদেরও দিতেন। আমরা আনন্দ ক'রে খেতাম। ভূদেব, রাধারমণ, ক্ষুদিরাম ও রাধু আমাদের সঙ্গে ভাগ বসাত। আমি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তরকারী কোটা, পান সাজা প্রভৃতি কাজ করতাম ও মধ্যে মধ্যে মহারাজের সেবা করতাম। মহারাজ বলতেন, "দেখ্, তুই মাঝে মাঝে এসে মা কি করছেন আমাকে বলবি। নিজের বুদ্ধি খাটাবিনি যেমনটি বলি তেমনটি করবি।" আমি "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলতাম। মধ্যে মধ্যে গিয়ে বলতাম, "মা এখন তরকারী কুটছেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কুটেছি। এখন পান সাজছেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেজেছি। মার উনানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এলাম। মা ঠাকুরের জন্য হালুয়া রান্না করছেন।" ইত্যাদি। তিনিও বলতেন, "যা করগে যা।" পরে "মা এখন ঘরে চুপ ক'রে বসে আছেন" বলতেই মহারাজ বলতেন, "যা মাকে জোড় হাত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে আয় আমি প্রণাম করতে যাব কিনা।" আমি জিজ্ঞাসা করলেই মা বলতেন, "হ্যাঁ বাবা, শরৎকে ডাক।" আমিও পিছে পিছে যেতাম। দেখতাম, মহারাজ হাঁটু গেড়ে বসে মাকে প্রণাম

ক'রে, "মা, ভাল আছেন ?" জিজ্ঞাসা করতেন। মা বলতেন, "হ্যাঁ বাবা, ভাল আছি। বাবা শরৎ, তুমি কেমন আছ ?" মহারাজও বলতেন, "হ্যাঁ মা, আমিও ভাল আছি।" রোজই এক প্রশ্ন ও উত্তর। পরে দেখতাম, আমরা যেমন মাকে প্রণাম করেই পিছন ফিরে চলে আসতাম, মহারাজ তেমন না ক'রে, মাকে সামনে রেখে জোড় হাত ক'রে পিছিয়ে পিছিয়ে দরজার কাছে এসে বারান্দায় বেরিয়ে তবে সিধা হ'য়ে চলতেন। বেরিয়ে মা লম্বা ঘোমটা দিতেন ব'লে বলতেন, "আমি যেন শ্বশুর ! এতখানি ঘোমটা !"

শরৎ মহারাজ এলে মা যত্ন ক'রে রেঁধে খাওয়াতে চেষ্টা করতেন এবং বলতেন, "শরৎ কলকাতার ছেলে। পোড়া পাড়াগাঁয়ে ভাল ভাল জিনিস পাওয়া যায় না—ছেলেকে কি খাওয়াব ?" আমরা এবং কোয়ালপাড়ার দাদারা—স্বামী কেশবানন্দ (কেদার দাদা), স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরীদা), স্বামী বিদ্যানন্দ (রাজেনদা), বরদা, গগন প্রভৃতি কোতুলপুর থেকে ও আমি কয়াপাটের হাট থেকে সবজী, ফল প্রভৃতি কিনে এনে দিতাম। মা খুবই খুশী হতেন। নলিনীদি (মার ভাইঝি) রান্না করতে গেলে মা বলতেন, "নলিনী, শরৎ কলকাতার ছেলে। ভাত যেন সুসিদ্ধ হয়, আবার ল্যাকটু (গলা) না হয়, তাহলে শরতের খেয়ে আনন্দ হবে না। চচ্চড়ি শুকনো শুকনো হবে—পাড়াগাঁয়ের মতো ঘ্যাঁট হবেনি। পটোল ভাসা তেলে ভাজবিনি। কম তেলে ভাজবি, আর মধ্যে মধ্যে হাতে ক'রে জলের ছিটে দিবি। তাতে পটোলগুলি নরম হবে ও শুঁটকে হবেনি।" ইত্যাদি মা নিজেও রান্না করতেন।

মহারাজ দুপুরের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করতেন। আমি গা, হাত, পা টিপে দিতাম। কিন্তু পায়ের হাঁটুর উপরে হাত দিতে দিতেন না। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ দিতেন। হাঁটুর উপরে হাত দিতে গেলে বলতেন, "চাদরখানা দেতো।" আমি দিলে কোমর থেকে গোড়ালী পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে বলতেন, "এবার এর উপরে টিপ।" তিনি অতিরিক্ত ভদ্র ছিলেন। আমাকে আঙুল ভাঁজা শিখিয়েছিলেন।

আমি একদিন বললাম, "মহারাজ! আমাকে দয়া করে সন্ন্যাস দিন।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "তুই তো ছেলেমানুষ। সন্ন্যাসের কি বুঝিস ? বি. এ. পাস ক'রে আয়। তারপরে যদি চাস তবে সন্ন্যাস নিবি।" আমাকে খুব ভালবাসতেন ব'লে এত সাহস পেয়েছিলাম যে, আহাম্মকের মতো ব'লে ফেললাম, "আপনি কি বি. এ. পাস করেছিলেন ? আপনি যদি না ক'রে থাকেন, তবে আমাকে কেন দিবেন না ?" তিনি বললেন, "পাস ক'রে এলে আমাদের মঠ মিশনের অনেক কাজ করতে পারবি। দেখছিস্, বিমল লেখাপড়া জানে ব'লে আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, আরও কত কাজ করে।" আমাকে বলতেন, "একটা বিদ্যে শিখবি ? তুই মাটিতে লম্বা চিমটে ফুঁড়বি। আর তর তর ক'রে মাটি ফেটে গঙ্গাজল এসে তোর মুখে পড়বে।" আমি বললাম, "না মহারাজ! ও সব শিখব না।" তিনি বললেন, "কেন রে ?" আমি বললাম, "ঠাকুর বলেছেন, ওসব করলে অহংকার হবে, আর ঐ সব দিকে মন গেলে ভগবানের দিকে মন যাবে না।" তিনি শুনে খুশী হলেন।

তিনি আমাকে অনেক গল্প বলতেন। একদিন বললেন, "একবার স্বামীজী, আমি ও গঙ্গা (পূজনীয় স্বামী পাহাড়ে ঘুরছিলাম খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। সঙ্গে পয়সা ছিল না। গঙ্গা আমাদের চেয়ে বেশী বেশী হিমালয়ে ঘুরেছিল। তাই সে বললে, 'দাঁড়ান, আমি ভিক্ষার ব্যবস্থা করছি।' এই

ব'লে এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে মাটিতে জোরে জোরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'এ পধান, এধার আও। দেখো সস্ত লোক ভুখে হ্যাঁয়। খিলাও।" লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আটার রুটী, তরকারী, ডাল প্রভৃতি দিয়ে আমাদের পেট ভরে খাওয়াল। স্বামীজী তো গঙ্গার কাণ্ড দেখে হেসে কুটিপাটি! গঙ্গা বললে, 'এদেশে প্রবাদ আছে,—গাঢ়োয়াল সরীখা দাতা নহীঁ, পর লাঠ্‌ঠি বেগর্ দেতা নহীঁ। মানে গাঢ়োয়ালীদের মতো দাতা নাই। কিন্তু তারা লাঠি না দেখালে দেয় না—মানে তারা চায় সাধুরা জোর ক'রে আমাদের সেবা নেবেন।' আর একবার স্বামীজী, রাজা মহারাজ, আমি ও কৃপানন্দ (সান্যাল মশায়) কোথাও যাচ্ছিলাম। মাঠের পথ। পথে একটি টাকা পড়েছিল। প্রথম তিনজন টাকাটি দেখেও চলে গেলেন। সান্যাল মশায় দেখেই হাতে উঠিয়ে বললেন, 'এখানে একটা টাকা পড়ে ছিল। কোনও গরীব লোককে দেওয়া যাবে।' স্বামীজী বকলেন। বললেন, 'টাকা যেখানে ছিল ফেলে দে সেখানে। আমি টাকাটা দেখেছি, কিন্তু হাতে নিইনি। রাখালও দেখেছে, শরৎও দেখেছে। কেউ হাতে নেয়নি। তুই কেন নিতে গেলি? টাকা ফেলে দে। যার টাকা সে বেচারা যদি খুঁজতে বেরোয় তো পেয়ে গেলে খুশী হবে। নতুবা গরীব লোক পায় তো কুড়িয়ে নেবে।'"

আর একটি মজার গল্প বলেছিলেন, "একবার স্বামীজী, গঙ্গা ও আমি হিমালয়ে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজীর একটু শরীর খারাপ হওয়ায় একটি গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'একটু বেগুনের ঝোল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।' আমরা দুজনে বললাম, 'হাতে নেই পয়সা। ডাল-রুটী ভিক্ষে মিলে না। কোথায় পাব বেগুন?' স্বামীজী বললেন, 'ছাখনা, কোথাও পাওয়া যায় কিনা।' আমরা দুজনে ঘুরতে ঘুরতে এক সাধুর আশ্রম দেখলাম। সেখানে অনেকগুলি বেগুন গাছও আছে, গাছে বেগুনও হয়েছে। সাধু আমাদের অভিবাদন ক'রে বসালেন ও বেদান্তের প্রকরণের কথা শুরু করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বেদান্তের আলোচনায় যোগ দেওয়ায় তিনি খুব খুশী হলেন। কিছুক্ষণ পরে, 'আমাদের বড় গুরুভাই একটু অসুস্থ। আমরা তাঁর কাছে যাব', ব'লে তাঁর জন্য দুটি বেগুন ভিক্ষা চাইলাম। কিন্তু তিনি দিলেন না। তাঁর আশ্রমে আমাদের ভিক্ষা নেবার কথা তো বললেনই না। ফিরে স্বামীজীকে বলতে তিনি বললেন, 'তোরা দুজনে আবার যা। একজন তাঁর সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা করবি। আর একজন তাঁর বাগান থেকে বেগুন নিয়ে আসবি। সাধুর বেগুন থাকতে চাইতেও যখন দেননি, তখন জোর ক'রে নিলে কিছু দোষ বা অন্যায় হবে না। যদি হয় সে দোষ বা অন্যায়ের জন্য আমি দায়ী। তোরা যা।' তখন আমি গিয়ে, 'ওঁ নমো নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ' ব'লে, অভ্যর্থনা করতেই তিনি খুশী হ'সে, আমাকেও অভিবাদন ক'রে ভিতরে ডাকলেন ও আমরা তাঁর বেদান্ত আলোচনায় খুশী হ'য়ে আবার এসেছি মনে ক'রে আবার বেদান্ত আলোচনা শুরু করলেন। এদিকে গঙ্গা চারটি বেগুন তুলে নিয়ে একটু দূরে এসে জোরে জোরে হাততালি বাজাতেই কার্য উদ্ধার হ'য়ে গেছে জেনে আমিও সাধুকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে ও ভিক্ষার ব্যবস্থায় বেরোতে হবে ব'লে সরে পড়লাম। স্বামীজী তো বেগুন পেয়ে হেসে কুটিপাটি! বললেন, 'বেশ করেছিস্। এখন দুটি ভাতের চেষ্টা দেখ দিকি।' গঙ্গা ভাত ডাল ভিক্ষা ক'রে আনল তিন মূর্তির জন্য। আমি বেগুনের ঝোল রাঁধলাম। তিনজনে খেয়ে খুব আনন্দ করলাম।"

একদিন পূজনীয় শরৎ মহারাজের প্রসাদ

পাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল। সুযোগ খুঁজছিলাম। কারণ শ্রীশ্রীমার অন্নপ্রসাদ (দুধ বাতাসামাখা ভাত) তো রোজই পেতাম। আর মাকে শরৎ মহারাজের প্রসাদ পাবার কথা বলতেও পারছিলাম না। একদিন সুযোগ জুটে গেল। আমি পুকুরে (পুখুরিয়া) গ্রামের দোকান থেকে আটা, তেল প্রভৃতি কিনতে গিয়েছিলাম। তখন জয়রামবাটীতে একটি মাত্র এত ছোট দোকান ছিল যে, মা আড়াই পোওয়া পোস্ত কিনতে পাঠিয়েছিলেন—চাইতে দোকানদার বলেছিল, "তোমাকেই আড়াই পোওয়া দিব তো আমি খুচরা বেচব কি ? আমার দোকানে মাত্র আড়াই পোওয়া পোস্ত আছে।" পুকুরে গ্রামে বড় দোকান ছিল। আমি একদিন দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে এনে রাখতেই মা বললেন, "বাবা রামময়, হাত মুখ ধুয়ে এসে জলখাবার খাও। শরতের পাতেই বস।" মহারাজ সেই মাত্র জল-খাবার খেয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রসাদী ২।১ খানি লুচি ও কিছু হালুয়া ছিল। মা আরও কিছু দিলেন। পরে যখন মা মুড়ি দিতে এলেন, তখন আমি বললাম,"আর মুড়ি চাই না। এতেই হবে।" মা বললেন, "তাকি হয় বাবা। দেশের ছেলে দুটি মুড়ি না খেলে কি পেট ভরে ?" এই ব'লে কিছু মুড়িও দিলেন। আমি খাচ্ছি এমন সময়ে জ্ঞানদা এসে আমাকে বকলেন। বললেন, "তুই বড় হচ্ছিস ? না, রোজ রোজ বোকা হচ্ছিস ? সেদিন মায়ের পাথরের থালায় ব'সে খেয়ে থালাখানি এঁটো ক'রে দিলি। এদেশে ঐ থালা পাওয়া যায় না। আজ আবার শরৎ মহারাজের কাঁসার থালা-খানা এঁটো ক'রে দিলি ?" মা শুনে জ্ঞানদাকে বললেন, "জ্ঞান, তুমি চুপ কর। আমিই রামময়কে শরতের পাতে খেতে দিয়েছি। ছেলে খেলে থালাও নষ্ট হয় না, দোষও হয় না।" এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমার পাথরের থালা এঁটো করার ঘটনাটিও বলা দরকার। ছোটমামী (রাধুর মা) পূজনীয় শরৎ মহারাজকে বাবা বলতেন। মহারাজ বলতেন, "আমার মেয়েটি বেশ ভাল। তবে মাথাটি একটু গরম হয় মধ্যে মধ্যে।" মামী মুচকি মুচকি হাসতেন ঐ কথা শুনে। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। মধ্যে মধ্যে ডেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সিংহবাহিনীর প্রসাদী ফল, মিষ্টি খাওয়াতেন। শ্বশুরের নাম রামচন্দ্র ব'লে আমাকে গোপাল ব'লে ডাকতেন। আবার ভাসুরের নাম বরদা ব'লে বরদা মহারাজকেও গোপাল বলতেন। মামী একদিন মহারাজকে ও আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে, রান্না ক'রে খাওয়ালেন। মহারাজকে বড় বড় বাটীতে মাছ, সিংহবাহিনীর প্রসাদী মাংস প্রভৃতি দিলেন। পায়েস, মিষ্টি প্রভৃতি অনেক কিছু ছিল। মহারাজ অল্পই খেলেন। জ্ঞানদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সিলেটি উচ্চারণে প্রায়ই বলতেন, "কি কাইবো (খাব) মহারাজ। আমোদর নদ যদি দুধ অইতো (হইতো) ও আতী (হাতী) যদি ফাটা (পাঁঠা) অইতো (হইতো) তো প্যাট (পেট) ভইর‍্যা (ভরিয়া) কাইতাম্ (খাইতাম)।" মহারাজ মাছ, মাংস ও পায়েস প্রভৃতি জ্ঞানদার কাছে ঠেলে দিয়ে তাঁরই উচ্চারণ নকল ক'রে বললেন, "কা (খা) জ্ঞান কা।" জ্ঞানদা তো খুব খেলেন। পরের দিন পেটের অসুখ! মহারাজ বললেন, "কি জ্ঞান, আর মাংস কাইবি (খাবি) ?" এদিকে ছোটমামী শ্রীশ্রীমার জন্যও নিরামিষ তরকারী ও ডাল-ভাত প্রচুর পাঠিয়েছিলেন। মার থালায় তাই বেশ কিছু প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল। মা বললেন, "আজ বৌমার (মণীবাবু উকীলের মা—মার শিষ্যা) জ্বর হয়েছে। নৈলে সে এই প্রসাদ খেতো।" তখন আমি বললাম, "মা, আমি খাব।" মা, "এস বাবা এস" ব'লে তাঁরই পাতে আমাকে বসিয়ে দিলেন এবং বেশ ক'রে ডালভাত মেখে খেতে দিলেন।

আমি খাচ্ছি এমন সময়ে জ্ঞানদা দেখে আমাকে এই মারেন তো সেই মারেন! বললেন, "তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? এদেশে পাথরের থালা পাওয়া যায় না। আর তুই মায়ের থালায় খেয়ে থালাটি এঁটো ক'রে দিলি?" শ্রীশ্রীমা তখন জ্ঞানদাকে খুব বকলেন, "তুমি বাপু চুপ কর। ছেলেকে খেতে দাও। থালায় খেয়ে, ধুয়ে নিলেই শুদ্ধ হয়।" ঠিক সেই সময়েই ছোটমামীও আবার আমাকে খেতে দেখে দুঃখ ক'রে বলতে থাকেন—"ওঃ, গোপাল আমার বাড়ীতে পেট ভরে না খেয়ে, আবার তার মায়ের কাছে খেতে বসেছে!" মা তাতে তখুনি জবাব দিলেন—"না, না, ছেলে তোর বাড়ীতে পেট ভরেই খেয়েছে। আমাকেও বলেছে—মামী খুব খাইয়েছেন। তবে এখানে প্রসাদ ব'লে আবার খেতে বসেছে।"

একদিন মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, "রামময়, তুই তো এদিকের পাণ্ডা! বিমলকে কামারপুকুরের সব দেখিয়ে নিয়ে আয়। আর পূজনীয় শিবুদাকে আমার প্রণাম জানাবি।" আমি বললাম, "আচ্ছা মহারাজ, নিয়ে যাচ্ছি। সব দেখিয়ে আনব।" তিনি বললেন, "শিবুদাকে কি ক'রে আমার প্রণাম জানাবি?" আমি বললাম, "ব'লব, পূজনীয় শরৎ মহারাজ আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন।" তিনি শুনে বললেন, "না। তুই তো আগে শিবুদাকে প্রণাম করবি? প্রণাম ক'রে বলবি—শরৎ মহারাজ আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন, এই ব'লে তুই আমার হ'য়ে তাঁকে আবার একবার প্রণাম করবি—বুঝলি?" আমি বললাম, "হঁা মহারাজ, ঠিক ঐ ভাবেই প্রণাম জানাব।" [ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম

শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ যদি হন সংস্থাপক, আর স্বামী বিবেকানন্দ ব্যবস্থাপক, তাহলে এ কথা কি বলা যায় যে, শ্রীম ছিলেন সংগ্রাহক? 'কি বলে শালারা, পরমহংসের ফৌজ?' বলেছিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে? এই ফৌজের রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন শ্রীম। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই শ্রীম এই রিক্রুটিং আরম্ভ করেন। যে স্কুলে এবং কলেজে তিনি পড়াতেন সেখানে উচ্চ সংস্কারবান ছেলে দেখলেই দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতেন, পরে নিয়ে যেতেন বরানগর মঠে, পরে পাঠাতেন বেলুড়ে। 'ছেলেধরা মাস্টার' নাম হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর। যীশু বলেছিলেন পিটারকে আর এণ্ড্রুকে, কী তোমরা মাছ ধরছ? পিটার, তার ভাই এণ্ড্রু, জেবেদীর ছেলে জেমস্ আর তার ভাই জন, এঁরা হয়েছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য; এঁরা সব জেলে ছিলেন কিনা। যীশু বললেন, এস আমার সঙ্গে, আমি তোমাদের মানুষ ধরা শিখিয়ে দেব। (ম্যাথু ৪ : ১৮) শ্রীরামকৃষ্ণেরও মানুষ-ধরা এজেন্ট ছিলেন শ্রীম। শ্রীম বলতেন, ঠাকুরের সাধু। কত বড় লোক এঁরা, এক উদ্দেশ্য, ঈশ্বরদর্শন। কত বড় আদর্শ সামনে নিয়ে চলেছেন। ছেলেধরা মানে এই ঠাকুরের সাধু তৈরী করা। সে কি আর দু-একটি বা চার-ছটি তৈরী করলেন? শ্রীম-দর্শন থেকে একটা সিন্ পড়ছি শুনুন। (দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৯)।

"শ্রীম'র হাতে একখানা পত্র। পত্রখানা মাথায় ঠেকাইতেছেন। একজন সাধু লিখিয়াছে হরিদ্বার হইতে।

"শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখুন মহাত্মাদের এই প্রসাদ। প্রসন্ন হ'য়ে যা দেন তাই প্রসাদ। এই সাধুটি আড়াই বৎসর পূর্বে সংসার ত্যাগ করেছেন,—লুকিয়ে লুকিয়ে সাধুসঙ্গ করতেন। পয়সা নেই, ছেলেমানুষ, হেঁটে হেঁটে এখানে, মঠ, উদ্বোধন, এই সব স্থানে যাতায়াত করতেন। পাঁচ মাইলের উপর হবে এখান থেকে বাড়ী। তিন জন আসতেন, দুজন সাধু হয়েছেন।...সব ভোগ-বাসনা ছেড়েছেন—কেবল ঈশ্বরকে চান। আবার কি রকম লিখেছেন, 'এই জীবনেই যেন তাঁকে পাই। আর ঠিক ঠিক সাধুজীবন যাপন করতে পারি।' কি রকম দেখতুম—দুপুর রৌদ্রে পায়ে হেঁটে ঘামতে ঘামতে এসে উপস্থিত—হাতে মা কালীর প্রসাদী ফুল। এমন না হ'লে কি এত serious হয়! 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'—এঁদের কি ঈশ্বর কল্যাণ না ক'রে থাকতে পারেন?"

দেখুন, কী সুন্দর চিত্র! আমরা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। আর শ্রীম'র সফলতার নমুনা দেখুন, তিনটি তরুণের উপর জালক্ষেপণ করলেন, ধরা পড়ল দুজন। দুজন তাদের মধ্যে সাধু হ'য়ে গেলেন। এ হ'ল তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্য থেকে সাধু সংগ্রহের হার। তাঁর রচিত মহাভাগবত কথামৃতের জ্বলন্ত উদ্দীপনার কথা হিসেব করলে এ সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বরে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, "মাস্টার মশাই, ঠাকুরও এক, এবং কথামৃত লিখবার লোকও এক। যতবার পড়ি ততবার নূতন ব'লে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।" (শ্রীম-দর্শন, ১২শ ভাগ, পৃঃ ৬)।

কী ক'রে তা সম্ভব হয়েছিল? কী ক'রে সম্ভব হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রকট হবার পরও অন্যূন অর্ধ শতাব্দী কাল শ্রীম'র এই সাধুসংগ্রহ কর্মে নিরলসভাবে নিমগ্ন থাকা? অবশ্যই তাঁর কৃপায়। যেমন যীশুর কৃপায় পিটার আর এণ্ড্রুর জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল যে, জালই গিয়েছিল ছিঁড়ে।

ঈশ্বরের শক্তিতেই অমর গ্রন্থ রচনা সম্ভব। অন্যথা অসম্ভব। এই ঈশ্বরের শক্তি বা কৃপা ব্যাপারটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। দেখুন না, কতজন তো লিখেছেন শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা। তাদের মধ্যে বৃন্দাবনদাস লিখিত চৈতন্য ভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত চৈতন্য চরিতামৃতের সমাদর সর্বাধিক। চৈতন্যের বাল্যলীলা জানতে হ'লে বৃন্দাবনদাসের ভাগবতের কাছে যেতে হবে, যেমন যীশুর বাল্যলীলা বা story of nativity জানতে হ'লে লিউক-কথিত গস্‌পেলেই যেতে হবে। বৃন্দাবনদাস শৈশবে চৈতন্যদেবকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর কৃপালাভ করেছিলেন, তাই বলেছেন, 'সর্বশেষ ভৃত্য তাঁর বৃন্দাবন দাস।' এই রকম কথা আছে যে, মহাপ্রভু তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবকে দর্শনই করেননি, নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন ক'রে তাঁর আদেশ মতো ইনি ব্রজবাস করেন। সেখানে সনাতন ও রূপ গোস্বামীর অনুগ্রহ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পরিচর্যা-ভার গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ইনি নিজে লিখে গেছেন যে, ইনি চৈতন্যের কৃপাশক্তি লাভ করেছিলেন। 'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস / তথাপি জানিবে আমি তাঁহার প্রকাশ।' কাজেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণ যে জগন্মাতার কাছে শ্রীম'র জন্য শক্তি প্রার্থনা করলেন। জগন্মাতা শক্তি

দিলেনও; দিলেন এক কলা, ষোল কলার মধ্যে। ঠাকুর বললেন, 'ও বুঝেছি, এতেই তোর কাজ হবে।' (কথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭৭)।

আর হ'ল কি, যে-সে হ'ল? শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন অনন্তমুখী, তাঁর জীবনবেদ 'কথামৃত'-ও তেমনি অসংখ্যমুখী। তোমার যে-মতই হোক, যে-পথই হোক, কথামৃত তোমাকে সেই মতেই সেই পথেই রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একটা কথা আছে না, চেতনসমূহেরও চেতয়িতা? 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' আছে গীতাতে, আছে মুণ্ডকেও। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্' আছে কঠ এবং শ্বেতাশ্বতরে। কথামৃতও যেন তেমনি সকল ধর্মগ্রন্থসমূহেরও ধর্মগ্রন্থ, অন্য সব ধর্মগ্রন্থ বোঝবার সহায়ক হচ্ছে এই কথামৃত। শ্রীম বলতেন বাইবেল প্রসঙ্গে, আমরা খৃষ্টের সঙ্গে থেকেছি কিনা, ঠাকুরকে দেখেছি, তাই আমরা একটু বুঝতে পারি খৃষ্টের কথা।

বাইবেলের কথা যখন উঠলো তখন বাইবেলের একটা 'ভার্স' প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃত করছি: 'For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard' (তাঁর বাণী তোমায় সব মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে, এই যা তুমি দেখলে ও শুনলে—Acts. 22 : 15)।

শ্রীমকেও বলা যেতে পারত এই কথা। Thou shalt be our Lord's witness unto all men of what thou hast seen and heard.

বস্তুতঃ শ্রীম তাই করেছেন, নিজের চোখে যা দেখেছেন, নিজের কানে যা শুনেছেন তাই সেই দিনই লিখে রেখেছেন। কবে কোথায়, কোন্ সময়, কে কে উপস্থিত ঘটনাস্থলে, কার কী প্রতিক্রিয়া—সব লিপিবদ্ধ করেছেন কথামৃতে। ফলে কথামৃত হ'য়ে রইল শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের এক প্রামাণ্য দলিল, অকাট্য সাক্ষ্য। কিন্তু কেবল কি শ্রীরামকৃষ্ণের? কথামৃত যে একই কারণে স্বামী বিবেকানন্দেরও একান্ত বিশ্বাসযোগ্য, authentication রিপোর্ট! বিবেকানন্দ—নরেনকে authenticate করবে কে? সে ক্ষমতা আছে কার? শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া ইহলোকে দ্বিতীয় কেউ নেই, ছিলেন না। যিনি জানতেন—নরেন্দ্র আসলে কে, কত বড়ো তিনি ছিলেন। পাঁচখণ্ড কথামৃতে প্রায় উনপঞ্চাশটি সিন্-এ নরেনকে দেখা যায়। আরো গোটা বারো জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অপরের নিকট নরেনের মহিমা বর্ণনা করছেন। অশেষ ভালোবাসায় আর আনন্দগৌরবে সেই সব ঐশীবাক্য লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রীম। আর নয়টি অবিস্মরণীয় পরিচ্ছেদে অসীম প্রেমে ও শ্রদ্ধায় শ্রীম চিত্রিত করেছেন বরাহনগর মঠে নরেনের নেতৃত্বে ভ্রাতৃসঙ্ঘের জন্মবিবরণ, চোখের সামনে জীবন্ত ক'রে তুলে ধরেছেন ত্যাগী ভাইদের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধন। চিত্রিত করেছেন শ্রীম'র চিরাচরিত সত্যনিষ্ঠার।

শ্রীম লিখছেন, 'মঠের ভাইরা নরেন্দ্রর অদর্শন সহ্য করতে পারেন না। সকলেই ভাবিতেছেন, নরেন্দ্র কখন ফিরিবেন।' কেন? কেন এত ব্যাকুলতা? শ্রীরামকৃষ্ণ যে নরেন্দ্রকে তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত দৈবী প্রেম দান ক'রে গিয়েছেন! কোন কোন দিকে নরেন্দ্রের মধ্যেই তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পান। নরেন্দ্রের এই অনুপম দৈবী রূপান্তরের সত্যনিষ্ঠ সাক্ষ্যও শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম'র—রামকৃষ্ণাবতারের এই ব্যাসদেবের—মহাপ্রয়াণের পরদিবসে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ, বেলুড় মঠের দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট বলেছিলেন, "এ সব ঠাকুরের শরীর। তাঁর কাজের জন্য এসেছিলেন। কাজ ফুরিয়েছে, তিনি আবার

কোলে তুলে নিলেন। যাবৎ চন্দ্র সূর্য উঠবে তাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম জীবন্ত থাকবে। আর সেই সঙ্গে থাকবে কথামৃতের লেখক শ্রীম'র নাম।" (শ্রীম-দর্শন, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ৪৫৭)।*

* ৯ই এপ্রিল ১৯৮২, উদ্বোধন কার্যালয়ের ভবনে 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।—স:

মাতৃ-বিভূতি

শেখ সদরুদ্দিন

মাকে আমার দেখতে কেমন, মায়ের রূপ কেমন বলো—
মায়ের রূপ-বর্ণনাতে আঁখি করে ছলোছলো।
যেদিকেতে তাকাই ফিরে দেখি সেথা মা-যে আছে,
ধূলি-কণা মাঠে-ঘাটে, বনভূমি—লতায় গাছে।

ঝর্না-নদী, সাগর-পাহাড় তুষার কিংবা মরুভূমি—
সবখানাতে দেখি আমি মাতৃদেবী আছ তুমি।
আকাশেতে আছ তুমি বাতাসেতে আছ মিশি'
সারা বিশ্ব প্রকৃতিতে মিশে আছ দিবানিশি।

তোমার রূপে সূর্য হাসে, চন্দ্র হাসে জোছনাতে
প্রজাপতি পাখনা নাচায়, গাইছে পাখী বেহাগেতে।
আলোর গানে তুমি হাসো, অন্ধকারেও তুমি আছ,
মুণ্ডমালা গলায় প'রে কালী হ'য়ে তুমিই নাচো।

জন্ম-মৃত্যু আসছে ভবে তোমার পায়ের নাচের তালে,
তোমার রূপের আলোর ছটায় বন্দী করো মহাকালে।
কখন আলো অন্ধকার, কখন বা কান্না-হাসি—
তোমার নাচের তালে দেখে অবাক হ'য়ে জগদ্বাসী!

তোমার রূপ দেখাও তুমি যখন যেমন ইচ্ছা করে,
মুগ্ধ হ'য়ে ভবের মানুষ আমরা দেখি নয়ন ভ'রে।
মন্দ যাকে মনে করি, সেটাও ভালো মনে হয়,
তোমার অপার প্রকাশ মাগো বোঝার সাধ্য মোদের নয়!

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

শ্রীশচন্দ্র সান্যাল*

১৯১৪ সালে আমি ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় আসি। আমরা তখন কলকাতার এক মেসে থাকতাম। আমি আর আমার ছোটমামা, পরে যিনি স্বামী বিবিদিষানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। আমরা স্কট লেনে এক মেসে থাকতাম। তখনও তিনি সন্ন্যাসী হননি। তখন তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। তারপরে এলেন আমার মেজদা নীরদ। তিনি এবং তাঁর ছোটভাই ক্ষীরোদ প্রথমে থাকতেন সি. এম. এস. হস্টেলে (C. M. S. College-এর অপর নাম St. Paul's College)। সরস্বতী পুজো নিয়ে হস্টেলে হাঙ্গামা হয়। তাই তাঁরা অন্য মেসে চলে আসেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে ছিল তাঁদের হস্টেল ও কলেজ। স্বামী অশেষানন্দও C. M. S. হস্টেলে থাকতেন। মেজদা নীরদও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। আমরা সবাই ছাত্র। ওই মেজদার উৎসাহে আমরা প্রায় প্রত্যেক রবিবারে সকালবেলা মঠে যেতাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) প্রমুখরা তখন মঠে। দল বেঁধে আমি, ছোটমামা অর্থাৎ দ্বিজেন, মেজদা অর্থাৎ নীরদ আর তাঁর ছোটভাই প্রভৃতি সবাই সকালবেলা মঠে যেতাম, আবার সন্ধ্যাবেলা ফিরতাম। সারাদিন মঠে কাটাতাম। মহারাজদের দর্শন করতাম, প্রসাদ বিতরণ করতাম, নিজেরাও প্রসাদ পেতাম। এই করেই আমি পরিচিত হই মহারাজদের সঙ্গে।

আমরা মঠে ওইরকম যাতায়াত করি। শ্রীশ্রীমা কখনও মায়ের বাড়ীতে, বাগবাজারে এলেই খবর পাওয়া যেত। তবে প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। পুরুষ মানুষেরা বড় কেউ তাঁকে দর্শন করতে পারত না। মেয়েভক্তেরা যেতে পারত। তবে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর যখন সুস্থ থাকত, তখন কোন কোন রবিবারে পুরুষ-ভক্তদেরও দর্শন হত। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) তখন শ্রীশ্রীমায়ের দেখাশোনা করতেন। শরৎ মহারাজের অনুমতি পেলে পুরুষভক্তদের দর্শন হত। শ্রীশ্রীমা ভাল আছেন খবর পেলে আমরা বিকেলবেলা সময়মতো চলে যেতাম মায়ের বাড়ীতে বাগবাজারে। তখন ওই বাড়ীর ওপরের বারান্দা খুব সরু ছিল, আমরা লাইন করে ওপরে যেতাম। বর্তমানে শরৎ মহারাজের ঘর যেটা, সেখানে একটা তক্তাপোষ পাতা থাকত সেখানে শ্রীশ্রীমা একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে বসতেন, কেবল চরণ দুখানা দেখা যেত। আমরা গিয়ে লাইন করে প্রণাম সেরে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে আসতাম। এভাবে প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দর্শন হল। তারপর কলকাতাতেই আছি। ১৯১৭ সাল। আমি তখন স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ. পড়ি আর বাদুড়বাগান লেনে টমারি হস্টেলে থাকি। ছোটমামা দ্বিজেন যিনি পরে স্বামী বিবিদিষানন্দ, থাকেন বেনেটোলায় একটা মেসে। মেজদা নীরদ পরে যিনি স্বামী অখিলানন্দ, থাকেন সি. এম. এস. হস্টেলে। তখনও সবাই একত্র হয়ে আমরা মঠে অথবা মায়ের বাড়ী অথবা বলরামবাবুর বাড়ী (এখন যেটা বলরাম মন্দির) যাতায়াত করি।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ একদিন

* শ্রীযুক্ত সান্যাল শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। তিনি বাংলাদেশের লালমণির হাট হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তাঁহার কয়েকজন ছাত্র তাঁহারই অনুপ্রেরণায় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন।—সঃ

ছোটমামা আমাকে বললেন যে, আমার আরও দুই মামা আসছেন শিলং থেকে বড়দিনের (Xmas) ছুটিতে। যাবেন জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। তাঁরা আগেই মায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। চাকরী করতেন শিলং-এ। ছোটমামা আমাকে বললেন: 'তুমিও যাও। এই সুযোগে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্র নিয়ে নাও।' আমি উত্তর দিলাম: 'হ্যাঁ, আমি যাব।' তখন ওঁকে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য কিছু কেনা-কাটা করলাম। শিলং-এর মামারা এলেন। তাঁরাও একটু ফল-ফলাদি কেনা-কাটা করলেন। অবশেষে আমরা রওনা হলাম জয়রামবাটির উদ্দেশ্যে। আমি, মেজমামা—নগেন্দ্র চৌধুরী, গোরা মামা—উপেন্দ্র চৌধুরী আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের আরেকজন বন্ধু এসেছেন—সুরেন চক্রবর্তী। তিনিও শিলং-এ চাকরী করেন। মামারা দুজন তো আগেই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের। এখন ঐ সুরেন চক্রবর্তীও মন্ত্র নেবার আশায় এসেছেন। আমিও সেইসঙ্গে জুটে গেলাম। আমরা চারজন চললাম।

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে বিষ্ণুপুর স্টেশনে গিয়ে নামলাম। সেটা ছিল শীতের সময়, ডিসেম্বর মাস। স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। তখন যাতায়াতের রাস্তা কাঁচা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ছিল কোয়ালপাড়া পর্যন্ত। আর যাতায়াতের উপায় হাঁটা অথবা গরুর গাড়ী। হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে দুখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করে আমরা চারজন রওনা হলাম কোয়াল-পাড়ার অভিমুখে। কোয়ালপাড়াতে স্বামী কেশবানন্দের আশ্রমে সন্ধ্যার সময় পৌঁছুলাম। স্বামী কেশবানন্দ আমাদের জয়রামবাটী যাওয়ার অভিলাষ জেনে আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি সেখানে তাঁতের কাজ করেন। অন্যান্য সব নানা কাজও আমাদের দেখালেন। তাঁর নিজের কথাও কিছু কিছু বললেন। আমি সবচেয়ে ছোট, কলেজে পড়ি। আর সবাই বড়, চাকরী করেন। তাই আমার প্রতি তাঁর স্নেহ একটু প্রবল বলে মনে হল। আমরা মন্ত্র নেবার আশায় যাচ্ছি শুনে স্বামী কেশবানন্দ বললেন: 'যাচ্ছ তো, মায়ের মন কিন্তু ভাল নয়। কারণ ভাইঝি বড় অসুস্থ। কালকে একটি ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের ভাগ্যে কি আছে জানি না।' আমরা তো মনে মনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি: 'মা! এবার যেন ফিরিয়ে দিও না।' কোয়ালপাড়া থেকে মাঠে মাঠে যেতে হত তখন। কোন রাস্তাঘাট ছিল না। মাঠে কৃষকেরা দেখিয়ে দিত: 'এদিক থেকে যেতে থাকুন। কোন লোকজন মাঠে পেলে জিজ্ঞেস করে করে যাবেন।' খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলের দিকে রওনা হলাম। একটু ঘোরাফেরা করতে হল আমাদের। রাস্তা তো নেই। মাঠে মাঠে যাওয়া। এইভাবে জিজ্ঞেস করে করে, ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যাবেলা আমরা জয়রামবাটী পৌঁছে গেলাম। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী। তখন মায়ের নিজের বাড়ী হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। ওপরে পাটাতন হচ্ছে। আমরা সেই ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করলাম। তখন তো আর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাওয়া যাবে না। রাত্রিতে খেতে গেলাম। আমরা বসে খাচ্ছি, কাছেই দেখা যাচ্ছে—শ্রীশ্রীমা পা ছড়িয়ে বসে আছেন, আমাদের খাওয়া দেখছেন। রাত্রিতে তখন ঐটুকুই দেখলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে বেরিয়ে এলাম। পরের দিন সকালবেলা

সেবককে পাঠিয়ে আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমরা ভেতরে গেলাম। চারজনই গেলাম। আমার মামারা দুজন তো আগেই শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান। তাঁরা প্রণাম করলেন। তারপরে সুরেন চক্রবর্তী গিয়ে বললেন: 'মা, আমি শিলং

থেকে এসেছি, আমাকে মন্ত্র দিতে হবে।' আমাদের তো বুক দুর দুর করছে, মা কি বলেন এই ভাবনায়। শ্রীশ্রীমা বললেন: 'আচ্ছা।' সবশেষে আমি গিয়ে প্রণাম করে বললাম: 'মা! আমি কলকাতা থেকে আসছি আপনার কাছে মন্ত্র নেবার জন্যে।' শ্রীশ্রীমা প্রশ্ন করলেন: 'ও, তুমি কলকাতা থেকে এসেছো? তা কলকাতায় ছেলেরা কেমন আছে?' আমি ঠিক বুঝতে পারিনি শ্রীশ্রীমার প্রশ্নটি। এই যে ছেলেরা কেমন আছে বললেন, সে কাদের কথা বললেন? কিছু না বুঝেই আমি বলে ফেললাম: 'ভাল আছেন। আমি মন্ত্র নেব মা।' শ্রীশ্রীমা বললেন: 'আচ্ছা, এসো।' আমি বাইরে এসে মামাদের জিজ্ঞেস করলাম: 'মা প্রশ্ন করলেন—ছেলেরা কেমন আছে?—আমি ঠিক বুঝিনি, কাদের কথা মা জিজ্ঞেস করছেন।' মামারা বললেন: 'বুঝলি না, ওই রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজদের কথা বলছেন।' 'তা আমি তো বলে এসেছি, ভাল আছেন। ভালই তাঁরা আছেন।' ওঁরা বললেন: 'আচ্ছা বেশ করেছো।'

এর পরে আমরা স্নানাদি সেরে তৈরী হয়ে বাইরে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। শ্রীশ্রীমা পূজো শেষ করে তাঁর ঠাকুরঘরখানায় ডেকে পাঠালেন। প্রথমে গেলেন সুরেনবাবু। তাঁর দীক্ষা হয়ে গেল। তাঁর পরে আমি গেলাম। আমাকেও তিনি কৃপা করে মন্ত্র দিলেন। একখানা কাপড় নিয়ে গিয়েছিলাম। দীক্ষান্তে প্রণাম করে, সেখানা মাকে দিলাম। আর দুটি টাকাও শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে দিতে গেছি, মা বললেন: 'মাটিতে দাও। (টাকা) লক্ষ্মী।' আমি কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের পায়েই দিলাম। শ্রীশ্রীমা সেটি তুলে নিলেন। এই আমার শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নেওয়ার ইতিহাস।

আমরা বাড়ীর বাইরে এলাম। সেখানে এক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য তিনি। শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝির চিকিৎসার জন্যে সেখানে আছেন। তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি হল। তখন ডাক্তারটি জানালেন যে, শ্রীশ্রীমা ভারী খুশী হয়েছেন। কি ব্যাপার? কিসে মা খুশী হয়েছেন বুঝতে পারছি না। ডাক্তার বললেন: 'দেখুন, রাধুর খুব অসুখ। আমি এখানে এসে দেখে বললাম, বেদানার রস খাওয়াতে হবে রাধুকে।' একথা শুনে মা খুব চিন্তিত ছিলেন। কারণ বেদানা তো এখানে পাওয়া যাবে না। বিষ্ণুপুরেও পাওয়া যাবে কিনা তা অনিশ্চিত, নয়তো একেবারে কলকাতায়। সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় আমরা গিয়েছি আর আমাদের সঙ্গে বেদানা রয়েছে। মামারাই নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার বাবুর ধারণা, সেইজন্যে মা খুব খুশী আছেন। এ-কথা শুনে আমরাও খুব খুশী। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেলবেলা আমরা কামারপুকুরের দিকে রওনা হলাম। শ্রীশ্রীমায়ের এক সেবক কোন্‌দিকে কামারপুকুর তা দেখিয়ে দিলেন। বললেন: 'ঐদিকে লক্ষ্য করে সোজা যেতে থাকবেন।' মাঠে মাঠেই যাওয়া। পথ-ঘাট বলে কিছু নেই। তিনি আরও জানালেন যে, এরকম দিশা করেই চলে যেতে হবে। মাঠে কাউকে দেখতে পেলে জিজ্ঞেস করা যাবে, নয়তো সোজা হাঁটতে হবে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যার কিছু আগেই কামারপুকুর পৌছে গেলাম। তখন তো সব জঙ্গলে ভরা। ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়ে ঘর-টর সব দেখলাম। সেখানে তখন পুরুষমানুষ কেউ ছিলেন না, মেয়েরাই ছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা আমাদের খুব যত্ন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানটি কোথায়?' তাঁরা দেখিয়ে দিলেন জায়গাটি। শ্রীশ্রীঠাকুর যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরও দেখলাম। সেই ঘরে

একটা মৃদঙ্গ ছিল। সুরেন চক্রবর্তী সেই মৃদঙ্গ একটু বাজালেন। আমরাও অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে দেখলাম। আসবার আগে রামলাল দাদার স্ত্রী ভুট্টার খই আর গুড় দিলেন, আমরা খেলাম। আর ওখানে ডোবার মতো পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। আবার হালদার পুকুরও দেখিয়ে দিলেন। পুকুরের ধারে বাঁশ-ঝাড়, আর জঙ্গল, আবার অন্ধকার হয়ে এসেছে। কাজেই সেখানে যেতে আর সাহস হল না। যুগীদের শিবমন্দির দেখলাম। এসব দেখে আমরা জয়রামবাটীর দিকে রওনা হলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পথ নেই, মাঠের ওপর দিয়ে যেতে হবে। মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকেরা বলে দিল: 'এই সোজা যেতে থাকুন।' দেখতে দেখতে ঘন অন্ধকার নেমে এল। কিছুই আর দেখা যায় না। মাঠে জনপ্রাণীও নেই যে জিজ্ঞেস করবো। কোথায় যাচ্ছি, কোন্ দিকে যাচ্ছি, জানি না। ভয় হল, হয়তো জয়রাম-বাটীর দিকে না যেয়ে অন্যদিকে যাচ্ছি। কোন নিশানা নেই, যা দিয়ে বুঝবো যে উত্তরে যাচ্ছি, কি পুবে যাচ্ছি। খুব দূরে শুধু জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোন্ গ্রামের জঙ্গল? সবাই আমরা শঙ্কিত। চলেছি তো চলেছি। শেষে সারারাত মাঠে মাঠে ঘুরতে থাকবো, না কি অন্য কোন গ্রামে গিয়ে উঠবো? এই সময় দেখতে পেলাম খুব দূরে একটা লণ্ঠনের বাতি নিয়ে কে যেন চলছে, খুব দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। আমাদের তখন একটু আশা হল—বাতি যখন দেখা যাচ্ছে; লোকজন তখন নিশ্চয়ই কাছে আছে। আমরা খুব চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম: 'মশায় কে বাতি নিয়ে যাচ্ছেন, একটু দাঁড়ান। আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা বুঝতে পারছি না, কোথায় যাচ্ছি।' আমাদের চীৎকার শুনে উনিও ডাকতে আরম্ভ করলেন: 'এদিকে আসুন, এদিকে আসুন।' আমরা বাতির দিকে লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম। কাছে গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীমায়ের সেবক এক সন্ন্যাসী, লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আমরা জিজ্ঞেস করলাম: 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' উত্তর দিলেন: 'আপনাদের খোঁজেই বেরিয়েছি। মা বললেন, "যাও, লণ্ঠন নিয়ে এগোও। ওরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।"' উনি আমাদের নিয়ে বাড়ী পৌঁছুলেন। তা আমরা অবাক! শ্রীশ্রীমা আমাদের জন্যে এত চিন্তা করেছেন। সেদিন তো রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করলাম। খাওয়ার সময় শ্রীশ্রীমা একটা জায়গায় বসে তদারকি করতেন। দুপুরবেলাতেও তাই দেখেছি। মায়ের পায়ে বাত ছিল, পা ছড়িয়ে বসতেন। সন্তানদের একটা কিছু নিজে রান্না করে খাওয়াবেন। একটা ঝলকের মতো দেখলাম তখন।

পরের দিন সকালে আমরা তৈরী হলাম কলকাতায় ফিরে আসব বলে। গেলাম শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে, মাকে প্রণাম করলাম। মা তখন ভেতরের বাড়ীর একটা ঘরে ছিলেন। মা একটু ছানা করে বাটিতে রেখে দিয়েছিলেন। সেটি এনে তখনই প্রসাদ করে দিলেন। প্রসাদ করে আমাদের হাতে হাতে দিলেন। প্রসাদ খাবার পর আমাদের মধ্যে শিলং থেকে যিনি এসেছিলেন, তিনি মাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'মা, আমি শিলং-এ থাকি। তা আমাদের তো সবসময় জামা-কাপড়, জুতো-মোজা পরে থাকতে হয়। সে ভয়ানক শীতের জায়গা। সবসময় স্নান-টানও করা হয় না। কিন্তু এসব জামা-কাপড় পরে আমরা জপ-টপ করতে পারি কি?' মা বললেন: 'হ্যাঁ, জপ করবে।' আমি তো ছেলেমানুষ—আমি গিয়ে বললাম: 'মা, কাল যে আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন, তা আমি আরেকবার আপনাকে শুনিয়ে নিচ্ছি। আমি করে জপ করি এবং বলি, আপনি দেখুন।'

তা একেবারে কাছে গিয়ে আমি দেখালাম সব। মন্ত্রও বললাম। সব দেখে মা বললেন: 'ঠিক আছে। ভুলবে না'—এই বলে আমার চিবুক ধরে একটু চুমু খেলেন। তারপরে আমরা প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

আগের দিনেও একটা ঘটনা ঘটে। আমরা বৈঠকখানা ঘরে বসে আছি, দেখি যে শ্রীশ্রীমা রাস্তায়। কাছেই ভাইয়ের বাড়ী গিয়েছিলেন। আমরা গিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম করলাম, তিনি দাঁড়ালেন। আধাময়লা সাদা কাপড়, ঘোমটা একেবারে মাথার ওপরে। আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বললেন। বললেন: 'এখানে বড্ড ধূলো গো।' আমরা বুঝলাম না কোন্ ইঙ্গিত। সেই শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের ধূলো যদি সঙ্গে নিয়ে আসতাম! আমি তো সকলের ছোট ছিলাম, কিছুই বুঝি না। যা হোক, তারপরে আমরা যেদিন আসছি, সেদিন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বৈঠকখানা ঘরে এসে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে তৈরী হয়ে রওনা দিলাম। ওঁরা তিনজন আগে যাচ্ছেন, আমি সকলের শেষে। মায়ের ভেতর বাড়ীর দরজার কাছে এসে আমার মনে হল—শ্রীশ্রীমাকে আরেকবার প্রণাম করি। তা তাঁকে তো আর দেখতে পাব না এখন। ওই দরজাতেই (দরজাটা খোলা ছিল বোধহয়) চৌকাঠের কাছে আমি মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছি। শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে প্রণাম করেছি। প্রণাম করে মাথা তুলতেই দেখি যে চৌকাঠের ওপরে আমার মাথার কাছে শ্রীশ্রীমা এসে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তো অবাক! মা একেবারে আমার মাথার কাছে চরণ দুখানা রেখে দাঁড়িয়ে! আমি তখন চৌকাঠের ওপরে গিয়ে মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। এই দেখে ওঁরাও ফিরে এসে প্রণাম করলেন। প্রণাম সেরে সকলে আবার রওনা হলাম। মা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে। আস্তে আস্তে ফিরে চললাম। আবার আমরা সেই কোয়ালপাড়ায় স্বামী কেশবানন্দের আশ্রমে এসে উঠলাম। সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে গরুর গাড়ীতে আমরা বিষ্ণুপুর এলাম। বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতায়।

তারপরে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে আমার বি. এ. পরীক্ষা। আমার মনে মনে সঙ্কল্প রইলো যে, আমার গর্ভধারিণী মায়ের দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এর আগে থেকেই তাঁর দুইভাই সন্ন্যাসী। দু-মাস বয়সে আমি পিতৃহারা হই। মা আগে থেকেই ভাইদের কাছে শুনে শুনে ঠিক করে রেখেছেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্র নেবেন। অনেকদিনের তাঁর এই সাধ। তাই আমার মন্ত্র হওয়ার পরেই আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম, পরীক্ষার পরে দেশে গিয়ে আমার মাকে কলকাতায় নিয়ে আসবো। ততদিনে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমার স্ত্রীও দেশের বাড়ীতে। ১৯১৮ সালে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে রওনা হলাম। দেশের বাড়ীতে যাওয়া-আসা তখন বড়ই কষ্টকর ছিল। ময়মনসিংহ এসে ট্রেন ধরতে হত। আঠারোবাড়ী পর্যন্ত একটা ট্রেন ছিল। আর আঠারোবাড়ী থেকে ৮।১০ মাইল দূরে আমাদের গ্রাম। সেখানে যেতে ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী এইসব যানবাহন। মাঝে-মধ্যে আবার ভাঙা পুল ইত্যাদি সব ছিল। বর্ষাকাল তখন। এই জুনমাস হবে। আমি বাড়ীতে গিয়েই মাকে বললাম: 'তোমাকে কলকাতাতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাব আমি।' দেশে তখনও তো শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব প্রচার হয়নি। দেশে আত্মীয়-স্বজনকে বললাম না যে, মাকে আসলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে বললাম: 'আমার মাকে নিয়ে পুরী যাব।' ইতিমধ্যে আমি আমার এক পণ্ডিত মশায়ের সাহায্যে পুরীতে

একখানা বাড়ী ঠিক করে রেখেছিলাম—চক্রতীর্থে। ছোট-খাট একটা বাড়ী। সবাইকে বলি মাকে নিয়ে যাচ্ছি তীর্থে। সঙ্গে আমার স্ত্রীকেও নিলাম। আমার মনে মনে মতলব, দু'জনকে একসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাব। তখন তো এখনকার মতো একটানা রেললাইন হয়নি। যা হোক, বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত কলকাতা এসে পৌছলাম! এসেই দ্বিজেন মহারাজের (আমার ছোটমামা) সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর সঙ্গে আগেই পরামর্শ করে গেছি। তাঁর-ই কথামতো মা এবং স্ত্রীকে কলকাতায় এনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন : 'তোমরা এসেছ ? শ্রীশ্রীমা অবশ্য কলকাতা এসেছেন, কিন্তু ভয়ঙ্কর অসুস্থ। এখন কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার যো নেই।' স্বাভাবিকভাবেই আমরা খুব হতাশ হলাম। তখন দ্বিজেন মহারাজকে বললাম: 'ওঁদের নিয়ে আমি তাহলে পুরী যাই। আপনি খবরাখবর করবেন। শ্রীশ্রীমা সুস্থ হলে আমাকে খবর দেবেন। আমি ওঁদের নিয়ে পুরীতে অপেক্ষা করতে থাকবো। কারণ একবার দেশে ফিরে গেলে আর আসা হবে না।' পুরীতে গিয়ে প্রায় মাসখানেক রইলাম, আর সমানে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করতে থাকলাম। প্রায় একমাস পরে ছোটমামার চিঠিতে জানতে পারলাম, শ্রীশ্রীমা তখনও সুস্থ হননি। আমাদের মনে ভয়ানক হতাশার ভাব। কি করি। শুধু জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে দিন কাটাচ্ছি।

তারপরে হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখি—ওই যে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে কাঠের সিঁড়িটা ছাদ পর্যন্ত গেছে, শ্রীশ্রীমা ওখানে দাঁড়িয়ে। লাল চওড়া পাড় গরদের একখানা কাপড় পরে ছাদের কাছে সিঁড়ির ওপর থেকে শ্রীশ্রীমা পুরীর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকছেন : 'আয়, আয়, আয়।' এই দৃশ্য স্বপ্নে দেখে আমার মন চমকে উঠল। তার দুই-একদিন পরেই ছোটমামার চিঠি : 'শ্রীশ্রীমা এখন সুস্থ হয়েছেন, দেখা হবে। তোমরা শিগ্‌গির চলে এসো।' আমরা তখনই চলে এলাম কলকাতায়। এসে আবার আমার সেই পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী বাগবাজারে গিয়ে উঠলাম। সেখান থেকে পরের দিন হেঁটে মায়ের বাড়ী গেলাম। আমার গর্ভধারিণী মাকে ও স্ত্রীকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি নীচে বসে রইলাম। মাকে বলে দিলাম: 'তুমি গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে বুঝিয়ে বলবে।' আমার স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে আছে। আমার মা ওপরে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে বললেন: 'মা, আমার ভাইয়েরা তো আপনারই শিষ্য, তা আমিও মন্ত্র নেব।' তখন যোগীন-মা ছিলেন কাছে, তিনি বললেন : 'তোমাদের এসব কি গো ? তোমরা কুলগুরু ছেড়ে এসেছ কেন ?' উত্তরে মা বললেন : 'কুলগুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নেব, সে ইচ্ছা আর আমাদের নেই। আমি মায়ের কাছেই মন্ত্র নিতে এসেছি।' শ্রীশ্রীমা অন্য কিছু না বলে, শুধু বললেন: 'আচ্ছা।' আমার স্ত্রীর আর কিছু বলতেই হল না। এরপরে শ্রীশ্রীমা পূজো সেরে আমার মাকে মন্ত্র দিলেন, আমার স্ত্রীকেও মন্ত্র দিলেন। দীক্ষার পরে প্রসাদ দিলেন। কিছুক্ষণ ওঁরা বসে আছেন শ্রীশ্রীমার কাছে। আমার স্ত্রীকে ডেকে—তিনি তখন ১৫।১৬ বৎসরের মেয়ে—শ্রীশ্রীমা বলছেন : 'বৌমা, আমার পায়ে একটু তেল মালিশ করে দাও তো।' তেল কাছে ছিল। ও কিছু বুঝতেও পারেনি। শ্রীশ্রীমা বললেন, আর ও তেল মালিশ করে দিল (এ ঘটনা আমি পরে এঁদের মুখে শুনেছি)। রাধুকেও নাকি আমার স্ত্রী দেখেছিলেন। আমি কিন্তু রাধুকে দেখিনি। সবশেষে আমার মা বললেন: 'আমার ছেলে এসেছে সঙ্গে, আপনাকে প্রণাম করতে চায়।' তা আমি তখন দুপুরবেলাতেই গেলাম প্রণাম করতে। আমি আগে শুনেছিলাম

আমার পণ্ডিত মশায়ের (উনি স্মৃতিতীর্থ ছিলেন) কাছে যে, মন্ত্র জপ করলে শুনতে হয়, না শুনলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়। আমার মনটাতে যেন কেমন লাগলো এই কথা শুনে। কারণ আমি এমনিও মন্ত্র জপ করি। তাই শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞেস করলাম এই ফাঁকে : 'মা, না শুনলেও কি জপ সিদ্ধ হবে ?' শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ, হবে। যাও।' তাঁকে প্রণাম করলাম। তখন তাঁর শরীর একটু যেন ভালই দেখলাম। এই শ্রীশ্রীমাকে আমার শেষ দর্শন। সেটি ১৯১৮ সালের জুন মাস বোধ হয়। তারপরে ১৯২০ সালে তো মায়ের দেহ চলে গেল। কাজেই আর দর্শন হয়নি।

স্বামী সারদানন্দ : মূর্ত বিবেকবাণী

ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধ সনাতন সত্যের ভাস্বর প্রকাশ-রূপটিই মাত্র দেখেননি—তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনুভূত ঐ সত্যের ব্যাবহারিক প্রয়োগের আশ্চর্য কুশলতাও। তিনি নিরন্তর বোধ করেছিলেন 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' জীবন উৎসর্গ করার এক দুর্বার প্রেরণাকে। পরার্থে আত্মোৎসর্গপ্রসঙ্গে তাই স্বামীজী বলেছিলেন : 'রামকৃষ্ণ এই জগতের জন্য প্রাণ দিতে এসেছিলেন। আমিও জগতের জন্য প্রাণ দেব। তোমরা সকলে দেবে—তোমরা সকলে—। ...বিশ্বাস করো, আমাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিলে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে বিরাট বীরের দল, ঈশ্বরের সৈনিকেরা, যারা আনবে জগতে বিপ্লব।'[১] তাই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ করেছিলেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ।

স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতের উচ্চ আদর্শ আছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করার যে কর্মকুশলতার প্রয়োজন তা খুবই বিরল। উচ্চ আদর্শের সঙ্গে যদি প্রয়োগ-কুশলতা যুক্ত হয়, তবেই ঐ আদর্শের বাস্তব মূল্য আছে, যা তিনি প্রভূত দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়েছিলেন। জগতের মানুষ চমৎকৃত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জীবনে যে এই আদর্শ কিভাবে প্রতিফলিত করা যায়, তা তারা বুঝতে পারত না। তাই স্বামীজী একদা তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে উপলক্ষ ক'রে বলেছিলেন : 'দেখ হরি ভাই, এরা আমাকে দেখে কিছু বুঝতে পারে না।...আমাকে দেখে এরা চমৎকৃত হ'য়ে যায়, স্তম্ভিত হ'য়ে পড়ে। তাই আমাকে এরা খুব ভালবাসে এবং প্রশংসা করে, কিন্তু বুঝতে পারে না। তোমরা ঠাকুরের সন্তান।...Live the life (আদর্শ জীবন যাপন কর)।'

দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে প্রয়োগ করতে কর্মকুশল ব্যক্তিগণের প্রয়োজন তাই এত প্রবল। আর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তানরা এই কারণেই জগতে এত বরণীয় হ'য়ে রয়েছেন। আমরা এখানে আলোচনা ক'রব স্বামী

১ Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, p. 629 ; শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ।

সারদানন্দজীকে নিয়ে। তাঁর ভার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর উপর দিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁর বাণীকে তথা শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সারদানন্দজীকেই উদাহরণস্বরূপ গড়ে তুলেছিলেন।

পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই স্বামীজীর বাণী কী অদ্ভুতভাবে ভাস্বর হ'য়ে স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে ব্যক্ত হয়েছে! স্বামীজীর বাণী ছিল তাঁর কাছে জীবন্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রের সাধন ক'রে তিনি জগদ্বাসীকে দেখিয়েছেন—উচ্চ আদর্শ কিভাবে কার্যে পরিণত করতে হয়।

আমরা এখানে স্বামীজীর কয়েকটি বাণী সারদানন্দজীর জীবনে কতখানি মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল, তা-ই দেখার চেষ্টা ক'রব। আলোচনার সুবিধার জন্য বিবেকবাণীকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করলে মন্দ হবে না, যেমন—

(১) 'Work and worship'—কর্ম ও উপাসনা।

(২) 'গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কর্ম দর্শন।'

(৩) 'জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

'Work and Worship'—কর্ম ও উপাসনা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতিটি অঙ্গের চরিত্র কেমন হবে সে-সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের উপলক্ষ ক'রে বলেছিলেন: 'তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল আদর্শবাদের সহিত কার্যকারিতা যুক্ত থাকে, তাহা করিতে হইবে। তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পর-মুহূর্তেই এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।'

ধ্যান ও কর্ম দুটি আপাতবিপরীত ধর্মী। ধ্যান মানুষের মনকে অন্তর্মুখী ক'রে ঈশ্বর দর্শন করায়, আর কর্ম মানুষের মনকে বহির্মুখী ক'রে সংসারে আসক্ত করে। ধ্যানের ন্যায় মনকে কিভাবে কর্মের দ্বারাও অন্তর্মুখী করা যায়, তা যদি প্রাত্যহিক জীবনে কারো মধ্যে প্রকাশ হ'তে না দেখা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে পারবে কেন যে কর্মও উপাসনায় রূপান্তরিত হ'য়ে ঈশ্বর দর্শন করায় এবং ভববন্ধন খণ্ডন করতে সক্ষম। সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ স্বামীজীর এই আদর্শগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য স্বামী সারদানন্দের জীবন ছিল ভাষ্যস্বরূপ। তাঁর জীবনে কী অদ্ভুতভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে স্বামীজীর বাণীগুলি! কর্ম কিভাবে উপাসনায় রূপান্তরিত করা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর জীবনের অন্ততঃ দুটি ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি।

স্বামী নিখিলানন্দ 'স্বামী সারদানন্দের স্মৃতি-কথা'য় লিখেছেন: স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে তিনি একবার কাশী গিয়েছিলেন। কাশী সেবাশ্রমের স্বামী শুভানন্দ একদিন সকালে তাঁদের বাসায় এসে বললেন, সেবাশ্রমের সম্পাদক সারদানন্দজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাকুল। তিনি স্বামী শুভানন্দকে জানালেন, সারদানন্দজী এখন ধ্যান করছেন—এ সময়ে তাঁকে বিরক্ত করা সম্ভব নয়। শুভানন্দ বললেন, সম্পাদক অসুস্থ, তিনি সারদানন্দজীর কাছে আসতে পারবেন না, তাঁকেই ১০ মিনিটের রাস্তা হেঁটে সেবাশ্রমের সম্পাদককে দেখতে যেতে হবে। তখন তিনি নিরুপায় হ'য়ে সারদানন্দজীর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজার সামনে সান্যাল মশায়ও তাঁর বিছানার উপর বসে ধ্যান করছিলেন। তিনি তাঁর আসার কারণ ইসারায় জেনে নিয়ে বললেন, সারদানন্দজী এখন যাবেন না, তাকে চলে যেতে বলো। কিন্তু এদিকে স্বামী শুভানন্দ সারদানন্দজীর যাওয়া একান্ত প্রয়োজন ব'লে জেদ করতে লাগলেন। সারদানন্দজী তখন গভীর ধ্যানে

তন্ময় হ'য়ে আছেন। সাহস ক'রে, তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে চিৎকার ক'রে বললেন : 'সারদানন্দজীর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।' শব্দ শুনে সারদানন্দজী ধীরে ধীরে চোখ খুললেন এবং ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন কি ব্যাপার ? তিনি তাঁকে জানালেন সেবাশ্রমের সম্পাদকের ইচ্ছার কথা এবং তিনি আসতে পারবেন না, তাঁকেই সেখানে হেঁটে যেতে হবে। শোনা মাত্র তিনি জামা-জুতো পরে অসুস্থ সম্পাদককে সেবাশ্রমে দেখতে গেলেন।

ধ্যানের দ্বারা তন্ময় হ'য়ে ঈশ্বরকে দর্শন করা আর অসুস্থ জীবন্ত মানুষরূপী ঈশ্বরকে দেখা— দুটোই সারদানন্দজীর কাছে সমান। দুটোই একই প্রেমময়কে পাওয়ার উপাসনা। তিনি কোনটিকে বড় বা ছোট ক'রে দেখতেন না। প্রত্যেকটি কাজই তাঁর কাছে উপাসনা। তাই তিনি বিনা প্রতিবাদে ধ্যান ছেড়ে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। সামান্য ছোট কাজও তিনি ধ্যানের ন্যায় নিষ্ঠাসহকারে তন্ময় হ'য়ে করতেন।

স্বামী সন্তোষানন্দের 'স্বামী সারদানন্দ স্মরণে' নামক স্মৃতিকথায় বর্ণিত একটি ঘটনায় উক্ত ভাবটি আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। স্মৃতি-চারণের ভাষায় : স্বামী সারদানন্দজী ধ্যানজপ সেরে উপরের ঘর থেকে নীচে তাঁর বসবার ঘরে 'ধীরে ধীরে তাঁর নির্দিষ্টস্থানে বসলেন, তারপর একটি ছোট টুল (সেটি একপাশেই থাকত) সামনে এনে আর একপাশ থেকে একটু ন্যাকড়া এনে অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নসহকারে এই টুলটিকে পুঁছতে আরম্ভ করলেন। ন্যাকড়াটি গেরুয়া রঙের, সমকোণী চতুর্ভুজ আকারে ভাঁজ করা। সেটি দিয়ে অতি যত্নসহকারে টুলটির উপর-নীচে চারিধার, পায়াগুলি সবই পুঁছে সেটিকে তাঁর সামনে বসালেন, আর ন্যাকড়াটিকে সাবধানে যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপরে একটি দেরাজ খুলে বার করলেন, বোধ হয়, একটি বিস্কুটের টিন, তার মধ্যে আছে একটি কালো আর একটি লাল কালির দোয়াত। দুটি সাধারণ নিবযুক্ত হ্যাণ্ডেল-ওয়ালা কলম আর একটু ন্যাকড়া। এই ন্যাকড়াটি রঙ করা নয়। এই ন্যাকড়াটুকু দিয়ে কলম দুটির হ্যাণ্ডেল, নিব—সব আস্তে আস্তে পুঁছলেন আর পুঁছলেন দোয়াতদুটি। তারপর বেরুলো চিঠির গোছা, ছোট ছোট বাণ্ডিল ভাগ করা, বোধ হয়, বিষয় অনুসারে ভাগ। তাঁর কার্যক্রম দেখলে মনে হ'ত যেন এই সব জলচৌকি প্রভৃতি সুখদুঃখ-সম্পন্ন সচেতন বস্তু। যাহোক এইখানে তাঁর প্রস্তুতি শেষ হ'ল। তারপর যে তাঁর কাছে যে প্রয়োজনে গেছে, তা যত সামান্য ব্যাপারই হোক না কেন, অতি অভিনিবেশসহকারে শুনবেন এবং সে সম্বন্ধে যা করণীয় তা ক'রে দেবেন। এই দোয়াত, কলম, টুল প্রভৃতি সাজানোতে যতখানি অভিনিবেশ দেখা যেত, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তাতেও ততখানি অভিনিবেশ দেখা যেত।' সারদানন্দজীর প্রতিটি কর্ম উপাসনায় রূপায়িত হয়েছিল, তাই তাঁর প্রতিটি কর্মে এমন নিষ্ঠা দেখা যেত।

'গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কর্ম দর্শন'

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥
(গীতা, ৪।১৮)

অর্থাৎ যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনি বিভিন্ন কর্ম করলেও কর্মের দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না।—শ্রীভগবান্ অর্জুনকে কোন্‌টি কর্ম এবং কোন্‌টি অকর্ম বোঝাবার জন্য এই শ্লোকটি বলেছিলেন। যথার্থ কর্মযোগীর আদর্শ এখানে ব্যক্ত। স্বামীজী এই শ্লোকের অনুবাদ করেছেন : 'যিনি প্রচণ্ড কর্মে গভীর শান্তভাব এবং গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কর্ম দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।' এবং তিনি

ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিনি আদর্শ কর্মযোগী হবেন, তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়, প্রতিটি স্নায়ু কর্মতৎপর হলেও তাঁর মনে গভীর প্রশান্তি থাকবে। কর্মচঞ্চল, জনকোলাহলপূর্ণ বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করলেও তাঁর মন ধ্যানমগ্ন, ধীর ও শান্ত থাকবে। অথবা গিরিগুহায় নীরব পরিবেশের মধ্যে তাঁর মন প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে।

স্বামীজীর ব্যাখ্যানুযায়ী গীতার এই আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি ক'রে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে তা প্রয়োগ করা—সত্যি অসম্ভব ব'লে মনে হয়। বহির্জগতের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত না হ'লে, জীবনে এটি প্রতিফলিত করা অসম্ভব। এই অসম্ভবকে রূপায়ণই স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাই। তাঁর জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রটি কী সুন্দরভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে!

উদ্বোধনের অফিস-ঘরে বসে কয়েকজন যুবক উচ্চস্বরে সমানে চিৎকার ক'রে হাস্যপরিহাস করছিল। এতে অন্যরা বিরক্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু সারদানন্দজী উদ্বোধনের নীচের তলায় যেখানে তিনি বসতেন, সেখানে বসে নীরবে একাগ্রমনে লিখছিলেন তথ্যবহুল, বিশ্লেষণমূলক ও ভাবগম্ভীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থটি। যুবকরা যেখানে বসে চিৎকার ক'রে কথাবার্তা বলছিল, সেখানে গোলাপ-মা গিয়ে তাদের ভৎ'সনা ক'রে বললেন : 'ধন্যি আক্কেল! উপরে মা আছেন, নীচে শরৎ রয়েছে—আর তোমরা এমন হৈ চৈ ক'রছ?' গোলাপ-মার উচ্চস্বরের ভৎ'সনা সারদানন্দজীর কানে যেতে তিনি বললেন: 'তুমি তো বেশ গোলাপ-মা! ছেলেরা এমন হৈ চৈ করে, তাই ব'লে কি তাতে কান দিতে আছে? আমি তো পাশেই আছি; আমি তো কিছুতে কান দিই না, কিছু শুনতে পাই না। কানটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, "তুই তোর প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কিছু শুনিস না।" কান তো কই কিছুই শোনে না।' এমনই অদ্ভুত তাঁর মনের সংযম! অনাসক্তভাবে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হ'লে, এইভাবে মনকে সংযত ক'রে কাজ করা অসম্ভব। তিনি নিজেকে সাক্ষি-স্বরূপ ও উদাসীন রেখে কিভাবে অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করতেন, তার পরিচয় তাঁর দৈনন্দিন সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যেই সুপরিস্ফুট ছিল।

'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'

ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সর্বজীবের প্রতি যে প্রেম তা স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে বহু আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রেম কখন দারিদ্র্যপীড়িত মানুষকে সহায়তা, কখন দুর্ভিক্ষ-মহামারী কবলিত, বিপন্ন, রোগ-শোকক্লিষ্ট মানুষের সেবা, বা কখন আশ্রিত-বাৎসল্য রূপে শতধারায় উৎসারিত হয়েছিল। তাঁর প্রেমে কোন উঁচু-নীচু ভেদ ছিল না। তাঁর প্রেম 'সমদরশন'। তাঁর হৃদয় ছিল আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো গভীর। তাঁর এই বিশাল বক্ষে সবার স্থান ছিল। আমরা এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে তাঁর বিশাল প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পেতে পারি।

অসুস্থ স্বামীজীর সেবার জন্য সারদানন্দজী একবার সিমুলতলায় গিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার সাঁওতালদের অন্নকষ্ট দেখে বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। আহার্য অন্ন তাদের সব বিলিয়ে দিয়ে তিনি নিজে শুধু ভাতের ফেন খেতে আরম্ভ করেন। মাসাধিক কাল তিনি

এইভাবে ভাতের ফেন খেয়ে কাটিয়েছিলেন। আর একবার কাশী সেবাশ্রমের একজন সেবককে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গরীবদের মধ্যে চাল বিতরণ করতে বলা হ'লে তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। সারদানন্দজী এই কথা শোনামাত্র অম্লানবদনে কাঁধে ঝুলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি চাল বিতরণ করতে লেগে গিয়েছিলেন। তাঁর এই বিরাট অকৃত্রিম হৃদয়বত্তার কাছে সেবকের অভিমানযুক্ত ক্ষুদ্র মনের পরাজয় ঘটেছিল।

একবার উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের করালরূপ প্রকটিত হয়। বুভুক্ষু মানুষের একমুষ্টি অন্নের জন্য হৃদয়বিদারক আর্তনাদ সারদানন্দজীকে বিচলিত ক'রে তুলেছিল। বহু মানুষের অন্নের সংস্থান না করতে পারার যে হৃদয়বেদনা, তা তিনি একটি চিঠিতে মাতৃসকাশে নিবেদন করেছিলেন। ক্ষুধিত মানুষের কষ্ট নিবারণের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে হৃদয়ের আর্তি জানিয়েছিলেন। ঐ চিঠি করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা শুনে আবেগ ও করুণাবিজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন: 'শরতের দিল্ দেখলে? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরাজ লোক ভারতবর্ষে নাই—সমস্ত পৃথিবীতে নাই।' তাঁর এই সেবার মূলমন্ত্র তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'পরের টাকা পরকে দিবি; তুই কি দিবি? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণ—মন, ভালবাসা।'

বিপন্ন মানুষের সেবার জন্য সারদানন্দজী সর্বদা উন্মুখ হ'য়ে থাকতেন। যে কোন পরিবেশের মধ্যে তিনি তা করতে পরাঙ্মুখ হতেন না। একবার পরিব্রাজক অবস্থায় হিমালয়ের এক ভীষণ খাড়াই অবতরণ করতে গিয়ে তিনি দেখেন, এক বৃদ্ধা লাঠি না নিয়ে মোটেই হাঁটতে পারছেন না। বিপন্না বৃদ্ধাকে তিনি তাঁর হাতের লাঠিটি দিয়ে দেন। স্বেচ্ছায় বিপদের ঝুঁকিকে বরণ ক'রে নিয়ে, নিজে খালি হাতে নামতে থাকেন। এই সব পথে হাতে লাঠি না থাকলে যে-কোন মুহূর্তে পা-পিছলে হাজার হাজার ফুট গভীর খাদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সারদানন্দজী খালি হাতে হেঁটে কোন রকমে নীচে নামলেও পার্বত্য নদী পার হ'তে গিয়ে জলে পড়ে যান। খরস্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গী দুই গুরুভাইয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি কোনমতে পারে ওঠেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেও অন্যকে বিপদমুক্ত করার এই যে সৎসাহস, তার উৎস ছিল ঐ প্রেম।

কত রোগশোকতাপক্লিষ্ট নরনারী সারদানন্দজীর বিশাল বক্ষের প্রেমের পরশ পেয়ে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা জুড়িয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সীমিত কয়েকটি বই-এ ঐ প্রেমফল্গুধারার কটির বা সন্ধান পাওয়া যায়! তবু যা পাওয়া যায়, তাতেই বুঝতে অসুবিধা হয় না তাঁর প্রেমধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হ'ত। কয়েকটি এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি।

যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য (ফকির) নামে এক দরিদ্র যুবকের গ্যালোপিং (galloping) থাইসিস হয়। রোগটি ভীষণ সংক্রামক এবং এই রোগের প্রতিষেধক ঔষধ তখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। অতএব এসব রোগীদের বাঁচার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাই হোক, ফকিরকে বলরামবাবুর বাড়ির পূর্ব দিকের একটি ঘরে শুশ্রূষার জন্য এনে রাখা হয়। তার চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যের জন্য সারদানন্দজী আর যোগানন্দজী দুজনে মিলে পাঁচজনের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাকে প্রাণপণে সেবা করতে লেগে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন পূজনীয় তুলসী মহারাজ। ফকিরের বাঁচার কোন আশা ছিল না, তবু তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সারদানন্দজী ও তুলসী মহারাজ তাঁদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে দিনরাত সেবা করেছিলেন। ফকিরের মুখনিক্ষিপ্ত

রক্ত ও থুতু ভরতি ডাবর তাঁরা নির্দ্বিধায় পরিষ্কার করতেন। এতে তাঁদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হ'তে পারে—কেউ এ-রকম আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে ঐ কাজ থেকে তাঁদের বিরত হওয়ার জন্য বললে, সারদানন্দজী তৎক্ষণাৎ বলতেন: 'অপর কারও জন্য কিছুই তো করতে পারলাম না, তবে লোকসেবা করতে করতে যদি প্রাণটাও যায় তাও ভাল।' ছোটবেলা থেকেই সারদানন্দজীর মধ্যে এই সেবাভাব দেখা যেত। একবার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে পরিচারিকার বিসূচিকা রোগ হয়। গৃহকর্তা বাড়ির সকলের নিরাপত্তার জন্য তাকে বাড়ির ছাদের এককোণে বিনা যত্নে ফেলে রাখেন। এই নিদারুণ সংবাদ শোনামাত্র তিনি রোগিণীর সেবা করতে লেগে যান এবং ঔষধ-পথ্যের সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রোগিণীর জীবনরক্ষা হয়নি। মৃত্যুর খবর পেয়েও তার সৎকারাদির ব্যবস্থা করতে কেউই যখন এগিয়ে এল না, তখন তিনি পেশাদার বৈষ্ণবদের ডেকে মৃতের সৎকারাদির সব ব্যবস্থা স্বয়ং করেছিলেন।

মঠ তখন আলমবাজারে। পরিব্রাজক অবস্থায় খালি পায়ে তীর্থস্থানাদি ভ্রমণ করতে করতে স্বামী অভেদানন্দজীর পায়ে ভীষণ ঘা হয়। এই পা নিয়ে তিনি মঠে এসেছিলেন। ঘায়ে পোকা হয়েছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্ করতেন। ডাক্তার দেখে বলেছিলেন, ঠিকভাবে সেবাশুশ্রূষা না করতে পারলে পাটি নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে, এমনকি এতে তাঁর জীবনও সংশয়াপন্ন হ'তে পারে। সারদানন্দজী ক্ষত-পাটি সারিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লেগে গেলেন। ঘা থেকে একটি একটি ক'রে পোকা বেছে বেছে ফেলে দিতেন। তারপর ক্ষতস্থানটি ধুয়ে শুষ্ক কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিতেন। এইভাবে তিনমাস ধ'রে, নিজ হাতে সেবা ক'রে অভেদানন্দজীর পায়ের ক্ষত সারিয়ে তোলেন। সারদানন্দজীর দেহ-ত্যাগের পর অভেদানন্দজী তাঁর সেবার কথা স্মরণ ক'রে সাশ্রুনয়নে বলেছিলেন: 'ভাই শরৎ, অসুখের সময় তুমি আমার জীবন দান করে-ছিলে। তোমার সে-সেবার কথা কি আমি ভুলতে পারি? তুমি যেভাবে প্রাণঢেলে আমার সেবা করেছিলে তার জন্য তোমাকে আর কী দিতে পারি! শুধু আমার কয়েক ফোঁটা চোখের জল তুমি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ কর।'

একবার গৌরী-মার দারুণ বসন্ত রোগ হয়। খবর পাওয়া মাত্র সারদানন্দজী তাঁকে দেখতে যান। গৌরী-মা কলকাতার বাইরে গঙ্গার ধারে একটি খোলার ঘরে থেকে তপস্যা করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর দারুণ বসন্ত হয়। সারদানন্দজী দশ-বারো দিন দিনরাত সেবা ক'রে, তাঁকে সুস্থ ক'রে তোলেন। শ্রীশ্রীমায়ের এক আত্মীয়ের বসন্ত হয়। সারদানন্দজীর হাতে ক্ষত থাকা সত্ত্বেও ক্ষত-স্থানটিতে কাপড়ের একটি পটি বেঁধে বারো-চোদ্দ দিন তিনি তাঁকে সেবা ক'রে, নিরাময় ক'রে তুলেছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি নিজ হাতে সেবা করতে পারতেন না, তখনও স্বয়ং রোগীকে দেখে, এবং তার খবরাখবর নিতে তিনি কখনও ভুলতেন না। সারদানন্দজীর দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে উদ্বোধনে শিষ্যস্থানীয় একজন সাধুর ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। সেই সঙ্গে ক্রমাগত কাসতে কাসতে তাঁর দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। তিনি তাঁর স্থূল শরীর নিয়ে রোগীর বিছানার উপর এক হাঁটু রেখে, মাথায় সস্নেহে হাত বুলাচ্ছেন আর বলছেন: 'ঠাকুর রয়েছেন, মা আছেন, ভয় কিরে?' অধৈর্য স্বভাবের জন্য ঐ পীড়িত সাধুর কাছে কেউ আসতে পারতেন না, কিন্তু সারদা-নন্দজীর মাতৃসুলভ স্নেহের কোমল পরশে তিনি শান্ত হ'য়ে গেলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ

হ'য়ে উঠেছিলেন।

সারদানন্দজী প্রায়ই দুপুরে উদ্বোধন থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন যান। কেউ জানেন না। একদিন দুপুরবেলা প্রচণ্ড রৌদ্রে যখন তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছেন, তখন সেবক স্বামী অশেষানন্দ তাঁর পিছু নিলেন। অনুসরণ করতে দেখে সেবককে তিনি উদ্বোধনে ফিরে যেতে বললেন। সেবক নাছোড়বান্দা হ'য়ে তাঁর সঙ্গে চললেন। তাঁরা দুজনে ট্রামে ক'রে টেরিটি-বাজারের সামনে নেমে এজরা স্ট্রীটের একটি হোটেলে ঢুকলেন। হোটেলের দোতলায় একটি ঘরে খোকানি নামে সিন্ধুদেশবাসী এক যক্ষ্মারোগী ছিল। সে ঘন ঘন কাসছিল ও পিকদানিতে থুতু ফেলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল। সেবকের সঙ্গে সারদানন্দজী ঐ ঘরেই প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখা মাত্র রোগীর খুব আনন্দ হ'ল। তিনি রোগীর খাটের উপর বসে তার মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন এবং তাকে আশীর্বাদ করলেন। খোকানি তার অপরিচ্ছন্ন হাতেই কিছু ফল কেটে সারদানন্দজীকে দিল। মুমূর্ষু রোগীর অনুরোধে তিনি তাও খেলেন, এবং আশীর্বাদ ক'রে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন। সেবক ফল খাওয়ার জন্য অনুযোগ করলে তিনি বলেছিলেন : 'খোকানি যাতে মনে কষ্ট না পায় তার জন্যই খেয়েছি। জান, ঠাকুর বলতেন, ভালবেসে কেউ কিছু খেতে দিলে তাতে অনিষ্ট হয় না।'

সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে কত যে মানুষ তাঁর কাছে এসে শান্তি পেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সংসারের জ্বালা জুড়াবার তিনি ছিলেন তাদের একটি স্থান। এখানে শুধু একটি ঘটনা স্মরণ করছি।

একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজায় বেলুড় মঠে প্রচণ্ড ভিড় হয়। সারদানন্দজী তখন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি সারা দিন সমগ্র মঠ পরিদর্শন ক'রে উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা দেখে বেড়াচ্ছিলেন। তাতে ভীষণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন তিনি। বিকাল চারটার সময় মঠের সামনের দালানের উপরকার বারান্দায় বসে একটু বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় কোথা থেকে এক ভদ্রলোক হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে এসে তাঁর পদপ্রান্তে বসে পড়েন। উপস্থিত অন্যরা তাঁকে চলে যাওয়ার জন্য বললেন। সারদানন্দজী কিন্তু তাঁর নিজের শারীরিক অসুস্থতা এবং ক্লান্তিকে উপেক্ষা ক'রে প্রবোধ-বাক্যে তাঁকে শান্ত করেন। স্বামী শিবানন্দজী সেখানে এলেও ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে কাঁদতে লাগলেন। সারদানন্দজী তাঁকে বললেন : 'সংসারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমাদের কাছে এসেছে।' তখন তাঁরা উভয়েই ভদ্রলোককে সান্ত্বনাবাক্যে পরিতুষ্ট করলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম—তাঁর প্রেমপূর্ণ সেবার পরিধি শুধু সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী বা শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বৃহত্তর সংসারের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতিই তা সমানভাবে প্রবাহিত ছিল।

তাঁর আশ্রিতবাৎসল্যও ছিল অসাধারণ। তিনি জানতেন, সঙ্ঘে তৎকালীন বিপ্লবীদের আশ্রয় দিলে রাজকীয় রোষের ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হবে। তবুও তিনি সকল ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি তখন। সঙ্ঘের প্রাচীনরা বারণ করলেও তিনি তাঁদের বুঝিয়ে, বিপ্লবীদের অনেককেই সঙ্ঘে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং পুলিসের উৎপাতকেও দিনের পর দিন নীরবে সহ্য করেছিলেন।

তিনি ছিলেন দীনদরিদ্রের মা-বাবা। হয়তো কোন বিধবা বিশ্বাস ক'রে তাঁর কাছে তার অল্প যা সম্পদ আছে তা গচ্ছিত রেখে গেল। আবার

হয়তো কোন অসহায় ভিক্ষুক তার ভিক্ষালব্ধ অর্থ তাঁর কাছে জমা রেখে গেল। তিনি তাদের সমস্ত টাকার হিসাব একটা খাতায় লিখে রেখে দিতেন। কেউ তার সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু নিলে তিনি তাও লিখে রাখতেন। এসব জানা গিয়েছিল তাঁর শরীর যাওয়ার পর হিসাবের খাতা থেকে। ভাবতে অবাক লাগে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান সচিব। তাঁর মাথায় এত বড় সঙ্ঘের বিরাট গুরু দায়িত্ব। সঙ্ঘ-পরিচালনায় কত রকমের সমস্যা তাঁকে সমাধান করতে হ'ত। তা সত্ত্বেও দীনদরিদ্রের জন্য এত সব ঝঞ্ঝাটের কাজ অম্লান বদনে প্রসন্ন চিত্তে তিনি সম্পাদন করতেন।

যোগীন-মার তিনটি মাতৃ-পিতৃহীন দৌহিত্রকে সারদানন্দজী উদ্বোধনে তাঁর নিজের কাছে এনে রাখেন। ছেলে তিনটি দিনের বেলায় এ-ঘর ও-ঘরে বসে পড়াশুনা ক'রত আর রাত্রে তাঁর বিছানায় শুতো। বাড়িতে ছেলে তিনটি জানালা বন্ধ ক'রে শুতো—একথা তিনি জানতেন। পাছে তাদের ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে, তাই গরমকালেও তিনি সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে শুতেন। একে তিনি স্থূলকায় ছিলেন, সারাদিন ধ'রে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখতেন—সমস্ত দিন তাঁকে খুব পরিশ্রম করতে হ'ত, তার উপর বন্ধ ঘর! রাত্রে এই বন্ধ ঘরে ঘুমাতে তাঁর খুব কষ্ট হ'ত। এইভাবে তিনি বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন। যোগীন-মার দ্বিতীয় নাতিটি কথাপ্রসঙ্গে বলতেন: 'তাঁকে আমরা সাধু ব'লে জানতাম না—মার সঙ্গে যেমন করতাম তাঁর সঙ্গেও তেমনি করেছি। একদিন রাত্রে জল হচ্ছিল। আমরা শুয়ে আছি—মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কি ভুলু, জেগে আছ? আমি সাড়া দিলাম। জানালার পাখীগুলি কি বন্ধ করবে? আমি বললাম—আপনি দিন। তিনি উঠে পাখীগুলি বন্ধ ক'রে দিলেন।'

দেহত্যাগের সময় শ্রীশ্রীমা সারদানন্দজীর উপর যোগেন-মা, গোলাপ-মা ও তাঁর সন্তানদের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সে-ভার সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের শোক ভুলে তাঁদের সান্ত্বনা ও সদুপদেশ দিয়ে শান্ত করেছিলেন এবং আজীবন তাঁদের ভার বহন করেছিলেন। তাঁর উপর স্ত্রী-ভক্তরা সর্বদা নির্ভর ক'রে থাকতেন। তাঁরা শ্রীশ্রীমায়ের অবর্তমানে তাঁর অভাব বুঝতে পারত না। রাধুর ভবিষ্যতের কথা উঠলে শ্রীশ্রীমা বিশ্বাসভরে একবার বলেছিলেন: 'রাধুর ভাবনা কি? শরৎ আছে। শরৎ সবাইকে পালন করবে। শরৎ আমার বিষ্ণুর অংশে জন্মেছে।'

একবার তিনি যাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তারা শত অপরাধ করলেও তাঁর ভালবাসা থেকে কখনও বঞ্চিত হ'ত না। অপরাধবশতঃ সঙ্ঘ হ'তে কাউকে সরাবার প্রস্তাব উঠলে তিনি ব্যথিত হৃদয়ে বলতেন: 'জুড়াতে এসেচে, কোথায় যাবে। ভাল হবার জন্যেই এসেচে, ভাল হবার চেষ্টা তো করচে—থাকুক না।' স্বামী তুরীয়ানন্দজী একবার শ্রীশ্রীমায়ের জনৈকা শিষ্যা যিনি সারদানন্দজীকে বাবা-সম্বোধন করতেন, তাঁকে বলেছিলেন: 'তোমার বাবার কথা শুনবে? আমরা যাদের ত্যাগ করি, তিনি তাদের হাত ধ'রে তুলে নেন।' সারদানন্দজীর প্রেম মন্দাকিনীর ন্যায় শতধারায় উৎসারিত। তাতে সবাই অবগাহন করতে পারে। প্রেমের বিনিময়ে তিনি কিছু চাননি, শুধু চেয়েছেন সর্বজীবের জন্য নিজেকে উজাড় ক'রে দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তিনি সর্বভূতে যাতে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাই ক'রে দেবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। ঠাকুর তখন বলেছিলেন: 'এ যে শেষকালের কথা রে!' শেষে তিনি বলেছিলেন: 'তা তোর হবে।' এই ঘটনার কথা উল্লেখ সহ

পরবর্তীকালে তাঁর মুখে শোনা যেত: 'তিনি যা বলেছিলেন, এখন তাঁর কৃপায় সেটা বেশ অনুভব করছি।' সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন না হ'লে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এইভাবে সেবা করা যায় না। 'ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়'কে দর্শন ক'রে, তিনি আজীবন সকলের সেবা ক'রে গেছেন। স্বামীজীর প্রবর্তিত 'শিব-জ্ঞানে জীবসেবা'-র আদর্শ তিনি নিজ জীবনে অনুষ্ঠান ক'রে, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-আদর্শের দৃঢ় বুনিয়াদ তৈরি ক'রে গিয়েছেন।

স্বামীজীর বাণী স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে এমনিভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল যে, ম্যাকলাউড প্রভৃতি তাঁকে 'দু নম্বর স্বামীজী বলতেন।'[২] তাঁর জীবন ছিল স্বামীজীর আদর্শে পরিপূর্ণ। তাঁর এই জীবনের উপর ভিত্তি ক'রে আজকের এই বিরাট রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দণ্ডায়মান।

২ নিবেদিতা লোকমাতা—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[ভাদ্র, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

কথায় বলতে গেলে যদিও এ সত্য অবিশ্বাস্য মনে হ'তে পারে, তবু বস্তুতঃ গভীরভাবে ভাবলে এ হৃদয়ঙ্গম হবে যে, শ্রীমা তাঁর প্রার্থনার এই চতুঃসূত্রীতে সকল জীবের চতুর্বর্গের পরমান্ন রেঁধে রেখেছেন।

ঈশ্বরের মাতৃভাবের এমন প্রজ্ঞা-প্রসন্ন সর্বার্থ-সাধক কার্যকরী প্রকাশ শুধু এই কলিযুগেই বিকসিত হয়েছে। অন্য যুগে হয়েছিল কিনা জানিনে।

রামকৃষ্ণ-সংঘে ঠাকুরের আবির্ভাবকে কায়েমী-রূপে প্রতিষ্ঠা করেই শ্রীমায়ের জীবনে হ'ল ভগবানে মাতৃভাবের অভাবনীয় বিকাশ। প্রসঙ্গক্রমে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, এতে তাঁর দুটি বীর সন্তানের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য—নরেন আর শশী। নরেনের কাঁধে-হাড়ে চেপে যত্র-তত্র যাবার সাধ ঠাকুরের ছিল। যতটুকু পরখ করার যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ছিল, ততটুকু ক'রে নিয়ে কাঁধ পেতে দিতে নরেন কিছু সময় নিলেও, অবশেষে সবখানি জীবনভূমিতে শুধু রামকৃষ্ণ-চাষই করলেন। আর শশীর ছিল একনিষ্ঠ ভক্তি। ঠাকুরকে পরখ ক'রে তাঁকে জানতে-বুঝতে হয়নি। ঠাকুরের কৃপায় দেখেই জেনেছিলেন যে এতে 'পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে'। কাজেই এঁর কম্‌তি কিছুই নেই। এর অস্তিও হচ্ছে কালজয়ী কালাতীত অস্তি। তাই তাঁকে সংঘাসনে বসিয়ে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর প্রেমপূজা লোকসংগ্রহার্থ। এ দুজন মহাপূজারীর যুগ্ম পূজনধারা আপাত ভিন্নমার্গে বিস্তারলাভ ক'রে থাকলেও উভয়েরই চরিতার্থতার আশিস্-উৎস হচ্ছেন শ্রীমা।

ঠাকুরের মহাসমাধির পর দীর্ঘ চৌত্রিশবছর ধরে এটিই হ'ল মায়ের মুখ্য সাধনা—ঈশ্বরের মাতৃ-ভাব বিকাশ। শ্রীমাকে এ সাধনায় ব্রতী রাখতে শ্রীঠাকুরকেও বহুবার "ওঘর" থেকে এঘরে এসে বহু ড়ি করতে হয়েছে, প্রথম দিকটায়। শেষে অবশ্য শ্রীমা এ দায়িত্বটি নিজের অপরোক্ষানুভূত ভূমা-মাতৃত্বের প্রেরণাতেই গ্রহণ করেছিলেন, সাগ্রহে, সোৎসাহে ও সানন্দে।

ভবতারিণী ঠাকুরকে ভাবমুখে থাকতে আদেশ

করেছিলেন। নিত্য ও লীলার সীমান্ত-অদেশ-বাসী ঠাকুরের আমরা যে বহু-চেনা পলে-পলে বহু-অচেনা অনন্তের নর্তন-নূপুর শুনতে পেতুম, সেই সংগীত-ইঙ্গিত শ্রীমায়ের জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকল যে, তিনি হলেন মূর্তিমতী শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতমানসা।

রামকৃষ্ণ-সংঘ শুধু রামকৃষ্ণ-অনুগামীদের একটি গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান নয়। এটি রামকৃষ্ণ অবতরণের একটি নব অবয়বী প্রকাশ, যার বাইরে একটি রূপ হচ্ছে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান। আর এই প্রকাশের ভাব-রূপটিকে যিনি সর্বকালের জন্য অনতিক্রম্য নির্ভর-যোগ্যতা, প্রামাণিকতা ও সামগ্রিকতা দান করলেন তিনি হচ্ছেন শ্রীমা। আর এটি করতে, জীবন ভরে তাঁকে অতি নিজস্ব সংসারেও-নয় সন্ন্যাসেও-নয় ভাব-মুখে থাকা রূপ তপস্যা করতে হচ্ছে। শ্রীমায়ের এই যে সংসারেও-নয়, সন্ন্যাসেও-নয়, অথচ দুএরই অতি কাছে অথচ দুইয়েরই ঊর্ধ্বে-অবস্থান,এই অভিনব যোগাভ্যাসের মাধ্যমেই তিনি সংঘের শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরূপকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটি তিনি শুধু ধ্যান-স্তরে করেননি, দৈনন্দিন ঘটনা-সম্পর্কিত মৌলিক স্বচ্ছ মনন-ধারা দ্বারাও করেছেন। আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের সকল দ্বন্দ্ব তাঁর প্রজ্ঞা-ভাস্বর বোধি-স্পন্দনের অভিঘাতে নিমেষে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত। তবে তিনি বিশদতার ব্যবহারিক তাড়নাদ্বারা যেমন 'বস্তু'-কেন্দ্রিক পারমার্থিকতাকে পর্যুদস্ত হ'তে দিতে মোটেই রাজী ছিলেন না, তেমনি দিতেন না অগণনীয় জীবের বহুকালের ভাবী পরমার্থ সংস্থানকে একদিনের প্রয়োজনের দাবীতে বেহিসেবী উদারতায় ভাসিয়ে দিতে।

শশী সংঘকে দিলেন পূজন-প্রীত অস্থি-"অস্তি"। নরেন দিলেন হৃদয়-সাগর, উদ্দীপ্ত-ধী ও প্রাণ-বেগ। শ্রীমা হলেন সংঘের সর্বজননীত্ব, বেগ-আবেগ, প্রাণগতি নিয়ন্ত্রী। সংঘের ভাবগঠন সৌকর্যে যেমন রয়েছে শ্রীমায়ের আপ্ত, সাবলীল, দর্শন, মননের ছাপ, তেমনি আছে দিব্য শিল্প-চেতনার সৌন্দর্য-সৌরভ।

স্বামী সারদানন্দ বলেন: 'শ্রীশ্রীমা স্বামীজীর কাজের উদ্দাম আবেগ যেন অনেক সময় রাশ টেনে ধ'রে নিয়ন্ত্রিত করতেন। কলকাতায় প্লেগ-মহামারীর সময় স্বামীজী নিবেদিতা প্রভৃতিকে নিয়ে সেবাকার্য আরম্ভ করলেন, কিন্তু কার্যের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়তে থাকায় এবং সে পরিমাণ অর্থের সংস্থান না থাকায় স্বামীজী বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেবাকাজ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বেলুড় মঠ বিক্রি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই কথা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে উত্থাপন করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'সে কি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সংকল্প করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ। তোমার ও-সব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়?'

"স্বামীজী বেলুড় মঠ স্থাপন ক'রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠাধ্যক্ষ (President) এবং আমাকে (স্বামী সারদানন্দকে) মঠের সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) করেছিলেন।' তাই মা স্বামীজীকে বললেন, তোমার মঠ বিক্রি করবার অধিকার কোথায়, বাবা?

"শ্রীশ্রীমা আরও বললেন, 'বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এই ভাব চলবে।' তখন স্বামীজী একটু সলজ্জভাবে বললেন, 'তাই তো, আবেগভরে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম, সত্যি তো মঠ বিক্রি আমি করতে পারিনা, সে অধিকার আমার নেই। রাজাকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মঠের অধ্যক্ষ, এবং শরৎকে (স্বামী সারদানন্দ) সেক্রেটারি করা হয়েছে।

এদেরই সব অধিকার। আমার অধিকার কোথায়? সে কথা যে আমার খেয়ালই ছিলনা!' "১২৩

এটিই স্বামীজীর মহত্ত্ব যে একের জন্যে, এক মুহূর্তে, অকাতরে পূর্বাপর না ভেবে নিঃশেষে সব দিয়ে দিতে পারেন।

এই যে শ্রীমা নরেনকে বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করতে দিলেন না—এটিই ঈশ্বরের মাতৃত্ব, সর্বকালের, সর্বজীবের, উপচিকীর্ষু অন্নপূর্ণা হৃদয়খানি। এ সন্ন্যাসী-সংঘের মর্মকেন্দ্র কোথায়? বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, শিব জ্ঞানে জীব সেবা, ঈশ্বর প্রণিধান—না কি? শ্রীমা এটি সংঘকে শিক্ষা দিলেন: সংঘের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে প্রেম। ভালবাসাকেই তিনি সংঘের প্রাণ মনে করতেন। এটির ভিত্তিতেই সবকিছু গড়ে উঠে, বিশেষ ক'রে পরস্পরের সম্বন্ধ, সংঘজননীরূপে এইটি শ্রীমায়ের মুখ্য শিক্ষা।

"কোয়ালপাড়া আশ্রমে তখনকার অধ্যক্ষ সহকারী ব্রহ্মচারীদের নিকট শুধু কাজেরই আশা রাখিতেন; কিন্তু বিনিময়ে তাহাদিগকে আদর-যত্ন করিতেন না, আশ্রমে আহারাদির সুব্যবস্থা ছিল না। ক্রমে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, কেহ কেহ ঐ আশ্রম ছাড়িয়া শ্রীমা অথবা স্বামী সারদানন্দজীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথাপি অধ্যক্ষ নিজের ত্রুটি সংশোধনে যত্নপর না হইয়া শ্রীমায়ের নিকট আসিয়া অনুযোগ করিলেন, 'মা, এরা সব আগে আমার খুব বাধ্য ছিল, এখন চোখ ফুটেছে, আমার কথা সব সময় মেনে থাকতে চায় না। আর শরৎ মহারাজ বা আপনাদের কাছে এলে, আপনারা আদর-যত্ন করে কাছে রেখে দেন। ভাল খাবার ও সুবিধা পায়। আপনারা যদি স্থান না দেন, একটু বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন, তবে আমার বাধ্য থাকবে।' শ্রীমা এইরূপ কথায় অবাক হইয়া বলিলেন: 'সে কি গো? ওসব কি কথা বলছ? ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। আর আমি মা, আমার কাছে তুমি ছেলেদের খাওয়াপরার খোঁটা দিয়ে কি করে বললে?' " ১২৪

আশ্রমাধ্যক্ষ স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করতে নারাজ থাকায়, কঠোর পরিশ্রমে ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আশ্রমবাসীদের স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল। এ অবস্থা মায়ের অসহনীয় হওয়ায় বার বার মঠাধ্যক্ষকে অনুরোধ ক'রে তিনি কর্মীদের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন।

"ভালবাসাই তো আমাদের আসল", শ্রীমায়ের একথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতের প্রাণ-বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রাণ-বাণী। এ কথাটিতে আছে শ্রীমায়ের ঈশ্বরীয়, মাতৃত্বের ও ব্যক্তিত্বের নির্যাস। এ অনুভূতির ভিত্তিতে সব গড়া চলে—সমাজ, দেশ, অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স, শান্তি, সভ্যতা। এ অনুভূতির যেখানে অনুশীলন নেই, সেখানে শুধু অন্ধ দ্বন্দ্ব-সমস্যা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, নিম্নগামিতা, দুঃখ, দৈন্য, অপূর্ণতা, ব্যর্থতা, অশান্তি।

শ্রীমায়ের এই বাণীর মর্মার্থের অনুশীলন না ক'রে, মানব জাতির কোন আশাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নেই। অথচ এই বাণীর আলোকে-পুলকে সমাধান হ'তে পারে না এমন কোন সমস্যা মানুষের নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে শ্রীমা এই হৃদয়বত্তাটি যে সযত্নে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এটিই হল তাঁর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেরিত ঈশ্বরের মাতৃত্ব প্রকাশ।

---

১২৩ দ্রষ্টব্য: প্রবন্ধ—স্বামী ঈশানানন্দ লিখিত, 'শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী' উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৭০, পৌষ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৭৮

১২৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৬০

১৯

মায়ের মহামন্ত্র : "ভালবাসাই তো আমাদের আসল"

ভবতারিণীর কাছে ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন : "মা, আমায় শুকনো সাধু করিস নি!" বুঝিবা ঠাকুরের শংকা ছিল, শুকনো সাধু যে অতি সহজেই হৃদয়হীন হ'য়ে যেতে পারে, কারণ, অনাসক্তি চর্চার একটি সহজ প্রবণতা ঐদিকে রয়েছে। আর তা যদি হয়, ঈশ্বরের বজ্র আর নিয়মশৃঙ্খলা ছাড়া বিশ্বে আর থাকে কি? তাই অবতীর্ণ ভগবানের ধর্মসংস্থাপন ও জীবোদ্ধারে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘরূপী যে মাতৃ-আবির্ভাব তাঁর বাণী-প্রকাশ দিলেন শ্রীমা : "ভালবাসাই তো আমাদের আসল।"

এ আসল খাটিয়ে যে যত পার ঐশ্বর্য আহরণ কর; ক্ষতি নেই; লাভ আছে। কিন্তু সাবধান, মূলধন নষ্ট ক'রে ব্যবসায় চলবে না!

"ভালবাসাই তো আমাদের সব" এই মহামন্ত্র শ্রীমা নিজের ভাবে, নরেন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে সকলকে শিক্ষা দিলেন, মানব-সভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের মৌলিক অবদানটি। এই মন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পাবনীশক্তি নিষ্কাশিত হ'য়ে আবির্ভূতা হয়েছেন এমন একটি অতি সহজ-সরলরূপে যে অনায়াসে এর গুরুত্ব-গাম্ভীর্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। তবে সৌভাগ্যবশে শ্রীমায়ের অপার করুণা ও অভাবনীয় ক্ষমার আশ্রয়ে ধর্ম নূতন ভাবে আবির্ভূত হলেন এই ধর্ম-সংঘে। তাঁর মাতৃহৃদয়-লালিত ধর্মানুশাসনের সে কি অভিনব প্রেমকান্ত বয়ান!

শ্রীমা তখন কলিকাতায় ১০/২ নম্বর বোস পাড়া লেনের বাড়ীতে আছেন। চুরি করার অপরাধে মঠের এক ভৃত্যকে স্বামীজী তাড়িয়ে দিয়েছেন। নিরুপায় বেচারা কেঁদে মায়ের আশ্রয় নিল। মা তাকে বাড়ীতে রেখে স্নানাহার করালেন। সে দিনই বিকেলে স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীমাকে প্রণাম করতে এলে, মা তাঁকে বললেন, "দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ও রকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ ক'রে তাড়িয়ে দিলে! সংসারে বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" প্রেমানন্দজী বোঝাতে চাইলেন যে এতে স্বামীজী রুষ্ট হবেন। মা তখন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : "আমি বলছি, নিয়ে যাও।" সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমানন্দ মঠে ঢুকবামাত্র স্বামীজীর গর্জন শুনতে পেলেন : "বাবুরামের কাণ্ড দেখ—ওটাকে আবার নিয়ে এসেছে।" প্রেমানন্দজী তখন সকল কথা খুলে বলায় স্বামীজী আর দ্বিরুক্তি করলেন না।[১২৫]

যিনি ঈশ্বরের মাতৃত্বের বিগ্রহধারিণী, তাঁর আদালতের বিচারধারা আলাদা। এখানে অপরাধের সাজা নয়, অপরাধ করতে জীব কেন প্রেরিত হয়, সে কারণের সপ্রেম অপনোদন।

এটি দেখা-বোঝা সম্ভব যে শ্রীমায়ের এ কর্মের মর্মে রয়েছে একটি আপাত-অনাগত মানব সভ্যতার সূচনা। এ সভ্যতাটি হচ্ছে ঈশ্বরের মাতৃত্ব-ভিত্তিক। এটি হবে একটি ক্ষতিকর ভ্রান্তি যদি কেহ ভাবেন যে মায়ের এই কর্মটি আকস্মিক, অচিন্তিত ও বিচ্ছিন্ন ভাবালুতার প্রকাশই শুধু নয়, এটি একটি বিপজ্জনক প্রশ্রয়।

এখানে সুগভীর ভাবে ভাববার একটি কথা আছে।

সমাজে-রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য লোক-প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করেন। এই শৃঙ্খলা রক্ষা যে অতি আবশ্যক এ বিষয়ে দ্বিমত বড় নেই। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে গোষ্ঠিস্বার্থ

১২৫ তদেব, পৃঃ ৪০১-২

রক্ষার জন্য, নিজেদের চর্মরক্ষার জন্য, সমাজ অপরাধীকে অকাতরে নির্মম শাস্তি বিধান করেন বা চিরতরে পরিহার করেন। প্রশ্ন উঠছে: অপরাধ ও অপরাধী সৃষ্টি করাতে সমাজের কোন দায়িত্ব আছে কিনা? যদি থেকে থাকে সমাজ অপরাধীর কাছে তা স্বীকার করবেন কিনা ও দায়িত্ব পালন না করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও সত্যাগ্রহ করবেন কিনা? প্রশ্নগুলি সমাজকে অপ্রস্তুত করার জন্য করা হচ্ছে না; প্রস্তুত করার জন্যে করা হচ্ছে!

একটু হৃদয়বত্তার অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে, একটি চোরের পক্ষ লয়ে বিশ্বের বিচারকহীন সর্বোচ্চ আদালতে শ্রীমায়ের এই যে অভিযোগ-উক্তি: "সংসারের বড় জ্বালা! তোমরা সন্ন্যাসী, তার কিছু বোঝ না।"—এতে ঈশ-হৃদয়ের একটি কী গভীর বেদনা কম্পিত হয়েছে! তাই শ্রীমা লোকাচার, গতানুগতিক নীতি, আইন—সব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ক'রে বাবুরাম মহারাজকে বজ্রাদেশ করলেন তস্কর ভৃত্যকে মঠে লয়ে গিয়ে কাজে বহাল রাখতে। বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক মন শ্রীমায়ের এই অসমসাহসিক ও বেপরোয়া নবনীতি-ব্যবস্থা লক্ষ্য ক'রে সেদিন নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়েছিলেন। ধর্ম-সংস্থাপনে—বিশেষ ক'রে অধুনা-প্রবাহিত বিবর্তনের ধারায়—কোন প্রত্যাখ্যান নেই, আছে ঊর্ধ্বমুখী লালন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

যদি বলি সনাতন ধর্মের বিবর্তনে এটি একটি মৌলিক অবদান শ্রীমায়ের—কথাটি যে প্রমাণের অপেক্ষা রাখবে, সে প্রমাণটি দেওয়া হচ্ছে এখানে। জয়রামবাটী অঞ্চলের শিরোমণিপুরে তুঁতে-ডাকাত দলের প্রতি শ্রীমায়ের যে সকরুণ ব্যবহার, তা ঘটেছিল চম্বল উপত্যকার বহুবিশ্রুত দুর্বৃত্ত উদ্ধারের বহু পূর্বে।

শিরোমণিপুরের মুসলমান ডাকাতদের সুমুখে সর্বাশ্রয়দায়িনী শ্রীমা শ্রীভগবানের করুণার আশ্রয়-প্রশ্রয় অঙ্গনখানি খুলে দিলেন এমন ভাবে যে, এ কর্মের ভেতর দিয়ে ধর্মের মর্মের একটি সৃজনী-সম্ভাবনার অভিনব প্রকাশ হ'ল। এমন নজির পুঁথিতে নেই যে, শ্রীমা একদিনও ওদের বলেছেন: তোমরা ডাকাতি করো না। অন্নপূর্ণার আগে অন্নের ব্যবস্থা, পরে নীতি-ব্যবস্থা, অভাবে স্বভাব নষ্ট নয়। সমাজ অভাব নিরসনে যত্নপর না হ'য়ে, যদি নষ্ট স্বভাবের জন্য শুধু বলে—ওকে জেলে পুরে রাখ, ওকে ছেঁটে বাদ দাও, ওকে কষে বাঁধ, ওকে পিষে মার, ওকে ঝুলিয়ে দাও ও অধুনা যদি না পার তো ওর চোখ উপড়ে ফেল, অন্তত হাঁটু ভেঙে দাও।—তাতে জগতে সৎপুরুষের সংখ্যা বাড়বে না, আপদ বাড়বে বই কমবে না।

মা বাইরের নষ্ট-স্বভাবকে চেয়েও দেখতেন না। তাঁর মূল মন্ত্র ছিল: "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে তা জানে ক' জনে।"[১২৬] তিনি দেখতেন সকলের অন্তরের জ্যোতির্ময় আত্মাকে। তা না হ'লে কি ক'রে এই অত্যাশ্চর্য অতুলনীয়া সমদর্শিনী বলতে পারতেন: "আমার শরৎ (সারদানন্দজী) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"[১২৭]

কোন্ কবে কৃষ্ণ ভগবান শিক্ষা দিয়েছিলেন:
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

"বিদ্যাবিনয় যুক্ত ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গো, হস্তী ও কুক্কুরে আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ সমদর্শী।"

শাস্ত্রের এই সব শাশ্বত বাণী বিস্মৃতির গহন গুহায় যেন নিদ্রিত ছিলেন; শ্রীমায়ের হৃদয়ানুভূতির স্পর্শে আবার জেগে উঠে বসে প্রাণ স্পন্দনে প্রেম-সম্বাহনে পূর্ণ মহিমান্বিত হলেন।

১২৬ তদেব, ৪০৩

১২৭ তদেব, ৪০৪

ব্যাবহারিক দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে মা কি করলেন শিরোমণিপুরের ডাকাতদের জন্য তাও প্রণিধানযোগ্য। তাদের তিনি দিলেন নিজের বাড়ীতে ঘর তৈরী করার কাজ, অত্যন্ত জরুরী রুজির সংস্থান, যাতে ক'রে অংশত তাদের হ'ল বেকারী থেকে মুক্তি, তাদের দিলেন সম্পূর্ণ মাতৃ-বিশ্বাস, অপরিসীম স্নেহ, আর তাঁর নিজের পাবনী হস্তের সেবা। অভাবনীয়! সত্যি অভাবনীয়!

অভাব-বিড়ম্বিত নষ্ট-স্বভাবদের দিয়ে দেখ না রুটি, রুজি, বিশ্বাস, প্রেম আর সেবা—কি হয় সমাজের!

সংস্কার-কুণ্ঠ আত্মীয়দের সজোর আপত্তি তিরস্কারে বিপর্যস্ত ক'রে, ঠাকুরের জন্য আনিত ডাকাতদের নৈবেদ্য সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে প্রভুকে ভোগ দিলেন। ঠাকুর কি ক'রে সে ভোগ গ্রহণ না করেন?

শ্রীমায়ের জ্বলন্ত-চরিত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের মাতৃত্বের এই লীলা-বিস্তার সনাতন ধর্মের মর্মমূলে যে এক প্রেম-সজীব বিপ্লবকে স্তম্ভিত ক'রে রেখেছে, সে দিকে এ কালের মনীষাসম্পন্ন সমাজ-দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলি: শুনুন অশনি সংকেত!

[ক্রমশঃ]

চিনি না যে সব চিনি

শ্রীসলিলকুমার চক্রবর্তী

চিনি মিষ্টি, গুড় মিষ্টি, আরও মিষ্টি মধু,
এদের চেয়েও বেশী মিষ্টি মুখের কথা শুধু।

কিন্তু আমরা যন্ত্র-যুগের মানুষ, মিষ্টি-কথা কইবার ক্ষমতা বিশেষ নেই, তাই চেয়েছিলাম মিষ্টির কথা কিছু বলতে। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আমরা মিষ্টি ভক্ত!

কেউ বলেন,—"মধুরেণ সমাপয়েৎ"। আমার মতে, "মধুরেণ আরম্ভয়েৎ, মধ্যং মধুরং ভবেৎ, মধুরেণ চ সমাপয়েৎ"। মিষ্টি না হ'লে আমাদের একটা দিনও চলে না। চায়ের কাপে চিনি দিয়ে দিন শুরু করি, আর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, যখন স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা লোপ পায়, তখনও রোগীকে দিই গ্লুকোজ্ ইন্‌জেক্‌সান্।

এবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিষ্টির কথা আলোচনা ক'রব।

খাদ্য ও পানীয়ের মিষ্টতা সম্পাদন করা হয় যে সব জিনিস দিয়ে, তাদের মোট দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—

(১) প্রাকৃতিক মিষ্টি (Natural Sweetness) এবং (২) কৃত্রিম মিষ্টি (Artificial Sweetness)।

বলাই বাহুল্য, প্রাকৃতিক মিষ্টদ্রব্যগুলির ব্যবহার চলে আসছে বহুদিন থেকেই। এখনও পর্যন্ত আমরা যে সব মিষ্টি ব্যবহার ক'রে থাকি, তার প্রায় শতকরা সত্তর ভাগই হচ্ছে এই প্রাকৃতিক মিষ্টি। প্রাকৃতিক মিষ্টিগুলির অন্যতম হচ্ছে শর্করা বা চিনি (Sugar)। উৎপাদনের মূল উপাদানের তারতম্য অনুসারে শর্করা আবার বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে। যেমন—

(ক) ইক্ষু-শর্করা (Cane-Sugar বা Sucrose), (খ) দ্রাক্ষা-শর্করা (Grape-Sugar বা Glucose), (গ) ফল-শর্করা (Fruit-Sugar বা Fructose), (ঘ) দুগ্ধ-শর্করা (Milk-Sugar বা Lactose) প্রভৃতি।

একে একে এই সব প্রাকৃতিক চিনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।

সুক্রোজ বা ইক্ষু-শর্করা : ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

সাধারণ অর্থে চিনি বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'ল এই সুক্রোজ। আখের রস, বীটমূল, তাল ও খেজুর রসে প্রচুর পরিমাণে সুক্রোজ থাকে। তরল আঠাল রসে সামান্য জল মিশিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। সামান্য চুন মিশিয়ে সেই রস জাল দিলে গাদ হিসাবে সূক্ষ্ম বর্জ্য পদার্থ পৃথক হ'য়ে পড়ে। তারপর তরলের মধ্য দিয়ে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করলে দ্রবণের রং অনেকটা চলে যায় এবং অতিরিক্ত চুন, ক্যালসিয়াম্ সালফাইট্ হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয়। কম চাপে তরলকে বাষ্পীভূত ক'রে রসটা গাঢ় এবং শীতল করলে কেলাস দানা রূপে চিনি পৃথক হয় এবং বাদামী রং-এর দ্রবণ হিসাবে ঝোলা গুড় অবশিষ্ট থাকে।

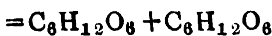
গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা : ($C_6H_{12}O_6$)

সাধারণ চিনির তিনভাগের একভাগ মিষ্টতাযুক্ত গ্লুকোজ হ'ল বর্ণহীন স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। জলে দ্রাব্য। পাকা আঙুর, অন্যান্য মিষ্টি ফলের রস, ফুলের মধু এবং মৌচাকই হ'ল গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ-এর প্রধান উৎস।

সুক্রোজ বা সাধারণ চিনিকে ৯০% অ্যালকোহলে দ্রবীভূত ক'রে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সুক্রোজ আর্দ্র বিশ্লেষিত হ'য়ে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন করে।



$$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O$$



$$=C_6H_{12}O_6+C_6H_{12}O_6$$

সুক্রোজ+জল=গ্লুকোজ+ফ্রুক্টোজ

ম্যাল্টোজ্ : ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

সাধারণ চিনি অপেক্ষা কম মিষ্টতাযুক্ত সাদা রং-এর দানাযুক্ত এই কঠিন পদার্থটি জলে দ্রাব্য। আলু, ভুট্টা, চাল প্রভৃতি প্রকৃতিজাত পদার্থ থেকে প্রাপ্ত স্টার্চ (starch)-এর সাথে অঙ্কুরিত যবে উপস্থিত ডায়াস্টেজ্ (Diastase) নামক জৈব অনুঘটক বা এন্‌জাইমের বিক্রিয়ায় ম্যাল্টোজ্ উৎপন্ন হয়।

ল্যাক্টোজ্ : প্রাণীর দুগ্ধ থেকে চীজ্ বা পনির পৃথক ক'রে নেবার পর যে তরল অংশ অবশিষ্ট থাকে, তার উপর ইনভার্টেজ (Invertase) নামক একপ্রকার এন্‌জাইমের বিক্রিয়ায় ল্যাক্টোজ্ উৎপন্ন হয়। এর মিষ্টতাও সাধারণ চিনির মিষ্টতার এক-তৃতীয়াংশ।

শর্করা ছাড়া আরও যে সব প্রাকৃতিক চিনি বা মিষ্টদ্রব্য আছে, তাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি হচ্ছে—সরবিটল্ (Sorbitol), জাইলিটল্ (Xylitol), ম্যান্‌নিটল্ (Mannitol), গ্লিসেরল্ (Glycerol) প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক এই মিষ্টদ্রব্যগুলির অধিকাংশেরই একটা সাধারণ রাসায়নিক সংকেত আছে। তা হ'ল $C_m(H_2O)_n$. কার্বন পরমাণুর সাথে জলের অণু যুক্ত আছে বলেই এদের নাম কার্বোহাইড্রেট্। প্রাকৃতিক এই মিষ্টদ্রব্যগুলি পুষ্টি-গুণসম্পন্ন। দেহের অভ্যন্তরে বিপাকীয় পদ্ধতিতে এরা জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয় এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

এবার আসা যাক্ না চেনা চিনিদের আলোচনায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে নিত্য বাড়ছে চিনির চাহিদা। অথচ, প্রকৃতির ভাণ্ডার তো অফুরন্ত নয়! কাজে কাজেই বিকল্প হিসাবে কৃত্রিম চিনির কথা ভাববার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। আর প্রয়োজনই তো আবিষ্কারের জননী। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি কৃত্রিম চিনি আবিষ্কৃত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মহলে এখনও চলছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কৃত্রিম চিনিগুলি কিন্তু কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীভুক্ত

নয়। এদের বেশীর ভাগেরই কোনরূপ পুষ্টি গুণ নেই। অথচ, এরা অনেকেই সাধারণ চিনির চেয়ে অধিক মিষ্টতাযুক্ত। এদের উৎপাদন ব্যয়ও অনেক কম।

বহুমূত্র রোগী কিংবা অতি স্থূলকায় ব্যক্তিদের খাদ্য ও পানীয়ে সাধারণ চিনির উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয় বলেই চিকিৎসকগণ তাদের এই সব চিনি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তাছাড়াও, আচার, সরবৎ, আইসক্রীম্, জ্যাম, জেলি, লজেন্স, টফি, চক্‌লেট্, নানারকম ওষুধ, দাঁতমাজার পেস্ট, প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতির প্রস্তুতিতেও কৃত্রিম চিনির ব্যবহার সুবিধাজনক। এমন কয়েকটি বিশেষ ধরনের কৃত্রিম চিনি হচ্ছে—

স্যাকারিন্ : সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত কৃত্রিম চিনিটি হ'ল স্যাকারিন্। এর রাসায়নিক নাম অর্থো সাল্‌ফো বেনজামাইড্। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার জোনস্ হপ্‌কিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিজ্ঞানী ইরা রেমজেন্ (Ira Remsen) এই যৌগটি আবিষ্কার করেন। এর মিষ্টি স্বাদটা অবশ্য হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলেন রেমজেনের গবেষণাগারে কর্মরত কন্‌স্টান্‌টিন্ ফালবার্গ নামে একজন জার্মান রসায়নবিদ্। আবিষ্কারের প্রায় ২৬ বছর বাদে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্যাকারিন্‌কে প্রথম কৃত্রিম চিনি হিসাবে বাজারে ছাড়া হয়। স্যাকারিন্ সাদা রং-এর দানাযুক্ত কঠিন পদার্থ। প্রাকৃতিক চিনি সুক্রোজের চেয়ে ৩৫০ গুণ বেশী মিষ্টি। কিন্তু জলে দ্রাব্যতা অপেক্ষাকৃত কম। ওষুধে মিষ্টতা আনতে, বহুমূত্র রোগীর খাদ্যে ও পানীয়ে এবং মদ্য প্রস্তুতিতে স্যাকারিন্ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এর অসুবিধা এই যে, খাবার পর একটু তেতো লাগে। অধিক তাপমাত্রায় স্যাকারিন্ অস্থায়ী বলে রান্নার কাজে একে ব্যবহার করা চলে না। তাছাড়াও পশুদেহে স্যাকারিন্ প্রয়োগের পরীক্ষা চালিয়ে ক্যানসারের লক্ষণ দেখতে পাওয়ায়, ১৯৭৭ খৃঃ মার্চ মাসে আমেরিকার খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন বিভাগ স্যাকারিনের ব্যবহারের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

সাইক্লামেটস্ : ১৯৩৭ খৃঃ আমেরিকার ইলিনিয়স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল সেভাডা নামক জনৈক স্নাতকশ্রেণীর ছাত্র এই যৌগটির আবিষ্কর্তা। ১৯৫০ খৃঃ থেকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে এর ব্যবহার শুরু। রাসায়নিক পরিভাষায় এর নাম সোডিয়াম্-সাইক্লোহেক্সাইল্ সালফামেট্। প্রাকৃতিক চিনির প্রায় ৩০ গুণ বেশী মিষ্টি এ যৌগটি খাবার পর, এ থেকে কোনও তিক্ত স্বাদ পাওয়া যায় না। এতে সামান্য পুষ্টিগুণ থাকায়, লিমকা, ক্যাম্‌পাকোলা প্রভৃতি জাতীয় পানীয় দ্রব্যে এবং অন্যান্য মিষ্টি খাদ্য প্রস্তুতিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। তা সত্ত্বেও ১৯৬৯ খৃঃ থেকে আমেরিকায় এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ডুল্‌সিন্ : সুক্রোজের চেয়ে প্রায় ২৫০ গুণ বেশী মিষ্টতাযুক্ত এই যৌগটির রাসায়নিক নাম হচ্ছে প্যারা ইথক্সি ফিনাইল্ ইউরিয়া। ১৮৮৩ খৃঃ বারলিনারব্লো নামক এক জার্মান-বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেন। যকৃতের টিউমার এবং রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংসের কারণ ঘটানোর জন্যই বোধকরি সাম্প্রতিক কালে এর ব্যবহার কিছুটা কমে এসেছে।

পি-৪০০০ : সাধারণ চিনির চেয়ে প্রায় ৪০০০ গুণ বেশী মিষ্টি ব'লে এই যৌগটির নামকরণ হয়েছে পি-৪০০০। কিন্তু কিড্‌নীর পক্ষে ক্ষতিকর এবং থাইরয়েড্ গ্রন্থির কার্যকারিতায় বিঘ্ন ঘটায় ব'লে আশ্চর্য মিষ্টতা গুণসম্পন্ন এই কৃত্রিম চিনিটির ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

পেরিলারটাইন : প্রাকৃতিক চিনি সুক্রোজের চেয়ে ২০০০ গুণ বেশী মিষ্টি এই

যৌগটি আবিষ্কৃত হয়েছে পেরিলা ফ্রক্‌টেন্‌সাস্ (Perilla Fructensceus) নামক একপ্রকার গাছের রস থেকে। আমাদের দেশের আখের মতো জাপানে লাইকারাইস্ নামে যে গাছ জন্মায়, তার রস মিষ্টি এবং সুগন্ধযুক্ত। পেরিলারটাইনের গন্ধ অনেকটা লাইকারাইসের গন্ধের মতো। আইসক্রীম, লজেন্স, টফি, জ্যাম, জেলি প্রভৃতি প্রস্তুতিতে এবং বিশেষ ক'রে জাপানে মধু, লাইকারাইস্ ও ম্যাপেলের রসের বিকল্প হিসাবে পেরিলারটাইনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অ্যাস্‌পারটেম্ : ১৯৬৫ খৃঃ আমেরিকার জি. ডি. সার্লে এণ্ড কোং নামক বিখ্যাত রাসায়নিক কারখানায় আর. এইচ. মাজুর এবং তাঁর সহকর্মীরা এই যৌগটি আবিষ্কার করেন। এর রাসায়নিক নাম ওয়ান্-মিথাইল-এন-এল-অ্যাস্‌পারটাইল-এল্ ফিনাইল্-অ্যালডিহাইড্। এর মিষ্টতা সাধারণ চিনির থেকে ২০০ গুণ বেশী। সাদা রং-এর এই গুঁড়ো পদার্থটি জলে স্বল্প দ্রাব্য। অতি সুস্বাদু এই কৃত্রিম চিনিতে তিক্ততা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু আম্লিক দ্রবণে এবং উচ্চতর তাপমাত্রায় যৌগটি অস্থায়ী ব'লে, রান্নার কাজে এর ব্যবহার সম্ভবপর নয়।

ডি-৬-ক্লোরোট্রিপ্‌টোফ্যান্ : ইলি লিলি (Eli Lilly) নামে এক আমেরিকান্ রসায়নবিজ্ঞানী ট্রিপ্‌টোফ্যান নামক একপ্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে এই যৌগটি আবিষ্কার করেন। সাধারণ চিনির চেয়ে ১০০০ গুণ বেশী মিষ্টি এই যৌগটি চমৎকার সুস্বাদু। এখনও পর্যন্ত এর বহুল বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয়নি।

অ্যাসিটোসালফ্যান্ : জার্মানের এক ওষুধ কারখানায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত এই যৌগ, সাধারণ চিনি অপেক্ষা ১০০ গুণ বেশী মিষ্টি। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এই কৃত্রিম চিনিটি জলে সহজে দ্রাব্য। তবে এতে কিছুটা অম্ল স্বাদ আছে।

মিরালিন্ : সিন্‌সেপেলাম্-ডুসিফিকাম্ নামক উদ্ভিদে জাত মিরাকেল নামক ফলের রস থেকে গ্লাইকোপ্রোটিন শ্রেণীভুক্ত এই যৌগটি আবিষ্কৃত। অম্লস্বাদযুক্ত ফলের রসকে মিষ্টি করবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এর। পুষ্টিগুণ না থাকলেও এর স্বাদ ও গন্ধ অপূর্ব। আইসক্রীম্, আইস্‌ক্যাণ্ডি, চিউইংগাম্ প্রভৃতি প্রস্তুতকরণে এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। টক্ জাতীয় কোন খাদ্য খাওয়ার দু-তিন মিনিট আগে একটা মিরালিন্ ট্যাবলেট খেয়ে নিলে পরে ঐ টক্ জাতীয় খাদ্য অপূর্ব মিষ্টি লাগবে।

মানুষের প্রয়োজনীয় মিষ্টির চাহিদা মেটাতে দেশবিদেশের গবেষণাগারে কৃত্রিম চিনি আবিষ্কার এবং তার গুণাগুণ বিচারের কাজ এগিয়ে চলেছে। আমরা মিষ্টি-লোভীরা আশাভরা মন নিয়ে তাকিয়ে আছি ভবিষ্যতের সেই দিনগুলির দিকে যখন উপযুক্ত কৃত্রিম চিনির আবিষ্কারের ফলে বর্তমানের চিনির জন্য হাহাকার ঘুচে যাবে। আর বন্ধ হবে চিনির কালোবাজারী।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর আবির্ভাবতিথি :

পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ২০ পৌষ ১৩৮৯

(৫ জানুআরি, ১৯৮৩)।

নানাপ্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

'শ্রদ্ধা আবিবেশ'

অনেক কাল আগে উদ্দালক বাজশ্রবস নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ধনাঢ্য হলেও একটু কৃপণ-স্বভাব ছিলেন। তাঁর একটি বালক পুত্র ছিল—নাম নচিকেতা। ছেলেটি বয়সে ছোট হ'লে কি হবে, ভীষণ বুদ্ধিমান এবং নিজের উপর খুব আস্থাশীল। একবার উদ্দালক 'বিশ্বজিৎ' নামে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে অনেক মানুষ-জন ঐ যজ্ঞ দেখতে আমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। বাজশ্রবসের গৃহে আনন্দে হৈ চৈ পড়ে গেছে। সবাই কর্মে ব্যস্ত—চারিদিকে ছোটাছুটি করছে। মহা-সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্ছে। অবশেষে এল দক্ষিণা দেওয়ার পালা। কৃপণ উদ্দালক ভেবেছেন —আসল যজ্ঞটি ভালভাবেই হ'য়ে গেল। দান-দক্ষিণা এ-সব অতি গৌণ ব্যাপার। কোন মতে সংক্ষেপে সেরে ফেললেই চুকে যাবে। বাজশ্রবস তাঁর গোশালা থেকে বেছে বেছে জরাজীর্ণ—যাদের আর বাঁচার কোন আশা নেই, কয়েক দিন পরেই মারা যাবে এমন সব গরু দান করতে লাগলেন।

যজ্ঞোৎসবে বালক নচিকেতারও মহানন্দ। কত বড় বড় মুনি ঋষি, কত সব গুণী-মানী এসেছেন এই যজ্ঞ দেখতে! কিন্তু পিতাকে অমন জরাজীর্ণ গরুগুলিকে দান করতে দেখে তার মনে বড় কষ্ট হ'ল। সে আনন্দমুখর উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। নির্জনে দাঁড়িয়ে দুঃখিত মনে দক্ষিণার গরুগুলিকে দেখতে লাগল। তখন তার মনে শ্রদ্ধার উদয় হ'ল। সে ভাবতে লাগল: বাবা ভালগুলিকে না দিয়ে ঐ রুগ্ণ গরুগুলিকে কেন দিচ্ছেন? ঐগুলি যাঁদের দিচ্ছেন তাঁদের কি কাজে লাগবে? গরুগুলি তো কয়েক দিন পরেই মারা যাবে। আর তিনি যে-উদ্দেশ্যে ঐ গরুগুলিকে দান করছেন, তা তো সফল হবে না, বরঞ্চ উলটো ফল হবে। স্বর্গে না গিয়ে তাঁকে তো দুঃখলোকে যেতে হবে! ছেলে হিসাবে আমার একটা কর্তব্য আছে—যে করেই হোক বাবাকে ঐ দুঃখলোক থেকে রক্ষা করতেই হবে। আর দান করতে হয় সর্বোত্তম জিনিস। পিতার কাছে পুত্রের চেয়েও উত্তম বা প্রিয় আর কী আছে? বাবা তো অনায়াসে আমাকেই দান করতে পারেন!

নচিকেতা ভাবতে লাগল—কিভাবে সে তার পিতাকে রক্ষা করবে? তিনি যদি তাকে কারো উদ্দেশ্যে দান করেন, তাহলে হয়তো তাঁর যজ্ঞ-উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবে।—এই ভেবে সে পিতাকে ব'লল: 'বাবা, আমাকে কার উদ্দেশে দান করলেন?' বাজশ্রবস পুত্রের কথায় কান দিলেন না। নচিকেতা আবার একই কথা জিজ্ঞাসা ক'রল, কিন্তু বাজশ্রবস কোন উত্তরই দিলেন না। নচিকেতা বারবার যখন একই কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন: 'তোকে যমের উদ্দেশে দিলাম।' নচিকেতা পিতার কথা শুনে অবাক হ'য়ে গেল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল: বাবা আমাকে যমের উদ্দেশে কেন দিলেন? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। মানুষ মরে গেলে তো যমের কাছে যায়, তবে তিনি আমাকে কেন যমকে দিলেন? আর আমি তো এমন খারাপ ছেলেও নই যে বাবার কোন কাজে আসব না। আমি তো তাঁর ছেলে বা শিষ্যদের ভালর মধ্যেই একজন বা মধ্যমের মধ্যে একজন; একেবারে খারাপ কখনও নই। তবে কেন তিনি আমাকে যমকে দিলেন? তাহলে

কি তিনি রাগ ক'রে বলেছেন 'তোকে যমের উদ্দেশে দিলাম'? যাই হোক, যা হবার তো হ'য়ে গেছে। এখন আমাকে বাবার সত্যরক্ষার্থে যমের কাছেই যেতে হবে। নচিকেতা সাহসী, দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাই জ্যান্ত মানুষ হয়েও মৃত্যুর রাজা যমের কাছে যেতে একটুও ভয় পেল না।

এদিকে উদ্দালক বাজশ্রবস চিন্তা করতে লাগলেন: আমার মুখ দিয়ে একী কথা বেরুল! পিতা হ'য়ে আমি সত্যি সত্যি তো আমার ছেলেকে মৃত্যুর কাছে দিইনি। ক্রোধবশে আমার মুখ দিয়ে ঐ কথা বেরিয়েছে। এটা আমার মুখের কথা মাত্র। নচিকেতা পিতার মনের কথা বুঝতে পারল। পিতা তাকে যমের কাছে যেতে দেবেন না, তাই সে প্রাচীনদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছে: 'বাবা, আপনি পূর্বপুরুষ এবং সাধু-মহাত্মাদের কথা চিন্তা ক'রে দেখুন, তাঁরা কি আচরণ করতেন? তাঁরা সব সময় সত্য ধরে, সত্য আচরণ করতেন। তাঁরা কখনও মিথ্যা আচরণ করতেন না। আর মিথ্যা আচরণ করেও কখন জরা-মরণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। মানুষ শস্যের মতো পাকে অর্থাৎ জরাজীর্ণ হ'য়ে শেষে মরে যায়। মরে আবার শস্যের মতো জন্মায়। সেইজন্য মিথ্যা আচরণ ক'রে লাভ কি? সত্য পালন করুন—আমাকে যমের কাছে যেতে দিন। আত্মবিশ্বাসশীল নচিকেতা তার সঙ্কল্পে অটল—শ্রদ্ধায় অবিচল।

নচিকেতা সত্যিই যমালয়ে চলে গেল। মৃত্যুপতি যম তখন প্রাসাদে ছিলেন না, বাইরে যেন কোথায় গিয়েছিলেন। বালক অতিথি উপবাস ক'রে তিনদিন ধরে অপেক্ষা করতে লাগল তাঁর জন্য। যম ফিরে এলে তাঁর অমাত্য ও স্ত্রীগণ বললেন: আপনার বাড়ীতে অগ্নিতুল্য এক ব্রাহ্মণ কুমার তিনদিন ধরে অনশন ক'রে অপেক্ষা করছে। আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ ক'রে, পা ধোয়ার জল দিয়ে প্রসন্ন করুন, তা না হ'লে আমাদের সংসারের যা কিছু মঙ্গলময় সব বিনষ্ট হ'য়ে যাবে। যমরাজ তাড়াতাড়ি তাকে নমস্কার ও পাদ্যার্ঘাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন এবং তাকে বিশেষ প্রসন্ন করতে তিনরাত্রি অনশন করার জন্য ইচ্ছা মতো তিনটি বর প্রার্থনা করতে বললেন।

যমরাজের ইচ্ছায় নচিকেতা প্রথম বর প্রার্থনা ক'রল: হে মৃত্যু, পিতা আমার জন্য দুশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে আছেন, তাঁকে প্রশান্তচিত্ত করুন। তিনি যদি আমার উপর বাস্তবিক রাগ ক'রে থাকেন, তাহলে সর্বাগ্রে তাঁর রাগ দূর করুন। আর আমি যখন আপনার কাছ থেকে ফিরে যাব, তখন তিনি যেন আমাকে তাঁর সেই পুত্র বলেই চিনতে পারেন। যমরাজ নচিকেতার প্রথম বর মঞ্জুর ক'রে বললেন: হে নচিকেতা, তোমার পিতার স্নেহ-ভালবাসা তোমার উপর আগে যেমন ছিল, তুমি ফিরে যাবার পরও দেখবে তেমনিই রয়েছে। আর তিনি আগামী রাত্রিগুলি সুখে নিদ্রা যাবেন। নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনা ক'রল: হে মৃত্যু, স্বর্গলোকে জরাজীর্ণ হওয়ার কোন ভয় নেই, সেখানে ভোজনেচ্ছা ও পিপাসা অতিক্রম ক'রে এবং মানসদুঃখের হাত থেকে রেহাই পেয়ে শুধু আনন্দ অনুভব হয়।—এই রকম যে স্বর্গলোক, তা লাভ করার জন্য যে অগ্নিতত্ত্ব আছে, তা আপনি জানেন। আমাকে যদি আপনি শ্রদ্ধাযুক্ত মনে করেন, তাহলে সেই বিদ্যা আমাকে বলুন। যমরাজ বললেন: হে নচিকেতা, আমি তোমাকে সেই অগ্নিতত্ত্বের কথা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোন। যমরাজ-কথিত অগ্নিতত্ত্ব উপযুক্ত শিষ্য নচিকেতা যথাযথভাবে উচ্চারণ ক'রে তাঁকে শুনালেন। যমরাজ তাঁর উপর অত্যন্ত খুশী হ'য়ে চতুর্থ আর একটি বর দিলেন। চতুর্থ বরটি হ'ল নচিকেতার নাম অনুসারে এই

অগ্নি 'নাচিকেত অগ্নি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং জনসাধারণ ঐ নামেই ব্যবহার করবে। এইবার নচিকেতা তার শেষ বর—তৃতীয় বরটি প্রার্থনা করলেন: হে মৃত্যু, মানুষ মরে গেলে কী হয়, কোথায় যায়? কেউ বলেন, মানুষ মরে গেলেও পরলোকবাসী আত্মা ঠিক থাকে; আবার কেউ বলেন, না, ঐ রকম কোন আত্মা নেই। এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আমাকে বলুন। এই-ই আমার তৃতীয় বরপ্রার্থনা আপনার কাছে।

নচিকেতার মুখে হঠাৎ এমন গুরুগম্ভীর আত্ম-জিজ্ঞাসা শুনে যমরাজ ভাবতে লাগলেন—সে আত্মজ্ঞানের অধিকারী কিনা। উপযুক্ত অধিকারী না হ'লে আত্মতত্ত্ব ব'লে কোন লাভ নেই, বললেও বুঝতে পারবে না। তিনি পরীক্ষা করার জন্য বললেন: হে বালক, তুমি এই বর ছাড়া অন্য যে-কোন বর প্রার্থনা কর। দেবতাদেরও এই বিষয়ে সংশয় আছে। আর অজ্ঞ লোকেরা বারবার শুনেও আত্মতত্ত্ব বুঝতে পারে না। আত্মতত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু নচিকেতা স্বীয় প্রশ্নে অনড়। দৃঢ়স্বরে আবার নিবেদন ক'রল: হে মৃত্যু, দেবতারাও যখন এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন, আর আপনিও যখন বলছেন এই আত্মতত্ত্ব সহজ লভ্য নয়, তখন এই তত্ত্ব পণ্ডিতগণেরও অজানা। তাই আপনার মতো অপর আর বক্তা পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই বরের মতো অন্য কোন বর প্রার্থনীয় হতেই পারে না। নচিকেতাকে যখন কথায় ভুলানো গেল না, তখন যমরাজ স্বর্গ ও পার্থিব ভোগের সামগ্রী তার সামনে তুলে ধরে প্রলোভন দেখাচ্ছেন: হে বালক, এই লও, তুমি সমস্ত পৃথিবী ভোগ কর, যতদিন বাঁচতে ইচ্ছা কর—বেঁচে থেকে দেবতা ও মানুষের উপভোগ্য যতপ্রকার ভোগ্য জিনিস আছে, তা তুমি ভোগ কর। মর্ত্যলোকের মানুষ যা একমাত্র কাম্য ব'লে মনে করে, অথচ পাওয়া দুর্লভ, তা তুমি আমার কাছে ইচ্ছা মতো প্রার্থনা কর। সুন্দরী রমণী, পুত্রকন্যা, ধনসম্পদ ইত্যাদি যা ইচ্ছা তুমি প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, শুধু তুমি 'মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা'—এই জটিল বিষয়ে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করো না।

পার্থিব জগতের মানুষ যা ভোগ করার জন্য সদা-সর্বদা উদ্‌গ্রীব, নচিকেতা তা অতি তুচ্ছ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে ব'লল: হে যমরাজ, আপনার ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য, আপনার এই সব সুন্দরী রমণী, হাতি-ঘোড়া-রথ ইত্যাদি আজ আছে কাল থাকবে না। স্বয়ং ব্রহ্মারও আয়ু যখন মহাকালের তুলনায় অতি অল্প, তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের আর কী কথা! আপনার ভোগ্য সামগ্রী আপনারই থাক, আমি এই-সব চাই না। আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু আত্মতত্ত্ব।

নচিকেতা স্বর্গ ও পৃথিবীর যাবতীয় মনোরম ভোগ্য বস্তুতেও প্রলুব্ধ হ'ল না। কোন প্রতি তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ধীর স্থির শান্ত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—আত্মতত্ত্ব তাকে জানতেই হবে। যমরাজ নচিকেতার শ্রদ্ধা দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং ভাবলেন এই বালকই আত্মতত্ত্ব শোনার যোগ্য অধিকারী। আর এই রকম শ্রদ্ধাসম্পন্ন মানুষই আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র অধিকারী। তাই যমরাজ তাকে প্রশংসা ক'রে বললেন: যারা ভোগ করতে চায় তারা প্রেয়কে প্রার্থনা করে, আর যারা মোক্ষলাভ করতে চায় তারা শ্রেয়কে প্রার্থনা করে। আমি তোমাকে বারবার প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতে চঞ্চল না হ'য়ে তুমি সেই শ্রেয়কেই প্রার্থনা করেছ। চরম সত্য লাভের জন্য যে সাহসের দরকার তা তোমার আছে। তোমার মতো উপযুক্ত অধিকারী পেয়ে আমি খুশী। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে তাহলে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই ব'লব।

যমরাজ তখন তাকে আত্মবিদ্যা উপদেশের ইচ্ছায়, বিদ্যা ও অবিদ্যার দোষ ও গুণ সব দেখিয়ে নচিকেতাকে বললেন: 'আত্মা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন, শাশ্বত, অনন্ত, নির্বিকার, বুদ্ধির অগম্য, অক্ষয়'—এইভাবে তাঁকে জেনে অমৃতত্ব লাভ করা যায় বা মুক্ত হওয়া যায়। ধর্মরাজ যম প্রসন্ন হ'য়ে বালক-জিজ্ঞাসু নচিকেতাকে এই-ভাবেই মৃত্যুর রহস্য, তথা আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন। বিশ্বের সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এই আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা।

যথাকালে নচিকেতা মর্ত্যলোকে আবার ফিরে এল। মরণজয়ী অদ্ভুত বালক ব'লে পৃথিবীতে তার কথা রটে গেল। এই বালক নচিকেতার মুখ থেকেই পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুর রহস্য,—আত্মবিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব জানতে পারে। উত্তর-কালে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই বালক নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য ব'লে চিরনমস্য হয়েছেন।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক শিষ্যকে উপলক্ষ্য ক'রে আমাদের সকলকেই বলেছিলেন: 'নচিকেতার মতো শ্রদ্ধা সাহস বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আনবার চেষ্টা কর।' তিনি নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী তরুণদের ভালবাসতেন। তাই তিনি কতবার বলেছিলেন: 'নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা ক'রে দিতে পারি।' [কাহিনীটি কঠোপনিষদের।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে কি না এটাই লক্ষণীয়'

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ একদিন বলেছিলেন: 'ইষ্ট ও জীবাত্মা একই জ্যোতিঃ-র দুই মূর্তি—অর্থাৎ জীব ও ইষ্ট একই উপাদানে গঠিত।'

আর একদিনের কথা: 'একটা পরীক্ষা পাশ করতে যে ঐকান্তিক চেষ্টা হয়, পাশ না করলে বোধ হয় যেন মাথায় বাড়ি,—এবং লোকের কাছে হীন হবার প্রবল ভয়, ভবিষ্যৎ অন্ধকার,—সেরূপ চেষ্টা হ'লে অল্প সময়ের মধ্যেই ইষ্টদর্শন বা কৃতকৃত্য হওয়ার বাধা থাকে না। অর্থাৎ দর্শনাদি এসেই পড়ে।'

'দ্যাখো তোমাকে যে মন্ত্র দিলাম, তা সিদ্ধ মন্ত্র, জপ করতে করতে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হবে।'

'ঠাকুর ও মা তোমার সকল ভার নিয়েছেন —এ-কথা যদি এখন বিশ্বাস না কর, কালে ঠেকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

*

প্রশ্ন করেছিলাম,—সাধন-ভজন করছি বটে, কিন্তু সরস হচ্ছে না—কেমন mechanical হ'য়ে পড়ে। ব'লে দিন, কেমন ক'রে চললে সরসতা আসবে।

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ জবাব দিয়েছিলেন: 'প্রত্যহ একই ভাব বা জিনিস নিয়ে থাকলে, কতকটা অমন mechanical হয়েই পড়ে। তবে যেদিন যে-সাধনটি ভাল লাগবে, সেই দিন অপর সাধনাংশ বাদ দিয়ে ঐটুকু নিয়েই থাকবে। এমনি ভাবে হয়তো দু-চার দিন কিছু কিছু অংশ বাদ যাবে তাতে ঘাবড়াবার নেই কিছু। বরং দেখবে, কয়েকদিন বাদে ঐ সাধনাংশগুলিতে সরসতা আসছে।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—পুস্তকাদি পাঠ ক'রে, লোকমুখে শুনে ঠাকুরের কথা কিছু তো জানা হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁর লীলাদি চিন্তা যখন করি, তখন তাঁকে সত্যি বা জীবন্ত বোধ হয় না কেন?

সারদানন্দজী গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন: 'দ্যাখো, সরস করতে গেলে heart ও brain

উভয়েরই সহযোগিতা দরকার। ঠাকুরের সম্বন্ধে যা জানা আছে, তা যদি তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করে, তবেই তাঁর লীলাদি কর্ম সরস ও জীবন্ত বোধ হবে।···ভেবো না, ক্রমে সব ঠিক হ’য়ে যাবে।’

অন্য আর একদিনও একান্তে পেয়ে, মহারাজকে জানালাম,—‘সবই তো যেমন করার ঠিক ক’রে যাচ্ছি। কিন্তু কই দর্শনাদি তো কিছুই কিছু হচ্ছে না।’

আমার এই বালকোচিত আক্ষেপ শুনে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ তক্ষুণি তীব্র ভৎ’সনার স্বরে জবাব দিয়েছিলেন: ‘রেখে দাও ও-সব কথা।···ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে কিনা, এটাই লক্ষণীয়।’ পরে আবার কোনও এক সময়ে মিনতি ক’রে বলেছিলাম—‘মহারাজ, কিছুই হচ্ছে না!’

তিনিও অকস্মাৎ উচ্চারণ করলেন: ‘হচ্ছে না?’ এই কথাটি বলেই, তাঁর প্রকাণ্ড হস্ততল আমার মাথার উপর জোরে স্থাপন করলেন। তৎকালে আর কিছুই জিজ্ঞাসা রইল না। বেশ ভাল লাগল!

*

উদ্বোধনের বাড়ীতে। একদিন বিদায় নিচ্ছি তাঁর ঘরে। অসুস্থতার জন্য মহারাজ (সারদানন্দজী) নিচে নামেননি। কী আশ্চর্য মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন: ‘বাবা, আজই রওনা হবে?’ তারপর প্রণামান্তে উঠছি,—তিনি কেবলই বলছেন ‘দুর্গা দুর্গা!’ বারান্দায় এসেছি,—সিঁড়ি দিয়ে নামছি,—কানে শুনতে পাচ্ছি, ‘দুর্গা, দুর্গা!’ যেন মা দুর্গার হাতে সঁপে দিচ্ছেন! আর ভয় কি? বিপদ কোথায়?

[প্রয়াত অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্তের অপ্রকাশিত দিন-লিপি থেকে সংকলিত।]

জ্ঞান-

আবহাওয়ার উপর নজর

আবহাওয়া সম্পর্কে মানুষের ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রচেষ্টা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। অতীতের অভিজ্ঞতা, প্রচলিত লোককাহিনী এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরী ঐ ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হ’ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিমাপ করবার যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার ফলে আবহ-বিজ্ঞান এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আজ আবহাওয়া-উপগ্রহ পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে, কমপিউটার সদ্য-পাওয়া তথ্যগুলিকে সংখ্যায় রূপান্তরিত ক’রে আবহ-মানচিত্র রচনা করছে আর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি করছে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ। এর জন্যে সারা বিশ্বে স্থাপন করতে হয়েছে ৩৫০০-এরও অধিক আবহ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক শত ‘জাতীয় সামুদ্রিক আবহমণ্ডল কেন্দ্র’ (National Oceanic and Atmospheric Administration) আবহাওয়ার উপর নজর রাখে। পৃথিবীর বুকে এই কেন্দ্রগুলি, উচ্চাকাশে অবস্থিত স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্রগুলি, আবহ-র‍্যাডার এবং পর্যবেক্ষক উপগ্রহগুলি জাতীয় আবহ-কেন্দ্র-গুলিতে অবিরত তথ্য সরবরাহ করে। বিজ্ঞানীরা এইসব তথ্য থেকেই বছরে বিশ লক্ষেরও অধিক আবহ-পূর্বাভাষ প্রচার করেন।

ঝড়ের গতিপথে অবস্থিত অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের জীবন-মরণ নির্ভর করে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ ও সতর্ক-বার্তা যথাসময়ে পাওয়ার উপর। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ধরনের ‘জাতীয় ঝটিকা কেন্দ্র’ (National Hurricane Centre in Miami, Florida) আটলান্টিক

মহাসাগর ও ক্যারিবিয়ান সাগরের জলের উষ্ণতা পর্যবেক্ষণ ক'রে চলেছে, ঝড়-সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য। কৃত্রিম-উপগ্রহ-প্রেরিত ফটোগুলির সাহায্যে ঝড়-সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঝড়ের বেগ, চাপ, কেন্দ্র ও গতিপথ নির্দেশের জন্য নিয়মিতভাবে ঝটিকা-বিমান (Hurricane Hunters) পাঠানো হয়। ঝড় উপকূলের কাছাকাছি এসে গেলে ঐ কাজ তখন র‍্যাডার-কেন্দ্রগুলির আওতায় এসে যায়। 'জাতীয় ঝটিকা-কেন্দ্র' ঘূর্ণিঝড়-সৃষ্টির শুরু থেকে কোথায় এবং কোন্ উপকূলে তা আঘাত করতে পারে—এই বিষয়ে সংবাদ প্রচার করতে থাকে, যাতে সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নাঞ্চলবাসীরা সময়মতো সাবধান হ'তে পারে এবং নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারে। আবার 'জাতীয় সামুদ্রিক আবহমণ্ডল কেন্দ্র'-ও ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সম্পর্কে বিশেষ জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বিধ্বংসী 'প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে'র (Tornado) মোকাবিলায় 'ডোপলার র‍্যাডার' (Doppler radar) বিশেষ ফলপ্রসূ। ওকলাহোমাতে অবস্থিত 'প্রধান বাত্যা গবেষণাগার' (NOAA's National Severe Storms Laboratory in Norman, Oklahoma) কোন্ কোন্ ধরনের বজ্রাঘাতসহ-ঝড় ঘূর্ণিঝড়ে পরিবর্তিত হ'তে পারে তা র‍্যাডার ও উপগ্রহ-ফটোর সাহায্যে পরীক্ষা করে। 'ডোপলার র‍্যাডার' বৃষ্টির প্রতিধ্বনি থেকে বায়ুর গতির তারতম্য ধরতে পারে ; কারণ এই ধরনের পরিবর্তনই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের নির্দেশক। প্রথম আঘাত হানার প্রায় কুড়ি মিনিট আগেই এই র‍্যাডার মেঘের মধ্যে লুকানো ঝড়ের সন্ধান পায়।

আধুনিক আবহাওয়া-গবেষণার একটি উদ্দীপনাকর দিক হচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটানো বা তাকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। মেঘের মধ্যে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে দিয়ে ঝড়ের বিধ্বংসী ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়াই গবেষকদের লক্ষ্য। ষাটের দশকে চারবার এই প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল এবং তাঁরা আংশিক সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু এতে ঝড় বৃদ্ধি পেতে পারে বা তার গতিপথও পালটাতে পারে—জনগণের এ-রকম একটা আতঙ্ক থাকায় ঐ পরীক্ষা স্থগিত রাখা আছে। তবে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার এবং ঝড় সম্পর্কীয় অধিকতর খবরাখবরের ফলে ভবিষ্যতে ঝড়কে আয়ত্তে আনা অনেকাংশে সম্ভবপর হবে ব'লে বৈজ্ঞানিকদের আশা।

[SPAN, March, 1982-এ প্রকাশিত আবহাওয়া বিষয়ক একটি সংবাদ-প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।]

দেশ-বিদেশ

কিরাতদের দেশ

পাহাড়ের পর পাহাড়—উঁচু-নিচু অসংখ্য পাহাড়গুলিতে সবুজ বনানীর আস্তরণ, আর স্বচ্ছ নদীর আলপনা। সুসজ্জিত ঐ পাহাড়ের গা থেকে কত ঝরনা বেরিয়ে, বিচিত্র সব খাদ বেয়ে নেমে আসছে—যেন নৃত্যের তালে তালে ছুটে চলেছে নদীতে মিশে যাবার জন্য! দূরে দেখা যায় শুভ্র তুষারাবৃত সুউচ্চ শিখরশ্রেণী ঝকমক করছে। সব মিলিয়ে প্রকৃতিদেবী অপূর্ব এক মহিমান্বিত সাজে, অপরূপ সৌন্দর্যের ডালি হাতে দাঁড়িয়ে দূরাগত পথিককে যেন হাতছানি দিচ্ছেন।

আকর্ষণ দুর্বার। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথ বড়ই দুর্গম। যে কোন মুহূর্তে পথচারীকে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পারে। তেমনি

খামখেয়ালী এখানকার আবহাওয়া। এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে আকাশ পরিষ্কার—সূর্যের আলোয় প্রকৃতিতে বর্ণাঢ্য রূপের মেলা। হঠাৎ আবার বিনা সংকেতে—বিনা মেঘে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হয়ে যায়। পরমুহূর্তে দেখা যাবে, প্রকৃতিদেবীর প্রসন্ন হাসিখুশি মুখ। আবার হয়তো খানিক বাদেই দেখা যাবে—ঘন কালো মেঘ হয়ে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে—যেন সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য রুষ্টা প্রকৃতিরানী করাল রূপ ধারণ করেছেন। কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ প্রকৃতির সে-রুদ্রমূর্তির পরিবর্তে প্রশান্তমূর্তি ফুটে উঠবে—চারিদিক সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে—মনে হবে যেন কোথাও কিছু হয়নি। এমনি অদ্ভুত স্বতন্ত্র-মেজাজের আবহাওয়া। এখানে বছরে প্রায় ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

এখানকার মানুষদের রাতদিন এই খেয়ালী প্রকৃতি এবং হিংস্র বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। লড়াই করতে করতে এখানকার মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে লড়িয়ে। তারা তীর, ধনুক, তরোয়াল এবং প্রচণ্ড ধারালো দা নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য যেন সর্বদা প্রস্তুত। তাদের শরীর অসম্ভব মজবুত। পায়ের মাংসপেশী সুদৃঢ়—দেখেই মনে হবে, সবাই এক-একজন দুর্ধর্ষ পর্বতারোহী। ঝড়-বৃষ্টি এবং হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা পাহাড়ের গায়ে বড় বড় খুঁটি পুঁতে তার উপর ছোট ছোট ঘর তৈরি করে বসবাস করে। এই অঞ্চলবাসীরা যেন এক নতুন জগতের মানুষ! এদের আচার-আচরণ রীতিনীতিও বড়ই অদ্ভুত।

আশ্চর্য এই রাজ্যটি হচ্ছে আমাদের ভারতেরই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই অঞ্চলের মানুষদের বলা হয়েছে 'কিরাত'। সংস্কৃতে 'কিরাত' শব্দের অর্থ সাধারণ পার্বত্য উপজাতি। যজুর্বেদে এদের কথা উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি সংহিতায় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এদের পার্বত্য গুহাবাসী বলা হয়েছে। রামায়ণে আছে এরা পাহাড়ে ও দ্বীপে বাস করে এবং কাঁচা মাংস খায়। মহাভারতেও এদের কথা বর্ণনা আছে যে, তারা ভীষণ পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধে ও শিকারে বিশেষ নিপুণ; এরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে ছিল।

কিরাতরা দেখতে সুশ্রী। তাদের গায়ের রঙ ফরসা। প্রাচীনযুগে এরা পশুচর্ম পরত এবং মাথার জটায় ত্রিকোণ চূড়া বাঁধত। ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব মতে কিরাতরা মঙ্গলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ এবং এরা ভারতবর্ষে ঢোকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০ শতকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে।

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এই রাজ্যটির বর্তমান নাম অরুণাচল প্রদেশ। অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিমে ভুটান, উত্তর-পূর্বে তিব্বত ও চীন এবং দক্ষিণ-পূর্বে বর্মাদেশ। আগে এই অঞ্চলটি আসাম রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত স্বাধীন হবার পরে অঞ্চলটিকে নির্দেশ করা হত 'নেফা' (NEFA : North Eastern Frontier Agency) বলে। আধুনিক অরুণাচল নামটি দেওয়া হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুআরি এটি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য। এর আয়তন ৮১,৪৯৩ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ৬২৮,০৫০ (১৯৮১)। প্রদেশটি আপাততঃ পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত, যথা—

(১) কামেঙ—প্রধান শহর বোমডিলা
(২) সুবনসিরি— „ „ জিরো
(৩) সিয়াং— „ „ অলঙ
(৪) লোহিত— „ „ তেজু
(৫) তিরাপ— „ „ বোরখুম

অরুণাচল প্রদেশের এই পাঁচটি জেলায় বিভিন্ন উপজাতির বাস—যাদের সঙ্গে আমাদের পাঠক-পাঠিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে পরবর্তী সংখ্যায়

সমালোচনা

বেদান্তালোকে যীশুর জীবনী ও বাণী—স্বামী তপানন্দ। প্রকাশক: স্বামী মায়েশানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ, পোঃ—কেতিকা, পুরুলিয়া। (১৯৮০), পৃঃ ২৮+৫৪৪, মূল্য: পঁচিশ টাকা।

আজ থেকে আনুমানিক দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে ইজরায়েলের অধিবাসীদের উপলক্ষ ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ করবার জন্য যিনি একটি সরাইখানার আস্তাবলে দীনহীনের মতো জন্ম নিয়েছিলেন, জীবের পাপ-নাশের জন্য যিনি বরণ করেছিলেন অতিশয় ক্লেশকর মৃত্যু, ঈশ্বরের বরপুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টের জীবনকাহিনী ও বাণী এই গ্রন্থের বিষয়। অনন্য এই জীবনের বৃত্তান্ত লেখক মূলতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বিবৃত করেছেন। আবার সেইসঙ্গে তিনি তা বিশ্লেষণ করেছেন ব্যাপক অর্থে বেদান্তের আলোকে। গ্রন্থটির বিশেষত্ব এইখানে।

প্রেম আর পবিত্রতার যিনি মূর্ত বিগ্রহ, নিঃস্বার্থ মানবসেবা যাঁর ধর্ম, সেই অবতারপুরুষ খ্রীষ্ট সকলের সম্মুখে একটি শুচিশুভ্র, জ্যোতির্ময় জীবনের রূপ তুলে ধরে বিনিময়ে কী পেয়েছেন? পেয়েছেন উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ঘৃণা এবং নিষ্ঠুর আঘাত। খ্রীষ্টের জীবৎকালে তাঁর প্রধান শিষ্যেরা তাঁর অলৌকিক যোগবিভূতির বিকাশ লক্ষ্য করেছেন, সেইসঙ্গে পেয়েছেন তাঁর অসামান্য প্রেমময় চরিত্রের পরিচয়। তবু, কী আশ্চর্য, অন্যদের কথা দূরে থাকুক, তাঁর সেই প্রধান শিষ্যদের মধ্যেও সকলে প্রভুর ঈশ্বরীয় সত্তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি, কেউ-বা বিরুদ্ধাচরণও করেছেন। কিন্তু প্রেমময় খ্রীষ্ট তাঁদের পরিত্যাগ করেননি, অভিশাপ উচ্চারণ করেননি কারও প্রতি—তাঁর কৃপা সকলকে ঘিরে রেখেছে। অবশেষে প্রভুকে তাঁর স্বরূপে পিটার প্রমুখ শিষ্যগণ যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সে তাঁরই অনুগ্রহে।

প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার বিরাট এই গ্রন্থটি সাঁইত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। লেখকের পরিকল্পনা যেমন সুচিন্তিত, তেমনই সযত্ন তাঁর রচনা। তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার নিদর্শন গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। খ্রীষ্ট জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় সেই সময়ের ইজরায়েলের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক পটভূমির সুস্পষ্ট পরিচয়। খ্রীষ্টের সমকালে ইহুদী জাতির নৈতিক দুর্দশার কথা আমরা জানি। সেই দুরবস্থার চিত্রটি লেখক বিভিন্ন ঘটনার সহযোগে উপস্থাপিত করেছেন। সাধারণভাবে উক্ত জাতির অধিকাংশের মধ্যে তখন সংকীর্ণতা আর স্বার্থপরতার প্রাধান্য। ইন্দ্রিয়সুখ আর ভোগবিলাস তাদের ধ্যানজ্ঞান। প্রতিবেশীর প্রতি তাদের ভালবাসা ও সহানুভূতির একান্ত অভাব। পুরোহিতকুল ক্ষমতালিপ্সু। তাদের ধর্মানুষ্ঠান গোঁড়ামি আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন—ধর্মের অসার ভাগ নিয়েই তাদের যত আড়ম্বর। ইহুদী জাতির জীবনে তাই তখন সংযম আর ঈশ্বরপ্রেম দুর্লক্ষ্য। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই সব মানুষকে সত্যের আলোকিত পথের নিশানা দিতেই খ্রীষ্টের দেহ-ধারণ। আর সেইসঙ্গে তাঁর অশেষ দুঃখবরণ।

খ্রীষ্ট তাঁর দিব্য জীবনে প্রকটিত করলেন ধর্ম কী। তিনি দেখালেন, ত্যাগ, প্রেম, ক্ষমা, সেবা আর পবিত্রতাই ধর্ম। আচার-অনুষ্ঠান যে অসার বস্তু আর পুঞ্জীভূত কুসংস্কার যে ধর্মের পরিপন্থী সে-কথাটি বুঝিয়ে দেবার জন্য তাঁর কর্মে ছিল না ক্লান্তি। জাগতিক অর্থে তিনি বিত্তহীন,

অনিকেত ; কিন্তু নিত্যতৃপ্ত। সাংসারিক কোনও সুখই তাঁর কাম্য ছিল না। দয়াময় তিনি। মৃতজনে তিনি যে প্রাণসঞ্চার করেছেন আর অন্ধজনকে করেছেন চক্ষুষ্মান্, সে শুধু ভগবানের অহেতুক করুণার রূপটি উদ্ঘাটন করার জন্য। তবে কি কিছুই তিনি চাননি? নিজের জন্য অবশ্যই কিছুই না। শুধু মানুষকে ঈশ্বরমুখী করতে চেয়েছিলেন তারই কল্যাণের জন্য। সেই-টুকুই তাঁর চাওয়া।

অমর জীবনের পথ যাদের কাছে উন্মুক্ত ক'রে দিতে তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন, প্রথমে সংশয়ে ক্লিষ্ট, পরে হিংসায় উন্মত্ত তারাই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার আয়োজন ক'রল। কিন্তু জড় দেহের এই মৃত্যু এ-কাহিনীর শেষ কথা নয়। যে-দেহ চিন্ময় তার তো মৃত্যু নেই। মৃত্যুর পর তাই তাঁর পুনরুত্থান। খ্রীষ্টের মৃত্যুহীন জীবন ভাবী কালের জন্য রেখে গিয়েছে সত্যের, ধর্মের পথনির্দেশ।

পরবর্তী যুগের অথবা চিরকালের মানুষের অন্তরের কথা বুঝি প্রতিধ্বনিত হয়েছে কবির ভাষায় :

'…সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ ক'রব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের
জীবনে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।
…
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।'

বিদগ্ধ সন্ন্যাসী লেখকের এই গ্রন্থখানি বাংলা ধর্ম-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

THE NEW WINE OF JESUS: CHRIST TAUGHT VEDANTA—Dr. Bhawani Sankar Chowdhury, Published by Tapas Sankar Chowdhury, 54/4B, Hazra Road, Calcutta-19. (1982), Price : Rs. 40·00

বইটির নামের মধ্যেই ইহার উপপাদ্য বলা হইয়াছে। নামটি দেখিয়াই জিজ্ঞাসু পাঠক উৎসাহিত হইবেন, সন্দেহ নাই। লেখক বাইবেল গ্রন্থ যে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ। শুধু তাহাই নহে, তিনি যীশুর উক্তি নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে আমাদের উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ এই রকম আলোচনা পাঠকের নিকট কিছুটা শুষ্ক হইয়া পড়ে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে লেখকের সাবলীল মননশীলতা ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গি গ্রন্থখানিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে।

এই আলোচনায় লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দু-একটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যাহা খৃষ্টাবলম্বীরা কতখানি মানিয়া লইবেন জানি না। যেমন পুনর্জন্ম (পৃঃ ৭৫)। যীশু যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন (পৃঃ ৬৫), লেখকের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও কী খৃষ্টান, কী অখৃষ্টান অনেকেরই ধারণা পরিষ্কার নাই।

বইটির ছাপা এবং কাগজ ভাল হইয়াছে। বইটি পাঠ করিয়া অখৃষ্টান পাঠক খৃষ্টের বাণীতে শ্রদ্ধাশীল হইবেন এবং কিছু একাত্মবোধ করিবেন। অপরপক্ষে, খৃষ্টান পাঠক তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিতে পারিবেন এবং বেদান্তধর্মের শাশ্বত সত্যটিকে হৃদয়ে লইতে পারিবেন। তবে এই বই-এর প্রচার আন্তর্জাতিক পুস্তক-বিক্রয় পথে না যাইলে, পরের উদ্দেশ্যটি সাধিত হওয়া সম্ভব নহে।

—শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সৌরাষ্ট্র ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ : গত ৮ নভেম্বর, ১৯৮২-র ঘূর্ণিবাত্যায় সৌরাষ্ট্রের (গুজরাট) অন্তর্গত ভবনগর, আম্রেলী এবং জুনাগড় জেলা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজকোট মঠকেন্দ্র কর্তৃক ভবনগর জেলার ভোজবাদাড় ও আম্রালা গ্রাম এবং আম্রেলী জেলার ভানকিয়া, নানা গোখাড়ওয়ালা, মোটা গোখাড়ওয়ালা এবং তিনটি অন্যান্য গ্রামের ৮৯০টি পরিবারকে প্রাথমিক ত্রাণসাহায্য দেওয়া হয়। গত ২৪ নভেম্বর, ১৯৮২ পর্যন্ত ২,৫০০ কিলো বজরা, ১,১০০ কিলো গম, ৩,১০০ কিলো চাউল, ৩,৪০০ কিলো মুগ ডাল, ৫৮০ কিলো চিনি, ৩৪৫ কিলো চা, ৬৬ কিলো গুড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় আরও বহু দ্রব্যাদি বিতরিত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ৬ ও ৭ নভেম্বর ১৯৮২, সুবর্ণজয়ন্তীর দ্বিতীয় দফায় প্রস্তুতিপর্ব উদ্‌যাপন এবং ধাত্রীবিদ্যা ও ছাত্রদের পুনর্মিলন উপলক্ষে আয়োজিত সভাসহ একটি চিত্র-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

গত ১৪ নভেম্বর ১৯৮২, ১৭২ জন যুবকের উপস্থিতিতে চণ্ডীগড় আশ্রম কর্তৃক একটি যুব-সম্মেলন আহূত হয়।

২৫০ জন যুবকের উপস্থিতিতে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ গত ৬ ও ৮ নভেম্বর ১৯৮২, একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করে।

ভক্ত-সম্মেলন

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ২৯ পৌষ হইতে ৩১ পৌষ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী স্বাধ্যায়, উপাসনা, ধর্মালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে এক ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসিগণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ যোগদান করেন

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ২৫ নভেম্বর স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়।

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই মাসে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ :

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ৩য় সং, মূল্য ০·৭৫

চিকাগো বক্তৃতা—স্বামী বিবেকানন্দ, ২৭শ সং, মূল্য ২·০

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা একজন সন্ন্যাসী ভ্রাতার দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী বিরজাত্মানন্দ (অনাদি মহারাজ) গত ১৫ নভেম্বর ১৯৮২, রাত্রি ১০-০৫ মিনিটে ৬১ বৎসর বয়সে কনখল সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আধঘণ্টা পূর্বে সহসা হৃদ্‌রোগে তিনি আক্রান্ত হন এবং সর্ববিধ চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যু ঘটে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বাস্থ্যের অবনতির দরুন তিনি তথায় অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর মন্ত্র-শিষ্য। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনি বহরমপুরের সারগাছি আশ্রম ব্যতীত কনখল সেবাশ্রমে কাজ করেন এবং কিছুদিনের জন্য তিনি জামতাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর সেবক এবং কয়েক বৎসর স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজেরও সেবা করেন। সরল অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

সিঁথি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের উদ্যানবাটীতে গত ২৮ অক্টোবর ১৯৮২, শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি-স্মরণে এক আনন্দানুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় প্রদীপ জ্বালাইয়া এবং পরে কথামৃত পাঠ, শ্রীনির্মল রায়ের ভক্তিগীতি পরিবেশন ও পরিশেষে হরিসংকীর্তন দ্বারা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব সিঁথি (দমদম) শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২৮ নভেম্বর ১৯৮২, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ প্রভৃতি হয়। তিনশত ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর সেবাধর্ম-প্রসঙ্গে ভাষণ দেন। বৈকালে ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা। স্তোত্রপাঠ ও ভজনগানের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ভূতনাথ ভট্টাচার্য** গত ১২ জুলাই ১৯৮২, বৈকাল ৫টায় বাঁকুড়া জেলার নবগ্রাম গ্রামের স্বীয় বাসভবনে ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রামহরিপুর, বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহিত তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদলের আজীবন সদস্য ও অন্যান্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **প্রীতিময়ী কর** গত ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। কর্তব্য-পরায়ণতা, ধর্মানুরাগ, সমাজসেবা, সাহিত্যচর্চা, সাধু-ভক্ত-আত্মীয়-পরিজনদের সেবা প্রভৃতি ছিল তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের প্রাক্তন যুগ্মসচিব এবং শিক্ষা-অধিকর্তা **ডঃ নিশীথরঞ্জন কর** গত ২৩ অগস্ট ১৯৮২, রাত্রি ৮-২০ মিনিটে আকস্মিক গুরুতর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। ছাত্রজীবনে তিনি মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন। প্রথিতযশা ভৌগোলিক হিসাবে তিনি দেশে ও বিদেশে সুপরিচিত ছিলেন।

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের প
নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—**স্বামী নিরাময়ানন্দ** : সংযুক্ত-সম্পাদক—**স্বামী অজজানন্দ**

